মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র

সপ্তম খণ্ড

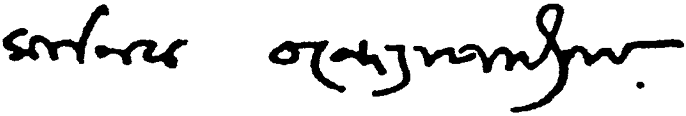

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)
ISBN 81-7751-0371

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : সপ্তম খণ্ড

নিবেদন
পেশা ৯
সোনার চেয়ে দামি (প্রথম খণ্ড) ১০৯
বেকাব
সোনার চেয়ে দামি (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৬৫
আপস
স্বাধীনতার স্বাদ ২৫৯
ছন্দপতন ৩৯৩

গ্রন্থপরিচয় ৪৫৯
পবিশিষ্ট বর্জিত পাঠ ৪৭১
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায জীবনপঞ্জি ৪৮৭

চিত্রপরিচয়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায সূচনা পৃষ্ঠা
পেশা প্রথম সংস্করণেব প্রচ্ছদচিত্র ১১
মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব ডাযেবিব একটি পৃষ্ঠাব অংশ ১০৮
সোনাব চেযে দামি প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র ১১১
স্বাধীনতার স্বাদ প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র ২৬১
মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব ডাযেবির একটি পৃষ্ঠার অংশ ৪৫৮
স্বাধীনতার স্বাদ পাণ্ডুলিপি চিত্র ৪৭০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

প্রধান সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বরানগর পিপলস লাইব্রেরি
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
হিরণ লাইব্রেরি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
প্রবর্তক সংঘ, সিঁথি
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীজগন্নাথ চন্দ্র

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীশ্যামল মৈত্র
শ্রীমুক্তিরাম মাইতি
শ্রীমতী অপর্ণা দাশ
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্যের শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক-পরিবার ও গ্রন্থালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান-পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ-সময় ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল-সৃষ্টিকারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা, সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম ছয়টি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। নানা কারণে সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল কিঞ্চিৎ বিলম্বে। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮

মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

পেশা

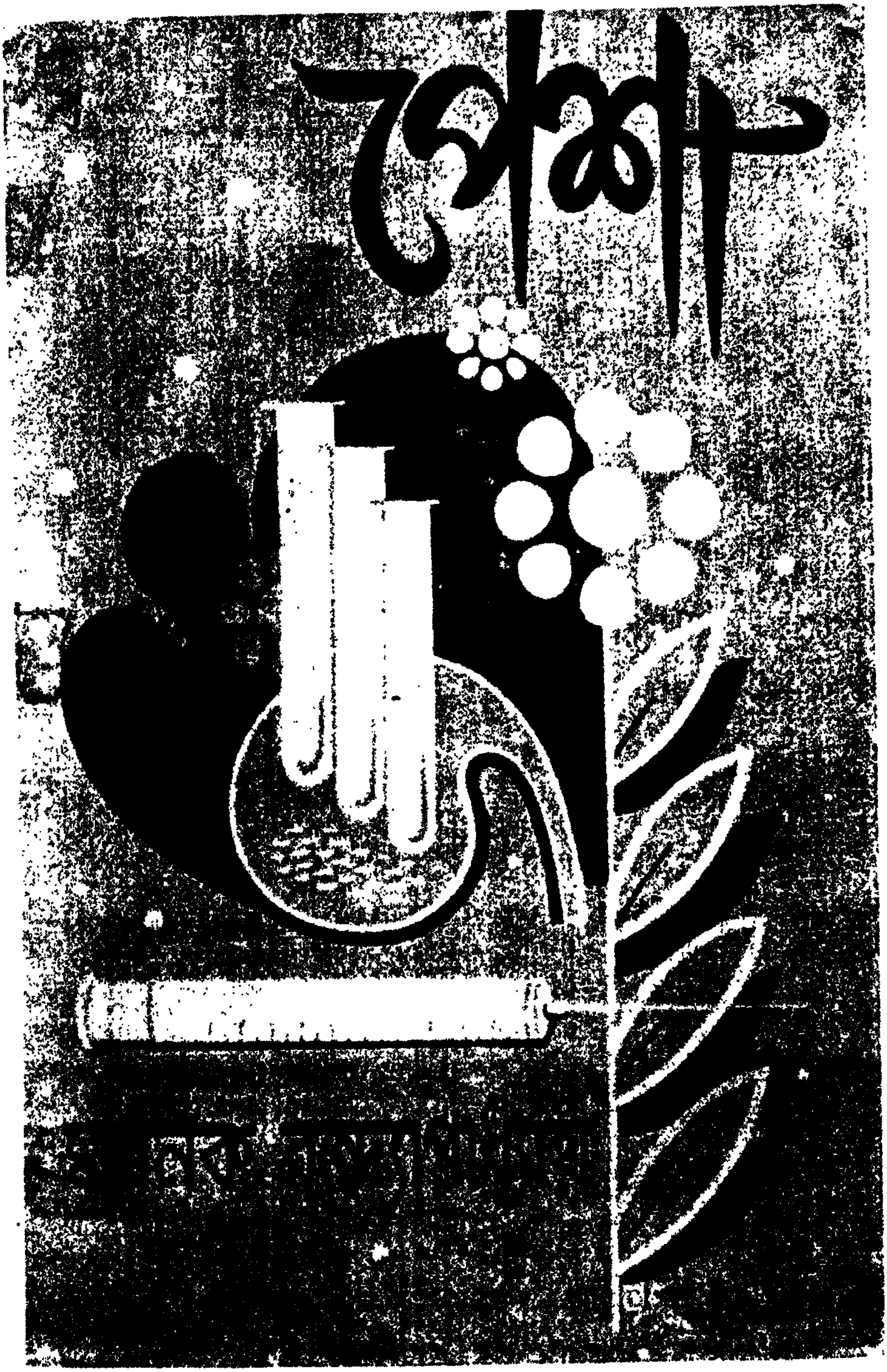

পেশা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

কেদার আজ পাসের খবর জানতে যাবে।

প্রকাশ্যভাবে সকলের পাস-ফেলের খবর প্রকাশ হতে এখনও কয়েকদিন দেরি আছে। তলে তলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হওয়ায় খবরটা আগেই জানার ব্যবস্থা হয়েছে।

বাড়ির লোকের কথা আলাদা। তারা ব্যাকুল হবেই। একদিন আগে পাসের খবর সুনিশ্চিত জেনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারাটাও তাদের কাছে সামান্য কথা নয়। নিজের আগ্রহ ব্যাকুলতাই অত্যন্ত অনুচিত মনে হয় কেদারের।

পাস করে যে ডাক্তার হবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের রোগ সারাবার মৃত্যু ঠেকাবার দায়িত্ব পাবে, জানা কথা জানতে কী তার এমন অধীর হওয়া সাজে ?

পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। সহজ বুদ্ধিতেই সে জানে যে কল্পনাতীত কোনো অঘটন না ঘটলে তার ভালোভাবে পাস না করার কোনোই কারণ নেই। তবু শুধু এই পাসের খবরটা জানার জন্য সেও যেন বাড়ির লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাকুল হয়েছে মনে হয়।

এ যেন গেঁয়ো লোকের চেক পাওয়া। জানে চেক ভাঙিয়ে টাকা পাওয়া যাবে তবু নগদ টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকা।

পাস করে ডাক্তার হবে কেদার।

ডাক্তার হওয়ার সাধ তার ছেলেবেলার স্বপ্ন।

রহস্যলোকের রহস্যময় লোক ছিল ডাক্তাররা তার কাছে, রূপকথার যাদুকরদের জীবন্ত বাস্তব সংস্করণ। রোগ হয়ে মানুষ মরে, ছোটোবড়ো সব মানুষ, তাদের বাড়িতেও অন্যলোকের বাড়িতেও। রোগ হয়েও মানুষ বাঁচে, ডাক্তার রোগীকে বাঁচায়, কিন্তু ডাক্তার দেখাবার মতো রোগ হলেই মরণের আকাশপাতাল জোড়া ভয়ংকর রহস্য ঘনিয়ে আসে বাড়িতে। ডাক্তার লড়াই করে তার সঙ্গে, কাটিয়ে দেয় সেই যাদু, বাড়ি থেকে উপে যায় দম আটকানো ভয় ভাবনা বিষাদের বিশ্রী আবহাওয়া।

ভূতের ভয়ে না নড়ে চড়ে জেগে থাকার মতো ওই আবহাওয়া বাড়িতে আসে আগে, রোগের সঙ্গে আসে। তারপর আবির্ভাব ঘটে ডাক্তারের, কালো ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আবহাওয়ায় অদ্ভুতরকম পরিবর্তন ঘটে যায়।

হাতের কাজ স্থগিত হয়, ফিসফিসানি কথা থেমে যায়, সকলের উদ্‌বেগ আর আতঙ্ক যেন রূপান্তরিত হয় প্রত্যাশায়। স্পষ্ট টের পাওয়া যায় রোগীর দিক থেকে সকলের মনের কাঁটা যেন চুম্বকের টানে ঘুরে গিয়েছে ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারের উপর গুরুজনদের অসীম ভয়ভক্তি, শিশুর মতো নির্ভরতা, মুখের কথা খসতে না খসতে ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের আদেশ পালন করা আর সারা বাড়ি জুড়ে গম্ভীর থমথমে ভাব—সমস্ত মিলে কেদারকে অভিভূত করে রাখত।

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তার ডাক্তারকে জগতে সেরা জীব মনে করার আসল কারণ।

বাড়িতে ডাক্তার আসার কারণ ও সম্ভাবনা ঘটলে কিশোর বয়সেও সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎকণ্ঠার তার সীমা থাকেনি পাছে কোনো কারণে ডাক্তারের আসা বাতিল হয়ে যায়।

রোগীর জন্য মমতা নিয়ে সে পড়ে যেত বিষম মুশকিলে।

অসুখ যদি কম হয়, রোগী যদি এমনিই সেরে উঠবে বোঝা যায়, তবে তো আর ডাক্তারের পদার্পণ ঘটবে না বাড়িতে। অথচ যাকে ভালোবাসে, অসুখটা তার সেরে না গিয়ে কঠিন হয়ে যাক এ কামনাই বা সে করে কী করে।

বাড়িতে ডাক্তারের পদার্পণ ঘটুক কামনা করাই অশুভ।

তাই একটা বোঝাপড়া দরকার হত।

অসুখ যেন সেরে যায়, নিশ্চয় সেরে যায়, ডাক্তার এসে চিকিৎসা আরম্ভ করা মাত্র সেরে যায়। অসুখ সারবে বইকী। নিশ্চয় সারবে। তবে ডাক্তার এসে অসুখটা সারিয়ে দিক এমনি যেন না সারে, না কমে—ডাক্তারের আসা যেন বাতিল না হয়ে যায়।

বাস্। শুধু এইটুকু সে চায়।

অসুখ হোক। ডাক্তার ডাকতে হোক। ডাক্তার আসুক। অসুখ সেরে যাক

প্রমাণ হোক যে ভগবান নয়, অসুখ সারিয়ে মানুষকে প্রাণ দেয় ডাক্তার।

ছেলেবেলাতেও সে অনেকবার দেখেছে, ডাক্তার এলেও অসুখ সারেনি রোগী মারা গেছে। এই বাড়িতেই মরেছে তার ঠাকুরদা, পিসিমা, বড়োদিদি, ছোটো দুটি ভাইবোন, চারজন আত্মীয় আত্মীয়া। যাদের ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যই তাদের শহরের এই বাড়িতে আনা হয়েছিল।

পাড়ার অনেক বাড়িতে ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মরেছে তার চেনা পরিবারের চেনা লোক—সংখ্যা তাদের কম নয়।

বাড়িতে চিঠি এসেছে শোক আর আপশোশ বহন করে, দূরের নিকট মানুষের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে—যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছিল, বড়ো ডাক্তার সকলকেই দেখানো হইয়াছে কিন্তু –।

কিন্তু যতই মনে আসুক, এ সব ব্যর্থতা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, ডাক্তারদের ছোটো করে দিতে পারেনি তার কাছে।

বরং এ সব মরণই তার কাছে ডাক্তারদের করে তুলেছে অমানুষিক প্রতিভার প্রতীক—নিয়তির মতো এ রকম অনিবার্য মরণকে পর্যন্ত যারা ঠেকাতে চায়, ঠেকাতেও পারে।

অসুখে মরেছে অনেকে- কিন্তু তার চেয়ে কত বেশি লোক অসুখে মরেনি এই ডাক্তারদের জন্য ?

সে নিজে ? জ্বরে, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়, ফোঁড়ায়, হাত ভেঙে কষ্ট পেয়েছে, টাইফয়েড হয়ে কয়েকদিনের জন্য মরে গিয়েছিল।

ডাক্তার তার কষ্ট কমিয়েছে, তাকে বাঁচিয়েছে, পাড়ার হর্ষ ডাক্তার।

পরীক্ষা দেবার আগে অসম্ভব অমানুষিক খাটুনি খাটতে খাটতে অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে। প্র্যাকটিস ইন মেডিসিনের ভল্যুমগুলি দিয়ে চতুর্দোলা বানিয়ে কেদার ডাক্তারকে সসম্মানে তাতে চড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজার চেয়ে বড়ো ডাক্তার পালের মেয়ে গীতার অসুখ সারাবার জন্য, রাজা ডাক্তার পাল আর রাণীসুন্দরী কেঁদে বলছে, মেয়েকে বাঁচাও, মেয়ে আর আমাদের ডাক্তারি সম্মান ও পশারের অর্ধেক তোমায় দেব।

সকাল থেকে বাড়িতে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। পরিবারের প্রথম ছেলে প্রথম আশা প্রথম ভরসা কেদার। সে পাস করে ডাক্তার হয়ে পসার করলে সকলের অবস্থাই বদলে যাবে নিশ্চয়।

শুভময়ী ঘুম ভেঙে ছেলের কল্যাণের জন্য দেবদেবীর নাম স্মরণ করে চলেছে। মানত করা হয়ে আছে অনেক আগেই, কেদারের যখন পরীক্ষা শুরু হয়।

পাস করে আমায় কী এনে দিবি ?

তুমি কী চাও ?

তুই যা চাস আমি তাই চাই। একটা বউ এনে দিবি আমায় !

প্রমথ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। ধৈর্য ও স্থৈর্য বজার রাখার চেষ্টায় এটা এসেছে। শুধু হাত দুটি তার মাঝে মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে খবরের কাগজ ধরে থাকতে।

ছোটো ভাই উপেন ভালো ছেলে, পাস দিতে ওস্তাদ। ঘনায়মান পরীক্ষা-সংকটের দিনেও সে স্কলারশিপ নিয়ে কলেজের প্রথম ধাপ ডিঙিয়েছে।

তার মৃদু একটু অবজ্ঞা ও প্রত্যাশার মিশ্রিত ভাব। তার মতো ভালো করে পরীক্ষা পাসের সাধ্য দাদার নেই, তবে কেদারের পাস করে ডাক্তার হওয়াটা দরকার। প্রমথ সামলাতে পারছে না, পড়াশোনার উঁচুস্তরে উঠতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে দাদার সাহায্য দরকার হবে।

অমলা বড়ো বকে। তার মুখের যেন আজ কামাই নেই। দাদা তাব পাস করবে এটা ধরে নিয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বকে চলেছে বলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে কারও প্রাণ সরছে না, যদিও এত বড়ো ধেড়ে মেয়ের এত বেশি বকাটাই এক ধরনের বজ্জাতি।

দোতলার ভাড়াটে জনার্দন অকারণেই উপর থেকে ডাক দিয়ে জেনে নিয়েছে, কেদার আজ যাচ্ছে কিনা। কথাটা তার জানা। কাল সন্ধ্যায় কেদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বহুক্ষণ একটানা আলোচনা চালাবার সময় প্রমথ অনেকবার তাকে জানিয়েছিল।

তাছাড়া একতলায় কী ঘটছে না ঘটছে কিছুই গোপন থাকে না দোতলায়। নেহাত ফিসফিস করে কথা না বললে নীচের তলার কথাবার্তা উপর থেকে সবই প্রায় শোনা যায়।

তার মেয়ে মায়া একবার ঘুরে গিয়েছে নীচেব তলা থেকে। বিয়ের যোগ্য পাস করা ছেলেদের বিরুদ্ধে তার একটা নালিশ সমগ্রভাবে ঘনীভূত হচ্ছে দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে। কিন্তু কেদাবের পাস-ফেলে তার কিছু আসে যায় না।

পাস করলে আমায় কী দেবেন কেদারদা ?

তোমায় ? একটা চশমা দেব—কালো বব এলে ফরসা দেখাবে। পরিমল কী করছে ?

দাদা রোগী দেখতে বেরোবে।

জনার্দনের বড়ো ছেলে সম্প্রতি কবিরাজ হয়েছে। গলির মোড়ের কাছে ছোটো একটি ঘরে ওষুধের ছোটোখাটো দোকান খুলে বসেছে। দু-চারপয়সা কামাতে শুরু করেছে রোগী দেখে এবং ওষুধ বিক্রি করে, তবু এখনও এ পেশা নিতে হওয়ায় তার মনে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে নিদারুণ।

বাপের সঙ্গে অনেক লড়াই করে তবে সে হার মেনেছিল। কেদার হতে চলেছে ডাক্তার, তাকে হতে হবে কবিরাজ ! কেদার একদিন মোটরে চেপে রোগী দেখবে, কাজে লাগাবে হরেক রকম সহজ আর জটিল যন্ত্রপাতি, আলোয় ঝলমল সাজানো ডিসপেনসারিতে বসবে রাজা হয়ে, আর সে কিনা ছোটো একটা ঘুপচি ঘরে কয়েকটা আরক জারক বড়ি সম্বল করে পুঁথি ঘাঁটবে খল নাড়বে আর শুধু আঙুল দিয়ে টিপে দেখবে নাড়ি।

তার মনে হয়েছিল, কেদার এগিয়ে চলেছে যুগের সঙ্গে আর সে পিছনে চলতে শুরু করেছে শত শত বছর আগেকার জীবনের দিকে।

বেরিয়ে যাবার সময় কেদারের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করেই পরিমল নীরবে রাস্তায় নেমে যায়।

কেদারও চুপ করে থাকে। পরিমলের মনের ভাব সে খুব ভালো করেই জানে।

বাড়িতে ডাক্তার আসার কারণ ও সম্ভাবনা ঘটলে কিশোর বয়সেও সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎকণ্ঠার তার সীমা থাকেনি পাছে কোনো কারণে ডাক্তারের আসা বাতিল হয়ে যায়।

রোগীর জন্য মমতা নিয়ে সে পড়ে যেত বিষম মুশকিলে।

অসুখ যদি কম হয়, রোগী যদি এমনিই সেরে উঠবে বোঝা যায়, তবে তো আর ডাক্তারের পদার্পণ ঘটবে না বাড়িতে। অথচ যাকে ভালোবাসে, অসুখটা তার সেরে না গিয়ে কঠিন হয়ে যাক এ কামনাই বা সে করে কী করে।

বাড়িতে ডাক্তারের পদার্পণ ঘটুক কামনা করাই অশুভ।

তাই একটা বোঝাপড়া দরকার হত।

অসুখ যেন সেরে যায়, নিশ্চয় সেরে যায়, ডাক্তার এসে চিকিৎসা আরম্ভ করা মাত্র সেরে যায়। অসুখ সারবে বইকী। নিশ্চয় সারবে। তবে ডাক্তার এসে অসুখটা সারিয়ে দিক, এমনি যেন না সারে, না কমে—ডাক্তারের আসা যেন বাতিল না হয়ে যায়।

বাস্‌। শুধু এইটুকু সে চায়।

অসুখ হোক। ডাক্তার ডাকতে হোক। ডাক্তার আসুক। অসুখ সেরে যাক।

প্রমাণ হোক যে ভগবান নয়, অসুখ সারিয়ে মানুষকে প্রাণ দেয় ডাক্তার।

ছেলেবেলাতেও সে অনেকবার দেখেছে, ডাক্তার এলেও অসুখ সারেনি রোগী মারা গেছে। এই বাড়িতেই মরেছে তার ঠাকুরদা, পিসিমা, বড়োদিদি, ছোটো দুটি ভাইবোন, চারজন আত্মীয় আত্মীয়া যাদের ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যই তাদের শহরের এই বাড়িতে আনা হয়েছিল

পাড়ার অনেক বাড়িতে ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মরেছে তার চেনা পরিবারের চেনা লোক—সংখ্যা তাদের কম নয়।

বাড়িতে চিঠি এসেছে শোক আর আপশোশ বহন করে, দূরের নিকট মানুষের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে—যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছিল, বড়ো ডাক্তার সকলকেই দেখানো হইয়াছে কিন্তু ।

কিন্তু যতই মনে আসুক, এ সব ব্যর্থতা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ডাক্তারদের ছোটো করে দিতে পারেনি তার কাছে।

বরং এ সব মরণই তার কাছে ডাক্তারদের করে তুলেছে অমানুষিক প্রতিভার প্রতীক নিয়তির মতো এ রকম অনিবার্য মরণকে পর্যন্ত যারা ঠেকাতে চায়, ঠেকাতেও পারে।

অসুখে মরেছে অনেকে- কিন্তু তার চেয়ে কত বেশি লোক অসুখে মরেনি এই ডাক্তারদের জন্য?

সে নিজে? জ্বরে, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়, ফোঁড়ায়, হাত ভেঙে কষ্ট পেয়েছে টাইফয়েড হয়ে কয়েকদিনের জন্য মরে গিয়েছিল।

ডাক্তার তার কষ্ট কমিয়েছে, তাকে বাঁচিয়েছে, পাড়ার হর্ষ ডাক্তার।

পরীক্ষা দেবার আগে অসম্ভব অমানুষিক খাটুনি খাটতে খাটতে অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে। প্র্যাকটিস ইন মেডিসিনের ভল্যুমগুলি দিয়ে চতুর্দোলা বানিয়ে কেদার ডাক্তারকে সসম্মানে তাতে চড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজার চেয়ে বড়ো ডাক্তার পালের মেয়ে গীতার অসুখ সারাবার জন্য, রাজা ডাক্তার পাল আর রাণীসুন্দরী কেঁদে বলছে, মেয়েকে বাঁচাও, মেয়ে আর আমাদের ডাক্তারি সম্মান ও পশারের অর্ধেক তোমায় দেব।

সকাল থেকে বাড়িতে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। পরিবারের প্রথম ছেলে প্রথম আশা প্রথম ভরসা কেদার। সে পাস করে ডাক্তার হয়ে পসার করলে সকলের অবস্থাই বদলে যাবে নিশ্চয়।

শুভময়ী ঘুম ভেঙে ছেলের কল্যাণের জন্য দেবদেবীর নাম স্মরণ করে চলেছে। মানত করা হয়ে আছে অনেক আগেই, কেদাবের যখন পরীক্ষা শুরু হয়।

পাস করে আমায় কী এনে দিবি ?

তুমি কী চাও ?

তুই যা চাস আমি তাই চাই। একটা বউ এনে দিবি আমায় !

প্রমথ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। ধৈর্য ও স্থৈর্য বজার রাখার চেষ্টায় এটা এসেছে। শুধু হাত দুটি তার মাঝে মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে খবরের কাগজ ধরে থাকতে।

ছোটো ভাই উপেন ভালো ছেলে, পাস দিতে ওস্তাদ। ঘনায়মান পরীক্ষা-সংকটের দিনেও সে স্কলারশিপ নিয়ে কলেজের প্রথম ধাপ ডিঙিয়েছে।

তার মৃদু একটু অবজ্ঞা ও প্রত্যাশার মিশ্রিত ভাব। তার মতো ভালো করে পবীক্ষা পাসের সাধ্য দাদার নেই, তবে কেদারের পাস করে ডাক্তার হওয়াটা দরকার। প্রমথ সামলাতে পারছে না, পড়াশোনার উঁচুস্তরে উঠতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে দাদার সাহায্য দরকাব হবে।

অমলা বড়ো বকে। তার মুখের যেন আজ কামাই নেই। দাদা তার পাস করবে এটা ধরে নিয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বকে চলেছে বলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে কারও প্রাণ সরছে না, যদিও এত বড়ো ধেড়ে মেয়ের এত বেশি বকাটাই এক ধবনের বজ্জাতি।

[illegible] ভাড়াটে জনার্দন অকারণেই উপর থেকে ডাক দিয়ে জেনে নিয়েছে, কেদার আজ যাচ্ছে কিনা। কথাটা তার জানা। কাল সন্ধ্যায় কেদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বহুক্ষণ একটানা আলোচনা চালাবার সময় প্রমথ অনেকবার তাকে জানিয়েছিল।

তাছাড়া একতলায় কী ঘটছে না ঘটছে কিছুই গোপন থাকে না দোতলায়। নেহাত ফিসফিস করে কথা না বললে নীচের তলার কথাবার্তা উপর থেকে সবই প্রায় শোনা যায়।

তার মেয়ে মায়া একবার ঘুরে গিয়েছে নীচের তলা থেকে। বিয়েব যোগ্য পাস করা ছেলেদের বিরুদ্ধে তার একটা নালিশ সমগ্রভাবে ঘনীভূত হচ্ছে দিন কেটে যাওয়াব সঙ্গে। কিন্তু কেদারেব পাস-ফেলে তার কিছু আসে যায় না।

পাস করলে আমায় কী দেবেন কেদারদা ?

তোমায ? একটা চশমা দেব—কালো বর এলে ফরসা দেখাবে। পরিমল কী করছে ?

দাদা রোগী দেখতে বেরোবে।

জনার্দনের বড়ো ছেলে সম্প্রতি কবিরাজ হয়েছে। গলির মোড়ের কাছে ছোটো একটি ঘরে ওষুধের ছোটোখাটো দোকান খুলে বসেছে। দু-চারপয়সা কামাতে শুরু করেছে রোগী দেখে এবং ওষুধ বিক্রি করে, তবু এখনও এ পেশা নিতে হওয়ায় তার মনে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে নিদারুণ।

বাপের সঙ্গে অনেক লড়াই করে তবে সে হার মেনেছিল। কেদার হতে চলেছে ডাক্তার, তাকে হতে হবে কবিরাজ ! কেদার একদিন মোটরে চেপে রোগী দেখবে, কাজে লাগাবে হরেক রকম সহজ আর জটিল যন্ত্রপাতি, আলোয় ঝলমল সাজানো ডিসপেনসারিতে বসবে রাজা হয়ে, আর সে কিনা ছোটো একটা ঘুপচি ঘরে কয়েকটা আরক জারক বড়ি সম্বল করে পুঁথি ঘাঁটবে খল নাড়বে আর শুধু আঙুল দিয়ে টিপে দেখবে নাড়ি।

তার মনে হয়েছিল, কেদার এগিয়ে চলেছে যুগের সঙ্গে আর সে পিছনে চলতে শুরু করেছে শত শত বছর আগেকার জীবনের দিকে।

বেরিয়ে যাবার সময় কেদারের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করেই পরিমল নীরবে রাস্তায় নেমে যায়।

কেদারও চুপ করে থাকে। পরিমলের মনের ভাব সে খুব ভালো করেই জানে।

প্রমথ তাগিদ জানায়, দেরি করিসনে কেদার। ডাক্তার সান্যাল বেরিয়ে গেলে আবার মুশকিল হবে।

এই যে যাই।

আজ তাকে দ্বিতীয় দফায় আরেকবার চা দেওয়া হয়েছে। বেশি গরম চা মুখে নিয়ে ফেলায় কেদারের চোখে জল এসে পড়ে ।

কেন মিছে তাগিদ দেওয়া তাকে ? তার কী গরজ নেই !

জামা-কাপড় পরে সে তৈরি হলে শুভময়ী তার কপালে শুকনো বিবর্ণ দুটি ফুলপাতা ছুঁইয়ে দেয়। অনেক দূরের তীর্থ থেকে অনেকদিন আগে এ জিনিসটি আনা হয়েছিল, ন্যাকড়ায় বেঁধে তোরঙ্গে একেবারে গয়নার বাকসের মধ্যে সযত্নে তুলে রাখা হয়।

উত্তেজনায় শুভময়ীর মুখের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটেছে যে চেয়ে দেখে কেদারের মনে হয়, মার শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।

প্রণাম নেবার জন্য প্রমথও শুভময়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনকে প্রণাম করে কেদার বেরিয়ে যায়।

ডাক্তার সান্যাল বলে, তুমি ফাঁকিবাজ ছেলে কেদার ।

শুনে বুকটা ধড়াস করে ওঠে কেদারের। হিসাব তবে তার ভুল হয়েছে ? পরীক্ষার ব্যাপার, কে জানে কোথায় কী গোলমাল হয়ে গেছে !

সান্যাল বলে, আগে থেকে একটু তদ্‌বির করতে পারলে না?

কেদার ম্লান মুখে বলে, তদ্‌বির করে আর কী হবে স্যার ? ও ভাবে পাস করতে চাই না। কীসে ফেল করলাম ?

সান্যাল হেসে বলে, আরে না, ফেল করবে কেন । সে কথা বলিনি। ফেল কি হে, তুমি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ ! তাই বলছিলাম একটু তদ্‌বির করলে খুব ভালো পজিশন বাগিয়ে নিতে পারতে। আমাকেও যদি জানাতে আগে যে ডাক্তার পাল তোমার জন্য স্পেশাল ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন—

কেদারের যেন জ্বর ছাড়ে। পাস তাহলে সে করেছে ভালোভাবেই ! তদ্‌বিরের অভাবে যা ফসকে গিয়েছে সে জন্য সে কিছুমাত্র আপশোশ বোধ করে না।

খবর জানতে সময় লাগে সামান্যই। কিন্তু সোজা বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না কেদার। আরেকজন উন্মুখ হয়ে আছে খবরটা শুনবার জন্য।

গীতাকে খবর জানাবার জন্য তাকে রওনা দিতে হয় শহরের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে।

ট্রামে এত লোকের মধ্যে, লেডিজ সিটে চোখ টেনে নেবার মতো অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি বসে থাকলেও, সে যেন আজ শুধু দেখতে পায় মিকশ্চারের শিশি হাতে শীর্ণ বিবর্ণ বউটিকে আর তার পাসের শার্ট পরা রোগা মানুষটার কোলে একটা জীবন্ত কঙ্কালের মতো ছেলেটাকে।

কেদার জানে বউটির হাতের শিশির ওষুধটা তার নিজের জন্য, ওর মুখের সুস্পষ্ট জ্বরের ছাপ দেখেই তা বোঝা যায়। ছেলেটারও চিকিৎসা দরকার কিন্তু সেটা সাধারণ ওষুধপত্রের চিকিৎসা, দুদিন পরে হলেও চলবে, না হলেই বা উপায় কী !

বাড়িতে ডাক্তার ডাকার ক্ষমতা নেই, জ্বর গায়ে বউটিকে তাই বিছানা ছেড়ে যেতে হয়েছে চিকিৎসকের কাছে।

হাসপাতালে কেন যায়নি কেদার জানে।

হাসপাতালে রোগ পরীক্ষার জন্য যতক্ষণ বসে থাকতে হবে, জ্বর গায়ে ততক্ষণ বসে থাকাব সাধ্য বউটির নেই।

তার কাছেও একদিন এ রকম রোগী আসবে, বাড়িতে ডেকে তাকে ফি দেবার সাধ্য যার নেই। রোগীকে সে পরীক্ষা করবে, বিধান দেবে ওষুধ ও পথ্যের, বলে দেবে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে পাঁচ মিনিটের জন্যও বিছানা ছেড়ে ওঠা উচিত নয় এ রোগীর পক্ষে !

উচিত তো নয়, কিন্তু সেও তো বিনা ফি-তে বাড়ি গিয়ে দেখবে না ওই রোগীকে। তাকে দর্শনী দিতে হলে ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না—বাড়িতে ডেকে তাকে দেখানোর কোনো অর্থ থাকে না।

ডাঃ পালের বাড়িটা পৈতৃক নয় তার নিজের পয়সা ও রুচি অনুসারে তৈরি। তৈরি হবার পর বাড়িটার অনেক বদল হয়েছে এবং নতুনত্ব ঘটেছে বোঝা যায়। সেগুলি ইঙ্গিত করে তার পয়সা বাড়বার এবং প্রথম বয়সের রুচিগত আধুনিক সূক্ষ্মতা ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসার।

খবর শুনে গীতা খুশি হয়ে বলে, দেখলে তো ? একটা আদর্শ ছাড়া কিছু হয় না মানুষের! বাজে ছাত্র ছিলে, ভালো পাস করলে কার জন্য ?

খাইয়ে দিতে হবে না কি ? কী খাবে ?

ছুটকো খাওয়া খাইনে আমি। রোজ খাওয়ার বাকি ব্যবস্থাটা করে ফ্যালো এবার।

গীতা হাসে।—তবে তুমি দুটো একটা খেতে পার। শুধু আজ, খবরটা এনেছ বলে !

গীতার মুখের কোমল মসৃণ ত্বক আজ এই বিশেষ দিনেও আড়াল করে দিতে পারে না ট্রামের সেই রুগ্ণ বউটির জ্বরতপ্ত মুখখানা।

বিশেষ দিন বলেই বোধ হয়।

এত কাছে গীতার মুখ কিন্তু মনে ভেসে আসে সেই রুগ্ণা রমণীর মুখখানা। গীতাকে চিরদিনের জন্য ঘরে রেখে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হলে ওদের কথা ভাবলে চলবে না, ওই সব রোগিনী জ্বর-গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তার কাছে এলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার উদারতা দিয়ে হবে না। গোড়াতেই না হোক, লক্ষ্য তাকে রাখতে হবে ডাক্তার পালের স্তরে উঠতে, আরও উঁচুতে যদি নাও উঠতে পারে। এতই বাড়াতে হবে তার চিকিৎসার দাম যে অবস্থাপন্ন লোকেরাও নেহাত দায়ে না ঠেকলে বাড়িতে ডাকবে না, অর্ধেক ফি দিয়ে কাজ সারবার জন্য তারই বাড়িতে এসে ভিড় করবে।

আজ পাসের খবর জেনে এসে গীতার এত কাছে বসেও প্রথম খটকা লাগে কেদারের, সে কি পারবে ? যে সব বিশেষ গুণ দরকার হয় ডাক্তার পালের মতো বড়ো ডাক্তার হতে হলে, সে গুণগুলি তার কি সব আছে ?

সবচেয়ে আগে দরকার হবে যে মানসিক গঠন ?

বাবাকে জানিয়ে যেয়ো। একটু বোসো।

গীতার এই ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গিয়েই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় কেদারের। ডাক্তার পাল জরুরি কলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে খবর শুনে বলে, বাঃ উদ্যোগীরাই পুরুষসিংহ সন্দেহ কী !

গীতা বলে, কিন্তু বাবা আসল উদ্যোগটা কার ?

তোমার ! পুরুষের আবার নিজের উদ্যোগ থাকে নাকি ? মেয়েরাই সব, মেয়েদের জন্যই সব !

হাসিটা হাসিই হয় ডাক্তার পালের কিন্তু এই সকাল বেলা তার মুখের শ্রান্তভাবটাও কেদার লক্ষ করেছে। এখনও প্রায় সারাটা দিন রোগী দেখা বাকি !

এদিকে বেলা বাড়ে, শুভময়ীর অস্বস্তি আর উত্তেজনাও বাড়ে। দুঘণ্টার মধ্যে কেদারের ফিরবার কথা। সাড়ে সাতটার সময় সে বেরিয়েছে, বাড়ি ফিরতে তার সাড়ে নটা বড়ো জোর দশটা হওয়া উচিত। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে শুভময়ীর মনে হতে থাকে, বড়ো দেরি করছে কেদার।

প্রমথ বলে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? কতরকম কারণ ঘটতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় কী কাজ হয় ?

কিন্তু ভিতর থেকে যার নিদারুণ কষ্টকর অস্বস্তি চাপ দিচ্ছে, সে কী যুক্তি মেনে শান্ত হতে পারে ! বারবার সে প্রশ্ন করে, কটা বাজল ? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেমন এক বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

তবে কি খারাপ খবর ? না, বিপদ-আপদ ঘটল কিছু ?

প্রমথ আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিল। আপিসে লেট হয়ে গেলেই বা উপায় কী। খবরটা না জেনে সে তো আজ বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারবে না কিছুতেই ! আজকালকার ছেলেদের সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই।

ঘামে গরমে দুশ্চিন্তায় শুভময়ীর মুখ যা হয়েছে দেখে তার অস্বস্তি শতগুণে বেড়ে যায়।

বারবার সে ভরসা দিয়ে বলে, আসবে, আসবে। এখুনি আসবে। হয়তো কোথাও দেরি করছে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছে—

তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো বরং।

দেখি, আরেকটু দেখি। এমনি লেট হয়ে গেছে, আমি এদিকে বেরোই ওকে খুঁজতে, ও এদিকে বাড়ি ফিরুক। অত ব্যস্ত হয়ো না। আরেকটু দেখি।

খানিক পরেই শুভময়ী অসুস্থ হয়ে পড়ল। সত্যসত্যই পড়ল। রান্নাঘরের ভেতর থেকে আরও একবার এসে দাঁড়িয়েছে সামনের ছোটো রোয়াকটুকুতে, লোহার হাতাটি পর্যন্ত হাতে ধরা আছে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই হাঁটু মুচড়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দেখা গেল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। শ্বাস বইছে আস্তে, আলগাভাবে। তাও যেন খুব কষ্টে।

হইহই ছুটোছুটি কান্নাকাটি পড়ে যায়। উপরতলার সকলে নেমে আসে। কলসি কলসি জল ঢালা হতে থাকে শুভময়ীর মাথায়। উপেন ছুটে যায় গলির মোড়ের সুধা ভান্ডার ডিসপেনসারির হর্ষ ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

সুস্থ সবল জ্যান্ত মানুষটার এ কী হল ? বছর খানেকের মধ্যে কোনো কঠিন অসুখ দূরে থাক একদিন একটু গা গরম পর্যন্ত হয়নি। এমনি মাথা ঘোরে, শরীর অস্থির অস্থির করে—তা, সংসারের এত খাটুনি খাটলে মেয়েদের ও রকম করেই থাকে।

মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করে নানারকম।

মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

দুবেলা উনানের আঁচ।

বাইরেটাই দেখতে পোস্ট, ভেতরে কী আছে কিছু ?

হর্ষ ডাক্তার এসে পৌঁছোবার মিনিটখানেক আগে কেদার বাড়ি ফিরল। মুখে তার ছিল আনন্দের জ্যোতি, ব্যাপার দেখে তা মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

শুভময়ীর নাড়ি পরীক্ষা করে একেবারে পাংশু হয়ে গেল তার মুখ। ইতিমধ্যেই এসে পড়ল ব্যাগ হাতে ঢিলে কোট আর আঁটো প্যান্ট পরা হর্ষ ডাক্তার। রোগিণীকে দেখে মুখখানা তারও একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

পরীক্ষা করতে করতে হর্ষ জিজ্ঞাসা করে, ব্লাডপ্রেসার আগে কখনও নেওয়া হয়নি ?

কেদার জবাব দেয়, না।

হর্ষ ব্লাডপ্রেসার নেওয়ার ব্যবস্থা করে। হর্ষ ডাক্তার যখন রক্তের চাপ মাপবার যন্ত্রটির ছোটো পাম্পটি টিপতে থাকে কেদারের চোখ দুটি বড়ো বড়ো হয়ে যেন বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে।

হর্ষ যেন শূন্যকে সম্বোধন করে বলে, এই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে এই গরমে উনি উনানের আঁচে রাঁধতে গিয়েছিলেন ?

কেদার স্তব্ধ হয়ে থাকে।

প্রমথ ভয়ে ভয়ে বলে, আমরা তো জানতাম না !

দুজন বড়ো ডাক্তারের নাম করে তাদের মধ্যে যাকে হোক একজনকে অবিলম্বে আনাবার প্রয়োজন জানিয়ে হর্ষ অন্যান্য ব্যবস্থা করার দিকে মন দেয়।

উপেন যায় অন্য ডাক্তার আনতে, কেদার নীরবে হর্ষ ডাক্তারের হুকুম পালন করে।

প্রায় যন্ত্রের মতো।

মাথাটা যেন সত্যই তার ভোঁতা হয়ে গেছে। তারা জানত না। কেন জানত না ? অন্য কেউ না জানুক, সে কেন জানেনি ? কেন জানবার প্রয়োজনও বোধ করেনি ? মায়ের তার কোনো প্রকাশ্য উগ্র রোগ হয়নি দু-একবছরেব মধ্যে, কিন্তু ভেতরের এই মারাত্মক রোগের কত লক্ষণ তো তার চোখের সামনে অবিরাম প্রকাশ পেয়ে এসেছে ? মায়ের এই পরিণামের ছোটো ছোটো অভ্রান্ত চিহ্নগুলি একে একে কেদারের মনে পড়ে যেতে থাকে। ও সব লক্ষণের যে কোনো একটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু কখনও সে তো খেয়ালও করেনি !

ও সব চিহ্ন যেন শুভময়ীর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক, বেখাপ্পা কিছু নয়। মায়েরা ও রকম করেই থাকে, মায়েদের মন মেজাজের ও রকম খাপছাড়া ভাব হয়। বিছানায় যতক্ষণ না পড়ে নির্দিষ্ট স্পষ্ট চোখে আঙুল দেওয়া রোগ হয়ে, ততক্ষণ মায়ের আবার রোগ কীসের ?

চিকিৎসা চলে শুভময়ীর।

তারই এক ফাঁকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করে, খবরটা জেনেছিস ?

খবর ?

কিছুক্ষণ মানেই বুঝতে পারে না কেদার।

যা জানতে বেরিয়েছিলি ?

পরীক্ষা শব্দটা উচ্চারণ করতে ভয় হয় প্রমথের।

জেনেছি। পাস করেছি।

রেজাল্ট কেমন হয়েছে কিছু—?

ভালো হয়েছে।

মুখে বলে ভালো হয়েছে। মনে মনে কেদার বলে, তার পাস করাই উচিত হয়নি। নিজের বাড়িতে নিজের মা যার চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা এমন মারাত্মক রোগ শরীরে বয়ে বেড়িয়ে আজ মরতে বসেছে, তার অধিকার নেই পরীক্ষায় পাস করে ডাক্তার হওয়ার।

২

ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করার গোড়ায় কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা জোটে, কতদিকে কত যে অনিশ্চয়তার মীমাংসা করে নিতে হয় !

অভিজ্ঞতাগুলি হয়তো বিচিত্র মনে হয় অনভিজ্ঞতার জন্য। নতুনত্ব আশ্চর্য করে দেয় নতুন ডাক্তারকে। কীভাবে চিকিৎসা-বিদ্যা কাজে লাগাবে স্থির করে নিয়ে স্থিতিলাভ করার পর বোধ হয় ডাক্তারের জীবনও হয়ে যায় একঘেয়ে, মনকে এতটুকু নাড়া দেবার মতো আর কিছুই ঘটে না।

একদিন যা মনে হয়েছিল সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার সেটাই বারবার ঘটে অতি সাধারণ ঘটনার মতো।

সারা জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে পুরো দমে ডাক্তারি আরম্ভ করার আগেই যে সব ছাড়া ছাড়া অভিজ্ঞতা জোটে কেদারের ; তা শুধু তাকে আশ্চর্য আর অভিভূতই করে দেয় না, রীতিমতো বিচলিত করে তোলে।

এবার কী করবে সে বিষয়ে একেবারে মনস্থির করে ফেলার কাজটা আরও কঠিন করে দেয়।

শুভময়ীর মৃত্যু তাকে বেশ খানিকটা কাবু করে দিয়েছে। যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাব ভাব ক্রমে ক্রমে অনুভব করছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলার দিন কাছে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে, মার আকস্মিক মরণ যেন শতগুণ জোরালো করে দিয়েছে সেই ভাব।

শুভময়ী মারা না গেলে হয়তো ইতিমধ্যেই তাকে করে ফেলতে হত চরম সিদ্ধান্ত। গীতা তাকে রেহাই দিত না, সময় দিত না। নিজে উদ্যোগী হয়ে কেদারকে আর ডাক্তার পালকে নিয়ে পরামর্শ সভা বসিয়ে ঠিক করে দিত কেদার কখন কীভাবে বিদেশে যাবে, কী কী ব্যবস্থা দবকার হবে সে জন্য।

শুভময়ীর মরণ যেমন একদিকে এলোমেলো করে দিয়েছে চিন্তা, অন্যদিকে তেমনি কিছু সময়ও তাকে পাইয়ে দিয়েছে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার জন্য।

মার শোকে তাকে এত বেশি বিচলিত হতে দেখে গীতা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

সে বলতে গিয়েছিল, মা কি চিরদিন থাকে ?

কেদার বলেছিল, শুধু শোক হয়নি গীতা। আমি এদিকে ডাক্তার হচ্ছি, আমাকে ডাক্তার কবার জন্য মা ওদিকে মরছে। আমাকে ডাক্তার করার খরচ জোগাতে বাড়ির লোকেব অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে, মাকে মরতে হয়েছে। আমি যেদিন ডাক্তার হলাম, মা সেইদিন মবল। খবরটা শুনেও গেল না। মার শরীরটা যে ভয়ানক খারাপ হয়েছে, এটুকু আমার ধরা উচিত ছিল।

তারপর গীতা আর এ বিষয়ে কথা বলেনি।

কেদার হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে নিয়মিত গিয়ে বসে। হর্ষ ডাক্তার এবং তার পরিবারের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা।

এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। স্থায়ী ব্যবস্থা ঠিক হওয়া পর্যন্ত।

হর্ষ ডাক্তার বলে, তোমার কাছে লুকোনো কিছু নেই। এই দোকানটি আর পশারটুকু আমার সম্বল। বিরাট ফ্যামিলি, দুটি মেয়ে পার করেছি।

আমি জানি না ?

জানো বলেই বলছি। এবার জ্যোতিটার পালা। ওর জন্য তোমার মতো ডাক্তার জামাই আনতে আমি একপায়ে খাড়া। কিন্তু একটা ডিসপেনসারি করে দিয়ে জামাই আনার সাধ্য আমার নেই।

সে তো জানি কাকা। জ্যোতি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো ! ওর জন্য আমিও ছেলের সন্ধানে আছি।

কেদার এ ভাবে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে ডিসপেনসারি একটা যৌতুক দিতে চাইলেও সে জ্যোতিকে বিয়ে করবে না।

কেদার আবার বলে, কিন্তু এবার ওর বিয়েটা দিয়ে দিতেই হবে কাকা। দিনকাল খারাপ, আপনার টানাটানি, এ সবের জন্য তো বয়সটা ওর বসে নেই !

তা তো বটেই।

হর্ষ বিরাগভরা দৃষ্টিতে তাকায়। তার ডিসপেনসারিতে বসে তার বদলে তার মেয়ের জন্য ওর বেশি দুর্ভাবনা, যে নাকি ওর মায়ের পেটের বোনের মতো।

তার দিকে কেউ তাকায় না। তার কথা কেউ ভাবে না। হর্ষ ডাক্তারের সাধ হয় বেলা এই চারটের সময়েই আলমারিটা খুলে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে ওষুধ তৈরির আড়াল করা অংশে গিয়ে গলায় ঢেলে দেয় খানিকটা নির্জলা ব্র্যান্ডি।

কম্পাউন্ডার দীনেশ এখনও আসেনি। ব্যাটা ঘড়ির কাঁটা ধরে সাড়ে চারটেয় আসবে। দু-চার মিনিট আগেও নয়, পরেও নয়।

কেদার খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, আমি ভাবছিলাম পরিমলের সঙ্গে দিয়ে দিলেই বা কী এমন আসে যায় ? কবিরাজিতেও পয়সা আছে এ দেশে। কবিরাজি পেটেন্ট ওষুধ বেচেই কতজন লাখপতি হয়ে গেছে। খোসপ্যাঁচড়ার ডাক্তারি মলম কবিরাজি নাম দিয়ে বিক্রি করে কত লোক বাড়ি করেছে। পরিমলকে একটু হেলপ্ করলেই ও দাঁড়িয়ে যাবে। তাছাড়া, জ্যোতির যখন অমত নেই কবিরাজে।

হর্ষ ডাক্তার চেয়ার ঠেলে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে সত্যসত্যই ব্র্যান্ডির বোতলটা ছিনিয়ে বার করে নেয়, মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে, তুমি যদি তোমার কব্‌রেজ বন্ধুটির জন্য ওকালতি আরম্ভ কর কেদার—

সাহস করে বাকিটুকু সে উচ্চারণ করতে পারে না।

পরিমলের উপর হর্ষের এই বিতৃষ্ণার ভাব কেদারের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। পরিমল সর্বদা আসে যায়, সে কবিরাজ হবে না ডাক্তার হবে না উকিল হবে এ সব কিছুই যখন স্থির ছিল না তখন থেকে হর্ষ ডাক্তারের পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে বিশেষ কোনো অবজ্ঞার ভাবও হর্ষের দেখা যায়নি কখনও, সে বরং নিজেই কোনো কোনো বিশেষ রোগে নাম করা কবিরাজি ওষুধের ব্যবস্থা দেয়।

বড়ো মেয়ের ডাক্তার জামাই এনেছিল হর্ষ, চোখ কান বুজে একটা ডিসপেনসারিও করে দিয়েছিল জামাইকে। হর্ষের আশা সফল হয়নি। তবে এ দেশে ডাক্তারের অন্ন মারা যায় না। নামের শেষে নিজেই একটা দুর্বোধ্য ডিগ্রি জুড়ে দিয়ে যে ডাক্তার সেজে বসে আর অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মৃত রোগীকে পুনর্জীবন দান করে, তারও নয়। কিন্তু একটা ডিসপেনসারির বিনিময়ে ডাক্তার জামাই এনে লোকে তো আশা করে না যে মেয়ের শুধু অন্ন জুটবে !

ও সব দাবি দাওয়া না করে কেদার যদি জ্যোতিকে বিয়ে করে, হর্ষ কৃতার্থ হয়ে যাবে। বোধ হয় এই জন্যই তার মুখে পরিমলের কথা শুনে এত রাগ হয়েছে হর্ষর। আসলে হয়তো পরিমলের উপর তার বিদ্বেষ নেই।

কেদারের ডাক্তারত্বে জ্যোতির মোটেই শ্রদ্ধা নেই।

পাসের খবর শুনে সে বলেছে, পাস তো সবাই করছে। বাবার সময় যেমন ছিল তেমন তো আর কঠিন নয় পাস করা আজকাল।

এ যেন প্রতিধ্বনির মতো শোনায় তার ফ্রক পরা বয়সের কথার।

কেদার বলত, আমিও একদিন ডাক্তার হব দেখিস !

জ্যোতি বলত, বাবার মতো ডাক্তার হতে হয় না আর। বাবা স্কুলে ফার্স্ট হত জানো ?

দেবতাকেও অপমান করায় সংকটে পড়ে কেদার অগত্যা বলত, ভারী ডাক্তার তোর বাবা ! মদ খায়।

হিংস্র চোখে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে জ্যোতি চলে যেত।

আজও জ্যোতির অচেতন মনে ক্ষমা পায়নি কেদার। বেঁধে মারার মতো সে অপমান সত্যই অমার্জনীয় ছিল। তখন জানত না, আজ কেদার বুঝতে পারে স্নেহশীল শ্রদ্ধেয় পিতা দেবতাটির মদের নেশা কী মারাত্মক সংঘাত সৃষ্টি করে অল্পবয়সি সন্তানের মধ্যে!

দুরকম মানুষ, দুটো মানুষ তাদের বাবা! সারাদিন সাধারণ ভালো মানুষ, আর দশজনেরই মতো, সারা বাড়ির আবহাওয়া স্বাভাবিক। রাত্রে কী অদ্ভুতভাবে বদলে যায় সেই একই মানুষটা, যেমন উদ্ভট আর ভীতিকর হয় মুখের চেহারা চোখের চাউনি তেমনি খাপছাড়া হয় কথা খেয়াল রাগারাগি। হর্ষ বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে মদ ঢাললেই সমস্ত বাড়িটাতে ঘনিয়ে আসত একটা ভীত সন্ত্রস্ত থমথমে ভাব—মায়ের মুখ হত কঠিন, সতর্ক শঙ্কিত হত তার চালচলন।

কোমল মনের যেখানে ছিল ঘা ঠিক সেইখানে সে আঘাত দিত। তাকে একেবারে ক্ষমা করা সম্ভব নয় জ্যোতির পক্ষে। বাপ ডাক্তার, ভগ্নিপতি ডাক্তার, তাই উপায় নেই, নইলে সোজাসুজিই হয়তো ডাক্তার জাতটাকেই অপদার্থ অবজ্ঞেয় বলে জ্যোতি ঘোষণা করত।

একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে হর্ষ শান্ত হয়। এটুকু কিছুই নয় তার কাছে। লোকে টেরও পাবে না। বরং অস্থিরতা কেটে গিয়ে স্থৈর্য আর গাম্ভীর্য আসায় শ্রদ্ধাই বাড়বে লোকের।

শান্ত হয়ে ব্যাগ নিয়ে হর্ষ তার পুরানো গাড়িতে বেরিয়ে যায় কলে। বাইরে রোগী দেখে সাড়ে ছটা নাগাদ সে আবার ডিসপেনসারিতে ফিরবে।

খানিক পরে সেজেগুজে জ্যোতি আসে ডিসপেনসারিতে।

বলে, বাবা নেই?

কলে বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছ?

সিনেমায় যাব। বাঃ রে, বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল!

কেদার বলে, টাকা চাই বুঝি? আমার কাছ থেকে নাও—হর্ষকাকার কাছে চেয়ে নেব।

খুব টাকা হয়েছে, না? বাবার কাছে চাইতে শেষে তোমার লজ্জা হবে—কাজ নেই তোমার টাকা নিয়ে। দীনেশবাবু, ক্যাশে টাকা নেই? আমায় দুটো টাকা দিন তো।

কম্পাউন্ডার দীনেশ হর্ষ বেরিয়ে যাবার পর এসেছিল, সে বলে, ডাক্তারবাবু চাবি নিয়ে গেছেন।

থাকগে, আজ যাবই না সিনেমায়।

কেদারকে বলে, চা খাবে তো এসো।

বাড়ি কাছেই হর্ষ ডাক্তারের। দু-মিনিটের পথ। পরিমলের ওষুধের দোকান সামনে পড়ে, তাকেও জ্যোতি চা খেতে সঙ্গে ডেকে নেয়।

কেদার তখন বুঝতে পারে, যেচে তাকে জ্যোতির চা খেতে ডাকার মানে।

শুধু হর্ষ ডাক্তারই বিরক্ত হয়নি পরিমলের উপর, বাড়ির লোকের কাছেও এতদিনে তাহলে আপত্তিকর হয়ে উঠেছে তার জ্যোতির সঙ্গে অবাধ মেলামেশা? পরিমলকে একা চা খেতে ডাকতে তাই ভরসা হয় না জ্যোতির?

কেদার একটু অস্বস্তি বোধ করে। শুধু এইটুকুই যেন নয়, আরও কিছু আছে এর পিছনে। বাড়িতে ঢুকে এটা সে আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করে।

হর্ষ ডাক্তারের এই সেকেলে বাড়ির ঈষৎ স্যাঁতসেতে আর অল্প অল্প অন্ধকার ভিতরটা এবং ওখানকার বাসিন্দা মানুষ ও তাদের চালচলনের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পরিমল বরং অনেক পরে তাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়াটে হয়ে এসে তারই বন্ধু হিসাবে এই পরিবারটির সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল।

মাঝখানে কিছুদিন সে আসেনি। শুভময়ীর মরণ আব নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই তার সঙ্গে এ বাড়ির মানুষগুলির সম্পর্কে যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে আজ সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ছেলেবেলা থেকে যে কেদার অসংখ্যবার এসেছে গিয়েছে খেলাধুলো উৎপাত করেছে ঠিক সেই কেদার যেন আজ আসেনি,—তাকে আজ একটু অন্যভাবে নতুনভাবে অভ্যর্থনা করা দরকার, একটু বেশি খাতির করা দরকার, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে আগের অনেকবারের চেয়ে তার আজকের আসাটা অনেক বেশি খুশির ব্যাপার সকলের কাছে !

কেউ জানত না যে সে এখন আসবে। জ্যোতি তাকে বিনা নোটিশে আচমকা ডেকে এনেছে।

তবু মনে হয় তাকে বিশেষভাবে খাতির করার জন্য সকলে যেন বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

জ্যোতির মা মোহিনী বলে, তোমার চেহারা এ কী হয়েছে বাবা ? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না বুঝি ?

আবার নিজেই আপশোশ করে বলে, আর কেই বা করবে প্রাণ দিয়ে। যত্ন করার মানুষটাই চলে গেল।

পরিমলের দিকে ফিরেও তাকায় না মোহিনী।

প্রসাধন অসমাপ্ত রেখেই আসে জ্যোতির দিদি প্রীতি। সেও ফিরে তাকায় না পরিমলের দিকে। কেদারকে সস্নেহ অনুযোগ জানিয়ে বলে, ভুলে গেছ নাকি আমাদের ? একেবারে খোঁজখবর নাও না ? জ্যোতি বুঝি ধরে নিয়ে এল জোর করে ?

তারপর নিজেই ভারিক্কি সুরে বলে, তা কাজকর্ম দায়িত্ব পড়ছে বইকী। সেটা বুঝিনে ভেব না ভাই।

হর্ষের দুটি ছেলে। একটি ছিল সবার বড়ো, অন্যটি কনিষ্ঠ। বড়ো ছেলেটি মারা গেছে সাত-আটবছর আগে। তার বিধবা বউ রেবা এসে পরিমলকে বাদ দিয়ে কেদারকে বলে, গরম গরম লুচি ভেজে দিই, তারপরে চা খেয়ো। কী কষ্টে যে একটু ময়দা জোগাড় হয়েছে। আবার কবে পাওয়া যাবে কে জানে ?

নির্বিকার অবহেলার ভঙ্গিতে জ্যোতি একটু বাঁকা হয়ে দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে তার মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি। এ সব যেন তার নিজেরই রসিকতা, অবজ্ঞা ভরা আনন্দে সে ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

দিঘল সে মানানসই। তাই, বাইশ বছর বয়সটা তার দেহে হঠাৎ খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে না। এইরকম কোনো একটা ভঙ্গি করে দাঁড়ালে তখন নিথর তরঙ্গের মতো স্পষ্ট রূপ নেয়।

বোনের দিকে তাকায় প্রীতি। ভঙ্গিটা তাকে যেন সুখীই করে। পরিমল জ্যোতির দিকে চেয়ে আছে দেখে বিরক্তির ভ্রুকুটি করে প্রীতি।

এই নগ্ন কুৎসিত সমাদর, এই নোংরা খাতির অসহ্য হয়ে উঠত কেদারের, গায়ে তার জ্বালা ধরে যেত—এদের সঙ্গে পরিচয়টা যদি একটু কম ঘনিষ্ঠ হত তার। নিজের বাড়ির লোকের মতোই এদের কারও সম্পর্কে তার কিছুই অজানা নেই।

আচমকা আজ এদের এই খাপছাড়া ব্যবহারের গুরুত্ব সে টের পায়। সবটা না ধরতে পারলেও খানিকটা অনুমান করে নিতে পারে এর পিছনের আসল বাস্তবতা।

এই নগ্ন আক্রমণ শুধুই তার মন ভুলাবার চেষ্টা নয়, তা হলে পরিমলের সামনে এ অবস্থায় এ ভাবে কখনই আত্মপ্রকাশ করত না—জ্যোতি তাকে আজ হঠাৎ চা খেতে ডেকে আনবে এ

সুযোগের অপেক্ষায় সকলে বসে থাকত না। যে কোনো দিন যে কোনো সময় তাকে ডাকিয়ে এনে অতিরিক্ত সম্মান ও আদর জানাবার জন্য কোনো অজুহাতই দরকার ছিল না এদের।

আজকের এটা ওদের আরও বড়ো সংগ্রাম।

কোনো কারণে মরিয়া হয়ে উঠতে হয়েছে এদের। জ্যোতিই ঘটিয়েছে কারণটা সন্দেহ নেই। আজ জ্যোতি তাদের দুজনকে একসাথে ডেকে নিয়ে আসায় এমনি নগ্নভাবে স্পষ্টভাবে নিজেদের মনোভাব তাকে আর পরিমলকে না জানিয়ে দিয়ে কোনো উপায় থাকেনি এদের।

পরিমল বলে, আমি উঠলাম। একজন রোগী আসবার কথা আছে। বলে সে সত্যসত্যই উঠে দাঁড়ায়।

জ্যোতি হেসে বলে, হার মানলে তা হলে ?

মোহিনী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলে, জ্যোতি !

তারপর শান্তকণ্ঠে পরিমলকে বলে, একটু বোসো বাবা, চা খাবারটা খেয়ে যাও।

আরেকদিন খাব।

পরিমল চলে যাবার পরে বড়োই তাড়াতাড়ি ঘর খালি হয়ে যায়। ঘরে থাকে শুধু জ্যোতি। সেও চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে কিন্তু তাকে লুচির থালা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জ্যোতি বলে, সবাই বুঝিয়ে দিয়েছে মনের কথা। আমিও আমল দিলাম। এবাব তুমি বলে ফেলো তোমার প্রাণের কথাটা।

আমার প্রাণে কোনো কথা নেই।

সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই হত ! বললেই হত, না কাকিমা, অত আদরে আমার কাজ নেই, আমি লুচি খাব না।

আমার তো দরকার পড়েনি খেপে যাবার।

তার কড়া কথায় মুখ কালো হয়ে যায় জ্যোতির। সামনে এসে তীব্র চাপাগলায় বলে, আমায় কেন বলতে আসে তবে আমল দিই না বলে তুমি বিগড়ে গেছ ? আরেকজনকে আমল দিই বলে তুমি রাগ করেছ ?

কেদার চুপ করে থাকে। জ্যোতিকে নিয়ে এ বাড়ির সাম্প্রতিক সংঘাতটা এবার মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে তার কাছে।

জ্যোতি আবার বলে, লজ্জা করে না তোমার ? ডাক্তারি পাস করেছ বলে জগৎটাকে কিনে ফেলেছ নাকি ? মা-বাবার মনে মিথ্যে আশা জাগিয়ে কেন তুমি আমায় জব্দ করবে ? ডাক্তার ! মতিগতির ঠিক নেই, সে আবার ডাক্তার।

জল খেয়ে কেদার চায়ের কাপটা তুলে নেয়। মৃদুস্বরে বলে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জ্যোতি।

যদি হয়েই থাকে ? আমার কাছে পাত্তা পাও না, বাঁকাপথে বাড়ির লোককে বাগ মানিয়ে আমায় তুমি বশ করবে ? এত নিচু মন তোমার ? ডাক্তারি পাস করে দাম বেড়েছে, এমনি করে সেটা মা-বাবাকে ঘুষ দিয়ে তুমি গায়ের ঝাল ঝাড়বে আমার ওপর ?

কেদার জোর দিয়ে বলে, তুমি উলটো বুঝেছ। আমার গায়ে ঝাল নেই। কারও মনে আমি মিথ্যে আশাও জাগাইনি !

জ্যোতি ফোঁস করে ওঠে, মিছে কথা বোলো না। এমন করে আমায় তবে গঞ্জনা দিচ্ছে কেন ? আমায় বিয়ে করতে তুমি একপায়ে খাড়া, আমি শুধু দূর ছাই করি বলে, আরেকজনের সঙ্গে মিশি বলে তুমি বিগড়ে গিয়েছ—

ওরা মিথ্যে একটা ধারণা করেছে, তাতে আমার কী দোষ ?

না, তোমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার ! আমি মেয়ে কিনা, আমার ছাড়া কার দোস হবে ?

একদৃষ্টিতে জ্যোতি তার দিকে চেয়ে থাকে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ঘরে-বাইরে সবার মন জুগিয়ে চলতে হবে আমাকে, কেমন ? বেশ, তাই হোক। আমল দিতে বলেছে, আমিও আমল দিচ্ছি।

দ্বিধামাত্র না করে সে দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দেয়। জানালাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়।

কেদার দরজা খুলতে গেলে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, না আমি তোমায় যেতে দেব না! সে দিনকাল আর নেই ডাক্তারি পাস করা কেদারবাবু ! একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না তার বাপ-মার সাথে হাত মিলিয়ে।

তুমি এত বোকা ?

বোকা হই যা হই, তোমায় আমি রেহাই দিচ্ছিনে। একঘণ্টা পরে দরজা খুলব। সবাইকে জানিয়ে দেব, সামনের তারিখেই তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছ।

তারপর ?

বিয়ে হবে।

তারপর ?

তারপর আমি তোমায় মজা দেখাব। ডাক্তারি পাস করার সুযোগ নিয়ে বাপ-মাকে হাত করে গায়ের জোরে একটা মেয়েকে বিয়ে করার সুখ টের পাইয়ে দেব ।

সে তো অনেক ঝঞ্ঝাট।

হোক ঝঞ্ঝাট।

ওভাবে আমায় মজা টের পাইয়ে দিতে গেলে নিজেও রেহাই পাবে না।

রেহাই চাই না আর।

কেদার হেসে বলে, তার চেয়ে এখন মাথাটা একটু ঠান্ডা করো না ?

মাথা আমার ঠান্ডাই আছে।

আছে ? তবে শোনো। আজকেই আমি হর্ষকাকাকে বলছিলাম, পরিমলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বন্ধুর পক্ষে ওকালতি করছি বলে উনি চটে গেলেন।

জ্যোতির কালো চোখে বিহ্বলতা ঘনিয়ে আসে।

সত্যি বলছ ?

মিছে বলব কেন ? বুঝতে পারছ না, তুমি আমার পায়ে ধরে কাঁদলেও তোমায় আমি বিয়ে করব না ?

তাই নাকি !

হর্ষকাকাকে কথায় কথায় আরও কী জানিয়ে দিয়েছি জানো ? তুমি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো।

এ কথা আগে বললেই হত !

জ্যোতি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়।

এত তাড়াতাড়ি খুলে দেয় যে বন্ধ দরজার ও পাশে দাঁড়িয়ে যারা কান পেতে তাদের কথা শুনছিল তারা সরে যাবার সময়ও পায় না।

৩

কেদার ও পরিমলের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব ছিল।

অথচ আজও তারা পরস্পরকে জানে না বা মানেও না বন্ধু বলে। বন্ধুত্বের চলতি ধারণায় তাদের সম্পর্কটাকে, দীর্ঘদিনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও, বন্ধুত্ব অবশ্য বলা চলে না কোনোমতেই। দুটি তরুণের মেলামেশা কথাবার্তা নিয়েই শুধু বন্ধুত্ব হয় না, হাসি তামাশা ইয়ার্কি ফাজলামি থেকে কলহ এবং মান অভিমানের পালাও চলে তাদের মধ্যে। কেবল দুজনে মিলেই সরস গল্পে আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারে।

নেহাত যদি রসকষহীন অত্যন্ত ভারিক্কি প্রকৃতির মানুষ হয় দুজনে, দেখা হলে জীবনের হালকা কথা যা কিছু আছে সব যদি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় জীবনের সীমানা পার করে, বড়ো বড়ো আদর্শের কথা আর মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ছাড়া কোনো বিষয়ে কথা বলাই মনে করে কথার অপচয়, তারাও বন্ধু হলে দুজনের মধ্যে ঘুচে যায় সচেতন গোপনতা, দুটি হৃদয় ও মনের মধ্যে দরজা থাকে খোলা।

বন্ধুত্ব কখনও গোপনতার আওতায় বাড়েও না, বাঁচেও না। দুজনের জানাজানির স্বচ্ছতাই বন্ধুত্বের প্রথম শর্ত—যে শর্ত প্রেমেরও বটে।

এ সব কিছুই নেই কেদার ও পরিমলের সম্পর্কে।

এতকাল একসাথে বাস করেও কোনোদিন একসঙ্গে তারা সশব্দে হেসে ওঠেনি কোনো কথায়, একসুরে বাঁধা দুটি তন্ত্রীর মতো। হাসির কথায় হাসি ফুটেছে দুজনেরই মুখে, স্মিতমুখে পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে তারা সায় দিয়েছে পরস্পরের রহস্য উপভোগে।

দূরের দুটি মানুষ যেন ইশারায় আদান-প্রদান করছে মনের ভাব, দুজনের মধ্যে স্থির করা কোডের ভাষায়।

পরস্পরকে নিজের কথা তারা বলে খুব কম।

দরদ সহানুভূতির দাবিদাওয়া তাদের মধ্যে একরকম নেই বলা চলে। কোনো কারণে একের জন্য অন্যের মনে সমবেদনা জাগলে সেটা মনের কোণেই থেকে যায়, প্রকাশ করার কোনো তাগিদ জাগে না একেবারেই।

কত স্বপ্ন কত কল্পনা আর দাবিদাওয়া অধিকার বোধ ভরা দুটি তরুণ মন, কত সমস্যা আর কত ব্যর্থতা ক্ষোভ ও নালিশ, কতরকম বিশ্বাস সংস্কার সংশয় সিদ্ধান্ত মতামত। কিন্তু এ সবের ব্যক্তিগত গুরুত্বই বড়ো হয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের কাছে, মিলিয়ে নেবার বা তুলনা করবার সাধ কখনও জাগে না।

তাই কথাবার্তা তাদের গভীরভাবে ব্যক্তিগত হয় কদাচিৎ। যখন হয় তখনও অনুভূতিগত প্রক্রিয়াকে রূপ দেবার ব্যাকুলতা দেখা যায় না একজনের মধ্যেও।

এত কাছের দুটি যুবকের মধ্যে এ রকম আবেগহীন সম্পর্ক কিন্তু এতখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিশোর বয়সে, দুটি পৃথক চিকিৎসা-বিদ্যাকে পেশা হিসাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা আরম্ভ করার আগে।

দুটি পরিবারের মধ্যে অনায়াসে আপনা থেকে যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল হৃদয়গত প্রেম ভালোবাসা হিংসা বিদ্বেষ পছন্দ অপছন্দ এবং পারিবারিক জীবনের অসংখ্য সমতার ভিত্তিতে, তাদের দুজনের তখনকার বন্ধুত্বের ভিত্তিও ছিল সেই পারিবারিক জীবন।

একতলা এবং দোতলা-বাসী দুটি পরিবারের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল একটা অনির্দিষ্ট রকমের, যার কোনো সমগ্রতা ছিল না, এখনও নেই:

তা, উপর থেকে তলা পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এ ভাবেই গড়ে ওঠে।

এ পরিবারের বিশেষ একজনের সঙ্গে হয়তো ওই পরিবারের বিশেষ একজনের গভীর অন্তরঙ্গতা। যেমন, নীচের তলার অমলার সঙ্গে উপরতলার রাণীর। জনার্দনের সে ভাইঝি। বয়সে সে অমলার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়ো এবং সে বিধবা। অথচ তাদের এত ভাব যে মনে হয় দুজনে যেন তারা সই পাতিয়েছে। সুযোগ পেলেই তাদের পরস্পরের কাছে আসা, অন্তহীন ফিসফিসানি। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাদের কারও একজনের দুটি বাড়তি কথা বলাবলি নেই!

মায়া প্রায় সমবয়সি অমলার এবং সে কুমারীও বটে। কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে রস পায় না অমলা, কেদারের বিধবা দিদি বিমলার সঙ্গেও যেমন রাণীর বনে না।

উপরতলার ছোটোদের সঙ্গে উপেনের বড়ো ভাব, বড়োদের সঙ্গে তার মনের মিল হয় না কিছুতেই! জনার্দনের ছোটো মেয়ে ফুলু উপেনের কোলে পিঠে চেপে বড়ো হয়েছিল। ফুলুকে আদর না করে যেন উপেনের দিন কাটত না। মনে হত যেন জনার্দনের মেয়ে রাখার জন্য সে মাইনে করা ছোকরা চাকর। মাঝরাতে এক-একদিন ঘুম ভেঙে উপেনের কাছে যাওয়ার জন্য ঝোঁক চাপত ফুলুর, কিছুতেই তার কান্না থামানো যেত না।

ফুলু বড়ো হতে ধীরে ধীরে উপেনের ভালোবাসাতেও ভাটা পড়ে এসেছিল। বারো-তেরোবছর বয়সে আজও ফুলু মাঝে মাঝে অনেক আশা করে উপেনের কাছে যায়, কিন্তু আশা তার মেটে না। উপেনের সমস্ত মায়া মমতা যেন উপে গিয়েছে।

তাই মনে হয় ফুলুর। তার জন্য যে ভালোবাসা ছিল উপেনের সেই ভালোবাসাই যে আজ পুরোমাত্রায় ভোগ করছে পাশের বাড়ির তিন-চারবছরের শিশু মেয়েটা, ফুলুর পক্ষে সেটা ধারণা করাও অসম্ভব।

একজনের জন্য ভালোবাসা কখনও অন্যে পায়?

মায়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে উপেনের একটু ভাব হবার উপক্রম দেখা যায়।

খানিকটা এগিয়ে সেটা থেমে যায় একেবারেই।

প্রমথ ও জনার্দনের মধ্যে খুব বনিবনা। দুজনের অবসর কাটে দাবা খেলে আর সংসারী মানুষের সুখদুঃখের প্রাণখোলা আলোচনায়। কোনো প্রত্যাশা নেই বা নালিশ নেই পরস্পরের সম্পর্কে, সংসার তাদের দুজনকেই সমানভাবে শুষে নিয়েছে।

দুজনেই এক বাড়িওয়ালার ভাড়াটে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ তাদের আরও বেশি আপন করে দিয়েছে।

এই দুজন বুড়োর চেয়েও শান্ত ও সংযতভাবে কেদার ও পরিমল কথা বলে। কাছাকাছি এলে দুজনেই তারা আপনা থেকে কেমন শান্ত ও নিরুত্তেজ হয়ে যায়। আলাপ তাদের হয় বিরামবহুল। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাছাকাছি বসে থাকলেও তাদের কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ হয় না।

অন্তত এ পর্যন্ত হয়নি।

কিন্তু তাদের চা খেতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জ্যোতি যে কাণ্ডটা করল তারপর থেকে কথা বলা কিংবা চুপ করে থাকা দুটো প্রক্রিয়াই রীতিমতো পীড়াদায়ক হয়ে উঠল তাদের কাছে।

এই যেন মানে ছিল তাদের এতদিনকার প্রাণহীন সম্পর্কের! যত সংঘাত ছিল তাদের মধ্যে সব তারা একটা নিরপেক্ষ অহিংস উদারতার আড়াল দিয়ে চাপা দিয়ে চলত।

জ্যোতি যেন শেষ করে দিয়েছে সে অধ্যায়। টেনে খুলে দিয়েছে তাদের মুখোশ।

জ্যোতির বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলবে ভেবেই রাত্রে কেদার পরিমলের ঘরে গিয়ে বসে। কিন্তু গিয়ে বসে টের পায় জ্যোতির কথা তোলাই যেন অসম্ভব, কী বলবে কীভাবে বলবে ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

পরিমলের ছোটো ঘরখানার একটা অত্যধিক ধোয়া মোছা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধভাব, ধূপচন্দনের গন্ধের আভাস মেলে। ঘরে টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। মোড়া জলচৌকি আর কম্বলের আসন আছে বসবার জন্য, একপাশে মেঝেতেই পাতা হয়েছে বিছানা। সকালে বিছানা তুলে নিয়ে মেঝে ধুয়ে ফেলা হয়। বিছানার চাদর ও আলনার জামা কাপড় দেখলেই টের পাওয়া যায় যে সবগুলিই বাড়িতে কাচা, কোনোটিতেই ধোপাবাড়ির ইস্ত্রি হয়নি। ধোপাবাড়ি না যাক, ইস্ত্রি না হোক, জামা কাপড় বিছানার চাদর কোনোদিন তার ময়লা দ্যাখেনি কেদার।

তাকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্পর্কিত বই সাজানো। মূল সংস্কৃত বইগুলির সঙ্গে ইংরাজি বাংলা বইও স্থান পেয়েছে।

পরিমল হোমিয়োপ্যাথির বই পড়ছিল। আয়ুর্বেদীয় উপাধির সঙ্গে সে আরেকটি উপাধি জুড়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করে।

পরিমলের ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কল্পনা করাও কঠিন যে ডাক্তারি পড়তে না পারায় তার মনে গভীর ক্ষোভ জেগেছিল এবং আজও তার জের মেটেনি।

মনে হয়তো তার আজও ক্ষোভ রয়ে গেছে যথেষ্ট, বাইরে সেটার প্রকাশগুলিই ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘর সাজানো থেকে বেশভূষা কথাবার্তা চালচলনে কত যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

পেশা যেন সত্যই ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে কলেজের সেই আধুনিকপন্থী স্মার্ট ছেলেটিকে !

হয়তো তাই ঘটে সংসারে। প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে, এ ভাবেই মানুষ খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে।

কেদার একটা সিগারেট ধরায়।

পরিমল তাড়াতাড়ি একটা মাটির সরা তার সামনে ধরে দেয় ছাই ফেলার জন্য।

কেদার বলে, খাওয়া হয়েছে ?

পরিমল বলে, না। মোটে সাড়ে নটা এখন।

তারপরেই শুরু হয় অস্বস্তি বোধ। কতবার এ ভাবে এসে বসেছে, এ রকম ছাড়া ছাড়া দু-একটা কথা বলে চুপচাপ নিজের মনে নিজের কথা ভেবেছে অথবা আয়ুর্বেদের কোনো বই নিয়ে পাতা উলটেছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ রকম বোধ করেনি কেদার।

পরিমলকে বলার যেন কিছুই নেই তার। এ ঘরে এসে বসাটাই তার অর্থহীন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য জোর করে সে বলে, হোমিয়োপ্যাথির মূল কথাটা খুব সোজা। সাধারণ লোকে চট করে বুঝতে পারে। এ দেশের লোক তো সূক্ষ্ম, বিন্দু, অণু পরমাণু এ সব কথা সর্বদাই শুনছে।

পরিমল বলে, রথীনবাবুকে চেনো তো ? ওর কাছেই হোমিয়োপ্যাথি পড়ছি। অ্যাটম বোমা আবিষ্কার হওয়ায় উনি খুব খুশি হয়েছেন। অ্যাটম বোমা নাকি প্রমাণ করেছে হোমিয়োপ্যাথির থিয়োরি অভ্রান্ত। উনি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছেন ইংরাজিতে।

কেদার বলে, অ্যাটমিক এনার্জি দিয়ে বোমা তৈরির কথাই লোকে শুনছে। মানুষের কত উপকারে লাগানো যায় অ্যাটমিক এনার্জি সে সব শোনাই যায় না একরকম। ধরো, একটা পাহাড়ের জন্য মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। গোটা পাহাড়টা অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।

পরিমল সায় দেয় না।

তাকে কী উপকার হয় মানুষের ? পাহাড়টা তো শূন্যে মিলিয়ে যাবে না, পৃথিবীতেই ছড়িয়ে থাকবে। যেখানে ছিল সেখানে এক জায়গায় জমাট হয়ে না থাকার জন্য হয়তো পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। পাহাড়ও তো অকারণে সৃষ্টি হয়নি। পাহাড় যেখানে থাকে সেখানে থাকার একটা সার্থকতা আছে নিশ্চয় !

তারা আলাপ করছে, এত কথা বলছে। কিন্তু কোনো মানে আছে কী এ রকম কথা বলার ?

খানিক চুপ করে থেকে আবার জোর করে কেদার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, রোগীপত্র কী রকম হচ্ছে ?

একে দুয়ে বাড়ছে। একটা ব্যাপার ভালো লাগছে না মোটে। মোদকের খদ্দের সব চেয়ে বেশি হচ্ছে। আর কি জানো ? লোকে রোগের চিকিৎসার চেয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো করার সস্তা ওষুধ খোঁজে কবিরাজের কাছে। খাঁটি ওষুধ কি সস্তায় হয় ?

খাঁটি ওষুধেই কি স্বাস্থ্য হয় ? খেতে না পেয়ে শরীরে পুষ্টি নেই, ওষুধে কি হবে ?

আমাদের সে ব্যবস্থা আছে। আমাদের ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা জড়ানো, পথ্য বাদ দিলে চলবে না।

পথ্য কেনার পয়সাই যে লোকের নেই।

চিকিৎসক তার কী করবে ? আমরা রোগের ব্যবস্থা দিতে পারি, রোজগারের ব্যবস্থা তো করতে পারি না।

জ্যোতির কথা না তুলেই কেদার নীচে নামে। খেতে বসে তার মনে হয়, কবিরাজ হতে হওয়ার আপশোশ সত্যই কমে এসেছে পরিমলেব। সে যেন আত্মরক্ষার জন্য মনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে, জোর করে বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজের পেশায় নিষ্ঠা আর ভক্তি।

নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে তার পেশা-আশ্রয়ী জীবনের প্রয়োজনের সীমানার মধ্যে।

আর কিছুদিন বাদে হয়তো সে ডাক্তারি চিকিৎসা পদ্ধতিকে টিট্‌কারি দিয়ে মন্তব্য করবে, কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসার সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাবে ভারতের সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকে।

পরিমল চিরদিনই শান্ত এবং সংযত। কেদারের কাছ থেকে সিগারেটে দু-একটা টান দিতে শিখেছিল, কিছুকাল পরে তাও বর্জন করে দেয়। কোনোরকম অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। আচার নিষ্ঠার শুচিবাই তার ছিল না বটে তবে জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করার আনুষ্ঠানিক দিকটার উপব ঝোঁক তার বরাবরই ছিল।

দাঁতমাজার কাজটাকে পর্যন্ত সে কখনও কোনো প্রয়োজনের খাতিরে সংক্ষেপ করে না।

জীবনকে আরও শুদ্ধ আরও পবিত্র করার এই ঝোঁকটা যেন এবার হঠাৎ তার আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

মাংস সে কোনোদিন খেত না। এবার মাছ খাওয়াও ছেড়ে দেয়। বাড়িতে মাংস পেঁয়াজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ঘরে তার আবির্ভাব ঘটে একটা মৃগচর্মের।

সকাল সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ যোগাসনে বসে ধ্যান করে।

নিজের বেশ এবং ওষুধের দোকানেও সে পরিবর্তন আমদানি করে। তাঁতের ধুতি গরদের পাঞ্জাবি আর গরদের চাদর ছাড়া আজকাল সে চৌকাঠের বাইরে পা দেয় না। দোকানের সাধারণ টেবিল চেয়ার আলমারি সরিয়ে দিয়ে আধুনিকতম ডিসপেনসারির উপযোগী দামি আসবাব এবং কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে কিছু ডাক্তারি ওষুধ ও যন্ত্রপাতি এনে দোকানটাকে ঝকঝকে করে সাজায়।

সকালে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে কেদাব ডাকে, চা খেয়ে যাও।

চা খাই না। ছেড়ে দিয়েছি।

এক মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়ায় না পর্যন্ত। মুখ ফিরিয়ে কথাটা বলতে বলতেই বেরিয়ে যায়।

জ্যোতি তাকে চা খেতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। জ্যোতির আপনজনেরা যে অপমান করেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় আরও অনেক কিছু করা ও ছাড়ার সঙ্গে চা খাওয়া পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে !

কেদার ভাবে, এ কী সংযম অথবা মানসিক অসংযমের বাহ্য প্রকাশ ? রাগ আর অভিমানকে যে বশ করতে পারে না, গায়ের জ্বালায় মাছ ছাড়ে চা ছাড়ে আচার-নিষ্ঠা বাড়িয়ে দিয়ে আত্মনির্যাতনের মধ্যে প্রতিশোধ নিতে চায়, তার কি সে রকম মনের জোর থাকা সম্ভব যা না থাকলে সংযমের কোনো মানে হয় না ?

কয়েকদিন পরে জ্যোতি আসে।

দুপুরবেলা। খাওযাদাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবাব পব ঘরে ঘরে যখন পুরো বিশ্রামেব পালা মেয়েদের।

একটু শুয়ে ঝিমিয়ে নিয়ে কেদার তখন উঠে বসে সিগারেট ধবিয়েছিল।

পরিমল দুপুরে শোয় না। দিবানিদ্রা বহুকাল থেকেই তার কাছে নিষিদ্ধ। সম্ভবত সে কোনো শাস্ত্র পাঠ করছে।

জ্যোতি কেদারকে বলে, ওকে সব বলেছ ? সেদিনের কথা ?

না।

কেন বলোনি ? আমার একটু উপকার হত !

সেদিন ঘরে খিল দিয়ে তাকে আটক করার মতো বেযাদবিতেও যার উপর বাগ কবতে পারেনি আজ হঠাৎ অসহ্য ক্রোধে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দেবাব ইচ্ছা হয় কেদাবেব।

তোব কি লজ্জাশরম বলে কিছু নেই ?

জ্যোতি সতেজে জবাব দেয়, না। লজ্জাশরম রাখতে দিচ্ছ না তোমরা। আমি আশা করে আছি তুমি সব কথা খুলে জানিয়ে দেবে, এটুকুও করতে পারলে না তুমি আমার জন্য ? কোন মুখে তুমিই আবার লজ্জাশরমের কথা বলছ ?

কেদার চুপ করে থাকে।

জ্যোতি আবার বলে, কেউ কিছু করবে না আমার জন্যে। এতটুকু উপকার করাব বদলে শুধু ক্ষতি করবে আর বাদ সাধবে। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলেও কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই। সব করতে হবে আমাকেই। তবু তোমরা চাও যে আমি মুখচোরা লাজুক মেয়েটি সেজে থাকি। তাই থাকতেই আমি চাই—

থাক গে জ্যোতি। এ সব বলে লাভ নেই।

তুমি বকলে, তাই বলছি। তুমি ভার নাও না, আমি এখুনি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি। কথা দাও সব ঠিক করে দেবে, তাবপর এতটুকু বেহায়াপনা যদি দ্যাখো আমার, আমায় তুমি চাবুক মেবো।

কেদার চুপ করে থাকে।

ঘন কালো চোখে নালিশ আর ভর্ৎসনা নিয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে জ্যোতি উপরে চলে যায়।

আধঘণ্টা পরে কেদার জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যায়। তখনও জ্যোতি উপর থেকে নামেনি।

জ্যোতির চিন্তাই গুমোটের মতো ঘনিয়ে থাকে কেদারের মনে।

অনুচিত ? তাই যদি হয়, জ্যোতির অনুযোগের জবাব সে দিতে পারেনি কেন ?

কলেজে গীতার সঙ্গে দেখা করবে। পথে উঁকি দিয়ে যাবে শীতাংশুদের বাড়ি।

ছায়াবউদিকে পাশের খবরটা জানানো হয়নি।

একেবারে সে ভুলেই গিয়েছিল যে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্বামী আর শাশুড়ির শাসনাধীন ওই সাধারণ বউটির দাবিও কম নয় তার পাসের খবর জানবার।

এ পাড়াতেই ছিল শীতাংশুরা বহুকাল। মাস কয়েক আগে অন্য বাড়িতে উঠে গেছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সে মহোৎসাহে শীতুদার সঙ্গে বউ আনতে গিয়েছিল মফস্বলের এক শহরে। তখন কে জানত যে অতি সাধারণ মেয়ে ছায়া শীতুদার বউ হয়ে এসে তাকেই বিশেষভাবে এতখানি পছন্দ করে ফেলবে, সব সময় এমন উৎসুক হয়ে থাকবে তাকে তার ঘরোয়া স্নেহের পূজা দিয়ে খুশি করতে আর নিজে কৃতার্থ হতে।

শীতাংশুর বাবা ছিল প্রমথেব বিশেষ বন্ধু। সে মারা যাবার পর প্রমথই পরিবারটির ভালোমন্দের দায়িত্ব পেয়েছিল। সে-ই চেষ্টা করে শীতাংশুকে চাকরি জুটিয়ে দেয়।

এখানে কম ভাড়ায় ভালো বাড়িতেই বাস করছিল—এখনকার তুলনায় অবিশ্বাস্যরকম কম ভাড়ায়। বাড়ি ভাড়া আকাশে চড়বার আগে থেকে বাস কবছিল বলে চেষ্টা করেও বাড়িওলা ভাড়া কয়েক টাকার বেশি বাড়াতে পারেনি।

হঠাৎ এ সুবিধা ছেড়ে দিয়ে অনেক দূরে নোংরা স্যাঁতসেঁতে অন্য একটা বাড়িতে বেশি ভাড়া দিয়ে উঠে যাবার কী প্রয়োজন শীতাংশুর হয়েছিল কেউ জানে না।

প্রমথ এটা পছন্দ করেনি। শীতাংশু তার বারণ না শোনায় মনে বড়োই আঘাত লেগেছে প্রমথেব। এমনি অকৃতজ্ঞ আব অবাধ্যই হয় বটে আজকালকার ছেলেরা !

চটে বলেছে, অনেক করেছি, আর কাজ নেই। এবার সম্পর্ক চুকল।

এটা অবশ্য কেদার বাড়াবাড়ি মনে করে প্রমথের। ওদের জন্য অনেক কিছু করার মানে তো ছিল খবরাখবর নেওয়া আব উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া—পয়সা খরচ করে কিছু করার দরকার হলে প্রমথ কী করত বলা যায় না।

নিজের আপিসে চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে শীতাংশুকে। কিন্তু এ জন্য সে তার খুশি আর প্রয়োজন মতো স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে না, সারা জীবন প্রমথের পরামর্শ শুনে চলবে আর প্রত্যেক কাজের কৈফিয়ত দেবে, এটা আশা করা সত্যই অন্যায় প্রমথের।

পাড়া থেকে চলে যাবার কিছুকাল আগে থেকে খুব ম্লান ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ছায়ার মুখ, একেবারে যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

এতদিনের জানাচেনা এ পাড়ার মানুষগুলিকে ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে যাবার চিন্তাতেই বোধ হয় মনটা তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

একমাত্র তাদের বাড়িতেই ছায়ার খুশিমতো আসা যাওযার অনুমতি ছিল। সকলে জানত যে শুভময়ী তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে, সে যেন তার নিজের ছেলের বউ এমনি একটা স্নেহ আছে তার জন্য।

আপিসে প্রমথের কাছে শুভময়ীর মরণের খবর পেয়ে একদিন ছায়া বাদে শীতাংশুরা সকলে এ বাড়িতে এসেছিল। কেদার বাড়ি ছিল না।

শুভময়ীর শ্রাদ্ধে ছায়ার উপর তার বিশেষ স্নেহের কথা স্মরণ করে ছায়াকে নিয়ে আসবার জন্য বিশেষভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল শীতাংশুকে।

আর সকলে এসেছিল, অসুখ করার জন্য ছায়াই শুধু আসতে পারেনি।

সরু গলির মধ্যে লম্বা প্যাটার্নের সেকেলে জীর্ণ পুরাতন দোতলা বাড়ি। শীতাংশুরা নীচের তলায় থাকে। নীচের তলা বলতে একদিকে পাশাপাশি দুখানা ঘর আর একফালি উঠান।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু না হলেও একটা যোগাযোগ ঘটে যায়, যার ফলে ছায়ার সঙ্গে নিরিবিলি কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ জুটে যায় কেদারের।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা অস্পষ্ট নম্বরটা কেদার মিলিয়ে নিচ্ছে, উপরতলার একজন বাইরে যাবার জন্য দরজা খোলে, দরজা বন্ধ করার জন্য তার সঙ্গে আসে একটি মেয়ে।

শীতাংশুবাবু থাকেন এখানে ?

থাকেন।—বলে লোকটা সোজা গলিতে নেমে যায়। মেয়েটি দরজা খোলা রেখেই উঠে যায় দোতলায়। দরজার কাছ থেকে কেদার দেখতে পায় ছায়া উঠানে বাসন মাজছে।

কেদারকে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। যেন কেদারের জন্যই প্রতীক্ষা করে বাসন মাজছিল !

দরজা দিতে দিতে বলে, আস্তে কথা কও।

কেদার বলে, কেন ?

সুযোগ যদি পেলাম, কটা দরকারি কথা আগে বলেনি। ওরা ঘুমুচ্ছে, আবার কবে সুবিধা হবে কে জানে ! অ্যাদ্দিনে তুমি এলে ?

বলে সে ছাইমাখা হাতেই হাত চেপে ধরে কেদারের। নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই একটু হাসে। হাসির সঙ্গে বিষাদ ঘনিয়ে আসে তার মুখে।

আঁচল দিয়ে কেদারের হাতের ছাই মুছে নিতে নিতে বলে, তা এক হিসাবে না এসে ভালোই করেছ।

ব্যাপারটা কী বলো দিকি ছায়াবউদি ?

ব্যাপার আমার পোড়া কপাল। তুমি আঁচও করতে পারনি কিছু ? তা, কী করেই বা পারবে ! একজনের মনগড়া মিছে জিনিস আরেকজন আঁচ করবে কীসে। অন্য কেউ হলেও বা কথা ছিল।

সোজা ব্যাপার মনে হচ্ছে না তো !

তোমায় বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে ভাই। এত ছোটোও হতে পারে মানুষের মন ? নিজের ভাইটিকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এলাম। তোমার মধ্যে ভাইও পেলাম দেওরও পেলাম। তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, জোয়ান হয়েছ—আমিও কী ছেলে বিইয়ে সংসার করে বুড়িয়ে গেলাম না ? তুমি জোয়ান হয়েছ বলে আমাদের নিয়ে যা তা কী করে মনে এল ভাব দিকি ? তুমি যদি নিজের মায়ের পেটের ভাই হতে, সত্যিসত্যি আমার দেওর হতে ?

কেদারের মুখ কালো হয়ে যায়। হতভম্বের মতো সে বলে, এ সব কী বলছ ? শীতাংশুদা—?

আমিও গোড়ায় বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, না বুঝে শুনে বিশ্রী একটা ঠাট্টা করছে বুঝি। ওমা, শেষে দেখি, মনটা সত্যি বিষিয়ে গেছে। পরীক্ষার আগে সেই যে একদিন ও বাড়িতে তোমায় খাইয়েছিলাম, সেইদিন জানিয়ে দিলে, না, আর এখানে থাকা নয়।

এই জন্য বাড়ি বদলেছে ?

তাছাড়া কী ? মনে নরক ঢুকেছে, তাই পছন্দ হয়েছে নরক।

এক মুহূর্ত ভেবে কেদার বলে, আমি বরং তবে চলেই যাই।

ছায়া বলে, ছি ! কেন চলে যাবে ? তোমার আমার মনে তো কিছু নেই।

তাতে কী আর আসবে যাবে বউদি ?

ম্লান মুখে ছায়া নিশ্বাস ফেলে।

বলে, সে তো বটেই। সেই জন্যেই তো তোমায় সব খুলে বললাম। কিছু না জেনে তুমি সরল মনে আসবে, আগের মতো ব্যবহার করতে যাবে—ফল হবে আরও খারাপ। তোমায় সব জানিয়ে দিলাম, তুমিও এবার বুঝে শুনে চলতে পারবে। তাই বলে বাড়িতে এসে না বসে চলে যাবে ? তুমি তো আমার কাছে আসোনি একা। মা আছেন ঠাকুরঝি আছেন—

কিন্তু এই দুপুরবেলা ?

ছায়া নিশ্বাস ফেলে উঠানের দিকে তাকায়। এ জগতে মিথ্যাকেও সম্মান করতে হয়। পরাধীন জীবনে মিথ্যা অপমানকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয় মাথা পেতে।

বলে, তাহলে চলেই যাও। একদিন সকালে নয় সন্ধ্যার দিকে এসো। এ রকম হয় কেন ঠাকুরপো ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেবি হয় না কেদারেব। নিচু গলাতেই সে কথা বলে কিন্তু ঝাঁঝটা টের পাওয়া যায়।

উপন্যাস পড়ো না ? সিনেমা দ্যাখো না ? শীতুদা বুঝি কোনো বইয়ে দেওর বউঠানের ভালোবাসার গল্প পড়েছে, নয় তো সিনেমা দেখে বুঝেছে যে প্রাণের টান মানেই সস্তা পিরিত। মানুষকে পশু প্রমাণ করার চেষ্টাই চলছে কিনা সিনেমাগুলিতে।

দরজা খুলে নেমে যেতে যেতে কেদাব ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, পাস করেছি খবর দিতে এসেছিলাম।

কেদার গীতাদের জগতের মানুষ নয়।

গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবাব পরেও ওই জগতের সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি বাড়েনি।

গীতাদের জগৎ বলতে অবশ্য একটা বোঝায় না যে তাদের মতো সাধারণ মানুষদের জগৎ থেকে সেটা একেবারে সব দিকে দিয়ে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক। গীতার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়াটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না কিছুই।

এ রকম পরিচয় সর্বদাই ঘটছে দু-জগতের মানুষের মধ্যে।

আশ্চর্য যা ছিল তা এই যে পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতাব দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ বা ঝোঁকটা এসেছিল গীতার দিক থেকে। গীতা নিজে চেষ্টা করে গড়ে না তুললে তাদের পরিচয় হয়তো প্রাথমিক স্তরের বন্ধুত্বের সীমার মধ্যেই আটকে থাকত। সে কখনই চেষ্টা করত না গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার।

গীতা সরলভাবেই বলেছিল, তাদেব স্তরেব বড়োলোক অ্যারিস্টোক্র্যাট ছেলেদের বিরুদ্ধে তার কোনো নালিশ নেই, ওই স্তবে মনুষ্যত্বের অভাব ঘটেছে বলেও সে মনে করে না, মোটেই তার দম আটকে আসে না ওই সমাজে মেলামেশা করতে।

তবে কিনা ওই সব ছেলেদের জীবনে সত্যিকারের কোনো লড়াই নেই। বড়ো হবার সববকম সুবিধা সামনে ধরাই আছে, গ্রহণ করলেই হল। লড়াই করে জীবনে বড়ো হবার প্রয়োজন ওদের নেই।

কেদার বড়ো হতে চায়, জীবনে উন্নতি করতে চায়। রীতিমতো যুদ্ধ না করে সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যত কিছু সুযোগ সুবিধা দরকার সব তাকে নিজে সৃষ্টি করে নিতে হবে। সামনে তার সোজা পথ খোলা নেই, তাকে উঠতে হবে নিজের জোরে নিজে পথ করে নিয়ে।

তার বাবা ডাক্তার পালকে যেভাবে উঠতে হয়েছে।

এই যুদ্ধটা গীতা ভালোবাসে।

তাই সে পছন্দ করে কেদারকে।

অবশ্য এ জন্য কেদারকে শুধু সে পছন্দই করেছিল। তার বন্ধুত্ব কামনা করেছিল। কেদারকে তার ভালোবাসার কারণ এটা নয়।

কেদার তার হৃদয় জয় করেছে কেদার হিসাবেই, মানুষ হিসাবেই। গীতা কী আর ভেবেচিন্তে হিসাব করে তাকে ভালোবেসেছে ?

হিসাব করে কী ভালোবাসা হয় ?

না ভালোবাসার হিসাব থাকে ?

এই প্রসঙ্গে গীতা জোর দিয়ে বলেছিল, তাই বলে ভেবো না কিন্তু আমার এটা সিনেমা নভেলের প্রেম। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমার লাইফের স্ট্যান্ডার্ড ছেড়ে গরিব মানুষ তোমার পাশে এসে দাঁড়াব আর সারাজীবন ছেঁড়া কাপড় পরে হাসিমুখে হাঁড়ি ঠেলব। তোমায় ওপরে উঠতে হবে। তুমি নিজেই জীবনে উন্নতি করতে চাও, এবার আমার জন্য আরও বেশি করে চাইবে !

বলে গীতা হেসেছিল, আমি অবশ্য তোমায় হেল্‌প করব। এ তো আর নতুন কিছু নয়, শত শত ঘটছে। মেয়ের বাপের টাকায় ছেলের বিলেত যাওয়া নিয়ে কেউ আজকাল একটা গল্প পর্যন্ত লেখে না, এমন পুরানো একঘেয়ে হয়ে গেছে ব্যাপারটা !

গীতার সরল সহজ কিন্তু স্পষ্ট সতেজ হাসি আর কথা কেদারকে মুগ্ধ করেছে বরাবর।

কোনোদিন সে গোপন করার চেষ্টামাত্র করেনি যে তার পছন্দ করা কেদার ছেলেটিকে ভবিষ্যতে স্বামী করার জন্য মানুষ করে তোলার প্ল্যান তার আছে—কেদারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সে ঠিক করেছে এই প্ল্যান।

আন্তরিকতার সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছে, পুরানো হোক, একঘেয়ে হোক, আমাদের এই ব্যবস্থাই ভালো। প্রেম-ফ্রেম বুঝিনে আমি, সত্যি বলছি। এইটুকু জানি যে তোমার সঙ্গে না হলে এ জন্মে হয়তো বিয়েই আমার হবে না। হয়তো বলছি এই জন্য, পাঁচ-সাতবছর পরে হয়তো আমি বদলেও যেতে পারি। হয়তো আরেকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, হয়তো মনে হবে, এ মানুষটাকেও জীবনের সাথি করা যায়। একনিষ্ঠ প্রেমের গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি না, বুঝলে ?

তোমার কাছেও আমি সে গ্যারান্টি চাই না। তুমিও আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারছ না। এটুকু শুধু ধরে নিচ্ছি। আমাদের বিয়ে হওয়াটাই আসল কথা। তুমি দুটাকা ভিজিটের ডাক্তার হয়ে জীবন কাটাতে চাইলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তুমি যদি আমার বাপের টাকায় বড়ো হতে অপমান বোধ কর, বিয়ে আমাদের ফসকে যাবে। কিন্তু এতে তোমার অপমান নেই। মেয়ের বিয়েতে টাকা বাবা খরচ করবেই। যার সঙ্গেই বিয়ে হোক। তোমার জন্য কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা হবে না!

এই অপমানের প্রশ্ন নিয়ে কেদার বিব্রত বোধ করে না। বাপের টাকায় বিলেত গিয়ে জীবনে উন্নতি করেছে বলে গীতা তাকে শ্রদ্ধা কম করবে, তার স্বামীত্বের অধিকার খর্ব করার সুযোগ পাবে—এ সব বাঁকা চিন্তা তার মনে আসে না। বউকে দখলে রাখার অধীনে রাখার সাধটা বাঁকা পথে ছদ্মবেশে যে তার মনেও আসে না তা নয়, বাস্তব যে সংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখেছে সমাজে অত সহজে ব্যক্তি তা থেকে একেবারে রেহাই পায় না। তবে এই সংস্কারের সঙ্গে জড়িত কতগুলি সাধারণ কুসংস্কারকে কেদার জয় করেছে।

বশীভূত ও বশংবদ স্বামী দরকার হবে, গীতার সম্বন্ধে এ ধারণা থাকলে তাকে বিয়ে করার কল্পনাও সে করত না।

না, গীতার বাপের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে নামকরা বড়ো ডাক্তার হতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই কেদারের—অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে প্রমথ একটা ডিসপেনসারি দাবি করবেই। গরিব ডাক্তার হয়ে থেকে বিনা পয়সায় গরিবের মেয়ে বিয়ে করে গরিবের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবার আদর্শ যদি কারও থাকে সেটা তারই থাক—ও রকম কোনো আদর্শ দিয়ে নিজেকে সে বাঁধেনি, বাঁধবার ইচ্ছাও পোষণ করে না।

অন্য ডাক্তার বাড়ি তুলবে মোটর হাঁকাবে আর সে কিছুই করবে না কতগুলি ফাঁকা নীতিবাক্যের খাতিরে, এই ত্যাগধর্ম সে গ্রহণ করেনি।

তার মনে খটকা লেগেছে অন্যদিক থেকে।

বড়ো হতে গেলে তাকে কী সম্পর্ক তুলে দিতে হবে যাদের সে মমতা করে তাদের সঙ্গে ? তাকে কী ভুলে যেতে হবে তাদের, যারা বড়ো হবার জন্য নয়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে শেষ হয়ে যায় ? এদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তার পক্ষে কী সম্ভব হবে বড়ো হওয়া, গীতার জন্য বড়ো হওয়া, তার বাপের টাকায় ?

বড়ো হবার প্রক্রিয়া কি তাকে রেহাই দেবে ? তার বেলা আলগা করে দেবে জীবনের এই শর্তগুলি ? বড়ো ডাক্তার হয়েও সে-কি আপন হয়ে থাকতে পারবে এখনকার আপন মানুষগুলির ?

এতদিন তার ধারণা ছিল তার মতো গরিব পরিবারের যে ছেলেরা নিজের চেষ্টায় আই সি এস হওয়ার মতো কেউ একজন হয়, তাদের বাধ্য হয়েই নাড়ির সংযোগ কেটে ফেলতে হয় কেরানি মাস্টারদের স্তরের আগেকার জীবনের সঙ্গে, নইলে ও রকম বড়ো হওযাও যায় না, বড়ো হওয়ার কোনো সার্থকতাও থাকে না।

কিন্তু ডাক্তার হওযা আলাদা কথা। ডাক্তার লড়াই করে মানুষের রোগের সঙ্গে। বড়োলোক রোগীর কাছে মোটা মোটা ফি নিয়ে টাকা করাও যেমন সম্ভব তার পক্ষে, গরিব আত্মীয়বন্ধুদের আপন থাকা আর বিনা ফিতে তাদের চিকিৎসা করাও তেমনি অসম্ভব নয়।

আজকাল এ বিষয়ে রীতিমতো খটকা লেগেছে কেদারের মনে।

এদিক ওদিক কয়েক মিনিট পায়চারি করে সে ঠিক চারটের সময় সবার বড়ো শিক্ষায়তনের মাঠের সামনে দাঁড়ায়। ক্লাস করে গীতা এখন বেরিয়ে আসবে।

শিক্ষায়তন !

এ শিক্ষায়তনের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। যেমন অভাগা দেশ, বিদেশের লোক এসে যে দেশের ঘাড় ভেঙে খায় পাঁচ-সাতপুরুষ ধরে, স্বাধীন করে দিয়েও ঘাড় ভেঙে খাওয়ার জের টেনে যায়, সে দেশের যোগ্য শিক্ষায়তন।

শিক্ষা আর সংস্কৃতির একটা জমিদারি।

গীতার জন্যে ?

একটি মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। মেয়েটিকে চেনা মনে হয়।

কেদার বলে, হ্যাঁ।

গীতা তো আজ আসেনি।

ও !

গীতা কেন আসেনি কেদার জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল মেয়েটি। জিজ্ঞাসা না করেই তাকে চলে যেতে দেখে সে ডাকে, শুনুন ?

কেদার ফিরে এলে বলে, গীতাকে বাড়িতেও পাবেন না।

কেদার সবিনয়ে বলে, আমার কোনো জরুরি দরকার ছিল না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি হেসে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। সে জন্যেই ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একঘণ্টা। আপনারা সত্যি আশ্চর্য জীব। গীতাদের জন্য এখনও আপনারা ধন্না দিয়ে থাকেন—আজকের দিনেও !

আঙুল দিয়ে চশমাটা যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে মেয়েটি মুচকে হেসে বলে, যাক গে, আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝবেন। গীতা কাল দিল্লি গেছে। প্লেনে গেছে। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেছে, আপনাকে জানিয়েও যায়নি ?

কেদার বলে, জানিয়ে যাবে কেন ? দরকার হয়েছে দিল্লি গেছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, জানিয়ে গেছে। আমাকে জানাবার সুবিধে ছিল না, তবু জানিয়ে যাবে কেন ?

এবার মেয়েটি হেসে বলে, আমাকে চিনতে পারেননি বুঝতেই পারছি। চিনলে একটু খোঁচা দিয়েছি বলেই চটতেন না। এ রকমভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার কিন্তু আছে।

চিনতে পারিনি সত্যি।

ভেবে দেখুন, যদি মনে পড়ে।

মেয়েটি হাসি মুখেই চলে যায়।

ভেবেও তখন কেদারের মনে পড়ে না। মনে পড়ে বাড়ি ফিরে অমলার দিকে চোখ পড়ামাত্র। ঠিক, অমলার সঙ্গে পড়ত মেয়েটি—নাম অঞ্জলি। তাদের বাড়িতেও অনেকবার এসেছে। অমলার পড়া বন্ধ হবার পর শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্ব। অমলাকে যদি পড়ানো যেত, তাকে ডাক্তার করার জন্য যদি না বলি দিতে হত অমলার লেখাপড়া—এই মেয়েটির সঙ্গে সেও আজ যাতায়াত করত ওই শিক্ষায়তনে।

শিক্ষায়তনটি কেদারের কাছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জমিদারি মাত্র, অথচ তার জন্য বোনটির ওখানে যাতায়াতের সুযোগ জুটল না বলে কেদার আপশোশও করে !

তাকে না জানিয়ে গীতা হঠাৎ দিল্লি চলে গেছে।

এ জন্য রাগ বা অভিমানের বদলে কেদার উৎকণ্ঠা বোধ করে। বিশেষ কাবণ না ঘটে থাকলে এ ভাবে গীতা নিশ্চয় প্লেনে দিল্লি ছুটে যায়নি।

কী হয়েছে জানা দরকার।

সোজা সে চলে যায় ডাক্তার পালের বাড়ি।

গীতার মা উদাসভাবে বলে, গীতা ? সে কাল দিল্লি গেছে।

হঠাৎ দিল্লি গেল কেন ?

এমনি কাণ্ডই তো করে। ওর কোন বন্ধুর নাকি খুব অসুখ। টেলিগ্রাম পেয়েই পাগলের মতো ছুটে গেছে। আজকালকার মেয়েরা বন্ধুত্বও করে বটে সত্যি !

গীতার মার রং খুব ফরসা। যাকে বলে দুধে আলতা রং প্রথম বয়সে বোধ হয় সেই রকম ছিল, আজকাল খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সর্বদাই তাকে শ্রান্ত আর উদাসীন মনে হয়। মেয়ের জামাই হলেও হতে পারে কেদার একদিন, হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলাব বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না গীতার মাব।

কেদারকে অপছন্দ করে বলে নয়। ভাবটা তার অবজ্ঞা বা বিরক্তির নয। সব বিষয়েই তার এই উদাসীন ভাব। মেয়ের জন্য ছেলে পছন্দের দায়িত্ব মেয়ে আর মেয়ের বাপের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে।

ও, হ্যাঁ, গীতার মা হঠাৎ বলে, তোমার জন্য একখানা চিঠি রেখে গেছে। পাঠিয়ে দিতে একেবারেই ভুলে গেছি।

এতক্ষণে বিব্রত বোধ করার ক্ষীণ একটু হাসি ফোটে তার মুখে।

শরীরটা ভালো থাকছে না কিছুতেই।

এটা হল কৈফিয়ত। গীতা যে চিঠিখানা রেখে গিয়েছিল কেদারকে সেটা পাঠাতে ভুলে যাবার কৈফিয়ত।

তবে কৈফিয়তটা একেবারে মিথ্যাও নয় গীতার মার। শরীরটা তার সত্যই ভালো নয়। কিন্তু কী অসুখ বিখ্যাত ডাক্তার পালের স্ত্রীর, কোথায় খুঁত ধরেছে তার এই দেহযন্ত্রে ? এদিকে কি নজর পড়ে না ডাক্তার পালের ?

ডাক্তারি শিখতে শিখতে সেও যেমন দেখতে পায়নি তার মার দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে, এত বড়ো ডাক্তার হয়ে ডাক্তার পালেরও কি তেমনি চোখে পড়ে না ঘরের মানুষটার দেহের অসুস্থতা ?

গীতার চিঠি পড়ে কেদার বুঝতে পারে তার দিল্লি ছুটে যাওয়ার কারণ। গীতার যে একজন প্রাণের চেয়ে প্রিয় মেয়ে বন্ধু ছিল তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। বরাবর কলকাতাতেই থাকত রেখা, কিছুদিন আগে তার বাবা মস্ত সরকারি চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে যায়।

সেখানে রেখার হঠাৎ কঠিন অসুখ হয়েছে।

কী অসুখ সেটা অবশ্য গীতা চিঠিতে লেখেনি।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে এখন বিশেষ এক গভীর মমতা বোধ করে কেদার। গীতাকে সে যে ভালোবাসে সেটা আরেকবার নতুন করে যেন অনুভব কবে। যাকে ভালোবাসে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসার যে ক্ষমতা সে দেখেছে গীতার, আজ তার আরেকটি পরিচয় পাওয়া গেল।

ফিরবার সময় বাইরের ঘরে নার্স অণিমার সঙ্গে দেখা হয় কেদারের। হয়তো সে এখানেই বসেছিল, ভেতরে যাবার সময় লক্ষ করেনি।

নমস্কার কেদারবাবু। ভালো আছেন ?

হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অণিমা পরিপূর্ণ প্রণাম জানায়।

কেদারের সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় অণিমার। কিন্তু দেখা হলে তাকে এমন খুশি মনে হয় যেন অনেকদিনের হারানো আত্মীয়কে ফিরে পেয়েছে।

অণিমার সীমাহীন বিনয় আশ্চর্য করে দেয় কেদারকে। অস্বস্তিও বোধ করে।

শুধু তার মুখের কথায় মুখের ভাবে নয়, সর্বাঙ্গের সমস্ত ভঙ্গিতে যেন একটা স্থায়ী সবিনয় কারুণ্য। মানুষ যেন বেচারিকে দয়া করে একটা পেশা অবলম্বন করতে দিয়ে সকলের দাসী বানিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার পালের জন্য অপেক্ষা করছেন ?

হ্যাঁ। একটু কাজ আছে। ওঁর ফিরতে দেরি হলেই মুশকিলে পড়ব। ওদিকে আবার ডিউটি আছে।

একটু বসুন না কেদারবাবু ? তাড়া নেই তো ?

না, তাড়া কিছু নেই।

একটু অপেক্ষা করলে ডাক্তার পালের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে মনে করেই কেদার বসে বটে, কিন্তু অণিমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাও যে তার থাকে না তা নয়। নার্সদের জীবন সম্পর্কে তার বিশেষ একটা কৌতূহল আছে।

নার্সরা তার একেবারে অজানা মানুষ নয়। হাসপাতালে অনেক নার্সকেই সে দেখেছে, তাদের কাছাকাছি এসেছে। কয়েকজনের সঙ্গে মোটামুটি আলাপও হয়েছে। কিন্তু সে পরিচয় শুধু ডিউটিরত নার্সদের সঙ্গে—তারা যখন চাকরি করছে, কর্তব্য পালন কবছে।

ডিউটির বাইরে ওদের একজনেরও জীবনের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়টুকুও নেই।

অণিমা বলে, একদিন চা খেতে আসুন না আমার বাড়িতে ? আমার স্বামী খুব খুশি হবেন আলাপ হলে।

সত্যিই মমতা বোধ করে কেদার। অণিমা যেন ঘোষণা করে যে এমনি দশা আমাদের, এমনি একটা জগতের সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হয় যে একজন পুরুষকে বাড়িতে চা খাবার নেমন্তন্ন করলে জানিয়ে দেওয়া এখনও আমি দরকার মনে করি, ভয় নেই, অন্য কিছু ভাববেন না দয়া করে, ঘরে আমার স্বামী আছেন, স্বামী নিয়ে ঘর করি আমি !

স্বাধীন পেশা নিয়েও অণিমারা যে কত অসহায় কেদার তা জানে।

আপনার স্বামী কী করেন ?

কাজ করতেন। এ বছর ছাঁটাই হয়ে ঘরে বসে আছেন।

সে নিজেই যেন দায়ি এমনি ভাবে অণিমা যোগ দেয়, যে দিনকাল। মানুষের কাজকর্মও থাকছে না।

অণিমাকে দেখলে মনে হয় যৌবনের মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেলেও সবেমাত্র পার হয়েছে। এখনও সীমানায় পৌঁছতে দেরি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপরাহ্ণ এসে গিয়েছে তার যৌবনের, ঘনিয়ে আসছে ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

তার বয়স কম দেখাবার প্রাণপণ চেষ্টার যে মানেই অন্য লোকে করুক, কেদাব জানে এ শুধু তার পেশা বজায় রেখে চলার প্রয়োজনকে খাতির করা।

আপনার ছেলেমেয়ে নেই ?

একটি মেয়ে।

আচ্ছা, আপনার সংসারের কাজ রান্নাবান্না এ সব কে করে ? লোক রেখেছেন ?

লোক কী রাখা যায় কেদারবাবু ! ওনার যখন চাকরি ছিল তখনই পারতাম না, আজ কোত্থেকে পারব ? বাড়ি থাকলে সে বেলা আমি রাঁধি। অন্য বেলা উনি চালিয়ে দেন।

কেদারের সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় হলেও তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তার আগ্রহ ও প্রশ্নের সঙ্গে অণিমার অনেককালের পরিচয়। কেদারের মতো এমন কত তরুণ ডাক্তারকে সে এই রোগজীর্ণ নিপীড়িত মানবতার মুক্তিদাতা হয়ে কর্মজীবনে নামার অনুপ্রেরণায় ডগমগ হয়ে থাকতে দেখেছে। এমনি সাগ্রহে তাদের কত প্রশ্ন করতে শুনেছে চিকিৎসকদের সহকর্মিণী নার্সদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে !

কয়েক বছর পরে এরাই আবার জীবনে একটিমাত্র আদর্শ খাড়া রাখে সামনে, বোগী বাড়ুক, পসার বাড়ুক, ফি বাড়ুক।

ক্ষমতা হাতে পেলে এরাই নিষ্ঠুর অবিবেচনার সঙ্গে নার্সদের কাছে দাবি কবে নিখুঁত দায়িত্বজ্ঞান সময়জ্ঞান তৎপরতা।

কেউ কেউ অন্য দাবিও করে।

৪

পরিমলের গরদের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, তাঁতের ধুতি, তার ওষুধের দোকানে দামি আসবাব, নতুন সুদৃশ্য সাইনবোর্ড—এ সব সত্যই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার !

বাইরের লোকের কাছে না হোক, যারা তার ও তার বাড়ির অবস্থা জানে তাদের কাছে তো বটেই।

হঠাৎ এত পয়সা সে পেল কোথায় ?

পয়সার অভাবেই যার কেদারের চেয়ে ভালো ছাত্র হয়েও ডাক্তারির বদলে কবিরাজি শেখা, কোনোরকমে পুরানো একটা চেয়ার টেবিল, ফরাশ পাতা তক্তপোশ এবং ভাঙা একটা আলমারি নিয়ে দোকান খোলা, হঠাৎ সব এ ভাবে বদলে দেবার সঙ্গতি সে জোটালো কী করে ?

বিয়ে তো করেনি বা বিয়ের সব ঠিক হয়ে যাওয়ায় আগাম কিছু পণ তো আদায় করেনি ভাবী শ্বশুরের কাছে !

পরিমলের বেশ ও দোকানের বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জ্যোতিরও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়।

তার অস্থির উগ্র মরিয়া ভাব দিন দিন সত্যই বড়ো অশোভন হয়ে উঠেছিল। শুধু তার আপনজনেরা নয়, কেদারও রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

অন্যভাবে ভালোবাসতে না পারুক, বিয়ে করা সম্ভব না হোক, ছেলেবেলার সাথি মেয়েটার জন্য তার আন্তরিক স্নেহ ছিল, নিজের বোনটি ছাড়া কারও জন্য এ স্নেহ পোষণ করতে না পারার মতো অনুদার সে নয়।

জ্যোতির জন্য কিছুই করতে না পারার অক্ষমতায় সে গভীর দুঃখ বোধ করেছে। যার চাপে হর্ষকে পরিমলের কথা বলতে গিয়ে সে ধমক খেয়েছিল।

সত্য কথা বলতে কী, নিজের এই নিরুপায়তা তাকে বারবার তিক্ততার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিয়েছে যে এই জন্যই সংসারে মানুষ অনুদার হওয়া ভালো মনে করে, যার জন্য কিছু করার অধিকার নেই তাকে স্নেহ করতে গিয়ে মনঃকষ্ট বরণ করে না, স্নেহমমতা রিজার্ভ করে রাখে নিজের বাড়ির নিজের লোকের জন্য।

তাও কার উপর কতটা অধিকার ঘটাতে পারা যাবে তারই হিসাব অনুসারে।

জ্যোতিকে হঠাৎ শান্ত হয়ে জুড়িয়ে যেতে দেখে, তার চোখে মুখে রহস্যময় হাসিখুশির ভাব ফুটতে দেখে, কেদার তাই প্রথমে পরম স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, কী এমন অঘটন ঘটে গেল যে জ্যোতির আর ভাবনা চিন্তা রইল না, মুখ থেকে হতাশার ছাপ মুছে গিয়ে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল ?

পরিমলের সম্পর্কে কি মত বদলে গেছে বাড়ির লোকের ? হর্ষ ডাক্তার কি অগত্যা মেনে নিয়েছে যে কবিরাজও মানুষ ?

অমলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, জ্যোতির সঙ্গে মিশিস না কেন তুই ?

ও মেয়ের সঙ্গে কে মিশবে ?

মেয়েটা খারাপ হল কীসে ?

মেয়েটা খারাপ নয়। মেয়েটার মাথাটা খারাপ। এতদিন ধিঙ্গিপনার শেষ ছিল না, লজ্জাশরম নেই বাছবিচার নেই, যা তা করছে যা তা খাচ্ছে। মেয়ে হঠাৎ আবার ডিগবাজি খেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। মাছ মাংসের ছোঁয়া খায় না, বউদির সঙ্গে নিরামিষ খায়, ভোরে উঠে চান করে, পুজো করে, আরও কত কী !

সেদিনের পর থেকে কেদার আর জ্যোতিদের বাড়ি যায়নি। ধীরে ধীরে তার সম্পর্কে পরিমলের যে অবজ্ঞা আর বিদ্বেষের ভাব স্পষ্টতই বেড়ে চলছিল সেটাকে উসকানি দেবার সাধ তার ছিল না।

এবার একবার নিজের চোখে দেখে শুনে ব্যাপার বুঝতে যায়।

ইতিমধ্যে জ্যোতি কয়েকবার দুপুরবেলা সেই সময় তাদের বাড়ি এসেছে। তখন সে লক্ষ করেছে জ্যোতির নতুন ভাব। কিন্তু কথাবার্তা সে ইচ্ছা করেই বেশি বলেনি তার সঙ্গে।

জ্যোতিরও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি আলাপ করবার। বাড়িতে একবার তাকে দেখে আসা দরকার।

মোহিনী সখেদে বলে, মেয়েটা আবার আরেক পাগলামি জুড়েছে বাবা। বাপের আদরে চুলোয় গেল হারামজাদি। এত বাড়াবাড়ি করছে, বাপকে বললাম একটু শাসন করো, তা বলে কি না, ভালোই তো।

বিয়ের কিছু ঠিক হল ?

কই আর হল বাবা ? ও মেয়ের আর বিয়ে হয়েছে। কোথা থেকে একটা অলক্ষ্মী এসে জন্মেছিল।

বিধবা রেবা মাছ কাটছিল। সে বলে, এ কী বাড়াবাড়ি মাগো ! মাছ না খাও না খেলে, আমিও তো খাই না। তাই বলে মাছ ছুঁতেও দোষ ? মাছটা কেটে দিতে বললাম, শিউরে উঠে ঘর লেপতে গেলেন। সকালে একবার লেপা হয়েছে, আবার কী দরকার তোমার ঘর লেপার ?

কেদার ঘরে যায়।

জ্যোতির কপালে চন্দনের ফোঁটা।

সে বলে, জেরা কোরো না, উপদেশ দিয়ো না কেদারদা।

কেদার বলে, বেশ তো। ব্যাপারটা আমায় খুলে বলো ! আগে বেহায়ার মতো বলেছ, আজ লক্ষ্মী মেয়ের মতো বল।

জ্যোতি একটু হেসে বলে, অভ্যাস করছি।

তার মানে ?

তাও বুঝলে না ? আরেক জনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে তো একদিন। বিবিয়ানা পছন্দ করে না মানুষটা।

কেদার অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এমন নির্ভয় নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এসেছে মেয়েটার যে একদিন তাকে পরিমলের ঘর করতে হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না ?

পরিমলের কথা কি মোহিনী তার কাছে তবে গোপন করে গেল ?

হর্ষকাকা রাজি হয়েছেন ?

হননি। হবেন।

কেন হবেন ?

জ্যোতি রাগ করে বলে, সেই জেরাই তুমি শুরু করলে। চিরদিন তোমার এই একভাব—

আমি তোর মঙ্গল চাই জ্যোতি।

এত মঙ্গল কি মানুষের সয় ?

তোর সইবে।

পসার বাড়ছে, ওষুধ বিক্রি বাড়ছে। এক বছরে মোটর কিনবে দেখো। তখন আর আপত্তি করবে কেন তোমরা ? বাবা নিজেই বলবে, নাঃ, ভালো পাত্র পেয়েছি।

কেদার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তুই টাকা কোথায় পেলি জ্যোতি ?

টাকা ?

পরিমলকে তুই টাকা দিয়েছিস।

মুখ কালো করে জ্যোতি বলে, তুমি পাগল নাকি ? আমি টাকা কোথায় পাব ?

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে কেদার তার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর নীরবেই বিদায় নেয়।

ওর জন্য কিছু করবার অধিকার শুধু তার নেই নয়, আজ টের পেয়েছে যে কিছু করার ক্ষমতাও তার নেই।

এও তো তপস্যা ! পদ্ধতিটা যেমন হোক।

কিছুতেই হাল ছাড়বে না জ্যোতি। দিবারাত্রি তার আর কোনো চিন্তা নেই, জীবনে আর কোনো কামনা নেই, সাধ আহ্লাদ সব দাঁড়িয়ে গেছে যে ভাবে হোক তার প্রেমকে সফল করার চেষ্টায়।

পরিমলকে সে বদলাতে চায় না, নিজে বাপের ঘরে কী ভাবে মানুষ হয়েছে শিক্ষাদীক্ষা কী পেয়েছে এ সব নিয়ে সে মাথা ঘামায় না—পরিমল যেমন চায় তেমনি হবার জন্য সে প্রস্তুত এবং উন্মুখ।

কেদার অবশ্য তার মানে জানে। কোনোদিন চোখে না দেখলেও বাপভাই যাকে এনে জুটিয়ে দেবে তার কাছেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ যে মনের ধর্ম এবং সেটাই যে মনের প্রেম, জ্যোতি নিজে বর বেছে নিয়ে নিজে তোড়জোড় কবে বিয়েটা ঘটাবার চেষ্টায় প্রাণপাত করলেও এ প্রেম আলাদা কিছু নয়, এও সেই একই মানসিক ধর্ম পালন। বিয়ে হবার পর স্বামীকে পছন্দ হলে যা ঘটে, জ্যোতির বেলা বিয়ে হবার আগেই সেটা ঘটেছে।

মানে সে জানে। জানে যে এ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়—ঘরে ঘরে মেয়েদের দাসীত্ব যে আত্মসমর্পণের ভিত্তি।

কিন্তু এ কি প্রেম নয় জ্যোতির ?

প্রেম শুধু ঘটেছে তার ও গীতার মধ্যে ? গীতা নিজেকে লোপ করতে রাজি নয়, সমানভাবে স্বাধীনভাবে নিজের রুচি ও পছন্দসই জীবন সে যাপন করবে তার সঙ্গে—নিজেকে সমর্পণ করবে না।

সত্যই কি করবে না ?

জ্যোতির মতো গীতাও কি চাইছে না তার প্রেম সফল হোক বাপের সম্মতিতে, তার পছন্দ মতো নীড়ে তার পছন্দ মতো দাম্পত্য জীবনে ?

জ্যোতিও তো অবিকল তাই চায়। দুজনের তফাত শুধু মনের গড়নের, পছন্দের।

তাছাড়া, সে বড়ো ডাক্তার হয়ে উপার্জন করবে আর সেই উপার্জন ভোগ করেও সত্যই কি স্বাধীন সত্তা বজায় থাকবে গীতার ?

পরিমল যেমন চায়, জ্যোতি চলবে ফিরবে সেইভাবে।

সে যেমন চায় গীতাও চলবে ফিরবে সেইভাবেই।

না বলে জ্যোতির পাড়ার কোনো বান্ধবীর বাড়ি যাওয়া নিয়ে পরিমল মাথা ঘামাবে না।

না বলে গীতাব দিল্লি চলে যাওয়াব মধ্যে সে দোষের কিছু খুঁজে পাবে না।

পার্থক্যটা তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়।

নিজেকে সব রকমে সঁপে দিয়ে গীতা জ্যোতির মতো শুধু তাকে আর রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরকে অবলম্বন করে জীবন কাটাবে ভাবলেও তাব গা ঘিনঘিন করে।

কিন্তু আজ এ কী মুশকিলেই যে সে পড়ে গেল ! তবে কেন তার বারবাব মনে হচ্ছে যে জ্যোতির মতো গীতাও যদি পাগল হয়ে উঠত, তাকে পাওয়ার জন্য জ্যোতির মতো সেও যদি মরিয়া হয়ে উঠত !

নিজের মনটা তার নিশ্চয় পিছিয়ে আছে।

সে নিশ্চয় মনে মনে চায় যে সে বড়ো হোক বা না হোক, ডাক্তার পালের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে দ্বিতীয় ডাক্তার পাল হোক বা না হোক, তাকে পাবার জন্য গীতা সব কিছু করতে রাজি আছে !

সে চিকিৎসক। রোগ নির্ণয় তার পেশা। জ্যোতির কোনো রোগ হয়নি। কিন্তু ডাক্তারি চোখ দিয়ে জ্যোতিকে দেখতে যে খটকা লেগেছে তার মনে তা যদি সত্য হয়, এ সমাজে কুমারী মেয়ের পক্ষে সেটা মারাত্মক রোগের চেয়ে বড়ো অভিশাপ।

তবু এক বছর দেড় বছর পরে পরিমল বড়োলোক হবে, হর্ষের মত বদলাবে এই আশা পোষণ করছে জ্যোতি ! বছরখানেকের মধ্যে পরিমল পসার বাড়াবে টাকা করবে মোটর কিনবে—কারও আপত্তি থাকবে না তার হাতে জ্যোতিকে সঁপে দিতে।

জ্যোতি নিজে কি টের পায়নি ?

অথবা সেই কি ভুল করেছে ?

দুপুরে আসত জ্যোতি সকলের বিশ্রামের সময়ে। দু-একটা কথা বলেই সে উপরে চলে যেত।

কেদার বাইরের ঘরে একটা পুরানো আলমারিতে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে, আগেকার টেবিলটাতেই একখণ্ড রঙিন কাপড়ের আবরণ চাপিয়ে তার নতুন কেনা ডাক্তারি ব্যাগ স্টেথোস্কোপ চাপিয়ে রাখে। এই ঘরেই সে শোয়া-বসার ব্যবস্থা করেছে।

তা আগেও সে এই ঘরেই শুয়েছে বসেছে পড়াশুনা করেছে, তবে আগে ঘরখানার দখলিস্বত্ব তাকে কেউ এমন সর্বাঙ্গীণ ভাবে ছেড়ে দেয়নি।

দু-একজন রোগী আসে। দু-চার টাকা পাওয়া যায়। তাতেই খুশি হয়ে প্রমথ এ ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনোরকমভাবে ঘরখানা ব্যবহার করা নিষেধ করে দিয়েছে।

রাত্রি শেষ হবে। শুকতারা দপদপ করে জ্বলছে নিভবার জন্য। দরজায় মৃদু করাঘাত আর চাপা গলার ডাক শুনে তরল ঘুম ভেঙে যায় কেদারের।

কে ?

দরজা খোলো কেদারদা। আমি জ্যোতি।

কেদার দরজা খুলে দিতে সে ঘরে ঢুকে কেদারের বিছানাতে বসে। বলে, বড়ো বিপদে পড়েছি। আমি কিন্তু হাতে পায়ে ধরব না কেদারদা।

খুলেই বল না ? সহজভাবেই?

চা-টা খেয়েই বাবা তোমার বন্ধুকে খুন করতে আসবে।

কেদার তার ভাঙা আলমারিটা খুলতে খুলতে বলে, কাঁপছিস কেন ? এই তো দোষ তোদের ! মরি-বাঁচি করে সারাবছর তিলে তিলে প্রাণ দিবি, যখন মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তখন আর গায়ে জোর খুঁজে পাবি না।

আলমারি খুলে বোতল থেকে ওষুধ মাপা গ্লাসে ওষুধ ঢেলে তাতে আরেকটা বোতলের ডিস্টিল ওয়াটার খানিকটা মিশিয়ে দিয়ে কেদার বলে, এক চুমুকে গিলে ফ্যাল। তারপর কথা হবে।

বাবার ওষুধ দিলে ? ব্র্যান্ডি দিলে ?

কেদার ধমক দিয়ে বলে, তোর বাবা ওষুধ খেয়ে নেশা করে। তার জন্যে কি ওষুধও বিগড়ে যাবে নাকি ?

একটু ইতস্তত করে এক চুমুকে ওষুধটা গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করে জ্যোতি কয়েক মুহূর্ত ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়।

তারপর ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে, তুমি আমায় ওষুধ খাইয়ে ঝিমিয়ে দিলে। যেভাবে বলতে এসেছিলাম সেভাবে আর বলতে পারব না।

সেই তো ভালো। ঝোঁকের মাথায় আবোল-তাবোল বলার চেয়ে এবার গুছিয়ে বলতে পারবি। সারারাত ঘুমোসনি, না ?

জ্যোতি মাথা নাড়ে।

বাড়ি গিয়ে ঘুমোবি।

তাই ঘুমোতে হবে। আর যাতে না জাগি এমনিভাবে।

তবে এলি কেন আমার কাছে ? ও ভাবে ঘুমোলেই হত !

এলাম কেন ? তুমি বলো কি না আমার ভালো চাও, তাই দেখতে এলাম সত্যি যদি ভালো করতে পার।

জ্যোতি মুখ তুলে সোজা তাকায়। মুখ তার থমথম করছে ভেতরের পুঞ্জীভূত আবেগ উদ্‌বেগ আর উত্তেজনায়।

ভয়ের কিন্তু লেশটুকু নেই মুখের ভাবে !

তুমি ঠিক ধরেছিলে কেদারদা। আমিই টাকা দিয়েছিলাম। মার নামে বাবা সার্টিফিকেট কিনে দিয়েছিল, চুরি করে নিয়ে ভাঙিয়েছিলাম। কাল সবাই জেনে গিয়েছে।

কী করে জানল ? সেই কবে চুরি করেছিলি, অ্যাদ্দিন পরে কাল মোটে ধরা পড়ল। তুই চুরি করেছিস জানল কী করে ?

আমি বললাম।

তোকে সন্দেহ করল কীসে ?

সন্দেহ করেনি। আমি নিজেই বললাম।

কেদার আশ্চর্য হয়ে যায়। সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না জ্যোতির কথায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, জ্যোতি, শুধু ব্যাপার খুলে বললেই চলবে না। তোর মনের ভাবটাও আমি জানতে চাই। মানুষ একটা কাজ করেছে সেটাই সব নয়। কেন করেছে কী উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে সে সবও জানতে হয়।

তুমি তো জানই সব।

না, আমি জানি না। লুকিয়ে নিয়েছিলি, কেউ টের পায়নি। তোকেও সন্দেহ করেনি। কাল যখন জানা গেল সার্টিফিকেটগুলো নেই, যেচে তুই বলতে গেলি কেন তুই নিয়েছিস, পরিমলকে টাকা দিয়েছিস ?

জ্যোতি এবার মাথা নামায়।

ধীরে ধীরে বলে, না জানিয়ে উপায় ছিল না। আমি যা ভেবেছিলাম তা তো হল না। আর দেরি করার উপায় নেই। ক'দিন ধরে আমি পাগলের মতো ছটফট করছি। মা বাক্সো খোলে না, টেরও পায় না। আমিই শেষে বাক্সের তালাটা খুলে রেখে মাকে বললাম, দেখো তো মা তালা খোলা কেন, কিছু চুরি গেছে নাকি। বাক্সো খুঁজে দেখে মা আমায় বলল, তুই নিশ্চয় লুকিয়ে রেখে তামাশা করছিস। আমি তখন কাঁদতে লাগলাম। তারপর সব খুলে বললাম।

এ অবস্থাতেও তার বলার কায়দা কেদারকে মুগ্ধ করে দেয়। জ্যোতি নিছক কেবল কাহিনিটাই বলছে কিন্তু তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে বাড়ির মানুষকে তার জানিয়ে দেবার তাগিদ যে সে-ই ঘরের টাকা চুরি করে পরিমলকে আয় বাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। তার এ তাগিদের আসল মানেও উঁকি দিয়ে গেছে তার বলার মধ্যে।

কেদার বলে, সব খুলে বলেছিস ? সব ?

জ্যোতি একটু মাথা নাড়ে।

পরিমলকে বলেছিস ?

এবারও জ্যোতি মাথা নাড়ে।

হর্ষ কাকা তবে ওকে খুন করতে আসবে কেন ?

আমায় ভুলিয়ে টাকাটা নিয়েছে বলে। আমি নাকি ছেলেমানুষ, আসল দোষী ও। সত্যি বলছি কেদারদা, ওর কোনো দোষ নেই, সব বুদ্ধি আমার, আমিই সব করিয়েছি। আমায় বরং বারবার বারণ করেছে, রাগারাগি করেছে ধমক দিয়েছে—আমি জোর করে সব করিয়েছি।

সব তোর বুদ্ধি ? সব ? কোনো বিষয়ে ওর দোষ নেই ?

এবার জ্যোতি মাথা নামায়।—না।

বাজে বকিস না জ্যোতি। পরিমলের কাণ্ডজ্ঞান নেই, ও মানুষ নয় ? তুই তো সত্যিই ছেলেমানুষ। নিজে অমানুষ না হলে তাকে নামানো যায় না।

জ্যোতি মৃদুস্বরে বলে, যায়, তুমি জানো না। আমায় খালি ছেলেমানুষ ভাবছ। ঘরে খিল দিয়ে তোমায় আটকেছিলাম, ভুলে গেছ ? আমার সঙ্গে পেরে ওঠেনি, করবে কী ?

জ্যোতি মুখ তোলে। জোর দিয়ে বলে, সত্যি বলছি কেদারদা, বিশ্বাস করো। তুমিও যদি বিশ্বাস না করতে পার, কে করবে ? আমায় ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিয়ো না। আমাকে ঠেকাতে কতভাবে কী চেষ্টা যে করেছে জানলে তুমি বুঝতে পারতে। সত্যি বলছি, প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমার সঙ্গে পারেনি। সামনে একদিন বিষ নিয়ে গিলে ফেলেছিলাম, আমি যা বলব শুনবে কথা দিয়েছে তবে বমি করতে রাজি হয়েছি।

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

এ উন্মত্ততা—উগ্র প্রচণ্ড ঝোঁক, যার কাছে জগৎ সংসার সব তুচ্ছ হয়ে যায়। একটা মানুষের জন্য এমন ভাবে উন্মাদিনী হতে পারে কোনো মেয়ে ?

তুই যে এমন করলি, তোর ওপর মানুষটার যে বিতৃষ্ণা আসবে ভাবলি না একবার ? তোকে শ্রদ্ধা করতে পারবে কখনও ? চিরদিন তোকে নিচু মনে করবে।

জ্যোতির মুখে ক্ষীণ হাসি ফোটে।

তুমি ঠিক উলটোটা বলছ কেদারদা। যার জন্য চুরি করলাম সে কখনও চোর বলতে পারে ? পুরুষ মানুষ নিজে উপায় করতে পারল না, আমি যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করেছি—নিজের কাছেই তো লজ্জা পাবে ! ছোটো ভাবতে হলে নিজেকে ভাববে, আমাকে নয়।

হর্ষ কাকা ওঠেননি ?

বাবার উঠতে সেই বেলা সাতটা আটটা।

আচ্ছা তুই বাড়ি যা। গিয়ে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবি।

জ্যোতি তবু নড়ে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। চোখে পলক পড়া আর আঙুলের নড়াচড়া শুধু প্রমাণ দেয় হঠাৎ সে চেতনাহীনা সত্যিকারের পুতুল বা প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়নি।

কেদার সহজভাবে বলে, অনেক কাণ্ড করেছিস, তোর আর কিছু করার নেই জ্যোতি। আমাদের ওপর নির্ভর করে এবার তোর হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ থাকার পালা। সত্যি বলছি, আর কোনো বুদ্ধি খাটিয়ো না, কিছু করতে যেয়ো না, তাতে খারাপ হবে।

তুমি ভার নিলে ? সত্যি নিলে ?

নিলাম।

তবে যাই। আমার কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে কী জানো—

মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে না পেরে জ্যোতি একটু হাসবার চেষ্টা করে।

সে চলে যাবে, কেদার ডেকে বলে, আরেকটা কথা শোনো।

বলো।

কোনো কারণে যদি এখুনি ব্যবস্থা না হয়, যদি ছ-মাস এক বছর দেরিও করতে হয়—

কেদারদা !

ঝিমিয়ে নেতিয়ে এসেছিল জ্যোতি, আবার সে সচকিত হয়ে ওঠে।

কেদার শান্তভাবে বলে, যদির কথা বলছি। তোর জেনে রাখা ভালো। আমি ডাক্তার, কেমন ? আমি তোকে কথা দিচ্ছি, কোনো কারণে যদি অপেক্ষা করতেই হয়, তোর কোনো ভয় নেই। আমি তোকে দায় থেকে রেহাই পাইয়ে দেব। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে ফেলিস না। তোর আবার বিষ গেলার অভ্যাস আছে।

তুমি পারবে তো কেদারদা ?

কেদার বলে, কেদারদা নয়—বল ডাক্তারবাবু, পারবেন তো ? আমি তোর অসুখ ঠিক ধরেছি, তোকে সারিয়ে দিতে পারব। মিছে ভাবিসনে।

জ্যোতি ফিরে এসে আবার বসে।

ঘুমে শ্রান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, জোর করে চোখ মেলে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে, তুমি আজও আমায় চিনলে না কেদারদা। আমি বিষ গিলেছিলাম কি মরতে চেয়ে ? ও সব আমার ধাতে নেই। মরার কথা কোনোদিন ভাবি না আমি। কেন মরতে যাব ? এত বড়ো পৃথিবী পড়ে রয়েছে, আমার ঠাঁই হবে না কোথাও !

মুখ না নামিয়ে শুধু গলা একটু নামিয়ে বলে, তুমি যে রেহাই দেবে বললে, আমি তা চাই না। আমি কি একটা পাপ করেছি যে সে জন্য আরেকটা পাপ করতে যাব ? আমি যাকে বিয়ে করব ঠিক করছি, তাকে আমি বিয়ে করবই। তোমরা সবাই যদি চেষ্টাও করো তবু ঠেকাতে পারবে না। গোড়া থেকে এই পণ করেছি, নইলে কি ভাব ঝোঁকের মাথায় নষ্ট করেছি নিজেকে ? তেমন মেয়ে পাওনি আমায়।

কেদার কথা বলতে পারে না। এ তেজ সে কল্পনাও করেনি জ্যোতির মধ্যে।

মনে হয়, নিজেকে আর সমস্ত মানুষকে বুঝি সে ছোটো ভেবে এসেছে এতকাল।

জ্যোতি আবার বলে, ও মানুষটার জন্যেই মুশকিল। ওর খালি ঝোঁক নিয়মমতো সাধারণভাবে বিয়েটা হোক। পুরুত ডেকে বাবা আমায় সম্প্রদান করে দেবে, অন্যরকম বিয়েতে ওর সাধ মিটবে না। নইলে আমি এত সহ্য করতাম ভেবেছ ? যত নিরুপায় ভাবছ আমাকে—

জ্যোতি হঠাৎ থেমে যায়। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী বকছি না তো ? না কেদারদা, আমি সত্যি নিরুপায়। আমার এ সব কথা শুনে তুমি যেন আবার চেষ্টা করতে ঢিল দিয়ো না।

জ্যোতি চলে যাবার পর কেদার অবাক হয়ে ভাবে যে এই জ্যোতি তার চোখের সামনে বড়ো হয়েছে !

সে ডাক্তার, ডাক্তার ! এই মেয়েকে সে অভয় দিতে গিয়েছিল দায় থেকে মুক্ত করার !

জীবনে সে কখনও এ ভাবে বিব্রত বোধ করেনি। চিকিৎসক হতে গিয়ে গোড়াতেই তাকে জানতে হয়েছে যে মানুষ কেবল দেহের রোগেই ভোগে না, সমাজের অনিয়ম আর জীবনের অনিয়মও রোগের মতোই মানুষকে ভোগায়। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় ভাসা ভাসা ভাবে অর্জন করা এই জ্ঞান যে তার কতদূর একপেশে আর যান্ত্রিক, জ্যোতির কাছে আজ তাকে সেটা বুঝতে হল।

জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কে জানে এ অভিজ্ঞতা আবার যাচাই হবে কিনা জীবনে ?

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় মস্ত এক দামি গাড়ি। দামি জামাকাপড় পরা শৌখিনভাবে ঘষামাজা করা মাঝবয়সি একজন ভদ্রলোক নেমে আসে।

মুখে তার দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ।

কাকে চান ?

ডাক্তারবাবুকে—কেদারবাবুকে।

এত সকালে কেদার নামক ডাক্তারবাবুকে খুঁজতে এ রকম গাড়ি চেপে অপরিচিত ভদ্রলোকের আবির্ভাব অন্যদিন হলে কেদারকে খুবই আশ্চর্য করে দিত। ভাবত যে ডাক্তারি আরম্ভ করার আগেই তবে তার নাম ছড়িয়ে গেছে ! আজ সে মনে মনে বড়োই বিব্রত হয়েছিল, তাই প্রায় নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গেই কেদার বলে, বসুন।

তাতে যে ভদ্রলোকের কাছে ডাক্তার হিসাবে তার মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে এটা তার খেয়ালও হয় না।

ভদ্রলোক বসে। বসে ইতস্তত করে।

কেদার নিজেও বসে। তার কাছে এই বড়োলোক মানুষটির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সে বুঝে উঠতে পারে না। ডাক্তার হিসাবেই তাকে কনসাল্ট করতে বা কল দিতে এসেছে এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার মনে হয় তার। শহরে এত বড়ো বড়ো ডাক্তার থাকতে এ রকম একজন বড়োলোক মানুষ সামান্য সর্দিকাশির চিকিৎসার জন্যও তার কাছে আসবে না।

ভদ্রলোককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কেদাব বলে, আমারই নাম কেদার।

আপনি নতুন পাশ করেছেন ?

কেদার সায় দেয়।

আপনার লাইসেন্স আছে তো ? মানে, কিছু মনে করবেন না, লিগালি সব কেসের ট্রিটমেন্ট করা, ডেঞ্জারাস অপারেশন এ সব—

কেদার মৃদু হাসে।

ভাববেন না। আমি পুরোপুরি ডাক্তার।

ভদ্রলোক আবার একটু ইতস্তত করে বলে, কথাটা কী জানেন, একটা কেস আছে। তাই আপনার কাছে এলাম।

কেমন খাপছাড়া মনে হয় ভদ্রলোকের কথাবার্তা আর হাবভাব। মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে কেদারের। এত সব বিখ্যাত ডাক্তার থাকতে তার কাছে এসে খবর নেওয়া তার লাইসেন্স আছে কিনা !

সে গম্ভীর হয়ে বলে, কেসটা কী ?

আমরা মোটা ফি দেব। একশো দুশো—যদি চান আরও বেশি দেব। একটু বিপদে পড়েছি। ভদ্রলোক করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।

খুলেই বলুন না ব্যাপারটা কী ?—কেদার জোর দিয়ে বলে, আগে কেসটা কী বলুন, তারপর ফি-র কথা হবে।

অন্যায় ব্যাপার কিছু নয়।

তবে বলতে আপত্তি কী ?

আপত্তি কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। একটি মেয়ের—মানে, মেয়েটি প্রেগন্যান্ট। মেয়েটির স্বাস্থ্য বড়ো খারাপ, আমরা আশঙ্কা করছি মেয়েটি হয়তো বাঁচবে না। আমরা চাই—

কেদার গম্ভীর হয়ে বলে, বুঝলাম। এটা গোপনীয় কেন ? একশো দুশো টাকা ফি-ই বা আপনাকে দিতে হবে কেন ? মেয়েটির স্বাস্থ্য সত্যই যদি খারাপ হয়, ডাক্তার যদি মনে করেন বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহলে নিশ্চয় তিনি দরকার মতো ব্যবস্থা করবেন।

লোকটি একটা আপশোশের আওয়াজ করে। বলে কী জানেন, মেয়েটির বিয়ে হয়নি। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে বসেছে, চুপিচুপি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতে চাই। আপনাকে বরং তিনশো টাকাই দেব—

এই সময় সংযম ভেঙে পড়ে কেদারের। নতুন ডাক্তার, পশার নেই, টাকার অভাব—লোকটা এই সব হিসাব করে তার কাছে এসেছে ! নামকরা বড়ো ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস পায়নি !

কেদার গর্জন করে বলে, বেরোন এখান থেকে।

মুখ লাল করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়।

ডাক্তারির অভিজ্ঞতা তো কেদারের নেই। সংসারের অভিজ্ঞতাও কম। সে তাই রাগের চোটে বলে, আপনার গাড়ির নম্বর টুকে রাখলাম।

বেরিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ায়। দেখা যায় তার এতক্ষণের সকরুণ বিনয় একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

তাই নাকি ! তুমি ছোকরা আমায় জব্দ করবে ? বটে, বটে ! তোমার মতো ডাক্তার কিনে আমি পা টেপাতে পারি জানো ? গাড়ির নম্বর রাখতে হবে না—আমার নাম ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে সে কেদারের দিকে অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে দেয়।

কেদারের রাগ তাড়াতাড়ি কমে যায় কিন্তু জ্বালা কমে না। সে জানে ভদ্রলোকের হুমকি মিথ্যা নয়—কিছুই সে করতে পারবে না তার অন্যায় মতলব ঠেকাতে। লোকটার টাকার জোর আছে বলেই নয়, শুধু নীতির খাতিরে তার পক্ষে কিছু করা উচিতও হবে না। এতক্ষণে অজানা অচেনা মেয়েটির কথা তার মনে পড়েছে। ভিতরের ব্যাপার কিছুই না জেনে কিছু করতে যাওয়ার মানেই দাঁড়াবে শুধু তার নিজের গায়ের ঝাল ঝাড়া।

বড়োই ছেলেমানুষ মনে হয় নিজেকে। এত রাগ না করে মেয়েটিকে একবার দেখতে গেলেই হত। কোনো উপকার হয়তো করলেও করতে পাবত তার।

কেদার ভাবছিল হর্ষের কাছে নিজেই যাবে না পরিমলকে তার খুন করতে আসার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। ভাবতে ভাবতে হর্ষের কাছ থেকেই ডাক এল।

গিয়ে দেখা গেল সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে পরিমলকে খুন করার সাধ তার বিন্দুমাত্র নেই। গম্ভীর বিমর্ষ মুখে মানুষটা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে।

কেদার গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুলে না চেয়েই বলে, বোসো।

কেদারকে চা দিতে বলে সে নীরবে কাগজে চোখ বুলিয়ে যায। তার ভাব দেখেই কেদার অনুমান করতে পারে যে জ্যোতিব পক্ষ নিয়ে তার ওকালতি করার দবকার হবে না, হর্ষ নিজেই অবস্থাটা মেনে নিয়েছে।

সে আপস করবে।

কেদার স্বস্তি বোধ করে।

সেই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে হর্ষ ডাক্তারের মতো একরোখা লোক এত সহজেই হার মানল !

হয়তো সেও অনুমান করতে পেরেছে সব কিছুই। বুঝতে পেরেছে যে হার মানা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মুখ তুলে কাগজটা সরিয়ে দিয়ে আচমকা হর্ষ বলে, তোমার বন্ধুটির কাছেই জ্যোতিকে দিতে হয় কেদার। হারামজাদি খেপে গেছে। এমন বেয়াদব অবাধ্য মেয়ে আর দেখিনি।

কেদার বলে, আমিও এই জন্যই বলেছিলাম আপনাকে।

হর্ষ নীরবে মিনিট খানেক খবরের কাগজে চোখ বুলায়। বোধ হয় কথা বলার আগে নিজেকে সংযত করে নেয়।

তুমি একা কেন, বউমাও বলেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, এ শুধু ছেলেমানুষি। ওইটুকু মেয়ের এমন গুণ হতে পারে, এ রকম বিগড়ে যেতে পারে, বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন দেখছি হারামজাদির আর কোনো গতি নেই। কী করেছে জানো ? চুরি করে আমার হাজার তিনেক টাকা ওই নচ্ছারটাকে দিয়েছে।

ক্ষোভে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে হর্ষ। তারপর বলে, যাক্ গে, কী আর হবে। ওর যখন গেঁয়ো কবরেজটাকেই এত পছন্দ, তাই হোক। নিজেই বুঝবে।

সকালবেলা এমনিতেই হর্ষ বেশ খানিকটা স্তিমিত নিস্তেজ হয়ে থাকে। আজ তাকে খুব বিমর্ষও দেখায়। এক একটি সন্তান নানা কারণে বিশেষভাবে আদুরে হয় বাপের। জ্যোতির জন্য হর্ষের পিতৃস্নেহের পক্ষপাতিত্ব সকলেরই জানা ছিল।

মনে তার সত্যই তাই ভয়ানক আঘাত লেগেছে। তার কাছে শুধুই পিতার অধিকার খাটাবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার দুঃখ নয়।

আচমকা সে বলে, আমারও দোষ আছে। আমিই আদর দিয়ে দিয়ে মাথা বিগড়ে দিয়েছি।

কেদার মৃদুস্বরে বলে, খুব তেজি আর একরোখা হয়েছে।

হর্ষ বলে, যাক গে, কী আর করা যাবে। আমি কিন্তু গিয়ে প্রস্তাব করতে পারব না কেদার। এ দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে। বিশেষভাবে এই জন্যই তোমায় ডাকিয়েছি। তুমি আমার ছেলের মতো, বিশু মারা যাবার পর থেকে—

তাও কেদার বোঝে। জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে জামাই করার আশা ছেড়েও হর্ষ ছাড়তে পারেনি, এদিক থেকেও তার মনে আঘাত লেগেছে।

কেদার বলে, আপনি ভাববেন না কাকা, আমিই আপনার হয়ে কথাবার্তা বলব।

হর্ষ বলে, একটা কথা। পরিমলকে জানিয়ে দিয়ো, পণের টাকা সে আগেই পেয়েছে। আমি আর একটি পয়সা দিতে পারব না। টাকাটা জ্যোতির বিয়ের জন্যই তোলা ছিল।

কেদার বলে, নিশ্চয়, আবার কেন টাকা দেবেন ? বিয়েটা তাড়াতাড়ি হলে তো আপনাব আপত্তি নেই কাকা ?

হর্ষ কাগজটা টেনে নিয়ে বলে, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

তেরো দিন পরে জ্যোতির পণ পূর্ণ হয়।

কেদার বলে, মিছেই তুই বাড়াবাড়ি করেছিস জ্যোতি। এত কাণ্ড করবার কোনো দরকার ছিল না। আরেকটু জোর করে বললেই হর্ষকাকা রাজি হয়ে যেতেন।

জ্যোতি হেসে বলে, হতেন না। তোমরা বলবে বাড়াবাড়ি কবেছি, প্রাগলামি করেছি। কিন্তু বাড়াবাড়ি না করলে কথাটা তোমরা গায়েই মাখতে না, ভাবতে একটু ছেলেমানুষি করছি। আমি জানি তোমাদের, এমনি করে বুঝিয়ে না দিলে তোমরা কিছুতে বিশ্বাস করতে না যে আমি মরব তবু ছাড়ব না।

তাই নাকি !

তা নয় ? তোমাদের অবশ্য দোষ নেই কেদারদা। তোমরা দেখেছ, অনেক মেয়েই এ বকম ছেলেমানুষি করে, আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেই সব সেরে যায়। আমি যে সত্যি সত্যি ছেলেমানুষি করছি না, সহজে তোমরা বিশ্বাস করবে কেন ?

৫

একসঙ্গে তিনটি রোগী জুটে যায় কেদারের।

তার ডাক্তারি জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম।

তিনজনের একজনও তাকে এক পয়সা ফি দেয়নি, পাবার আশাও নেই। এ দিকটা ধরলে হয় তো এদের ঠিক রোগী বলা যায় না।

পাশের বাড়িতে মায়ার একটি বন্ধু আছে, বীণা। কেরানি স্বামী আর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বীণা বাস করে।

বিজন নিচু স্তরের অল্প মাইনের কেরানি। অতি কষ্টে সংসার চলে।

একটি ঘরে তিনটি জীবের অভাব অনটন ভরা জীবন একটা বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মায়ার কাছে। ওই ঘরে নিদারুণ অভাব আছে কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপ নেই। ওই অভিশাপকে ব্যর্থ করার একমাত্র যে পথ, সেই পথ বেছে নিয়েছে বিজন আর বীণা দুজনেই।

দুজনে লড়াই করে। তাদের মতো আরও অসংখ্য জীবনে যারা অভাবের অভিশাপ চাপাবার অবস্থা বজায় রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

মায়া এসে একদিন বলে, কেদারদা, বিজনবাবুকে একটু দেখবেন ? খুব জ্বর হয়েছে।

কেদার সবে ঘুম থেকে উঠেছিল। মুখ-হাত ধুয়ে সে চা খাবার খায়, মায়া বন্ধুকে খবব দিয়ে এসে ধন্না দিয়ে বসে থাকে রান্নাঘরের দরজায়।

কেদার ঘরে গিয়ে জামা পরে এলে সে বলে, ফি চাইবেন না কিন্তু। আমার বন্ধুর স্বামী।

তাতে আমার কী ?

ইস্ ! ওরা দাদাকে দেখাতে চেয়েছিল, আমি আপনার কথা বলেছি। ফি দেবাব ক্ষমতা সত্যি ওদের নেই।

কেদার হেসে বলে, ভয় নেই, ভয় নেই। ওদের বদলে তুমি যখন ডেকেছ, ফি কি আমি চাইতে পারি ? সে তো তোমার কাছে চাওয়া হবে ! কিন্তু তোমার দাদাকে ডাকতে চাইল, বারণ করলে কেন ?

মাযা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কবরেজিতে নাকি অসুখ সারে ?

পরিমল কবিরাজি আরম্ভ করার পর তাদের দোতলায় আর ডাক্তার ওঠেনি—একমাত্র কেদার ছাড়া। সেও গেছে নিছক কেদার হিসাবেই, ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসা করতে নয়। এই সেদিন মায়ার অসুখ হয়েছিল, ওষুধ দিয়েছিল পরিমল।

সেরে উঠলেও মায়া বিশ্বাস করে না দাদার কবিরাজি চিকিৎসায় সে সেরে উঠেছে। দাদার ওষুধ না খেলেও সে এমনিতেই ভালো হয়ে যেত !

কেদারকে মায়া সঙ্গে নিয়ে যায়।

বিজনের খুব জ্বর। পরীক্ষা করে দেখে কেদার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে, মাথায় বরফ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে দবকারি সব ব্যবস্থার কথাও বলে দিয়েছে কিন্তু মনে মনে সে বোধ করেছে প্রচুর অস্বস্তি।

বোগ ধরতে ভুল হয়নি জানে, কিন্তু বিনা অভিজ্ঞতায় একা এমন একটা কঠিন রোগের চিকিৎসা করার দায়িত্ব নিতে গিয়ে দরকার মতো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছে না। কী ভাবে চিকিৎসা করতে হবে সবই সে জানে—কিন্তু যদি ভুল হয়ে যায়, যদি এমন কিছু কম্প্লিকেশন থেকে থাকে যা সে ধরতে পারেনি এবং যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

এই দ্বিধা সংশয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে কেদার। কঠিন রোগ হলেও প্রথম অবস্থায় এখনই সে বিচলিত হয় কেন নিজের অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য ? দরকার মনে হলে বীণাকে সে বলতে পারবে গয়না বেচে বড়ো ডাক্তার আনার কথা, নয় তো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে বিজনকে।

আজকেই অন্য ডাক্তার আনিয়ে নতুবা হাসপাতালে পাঠিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য মনটা তার ছটফট করছে কেন ?

কঠিন রোগ—জীবন অথবা মৃত্যু। কিন্তু তাই নিয়েই তো কারবার ডাক্তারের ? রোগী মরতে পারে এই ভাবনায় ডাক্তারের কি বিচলিত হলে চলে ?

এতই যদি দুর্বল হয় মন তার, এ পেশা নেওয়া তো তার উচিত হয়নি !

পরিমলকে সে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রথম সিরিয়াস কেসের কথা মনে আছে ?

আছে বইকী। ওই বস্তিতে একেবারে শেষ অবস্থায় ডেকে নিয়ে গেল—ডবল নিমুনিয়া। কয়েকদিন হোমিয়োপ্যাথি চলছিল, তারপর আমায় ডাকে। বাঁচবে ভাবিনি—শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।

তোমার ভাবনা হয়নি ? ভুলটুল যদি হয়ে যায় ? কনসাল্ট করার কথা ভাবনি ?

কেন ? লক্ষণ সব পরিষ্কার, কী করতে হবে জানি, ভুল হবে কেন ? রোগ না ধরতে পারলে, কী বিধান দেব বুঝতে না পারলে আলাদা কথা ছিল।

একেই কি বলে আত্মবিশ্বাস ? নিজে যতটা জানি যতটা বুঝি তাই দিয়ে যতটা সম্ভব করলাম তার পরে আর কথা নেই ? যদি ভুল হয়ে থাকে—এ প্রশ্ন অর্থহীন ?

কেদার হর্ষের কাছে যায়।

জ্যোতির বিয়ের পর হর্ষ মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ যেন সংসার জীবন আর পেশা সম্পর্কে আরও বেশি নিস্পৃহ হয়ে গেছে মানুষটা। রোগী আর চিকিৎসা সম্পর্কে পর্যন্ত এখন মাঝে মাঝে তার উদাসীনতা দেখা যায়।

হর্ষ তার কথা শুনে হাসে। অনেকদিন পরে কেদার তার মুখে হাসি দেখতে পায়।

ও রকম হবে না ? প্রত্যেক অনেস্ট ইয়ং ডাক্তারের হয়। এটাই তো প্রমাণ যে তুমি সিরিয়াস, রোগীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে তুমি নারাজ। দায়িত্বজ্ঞান থেকে এ রকম নার্ভাসনেস আসে, এটা কেটে যাবে কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানটা চিবকাল থাকবে। বুড়ো হলাম, এখনও একটা রোগী মরলে তন্নতন্ন করে সব হিসাব করি ভুল করেছি কিনা—নইলে স্বস্তি পাই না। তুমি তো ছেলেমানুষ।

হর্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে কেদার। সে ভুলে গিয়েছিল, হর্ষ তার মনে পড়িয়ে দিয়েছে যে বৈজ্ঞানিকও যন্ত্র নয় মানুষ—বিজ্ঞানের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান।

তার দ্বিতীয় রোগীটি পাড়ার একটি ছেলে।

কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, রোগা লম্বা চেহারা কলেজে পড়ে। পাড়ার ছেলে, কাছেই বাড়ি, অনেকদিনের চেনা। মাঝে মাঝে এসে কেদারের সঙ্গে দেশ সমাজ রাজনীতি নিয়ে কথা বলে।

নিজেই একটা প্রশ্ন করে কেদারকে, তার মতামত শুনতে চায়, তারপর তর্ক জুড়ে দেয় বিনীতভাবটা আগাগোড়া বজায় রেখে। কত বিষয়ে যে তার কত মতভেদ দেখা যায় কেদারেব সঙ্গে।

মতভেদের জন্যই কেদার সুধীরকে খুব পছন্দ করে।

সুধীর একদিন মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফেরে। দুর্ঘটনা নয়, কুঘটনা। একটা সভায় গিয়েছিল, পুলিশ লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। গায়ের জামাটি খুলে ফাটা মাথায় জড়িয়ে সে কেদারের কাছে হাজির হয়।

প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে।

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কেদার বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত ছিল সুধীর।

মিছিমিছি হয়তো অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম। পরীক্ষা আসছে, তাই ভাগলাম।

একটু জ্বর হয়েছিল সুধীরের। ব্যান্ডেজ খুলবার দিনও মনে হল তার একটু ঘুষঘুষে জ্বর আছে। দু-একবার সে কাশে।

কেদারের মনে খটকা লাগে। পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর সে ব্যবস্থা করে বুকের ভেতরের ফটো নেবার এবং স্পেশালিস্ট ডাক্তার সেনকে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাবার।

দেখা যায় সুধীরকে টি বি ধরেছে।

মাথা ফাটার জন্য অবশ্য নয়। মাথা ফাটবার আগেই শুরু হয়েছিল রোগটা।

বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। স্পেশালিস্টের নির্দেশ মতো চিকিৎসা করছে কেদার।

সে ভাবে, ফাটা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য তার কাছে না এলে সে টেরও পেত না মাঝে মাঝে ছেলেটার ঘুষঘুষে জ্বর হয়, তার ভেতরটা এ দেশের এই অতি সুলভ মারাত্মক রোগে খয়ে যেতে শুরু করেছে। আরও কতকাল হয়তো বিনা বাধায় ভেতরে ভেতরে বেড়ে চলত রোগটা—তার কাছে এসে তর্ক করতে করতে মাঝে মাঝে সে কাশত কিন্তু ডাক্তার হলেও যেহেতু ছেলেটা রোগী হিসাবে আসেনি সেই হেতু ওর কাশিটার বিশেষত্ব খেয়ালও হতনা তার।

একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও গোপন রোগটা তার নির্বিবাদে গোপন আক্রমণটা চালিয়ে যেত !

কেদার গীতাকে বলে, এ যেন ঠিক মায়ের ব্যাপারটা আরেকবার ঘটল। চোখের সামনে রোগের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ, একটু খেয়াল করলেই সন্দেহ হয়। পরীক্ষা করে ধরা যায়, অথচ খেয়ালটা আমার হয় না কিছুতেই !

গীতা বলে, কী যে বল তুমি ! এত কেউ খেয়াল করতে পারে ? ডাক্তার বলেই কী তুমি মানুষ নও ? চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে তাহলে ওত পেতে থাকতে হয়, কার শরীরে কী লুকানো রোগ আছে। কেউ কাছে এলে তোমায় শুধু খুঁজতে হবে তার কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা।

কেদার বলে, তা নয়। তুমি ভুল বুঝলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আমার চোখে ধরা পড়ছে না।

তৃতীয়টি রোগিণী। তাদেরই বাড়ির ঠিকা ঝি পদ্ম।

শুভময়ীর মরণের পর ঠিকা ঝি দরকার হয়েছে। বিমলা আর অমলা সামলে উঠতে পারে না। অমলার দু-একখানির বেশি বাসন মাজা, মশলা বাটা বা দু-দশ মিনিটের বেশি উনানের আঁচে থেকে রান্না করা নিষেধ।

হাত-পায়ের আঙুল মোটা হয়ে গেলে, গায়ের রং ময়লা হলে তাকে পার করা নিয়ে মুশকিল হবে।

শুভময়ী বেঁচে থাকতে তাকে দেখতে এসেছিল একটি ছেলের পক্ষের মেয়েরা। হাতের পায়ের আঙুল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে গেছে।

অমলা কেদারের জীবনে একটা বড়ো আপশোশ।

তার ডাক্তারি পড়ার জন্য অমলার পড়া বন্ধ হয়েছিল। চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকেনি।

এখন আবার সমস্যা দাঁড়িয়েছে যে সে বিয়ে করে টাকা না আনলে ওকে পার করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি পসার করে টাকা আনলেও অবশ্য চলে। কিন্তু সে ভরসা কেউ রাখে না।

বিমলার পিছুপিছু পদ্ম এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

বিমলা বলে, ঝি বলছিল ওকে একটু ওষুধ দিতে।

কী হয়েছে ?

মুখে ঘা হয়েছে, খেতে পারে না। গলা বসে গেছে, কানে ব্যথা—

পদ্মর দেহটা শুকনো, বয়স খুব বেশি নয়। তিন বছরের একটি ছেলে আছে। স্বামীর নাম বংশীধর।

তাকে পরীক্ষা করে কেদার বলে, আজ ওষুধ দেওয়া যাবে না। তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ো। আর ও বেলা থেকে তুমি কাজে এসো না।

হায় রে কপাল পদ্মর ! ডাক্তারের বাড়ি কাজ করছে ভেবে বিনামূল্যে একটু ওষুধ চাইতে গিয়ে তার চাকরিটা গেল !

পদ্ম নড়ে না।

কেদার বুঝিয়ে বলে, তোমার অসুখের ভালো চিকিৎসা দরকার। তোমার স্বামীকে সব বুঝিয়ে বলা দরকার। চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

তবু পদ্ম নড়ে না।

বিমলাকে মৃদুস্বরে সে তার বক্তব্য জানায়। বিমলা কেদারকে জানায়, ওব স্বামী মাঝে মাঝে আসে, চলে যায়।

অর্থাৎ এখন কিছুদিন বংশীধরের পাত্তা মিলবে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মকে চিকিৎসার জন্য আসতে বলা বৃথা। তিন বাড়ি খেটে সে কোনোমতে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে নিজের ধড়ে প্রাণটা বজায় রেখেছে—

সুতরাং পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে কেদারকেই হাসপাতালে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে যেতে হয়।

পদ্মকে সে সাবধান করে দেয় যথানিয়মে, স্বামী ফিরলেই আগে যেন তারও চিকিৎসা হয়, নইলে আবার তার এই কুৎসিত রোগটা হবে। কিন্তু পদ্ম বিশেষ গা করেছে মনে হয় না।

রোগটা সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ব্যস্ত হবার উপায় তার নেই। তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণগুলি চাপা পড়লেই সে বাঁচে—তাকে খেটে খেয়ে বাঁচতে হবে।

নিচুর তলার গরিব অসহায় রোগী এই তার প্রথম। কিন্তু তার তো আর অজানা নয় গরিব অসহায় এই মানুষগুলি কত রকমের কত রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় সেরে ওঠে, পঙ্গু হয়, মরে যায় !

এটা তার হৃদয়ের একটা স্থায়ী বেদনা।

তার সাধ্য নেই ওদের জন্য কিছু করে। ডাক্তার হয়েছে বলে একা ওদের যতজনের পারে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জীবনটা ধন্য করার ফাঁকিতে সে বিশ্বাস করে না। অনেক ধনী ব্যক্তি দাতব্য ঔষধালয় খুলে দিয়েও কী এ অভিশাপের এতটুকু গুরুত্ব কমাতে পেরেছে ? ভিক্ষা দিয়ে কী একটা দেশের দারিদ্র্য ঘোচানো যায় ?

তবু কিছু তার করতে ইচ্ছা হয়। যে ভাবে সত্যিকারের প্রতিকার হবে, রোগ হলে মানুষ আকাশের রোদ বৃষ্টির জল আর গাছের ছায়ার মতো ওষুধ পথ্য চিকিৎসা পাবে।

কিন্তু সে জানে না কী ভাবে সে এটা সম্ভব করার কাজে অংশ নিতে পারে, তার ডাক্তারি পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে।

এখনও ঠিকমতো আরম্ভ করেনি ডাক্তারি জীবন, অথচ নানা কাজে নানা ঝঞ্ঝাটে কোথা দিয়ে সময় চলে যায় সে যেন টেরও পায় না।

জ্যোতি বলে, এই বুঝি লাভ হল তোমার বন্ধুর বউ হয়ে ? একবার খবরও নাও না বেঁচে আছি কী মরে গেছি !

জ্যোতিকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ছেলেবেলা থেকে কতবার এসেছে গিয়েছে কিন্তু এবার বউ সেজে স্থায়ীভাবে এ বাড়ির দোতলায় এসে উঠেই সে যেন খুশিতে আনন্দে স্বাস্থ্যের বিকাশে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছে।

সেই সঙ্গে এমন ভাবে নিজেকে সে মানিয়ে নিয়েছে এ বাড়ির পাঁচজনের সংসার ও সংস্কারের সঙ্গে যে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে সে বুঝি পেয়ে এসেছে এ বাড়িতে সকলের মনের মতো বউ হবার শিক্ষা ! সে যেন মানুষ হয়নি হর্ষ ডাক্তারের বাড়ির একেবারে আলাদা পরিবেশে।

একমাত্র পরিমল ছাড়া গোড়ায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল সকলের মুখ। হর্ষ ডাক্তারের এই মেয়েটাকে ঘরে আনবে পবিমল, এমন আচমকা আনবে, বাড়ির কারও অনুমতি বা পরামর্শের তোয়াক্কা পর্যন্ত না রেখে—এক পয়সা পণ না নিয়ে !

পরিমলকে বউ নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যেতে বলাব কথা পর্যন্ত ভেবেছে জনার্দন।

জ্যোতি প্রায় সকলের মুখ থেকেই অসন্তোষের সেই অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। নতুন বউয়ের কাছে সবাই যেমন আশা করে ঠিক তেমনই করেছে সে তার ওঠাবসা কথাবার্তা চালচলন। শাশুড়িকে জানিয়ে রেখেছে খুব সঙ্গত এক সূত্রে যে তার মায়ের গয়নাগাঁটি সব সে পাবে। তার ছোটো ভাইটি খুবই ছোটো। বড়ো ভাইয়ের বউ বিধবা।

কয়েক বছর পরে মা তার শুরু করবে তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া—তার আগে গয়নাগুলি তাকে দিয়ে যাবে।

বাড়ির সকলের কানে পৌঁছে দেবার জন্য মায়াকে সে চুপিচুপি জানিয়ে রেখেছে যে জামাই যদিও মোটেই পছন্দ হয়নি তার বাবার, তবু বাবার তার পরিকল্পনা আছে পরিমলের পসার বাড়িয়ে খ্যাত বাড়িয়ে তাকে উঁচুতে তুলে দেবার !

জনার্দন শুনে জ্যোতিকে ডাকিয়ে সস্নেহে বলেছে, বউমা, তোমার বাবা তো এত বড়ো ডাক্তার। তা তিনিও চিকিৎসা করেন, পরিমলও চিকিৎসা করে। ওর জন্য কিছু করতে পারেন না বেয়াই মশাই ?

নতমুখে মৃদুস্বরে জ্যোতি বলেছে, করবেন বইকী বাবা। কী ভাবে করবেন তাই ভাবছেন। তবে কিনা খুব তো খুশি হতে পারেননি, তাই দুদিন একটু—

সে তো বটেই ! সে তো বটেই !

জ্যোতির অনুযোগের জবাবে কেদাব বলে, তুই এখন পরের ঘরের বউ। অত খবর নিলে চলবে কেন ?

গীতাদিকে কবে আনবে বউ করে ?

কে জানে কবে। সে তো তোর মতো পাগল নয় বউ হওয়ার জন্য।

বিজনের বোগটা একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাঁকা পথ ধরে। কেদারের এ আশঙ্কা ছিল কিন্তু এমন বিপর্যয় সে কল্পনা করেনি।

নিজেকে সে ধিক্কার দেয়।

এখনও সে জীবনের মমতায় ভরপুর। তাই ডাক্তার হয়েও একটা রোগীর রোগ হঠাৎ বিগড়ে যাওয়াতে নিজেকে সে নিন্দা করতে পারে মনে মনে।

হর্ষের কাছে ছুটে যায়।

রাত এগারোটার সময় হর্ষের তখন ঢুলুঢুলু চোখ। সে বলে, রাত দশটার পর আমি তো রোগী দেখি না।

জ্যোতির বিয়েতে যে অবিশ্বাস্য কার্পণ্য করেছে হর্ষ ডাক্তার, তার মানেটা কেদার বুঝতে পারে। নাম-করা ডাক্তার, দিনদিন পসার তার বেড়েই যেত স্বাভাবিক নিয়মে—যদি শুধু দয়া করে সে দরকারের সময় টাকা নিয়ে একবার হাজির হত রোগীর বিছানার পাশে। জ্যোতির বিয়ের পর মদ তার কাছে আরও তুচ্ছ করে দিয়েছে রোগীর জীবন, একগুণ পরিশ্রমের দশগুণ দাম নিয়েও সে ডাক্তারের উপস্থিতি আর চিকিৎসা পেয়ে রোগীকে মরতে দেবার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরোতে রাজি নয় রাত দশটার পর।

ট্যাক্সি নিয়ে কেদার ছুটে যায় ডাক্তার পালের বাড়ি। বাড়িটা অনেক দূর। কিন্তু কী করবে, কাছাকাছি বড়ো ডাক্তার যারা আছে, তাদের তো সে চেনে না। নতুন ডাক্তার হয়ে পরের জন্য বিনা পয়সায় সে অনেক সময় আর পরিশ্রম খরচ করেছে, এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার চেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ একজন বৈজ্ঞানিককে তার দরকার হয়েছে এ কথা জানলেই তারা তো আর ছুটে আসবে না তার ডাকে !

ডাক্তার পাল বই পড়ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম বই।

বিরক্ত হয়ে বলে, গীতা ঘুমিয়ে পড়েছে কেদার !

আমি আপনার কাছেই এসেছি।

এতরাত্রে হঠাৎ ? ডাক্তার হতে চলেছ কেদার, বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না। সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলো।

কেদারের বিবরণ শুনে ডাক্তার পাল বলে, তুমি ঠিক ধরেছ। এ রকম অবস্থায় ব্রেনটা বাঁচানোই আসল কথা। এ তো খুব সোজা কথা কেদার। ব্রেনটা বাঁচালেই রোগী বেঁচে যায়।

আপনি একবার চলুন।

ডাক্তার পাল নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরায়। প্রশ্ন করে, তোমার কে হয় বললে ?

আমার কেউ নয়।

ডাক্তার পাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি কোনোদিন ডাক্তার হতে পারবে না কেদার। তোমার নিজের কেউ নয়, চেনা একটা লোক মরছে দেখেই তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ ! একবার ভাবলে না যে এত বড়ো শহরে এ রকম কত লোক মরছে ? আমার সাধ্য আছে তাদের সকলকে গিয়ে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে দিই ? আমাকে তাহলে ডাক্তার না হয়ে ধোপার গাধা হতে হত অনেক আগে।

কেদারের মাথা ঘুরছিল। ঝোঁকের মাথায় সে বলে বসে, আপনার পুরো ফি দেবে।

এ কথাটা গোড়াতে বললেই পারতে ?

পোশাক ডাক্তার পালের এক রকম পরাই ছিল, শুধু জুতোটা পায়ে লাগিয়ে আলমারি খুলে দুটো ওষুধ ব্যাগে ভরে দু-মিনিটে তৈরি হয়ে যায়।

রতন ! বলে ডাক দেওয়ামাত্র তার ড্রাইভার রেশনের গম ভাঙানো রুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে গেঞ্জি গায়ে এসে স্টিয়ারিং হুইল ধরেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেয়।

একেবারে যেন মিলিটারি তৎপরতা !

বিজনকে পরীক্ষা করে ব্যাগ খুলে ডাক্তার পাল তাকে একটা ইনজেকশন দেয়। বলে, তুমি স্টুডেন্ট ভালো ছিলে। এ কী রকম ডাক্তারি শুরু করলে কেদার ?

কেদার বিরস মুখে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার পাল বলে, আমায় ডাকতে না গিয়ে ইনজেকশনটা দু-ঘণ্টা আগে দিলেই পারতে ?

বলে, তোমরা সাহস পাও না। কেন পাও না ? ডাক্তার কি ইয়ার্কি দেয় রোগীর সঙ্গে ? সে যে বিজ্ঞান শিখেছে সেইমতো চিকিৎসা করে যায়, রোগী বাঁচবে কী মরবে সে দায় তো তার নয় !

আরেকটা ইনজেকশন দেয় বিজনকে। খানিক পরেই উঠে দাঁড়ায়।

কেদারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে মাথা নাড়ে।

ডাক্তারি জীবনে এই প্রথম রোগীর মরণ ঘটল কেদারের।

কেদার ভাবে, তাতে কী হয়েছে ? আমার কি দোকানির মন রয়ে গেছে ? বউনিটা ভালো হল না বলে মন খুঁতখুঁত করবে ?

দুঃখ হলেও মায়ার কাছে তাকে ডাক্তার পালের ফি-এর দাবিটা তুলতে হয়।

মায়া বলে, এ সময় কোন মুখে গিয়ে চাইব ? কত লাগবে ?

ডাক্তার পালের ফি-র অঙ্ক শুনে মুখ শুকিয়ে যায় মায়ার। সে বলে, কী সর্বনাশ, ওঁকে আপনি ডাকতে গেলেন কেন ? এ টাকা কোত্থেকে দেবে ?

কেদার ভাবে, বাঃ, বেশ ডাক্তাব আমি। আমার রোগীও মরল, চিকিৎসার টাকাটাও দিতে হবে আমারই পকেট থেকে।

৬

অঞ্জলি একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। উপলক্ষ, তার নিজেব জন্মদিন।

কেদার সেদিন তাকে চিনতে পারেনি বলে সে নাকি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। না চেনাই তো স্বাভাবিক। আট-নবছর আগে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসত, তাও আবার অমলার কাছে। বোনেব বন্ধু বলে কেদার ভাসা ভাসা ভাবে হয়তো বা কোনোদিন দু-একটা কথা বলেছে, কোনোদিন তাও বলেনি।

তার পক্ষে কি মনে রাখা সম্ভব অঞ্জলিকে ?

তবে আমি জানতাম, পরে আপনার মনে পড়বে।

কী করে ?

অঞ্জলি মুচকে হাসে।

প্রথমে আমিও আপনাকে চিনতে পাবিনি। গীতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, একজন ক্লাসফ্রেন্ড বললে, ওই দ্যাখ আমাদের গীতার ইয়ে। ইয়ে মানে বোঝেন তো ? ভালো অর্থে ইয়ে—মানে, যার সঙ্গে যথারীতি এনগেজমেন্ট হয়েছে। তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। বাড়ি ফিরে হঠাৎ মনে পড়ল—ইনি তো সেই অমলার সেই দাদা ! যিনি হঠাৎ একদিন পাঁচ মিনিটে আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

কেদার হেসে বলে, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ? কী বিশ্রী ব্যবহারটা করেছিলাম আপনাকে ছেলেমানুষ পেয়ে !

আমার কিন্তু দুঃখ বেশি হয়নি, গাও বিশেষ জ্বালা করেনি। শুধু ভড়কে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এতটুকু মেয়ে বাঁদর নাচানোর কায়দা জানল কী করে ?

এতটুকু মেয়ে কী কেদাবদা ? পনেরোয় পা দিয়েছিলাম। আপনার বোধ হয় কুড়ি একুশ হয়েছিল ? আপনার তুলনায় কত পেকে গিয়েছিলাম ভাবুন তো !

কেদার শুধু একটু হাসে।

অঞ্জলি বলে, আচ্ছা কেদারদা, ব্যাপারটা কী বলুন তো ? এমন স্মার্ট ছিলেন, কলেজে পড়তেন, আমার বেলায় অমন হাবাগোবার মতো হয়ে গেলেন কী করে ?

হাবাগোবাই ছিলাম। তাছাড়া কী জানো, আমি তো ঠিক প্রেমে পড়তে চাইনি তোমার, মুক্তি চেয়েছিলাম।

বুঝলাম না তো।

বুঝলে না ? ছেলেমেয়েদের এই যে প্রেমে পড়ার বাতিক, হালকা রোমান্স খোঁজার রোগ, এটা শুধু বাজে বই পড়ে বাজে সিনেমা দেখে জন্মায় না। বই সিনেমা এ সবের মারফতে কাঁচা মনে বিকারের চাষ তো চলছেই—সস্তা রোমান্সে মুড়ে বিষ ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমার মতো ছেলেরা যে প্রেমকাতর হয়, তার আরেকটা দিক আছে।

কেদার আর হাল্‌কা সুরে কথা কয় না। অঞ্জলির মুখের দুষ্টামি-ভরা হাসিটুকু মুছে যায়।

আমার কথাই ধরো। আধা-গেঁয়ো আধা-শহুরে গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সংকীর্ণ একঘেয়ে জীবন, কত কিছু চাই কিন্তু পাই না, পরিবেশটার চাপে দম আটকে আসে।

টের পেতেন ? বুঝতেন সবই?

সে চেতনা থাকলে আর ভাবনা কী ছিল বলো ? এখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা কী হয়েছিল। ওই অবস্থায় দিন কাটাই, কত স্বপ্ন দেখি—কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যৎ কেবল হতাশা পাঠায়। এদিকে বইয়ে পড়ি সিনেমায় দেখি মুক্ত স্বাধীন অ্যারিস্ট্রোক্যাটদের জীবন—কোনো বাস্তব সমস্যা নেই, শুধু ভাব নিয়ে মশগুল। প্রেম ছাড়া কোনো ব্যাপারে কারও মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। শুধু প্রেম নিয়ে পাক খাওয়া।

সত্যি !

তখন তুমি উদয় হলে। মনে হল, এই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করে আমিও তো মুক্তি পেতে পারি সমস্ত বিশ্রী ঝঞ্ঝাট থেকে ? মনে হল মানে অনুভব করলাম।

অঞ্চলি ঘাড়ে ঝুলানো খোঁপাটা একটু ঠেলে দিয়ে বলে, বড়ো ভুল করেছি কেদারদা। আপনার সঙ্গে মেলামেশা বজায় রাখা উচিত ছিল। জানেন, খানিক আগেও আপনাকে সেই হাবাগোবা ভালো ছেলে আর গীতার ইয়ে মনে করে রেখেছিলাম।

ধারণাটা হঠাৎ বদলাল কীসে ?

আপনার কথা শুনে।

আমি তো এমন কিছু দামি কথা বলিনি।

অঞ্জলি তার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলায়। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরনে, পায়ে একটা স্যান্ডেল। চুল বড়ো হয়েছে, দু-হপ্তা আগেই চুল ছাঁটা উচিত ছিল। গলায় আঙুল দিয়ে ঘষলে নিশ্চয় ময়লা উঠবে। তার দিকেই চেয়ে আছে কিন্তু যেন পুরুত ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে, ধীর শান্ত দৃষ্টি, তার দেহের গড়নে চোখ বুলাবার অথবা তার মুখের সৌন্দর্য বিচার করার কিছুমাত্র আকুতি নেই।

কথা বলতে গিয়েও অঞ্জলি আরেকবার থেমে যায়।

মনে হয়, ভুল করেনি তো ?

সে যে একদিন একে বাঁদর নাচিয়েছিল, আজ এটা তারই প্রতিশোধ নেবার কায়দা নয় তো ? সমস্তটাই অভিনয় নয় তো কেদারের ?

কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে ডিগবাজি খাইয়ে দেয় অঞ্জলি। অভিনয় ! অভিনয় ! চারিদিকে সে কেবল খুঁজে বেড়ায় অভিনয়—মনকে আড়ালে রেখে বাইরে মনের মিথ্যা পরিচয় ঘোষণার অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এ জগতে কোনো মানুষের যেন আর কোনো কাজ নেই।

শুনে রাগ করবেন কেদারদা ?

রাগ করতেও পারি।

কেদার হাসে। তার ঝকঝকে দাঁত দেখে অঞ্জলির খেয়াল হয়, মাড়ির একটা দাঁত আজ তার একেবারেই টনটন করছে না।

না। রাগ আপনি করবেন না। আমারই প্রাণ খুলে কথা কইতে বাধোবাধো ঠেকছে। সত্যি কথা শুনবেন ? আমি আজ খালি জন্মদিনের নেমন্তন্ন করতে আসিনি।

ওই অজুহাত নিয়ে এসেছ।

ঠিক। এই অজুহাতে এসেছি।

অঞ্জলি তার সুন্দর শোভন দামি হাতব্যাগটি খুলে ছোটো একটি সুপারির কুচি মুখে ফেলে দেয়।

বলে, সেদিন কলেজের গেটে গীতার জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলাম এ মানুষটাকে গীতা কেন বেছে নিল—ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা স্কলার মানুষটাকে ? বাড়ি গিয়ে অমলার ফটোটা দেখে যখন মনে পড়ল আপনি কে—আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার সেই ছেলেবেলার লাভারকে গীতা শেষে পছন্দ করল !

ভাবলে না, সেই আমি যাকে বোকা পেয়ে নাজেহাল করেছিলাম ?

ভেবেছি। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য প্রাণটা ছটফট করছিল। বিশেষ ভাব না থাক, আমি তো জানি গীতাকে। ওর খুঁতখুঁতানির অন্ত নেই। রাজপুত্রের মতো কত ছেলে পাত্তা পেল না। আপনাকেও তো জানতাম, পাঁচ-সাতবছরে কী এমন আপনি হয়ে গেলেন যে আপনাকেই গীতা পছন্দ করে বসল ? এটা না বুঝতে পেরে আমার যেন সব কিছুতে অরুচি জন্মে গেল সেদিন থেকে।

এখন বুঝতে পেরেছ নাকি ?

পেরেছি। আপনার মধ্যে অনেক কিছু সম্ভাবনা আছে। সেই সঙ্গে যেরকম আত্মবিশ্বাস দেখছি আপনার, আপনি একদিন অনেক বড়ো হবেন।

কেদার আশ্চর্য হয়ে যায়। গীতার কথা মনে পড়ে। গীতাও তাকে পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছে যে সে লড়াই করে বড়ো হবে, বড়ো হবার সুযোগ সুবিধা তার নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে হবে, এটা গীতার ভালো লাগে। এটাই গীতার চোখে তাকে বড়ো হবার সহজ পথ যাদের সামনে খোলা আছে তাদের চেয়ে মানুষ হিসাবে বড়ো করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ আলাপ করেই অঞ্জলিও টের পেয়ে গেছে নিজের চেষ্টায় একদিন সে বড়ো হবে।

সেই সঙ্গে অঞ্জলি আবিষ্কার করেছে তার আত্মবিশ্বাস !

অঞ্জলি বলে, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা উচিত ছিল। মেলামেশা করলে আমারই উপকার হত।

কী রকম ?

আপনার সঙ্গে আলাপ করলে উদ্‌বেগ কেটে যায়, মনটা শান্ত হয়। শান্ত হয় মানে, অস্থিরতা কেটে গিয়ে একটা ধীর ভাব আসে। এখানে আসবার আগে কেমন একটা ছটফটানির ভাব ছিল—আগে অবশ্য বুঝতে পারিনি। ও ভাবটা সর্বদাই থাকে। আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে সেটা ঝিমিয়ে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি।

কেদার হেসে বলে, তুমি আমার তোষামোদ জুড়েছ। আরেকবার জব্দ করার মতলব নেই তো ?

অঞ্জলিও হেসে বলে, মতলব থাকলেই বা পারব কেন ? অত বোকা আমি নই, এটুকু বুঝতে পারি। আসল কথাটা কী জানেন কেদারদা ? আপনি সাদাসিদে সাধারণ ছেলে, বাইরে কোনো আবরণ নেই, মানুষকে চমকে দেবার মতো আশ্চর্য কোনো প্রতিভার লক্ষণও প্রকাশ পায় না—এটার মানে আগে ধরতে পারিনি। আপনার বাইরেটাও শান্ত, ভেতরটাও শান্ত—এ জন্য আপনাকে ভেবেছিলাম ভোঁতা। আসলে আজকের দিনে আপনার মতো অবস্থার একজনের পক্ষে বড়ো হবার লড়াই করতে নেমে ভেতরে এ রকম স্বাভাবিক শান্তভাব বজায় রাখা যে কত বড়ো প্রতিভার লক্ষণ, আজ সেটা টের পেয়েছি। আপনার প্রকৃতিটাই এ রকম আশ্চর্য ধরনের, অকারণে আপনি অস্থির হন না। আমরা সব সময়েই এটা নিয়ে ওটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে থাকি, ধৈর্য বলে কিছু নেই।

কেদারের মনে পড়ে, কথা অঞ্জলি আগেও অনর্গল বলে যেত। এদিক দিয়ে অমলার সঙ্গে তার খুব বনত—অমলা চুপচাপ মন দিয়ে তার কথা শুনত।

কেদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এতই অন্যমনস্ক হয়ে যায় অঞ্জলি যে অমলাকে তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতেই শুধু ভুলে যায় না—অমলার সঙ্গে দেখা না করেই সে চলে যায়।

এই ভুল সংশোধনের জন্যই অবশ্য বিকালে আরেকবার তাকে আসতে হয়।

কেদার তখন বাড়ি ছিল না।

অমলা বলে, মাগো মা, কী জমকালো চেহারা করেছিস ! কত বড়ো হয়ে গেছিস।

মুটিয়ে গেছি, না ?

মোটা নয়। বেশ জমজমাট চেহারা হয়েছে।

তুই তো তেমন বাড়িসনি ?

সেটা আমার বাপদাদার ভাগ্যি !

বিমলা শুনতে পেয়ে বলে, তোর যে কেমন ধারা কথা অমলা। বাপদাদা কি তোকে বোঝা ভাবে ?

অমলা চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বুঝতে পারে বাবা এবং দাদা অর্থাৎ কেদার তাকে বোঝা মনে কবে না এটা মানতে সে রাজি নয়।

অমলার পড়া কেন বন্ধ করা হয়েছিল অঞ্জলি জানে। আজ এতদিন পরে পুরোনো কালেব বান্ধবীর কাছাকাছি এসে সে টের পায়, শুধু পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই অমলা কোথায় ঠেকে রয়ে গেছে, কতখানি ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের মধ্যে।

পার্থক্য তাদের মধ্যে আগেও ছিল। তারা যে দুটি পরিবারে জন্মেছে তার মধ্যেই অনেক তফাৎ, আচার ব্যবহার খাওয়া পরা রুচি অরুচি সব দিক দিয়ে সেটা আজও বজায় আছে। কিন্তু অন্যদিক দিয়েও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে। অমলা যেন আর বড়ো হয়নি মনের দিক দিয়ে।

শুধু পড়াশোনা করার জন্যই মনের বয়সটা তার বেড়েছে কিন্তু অমলাব মনটা আজও তেমনই কাঁচা থেকে গেছে—সেই কাঁচা অবস্থাতেই সংসারের চাপে এবং তাপে খানিকটা নীবস পক্বতা এসেছে, এই মাত্র।

স্কুল কলেজে পড়াবার খরচ না কুলোক, নিজে পড়াবার সময় না থাক, কেদাব কেন বোনকে নিয়মিত সাধারণ বই পড়তে শেখায়নি, বাইবের জগতের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় করিয়ে দেয়নি ?

ঘরের কোণে আটকে রেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে ?

জ্যোতির সঙ্গেও আলাপ হয় অঞ্জলির।

আগে যখন এ বাড়িতে অঞ্জলির আসা যাওয়া বজায় ছিল তখন দু-একবার জ্যোতিকে সে দেখেছে। কিন্তু সে কথা আজ মনে পড়ে না।

তাই একেবারে নতুন করেই আলাপ পরিচয় হয়।

শাশুড়ির সঙ্গে জ্যোতি গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল।

অমলা বলে, এই অবেলায় চুল ভিজিয়ে চান করেছিস ?

জ্যোতি মৃদু হেসে বলে, চুল না ভিজিয়ে কি গঙ্গাস্নান হয় ?

বিকালে গঙ্গাস্নান কেন ?

চারটের পর যোগ শুরু হয়েছে।

অমলা হেসে বলে, তুই সত্যি দেখালি বটে জ্যোতি ! আজও বোধ হয় পেটে তোর মুরগির মাংস গিজগিজ করছে।

জ্যোতি বলে, বলিস নে ভাই। ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে !

অঞ্জলির দিকে চেয়ে বলে, এ সব শুনলে আপনাদের হাসি পায় কিন্তু যার যেমন রুচি, কী বলেন ?

অঞ্জলি বলে, তা বইকী।

অমলা বলে, তোর তো ধার করা রুচি। বিয়ের সঙ্গে গজিয়েছে।

জ্যোতি বলে, তোদের রুচিও তো সায়েবদের কাছে ধার করা ? বাছবিচার না করে মানুষ যা-তা খাবে, যা খুশি করবে, ও সব এ দেশে ছিল ? আমি বরং দেশি রুচি ধার করেছি।

মনে হয়, পরিমল যেন কথা কইছে জ্যোতির মুখ দিয়ে !

বসতে বলা হলেও জ্যোতি বসে না, ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। সে ওপরে চলে গেলে অমলা তার কাহিনি অঞ্জলিকে শোনায়—যতটা তার জানা ছিল।

অঞ্জলি বলে, আশ্চর্য মেয়ে তো !

কেদারের কাছে সমস্ত কাহিনিটা শুনলে সে কী বলত কে জানে।

অমলাকে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে বলে, যাস কিন্তু কেদারদার সঙ্গে।

সংসারের অনেক কাজ—

সংসারের অনেক কাজ বলে একদিন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন পর্যন্ত রাখতে যাবি না ?

অগত্যা অমলা বলে, আচ্ছা যাব।

কেদার কিন্তু একাই যায়।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করে, অমলা এলো না ?

কেদার একটু চুপ করে থেকে বলে, না, এলো না। আমিও জোর করলাম না।

কেন ?

সে তো বুঝতেই পারছ। এ রকম নেমন্তন্ন রাখার অভ্যাস ওর নেই। এসে শুধু লজ্জা পাবে। কারও সঙ্গে মিলতে মিশতে পারবে না, জড়পিণ্ডের মতো বসে থাকবে।

আগে কিন্তু আসত। অস্বস্তি বোধ করত না।

তখন কত ছোটো ছিল। আজ নিজেকে বুড়োধাড়ি মেয়ে ভাবছে তো। মনের গড়নটাই অন্যরকম হয়ে গেছে।

কেন তা হতে দিলেন ?

কেদার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বলে, পড়া নয় ছেড়ে দিল—বাইরে যাওয়া আসা বন্ধ করলেন কেন ?

আমি কিছুই বন্ধ করিনি। পাড়ায় কাছাকাছি বাড়িতে একলাই যায়। দূরে হলে কাউকে সঙ্গে নেবার দরকার হয়। তবে যেসব বাড়িতে যায় সেগুলি আমাদের বাড়ির মতোই।

সেদিন জ্যোতির সম্পর্কে অমলার মন্তব্য স্মরণ করে অঞ্জলি ভাবে, নিজেও সে যে কী ছিল আর আজ কী হয়েছে অমলার বোধ হয় খেয়াল হয় না। হলে জ্যোতির বাড়াবাড়ি নিয়ে হাসাহাসি করার সাধ্য তার হত না নিশ্চয়।

অঞ্জলির দাদা ডক্টর অনাদি সেন বিজ্ঞা. * নাম করা অধ্যাপক।

কেদার নামটাই শুনেছিল, আজ পরিচয় ঘটে। অতি সুন্দর চেহারা, চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি।

অঞ্জলির বাবার সঙ্গেও পরিচয় হয়।

অঞ্জলির বাবা কে টি সেনও নাম-করা লোক। পেশা ব্যারিস্টারি। এককালে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ ছিল, এখন সে সব বালাই নেই।

কে টি অর্থাৎ কান্তিতীর্থের চুলে পাক ধরেছে ভালোভাবেই। তার পরনে ঘরোয়া বিলাতি পোশাক। কিন্তু অনাদির খাঁটি স্বদেশি বেশ, সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি।

দেখলেই বুঝতে পারা যায় বাপ-বেটা দুজনে তারা বাড়িতে এই দুরকম বেশেই রীতিমতো অভ্যস্ত।

তবে এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অনাদির বেশটা অভ্যস্ত হলেও একটু লোক-দেখানো ব্যাপার।

সত্যই সে মেধাবী ছাত্র ছিল বিজ্ঞানের। অধ্যাপক হয়েও অল্পদিনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নাম করেছে। বেশ সম্পর্কে তার এই দুর্বলতাটুকু কেদারকে সত্যই আশ্চর্য করে দেয়।

পরিচয় হওয়ায় সে যে বিশেষভাবে খুশি হয়েছে এটা গোপন করার চেষ্টামাত্র না করে কেদার বলে, আপনার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করছে দেশ।

আমি তো চললাম।

কেদার ভাবে, অনাদি আবার বিদেশে যাচ্ছে আরও বেশি জ্ঞানের জন্য। সে রীতিমতো ঈর্ষা বোধ করে।

কোথায় যাবেন ?

অঞ্জলি বুঝিয়ে বলে, দাদা ভালো গবর্নমেন্ট সার্ভিস পেয়ে গেছেন। বউদির বাবা চেষ্টা করে জুটিয়ে দিয়েছেন। বউদির বাবার নাম শুনেছেন তো ? বসন্তবাবু।

শুনে কেদার যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আপনি সরকারি চাকরি নিলেন ? আপনার সায়ান্টিস্টের কেরিয়ার তো নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে ?

অনাদি উদাসভাবে বলে, একেবারে নষ্ট হবে না। খানিকটা অসুবিধা হবে। কিন্তু উপায় কী, এ রকম একটা চাকরিও তো ছাড়া যায় না।

আপনি ইচ্ছা করলে সারা পৃথিবীতে নামকরা বৈজ্ঞানিক হতে পাবেন !

কান্তিতীর্থ হেসে বলে, ইংরেজ রাজত্বে স্টার্ভ করে নাম কিনে লাভ কী বলো ? নেটিভ জিনিয়াসের কোনো দাম ইংরেজ দেয় না। ভালোমতো একটা ল্যাবরেটরি কী পাবে একস্‌পেরিমেন্ট করাব জন্য ?

তবু—

কান্তিতীর্থ সশব্দে হেসে ওঠে।—ইয়ংম্যান, যতদিন এই সেন্টিমেন্ট না ছাড়তে পারবে ততদিন এ দেশের মুক্তি নেই। স্বাধীনতা হচ্ছে রিয়ালিটি—রিয়ালিটিকে মূল্য দিতে না শিখলে স্বাধীন হওয়া যায় না।

অঞ্জলির অনুরোধে কেদার অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের অনেক আগে এসেছিল। সরলভাবেই অঞ্জলি জানিয়েছিল যে তার বাবা ও দাদার সঙ্গে সে একটু বিশেষভাবে কেদারকে পরিচিত করিয়ে দিতে চায়। তার এই ইচ্ছার কারণটা অবশ্য সে খুলে বলেনি। এতক্ষণে অন্যেরা একে দুয়ে আসতে আরম্ভ করলে তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ অনাদি বা কান্তিতীর্থের থাকে না। অঞ্জলিরও নয়।

তবে অঞ্জলি তাকে ভরসা দিয়ে রাখে, কাল আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব।

রাত প্রায় আটটার সময় নিমন্ত্রিত সকলের মন ও মান রক্ষা করতে করতে হঠাৎ একফাঁকে বলে, গীতাকে বলেছিলাম, কই, সে তো এল না ?

কেদার বলে, গীতার মন খুব খারাপ। দিল্লি থেকে ফিরে কোথাও যায় না। ওর বন্ধুর খবর শুনেছ তো ?

শুনেছি।

অঞ্জলি আরেকজনের কাছে যায়। কী কথা বলে হাসে। সেদিন শিক্ষায়তনের সামনে এবং দুদিন আগে বাড়িতে যখন অঞ্জলিকে দেখেছিল, তার সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছিল কেদারের। আজ নীরব দর্শক হয়ে তাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেয়ে তার রূপ দেখে কেদার সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমন অসাধারণ রূপের ঐশ্বর্য যে অঞ্জলির আছে এটা যেন আজ সে প্রথম আবিষ্কার করে। দুচোখ ভরে দেখেও যেন এই অপরূপ ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না।

রূপসি বলে অহংকার ছিল কিশোরী অঞ্জলির। কিন্তু এবার কদিন মেলামেশা করে নিজের রূপ সম্পর্কে তাকে বিশেষ সচেতন মনে হয়নি।

রূপের অহংকার কী সে কাটিয়ে উঠেছে ?

পরদিন সকালেই অঞ্জলি কেদারদের বাড়ি আসে।

বলে, দাদার ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে এলাম।

কেদার অস্বস্তি বোধ করে বলে, তোমার দাদা স্বাধীনভাবে যা খুশি করতে পারেন, আমি কৈফিয়ত চেয়েছি কিংবা সমালোচনা করেছি ভেব না কিন্তু।

তা জানি। আমিও কৈফিয়ত দিতে আসিনি। আপনার ভুল ধারণাটা দূর করা উচিত মনে করে এলাম।

আমার ধারণা নয়, আমি বলছিলাম দেশের লোকের কথা। সাহিত্যিক হোক বৈজ্ঞানিক হোক কেউ প্রতিভার পরিচয় দিলে সকলে তার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

আমিও তাই বলছি। প্রত্যাশা করে। কিন্তু সুযোগ দেয় না কেন ?

পরাধীন দেশে যতটা সম্ভব দেয়। প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে। দেশ-বিদেশে নাম হলে গর্ব বোধ করে।

কিন্তু যথেষ্ট টাকা দেয় না।

কেদার চুপ করে থাকে।

ঘুরে-ফিরে এই আসল প্রশ্নই যে উঠবে সে তো জানা কথা। অঞ্জলির বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

অঞ্জলি বলে, তা হলেই ত্যাগের প্রশ্ন আসে। আদর্শের জন্য আর্থিক কষ্ট বরণ করা। দাদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। নতুন আবিষ্কার করবে, বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেবে, এ সাধ কি দাদার নেই ? কিন্তু দাদা বলে, সাধ থাকলে কী হবে, ওটা হবার নয় ।আজ এ চাকরিটা না নিলে কী হবে ? দু-চারবছর আদর্শটা আঁকড়ে থাকবে, তারপর একটা আপস করবে। বিদ্যাকে কাজে লাগাবে টাকা করার জন্য, আদর্শের একটা ঠাট শুধু বজায় থাকবে। এ রকম কত ঘটেছে।

একটু থেমে অঞ্জলি আবার বলে, দাদা বলে, ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা যার আছে তার কথা আলাদা, আমি পারব না, উপায় কী ? বিজ্ঞান-চর্চার নামে প্রতিভা বিক্রি করার চেয়ে চাকরি নিয়ে বিক্রি করাই ভালো।

কেদার বলে, আসলে দাঁড়াচ্ছে মনের জোরের প্রশ্ন। কিন্তু মনের জোর এমনি আসে না, সে জন্য মানুষকে ভালোবাসা চাই। খাঁটি আদর্শের মানেই হল দশজনের জীবনকে এগিয়ে দেওয়া। আদর্শের জন্য মানুষ যা করে সেটা ত্যাগ নয়, কর্তব্য।

অঞ্জলি বলে, ঠিক। যতই হোক, বৈজ্ঞানিক তো, বাজে সেন্টিমেন্টাল ওজোর দিয়ে নিজেকে ভুলায়নি। দাদা স্পষ্টই বলেছে, আমি কী করব ? কোনোদিন সে শিক্ষা পাইনি, সেভাবে মানুষ হইনি। আজ হঠাৎ আদর্শের নামে নিজেকে বদলে ফেলব কী করে ? কথাটা আমার ঠিক মনে হয়। বউদিকে দেখলেন তো ? আজ এ চাকরি না নিলে সারাজীবন বউদির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। নয়তো অন্যভাবে টাকা আনতে হবে।

অঞ্জলি হাসে।—দাদা আবার বউদি-অন্ত প্রাণ।

কেদার হেসে বলে, তবে তো কথাই নেই !

অঞ্জলি বলে, আসলে দাদা খাঁটি বৈজ্ঞানিক নয়। সে রকম বৈজ্ঞানিক হলে বউ নিয়ে এত বেশি মাততে পারত না।

কেদার আশ্চর্য হয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকায়। অঞ্জলি তামাশা করে কথাটা বলেনি। বিচার করে ধরতে পারুক না পারুক, সত্যটাকে মোটামুটি অনুভব করে ধরেছে।

অঞ্জলির বাইরের রূপটাই শুধু নয়, তার ভিতরেরও একটা বিশেষত্ব ক্রমে ক্রমে কেদারের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল,—সহজ বাস্তব-বোধ।

হালকা ভাবপ্রবণতাই যার কাছে প্রত্যাশা করার কথা, তার মধ্যে ভাবপ্রবণতার ঘাটতিটা এমন বিস্ময়কর মনে হয় কেদারের !

তুমি এভাবেও ভাবতে পার অঞ্জলি ? তোমার মনটা তো বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে !

অঞ্জলির মুখের ভাব বদলে যায়।

শক্ত না হয়ে উপায় কী বলুন ? খুব সুন্দর হয়ে জন্মেছি যে ! এত রূপ নিয়ে জন্মালে তার দামটা দিতে হবে না ?

রূপের জন্য গর্ব বোধ করার বদলে রূপের বিরুদ্ধে তার নালিশ অভিভূত করে দেয় কেদারকে। ভেতরটা শক্ত হয়েছে কিন্তু শুকিয়ে যায়নি, ভাবাবেগ তার গভীর ও ঘন হয়েছে। বাস্তবতাকে মেনে নেবার ক্ষমতা জন্মেছে। তার মুখের ভাবে কথা বলার ভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ পায়।

কেদার মৃদুস্বরে বলে, আমি এদিকটা ভাবিনি।

অঞ্জলি বলে, অন্য মেয়ের যা হত মস্ত সম্পদ, আমার বেলা সেটাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গে বুদ্ধিটা যদি একটু ভোঁতা হত, কোনো কিছুর মানে তলিয়ে বুঝতে না চাইতাম, নিজের রূপের মোহ নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতাম জীবনটা। প্রেমের কথা এত শুনেছি,—পরস্পরকে নিয়ে যতবেশি মশগুল হওয়া যায়, জগৎ-সংসার ভুলে যাওয়া যায়, ততই নাকি প্রেম গভীর আর খাঁটি প্রমাণ হয়। কত বড়ো একটা মিথ্যা কথা চালু হয়ে আছে ! যার জীবনে বড়ো আদর্শ নেই, বড়ো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সাধ নেই, সেই শুধু ও রকম পাগল হতে পারে। একটা মেয়ের জন্য যে সব ভুলে যেতে পারে, সে কী মানুষ ? যার মনুষ্যত্ব নেই সে কী ভালেবাসতে পাবে ? আমায় নিয়ে যে যত পাগল হয়েছে, দেখেছি যে মানুষ হিসাবে সে-ই তত বেশি অপদার্থ !

আমিও একদিন পাগল হয়েছিলাম।

অঞ্জলি মিষ্টি করে একটু হাসে।

সে তো ছেলেমানুষি। আমিও তখন চাইতাম সবাই ও রকম পাগল হোক। পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পাগল করতে মজা লেগেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখলাম, কই, কাজের মানুষ তো পাগল হয় না ? জীবনে যে বড়ো কিছু করতে চায়, সত্যিসত্যি আমার প্রেমে পড়লেও আমার খাতিরে সেটা খারিজ করতে রাজি হবে না।

কেদার বলে, শুধু তোমার কেন, কোনো মেয়ের খাতিরেই রাজি হবে না।

অঞ্জলি বলে, আমিও সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। অকর্মণ্য বাজে লোকের একটা নেশাকে প্রেম বলে চালানো হয়। সত্যিকারের মানুষের প্রেমে বাড়াবাড়ি থাকে না।

কেদার একটু হেসে বলে, তুমি উপন্যাসের কত বড়ো বড়ো নায়ককে অমানুষ করে দিলে জানো ?

মস্ত মানুষ সব। একটা মেয়ের জন্য যাদের জীবনটা পশু হতে বসে তারা আবার মানুষ ! আমার গা ঘিনঘিন করে।

কেদার হেসে বলে, আর যারা উলটোটা করে ? মাঝে মাঝে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দেয় ?

অঞ্জলি একটু হাসে।

কেদারের মনে আলোড়ন তুলে দিয়ে যায় অঞ্জলি।

জীবন্ত বাস্তব একটা মানুষ অঞ্জলির দাদা অনাদি, তার বিজ্ঞান-চর্চা ছেড়ে দেবার কাহিনি আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে তার নিজের জীবনের আগামী দিনের সমস্যাকে। তাকেও আপস করতে হবে, টাকার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে, গীতা ছাড়বে না !

কিন্তু তার আদর্শটা কী ?

বড়ো ডাক্তার হওয়া আর গীতাকে পাওয়ার চিন্তা এতদিন যেন চেতনাকে তার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গীতার বাপের পয়সায় বিদেশে গিয়ে বড়ো ডাক্তার হয়ে এলে নীচের তলার আপনজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে, এতদিন এটাই ছিল তার কাছে আসল সমস্যা। শুধু গীতাকে অবলম্বন করে আরেকটি ডাক্তার পাল হয়ে এতকালের আত্মীয়বন্ধুদের ত্যাগ করে নতুন আত্মীয়বন্ধু খুঁজে নিয়ে যান্ত্রিক একঘেয়ে জীবনে সে কি সুখী হতে পারবে ?

আজ তার প্রথম মনে পড়ে যায় যে ও ভাবে বড়ো ডাক্তার হলে জীবনের কোন আদর্শটা যে তার ক্ষুণ্ণ হবে সে তা স্পষ্টভাবে জানে না !

ছেলেবেলা থেকে যাদের আপন বলে জানে তাদের ছাড়তে হবে—এটাই কী সব ?

সেবাব্রত তার আদর্শ নয়। ডাক্তার হয়ে বিনা ফি-তে রোগী দেখে বেড়িয়ে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন সে দেখে না।

কিন্তু তার স্বপ্নটা কী ?

গীতাকে যদি সে বাদও দেয় জীবন থেকে, ওভাবে বড়ো হবার কল্পনা বাতিলও করে দেয়—আত্মীয়বন্ধু নিয়ে সাধারণ ডাক্তার হয়ে সাধারণ জীবনটাই সে যাপন করবে !

একটু ছোটো স্কেলে গরিব মানুষের স্তরে ডাক্তার পালেরই যান্ত্রিক স্বার্থপর জীবন !

দেশের গরিব মানুষ, নিপীড়িত অসহায় মানুষদের জন্য তার মমতা আছে। গীতা অঞ্জলি জ্যোতিদের আড়াল করে মাঝে মাঝে ট্রামের রুগ্ণা বউটি সদলবলে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, ঘরে ঘরে অচিকিৎসায় বিনা চিকিৎসায় মানুষকে রোগে ভুগতে আর মরতে হয় বলে প্রাণটা তার ক্ষোভে ভরে থাকে, কিন্তু ওদের জন্য কী করবে তা তো সে কখনও ভাবেনি !

অনাদি তবু জানে কোন আদর্শটা সে ত্যাগ করছে। ব্যবসা যতই ব্যাহত আর সংকুচিত হোক বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞান-চর্চা করাই যে তার কর্তব্য, এটা সে স্বীকার করে।

তারও কী শুধু এইটুকুই আদর্শ—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়ে ডাক্তারি করা ?

গীতার স্বামী এবং বড়ো ডাক্তার হলে গরিব রোগীদের মনে মনে মমতা করার সুযোগ হারাবে—এইটুকুই তার আপত্তি ?

নিজের এই নতুন চিন্তার ফাঁকে অঞ্জলির কথা তার মনে পড়ে।

অঞ্জলির জন্য সে মমতা বোধ করে। সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধ।

অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাই তার জুটেছে অনুমান করা যায়। তবে অঞ্জলি কাবু হয়নি।

কে জানে কী ভবিষ্যৎ অঞ্জলির ?

৭

কেদার বাড়ি ফিরতেই অমলা বলে, জানো দাদা, জ্যোতিকে আজ একচোট নিয়েছে পরিমলদা।

তার বেশ খুশির ভাব। জ্যোতি আজ শান্ত লাজুক শুচিবাইগ্রস্তা বউ হয়েছে কিন্তু তার আগেকার পাগলামি আজও অমলা ক্ষমা করতে পারেনি। বোধ হয় নিরীহ লাজুক বউ হয়েও বাছবিচার ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে সে যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, এটাও অমলার পছন্দ হয় না বলে !

কী হয়েছে ?

যা হবার তাই হয়েছে। এত ন্যাকামি মানুষের সহ্য হয় ? কিছুদিন ধরে কেমন একটু গম্ভীর গম্ভীব ভাব দেখছিলাম পরিমলদার। জ্যোতিকেও কেমন যেন মনমরা মনে হচ্ছিল। দুজনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নিশ্চয়। আজ পরিমলদা আমায় আদা দিয়ে একটু চা করে দিতে বলেছিল, সর্দি হয়েছে। ওদের তো চায়ের পাট নেই, পরিমলদাই জোর করে বন্ধ করেছিল। জ্যোতি নিশ্চয় পরামর্শ দিয়েছিল। আমি চা করে নিয়ে গিয়ে পরিমলদার হাতে কাপটা দিয়ে ওদের বিছানায় একটু বসতে গেছি—জ্যোতি বললে কী, না ভাই বিছানায় বোসো না, তুমি রাঁধছিলে। শুনেই কী রাগ পরিমলদার ! একেবারে গর্জন করে ফেটে পড়ল। একটা মাতালের মেয়ে, ভদ্রতা জানে না, গেঁয়ো অসভ্য ভূত—যা মুখে এল তাই বলতে লাগল জ্যোতিকে। আমি যত বলি, থাক না পরিমলদা, ওতে কী হয়েছে—কে সে কথা শোনে !

জ্যোতি কী করল ?

আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছু বলল না ?

না।

বেলা তখন এগারোটা বাজে। হর্ষের শরীরটা খারাপ থাকায় সে আজ তাকে একটি রোগীর কাছে পাঠিয়েছিল—যেখানে যাওয়া উচিত ছিল হর্ষের নিজের। রোগীর অবস্থা দেখে সে হর্ষকে ডেকে নিতে লোক পাঠিয়েছিল, হর্ষ যায়নি। বলে পাঠিয়েছিল যা কিছু দরকার কেদার করলেই হবে।

তার এই বিশ্বাসে খুশি হওয়ার বদলে কেদার বিরক্তই হয়েছে। কারণ, রোগীর আত্মীয়স্বজনেব ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে হর্ষ যাই ভাবুক, এই ছোকরা ডাক্তারের উপর তাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। ওষুধ খাইয়ে ইনজেকশন দিয়ে দু-ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে রোগীকে লক্ষ করতে হয়েছে কেদারের। আবার সে বোধ করেছে অসহায় ভাব—হর্ষ ডাক্তারের রোগী যদি তার হাতে মারা যায় !

ক্রাইসিস্‌টা কেটে গেলেও খুশি হবার বদলে শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরেছে। খিদে পেয়েছে চনচনে।

অমলার কাছে জ্যোতির খবর শুনে সে শ্রান্তিক্লান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলে যায়।

ভাবে, এত তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া শুরু হল ?

অমলা বলে, তারপরে শোনো দাদা। সে এক অবাক কাণ্ড।

কেদার ভাবে, অমলাও আজকাল সাজিয়ে গুছিয়ে রস দিয়ে কথা বলতে শিখেছে !

অমলা বলে যায়, খানিক পরে বাজারে গিয়ে পরিমলদা মস্ত একটা ইলিশ মাছ আর মাংস কিনে নিয়ে এল। আমায় এ বেলা খেতে বলেছে।

ওদের দুজনেরই মাথা খারাপ।

আমায় কী বলল শুনবে ? বলল, কেদারকেও বলব ভাবছি, কিন্তু লজ্জা করছে। কেদার মাছ মাংস খাবে আর মনে মনে হাসবে।

কেদার সঙ্গে সঙ্গে বলে, যা, বলে আয়, আমিও খাব। খিদে পেয়েছে, রান্না হলেই যেন খবর পাই।

অমলা ঘরের বাইরে গিয়েছে, সে তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনে।

বলে, শোন, আগে বরং জ্যোতিকে জিজ্ঞেস করে আয়, আমি খেতে যাব নাকি। বলিস, আমি জানতে চেয়েছি।

অমলা একটু মুখ ভার করে চেয়ে থাকে।

কেদার বলে, এটা বুঝিসনে ? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ব্যাপার, পরিমলকে খুশি করতে গিয়ে হয়তো জ্যোতির মনে কষ্ট দিয়ে বসব। হয়তো ওদের ঝগড়াটা উসকিয়ে দেব। বুঝলি না ?

অমলা ঠেস দিয়ে বলে, বুঝেছি। কার জন্য তোমার আসল দরদ তা আমি জানি।

অমলা গিয়ে জ্যোতিকে কী জিজ্ঞাসা করে আর কী বলে সেই জানে, জ্যোতি নিজেই জবাব দিতে তার সঙ্গে নেমে আসে নীচে।

যখন তখন সময়ে অসময়ে কেদারের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে যতক্ষণ খুশি কথা বলার পালা তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে। অন্য বাড়ি থেকে নির্জন দুপুরে সে এ বাড়িতে এসে কেদারের সঙ্গে কত কথা বলে গেছে—এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর এমন সপ্তাহও গেছে ইতিমধ্যে কেদারের সঙ্গে যে সপ্তাহে মুখোমুখি দেখা পর্যন্ত হয়নি।

জ্যোতির মশলা-মাখা হাতে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ !

কপালে সে আজ সিঁদুরের ফোঁটা আঁটেনি।

কাছে এসে দাঁড়ায়। ম্লানমুখে হাসে।

অমলা দুজনেব মুখের দিকে তাকায়, অনিচ্ছুক কণ্ঠে বলে, আমি বরং যাই।

জ্যোতি বলে, না ভাই, যাবি কেন ?

কেদার চুপ করে থাকে।

জ্যোতি অমলাকে হাজির রাখতে চায়, তার মানেই সে আজ এখন প্রাণ খুলে কথা কইতে রাজি নয়। অমলার সামনে যে ভাষায় যে কথা বলা যায় শুধু সে ভাষায় সেই কথা সে বলবে।

কেদার ভাবে, তাই বলুক।

জ্যোতি বলে, কেদারদা, ও মানুষটাকে তুমিও বুঝতে পারনি, আমিও বুঝতে পারিনি। খড়কুটো স্রোতে ভেসে যায় দেখেছ ? সেই রকম মানুষ।

এতদিনে বুঝলি ?

বাবা কী আমাকে বুঝবার বুদ্ধি দিয়েছিল ? শুধু ৻৩৲ দিয়েছিল খানিকটা। যেটুকু বুঝলাম, যেমন বুঝলাম, তাই নিয়ে মরণ-পণ করলাম। কেদার বলে, জ্যোতি, আমার বড়ো খিদে পেয়েছে। তোদের ওখানে মাছ-মাংস খাব না নিজের ঘরে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি খাব বলে দে। চান করে খেতে যাই।

অপমানে কালো হয়ে যায় জ্যোতির মুখ।

তবু সে সতেজে বলে, আমি মাছ-মাংস রাঁধব, তুমি খাবে না ? তুমি এখুনি চান করে এসো। ওনার ফিরতে দেরি হলে আগে আমি তোমায় খাইয়ে দেব।

অমলা বলে, আমার খিদে পায় না ?

তুই-ও আয় না ?

বোনেদের তেলের শিশি থেকে একটু নারকেল তেল মাথায় দিয়ে, রান্নার সরষের তেল থেকে কয়েক ফোঁটা নিয়ে গায়ে এখানে ওখানে ঘষে কেদার স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় আর ভাবে, নিষ্ঠা দিয়ে কী হয় ? যা চাই আদায় করে কী হয় ?

ভাবে, কাজ নেই আর বড়ো কথা ভেবে, তেজ দেখিয়ে। ডাক্তারি পাশ করেছে, ডাক্তারি ব্যবসায়ে বেশ দু-পয়সা আসবে, তাই নিয়ে খুশি থেকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।

স্নান করে কিন্তু সে বসে থাকে। পরিমল ফেরবার আগে ওপরে গিয়ে জ্যোতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসবার মতো তেজ নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না।

পরিমল ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরেই। নীচের তলা থেকেই কেদার শুনতে পায় তার কর্কশ চিৎকার—রান্না হয়েছে ?

জ্যোতি বোধ হয় কেদারের নিমন্ত্রণ গ্রহণের কথাটা তাকে জানিয়ে দেয়। কারণ, খানিক পরে পরিমল নীচে এসে বলে, চান করেছ ? এসো তবে বসে পড়ি।

এইমাত্র যার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গিয়েছিল, এখন তাকে খুব শান্ত মনে হয়। মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। এটা প্রায় স্থায়ী হয়ে উঠেছে আজকাল।

আসন পেতে দিয়ে মায়া বলে, কেদারদার কল্যাণে আজ অনেকদিন বাদে একটু মাছ-মাংসের স্বাদ পাব। এবার থেকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করতে হবে আপনাকে।

পাশাপাশি তারা বসে। দুটি কার্পেটে বোনা আসনে—একটিতে লেখা 'জয় গুরু অন্যটিতে 'হরেকৃষ্ণ'।

পরিবেশন করে জ্যোতি।

পরিমলের মা একবার সামনে এসে দুটো কথা বলে সেই যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে, আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। মুখখানা তার ঘন মেঘে ঢাকা আকাশের মতো গম্ভীর।

জনার্দনও তার ঘর থেকে বার হয় না।

কেদার বলে, আবার তাহলে মাছ-মাংস ধরলে ?

হ্যাঁ, নইলে খাব কী ? যত-সব ধাপ্পাবাজির ব্যাপার। বলে কিনা তোমার যেমন পেশা তার সঙ্গে সব কিছুর সামঞ্জস্য করতে হবে, খাওয়া দাওয়া বেশভূষা রীতিনীতি মানিয়ে নিতে হবে। হিন্দুমতে চিকিৎসা করবে, তোমার কী স্বেচ্ছাচার মানায় ? লোকে শ্রদ্ধা করবে কেন, তোমার সাধনা সফল হবে কেন ! নিজের পেশায় তোমার নিজের বিশ্বাস আসবে কেন, মনে জোর পাবে কোথা থেকে। যত সব হাম্বাগি কথা। এখনও যেন সে সব দিন আছে, লোকে দেখতে আসছে বাড়িতে তুমি কী খাও আর কী কর—দেখে তবে তোমার ওষুধ খাবে।

বুকে অনেক কথা জমেছে পরিমলের, একটু আলগা দিতেই গড়গড় করে বেরিয়ে আসে !

কেদার বলে, এ সব বলেছিল কে ?

উনি বলেছিলেন। সব ব্যাপারে কর্তালি আর বাহাদুরি করা চাই তো !

কেদার হেসে বলে, তুমি যে সব ফাঁস করে দিলে পরিমল ! বিয়ের আগে থেকেই হুকুম মেনে আসছ তাহলে ?

পরিমল গরম হয়ে উঠেছিল, তার পরিহাসে লজ্জা পেয়ে সেও একটু হাসে। একটু সহজ হয়ে আসে পরিবেশ। যদিও জ্যোতির ওপর তার গভীর বিরাগটাও ফাঁস হয়ে গেছে তার কথায়, সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কেদার ভেবেচিন্তে বলে, জ্যোতির কী হয়েছে জানো ? মধ্যবিত্তের ঘরে নিয়মনিষ্ঠার অভাবটা ওর অসহ্য ঠেকত। সেকালে যেমনই হোক সংসারে আচারবিচার নিয়মনীতি বাঁধা ছিল—আমরা সে সব প্রায় ভেঙে দিয়েছি অথচ সে জায়গায় নতুন কিছু তৈরি করিনি। তার ফলে আমাদের ঘরে ঘরে অনিয়ম বিশৃঙ্খলা আর বিরোধ। হর্ষকাকার ড্রিঙ্ক করার হ্যাবিটটার জন্যই জ্যোতির বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেছে। ও এখন পুরোনো চালচলন চায়। ওর ধারণা, ব্রতপুজো আচারনিষ্ঠা নিরামিষ খাওয়া এ সব হলে সংসারে সুখশান্তি বজায় থাকে।

তাই কি হয় ?

কিছুতেই হয় না। নতুন অবস্থা জীবনে নতুন বিরোধ সৃষ্টি করেছে, পুরোনো দিনের চালচলন দিয়ে কী সে বিরোধ ঠেকানো যায় ? বেচারির উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, কিন্তু ছেলেমানুষ তো !

পরিমল ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ছেলেমানুষ !

মাছের পাত্র হাতে জ্যোতি সামনে দাঁড়িয়ে, পরিমলের ঝাঁঝালো ব্যঙ্গোক্তি তার কানে কেমন হয়ে বাজে সেই জানে।

কেদারের পাতে মাছ দিতে দিতে সে বলে, ছেলেমানুষ আমার রান্না খারাপ হলেও নিন্দে করতে পাবে না কিন্তু।

পরিমলকে বলে, শুধু মাছ দিয়ে পেট ভরিয়ো না। মাংস আছে।

কেদার মুগ্ধ হয় না।

সে জানে, এটাও জ্যোতির একগুঁয়েমি। স্বামী-ভক্তিপরায়ণা শান্ত নিরীহ বউয়ের ভূমিকা সে অভিনয় করে যাবেই—স্বামী জুতো মারলেও বিচলিত হবে না। অথচ মুখ দেখে বেশ বোঝা যায় ভিতরে তার ঝড় উঠেছে। কিন্তু বাইরে সে তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেবে না। কথাটা সত্যি। সে শুধু তেজ শিখেছে। তেজ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।

জ্যোতির রান্না হয়েছে চমৎকার। খিদেও কেদারের ছিল জোরালো। তবু মাছ-মাংস তার মুখে বিস্বাদ লাগে।

কোথায় গিয়ে ঠেকবে জ্যোতি ?

কেদারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ জ্যোতি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সৃষ্টি করে নেয়।

কেদারকে বলে, আমি দুপুরে বাবার ওখানে যাব। আমি যাওয়ার খানিক বাদে তুমিও এসো অনেক কথা আছে।

কথা তোর চিরদিন থাকবে।

কী করব ? বুদ্ধি যে কম। ভাবি এক রকম, হয় আরেক রকম।

এত কাছে বাপের বাড়ি, সেখানে যেতে জ্যোতি জমকালো শাড়ি পরে। অবশ্য সাধারণভাবেই পরে।

যাবার সময় বলে, একলা যেতে দিতে শাশুড়ি আপত্তি করছিলেন ! কী অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো সংসারে ? কত শতবার একলাটি এসেছি গিয়েছি, কোনো দোষ হয়নি, আজ বিয়ে হয়েছে বলে আর একলা যাওয়া উচিত নয়।

তোর বুদ্ধি সত্যি কম। এই সোজা কথাটা বুঝিস না ?

আরও কিছু বুঝবার আছে না কি ?

আছে বইকী। বিয়ে হওয়ার জন্যে কি তোর একলা যাওয়া আসা দোষের হয়েছে ? মাসিমার কাছে এটা আগেও দোষের ছিল কিন্তু তখন কিছু বলার অধিকার ছিল না। এখন তুই ছেলের বউ, এখন আপত্তি করার অধিকার জন্মেছে।

জ্যোতি সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ।

কিছুক্ষণ পরে কেদার ও বাড়ি যেতেই মোহিনী বলে, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে কেদার। ডাকতে পাঠাব ভাবছিলাম। আমার বাঁ হাতটায় কী হয়েছে দ্যাখো দিকি। হাতে জোর পাই না, আঙুলগুলি সোজা করতে কষ্ট হয়।

হর্ষকাকাকে দেখাননি ?

ওকে আবার কী দেখাব !

কেদারের যেন তাক লেগে যায় !

মনে পড়ে, দরকার হলে সুন্দরীও কখনও ডাক্তার পালকে বলে না আমার কী হয়েছে দ্যাখো তো—ডাক্তার পালের কোনো বন্ধু-ডাক্তারকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করায় !

কেদার সবে পরীক্ষা শুরু করেছে, জ্যোতি এসে বলে, মা, তুমি কি আর কেদারদাকে হাত দেখাবার সময় পাবে না ? কেদারদা পালিযে যাবে ? আমাকে শিগগির ফিরতে হবে, দরকারি কথাগুলো সেরেনি ?

মোহিনী হাতটা টেনে নিয়ে বলে, তাই নে বাছা, তাই নে। কীসেব যে তোর অত দবকারি কথা !

কেদার একটা সিগারেট ধরায়। জ্যোতির অধৈর্য ভাব তাকে আরও চিন্তিত করে দিয়েছে।

জ্যোতি বসতেই সে তাকে বলে, তোকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে ? এত সব যে করছিস পরিমলের জন্য, বাড়ির টাকা পর্যন্ত চুরি করে দিচ্ছিস তোর ওপরে অশ্রদ্ধা জন্মে যাবে না ? তুই বলেছিলি, যাব জন্য চুরি করলাম সে কখনও চোর বলতে পারে ! সংসারে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু করলে তার ফল ফলবেই, এখন সেটা বুঝতে পারছিস তো ?

তুমি নীতি কথা শুরু করলে কেদারদা। অবস্থাটা বিচার না করেই সরাসরি বলছ কাজটা অন্যায় হয়েছিল। তোমরা তো দরকার হলে পেটের মধ্যে ছেলেকে মেরে ফ্যালো—সেটা কী খুন কবা হয় ? ও সব করেছিলাম বলে কিছু হযনি। সব কথা শোনো আগে, তবে তো বুঝতে পাববে।

কেদার লজ্জা পেয়ে ভাবে, আজও জ্যোতিকে এঁটে উঠবার সাধ্য তার হয না। সব কথা না শুনে একটা মন্তব্য করে বসা সত্যই তাব উচিত হযনি।

জ্যোতি খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসল ব্যাপার কী দাঁড়িয়েছে জানো ? মোটে পসার হচ্ছে না। রোগীপত্র কিছু কিছু হয়, ওযুধপত্রও বিক্রি হয়, কিন্তু পয়সা নেই। বেশিব ভাগ গরিব বোগী, অল্প পয়সায় চিকিৎসা সারতে চায়। বোজগার হচ্ছে না, সে দোষটা এখন চাপছে আমার ঘাড়ে। আমি বলেছিলাম এ রকম করো, ও বকম করো—তাতে সুবিধে হচ্ছে না, কাজেই দায়ি হলাম আমি।

কিন্তু পরিমল জানে না, খুব নামটাম না হলে কবিরাজিতে বেশি পয়সা নেই ! সাধারণ একজন ডাক্তারেব চেয়ে সাধারণ কবিরাজের আয় ঢের কম ?

সেই জন্যই বলছে টাকাটা অন্যভাবে লাগালে ভালো হত। ভালো দোকান করার বদলে একটা ওযুধ বার করে। বিজ্ঞাপন দিলে নাম হত, পয়সাও হত।

তার মানে লোক-ঠকানো ?

তাই তো বলছে। প্রথমে অনেক বড়ো বড়ো কথা ভেবেছিল, সব নাকি বাজে। খাঁটি ওযুধ দিতে হলে বেশি দাম পড়ে—লোকে কেনে না। অনেক রোগীর টোটকা চিকিৎসাও করতে হয়। লোক না ঠকিয়ে উপায কী ?

কেদারের মুখ কঠিন দেখায়।

বিয়ের আগে তো এ সব কথা বলেনি ? ক-মাসে জ্ঞান জন্মে গেছে, না ?

আমার কথা শুনে চলত কি না।

তা তো চলবেই। নইলে কী এত বড়ো ডাক্তারের এমন মেয়েটিকে বাগানো যায়—এতগুলি টাকা মেলে ?

জ্যোতি নতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তা নয় কেদারদা। মানুষটা ও রকম নয়। তোমরা টের পাওনি, কেবল আমার দিকটা দেখেছিলে, নইলে ও মানুষটাও কম পাগল হয়নি। ওভাবে ঠকায়নি, টের পেয়ে যেতাম না ? মুশকিল হল, আমরা অন্য দিকগুলো হিসেব করিনি। সংসারে শুধু প্রেম নিয়ে চলে না।

অঞ্জলির কথা মনে পড়ে যায় কেদারের। অঞ্জলিও এই সত্য আবিষ্কার করেছে শেষ পর্যন্ত। প্রেমকে যারা বাস্তব জীবনের চেয়ে বড়ো করে তোলে, জীবনের আর সমস্ত সার্থকতা তুচ্ছ হয়ে যায় যাদের কাছে, মানুষ হিসাবে তাদের বেশি মূল্য নেই !

নারীপুরুষ নির্বিচারে এই নিয়ম।

কত সোজা কথাটা ! অবাস্তব প্রেমের মূল্য কতটুকু ! সেই প্রেমের দামে সস্তা মানুষ ছাড়া কে নিজেকে বিলিয়ে দেবে !

জ্যোতি তার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলে, এখনও আসল কথায় আসিনি কেদারদা। এতক্ষণ তো শুধু কীসে কী হয়েছে বললাম।

আসল কথাটা কী ?

আমায় বলছে বাবাকে ধরে ব্যবস্থা করে দিতে। আরও কিছু টাকা পেলে গুছিয়ে নিতে পারবে। কোন মুখে বাবাকে আবার বলব বলো তো ?

হর্ষকাকার টাকা কই ? রোগীও কমিয়ে দিয়েছেন---ডাকলে যান না।

মুশকিল কী হয়েছে জানো ? আমি বললে বাবা দেবে—যেভাবে পারে জোগাড় করবে। ও মানুষটাও তা জানে। মনে মনে কী বলছে বুঝতে পারি। এই বুঝি তোমার ভালোবাসা, আমার জন্য এটুকু করতে পারবে না ? আমি কোন মুখে বলব সেটা ভাবে না। কত হম্বিতম্বি করেছি, কবিরাজ কী মানুষ নয়, আমায় সুখে রাখতে পারবে না ? আজ গিয়ে উলটো গাইতে পারি আমি ?

এই নিয়ে ঝগড়া হয়েছে ?

না। ঝগড়া ঠিক নয়। আমি যা বলছি ঠিক তার উলটোটা করছে। সর্বদা বিরক্ত ভাব, যখন তখন সামান্য ব্যাপারে চটে যাচ্ছে। তবে আসল কারণ ওটা।

কেদার ভেবেচিন্তে বলে, হর্ষকাকাকে বলবি তাছাড়া উপায় কী ?

কেদার শুধু জ্যোতির দিকে হিসেব করে না, হর্ষের কথাও ভাবে। ঘর সংসার সম্পর্কে হর্ষের উদাসীনতা বাড়ছে, আদুরে মেয়ের জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করতে গিয়ে এ ভাবটা যদি কেটে যায় !

জ্যোতি বলে, আমি পারব না।

কিন্তু—

কিন্তু জানি না। আমি মরে গেলেও বাবাকে বলতে পারব না।

সেই তেজি জ্যোতি ! তেজ তার এখনও যায়নি !

কেদার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তুই আবার মাছটাছ খাওয়া ধরেছিস ?

না।

যত রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলি সব বজায় রেখেছিস ?

সব।

কেদার একটু ভেবে বলে, তোর ইচ্ছা আমি হর্ষকাকাকে বলি ? জ্যোতি চুপ করে থাকে।

আমি পারব না জ্যোতি।

আমিও তাই ভাবছিলাম। এ কী মানুষ পারে ?

বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরেই একটু বসে কেদার। মনটা একটু গুছিয়ে ব্যাগ নিয়ে ডিসপেনসারিতে যাবে।

ভেতরের বারান্দায় মেয়েদের গল্প হচ্ছে শুনতে পায়। মায়া আর তার মা নীচে এসেছে।

মোহিনী বলে, এমন বউ জুটেছে বলব কী তোমাকে। একলাটি গটগট করে বাপের বাড়ি চলে গেল। সধবা মানুষ, মাছ খাবে না। যতদিন পরিমল বাড়িতে মাছ আসতেই দিত না, কেউ খেত না, তখন না খেয়েছিস আলাদা কথা। পরিমল আবার মাছ ধরেছে, কিন্তু বউয়ের ধনুক-ভাঙা পণ। একবার যখন ছেড়েছে আর ধরবে না।

মায়া বলে, দাদার মনটাও বিগড়ে গেছে। বিয়ের সময় পণ নিল না, এখন টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে। একটা ওষুধ বার করেছে, বাজারে ছাড়লেই ঢের লাভ হয়—কিন্তু ছাড়বে কী দিয়ে ? টাকা কই ? কত টাকা ধার করে দোকান খুলেছে, আবার কোথা থেকে ধার পাবে ? বাবা শ্বশুরের কাছে চাইতে বলছিল। দাদা রাজি হয় না। বউদি যে রাগ করবে।

কয়েক মিনিট পরে জ্যোতিও ফিরে আসে। তখনও বারান্দায় তাকে নিয়েই আলোচনা চলছিল।

জ্যোতি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই চুপ হয়ে যায়।

জ্যোতির স্পষ্ট দৃঢ় গলা শোনা যায়, একটা ভালো খবর আছে মা। একলাটি গেলাম বলে তোমরা রাগ করেছ। আমি কী নিজের গরজে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম ?

মায়া বলে, কী খবর বউদি ?

জ্যোতি বলে, তোমার দাদার ওষুধটা বাজারে দেবার জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মা বলেছে আগেই ক-খানা গয়না আমায় দিয়ে দেবে, বাকিটা পরে পাব।

কেদার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পথে নেমে যায়।

হাসবে না কাঁদবে সে ভেবে পায় না।

এবারও জ্যোতি কারও ভরসায় না থেকে নিজে হাল ধরেছে।

এবারও সে হার মানিয়েছে কেদারকে।

এই মেয়েকে যদি ছেলেবেলা থেকে সংসারের স্রোতে গা ভাসিয়ে বেরিয়ে বড়ো হতে না দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা যেত, তার এই অবাস্তব মিথ্যা প্রেমের চেয়ে ঢের বড়ো বড়ো সার্থকতা জীবনে আছে এ চেতনা জাগানো যেত—কত দিক দিয়ে সে ধন্য করতে পারত নিজেকে আর সমাজ জীবনকে ?

হর্ষের সেই রোগীটিকে দেখতে যেতে হবে।

কেদার এ বেলা হর্ষকে পাঠাবার চেষ্টা করে। বলে, ওরা আপনাকেই চায় কাকা। আপনার গিয়ে দেখে আসা উচিত।

তুমিই তো বেশ চালাচ্ছ। ক্রাইসিসটা পার করিয়ে দিয়েছো।

তবু—

আর অত পারিনে বাবা। এ রোগীটা ভালো করলে, এবার থেকে ওরা তোমাকেই ডাকবে।

হর্ষ হাসবার চেষ্টা করে।

৮

রোগী মারা গেছে। কিন্তু উপায় কী ? ক-দিন পরে মায়ার কাছে টাকা চায়। বলে, আমি ডেকেছি বলে এমনি এসেছিলেন, নইলে আগে ফি না নিয়ে বেরোতেন না।

না ডাকলেই হত ডাক্তার পালকে।

তোমার বন্ধুকে বাঁচাবো বলেই ডাকা হয়েছে।

ও সময় কারও মাথার ঠিক থাকে ? কী লাভ হল ডাক্তার পালকে এনে ?

কেদার তিক্তকণ্ঠে বলে, ডাক্তার আনলে কী রোগী মরে না ? শেষ নিশ্বাস পড়া পর্যন্ত বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে রোগীকে। আমি কথা দিয়েছি পুরো ফি দেওয়া হবে।

মায়া বলে, এত টাকা এখন কোথায় পাবে বীণা ? রোগীকে বাঁচাতে পারল না তবু গরিবের কাছে এত টাকা কোন মুখে নেবে ? এর চেয়ে গোড়া থেকে দাদাকে দেখালেই ভালো হত।

কেদার চুপ করে থাকে।

হয়তো বেঁচেও যেত দাদার চিকিৎসায়।

মুখ কালো হয়ে যায় কেদারের।

ডাক্তার পালের তিরস্কার তার প্রাণে বিঁধে গিয়েছিল। জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারে কি না সন্দেহ।

তার আত্মবিশ্বাস নেই, সে সাহস পায়নি ! সেও ভেবেছিল ওই ইনজেকশনটা দেবার কথা, কয়েক ঘণ্টা আগে সেটা দিলেই যে বিজন বেঁচে উঠত এমন কোনো কথা নেই—কিন্তু ডাক্তার পালকে ডেকে না এনে তার তো সত্যই সাহস হয়নি ইনজেকশনটা দিতে !

কেন এ ভীরুতা ?

কিন্তু সত্যিই কী এ ভীরুতা ? আত্মবিশ্বাসের অভাব ? অথবা এর কারণ তার শিক্ষাদীক্ষার গলদ ?

রোগী মরবে কী বাঁচবে সে বিষয়ে নির্বিকার থেকে ডাক্তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করে যাবে, ডাক্তার পালের এ কথায় কিছুতেই সায় দিতে চায় না কেদারের মন।

ডাক্তার পালের পসারটাই টিকে থাকে কই এই নীতি পালিত হলে ? দু-টাকা চার-টাকা ফি-এর ডাক্তার যদি এই নীতি মেনে চলে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে চিকিৎসা চালিয়ে যায়, রোগীর মরণ-বাঁচন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে, রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়ালেও ডাক্তার পালকে ডেকে তার মত নেবার প্রশ্নটাও যে তাহলে বাতিল হয়ে যায়।

ক-জন রোগী সোজাসুজি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পালের কাছে যায় ? দু-টাকা চার-টাকার ডাক্তাররাই আগে চিকিৎসা শুরু করে, তাদের চিকিৎসাতে নির্ভর করেই বাঁচে মরে বেশির ভাগ রোগী। তাদের কাছ থেকেই বেশির ভাগ ডাক জোটে ডাক্তার পালের।

কেদার টের পায়, ডাক্তার পালের টাকাটা তার নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

তার যে টাকার কী টানাটানি সেটা সে আরেকবার অনুভব করে তীব্রভাবে।

নিজের ভালোমানুষি ছেলেমানুষির উপর তার ধিক্কার জন্মে যায়। আর সব ভুলে গিয়ে রোগীকে বাঁচাবার আদর্শটা আঁকড়ে থেকে লাভ তো তার হল এই। রোগীর চিকিৎসা করে নিজে তো একটি পয়সা পেলই না, ডাক্তার পালকে ডেকে আনার খেসারতটাও দিতে হবে তার নিজের পকেট থেকে !

দু-চারদিনের মধ্যে সে টের পায় শুধু এইটুকুই নয়, আরও একটা লাভ তার হয়েছে এই যে বিজনের মৃত্যুর জন্য মায়া তাকে দায়ি করে তার ওপর ভীষণ চটে গেছে।

সুধীরকে নিয়েও বিপদে পড়েছে কেদার।

দামি দামি ওষুধ দেয় কিন্তু কোনোই যেন ক্রিয়া দেখা যায় না ওষুধের। চিকিৎসা আরম্ভ করার আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি অবনতি ঘটতে থাকে সুধীরের।

রোগটা টের পাবার পর মানসিক আতঙ্কের ফলে প্রথম কয়েকদিন এ রকম হতে পারে। কিন্তু মানসিক ভয়-ভাবনা তো ওষুধের ক্রিয়া বাতিল করে দিতে পারে না। কোনো মানেই তাহলে থাকে না চিকিৎসার।

স্পেশালিস্ট বলে, কী ব্যাপার কেদারবাবু ? ডিরেকশনগুলি ঠিকমতো সব মানা হচ্ছে তো ?

আমি নিজে সব দেখছি সার।

তবে ?

হর্ষ শুনে বলে, ওষুধ কোথা থেকে নিচ্ছ ?

ওরাই কিনে আনে।

তুমি কিনে দিয়ো।

কিন্তু ততদিনে বিশ্বাস ও ধৈর্য ভেঙ্গে গেছে সুধীরের আত্মীয়স্বজনের। তার বাবা ভবেশ সবিনয়ে বলে, তোমার হাতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না কেদার। আমরা ওকে হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেব।

যেন কেদারের হাতেই ছিল সুধীরের প্রকৃত চিকিৎসার ভার। সে যেন গোড়াতেই হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলেনি, সুধীরের আত্মীয়স্বজনের পরিবর্তে সেই যেন বাড়িতে রেখে তার চিকিৎসা করাতে চেয়েছিল।

কিন্তু সত্যই কী সে দায়ি নয় একেবারে ? স্পেশালিস্টেব নির্দেশ পালনের দায়িত্ব কী ডাক্তারের মতো পালন পরার বদলে যন্ত্রের মতো পালন করেনি ? প্রত্যক্ষভাবে সেই তো তদ্‌বিব করেছে সুধীরের, নিজের হাতে তার দেহে প্রয়োগ করেছে ওষুধ। ডাক্তার হয়ে তার যদি খেয়াল না থাকে যে মানুষের বাঁচন-মরণ যে ওষুধের ওপর তা নিয়েও চলেছে ভেজালেব কারবার, সুধীরের অনভিজ্ঞ আত্মীয়স্বজন সেটা কী করে খেয়াল রাখবে, সাবধান হবে ?

সেই দিন রাত্রে কেদার ঘুমোতে যাবে, নগেন বিশ্বাস এসে একেবারে তাব পা জড়িযে ধরে।

আমার ছেলেটাকে বাঁচাও বাবা।

পঞ্চাশ বছর বয়সে নগেনের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, জীর্ণ-শীর্ণ শবীরটা বাঁকা হয়ে গেছে অভাবের চাপে।

এই গলি থেকে বেরিয়েছে আরও সবু অন্ধকার গলি। তাবই মধ্যে একটা একতলা বাড়িব একখানা ছোটো কোটরে ভাঙ্গা বাক্‌সো-প্যাঁটরা ছেঁড়া তোশক বালিশ নিয়ে বাস করে নগেনের পরিবার।

দশ-এগারোবছরের ছেলে। হিক্কা তুলতে তুলতে বাঁকা হযে যাচ্ছিল। দেখেই আক্কেল গুড়ুম হযে যায় কেদারের।

ক-দিন হল ?

আজ এগারো দিন।

কে দেখেছিলেন ?

নগেন কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, ডাক্তার দেখাবো কোথা থেকে বাবা ?

অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে দেখবে কী একবার ? কেদার ভাবে সে যদি শেষ মুহূর্তে এই ছেলেটার চিকিৎসার ভার নেয়, একে বাঁচাবার জন্য সম্পূর্ণরূপে সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপব নির্ভর করতে পারবে, বাধ্য হয়েই নির্ভর করতে হবে তাকে। অন্য কোনো ডাক্তার ডাকার প্রশ্নই নেই, হাসপাতালে পাঠাবার সময় বা অবস্থাও নেই ছেলেটার, যা কিছু করা সম্ভব তার নিজের করা ছাড়া উপায় নেই।

ছেলেটা মরে গেলে নিজের বিবেকের কাছেও তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

একটা ঝোঁক চেপে যায় কেদারের। স্লিপ পাঠিয়ে সে হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ আনায়। ওষুধ কেনার পয়সা পর্যন্ত নগেনের হাতে নেই। পরে যেভাবে পারে ওষুধের দাম দিয়ে দেবে জানাতে গিয়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলে।

সারারাত জেগে কেদার লড়াই করে ছেলেটার জীবন রক্ষার জন্য।

বাইরে ভোরের আলো ফোটে, ঘরে তার আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। তখনও ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে ভেবে নতুন ডাক্তার কেদারের হৃদয় গর্বে ভরে যায় বটে কিন্তু মনে মনে সে ভাবে যে গীতা তার এ রকম ডাক্তারি করার খবর পেলে কী বলবে !

সকালবেলাও ঝোঁকটা তার কাটতে চায় না।

বাঁচবে কী মরবে ছেলেটা সুনিশ্চিত হয়ে যায়নি। মরার সম্ভাবনাটাই বেশি। সে এসে না পড়লে যে মরণটা এসে যেত আধঘণ্টার মধ্যে, সে শুধু সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত এবং আরও কিছু সময়ের জন্য।

এখন ওকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব।

কেদারের প্রবল ইচ্ছা জাগে, নিজেই সে লড়াই করবে শেষ পর্যন্ত, ছেলেটা বাঁচবেই না এমন তো নয়, এখন বরং আশা করা যায় যে বেঁচেও যেতে পারে।

হাসপাতালে না পাঠিয়ে এখানে রেখে নিজে সে ওকে বাঁচাতেও পারে।

জোর করে ইচ্ছাটা দমন করে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে নিজে সঙ্গে গিয়ে পরেশকে কেদার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসে।

বিকেলে ঘরে বসে আছে কেদার। ভাবছে বেরোবার কথা। গীতা ডেকে পাঠিয়েছে, একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দরকার। যাবার সময় পরেশের খবর নিয়ে যাবে। ছেলেটার মরণকে ঠেকানো যদি না যায়, উপায় কী। সে জন্য নিজের সব কাজ বন্ধ করে ঘরে বসে থেকে লাভ নেই।

ক-দিন খাটুনি গিয়েছে বেশি রকম। কাল রাত্রি জাগতে হয়েছে। সারাদুপুর ঘরে বিশ্রাম করে একটু ভালো লাগছে কেদারের। শরীর খারাপ হলে মন তার অল্পে বেশি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এটা চিরকাল ধরে কতবার কত ব্যাপারে সে লক্ষ করেছে, অথচ প্রয়োজনের সময় খেয়াল থাকে না। ক্ষোভদুঃখের পরিমাণটা যখন বড়ো বেশি মনে হয় দেহের দুর্বলতার জন্য, তখন কথাটা স্মরণ করে অনুভূতিকে সংযত করার চেষ্টা করতে ভুল হয়ে যায় কেন কে জানে !

পাশের বাড়ির দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ন্ত রোদের রঙিন আলো ঘরে এসে পড়েছে ঘুপচি জানালা দিয়ে। সিগারেট নেই।

না থাক, সিগারেট ছাড়াও তার চলবে।

মায়া এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, কেদারদা, একটা খারাপ খবর আছে।

চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই মায়া চিরকাল তার সঙ্গে কথা কয়। কখনও ঘরের ভেতরে এক পা আসে না। দু-চারমিনিটের বেশি কথাও বলে না কখনও। বাজেবাজে কথা বলে না একেবারেই। কেদার বুঝতে পারে মায়া খোঁচা দিতে, ঝাল ঝাড়তে এসেছে।

খারাপ খবর ? কী খবর মায়া ?

নগেনবাবুর ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়েছিল জানেন তো ?

কী হয়েছে ?

কেদার জানে কী হয়েছে। তাই শান্তভাবেই প্রশ্ন করে।

মারা গেছে শুনলাম।

কখন ?

ও বেলা, হাসপাতালে নেবার কিছুক্ষণ পরেই। দাদা শুনে এসে বলল।

পরিমল বাড়ি আছে ? একবার আসতে বলবে ?

দাদা আসছে।

পরিমল আসছে। দু-চারমিনিটের মধ্যে সে-ই এসে খবরটা দিত কেদারকে। তবু নিজে এসে আগে খবরটা না জানিয়ে চলল না মায়ার ! অথচ মায়াকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। ছুটে এসে খবর দেবার মতো উত্তেজনার তাগিদ তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

ওকেও বাঁচাতে পারলেন না ?

মায়ার স্বর বড়ো তীক্ষ্ণ শোনায়।

বাঁচল কই ?

বাঁচবার আশা ছিল না বলে বুঝি আপনি চলে এলেন ?

জবাব না পেয়ে মায়া বলে, সুধীরেরও বুঝি কিছু করতে পারলেন না, তাই হাসপাতালে পাঠাতে হল ?

এবারও কেদার চুপ করে থাকে।

পরিমল ঘরে এসে বসে। মায়া চলে যায়।

নগেনবাবুর ছেলেটা মারা গেল। হাসপাতালে নেবার আধঘন্টাব মধ্যে। হাসপাতালে সময় মতো গেলে বাঁচানো যেত। গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়নি।

এগারো দিন শুধু টোটকা চিকিৎসাই চলছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে।

পরিমল বলে, যন্ত্রের মতো চিকিৎসা কবার শিক্ষাই পাই আমবা ডাক্তার-কবিরাজরা। শিক্ষাটা তাই অসম্পূর্ণ থাকে। মনেরও শিক্ষার দরকার ওই সঙ্গে। বিদ্যা যদি না কাজে লাগে তাব দাম কী ? কিন্তু সে ব্যবস্থা নেই। এটা তারই ফল।

কেদার সায় দেয়।

শুধু কী এই একটা ? কত অন্যায় আর অসঙ্গতি যে চোখে পড়ছে একে একে। এদিকটা আমাদের ভাবতেও শেখানো হয় না। অন্তত একটু সূত্র ধরিয়ে দিলে গোড়ার দিকে অনেকে নিজে নিজেই ভেবেচিন্তে এ সব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে পাবে। গোড়ায় একটু ইঙ্গিত পর্যন্ত পাই না আমরা।

সত্যি বড়ো বিশ্রী ব্যবস্থা। শিক্ষার শেষে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন শিক্ষা পেতে হয়, আগের শিক্ষাদীক্ষা ধারণা বিশ্বাস অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো সংস্রব থাকে না তার।

বাস্তবকে বাদ দিলে শিক্ষা এই রকমই হয়।

সামঞ্জস্য ঘটাতে মাথা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়।

বিদেশে শুনেছি এ রকম খাঁপছাড়া শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সোভিয়েটে নাকি সামাজিকভাবে কাজে লাগে না এমন কোনো শিক্ষাই নেই। সেখানে সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষাটা একজনের পেশা না হয়ে যাতে দশজনের কাজে লাগে।

ধীরে ধীরে তারা কথা বলে, থেমে থেমে। এ সমস্যার বৃহত্তর দিক আছে অনুভব করে দুজনেই, তার স্বরূপটা কী তাদের ধারণায় আসে না। চিকিৎসকেরা কর্তব্য করে না, ভুল করে, অন্যায় কবে, কিন্তু এটাই যে শেষ কথা নয় তারা বোঝে। আসল কথা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার আয়ত্তে আসে না।

এই আলোচনার মধ্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় গীতা, অনেকটা মায়ার মতো ভঙ্গিতে।

পরিমল উঠে দাঁড়ায়।

নমস্কার। ভালো আছেন ?

নমস্কার। দেখতেই তো পাচ্ছেন ভালো আছি।

পরিমল সস্মিতভাবে একটু হাসে। কেদার বলে, তুমি ভুল করলে গীতা, ওটা দেখার প্রশ্ন নয়। ভালো আছেন মানে আপনাকে দেখে খুশি হয়েছে।

পরিমল নীরবে গীতার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

গীতা গম্ভীর মুখে ঘরে ঢোকে। পরিমল বিছানার যেখানে বসেছিল সেইখানে বসে বলে, তুমি খুশি হয়েছ কী ?

তা কী বলে দিতে হবে ?

হবে না ? এত দিনের মধ্যে একবার যেতে পারলে না, খবর পর্যন্ত দিলে না একটা। যেচে এসে হাজির হয়েছি খবর জানতে। খুশি না হওয়া আশ্চর্য নয় তো মোটেই !

ক-দিন বড়ো বিব্রত হয়ে ছিলাম গীতু—একটু করুণ সুরেই কেদার বলে, তুমি না এলে আজ নিশ্চয় যেতাম। ক-দিন যে কীভাবে কেটেছে—

এক মুহূর্তে খুশি আর উৎসাহিত হয়ে গীতা বলে, বিলেত যাবার চেষ্টা নিয়ে তো ? কী হল শেষ পর্যন্ত ? কেন যে তুমি ইতস্তত করছ !

না, ঠিক সে জন্য নয়। কয়েকটা কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তার চেয়ে বিব্রত ছিলাম কতগুলি নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। আজও মনটা ভালো নেই। একটি রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, আজ সে মারা গেল।

সব রোগী কী বাঁচে ? সে জন্য ডাক্তারের বিচলিত হলে চলে না।

ওই রোগী বাঁচত—ডাক্তাররা বাঁচালেন না। ডাক্তার হয়ে এটা সইছে না।

ডাক্তার পালের কথাটা গীতাকে বলা যায় না, তাই কেদার বলে চলে, কেবল এটা নয়, আরও রোগীকে মরতে দেখেছি ডাক্তারের জন্য। আর দেখেছি, ডাক্তার ঠকাচ্ছে রোগীকে, ভয় দেখাচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে—

সবাই ?

না না, সবাই নয়। কিন্তু ফিয়ের দু-টাকা চার-টাকা না পেলেও রোগীকে মরতে দেন না এমন ডাক্তার ক-জন আছে ভাবি।

ডাক্তারকেও বাঁচতে হবে।

শুধু ব্যবসা করার জন্যই কী ডাক্তার হলাম ? ফি বেশি হবে, এই জন্যই কি বিলাত যাব ?

রোগীর মরণে মনমরা কেদারকে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রায় অপদার্থ ভণ্ডের মতো ঘৃণা করে গীতা। তীক্ষ্ণসুরে প্রায় ধমক দিয়ে বলে, কী বলছ তুমি পাগলের মতো ?

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ভাঁজ করে টেনে নিয়ে যায় কপালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। অবিশ্বাসের বিদ্বেষে তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি এসে যোগ দেয়, বারো-তেরোবছর বয়স থেকে তুমি না স্বপ্ন দেখে আসছ একদিন মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে ? লোকে বলবে কেদার ডাক্তার ম্যাজিক জানে, মরা বাঁচায় ? দুমাস আগেও না তুমি বলতে যত কিছু শিখবার আছে আগে শিখে তবে ডাক্তারি করবে ? আজ আবার উলটো গাইছ কেন ?

উলটো গাইছি না গীতু।

এক-একদিন তোমার মুখে গীতু শুনলে গা জ্বলে যায়।

একটু আহত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কেদার চা শেষ করে সিগারেট ধরায়।

ও রকম মন্তব্যের এ রকম জবাবই গীতা পছন্দ করে বেশি।

বিষাদ ও বিতৃষ্ণার চাপে জোর করে আদায় করা অবসরটুকু কথার ফাঁকিতে ভরে তুলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না।

এদিক দিয়ে গীতার সঙ্গে তুলনা হয় না। রাগ অভিমান জানিয়ে সহিষ্ণুতা থেকে বা প্রশ্রয় দেবার উদারতা থেকে তার কাছে মুখর জবাব না পাওয়া গীতা মেনে নেয় না, আঘাত তাকে ছুঁয়ে একটু আহত করেছে জানালেই সে সন্তুষ্ট হয়। এটা গড়ে উঠেছে তাদের মেলামেশার শেষের দিকে। যখন থেকে মান অভিমান রাগ ও বিরোধের ছোটোবড়ো সংঘাতগুলি শুধু শূন্য-ভরা বুদ্‌বুদের মতো হওয়ার বদলে জীবনের বাস্তবতাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

তার নীরবতায় শান্ত হয়ে গীতা বলে, উলটো গাইছ না যদি সত্যি হয়, তোমার কথার মানেটা তবে কী ? কী বলতে চাও তুমি ?

আমি বলতে চাই বিলাতি ডিগ্রি পেলেই ভালো ডাক্তার হয় না।

তা হয় না। কিন্তু হয়ও তো ?

সেটা ডিগ্রি পাবাব গুণে নয়। ডাক্তাবের নিজের গুণে।

নিজের গুণে ছাড়া ডাক্তার ভালো হবে কী করে ? সে তো ধরা কথা। বিদেশে বেশি শেখবার সুযোগ তো পায়, এ দেশে যার ব্যবস্থা নেই। সেই জন্যেই তো বিদেশি ডিগ্রির দাম।

কেদারের মুখে বিষাদেব থমথমে গাম্ভীর্য নেমে আসে।

সেই জন্যেই কী ? না বেশি পয়সা পাওয়া যায় বলে, লোকেব অন্ধ মোহ আছে বলে ? হর্ষ কাকারও তো বিলাতি ডিগ্রি, অনেক বেশি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে দেশি ডাক্তারের চেয়ে। কোনো কাজেই তো সে বিদ্যা লাগে না, মোটা ফি আর পসার ছাড়া। নিজের খেয়ালে বোগীকে পর্যন্ত মরতে দেন—মেরেই ফেলেন এক রকম।

এবার গীতা রাগ করে।—মেরে ফেলেন তো কী ? তুমি তো হর্ষ ডাক্তাব নও ! হলে অ্যাদ্দিনে বিলেত যাবার খরচা নিয়ে বিয়ে করে ফেলতে। বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এলে তুমিও তো হর্ষ ডাক্তাব হয়ে যাবে না।

সে কথাটাই ভাবছি।

গীতার সঙ্গে এমন একটা কলহ হয়ে যায় কেদাবের যে কোনো পক্ষ থেকেই বেশি বকম কড়া কথা একটিও না বলা হলেও ছাড়াছাড়ি হবাব পব দুজনেরই মনে হয় তারা যেন আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

রাগারাগি আগেও তাদেব হয়ে গেছে অনেকবাব, এমন কথাও একজন আরেকজনকে বলেছে তখন যা মনে হয়েছে অমার্জনীয়, ও রকম মন্তব্যের পর এ জীবনে আব তাদের কথাবার্তা হওয়াও সম্ভব নয়।

কিন্তু দুদিনে মিটে গেছে সে বিবাদ, মনেও থাকেনি কী নিয়ে তাদের ঝগড়া বেধেছিল।

এতটুকু তিক্ততার জের টেনে তাদের চলতে হয়নি। আঘাত যে করেছে সে হয়তো কোনো চেষ্টাই করেনি মিটমাটের, একটা মিষ্টি কথা বলে মিলিয়ে দিতে চায়নি রূঢ় কথাব স্মৃতি।

আহত হয়ে যাব রাগ করার কথা সেই হয় তো গিয়ে বলেছে, বাগ কবনি তো ?

এবার যেন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে থাকে তাদের মনান্তরের পবের দিনগুলি, রাগ অভিমানের জ্বালা কমবার বদলে বাড়তে থাকে !

আগের কলহগুলি তাদের হত সামান্য ব্যাপার নিয়ে, যত তীব্র হোক মনান্তব, জীবনের কোনো গভীর স্তরকে ভিত্তি করে বাড়তে না পেরে অবিলম্বে শূন্যে মিলিয়ে যেত। সে সব ছিল যেন নিছক দুটি বন্ধুর রাগারাগির খেলা। অথবা যদিও তাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন ধরে এবং বিয়েটা হয়েও হয়নি আজ পর্যন্ত, তবু ঝগড়াঝাঁটিটা এ পর্যন্ত যেন তাদের হয়েছে দাম্পত্য কলহের মতোই !

এবার টান পড়েছে মর্মে, তাই বাইরে গুরুতর রূপ না নিলেও সংঘাতটা ভিতরে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এ তো রাগারাগি নয়, খেয়ালের সংঘাত নয় যে রাগ কমলে আর খেয়াল উপে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসাবনিকাশ বোঝাপড়ার ভিত্তে চিড় ধরেছে তাদের অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সংযত আলোচনায়। আজ বোধ হয় এই প্রথম বাস্তব মূল্য বিচার হয়ে গেছে তাদের অনেকদিনের সহজ সাধারণ মেলামেশায় গড়ে-ওঠা ভালোবাসার।

বেশি কথা তাদের বলতে হয়নি। ভূমিকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাদের নেই। গীতা যা বলেছে তাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে কেদারের ভালোবাসায় তার সন্দেহ জেগেছে।

মৌখিক কোনো কনট্র্যাক্ট না করে থাকলেও এ বোঝাপড়া তাদের মধ্যে হয়েছিল যে কেদার বিলাত গিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলে তাদের বিয়ে হবে। বিলাত যাবার আগেও বিয়েটা অনায়াসে হয়ে যেতে পারত।

এ দেশে পাস করে কেদার বিলাত থেকে ডিগ্রি আনতে যেতে রাজি আছে এটুকু জানালেই ডাক্তার পাল যে বিয়েতেও মত দিত, বিলাতি ডিগ্রি আনবার খরচ দিতেও রাজি হত তাতে গীতার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিয়ার সাথে মিলনের ও জীবনে উন্নতিলাভের এই সহজ সাধারণ পথটা গ্রহণ করতে কেদার রাজি হয়নি। ডাঃ পালের কাছ থেকে এ রকম কোনো প্রস্তাব যে এসেছে, বা গীতা যে তাকে এ রকম কোনো পরামর্শ দিয়েছে এবং সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তা নয়। এ জানাটা মনে মনে গড়ে উঠেছে আপনা থেকে।

এই সহজ উপায়টা কেদার না নেওয়ায় গীতাও খুশি হয়েছে।

তার জন্য বা বড়ো হবার জন্যও কেদার নিজেকে সস্তা করতে চায় না এ যেন তারই গৌরব, তারই কৃতিত্ব। তার এই মনোভাব থেকে কেদারও নিজের মধ্যে জোব পেয়েছে।

কিন্তু আজ গীতা স্পষ্টই বলে গেছে যে তার বাপের পয়সায় বড়ো হতে না চাক, সেই অজুহাতে বড়ো হবাব সাধটাও যে কেদার বর্জন করবে, নিজে ও জন্য চেষ্টা করবে না, এটা বরদাস্ত করবে না গীতা।

অন্য কিছুর জন্য হোক বা না হোক, তাব জন্যই কেদারকে বড়ো ডাক্তার হতে হবে, দেশ-জোড়া নাম-ডাক পসার অর্জন করতে হবে।

টাকার প্রশ্নও অবশ্য আছে এর মধ্যে, কিন্তু টাকাটা গীতার কাছে তুচ্ছ না হলেও বড়ো কথা নয়, বেশি টাকা রোজগার না করেও যদি কেদার বড়ো ডাক্তার হতে পারে গীতার তাতে কোনো আপত্তি নেই !

তোমার যেন উৎসাহ দেখছি না কোনো বিষয়ে।

কোনো বিষয়ে বলতে গীতা কোন বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছিল বুঝতে দেরি হয়নি কেদারের। দেরি হওয়ার কথাও নয়। এগারো দিনের মধ্যে একবার সে চোখের দেখা দেখতে যায়নি এই নালিশ দিয়ে কথা আরম্ভ করেছিল গীতা, প্রশ্ন করেছিল, আমায় দেখে তুমি খুশি হয়েছ কী ? নানাকথার মধ্যে তারপর এই অভিযোগটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্রীভাবে।

অসন্তোষের সূচনা শুধু গীতার মধ্যেই দেখা দেয়নি।

এবার সে কী করবে সুনিশ্চিতভাবে ঠিক না করায়, ঠিক করাব জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শ না চালিয়ে যাওয়ায়, বাড়ির লোকের মধ্যেও অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছে, ক্ষীণ অস্পষ্ট এবং মৃদু হলেও অনুযোগ আসছে নানাভাবে।

প্রমথ কয়েকবার বলেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে : তুমি কী ভাবছ বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক, এবার তো মনস্থির করে ফেলতে হয় !

অন্যেরা কথাটা তোলেন অন্যভাবে।

এবার বিয়ে করতেই হবে তাকে।

তার মনস্থির করার প্রশ্নটা মোটামুটি দাঁড়িয়েছে এই। ডিসপেনসারি করে দিয়ে তাকে ডাক্তারিতে বসাবার ক্ষমতা প্রমথের নেই।

অনেকদিন আগে থেকেই এদিক ওদিক খোঁজখবর নেওয়া এবং আলাপ-আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি একটি মেয়ের খবর পাওয়া গেছে, বাপের সে একমাত্র মেয়ে, ভালোরকম ডিসপেনসারি দেবার জন্য বাপ মোটা টাকা দিতে প্রস্তুত।

তবে, একটা কথা এই যে মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়। একেবারে চলনসই সাধারণ মেয়ে।

বাড়ি থেকে তাই কেদারের ওপর বেশি চাপ দেবার ভরসা কারও হচ্ছে না। মেয়েটিকে একবার দেখে আসবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আর ভাসা ভাসা উপদেশ শোনানো হচ্ছে যে সাধারণ বাঙালি সংসারে মোটামুটি সাধারণ মেয়েই ভালো। জীবনে উন্নতি করাটাই বড়ো কথা। উন্নতির জন্য স্থায়ীভাবে গুছিয়ে বসবার এমন সুযোগও মানুষের হঠাৎ মেলে না।

কেদার জানে, মেয়েটি দেখতে শুনতে মোটামুটি একটু ভালো হলে ইতিমধ্যে তার ওপর জোর জবরদস্তি শুরু হয়ে যেত।

ডাঃ পালের মেয়েটাকে যখন খুশি বিয়ে করে সে বিলাত যেতে পারে কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলেও ডাঃ পালের কাছে সে টাকা নিতে রাজি নয়—এ খবরটা জানলে বাড়ির লোক কী করত কে জানে!

বড়ো সস্তা মনে হয় নিজেকে কেদারের।

সংসার তার দাম কষে দিয়েছে। তার একমাত্র ক্রেতা মেয়ের বাপেরা, তারা ছাড়া একটা ওষুধের দোকান খোলবার টাকা তাকে দিতে কেউ রাজি নয়। ডিসপেনসারি দিয়ে বসতে হোক, বিলাত গিয়ে নিজের দাম বাড়াতে হোক, কোনো মেয়ের বাপের শরণ নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথও তার সামনে খোলা নেই। নিজের বাজারদর বাড়াবার জন্যে আরও সময় ও শক্তি নষ্ট করতে তার দ্বিধা দেখে গীতার মনে পর্যন্ত আপশোশ জেগেছে, বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এসে তার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনে তার উৎসাহের অভাব জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে গীতার মধ্যে। তাদেব এতদিনেব সহজ সুন্দর প্রেম সমস্যা হয়ে উঠেছে গীতার কাছে।

এখন তার যে দাম গীতা তাতে সন্তুষ্ট নয়।

পাড়ার ত্রৈলোক্য মজুমদার ধনী ব্যবসায়ী, স্বদেশি বলেও নাম আছে। কয়েক রকম ব্যাবসা তাব আছে, তার মধ্যে জীবনবীমা কোম্পানি ও কটন মিল প্রধান। জাতীয় শিল্পের উন্নতির দ্বারা স্বদেশ সেবার ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার প্রচুর পুরস্কার সে পেয়েছে, যা ধরেছে এবং ধরছে তাই সোনা হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে।

কেদার একদিন সকালে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে, ত্রৈলোক্যের মোটরগাড়িও প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরবার পথে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ত্রৈলোক্য মুখ বার করে ডাকে, ওহে কেদার, শোনো শোনো। তোমাকেই খুঁজছিলাম যে!

আমাকে?

তোমাকে। এসো, গাড়িতে এসো।

সেখান থেকে হেঁটে ত্রৈলোক্যের বাড়ি তিন মিনিটের পথ। কেদার বলে, আপনি এগোন, এই মোচাটা বাড়িতে দিয়েই আমি আসছি।

ত্রৈলোক্য বলে, আরে এসো। মোচা তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার লোক আছে আমার। চলে এসো।

হঠাৎ ত্রৈলোক্য মজুমদারের এই গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় কেদার কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। সে আর কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসে।

ত্রৈলোক্য অনুযোগ দিয়ে বলে, ভালোভাবে পাস-টাস করেছ শুনলাম ? বেশ বেশ। সুসংবাদটা জানানো তো উচিত ছিল একবার !

পুরানো সুসংবাদটা এতদিনে ত্রৈলোক্যের কানে গিয়েছে এতে কতখানি কৃতার্থ হবে কেদার ভেবে পায় না। বাড়ি বয়ে গিয়ে সুসংবাদটা তাকে জানিয়ে আসবার দায়িত্বও কী হিসাবে তার ঘাড়ে চাপে সে বুঝে উঠতে পারে না।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে কেদারকে ত্রৈলোক্য আবও খাতির কবে। নিজের বসবাব ঘরে আদর করে বসিয়ে চা ও খাবার আনতে হুকুম দেয়। আর কথা যা বলে তাতে কেদারের ভালোমন্দ সম্পর্কে তার বেশ খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ পায।

মতলব একটা আছে ত্রৈলোক্যের বুঝতে দেরি হয় না কেদারের। কিন্তু তার কাছে ত্রৈলোক্যের মতো লোকের কী দরকার থাকতে পারে সেটাই সে বুঝে উঠতে পারে না।

বোঁচা-খাঁদা মেয়েও নেই ত্রৈলোক্যের যে তাকে ঘর-জামাই করার ইচ্ছা জাগবে !

হর্ষের ওখানেই বসছ, না ? ওখানেই থাকবে নাকি ?

না। কিছুদিনের জন্য আছি।

তারপর কী করবে ভাবছ ? চাকরি নেবে না প্র্যাকটিস করবে ?

ঠিক করিনি কিছু এখনও।

তা বটে। তা বটে। হঠাৎ কিছু ঠিক কবা কঠিন বটে এখন। যা স্থির করবে, সমস্ত ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে তার উপর। কত দ্বিধা, কত ভয-ভাবনা আসে এ সময়টা ! আমি জানি, আমারও এমন অবস্থা এসেছিল এক সময় !

এতক্ষণ কেদারের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলায় ছলনা চালবার পর এবার প্রথম নিজের কথা আরম্ভ করার সময় মুখের ভাবটা বদলে যায় ত্রৈলোক্যের,—চাকরি করব, না, ব্যাবসায় নামব যখন স্থির করতে হয়েছিল। আজও মনে আছে সে দিনগুলির কথা। চাকরিতে আর কিছু না হোক মাস গেলে মাইনেটা বাঁধা। ব্যাবসায়ে যদি সুবিধা না হয ! উঠতে না পেরে যদি তলিয়ে যাই ! মনটা কীসে ঠিক করেছিলাম জানো কেদার ? দেশের কথা ভেবে। ভাবলাম, একমাত্র শিল্পের উন্নতিতেই যখন দেশের উন্নতি, রিস্ক থাকলেও এদিকেই নেমে পড়ি। তা, ভুল করিনি, কি বলো, অ্যাঁ ?

নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই গভীর সন্তোষের হাসি হাসে।

তাকে মহাপুরুষ বলে মানতে আগে কেদারের সংশয় থাকলেও এখন যে তাব সব সংশয় মিটে গেছে তাতে যেন আব তার সন্দেহ থাকে না, এখন থেকে কেদার তার ভক্ত হয়ে থাকবে নিশ্চয় !

কেদার চুপ করে থাকে।

কিন্তু ত্রৈলোক্য নিজেব ভাবেই মশগুল ! সে বলে চলে, দিবারাত্রি খাটতে হয়েছে, দাঁত কামড়ে লেগে থাকতে হয়েছে। লোকে ভাবে, দেশের নামে কিছু করলে বুঝি সেটা সহজে হয়। তাই যদি হত, তবে সবাই কী আর করত না ? আমার কাছে এসে চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করত ? শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। সত্যি বলছি তোমায়, শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না—নিষ্ঠা চাই, পরিশ্রম চাই, ইনিসিয়েটিভ চাই, জীবনে উন্নতি করা কী মুখের কথা—টাকা করা ?

কেদার ভাবে এত কথার পর তাহলে জীবনে উন্নতি করা এসে দাঁড়াল টাকা করায় !

কী আর বলা যায় ! টাকার জন্য নিজের দেশকে বিদেশের কাছে বিক্রিও তো করেছে মানুষ। এ ভদ্রলোক তাদেরই শিষ্য !

কেদার চুপ করে থাকে।

আমি বলছিলাম কী জানো, একটা পেটেন্ট ওষুধের কারবার শুরু করব ভাবছি।

কিছু আজেবাজে কথার পর আচমকা কাজের কথা আরম্ভ করার স্বভাবগত অভ্যাস বজায় রেখে ত্রৈলোক্য বলে, কিছুদিন থেকে চিন্তা করছিলাম এ বিষয়ে। এই এক ব্যাবসা যা শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে চলে, আর সহজে অল্প টাকাতে হয়। সাধারণ কয়েকটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ বানিয়ে শিশিতে ভরে বেশ জমকালো লেবেল-টেবেল দিয়ে বাজারে ছাড়লেই হল। গোড়ায় খুব ফলাও করে বিজ্ঞাপন দরকার—একবার দাঁড়িয়ে গেলে সে খরচও কমিয়ে দেওয়া যায়। অ্যালোপ্যাথি আর কবরেজি এই দুটো ডিপার্টমেন্ট যদি খোলা যায় একটা কোম্পানি দাঁড় করিয়ে, আর যদি অ্যালো-কবরেজি নতুন ধরনের ওষুধ ছাড়া যায় বাজারে—

ত্রৈলোক্য বলে যায়, কেদার শোনে।

দেশে ডাক্তার অল্প, হাসপাতাল ডাক্তারখানা অল্প। চিকিৎসার ব্যবস্থা যেটুকু আছে দেশে, খরচ দিয়ে সেটা কাজে লাগাবার পয়সা নেই বেশির ভাগ লোকের।

অথচ দেশটা রোগ-ব্যারামে ভরা !

তার ওপর লোকগুলি অশিক্ষিত, মনগুলি কুসংস্কারে পরিপূর্ণ।

পেটেন্ট ওষুধের ব্যাবসা চালাবার এমন ফিল্ড আর কোনো দেশে নেই। ঘরে বসে চকখড়ির গুঁড়োতে একটু নিমের আরক মিশিয়ে কাগজের প্যাকেটে ভরে গালভরা নাম দিয়ে ফিরি করে কতলোক দিব্যি পয়সা রোজগার করছে !

পেটেন্ট ওষুধের বড়ো কারবার যত আছে তার চেয়ে বোধ হয় ঢের বেশি ক্যাপিট্যাল খাটছে দু-শো পাঁচশো হাজার টাকার ছোটো ছোটো অসংখ্য কারবারে। বড়ো কোম্পানিগুলি দামি ওষুধপত্র নিয়েই থাকে, ছোটোগুলির সঙ্গে তাই কম্পিটিশন নেই। কোনো বড়ো কোম্পানি যদি বড়ো স্কেলে এক সঙ্গে দুরকম ওষুধপত্রের কারবার চালায়, দেশজোড়া ছোটো ছোটো কারবারগুলি উৎখাত করে অনায়াসে সে ফিল্ডও দখল করতে পারে। বড়ো স্কেলে ছোটো কারবারিদের টেকনিক ফলো করলেই হল।

ত্রৈলোক্য তাই ভাবছে, লাখ তিনেক টাকা খরচ করে একটা কারবার ফাঁদবে।

কেদার আর মুখ না খুলে পারে না, বলে, কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবু, ভালো ওষুধ না দিলে—

ভালো ওষুধ দেব বইকী। সবাই যা কিনেছে তার চেয়ে ভালো ওষুধ না দিয়ে কী আর খারাপ কিছু বাজারে ছাড়ব ? তবে কী জানো—

ত্রৈলোক্য কয়েক মুহূর্ত বক্তব্যটা মনে মনে আউড়ে নেয়। এ সব বোকার কাছে সাবধানে কথা বলা দরকার। বলে, অন্ধকে আলো দান করা পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কাজ বিলাতি ওষুধের মতো দামি ওষুধ কেনবার কি ক্ষমতা আছে এ দেশের লোকের ? আমি কী ভাবিনি ওদিকটা, দেশের জন্য এত করছি, এত ভাবছি ! যা হবার নয় সে স্বপ্ন দেখে লাভ কী ? যখন সেদিন আসবে, খাঁটি স্বাধীনতা আমরা পাব,—ত্রৈলোক্যের চোখে মুখে যেন স্বপ্নের গরিমা নেমে আসে,—লোকের যখন ক্ষমতা হবে যেমন রোগ তার উপযুক্ত ওষুধ কিনবার, চিকিৎসা করাবার, তখন কী আর সাধারণ চলনসই ওষুধ বাজারে ছাড়ব, না তার দরকার হবে, না লোকে তা কিনবে ?

কেদার মনে মনে বলে, লোকে কিনবে না সেটাই হবে আসল কথা !

ত্রৈলোক্য বলে যায়, যে ওষুধ দেব, কিছু তো উপকার হবে তাতে ? চার পয়সা দামের মাজন দিয়ে যে কাজ চালায় তাকে আট আনা এক টাকা দামের ভালো পাউডার বা পেস্ট দিতে চেয়ে লাভ কী ? সে কিনবে না, কিনতে পারবে না। সস্তা মাজন ভালো নয় বলে তৈরি বন্ধ করলে, সে দাঁতই মাজবে না। চকখড়ি আর দু-চারফোঁটা নিমের আরকের একটু তো উপকার আছে ? তা থেকেও বেচারি বঞ্চিত হবে। ম্যালেরিয়ার কথা ধরো। ভালো কুইনিন, জোলাপের ওষুধ, পিলের ওষুধ এ সব পুরো পরিমাণে দিয়ে ওষুধ বেচতে গেলে দাম পড়ে যাবে কত ! ক-জন কিনতে পারবে ? তার চেয়ে দু-গ্রেন কুইনিনও যদি পেটে পড়ে সেটা কি ভালো নয় ?

কেদার মনে মনে বলে, কী যুক্তি !

বলে—ভাবে যে মনে মনেই শুধু মন্তব্য করছে কেন, মুখ খুলে তর্ক জুড়তে পারছে না কেন ? ত্রৈলোক্যকে চটাতে সাহস হচ্ছে না ? পেটেন্ট ওষুধের কারবার খোলা সম্পর্কে তাকে ডাকবার কারণটা জানবার কৌতূহল তার আছে বটে কিন্তু ত্রৈলোক্যের কাছে কোনো উপকার লাভের লোভ তো তার একফোঁটা নেই ! তবু যেন ত্রৈলোক্যেব কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বেধে যাচ্ছে।

যাক গে, ও সব পরের কথা, পরে হবে।

ত্রৈলোক্য এবার আসল কাজের কথায় আসে।

তোমায় কেন ডেকেছি বলি। চাকরির দিকে যেয়ো না, তোমার তা দরকার হবে না। আমার এই কারবারে তোমায় নিয়ে নেব ভাবছি। চাকরি তোমাকে করতে হবে না, কিছু শেয়ার তোমায় দিয়ে দেব। আর যদ্দিন না তোমার শেয়ার থেকেই যথেষ্ট টাকা পাও তোমায় কিছু কিছু হাত-খরচা দেব। এদিকে তুমি স্বাধীনভাবে নিজের প্র্যাকটিসও গড়ে তুলতে পারবে।

আমার কাজ কী হবে ?

তোমার কাজ ? তোমার খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ হবে। কারবারের মূল ব্যাপারে থাকবে তুমি। সে জন্যেই তো মাইনের ব্যবস্থা না করে তোমায় কারবারের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। কী কী পেটেন্ট ওষুধ বেশ চলবে, আমিই তা বলে দেব। তুমি লাগসই প্রেসক্রিপশন তৈরি করে দেবে। সহজে সস্তায় ওষুধটা হয়, অথচ—

এতক্ষণ প্রতিবাদ না করার দুর্বলতায় নিজের ওপর কেদার বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এবার সে ত্রৈলোক্যকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে, আমি ওর মধ্যে নেই। আমায় মাপ করবেন।

কেন ?

ত্রৈলোক্য একেবারে আশ্চর্য হয়ে যায়। সদ্য পাস করা একজন যুবক যে তার সঙ্গে কারবারে নামবার সুযোগ পাওয়ার সৌভাগ্যে গদগদ হয়ে পড়ার বদলে সোজাসুজি তার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, ত্রৈলোক্যের যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

কেদার বলে সহজভাবে, ও সব জুয়াচুরির মধ্যে আমি নেই।

জুয়াচুরি ? এবার নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না ত্রৈলোক্যের। মুখটা তার হাঁড়ি হয়ে যায়।

জুয়াচুরি কী বলছ হে ?

স্রেফ জুয়াচুরি। আপনার কথামতো যেমন এত বেশি রোগ আর চিকিৎসার অভাব কোনো দেশে নেই, তেমনি বোধ হয় পেটেন্ট ওষুধের এমন জুয়াচুরির ব্যাবসাও কোনো দেশে এত বেশি চলে না—এমন খোলাখুলিভাবে। বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে মানুষ মেরে আপনি টাকা রোজগার করতে চান, এটা জুয়াচুরি নয় ? আপনাদের মতো যারা এ কাজ চালাচ্ছে ধরে ধরে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত !

এত কড়া করে এত কথা সে বলতে চায়নি ! ডাক্তারদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভটা ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল, রোগীদের ঠকাবার দেশ-জোড়া এই ভয়াবহ অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তার জ্বালা কম ছিল না। বলতে গিয়ে সামলাতে পারল না।

তারপর অবশ্য ত্রৈলোক্য ভদ্রভাবে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। ভদ্রভাবে এই জন্য যে এ সব মাথা-পাগলা যুবককে খেপাতে তার ভয় করে—কী করে বসে তার ঠিক কী !

৯

জ্যোতি হাসি ফুটিয়েছিল সকলের মুখে। আবার সেই মুখগুলিতে অন্ধকার নেমে আসে।

জ্যোতি সত্যই যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল যে স্বাস্থ্যের বিকাশে, সুখস্বপ্নের মতোই যেন তার সেই স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি উপে যেতে আরম্ভ করে।

কে জানে কী হল জ্যোতির !

বাড়ির লোকের কী হয়েছে বোঝা যায়।

ডাক্তারের চোখ নিয়ে আর জ্যোতির অবস্থা অনুমান করার প্রয়োজন হয় না। তার দিকে তাকালেই সেটা টের পাওয়া যায়।

মেয়েদের কানাকানি একেবারে অভিযোগ হয়ে পৌঁছায় জনার্দনের কাছে, এ কী বউ আনা হল তাদের শুদ্ধ পবিত্র বংশে !

জনার্দন গর্জন করে ওঠে।

পরিমল বলে, আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আমাদের বংশ পবিত্রই আছে।

সকলের মুখ কালো হয়ে থাকলেও সেটা বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ হত না। পরিমল যখন তাব পক্ষে আছে, কবিরাজিতে তার পসার ও আয় অল্পে অল্পে বাড়ছে, মুখের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সকলের কেটে যাবেই। কিন্তু জ্যোতির স্বাস্থ্য হানিই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা।

পসার ও উপার্জন সামান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠেছে নিজের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর পরিমলের অন্ধ বিশ্বাস এবং কেদারদ্রের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে বিদ্বেষ। সে যেন আজ ভুলে গেছে ডাক্তারি শিখতে না পারার জন্য তার আপশোশ ও আত্মগ্লানি, কবিরাজ হতে হয়েছে বলে সকলের কাছে লজ্জা বোধ করা !

হয়তো তার আজকের মনোভাবটা তারই প্রতিক্রিয়া !

কেদার বলে, জ্যোতিকে একটু ভালোভাবে পরীক্ষা করানো দরকার।

পরিমল বলে, পরীক্ষা করেছি।

কেদার বলে, এখন থেকেই ভালোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত কিন্তু।

পরিমল বলে, চিকিৎসা করছি বইকী।

কেদার বলে, কী জান ভাই, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা নিজে না করাই ভালো।

পরিমল বলে, নিজে কেন করব ? পূর্ণেন্দু সেনকে দেখিয়েছি, তাব ব্যবস্থামতো ওষুধপত্র দিচ্ছি।

কেদার তবু হাল ছাড়তে চায় না। আবার বলে, এখন হর্ষকাকার কাছে গিয়ে থাক না ? প্রথমবার এ সময়টা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকাই ভালো।

পরিমল আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তা কী আমি বুঝি না ? কিন্তু সাহস পাচ্ছি না ভাই। ওখানে পাঠালেই ওর বাবা এ চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করবেন। আমি ভরসা করতে পাচ্ছি না।

কেদার নির্বাক হয়ে থাকে।

জ্যোতিকে সে বলে, তোর না এত বুদ্ধি, এত জোর ? বাবার কাছে গিয়ে থাকার ব্যবস্থাটুকুও করতে পারছিস না ?

জ্যোতি শীর্ণমুখে হেসে বলে, কী হবে গিয়ে ?

চিকিৎসা হবে। বাঁচবি।

ইস্ ! তোমাদের চিকিৎসাতেই যদি মানুষ বাঁচত তবে আর ভাবনা ছিল না।

হর্ষকাকার চিকিৎসাতে বিশ্বাস করিস না তুই ?

বাবার কথা আলাদা। বাবা তো আর নিজে চিকিৎসা করবে না।

মেয়েকে দেখতে এলে একদিন জামাইয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যায় হর্ষ ডাক্তারের।

পরিমল অবশ্য হর্ষের সম্মান রক্ষা করেই ঝগড়া করে, হর্ষ খুব বেশিরকম চটে গেলে অগত্যা তাকে চুপ করে যেতে হয়। শ্বশুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করাটাও তার পেশা ও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শের খাতিরে মানতে হয়েছে।

শেষে হর্ষ বলে, আমি আর সাতদিন দেখব। আরও যদি খারাপ হয় জ্যোতির শরীর, জোর করে আমি ওকে নিয়ে যাব বলে গেলাম।

পরিমল বলে, জোরের দরকার কী ? আমি তো বেঁধে রাখিনি আপনার মেয়েকে। আপনার মেয়ের ইচ্ছা হলে এখুনি সে যাক না আপনার সঙ্গে।

কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক পরিমল, দিন দিন তার মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হতে থাকে।

মাঝখানে একটু উন্নতি হয় জ্যোতির চেহারার।

পরিমল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু মাসখানেক পরেই আবার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে যায় জ্যোতির স্বাস্থ্য।

কয়েকটা বিশেষ উপসর্গ দেখা দেয় তার, যা ডাক্তার কবিরাজ কেন মেয়েদের কাছেও অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

কেদার কথা বন্ধ করে দেয় পরিমলের সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কিন্তু সেটা বজায় রেখে চলা সম্ভব হয় না জ্যোতির জন্য।

জ্যোতি এসে বলে, তুমি চিরদিন ঠিক উলটো বুঝে এলে কেদারদা। এতদিন আমাকে বাপের কাছে পাঠাবার জন্য ধস্তাধস্তি করলে, আর মানুষটা যখন নিজেই ভড়কে গিয়ে পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছে তখন রইলে চুপ করে! এত কাণ্ড করার পর বাচে এখন আমাকে পাঠায় কী করে ?

তাই নাকি ? হর্ষকাকাকে বলব নেওয়াবার ব্যবস্থা করতে ?

জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমি বললাম ওর কথা। পাঠাতে চায় না বলে তুমি রাগ করেছ, তোমার ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে চাই। ওর দোষ নেই—আমিই রাজি নই বাবার কাছে যেতে।

ও! বুঝেছি এবার। পরিমলের বদলে তোর ওপর রাগ করতে বলছিস তো ?

তাই করো!

স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়েছে তার বিবর্ণ মুখে উগ্র একগুঁয়েমির ভাব।

নিজের প্রেমকে সার্থক করার পর আজ যেন তার দরকার পড়েছে আরও বেশি প্রাণান্তকর চেষ্টায় বাজি জিতবার পর সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবার অনিবার্য প্রক্রিয়া ঠেকানো।

পরিমল তার কবিরাজি ওষুধটি যথানিয়মে বাজারে ছেড়েছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কিন্তু তার আশা সফল হয়নি। নিত্য নতুন এ রকম কত ওষুধ বেরিয়ে বাজার একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, তার মধ্যে নতুন একটা ওষুধকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়।

আসল কথা বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের বিরাট ব্যাপক অভিযান এবং সেটা টেনে চলা।

তাতে অনেক টাকা দরকার।

অত টাকা পরিমল কোথায় পাবে ?

কেদার তাকে এদিকটা খেয়াল রাখতে বলেছিল। কিন্তু পরিমল গ্রাহ্য করেনি।

তার ওষুধের নাকি অসাধারণ গুণ। যে কোনো পেটের অসুখ এ ওষুধ খেলে তিন দিনে সেবে যাবে—কলেরায় পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার সঙ্গে এ ওষুধ খাওয়াবাব ব্যবস্থা করলে রোগী নিশ্চয় সেরে যাবে।

গুণের কদর হবে না জগতে ?

কিন্তু জ্যোতির মার গয়না বিক্রিব টাকা শেষ হয়ে গেছে, আর বিজ্ঞাপন দেবার সাধ্য পরিমলের নেই—মানুষ যে গুণের কদর জানে তার প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি। তিন মাসে ওযুধ বিক্রি হয়েছে মোটে সাতান্ন প্যাকেট।

এতে অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু ছিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওষুধটা বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে এটাই তো শুভ লক্ষণ। প্রতিমাসে আট-দশ প্যাকেট বিক্রি বেড়েছে।

বিজ্ঞাপনটা চালিয়ে যেতে পারলে বাড়তে বাড়তে একদিন ওষুধটা যে মাসে সাতান্ন শো ফাইল বিক্রি হবে না এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু বিজ্ঞাপন চালাবে কে ?

কেদার তখন জ্যোতিকে সাবধান করে দিয়ে বলে, এ রকম অস্থিবতা তো মারাত্মক ? পরিমল বাস্তব হিসাব করছে না, তাড়াতাড়ি দাঁও মারবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এ ভাবে কেউ কিছু করতে পারে ? ধীরে ধীরে উঠতে হবে পরিমলকে, আর কোনো পথ নেই।

জ্যোতি ক্লান্তকণ্ঠে বলে, সেটা বুঝিয়ে দাও।

আগে তো এ রকম ছিল না পরিমল ?

আমি বিগড়ে দিয়েছি বলতে চাও তো ?

জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে।

কেদার মাঝে মাঝে তাকে বলে, ও বাড়িতে গিয়ে তো থাকতে পাবিস এখন ?

জ্যোতি বলে, না আমি বেশ আছি।

ডিসপেনসারি থেকে বেলা এগারোটার সময় সেদিন কেদার বাড়ি ফিরেছে, মায়া এসে বলে, আজ বউদিকে বিছানা নিতে হল। ক-দিন থেকে বলছি সবাই—

হয়েছে কী ?

মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর।

বেশি জ্বর ?

মন্দ নয়। দেখে আসুন না একবার ?

কেদার ভাবতে ভাবতে উপরে যায়।

পরিমল বাড়ি ছিল না। জ্যোতি চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে ছিল, মায়ার ডাকে চোখ মেলে কেদারকে দেখে আজও সে একটু হাসবার চেষ্টা করে।

মোহিনী এসে বলে, তুমি একবার পরীক্ষা করে দ্যাখো না কেদার ?

জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করে কী হবে ? আমি ডাক্তারিতে বিশ্বাস করি না।

কেদার বলে, বিশ্বাস নাই বা করলি। আমি শুধু পরীক্ষা করব।

কী দরকার ? মিছে শুধু জ্বালাতন করা।

পরীক্ষা না করেই কেদারকে নীচে নামতে হয়।

ঘণ্টাখানেক পরে পরিমল বাড়ি ফেরে। জামা না ছেড়েই উপর থেকে সে নেমে আসে।

জ্যোতিকে একবার দেখবে কেদার ?

আমায় দেখতে দেবে না।

এবার দেবে। আমি বুঝিয়ে বলেছি।

কেদার ঘরে যেতে জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে, করো। কিন্তু কোনো লাভ হবে না কেদারদা। আমি তোমার ওষুধ খাব না। কবিরাজি ছাড়া কোনো চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই, আমার শুধু কবিবাজি চিকিৎসা হবে। আগেই বলে রাখলাম-কিন্তু।

পরিমল বলে, তোমার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

কী করব ? ডাক্তারি ওষুধ খেয়ে মরব নাকি ?

কেদার ও পরিমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুজনেরই একসঙ্গে মনে হয়, নিজের প্রেমের জন্য গায়ের জোবে খাড়া করা নিজের মিথ্যা বিশ্বাসকেও জ্যোতি জীবন পণ কবে আঁকড়ে থাকবে।

কেদার সময় নিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জ্যোতির দেহযন্ত্রটি পরীক্ষা করে। ধীরে ধীরে এবং তন্নতন্ন করে। তার এই বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা পরিমলের পছন্দ করছে না, এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করে—জ্যোতিকে নয়, পরিমলকে। পরিমল স্রষ্টা বলেই তার কাছে সে জানতে চায় কোনোদিন তার কোনো বিশেষ রোগ হয়েছিল কি না, যা এই স্বাভাবিক সাধারণ সৃষ্টিকার্যেও মানুষের বহুকষ্টে আয়ত্ত করা সভ্যতাকে বিকৃত কবে দিতে চাইছে।

পরিমল চটে গিয়ে কথা কয় না।

অগত্যা কেদার নতুন জীবনের স্রষ্টার কাছে সাহায্য পাবার আশা ছেড়ে জ্যোতির দেহযন্ত্রটিব মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্রটির সাড়া শোনে।

বড়োই ক্ষীণ মনে হয় সাড়াটা।

সেটা আর আশ্চর্য কী ?

মা হবার সম্ভাবনা ঘটায় কোথায় মা হবাব জন্য প্রস্তুত হবে জ্যোতি—তার বদলে তাকে চালাতে হল মা হবার ছাড়পত্রের জন্য লড়াই।

কোথায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত আরামে বিলাসে থাকবে, তাব বদলে ববণ করতে হল ঝড়ঝাপটা।

আগামী মানুষের অবস্থানে গলদ আছে কি না সে ভালোভাবে পরীক্ষা করে।

জ্যোতি বলে, কী করছ কেদারদা ?

তুই চুপ কর !

পবীক্ষা শেষ করে মনের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে কেদাব বলে, তোর কবরেজি চিকিৎসাই হবে জ্যোতি। আমি শুধু তোর একটা ফটো নেব। অদৃশ্য আলোর ফটো—ডাক্তার ছাড়া কেউ দেখতেও পাবে না, দেখলেও বুঝতে পারবে না কার ফটো কীসের ফটো।

জ্যোতির মুখে হাসি ফোটে।

গেঁযো মেয়ে পেয়েছ, না ? আমি ডাক্তারের মেয়ে ভুলে গেছ ? এক্স-রে করতে চাও কোরো—ব্যবস্থা দিলে আমি কিন্তু মানব না বলে দিচ্ছি।

একটু থেমে বলে, তোমার যেন বেশ হাসিখুশি ভাব কেদারদা ? ঠকাচ্ছ নাকি ?

কেদার বলে, একদিন খুব ভোরবেলা বিপদে পড়ে এসেছিলি মনে আছে ? ডাক্তারি ওষুধ দিয়েছিলাম, ঢকঢক করে খেয়েছিলি ? তেমনই বিপদ যদি হয়, কেবল তোর নয়, পরিমলেরও যদি বিপদ হয়, ডাক্তারি ওষুধ দিলে খাবি না ?

না।

বেশ। কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানিস জ্যোতি ? এটা আমরা মেনে নিয়েছি, তোর অনিচ্ছায় তোর চিকিৎসা করা যাবে না। ডাক্তার কবিরাজ দুজনে আমরা তোর কাছে হার মানছি। তুই যা বলবি তাই আমরা করব !

জ্যোতি নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়।

কেদার এখন আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে জ্যোতির জিদ অনেক লড়াই করে বাজি জিতবার অহংকার আঁকড়ে থাকা থেকে আসেনি। এই একরোখামি আর কিছুই নয়, সে তার প্রেমের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে চায়। তার প্রেম আর পুরানো জীবন-ধাবায় বিশ্বাস একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এই বিশ্বাস ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই।

এ বিশ্বাসকে মর্যাদা না দিলে তার প্রেমের মান বাঁচে না, এ বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলে আঁকড়ে না থাকলে তার প্রেমও একটা ভুল হয়ে দাঁড়ায়।

পরিমল তার সঙ্গে নীচে নেমে আসে।

কেদার বলে, কী করা যায় ?

পরিমল বলে, আমিও উপায় ভাবছি।

কেদার বলে, হর্ষকাকার কাছে একবার যাই। তিনি নিজে এসে বুঝিয়ে বললে যদি কোনো ফল হয়।

পরিমল যেন আনমনেই বলে, হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখা যাক। না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য কী ব্যবস্থার কথা ভাবছ ?

এখনও ঠিক করিনি।

অগত্যা হর্ষ ডাক্তারকে আসতে হয় মেয়ের শ্বশুববাড়ি।

জনার্দন বলে, আসুন। আপনি নিজে ডাক্তাব, সময়মতো মেয়ের মাথাব চিকিৎসাটা করিযে রাখেননি ? আজ তাহলে এত ঝঞ্ঝাট হত না।

হর্ষ গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, রোগ হবার আগে কি চিকিৎসা কবা যায় মশায় ? আগে তো ছিল না মাথার রোগটা।

জনার্দনের মুখ কালো হযে যায়।

মেয়েকে হর্ষ সোজাসুজি বলে, অ্যাম্বুলেন্স এনেছি জ্যোতি। হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতালে আমি যাব না।

এখানে থেকে মরবি ?

মরব কেন ? কবিরাজি ওষুধ খাচ্ছি তো।

শুধু ওষুধে হবে না। অপারেশন দবকার হতে পারে।

সে ও যা হয় ব্যবস্থা করবে।

সকলে অভিভূত হয়ে থাকে। এতগুলি মানুষের নীরবতায় ঘরটা থমথম করে।

পরিমল বোধ হয় সেই মুহূর্তে মনস্থির করে, কারণ তার মুখেব অসহায় ভাব কেটে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখা যায়।

ধমক দিয়ে বলে, পাগলামি কোরো না। আমি কবিরাজি ছেড়ে দিচ্ছি।

জ্যোতি বলে, সে কী ?

পরিমল জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি, অন্য কিছু করব। আমার ধাতে যা পোষাবে না সেটা আঁকড়ে থেকে লাভ কী ? দোকানে তালা দিয়ে এসেছি, আর খুলব না। যা দাম পাই বিক্রি করে দেব।

জ্যোতি খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না। করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

পরিমল আবার বলে, কাজেই বুঝতে পারছ এ সব পাগলামির কোনো মানে হয় না তোমার। বাবা এসেছেন, ওঁর কথা শোনো।

খানিক পরে জ্যোতি বলে, বাবা, হাসপাতালে নয়, আমায় বাড়ি নিয়ে চলো।

হর্ষ বলে, তাই চলো।

১০

আশ্বিনের দুটি উজ্জ্বল দিন আর চাঁদ ও তারা-ভরা মনোরম রাত দারুণ কষ্ট ভোগ করে তৃতীয় দিন সকালে জ্যোতি যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেল একেবারে জ্ঞান হারিয়ে, ফিরে যা আর আসবে না মনে হল হর্ষ ডাক্তারের দুজন সমবয়সি নামকরা অন্তরঙ্গ ডাক্তার ভূপেশ ও কালীপদর।

বেলা তখন দশটা হবে।

শেষ রাত্রে আকাশে মেঘ ঘনিয়েছিল, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টিপি টিপি, আকাশ মেঘে ঢাকা, গুমোট হয়েছে এমন দারুণ যেন বাতাস ভান করেছে মরণের,—প্রচণ্ড ঝড়ের রূপ ধরে এসে এ তামাশা শেষ করবে আশঙ্কা হয়।

দোতলার দক্ষিণ কোণের ছোটো ঘরের হাওয়া পোড়া কয়লার গন্ধে ও ভাপে ভারী ও গরম। আবছা আঁধারটাও ভয় ও বিষাদে ভারী, চোখ কটকট করে, ভেতরে চাপ লাগে, জানালাগুলি প্রায় বন্ধ, মোটে দুটি জানালা ঘরে। ছোটো জানালাটির একটি খড়খড়ি শুধু তোলা। জ্যোতির ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা। ঠান্ডা লাগার ফল সাংঘাতিক হতে পারে। সেঁকের ও তাপের উপকারিতা অনেক। তিনটে হট ওয়াটার ব্যাগ জ্যোতির গায়ে লাগানো হয়েছে। ভাঙা কড়ায়ে কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে শুকনো সেঁকের উপকারিতা আছে, ঘরে ঘরে চিরকাল প্রসূতিকে এভাবে সেঁক দিয়ে আসা হয়, ঘরের মধ্যেই কয়লা জ্বেলে।

দেয়াল ঘেঁষে পুরানো ছেঁড়া তোশকের ওপর মস্ত অয়েলক্লথ বিছিয়ে জ্যোতির বিছানা হয়েছে ! তোশকটা ছিঁড়ে কিছু নতুন তুলো দিয়ে নতুন তোশক করার কথা হয়েছিল গতবছর শীতকালে, হর্ষ ডাক্তারের মেজোমেয়ে কিরণ এসে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মাস ছয়েক ব্যবহার করে যাওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে তোশকটার যে তুলোও আর কোনো কাজে লাগবে না। অয়েলক্লথটা আগে কেউ ব্যবহার করেনি, ওটা হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে আনা। জিনিসটা একটু পুরানো, কয়েকবছর দোকানে পড়ে থাকায় ফেটে চিড় খেয়ে গেছে, চলটা উঠতে শুরু করেছে। আস্ত একটা শিটের এটুকু কেউ কিনতে চায়নি, কম দামে দিতে চাইলেও নয়।

এতদিনে জিনিসটা কাজে লাগল।

জ্যোতির মাথায় একটা ওয়াড়হীন তেলচিটে বালিশ।

ভূপেশ ও কালিপদ অভিজ্ঞ ডাক্তার, কাজের বিষয় ছাড়া বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ডাক্তার হবার আগে পনেরো-বিশবছর এবং ডাক্তার হবার পরেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবছর ধরে প্রসবের ঘরে এই রকম গন্ধ, ভাপ বিছানাপত্রাদিই তাঁদের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা।

বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে, কেউ কেউ কাঁদেও—যাদের প্রাণ খুব নরম। পাড়ার মেয়েরাও জড়ো হয় ! এ সবও স্বাভাবিক, সঙ্গত।

ডাক্তার কেউ উপস্থিত না থাকার সময় কী হয় না হয় তা নিয়েই বা হাঙ্গামা করার মানে কী আছে। চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকমতো পালন করা হয়েছিল কিনা সে তো জিজ্ঞাসা করাই হয়।

নার্স শোভা তিনবার করে আসছে, সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায়। আজ সে এখনও এসে পৌঁছোয়নি, আসবার সময় মিনিট পনেরো পার হয়ে গেছে।

শোভা কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘড়িভক্তিপবায়ণা। আজ এসে দেরি হওয়ার জন্য, পনেরো-বিশ মিনিটের জন্য হলেও, বারবার কারণটা জানিয়ে ক্ষমা চাইবে সন্দেহ নেই,—ইতিমধ্যে জ্যোতির জ্ঞানহীন দেহটা যদি নিস্পন্দ প্রাণহীন হয়ে যায় তবুও সে কৈফিয়ত দিয়ে ক্ষমা চাইতে ছাড়বে না। ছেলেমেয়ে প্রসব করতে এত মেয়েকে মরতে দেখছে শোভা, কচি থেকে বয়স্কা মেয়েকে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, যে আরেকজনও ওভাবে মরেছে বলেই ঠিক সময়মতো নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছবার সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ কারণটা যতজনকে পারা যায় ব্যাখ্যা করে শোনাবে না কেন, একবার ছেড়ে দশবার শোনাবে না কেন, তা সে ভেবেই পায় না !

পশ্চিমা দাই রুক্‌মিনী হাজির আছে চব্বিশ ঘণ্টাই। তার তিন বছরের মেয়েটাকে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা কোনোমতে বস্তিতে তাদের ঘরে আটকে রাখা গিয়েছিল, তারপর থেকে সেও এ বাড়িতে স্থান পেযেছে। প্রসবাগারে তার ঢোকা বারণ, তবে ঘরেব সামনে সরু বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে সে ঠায় বসে থাকে।

মাঝে মাঝে সেখানে বসে বসেই ক্ষীণ টানা সুরে কাঁদে—মায়ের জন্য, খিদেয, একঘেয়েমিব কষ্টে।

রুক্‌মিনী কখনও তাকে ভেতরে নিয়ে যায় অল্পক্ষণের জন্য, কখনও নিজে বাইরে এসে তাকে একটু আদর করে বা কিছু খাইয়ে যায়,—অল্পক্ষণের মধ্যে।

ভূপেশ ও কালিপদ নীচে নামে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। ভূপেশেব নতুন ব্রাউন রঙের জুতোজোড়া শব্দ করে মচ্‌মচ্‌। স্পেশালিস্ট সে নয়, তবে স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় নামডাক আছে। চোখা নাকের উপরে ছোটো ছোটো চোখ ঢেকে হাই-পাওয়ার চশমা, মাথায় কদমছাঁটা চুল। প্রায় সব চুলই পাকা কিন্তু সাদা নয়, ধোঁয়ায় যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ভূপেশ বলে, ভেতরে কিছু হয়েছে।

জ্যোতির ভেতরে কী হতে পারে কালীপদর কোনো ধারণা নেই। চড়া ব্যথা উঠেছে নেমেছে দুদিন ধরে, রক্তক্ষরণে এসেছে জোয়ার-ভাটা। অস্বাভাবিক রক্তস্রাবের কোনো কারণ যদি ঘটেই থাকে ভেতরে, ডেলিভারি বন্ধ হয়ে আছে কেন ? রক্তপাতের কারণ স্বতন্ত্র হলে তার মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, তারপরও রক্তপাত চলবে, তখন চিকিৎসা হবে তার। প্রথম থেকে একটা সংশয় তাব মনে এসেছিল, ভূপেশ সমর্থন করেনি।

তুমি সিওর তো হে কেটে বার কবার কেস নয় ?

সিওর বইকী। মোটে সাড়ে ন-মাস। এগারো মাস হলেও আটকাত না।

জিভে একটা অস্বস্তির শব্দ করে ভূপেশ।

তাছাড়া মাথাটা এসে তো ঠেকত।

হর্ষকে কী বলবে ?

তাই ভাবছি। কাল বিকালেও সিওর ছিলাম, রাত্রের মধ্যে—

দুজনে নীচে নামলে একটি পনেরো-ষোলোবছরের ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে সসংকোচে প্রশ্ন করে : কেমন আছে ?

প্রশ্ন যে তার নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কাছেই পাশের দেয়াল ঘেঁষে আধঘোমটা টেনে মোহিনীকে এবং জ্যোতির মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের কিছু নেই।

ভূপেশ জানে, জ্যোতির জ্ঞান ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। সে-ই জোর দিয়ে কথাটা বলে। সত্য কথা বলা অর্থহীন। এখুনি এরা মড়াকান্না জুড়ে দেবে।

হর্ষ এবং কেদার দুজনেই ডিসপেনসারিতে বসে ছিল। হর্ষ কাঠের পার্টিশন করা তার ছোটো কামরায়, কেদার বাইরে। স্প্রিং আলগা বলে হর্ষের কামরার ফোল্ডিং-দরজা সামান্য বাতাসে লড়বড় করে, তাকে বারবার দেখা যায়। আজ এখনকার গুমোটে দরজার পাট দুটি প্রায় নিষ্কম্প হয়ে আছে।

রোগীও আজ কম। জন তিনেক মাত্র এসেছে টিপিটিপি বৃষ্টিতে ছাতি মাথায় দিয়ে, আসাটা তাদের জরুরি। হর্ষ ডাক্তারের সঙ্গেই এদের সোজাসুজি কারবার, এদের সঙ্গে কেদারের সম্পর্ক নেই। একে একে হর্ষ ডাক্তারের সঙ্গে কথা কয়ে এসে দুজন বসে আছে নতুন ওষুধ তৈরি হবার প্রতীক্ষায়, বসে থাকতে থাকতে কেদারের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা মাত্র না করে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা প্রশ্ন করে বসছে কেদারকে নিজের নিজের রোগীর রোগ সম্পর্কে, কেদার যেন সব জানে তাদের সম্পর্কে এটা অনায়াসে ধরে নিয়ে।

কেদার জবাব দিয়েছে নানারকম পালটা প্রশ্ন করে জানতে চেয়ে যে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। ভদ্রলোক দুজন তাই প্রশ্ন কমিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বিড়ি আর সিগারেট টানছে উদাসীনভাবে। বিড়ি যে টানছে তার ছেলের টাইফয়েড, আজ তেবো দিন। সিগারেটের স্ত্রীর বাধক, অম্বল, বুক ধড়ফড়, মাথার যন্ত্রণা, কান ভোঁ ভোঁ আর শুকনো কাশি, আজ তিন বছর। আজ সকালে চা খাওয়ার পর থেকে হিক্কা তুলছে আর বমি করছে।

কেদার : কদ্দিন বিয়ে করেছেন ?

শচীন সেন : এই বছর তিন-চারেক হবে।

কেদার : ছেলেমেয়ে ?

শচীন সেন : দুবার নষ্ট হয়ে গেল। প্রথমবার চার মাসে, পরেরবার পাঁচ মাসে। আচ্ছা, আপনার কী মত ? সবাই বলছে, একটি ছেলেমেয়ে হলেই সব সেরে যাবে। ডাক্তারবাবুও তাই বলেন। আপনি অবশ্য সবে পাশ করেছেন, তবু আপনিও তো ডাক্তার। আপনার কী মত বলুন না শুনি ?

কেদার : ছেলেমেয়ে হলে মোটামুটি সেরে উঠবে বইকী। কেন জানেন ?

শচীন সেন : বলুন না।

কেদার : মোটামুটি সেরে না উঠলে ছেলেমেয়ে হবে না। আগে স্ত্রীকে সুস্থ করুন—

শচীন সেন পাশ ফিবে মুখ ফিরিয়ে ফস্ করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে টেনে ফুঃ ফুঃ করে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয়। এই জন্যই তো এ সব ছোকবা ডাক্তারকে কেউ বিশ্বাস করে না, ডাকে না। অল্প বিদ্যা আর অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে এরা ধাঁধায় কথা কয়, রোগ-ব্যারামটা যেন হালকা ইয়ার্কির ব্যাপার। হর্ষ ডাক্তার তো এ ভাবে কথা বলে না কখনও !

তৃতীয় ব্যক্তি রোগ আর চিকিৎসা গোপন রাখার জন্য দূর থেকে হর্ষ ডাক্তারের কাছে আসা যাওয়া করছে প্রায় দুমাস। নাম ঠিকানা সে যে মিথ্যা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কেদার তিন-চারবার তার হাতঘড়ির ব্যান্ডে গোঁজা বাসের টিকট দেখেছে দশ পয়সা দামের ! শহরের এক দেশ থেকে আরেক দেশে সে খুঁজতে এসেছে গোপনতা ও আরোগ্য !

নাম বলেছে শরৎচন্দ্র মুখার্জি। ঠিকানা দিয়েছে যে অঞ্চলের সেদিক থেকে হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে আসতে ট্রামডিপো থেকেও কেউ পয়সা খরচ করে না দু-তিনমিনিটের হাঁটাপথ ট্রামে চেপে যেতে।

এর সঙ্গেই হর্ষ ডাক্তার কথা বলছিল। ভূপেশ ও কালীপদ এসে পড়তে সে শরৎ মুখার্জিকে বলল, আচ্ছা, আপনি ও বেলা আসবেন সাড়ে চারটেয়। ইনজেকশনটা আনিয়ে রাখব।

সাড়ে পাঁচটায় আসব। পাঁচটা পর্যন্ত আপিস।

ও, হ্যাঁ। তাই আসবেন।

দুমাস ধরে নিয়মিত আসছে, বিকালের দিকে আপিসের জন্য সাড়ে পাঁচটা-ছটার আগে সে আসতে পারে না এ কথা কতবার বলেছে ঠিক নেই, তবু হর্ষ ডাক্তারের সেটা খেয়াল থাকে না। দুমাসে বিশেষ কোনো ফল না পেয়ে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা মন দিয়ে ভালোভাবে করছে না এ রকম

একটা খটকা লেগেছিল মনে। তার সম্বন্ধে হর্ষ ডাক্তারের অন্যমনস্কতার নতুন প্রমাণে খটকাটা হঠাৎ বুঝি জোরালো সংশয়ে পরিণত হয়ে গেল, তাই তার মুখের ভাব দেখে কেদারের মনে হল, হর্ষ ডাক্তার বুঝি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে তার বাঁচবার কোনো ভরসা নেই !

এমনি নিরীহ গোবেচারীর মতো চেহারা, মুখে কাব্যরোগী কিশোরের করুণ ম্লানিমা মেশানো অসংযত মধ্য যৌবনের বিবর্ণ পাঁশুটে ভাবের সঙ্গে, তার ওপর এই গভীর হতাশার ছাপ।

দেখে বড়ো মায়া হল কেদারের। অন্য দুজন ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। শরৎ ধপাস করে বসে বলে, আপিসে লেট হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু কী বললেন ? আহাহা ভড়কে যাবেন না। আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমাকে সব জানতে হয়। ওঁর কাছে যা প্রাইভেট ব্যাপার, আমার কাছেও তাই। আমাকেও সব গোপন রাখতে হয়। ধরুন, উনি ক-দিনের জন্য বাইরে গেলেন, আপনার ট্রিটমেন্টের ভার তো আমাকেই দিয়ে যাবেন ?

হর্ষ ডাক্তারের এত অন্তরঙ্গ হয়েও তার কাছে ডাক্তারবাবু কী বললেন জানবার দরকার কেদারের কেন হল, এ প্রশ্ন অবশ্য শরতের মনে আসে না।

ও বেলা ইনজেকশন দেবেন বললেন।

কটা হল ?

আজ থেকে দেবেন। ইনজেকশনের ওষুধটা আনিয়ে রাখবেন বললেন।

ইনজেকশনের ব্যবস্থা গোড়ার দিকেই করা উচিত ছিল। কথাটা শরৎকে বলতে ইচ্ছা হয়, বলতে পারে না। বললে অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না কিছুই, বিশ্বাস হর্ষ ডাক্তার করেনি তাকে। তার ডিসপেনসারিতে এখানে দোকানের কর্মচারীর মতো বসতে দিয়েছে এইটুকু বিশ্বাস, স্নেহ আর অনুগ্রহ।

ইনজেকশনের কথা আগে বলেছিলাম ডাক্তারবাবুকে। এটা নির্দোষ কথা, সত্যও বটে।—কারা তৈরি করেছে ?

কী তৈরি করছে ?

শুনে খটকা লাগে কেদারের, কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ জাগে। আরও দু-চারটি কথা জিজ্ঞেস করে মনটা তার ঘা খেয়ে নড়ে ওঠে। রোগীর শরীরের বিষ নিয়ে ইনজেকশনের ওষুধ তৈরি করতে দেয়নি হর্ষ ডাক্তার, কী ইনজেকশন তবে যে দেবে শরৎকে তার এ রোগের জন্য ? এটুকু কি তার জানা নেই যে ওভাবে তৈরি করা বিশেষ সিরাম ছাড়া এ রোগে ইনজেকশনের আর কোনো ফলপ্রদ ওষুধ হয় না ?

তাই বা কী করে সম্ভব হয় ! এ তো সহজ, সাধারণ জ্ঞান ! তবে কি জেনে শুনে ইচ্ছে করেই হর্ষ ডাক্তার ওকে ভাঁওতা দিচ্ছে, হাঙ্গামা আর ভাগে টাকা কম পড়া এড়াবার জন্য ? আশ্চর্য কী ! ক-মাস ধরে সে তো দেখছে হর্ষ ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা !

কত দাম বললেন ?

পাঁচ টাকা করে। সাতটা লাগবে।

শরৎ হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হয়ে পড়ে।

টাকার জন্য ভাবি না মশায়। অনেক টাকা দিয়েছি, আরও নয় পঞ্চাশ একশো যাবে। সেরে যাবো তো ?

সেরে যাবেন বইকী ! নিশ্চয় সেরে যাবেন।

যন্ত্রের মতো কেদার তাকে ভরসা দেয়।

কবিরাজি করে দেখব একবার ? নয় হোমিয়োপ্যাথি ?

আমি কী বলব বলুন ?

শরৎ চলে গেলে পার্টিশনের ও পাশ থেকে তিন ডাক্তারের কথা কাটাকাটি কেদারের কানে আসে। এতক্ষণ কোনো দিকে তার মন ছিল না।

হর্ষ ডাক্তার একটু চটেছে মনে হয়।

পালকে ডাকতে বলছ ? পাল কি তোমার আমার চেয়ে বেশি বোঝে বলতে চাও ?

ভূপেশ বলে, আহা তুমি বুঝতে পারছ না কথাটা। তোমার মেয়ে তো ধরতে গেলে আমারই মেয়ের মতো। অপারেশন যদি করতে হয়, আমার করা কি উচিত হবে ? আমরা যতই হোক ঘবের লোক, বাইরের একজনকে আনিয়ে কনসাল্ট করাও দরকাব।

কেদার ভাবে, এ সুবুদ্ধি গোড়ায় হল না কেন ?

কালীপদ বলে, না না, তুমি ইতস্তত কোরো না হর্ষ। হয় পালকে ডাকো, নয় হাসপাতালে পাঠাও মেয়েকে। হাসপাতালের মুখার্জি শুনেছি এ সব অপারেশনে বেশ ভালো।

পাড়ার কুমুদ সেনের বাড়িতে একবার ডাঃ পালকে ডাকা হয়েছিল কনসালটেশনের জন্য।

সকলের সামনে ডাঃ পাল কিছু বলেনি, আড়ালে নাকি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিল হর্ষ ডাক্তারকে, রীতিমতো অপমান করেছিল।

সেই আঘাতে হর্ষ ডাক্তার আজও মনে মনে আহত হয়ে আছে, ডাঃ পালের নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে।

ডাঃ পালকে আনলেই সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু আরও তো স্পেশালিস্ট আছে শহরে ? হর্ষ ডাক্তারের মর্মান্তিক বিদ্বেষের খবর জেনেও ওরা তাদের একজনকে আনাবার কথা না বলে ডাঃ পালকেই ডাকবার জন্য জোর করছে কেন ?

মেয়েকে হাসপাতালে পাঠাতেই বা হর্ষ ডাক্তাবের আপত্তি কীসের ?

ডাক্তারের কি হাসপাতাল সম্পর্কে ভয় বা কুসংস্কাব থাকা সম্ভব ?

সাধারণ রোগীর বেলা যাই ঘটুক হাসপাতালে, হর্ষ ডাক্তারেব মেযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে, বিশেষত সেখানকার ডাক্তার মুখার্জি এবং হয়তো আরও দু-চারজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যখন এদের জানাশোনা আছে। এ কী ছেলেখেলা, না এটাই সম্ভব ডাক্তারি ব্যবসায়ে ?

শরৎ আর জ্যোতি ধাঁধা হয়ে জড়িয়ে যায় কেদারের মনে। মৃত্যুভয় আঁকা শরতের মুখ, জ্যোতির মুখে মরণের চিহ্ন। শরৎ না হয় অজানা অচেনা পর,—রোগী ডাক্তারের পর এটা মানতে চায় না কেদারের কাঁচামন—তবু নয় মেনে নেওয়া গেল বাস্তব সত্যটাকে যে শরৎ হর্ষ ডাক্তারের কেউ নয়, কিন্তু জ্যোতি তো মেয়ে। সে আর তার দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চেয়ে বড়ো ডাক্তার জগতে নেই, তারা জানে না এমন কিছু ডাক্তারি বিদ্যায় থাকাই অসম্ভব, এ অভিমানও না হয় মেনে নেওয়া গেল, ডাক্তারও মানুষ বলে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যযুক্ত সাধারণ মানুষ বলে।

কিন্তু নিজের মেয়ের মরণাধিক এমন যন্ত্রণা আর মরণ-বাঁচনটাও কি সে অভিমানকে গলাতে পারে না ? বন্ধুর অভিমানকে খাতির করে দুই প্রবীণ বন্ধু দুদিন চুপ করে থাকতে পারে ?

কেদার উঠে ভেতরে গিয়ে একপাশে দাঁড়ায়।

হাসপাতালেই পাঠাও তবে। কেদার, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি বার করুক।

গাড়িতে হবে না। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করে দাও। বোলো আর্জেন্ট।

হর্ষ ডাক্তারের যেন চমক ভাঙে—সে কী হে ? তোমরা তো কিছু বলোনি আমায় !

ভূপেশ বলে, সাডেন টার্ন নিলে, আগে কিছু টের পাইনি। আমি বলি কী, পালকে একবার দেখিয়ে—

হর্ষ ডাক্তার গুম খেয়ে বসে থাকে।

কেদার ধৈর্য হারিয়ে বলে, হর্ষকাকা, আমি গিয়ে নিয়ে আসি ডাঃ পালকে। উনি আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, বললেই আসবেন।

সে হর্ষ ডেকেছে শুনলেও আসবে, ভূপেশ বলে।

হর্ষ ডাক্তার মুখ তুলে বলে, তাই বরং যাও কেদার। আমি ডেকেছি বলার দরকার নেই। তুমিই যা বলবার বলে নিয়ে এসো। বরং বোলো যে তুমিই ভার নিয়েছিলে, হঠাৎ খারাপ টার্ন নেওয়ায় ভরসা পাচ্ছ না—হর্ষ ডাক্তার ঠোঁট কামড়ে একটু থেমে বলে, জ্যোতিকে একবার দেখে যাও।

আমি কী দেখিনি হর্ষকাকা ? কতবার করে দেখছি রোজ। বলতে সাহস পাইনি, নইলে—

হর্ষ ডাক্তারের পুরোনো গাড়িতে ডাঃ পালের বাড়ির দিকে যেতে যেতে কেদার ভাবে . সাহস পায়নি বলতে। মুখ দিয়ে সত্য কথাটাই বেরিয়ে গেল ? দুজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তার জ্যোতির ভার নিয়েছে, তার কিছু বলা সাজে না, এই যুক্তিতে সে তবে চুপ করে থাকেনি ? তা ছাড়া আর কি ! কেবল জ্যোতির ব্যাপারে তো নয়, আরও কত বিষয়ে নিজের ভীরুতার জন্যই সে চুপ করে থেকেছে—তার নিজের ভালোমন্দ অধিকার অনধিকারের বিষয়েও অন্যায় পর্যন্ত সহ্য করে।

কেমন এলোমেলো হয়ে যায় কেদারের চিন্তাগুলি, সে জ্বালা বোধ করে। নালিশ, আপশোশ, অনিশ্চয়তা, ফাঁকি আর ফাঁদে পড়ার জ্বালা। এতকাল ধরে এত সমারোহ এত আয়োজনের পর সে কীসের জন্য তৈরি হয়েছে, তার পেশা ও কাজের আসল রূপ কী, কী তার সংগ্রাম, কী জন্য, কার জন্য, কীসের সঙ্গে ?

ডাঃ পাল বেরিয়ে গেছে। নার্স অণিমার বাড়ি গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

ডাঃ পালের একজন মুখচেনা তরুণ স্তাবক যন্ত্রের মতো জানিয়ে দেয়। কে জানে সেও কেদারের মতো নতুন ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করেছে কি না !

ওখানেই চলুন তা হলে।

কেদার নির্দেশ দেয় ড্রাইভার অনন্তকে।

ওখানে গিয়ে কী হবে ? বাড়ি চিনি না।

আমি চিনি। জোরে চালান।

অনন্ত কাল মদ খেয়ে রাত জেগেছে। চোখ টান করে সে যেন প্রায় কটমটিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। তারপর কী ভেবে গাড়িটা একদম বিপজ্জনক বেখাপ্পা স্পিডে চালিয়ে দেয়।

কেদার মনে মনে বলে : এমন বাঁদর না হলে হর্ষ ডাক্তার একে পোষে ? ভাটিখানার পোষা জীব !

নার্স অণিমার বাড়ি কেদার কখনও যায়নি, ঠিকানাটা শুধু জানা ছিল। বাড়ি খুঁজে বার করতে সদর দরজার ভেতর দিকে সিঁড়ির নীচে দেখা হয় অণিমার স্বামী শশীনাথের সঙ্গে।

জীর্ণ শুকনো চেহারা, চুলগুলি সব পাকা, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। বয়স অনুমান করা কঠিন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি।

মুখে রাত্রে গেলা দেশি মদের সকাল বেলার দুর্গন্ধ।

কাকে চান ?

আমি হর্ষ ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি।

অ ! তা কী জানেন, উনি তো যেতে পারবেন না আজ ! একটু কী জানেন, মুশকিল হয়েছে।

ডাঃ পাল আছেন, না চলে গেছেন ?

আছেন। ওনাকে দেখছেন। বড়ো ভালো লোক, অত বড়ো বিলেত-ফেরত ডাক্তার, এত নাম-ডাক, আমি গোড়ায় ভরসাই পাইনি ডাকতে যেতে। উনি বললেন, যাও আমার নাম বললেই আসবেন। তা, গিয়ে বলামাত্র ছুটে এলেন। নিজের ড্রাইভারকে পাঠিয়েছেন ওষুধপত্র কী সব আনতে।

কী হয়েছে মিসেস দাসের ?

আর বলেন কেন, বুড়ো বয়সে কী কেলেঙ্কারি। কী ফাঁদই পেতে রেখেছেন ভগবান, রেহাই নেই আর। ছোটো মেয়েটার বয়েস মশায় আমার পনেরো বছর।

প্রায় চোখ বুজে সৃষ্টির অনিবার্য দুর্বোধ্য বিধানের খাপছাড়া পরিহাসের প্রতিবাদে শশীনাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। মাথা নাড়তে নাড়তেই সে অবশ্য জানিয়ে দেয় ব্যাপারটা কী হয়েছে। চার-পাঁচমাসের সন্তান-সম্ভাবনা ছিল অণিমার ; শেষ রাত্রে ব্যথা উঠে মিসক্যারেজের উপক্রম হয়েছে অথবা এতক্ষণে ঘটেছে।

এ রকম ঘটে, সৃষ্টি ছাড়া কিছু এটা নয়। ব্যাপারটা দুঃখেরও বটে আপশোশেরও বটে। কিন্তু ক-দিন আগেও নার্স অণিমাকে কেদার দেখেছিল আর তার অজস্র কথা শুনেছিল বলেই বোধ হয় ঘটনাটা কেদারের কল্পনায় উদ্ভট একটা তামাশার মতো মনে হয। পনেরো বছর অণিমা অন্য মেয়েদের প্রসব করিয়ে এসেছে, নিত্য-প্রসাধনের মতোই ওটা বোধ হয় তার কাছে সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল, আজ সে নিজেই পড়েছে ফাঁদে।

ছি ! নিজের ওপর চোখ রাঙায় কেদার। একটি মায়ের বহু বিলম্বিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা ব্যর্থ হওয়া কী কম শোচনীয় কথা। তার নিজের মায়েরও ছোটো ছেলেমেয়ে দুটির বয়সের তফাত তো হবে প্রায় দশ-এগারোবছর—ছোটো খুকি যখন জন্মায় মা-র বয়স তাব চল্লিশের দিকে ঘেঁষেছিল। কী কষ্টই মা পেয়েছিল ছোটো খুকি হবার সময়।

১১

ডাক্তার পালের নেমে আসার জন্যে কেদারকে অপেক্ষা করতে হয অনেকক্ষণ।

অণিমার অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই। ডাক্তার পাল স্নেহও করেন খানিকটা অণিমাকে। দায়ে পড়া কর্তব্য পালনে এত সময় দেওয়া ডাক্তার পাল কেন, তার চেয়ে অনেক কম নাম-করা ডাক্তার যাদের শশীনাথ চেনে, তাদেরও নাকি স্বভাব নয় ! আর নিজে ভার নিয়ে সব করা !

শশীনাথের কৃতজ্ঞতার আবেগে উচ্ছ্বসিত কথা থেকে ডাক্তার পাল যা যা করেছে জানা যায়। এ যেন সত্যই একটা প্রমাণ যে যতই শক্ত আর ভোঁতা হয়ে যাক মানুষের হৃদয়, হৃদয় যদি থাকে কোমলতাও থাকবে !

বসে থাকতে থাকতে অণিমার কনিষ্ঠা কন্যাটির দর্শনলাভ ঘটে কেদারের। বাপের জন্য সে চা নিয়ে আসে কলাই করা ছোটো মগে—কাপে বোধ হয় শশীনাথের চায়ের তৃষ্ণা মেটে না। রীতিমতো চা-খোর মানুষ।

বয়স মেয়েটির পনেরো-ষোলো বছর হবে, ফ্রক পরে থাকলেও এবং বেণী পিঠে দুললেও। বেশ মোটা-সোটা গোলগাল মেয়েটি অণিমার, দিব্যি আদুরে-আদুরে চেহারা। কচি মুখখানা দেখে একটু স্বস্তি বোধ না করলে কেদার নিশ্চয় মেয়েটার এমন বেখাপ্পা বেশের জন্য ওর বাপ-মাকে মনে মনে গাল দিত। সস্তায় কেনা বেমানান ফ্রকটাতে বেচারির বাড়ন্ত দেহটি যেন এই ঘোষণায় পরিণত হয়েছে—এ আর কী বেড়েছি, কাল পরশু দেখো !

চা খাবেন নাকি এক কাপ ? একটা কাপ আন তো বুনু।

মগের কানায় কানায় ভরা প্রায় দুধহীন কড়া লালচে চায়ের দিকে চেয়ে কেদার তাড়াতাড়ি বলে, না না, চা খাব না।

বুনুর কচিমুখে দেখা দেয় সবজান্তা হাসি।

নরম চা করে দিতে পারি ঠিকমতো দুধ দিয়ে, যদি বলেন।

থাক, দরকার নেই।

হাঙ্গামা কিছু নেই কিন্তু। হাঁড়িতে জল ফুটছে।

এবার কেদার হেসে বলে, তবে আনো।

কেদারের মন বুঝে তার মত বদলিয়ে তাকে চা করে এনে খাওয়াতে পারায় ভারী খুশি মনে হয় বুনুকে। ডাক্তার পাল নেমে আসা পর্যন্ত তাদের আলাপ এগোয়। থার্ড ক্লাসে পড়ছে বুনু। এবার সেকেন্ড ক্লাসে উঠত, ফিফথ ক্লাসে পড়বার সময় তার ভীষণ অসুখ হয়েছিল, একবছর তাই পিছিয়ে গেছে। এবারের আগের বারের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল, এবার পারেনি। মা তাকে দিয়ে রাঁধাবাড়া করায়, বলে, শুধু লেখাপড়া করলেই হয় না মেয়েদের, রাঁধাবাড়াও শিখতে হয়। বেশি না পড়লে ফার্স্ট হওয়া যায় ?

খেলা কর না ?

শুনে চোখের পলকে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে যায় বুনুর মুখ। আচমকা সে যেন বদলে যায় আগাগোড়া, শিশু ও মিষ্টি থেকে পাকা আর তিতো।

কীসের খেলা ?

ঝাঁজালো সুরে সে পালটা প্রশ্ন করে।

কেদার ভড়কে গিয়ে বলে, এই স্কুলের মেয়েরা যা খেলে, দৌড়ানো, স্কিপিং, ব্যাড্‌মিন্টন—

আমি মোটা বলে বুঝি বলছেন খেলাধুলো করি না ?

চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকে বুনু।

না না, তা বলিনি। আমি তা ভাবিওনি ! সত্যি বলছি।

আমতা আমতা করে কেদার কৈফিয়ত দেয়। অবস্থা সহজ করে আনার জন্য হঠাৎ সহজভাবে হেসে জিজ্ঞেস করে, পুতুল খেলা কর তো ?

বুনুর মুখের ভাব এতটুকু বদলায় না। বরং মনে হয় সে যেন আরও বেশি আহত হয়েছে।

পুতুল খেলা ? ফ্রক পরে থাকি বলে জিজ্ঞেস করছেন বুঝি ?

কেদার আর কী বলবে, অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সে একেবারে চুপ হয়ে যায়।

বুনু কিছুক্ষণ মনে মনে বিচার ও বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করে বলে, ছেলেবেলার সেই অসুখের পর আমি মোটা হয়েছি। খেলাধুলো না করার জন্য নয়।

কেদার সায় দিয়ে বলে, ও !

বাড়িতে ফ্রক পরি কেন জানেন ? আমার মাসিমা আমায় ফ্রক কিনে দেয়। ফ্রক না পরে শাড়ি পরলে মাকে কিনে দিতে হত। আমি ফ্রক পরি বলে গরিবের সংসারে সাহায্য হয়।

তা তো বটেই।

মাসিমা ফ্রকের বদলে শাড়ি কিনে দেয় না কেন ভাবছেন তো ? মাসিমার একটু ছিট আছে মাথায়। আমি শাড়ি চাইলে বলে, বড়ো হয়ে পরিস।

তা তো জানতাম না।

না জেনে যা-তা ভাবেন কেন একজনের সম্বন্ধে ?

এতক্ষণে শশীনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, কিন্তু মেয়েকে সে ধমকায় না। গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলে, কী বকর বকর আরম্ভ করলি বুনু ?

বুনুও বিরক্তির একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে ভেতরে চলে যায়।

খানিক পরেই ডাক্তার পাল নীচে নামে।

বলে, কেদার ? তুমি এখানে ?

কেদার বলে, একটু দরকার ছিল।

তার দরকারটা কী না শুনেই ডাক্তার পাল শশীনাথের সঙ্গে কাজের কথা পাড়ে : নষ্টই হয়ে গেল। উপায় ছিল না।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভয়ের কিছু নেই, তবে হার্ট একটু খারাপ। কয়েকদিন পারফেক্ট নার্সিং চাই। ভালো নার্স আনাতে পারবেন একজন ?

উনি পারবেন বইকী।

ডাক্তার পালের দুপাটি দাঁত দু-তিনবার ঘষাঘষি করে পরস্পবেব সঙ্গে।

উনি পারবেন মানে ? উনি তো ক-দিন বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।

শশীনাথ তাড়াতাড়ি জিভ কাটে।

উনি কী নিজে যাবেন ডাকতে ? তা বলিনি। অনেকেব সঙ্গে চেনা আছে, উনি ডেকেছেন শুনলে আসবে। আসবে না তো কী, তাদের বিপদে-আপদে উনি যান না, করেন না ?

অ ! একজন ভালো নার্সকে আনান। ওষুধ পথ্য ঠিকমতো চলবে, কিন্তু পারফেক্ট রেস্ট সবচেয়ে দরকারি।

শশীনাথকে একেবারে যেন বাতিল করে এবার ডাক্তার পাল কেদারের দিকে ফিরল।

কী ব্যাপার কেদার ?

আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে চোখ প্রায় বন্ধ করে ডাক্তার পাল এমন এক দীর্ঘনিশ্বাস টানল ও ফেলল যে তার সীমাহীন শ্রান্তি যেন তুষাবের হিমস্পর্শের মতো স্পর্শ করল কেদারের হৃদয়-মনকে। এক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু কী দীর্ঘ তার ইতিহাস। ডাক্তারি করে করে চুল প্রায় সব পেকে গিয়েছে ডাক্তার পালের। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে কত আত্মীয়বন্ধু স্নেহাস্পদ এমনি বেহিসাবি বেপরোয়া অন্যায় আবদার তাকে জানিয়েছে, আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে ! যার সুযোগ জুটেছে সে-ই চেয়েছে এই সুবিধা—ভালো ডাক্তার সে, তাকে দিয়ে বিনা পয়সায় আপনজনের সর্দি থেকে যক্ষ্মা পর্যন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়ে নিতে। একটি দীর্ঘনিশ্বাসে ডাক্তার পাল যেন তাকে বলল : প্রায় একটা বাজে। এখনও বাড়ি যাইনি, নাইনি, খাইনি। দেহটা শ্রান্ত, অবসন্ন। একটু বিশ্রামের জন্য মরছি। এমন সময় তুমি এসে বললে যেতে হবে ! আমিও জানি, তুমিও জানো, বিশেষ দাবি তোমার আছে। তুমি সেই দাবি খাটাতে এসেছ। উপায় কী, আমাকে যেতেই হবে। না গেলে আমার মেয়ে গীতা রাগ করবে, তুমি রাগ করবে, আমি হব মন্দ, স্বার্থপর লোক !

কেদার আর্তস্বরে বলতে যায়, আমা' বাড়িতে নয়, হর্ষ ডাক্তার—

ডাক্তার পাল হাই তুলে বলে, হর্ষ দেখছিল ? কেসটা কী ?—চলো যাই, গাড়িতে শুনব।

বুনু এসে কখন দাঁড়িয়েছিল কেউ দেখেনি। কেদারের পাঞ্জাবির প্রান্ত টেনে সে চুপিচুপি বলে, আপনি ডাক্তার ? একদিন আসবেন ? কথা আছে।

কী কথা বুনু ?

দরকারি কথা। আসবেন।

বলে সে অন্দরে মিলিয়ে যায়।

গাড়িতে কেদার সব কথা খুলে বললে ডাক্তার পাল যেন আরও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনুযোগ দিয়ে বলে, আগে বলোনি কেন তোমার বাড়ির কেস নয়। তোমরা ইয়ংম্যান, এমন তাড়াহুড়ো কর ! হর্ষনাথের বাড়িতে তো আমি যেতে পারব না !

আপনি না গেলে মেয়েটা মরবে।

ডাক্তার পাল আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি কি পাগল হয়েছ কেদার ? ডাক্তার হয়ে এমন কথা বলছ ? কোনো একজন ডাক্তার পাওয়া গেল না বলে কোনো রোগী মারা যায় ? ও রকম ধন্বন্তরি ডাক্তার তো আজ পর্যন্ত জগতে জন্মায়নি ! কলকাতা শহরে আমার মতো কত স্পেশালিস্ট আছে, তাদের একজনকে ডাকো। নয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। আমি গিয়ে যা করব, অন্যেও তাই কবরে। তুমি যা বিবরণ দিলে কেসটার, তাতে মনে হয়—নাঃ, রোগী না দেখে কোনো ওপিনিয়ন দেওয়া যায় না।

কেদার সাগ্রহে বলে, তবেই দেখুন, আমার মুখে শুনেই আপনি ধরতে পেরেছেন। আপনি একবার চলুন।

যাওয়ার কথা কানে না তুলে ডাক্তার পাল বলে, আমি কিছু ধরতে পারিনি কেদার। তোমাব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার ডায়োগনসিসটাই ঠিক—টুইন কমপ্লিকেশন। সোজা ব্যাপাব। কমপ্লিকেশনটা কী জেনে ঠিক করে দিলেই ওয়ান আফটার অ্যানাদার ডেলিভারি হয়ে যাবে। স্রেফ পজিশনের গোলমাল, ঠিক করে দিলেই হল। যে কোনো সাধারণ ডাক্তার পারে।

সোজা কেস হলে ওরা দুজন ধরতেও পারলেন না ?

ডাক্তার পাল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। গাড়ি তার বাড়ি অথবা হর্ষ ডাক্তারের বাড়িব পথে মুখ ঘুরোবার মোড়ে এসে পৌঁছানোয় ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে হুকুম দেয়। কথা যখন বলে, মনে হয় কথা বলতে তার ক্লেশ হচ্ছে, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা পীড়ন করছে তাকে।

হয়তো তা হলে কেসটা সোজা নয়। তোমাব ডায়োগনসিস ভুল। কিন্তু কি জানো কেদার, তুমি ছেলেমানুষ, সবে ডাক্তারি পাশ করেছ, তোমাকে বলতে লজ্জা করে, অনেকে অনেক সময় সোজা কেস ধরতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে নয়, স্বভাবের দোষে। রোগটা কী হওয়া উচিত না ভেবে ভাবে রোগটা এই হওয়া উচিত। সকালে রোগীকে দশ মিনিট দেখে যদি একবার ঠিক করল রোগটা এই, বিকালে আরও হাজার রকম সিম্প্টমে যদি স্পষ্ট বোঝা যায় রোগটা অন্য কিছু, তবু সেগুলি গ্রাহ্য না করে শুধু হাতড়ে বেড়াবে কোন সিম্প্টমগুলি তার সকালের ডায়োগনসিসকে সাপোর্ট করে। অনেকে আবার চায় না যে তার রোগীর রোগটা সহজ সাধারণ কিছু হোক—কঠিন জটিল দুরারোগ্য কিছু হলে সে খুশি হয়। বিভূতি সেনকে তো তুমি চেন, কাশির রোগী পেলেই ও মহোৎসাহে পরীক্ষা করাবে টি বি সন্দেহ করার একটা সামান্য কারণ পর্যন্ত হয়তো নেই। কেউ আবার ঠিক উলটো। ধরণী যেমন। গোড়াতেই ধরে নেবে, রোগটা সাধারণ। চেহারায় টি বি-র ছাপ নিয়ে যদি কেউ আসে, সামনে কাশতে কাশতে রক্ত তোলে, তবুও চেষ্টা করবে রোগটা সাধারণ কাশিতে দাঁড় করিয়ে চিকিৎসা করতে।

ইতস্তত করে ডাক্তার পাল একটা চুরুট ধরিয়েই ফেলে—নেয়ে খেয়ে যেটা ধরাবে ঠিক ছিল।

তবু আমি ডাক্তারদের দোষ দিই না। ডাক্তাররা মানুষ, দশজনের মতো মানুষ। চাকরির মতো ডাক্তারিটা তাদের অধিকাংশের নিছক পেশার মতো—যে সব বিশ্বাস কুসংস্কার দুর্বলতা নিয়ে তারা আপিসে চাকরি করত, সে সব নিয়েই তারা ডাক্তারি করে, পয়সার জন্য। কী করবে তারা ? আর কিছু করবার নেই। ডাক্তারের মন তারা কোথায় পাবে, কি করে পাবে ? রোগীর মন আর তার মনে তফাত নেই—সে শুধু জানে এই এই অবস্থা হলে এই এই ওষুধ আর এই এই পথ্য ব্যবস্থা করতে

হয়। সেটা তুচ্ছ নয়। না কেদার, সেটা তুচ্ছ নয়। একজন জ্বরের রোগীর ম্যালেরিয়া হয়েছে ধরতে পেরে কুইনিন দিয়ে তাকে সারিয়েছে যে ডাক্তার, আর কোনো রোগ ধরে সে যদি ঠিক চিকিৎসা করতে না পারে, তবু তার কাছে দেশের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কেন ?

ডাক্তার পাল যেন ঘুম থেকে জাগে।

তুমি কি এখানে নামবে ?

আপনি একবার চলুন।

এ অনুরোধের জবাবে ডাক্তার পাল ড্রাইভারকে বাড়ি যেতে হুকুম দেয়।

কেদারকে বলে, তুমিও আমার ওখানেই নেয়ে খেয়ে নেবে চলো। গীতা বলছিল, তুমি অনেকদিন যাওনি।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে কেদার নেমে যায়।

কী করব বুঝতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে।

ডাক্তারের অসুখের চিকিৎসাও ডাক্তারই করে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় মাথা ঘোরাটা অসুখ নয়। ডাক্তার পালের গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে যায়।

নিখুঁত ব্যঙ্গ যেন। ডাক্তাররাও মানুষ, সাধারণ দুর্বল মানুষ ! হর্ষ ডাক্তার প্রমাণ দিয়েছিল ডাক্তার পালকে ডাকতে না চেয়ে, ডাক্তার পাল অকাট্য প্রমাণ দিয়ে গেল হর্ষ ডাক্তারের মেয়েকে বাঁচাতে যেতে অস্বীকার করে। ডাক্তার পাল ধন্বন্তরি নয়। অন্য একজন স্পেশালিস্ট ডেকে বা হাসপাতালে পাঠিয়ে সে যা করত তা করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু এ কী একটা যুক্তি ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসা করতে না চাওয়ার ! কেদার জানত ডাক্তার পালের সমালোচনার আঁচড়ে স্থায়ী ক্ষত হয়েছিল শুধু হর্ষ ডাক্তারের মনে। কিন্তু সে অনেক বড়ো ডাক্তার, সে ভুল দেখিয়ে উপদেশ দিলে শিষ্যের মতো শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ হওয়ার বদলে হর্ষ ডাক্তার দুর্বিনীতের মতো অপমান বোধ করেছে, এই অভিমানের ক্ষত যে ডাক্তার পালকেও কাবু করে রেখেছে এতকাল, তা কি কল্পনা করা গিয়েছিল।

কড়া রোদে দাঁড়ানো যায় না। কয়েক হাত দূরের ডাস্টবিন থেকে চলতি দুর্গন্ধের বদলে প্রায় অপরিচিত ও উৎকট একটা গন্ধ উঠে আসছে। কী একটা ভুলে যাওয়া কষ্ট যেন মনে পড়িয়ে দিতে চেয়ে পারছে না। ভিতরের ক্ষোভটা কটু : হাসি না কান্নার পাল্লায় ভারী বোঝা যাচ্ছে না। এত দুঃখেও তামাশার মতো লাগছে যেন সব। ডাক্তার হয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে সে মিশছে মাত্র কটা মাস, মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে, তাও অনেকটা ছাত্রেরই মতো। চিকিৎসা জগতের এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিজ্ঞতা তার ভরে উঠেছে কত অমার্জনীয় দুষ্টতার টুকরো টুকরো উদাহরণে। জলজ্যান্ত বাস্তব ইঙ্গিত সেগুলি, অবিস্মরণীয়। কিন্তু দুঃখ বোধ করার চেয়ে বেশি বিচলিত সে হয়নি। আর আজ ডাক্তার পালের মন নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আবিষ্কারের ক্ষোভ তার দেহমনকে অবসন্ন করে আনছে।

ডাক্তার পালের মতো ডাক্তারের যদি রোগের সঙ্গে লড়বার পিছনে কোনো আদর্শের প্রেরণা না থাকে যুদ্ধের ভাড়া করা সেনাপতির মতো তবে আর আশা ভবসা কী থাকে ? চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান আর নতুন নতুন জ্ঞানসঞ্চয়ের অদম্য কামনা আছে বলেই তো কেদার তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে আসেনি। জীবনধর্মের মূলনীতিতে তার নিজের যে বিশ্বাস তারই সমগোত্রীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব সে অনুভব করে এসেছে ডাক্তার পালের মধ্যে। বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সে বিশ্বাসের কোনো স্মরণযোগ্য উদাহরণ সে কখনও ঘটতে দেখেনি বটে, সেও আর দশজনের মতোই মোটা ফি নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করেছে, বড়ো জোর কোনো ক্ষেত্রে রেয়াত করছে ফিয়ের একটা

অংশ। গরিব রোগী তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু এই মাপকাঠিতে তাকে বিচার করার কথা কেদার কোনোদিন ভাবেনি, আজও ভাবে না। রোগী যেই হোক, চিকিৎসা করার সময় ব্রতপালনের মতো তার একান্ত নিষ্ঠা কেদারকে মুগ্ধ করেছে, রোগীর জন্য তার দরদ কেদারকে অভিভূত করেছে। এ দরদ, এ নিষ্ঠা কোথা থেকে আসে, মানুষ বলে মানুষকে ভালোবাসার প্রেরণা ছাড়া, রোগ সারানোই আমার আচরণীয় ধর্ম এ বিশ্বাস ছাড়া ? তাই, মনের উঁচু বিশ্বাস ও আদর্শের পাশে তোলা ছিল যে মানুষটি, সে যেন আজ হুড়মুড়িয়ে পড়ছে সব কিছু নিয়ে। অনুগতা ভক্তিমতী নার্স অণিমাকে খাতিরে বা স্নেহে হোক বাঁচাতে ছুটে যায় আর হর্ষ ডাক্তারের মেয়ে বলে জ্যোতি হয় বাতিল,—কথা তো শুধু তাই নয় ! কোনো অণিমা কোনো জ্যোতিই কিছু নয় ডাক্তার পালের কাছে। সে নিজেই সব—ডাক্তার সে ! তার জগতে সে আছে আর আছে তার ডাক্তারি, রোগীর স্থান সেখানে নেই ! রোগী ছাড়া রোগ হলেও সে এমনিভাবে চিকিৎসা করে যেত—রোগী গোরুছাগল কীটপতঙ্গ হলেও কিছু আসত যেত না।

রাস্তার ওধারে সাজানো গোছানো নতুন বড়ো ওষুধের দোকান, ঝকঝকে তকতকে। টেলিফোন আছে। কেদার ধীরে ধীরে দোকানে ঢোকে।

মাপ করবেন, বাইরের লোককে টেলিফোন করতে দেওয়া হয় না।

নিজের ডাক্তার পরিচয় দাখিল করলে টেলিফোন করতে দিতে আপত্তি থাকবে না, কেদার জানে। জরুরি দরকারে ডাক্তারকে টেলিফোন করবে বললেও আপত্তি তুলে নেবে। কিন্তু একটা টেলিফোন করার জন্য কোনোদিক দিয়ে কোনো ডাক্তারকে টেনে আসরে নামাতে তার বিতৃষ্ণা বোধ হয়। সে রোগীর কথা বলে।

বলে, আমার বিশেষ দরকার মশায়। রোগীর অবস্থা খারাপ —এই তো মুশকিল করে তারা, নিয়ম নেই তবু—! পয়সা লাগবে। তা তো লাগবেই ! হর্ষ ডাক্তারকে টেলিফোন করে পয়সা দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে চোখ বুলিয়ে নেয় দোকানের চারিদিকে। এ রকম সুবিন্যস্ত আলোয় ঝলমল সুশ্রী সুন্দর ওষুধের দোকান তার মনে স্বপ্নের মোহ এনে দেয়, রূপসি মেয়ের মতো দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

বাড়ি ফিরে সে একখানা চিঠি পায় ছায়ার।

১২

ইটের চার কোনা চোঙার তলের দিক এই উঠানটুকুতে দাঁড়িয়ে কষ্টে ওপর দিকে তাকালে ওপরের খণ্ডিত আকাশটুকুতে হালকা একরাশি মেঘ এসেছে দেখা যায়। রোদের চোঁয়ানো আলোটুকুও ম্লান হয়ে এসেছে দেখে মুখ তুলে না চেয়ে পারা যায় না, মাথার এলো খোঁপা পিঠে ঠেকিয়ে এভাবে চাইতে গিয়ে ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে মনে হলেও। এক পশলা বৃষ্টি হবে কি ? নিজের এটা সংশয় নয় ছায়ার, মনে মনে সে যেন জিজ্ঞাসা করে মেঘলা ওই আকাশটুকুকেই। সে জানে না, তার দাবিও নেই, আকাশের মেঘ খুশি হয়ে অযাচিতভাবে এক পশলা বৃষ্টি আজ দেবে কি-না মেঘই যেন তা বলতে পারে !

এমনিতেই বদ্ধঘরে আর প্রাচীর ঘেরা উঠানে তার স্থায়ী গুমোট, বাইরে বাতাস বইছে কি-না উত্তর বা দক্ষিণের, সে টেরও পায় না অনুভূতির রকম-বিরকমের মারফতে ছাড়া, ঝড়ের রূপ নিয়ে না এলে বাইরের বাতাস পৌঁছায় না তার কাছে। বাইরে গুমোট হলে সদা সক্রিয় অভ্যস্ত একটা চাপ যেন শুধু বেড়ে যায়, চলতি জ্বর বেশি হওয়ার মতো।

বৃষ্টি যদি হয়, ঠান্ডা যদি পড়ে, যন্ত্রণাটা কি তার বাড়বে ? যে যন্ত্রণাই হোক, শরীরের ঠান্ডা লেগে যন্ত্রণা বেড়ে যায়, এইটুকু ছায়া জানে। ঘুপচি রান্নাঘরের বদ্ধ হাওয়ায় তার দম আটকে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, কিন্তু কদিনের এই অসহ্য যন্ত্রণাটা যেন সত্যই একটু কম পড়ে উনানের আঁচ লাগলে।

মেয়েমানুষের কানে ব্যথা ! পেটে নয়, কানে ! বাচ্চা কাচ্চা নয়, জোয়ান বয়সি এক বিয়ানি মেয়েমানুষ, তার কানে ব্যথা। বাচ্চাদের কানে আর পেটে ব্যথা হয়, সেটা সবাই জানে, কিন্তু এই বয়সে কান ব্যথা !

সীতাংশু বলে, ময়লা জমেছে কানে। মাঝে মাঝে তেল দিতে পার না কানে দু-একফোঁটা ? না, কানটা তেলে চক্‌চক্ করলে রূপের হানি হবে ? তেল দিয়ে বাইরেটা সাবান দিয়ে ঘষে সাফ করে নিলেই হয়। দুদিনে একটা করে সাবান তো ফুরোচ্ছে,—লাটসায়েবের বাড়ি যেন !

কানের অসহ্য ব্যথার কথা এসে ঠেকে সাবানের খরচে।

আমি একা সাবান খরচ করি ? মুখে হাতে একটু মাখি তো মাখি, নইলে নয়। আমায় দায়ি করো কেন ? আমি একাই যেন তোমায় ফতুর করলাম ! বিয়ে করা বউকে লোকে কত কী দেয়, গায়ে ঘষবার সাবান জোটে না আমার। আর তুমি যে ওদিকে—

জানি, জানি জানি। নিজের রোজগারের দু-চারটে টাকা নিজের জন্য খরচ করি বলে বজ্জাত বনেছি।

বাসনের পাঁজা তুলতে গিয়ে উঁচু হতেই কানটা যেন ঝনঝনিয়ে বেড়ে ওঠে মহাসমারোহময় যন্ত্রণার ব্যান্ড বাজনার মতো ! বাসনগুলি তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছায়া ভাবে, ছুরি দিয়ে হোক, ক্ষুর দিয়ে হোক, কানটা কেটে ছেঁটে ফেলতে পারার উপায় জানলে বোধ হয় ক্ষুর দিয়ে গলাটা কেটে বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছাটা এমন জোরালো হত না। স্যাঁতসেঁতে উঠানে চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথাটা কী তার ফেটে যাবে না—এমন ভাবে ফেটে যাবে না যাতে সঙ্গে সঙ্গে তার মরণ হয় ?

আমি বলে মরে যাচ্ছি কানের ব্যথায়—ক-দিন বারবার কেন যে সে নিরর্থক সীতাংশুকে এ কথা শোনাতে গিয়েছে সকালে বিকালে ! তার বদলে নিজেই কোনো একটা ব্যবস্থা করলে হয়তো সে রেহাই পেত এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে। কিন্তু হায়, কী ব্যবস্থা করা দরকার তাই যে সে জানে না !

তার শক্ত কোনো ব্যাবাম হলে সীতাংশু যে ব্যস্ত হয় না তা নয়, কিন্তু কান ব্যথার কথাটা সে কানেও তোলে না !

সরষের তেল গরম করে দিয়ো সেরে যাবে। একটু সেঁক দিয়ো। কান ব্যথা ! কান ব্যথাটাই তোমার বড়ো হল ?

শাশুড়িও তাই বলে, গরম দুফোঁটা তেল দাও কানে, সেঁক দাও একটু, সেরে যাবে। কান ব্যথা কার না হয় বাছা ? এমন তো করে না কেউ !

ননদ খুকুর বিয়ের চেষ্টা চলছে তিন-চারবছর, প্রাণটা তার রসে টইটুম্বুর, সব কিছুর একটিমাত্র মানে সে জানে। সে বলে, আসল কথাটা বলো না বউদি ? বলো, তোমার পায়ে পড়ি। বলতে হবে আমায়। কান ব্যথার মানেটা কী ? আলসমি লাগছে ? গা গুলোচ্ছে, বমি আসছে, শুয়ে থাকতে চাও ? তাই বলো না কেন, সোজা কথা সোজা ভাষায় ! আর কাউকে না বলো, আমায় বলো ! কান ব্যথার ছল করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দেব। তোমায় রাঁধতে হবে না, বাসন মাজতে হবে না, কোনো কাজ করতে হবে না, শুয়ে শুয়ে হাই তুলবে, আর—

উঠান-চোঙ্গার আকাশটুকুর মতো মেঘলা হয়ে আসে খুকুর মুখ, যার ভালো নাম অপরাজিতা, করুণ সুরে সে বলে, কেমন লাগে বউদি ? বলো না আমায়। বলতে হবে, বলতে হবে তোমায়।

তার কানে ব্যথা। এক অদ্ভুত অসহ্য ব্যথা, যার মাথামুণ্ডু কিছু সে নিজেও বোঝে না, শুধু মনে হয় টিপটিপ, ধপধপ, ঝিমঝিম, ঝনঝন,—এ যন্ত্রণার চেয়ে মরা ছেলেটা প্রসব করার যন্ত্রণা ছিল সুখ, আরাম।

বাইরের কড়া নাড়ার শব্দ সে শুনতে পায় কানের ব্যথার পর্দার ভেতর দিয়ে, গাঢ় কুয়াশা ভেদ করে আলো আসার মতো, বিয়ের আগে ছেলেবেলায় যেমনটি সে দেখেছিল।

পাঁচু মুখ গোমড়া করে বসে আছে সিঁড়িতে, স্কুল থেকে ফিরে আজ গুড় দিয়ে বাসি রুটি খেতে বলায় তার রাগ হয়েছে।

পাঁচু, কে ডাকছে ?

মরুক, মরুক। যা হয়ে মরুক।

গুরুজনের মতো কঠিন গম্ভীর মুখ করে ছায়া আদেশের সুরে বলে, পাঁচু, কে কড়া নাড়ছে, দেখে এসো।

মুখ বাঁকিয়ে ত্যারচা চোখে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় পাঁচু, সুর করে বলে, বউদি গেল কই, লুকিয়ে মারে দই—

সীতাংশুর মা ধমকের সুরে হাঁক দেয়, পাঁচু !

পাঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় দোতলায়, দোতলার নতুন ভাড়াটেদের সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করছে—কিন্তু ভাব জমছে না কিছুতেই। প্যাকাটির মতো ছেলেগুলি নির্জীব, প্রাণহীন।

ছায়া ধৈর্য হারায়। চুপিচুপি একখানি পোস্টকার্ড লিখে দোতলায় স্কুলে-যাওয়া মেয়ে আলোকে দিয়ে কাল পোস্ট করিয়েছিল, হয়তো সশরীরে জবাব এসেছে সেই চিঠির। দশটা কী বারোটার ডাকে চিঠিখানা পেয়ে হয়তো কেদার নিজেই দেখতে এসেছে তাকে চারটে বাজতে না বাজতে, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

ছায়া নিজেই গিয়ে দরজা খোলে, বলে, এসো, ডাক্তার ঠাকুরপো, এসো।

যতটা আনন্দ ঢালা উচিত ছিল কথাগুলির মধ্যে তা অবশ্য সে ঢালতে পারে না। অসামঞ্জস্যটা লক্ষ করে কেদার। কারণ, যদিও সেদিনের পর সে আসেনি এ বাড়ি, আগে যখনই সে এসেছে ছায়ার অভ্যর্থনায় কখনও হাসির সঙ্গে এমন খাপছাড়া চাপা আর্তনাদ মিশে থাকেনি।

দুঃখ থেকেছে, কষ্ট থেকেছে, থেকেছে ম্রিয়মানতা। থেকেছে যে, সেটা সত্যই কেদার খেয়াল করেনি আজকের আগে, সে জেনে এসেছে ওটাই হল ছায়া বউদির হাসি-ভরা অভ্যর্থনার রূপ। আজ জলো দুধের বদলে টক-ছানা-কাটা দুধের মতো একেবারে নতুন রকম তার হাসি আর অভ্যর্থনার তফাতটা সে টের পায়, টের পায় আগেও বরাবর বড়ো কষ্টে ছায়া বউদি তাকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে।

কেমন আছ ছায়া বউদি ?

তেমন ভালো নয় ডাক্তার ঠাকুরপো।

কেদার ঠাকুরপোকে ডাক্তার ঠাকুরপো করেছ ? কেদার বলে অনুযোগ দিয়ে।

করব না ? কানে বড়ো ব্যথা ঠাকুরপো, বড্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। ডাক্তার ঠাকুরপো যদি বাঁচায় আমাকে !

ছায়া বলে মরো-মরো কাঁদো-কাঁদো হতাশার সুরে, একমাত্র আশা-ভরসাকে আঁকড়ে ধরবার চরম ভাষায়।

সীতাংশুর মার গলা ভেসে আসে, কে এসেছে কে ? কেদারের গলা শুনছি ? কেদার এয়েছে নাকি ?

আমি খুড়িমা, আমি। এখুনি আসছি আশীর্বাদ নিতে, ছাতা-টাতাগুলো রাখি ঠিকমতো গুছিয়ে। কেদার বলে হাঁক দিয়ে। গলা নামিয়ে বাপের মতো, দাদার মতো, স্বামীর মতো, সেই সঙ্গে খানিকটা ডাক্তারেরও মতো সুরে জিজ্ঞেস করে, কীসের ব্যথা কানে ? কদিন হল ?

তিন-চারদিন হল। ব্যথায় মরে যাচ্ছি ঠাকুরপো, তুমি না এলে আজ—

গলায় দড়ি দিতে ?

দিতাম—

কবজি ধরে নাড়ি না দেখে, বুকে স্টেথিস্কোপ না লাগিয়ে, কোন কানে ব্যথা জানবার চেষ্টা পর্যন্ত না করে, কেদার বলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা দেবার সুরে, ভেতরে যাও, অন্য সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সীতুদা যখন আসবে, তখন চা নিয়ে এসো। তোমায় কিছু বলতে হবে না, করতে হবে না, শুধু চা দিতে সামনে আসবে।

শুনে রোমাঞ্চ হয় ছায়ার দেহে। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে বারবার তার শুধু এই কথাটাই মনে হয় যে যুবক বয়সের গোড়ার দিকে সত্যই মানুষের মতো মানুষ থাকে মানুষ। বছরখানেক সীতাংশু যা ছিল বিয়ের পর, কোনোদিন মদ খেলে পর্যন্ত বাড়ি এসে যেমন সে করত তাকে নিয়ে তার রাগ, অভিমান, ভর্ৎসনা সব কিছু মাথা পেতে নিয়ে—সে যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়, অথচ সত্যি ঘটেছিল। সেসবের জন্যই তাকে এত মায়া করতে পারল কেদার। দু-একবছর পরে হয়তো তাকে মরতে দেখলেও এই কেদার উদাস চোখে চেয়ে বলবে, মরছ নাকি তুমি, কী আর করা যায়, মরো !

সীতাংশু বাড়ি ফিরে বলে, আরে, আরে, কেদার যে ! কদ্দিন পরে দেখা ! কেমন আছ ? বাড়ির সব ভালো ?

কে জানে কী ভাবে এটা সম্ভব হয়। ছোটো ভাইয়ের মতোই সে ছিল বটে একদিন কিন্তু নিজে বিগড়ে যাবার পর তারই সম্পর্কে একটা উদ্ভট সন্দেহ নিজের মনে সৃষ্টি করে পাড়া ছেড়ে এ বাড়িতে পালিয়েও এসেছে সীতাংশু,—অথচ তার ভাব দেখে কে কল্পনা করতে পারবে মনে তার কিছু আছে !

ভদ্রতাটুকু সেরে, জামাকাপড় ছেড়ে সে মুখ হাত ধুতে যায়। ফিরে এসে বসে জমজমাট হয়ে। তিন হাজার মজুর কাজ করে তার কোম্পানিতে, মানে, যে কোম্পানিতে সে চাকরি করে দেড়শো টাকা বেতনে, যেখানে তেইশ থেকে একশো চল্লিশ পর্যন্ত মাইনের সত্তর-পঁচাত্তরজন চাকুরের চেয়ে বেশি মাইনের তার চাকরি !

এক কাপ চাও খাওয়াবে না সীতুদা ?

শুধু চা ? অ্যাদ্দিন পরে এসেছ ?

ভুরু কুঁচকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবে সীতাংশু, বলে, মা লুচি-টুচি তো পরে হবে, এককাপ চা দিতে বলো না আগে।

চা এনে দেয় ছায়া।

কেদার বলে, বউদি, কানে কী হয়েছে আপনার ?

এ ছলনা ভালো লাগে না ছায়ার। মনে মনে সে কোটি মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাকে মায়া করে তাকেই বাঁচবার জন্য এ ছলনা বলে কৃতজ্ঞতায় মনে মনে মাথা নুইয়ে সে প্রণাম করে দেওর সম্পর্কের কেদারের পায়ে।

কী জানি ! ভীষণ ব্যথা করছে কানটা কদিন ধরে। রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না, কানের ব্যথায় সময় সময় মনে হয় কী যে—

দেখি।

কেদার তখন ডাক্তার, কারও কিছু বলার বা করার অধিকার নেই। ছায়ার কানটা সে এমনি সাধারণভাবে পরীক্ষা করে। তাকে প্রশ্ন করে কয়েকটা। অতি গুরুতর বিরুদ্ধ সমালোচনাভরা মুখে তাকিয়ে সে ভড়কিয়ে দেয় সীতাংশু আর তার মাকে। শেষে ভর্ৎসনা করে বলে, সীতুদা, তিন-চারদিন হল, কোনো ব্যবস্থা করোনি ?

সীতাংশু বিব্রত হয়ে বলে, কী হয়েছে বুঝতে পারিনি ভাই।

আমিই কি পুরোপুরি বুঝতে পারছি, কেদার বলে ডাক্তারি ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে, এটুকু বুঝতে পারছি যে এটা বোধ হয় সিরিয়াস কিছু হবে।

তার মানে ?

মানে ? মিনিট খানেক কেদার ভাবে। বলে, মানে হল এই। কানে খোল জমে এ ব্যথা হয়নি। কানের হাড়ে লাগছে, সেটা ব্রেইনে সোজাসুজি টাচ করে ভীষণ পেন তুলছে, যত তাড়াতাড়ি পাবা যায় অপারেশন না করালে—

ঠাকুরপো, আমায় বাঁচাও !

পরদিনই অপারেশনের ব্যবস্থা হয়, কেদারের ব্যবস্থা।

সীতাংশু বলেছিল, বাড়িতে হয় না ?

বাড়িতে ? কেদার ধমকের সুরে বলে, মাথায় অপারেশন কবতে হবে সীতুদা, সেটা ভুলো না। দু-তিনদিন শুধু দেখে শুনে বিচার বিবেচনা কবে ঠিক করতে হবে কীভাবে কতটুকু কম ইনজুরি করে অপারেশনটা করা যায়, ডাক্তারদের যে কী ঝকমারি সীতুদা—

নাকের সামনে কী একটা ধরেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে গন্ধ, আশ্চর্য গন্ধ। আশ্চর্য গন্ধ, ঘুমপাড়ানি গানের সুর যেন গন্ধ হয়েছে। এ গন্ধ শুঁকতে আরম্ভ করে প্রথমেই উৎকট একটা প্রতিবাদ জাগে, ইচ্ছা হয় দুহাতে যন্ত্রটাকে ধরে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয় দেখাই যাক না গন্ধ হয়ে এই যে নিবিড় গভীর ঘুম ঘনিয়ে আসছে, তার রূপটা কী !

ওদিকে জ্যোতি অজ্ঞান হয়ে আছে নিজে থেকেই। অপারেশন করাব জন্য তাকে আর ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হবে না।

এদিকে ছায়াকে অজ্ঞান করা হয়েছে ওষুধ দিয়ে।

জ্যোতি বাঁচবে না। ছায়া বাঁচবে, মাথা তার ঠিক আগের মতো সাফ থাকবে কি না বলা যায় না।

কেন বাঁচবে না জ্যোতি ?

কেন ভোঁতা হয়ে যাবে ছায়ার মাথা ?

পরিষ্কার ধারণা করতে পারছে না কেদার। সে ডাক্তার !

এই সব ঝঞ্ঝাটে ও মানসিক সংঘাতে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে দিন কাটে কেদারের।

কত দিকে কত মানুষের সঙ্গে মনে সংযোগ ঘটে থাকলেও দীর্ঘকাল যোগাযোগটা আর কিছুতেই ঘটে ওঠে না।

সাধ হয় পদ্ম ঝি-র খবর নিতে। সে আর ঝি নেই কেদারের কাছে। ট্রামের সেই গরিব বউটি আর পদ্ম ঝি রোগিণী হিসাবে তার কাছে একাকার হয়ে গেছে। নগেনকে একবার দেখে আসতে ইচ্ছা

হয়— কাছেই বাড়ি। ছেলেটি তাব বাঁচেনি—কিন্তু নগেন যাতে আরও কিছুকাল নিজে টিকে থাকতে পারে সে জন্য তাকে কয়েকটা জরুরি উপদেশ দিয়ে আসবার অদম্য ইচ্ছা জাগে।

নগেনের মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে সুস্পষ্ট রোগের লক্ষণ—যে রোগ যক্ষ্মার মতো সংক্রামক নয় কিন্তু প্রায় সমান মারাত্মক—ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এ মৃত্যু ঠেকাবার সাধ্য নগেনের হবে না। সে জন্য যে চিকিৎসা প্রয়োজন সেটা তার কাছে আকাশ-কুসুমের মতোই দুর্লভ।

তবে মরণের দিকে এগিয়ে চলার গতিটা সে আরও অনেক মন্থর করে দিতে পারে। একটু কঠোরভাবে তার সাধ্যায়ত্ত কয়েকটা নিয়ম পালন করলেই হয়।

কিন্তু যাওয়া হয় না। উপদেশ দিয়ে এলেও নগেন বেশিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করবে কি-না সন্দেহ ! এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিরর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

অঞ্জলির সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়। অঞ্জলি আরেকদিন নিজেই এসে হাজির হয় না কেন ভেবে অভিমান জাগে। কিন্তু দেখা আর হয় না অঞ্জলির সঙ্গে।

খবরের কাগজে শহরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাবটা পড়ে। সে জানে এ হিসাব ঠিক নয়—এ শুধু আইন মতে স্বীকৃত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব। যে স্তরে তাব প্রধানত চলাফেরা দাঁড়িয়েছে—শহরের বেশির ভাগ সাপ্তাহিক মৃত্যু সে স্তবে ঘটে না।

রোগ ও মৃত্যুর যথেচ্ছ বিহাব যে স্তবে যেখানে তার যাতায়াত কদাচিৎ ঘটে।

সে বড়ো ডাক্তার নয়, তবু।

খাঁটি বস্তিবাসী দু-চারজন রোগী রোজই আসে হর্ষ ডাক্তারের ওষুধের দোকানে। ডাক্তার ডাকতে নয়—রোগেব লক্ষণ মুখে বলে ওষুধ নিয়ে যেতে। কম দামি ওষুধ হলে কেউ কেনে। অন্যেরা ওষুধেব দাম শুনেই ফিরে যায়।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সত্যটা কেদারের কাছে যে মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকগুলি দামি আর কতগুলি বছবের দামি সময় খরচ করে ডাক্তাব হয়ে এ দেশের গরিব জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় না ডাক্তারের পক্ষে।

গরিব মানুষগুলির একমাত্র অবলম্বন ম্যাজিকওলা চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসা আর মাদুলি কবচ ঝাঁড়ফুঁক।

কেদার ভাবে, হায় ভগবান, গীতাকে বিয়ে করে ওই বিলাতে গিয়ে মস্ত ডাক্তার হয়ে আসবার স্বপ্ন দেখছি, ওই বিলাত আমার দেশটাকে রেখে দিয়েছে টোটকা আর মাদুলির চিকিৎসার স্তবে !

রাস্তার ফুটপাতে পড়ে আছে কত রোগী।

ট্রামে-বাসে চড়ে গেলেও দেখতে পাবে, ফুটপাতে পায়ে হেঁটে গেলেও দেখতে পাবে।

দেখায় শুধু তফাত হবে খানিকটা।

সকালবেলা হঠাৎ পদ্ম ঝি-র স্বামী বংশীধরের আবির্ভাবটা কেদারকে সেদিন উৎসাহিত করে তোলে।

তার আসবার সঙ্গে সঙ্গে বংশীধর তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল,—তবু।

তবু কেদার উৎসাহিত বোধ করেছে।

যে খুনিকে আয়ত্ত করার সাধ্য কারও ছিল না, কোনো আইনে যাকে পাকড়ানো যেত না, সে এসে তারই কাছে হাজিব হয়েছে শুধু তার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদর্শে বিশ্বাসটা সরলভাবে বাস্তবভাবে ঘোষণা করার জন্য।

পদ্মকে খাতির করে না বংশীধর। পদ্ম তার কাছে শুধু টাকা চায়। টাকা কয়েকটা যখন দিতে পারে তখন পদ্ম তাকে কী ভাবেই যে খাতির করে।

এবার বেশ কিছু টাকা হাতে করেই ফিরেছে, কিন্তু পদ্ম একেবারেই আমল দেয়নি। একেবারেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে পদ্ম !

আগে রোগটি সারাও, তারপর এসো।

কেদার তাকে সোজা ভাষায় যা বুঝিয়েছিল, সেই কথাগুলিই সে বংশীকে বলে। খানিকটা অবশ্য গুলিয়ে ফ্যালে।

পদ্মর উপদেশ শুনে নয়, তার চেহারাটি এবার বেশ খুলেছে দেখে এবং কোনোমতেই সে রফা করবে না টের পেয়ে বংশী কেদারের কাছে এসেছে।

এ এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে যতটুকু সে আয়ত্ত করেছে রোগ সারাবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাই দিয়েও খানিকটা উপকার করা যায় এ দেশের কিছু অজ্ঞ গরিব মানুষের !

কয়েক বছর আগে আরও কম বয়সে এইটুকু করার জন্য নেমে পড়াটাই জীবনের উপযুক্ত ব্রত বলে মনে হত কেদারের, কিন্তু সে সব দিন কেটে গেছে।

এ যুক্তির ফাঁকি কেদার জানে।

কয়েকজন গরিবের রোগ সারাল। বেশ কথা। কিন্তু তারপর ? দেশ জোড়া অসংখ্য গবিবের কি আসবে যাবে ? মানুষের দারিদ্র্য তো ঘুচে যাবে না তার চিকিৎসার সেবা-ব্রতে !

দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা না পেলে কারও একার চেষ্টায় কোনো দেশের মানুষের কোনো দুঃখই ঘুচতে পারে না।

ডাক্তারি পেশার মধ্যেও যে গলদ আর অনিয়ম, তার জন্যও কোনো ডাক্তার ব্যক্তিগতভাবে দায়ি নয়, ওটাও দেশের লোককে অন্নবস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার ফল।

চিকিৎসাও এ দেশে দামি পণ্য ছাড়া কিছুই নয়।

যে দেশে না খেয়ে মানুষ মরে সে দেশে রোগ হলে কি চিকিৎসা পাবার অধিকার থাকে মানুষের ?

এই অবস্থাতেই যদি থাকে দেশ, জগৎ ঘুরে যত পারে জ্ঞান সঞ্চয় কবে নিয়ে এসে মস্ত ডাক্তার হয়ে হাজার সদিচ্ছা নিয়েও কিছুই সে করতে পারবে না দেশের লোকের।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারবে না।

কারণ, ডাক্তারি করে তো তার সাধ্য হবে না দেশের অবস্থা পালটে দেবার।

শুধু ডাক্তারি করলে তার চলবে না।

কেবল বড়ো ডাক্তার হয়ে তার সাধ মিটবে না।

ডাক্তার বলেই সে রেহাই পায়নি। দেশের অবস্থা বদলে দেবার জন্যও তাকে মাথা ঘামাতে হবে, সময় ও শক্তি দিতে হবে।

কিন্তু আরও জ্ঞান যে তার চাই ? ডাক্তার হিসাবেও তার যে আত্মবিশ্বাস দরকার রোগীর প্রাণ বাঁচাতে, তার দেশের মানুষ খাঁটি স্বাধীনতা অর্জন করলে চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা গড়তে—নতুন রকম ডাক্তার তৈরি করা থেকে চিকিৎসাকে জল বাতাস রোদের মতো সুপ্রাপ্য করতে ?

নিজের জীবনের সংকটটা আজ জানতে পেরেছে কেদার।

জ্যোতি কেন মরবে আর ছায়া কেন হাবা হয়ে যাবে এ প্রশ্নকে বাতিল করে যেমন আছে সে রকম ডাক্তার হয়ে থাকলে তার চলবে না।

আবার জ্যোতির মৃত্যু ও ছায়ার মাথা বাঁচাবার ক্ষমতা অর্জন করতে দ্বিতীয় ডাক্তার পাল হলেও তার চলবে না।

অল্পবিদ্যার ডাক্তার অথবা দেশকে বাতিল করা বড়ো ডাক্তার হওয়া তার জীবনে অর্থহীন।

দামি একটি মোটর এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। ড্রাইভারের হাতে একটি ছোটো চিঠি দিয়ে অঞ্জলি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কোনো কারণ জানায়নি।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেও কারণ কিছু জানা যায় না। সে শুধু জানায় যে অঞ্জলির তেমন কোনো অসুখ হয়েছে কি-না বলতে পারে না, তেমন কোনো অসুখ হলে সে অবশ্যই জানতে পারত, তবে কিছুদিন থেকে অঞ্জলি একেবারেই বাড়ি থেকে বেরোয় না।

আহ্বানটা জরুরি নিশ্চয়। নইলে ডাকেও অঞ্জলি চিঠি পাঠাতে পারত। এই গাড়িতেই যাওয়া উচিত মনে হয় কেদারের।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকেই দেখা হয় অনাদিব সঙ্গে। অনাদি বোধ হয় তার সেদিনের সেই সমালোচনা ভুলতে পারেনি। অত্যন্ত প্রাণহীন নীরস হয় তার অভ্যর্থনা।

কেদার অবশ্য সমালোচনা করার ভাষায় কিছুই বলেনি তাকে—কিন্তু অনাদির নিজের মনেও তো খুঁতখুঁতানি না থেকে পারে না। টাকার জন্য সে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিচ্ছে—এ রকম স্পষ্ট অনুযোগ না করলেও কেদার তো তাকে বলেছে যে চেষ্টা করে সে খুব বড়ো বৈজ্ঞানিক হতে পারত, দেশের লোক অনেক আশা করে তার কাছে। তাব মানেই দাঁড়ায় তাই।

কেদার ভদ্রতা করেই জিজ্ঞাসা করে, চাকরিতে জয়েন কবেছেন ?

তাতে যেন চটে যায় অনাদি !—কবেছি।

[illegible] কেদাব বলে, অঞ্জলি একটু ডেকেছিল আমায। ওব কোনো অসুখ হয়নি তো ?

অনাদি বলে, অসুখ কি-না আপনারাই জানেন। ডাক্তাবি শাস্ত্রে নাকি এর কোনো প্রতিকার নেই। কাজেই অসুখ বলে না মেনে উড়িয়েও দিতে পারেন !

কী হয়েছে ?

শ্বেতি হয়েছে। মুখে।

অঞ্জলির আঁকা ছবির মতো সুন্দব মুখখানা স্মবণ কবেই কেদার বলে, কী সর্বনাশ !

অনাদি বলে, কী করতে আছেন মশায আপনারা ? কত বড়ো বড়ো স্পেশালিস্ট, কত নাম ডাক—সামান্য একটা স্কিন ডিজিজ সারাতে পারেন না ?

কেদার হেসে বলে, এটা কি বৈজ্ঞানিকের মতো ক[illegible] হল ডক্টব সেন ? এখনও অনেক কিছু আবিষ্কার হয়নি বলে আপনি দাযি করছেন বৈজ্ঞানিককে ?

অনাদি লজ্জিত হয়ে বলে, না না, ও ভাবে বলিনি কথাটা। আমি বলছিলাম কী সায়ান্সে প্রগ্রেসের তুলনায় আপনাদেব ব্রাঞ্চটা পিছিয়ে আছে।

এটাও কি ঠিক বললেন ? কোনো রোগেই মানুষের আর মরবার বা বেশি ভুগবার দরকার নেই—আমাদের ব্রাঞ্চ আজ এ ঘোষণা করতে পারে। আপনাদের ব্রাঞ্চে মানুষ-মারা অস্ত্র বানায়—যুদ্ধকে ভীষণ করে দেয়। আমবা আহতদের বাঁচাই।

অঞ্জলি বলে, দেখছেন ? মুখখানা কেমন সুন্দর হয়েছে ?

কেদার বলে, এই কি প্রথম আরম্ভ হল ? অন্য কোথাও- ?

অঞ্জলি মাথা নাড়ে।

কেদার বলে, তুমিই সেদিন বলেছিলে, রূপের জন্য তোমার আর মাথাব্যথা নেই। নিজের রূপের মোহ কাটিয়ে উঠেছ।

অঞ্জলি বলে, তাই বলে কি কুৎসিত হতে চেয়েছি ? মুখটা আরও সুন্দর হয়ে চলবে—এই তো সবে আরম্ভ !

খুব ভড়কে গেছ ?

গেছি বইকী। বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না। মনকে কত বুঝাই, কিন্তু লোকে এই মুখ দেখবে ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে।

কেদার তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু আমাকে তো অনায়াসে দেখালে ? বিশেষ লজ্জাও পাচ্ছ মনে হচ্ছে না ?

অঞ্জলি বলে, আপনি যে ডাক্তার। আপনার কথা আলাদা। আপনি জানেন এটা কোনো খারাপ ব্যারাম নয়। কিন্তু অন্যেরা ঘেন্না করবে। অনেকে ভাববে এটা এক রকমের কুষ্ঠ হয়েছে। আমিও আগে তাই ভাবতাম !

কেদার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বলে, আচ্ছা, এটার চিকিৎসা নেই। আমার যে এত বিশ্রী লাগছে, পাঁচজনের সামনে বেরোতে মনে জোর পাচ্ছি না—এর যদি চিকিৎসা থাকত ! আপনারা— ডাক্তাররা যদি আমার কাছে এটাকে আর লোকে কী ভাববে, সে ভাবনা তুচ্ছ করে দিতে পারতেন !

কেদার সহজ শান্তভাবে বলে, ও জন্য ডাক্তারের দরকার হবে না, তোমার মনের কোনো রোগ হয়নি—সে রোগের চিকিৎসাও ডাক্তার জানে। বন্ধু বলে আমায় ডেকেছ, আমিই তোমাকে ভরসা দিয়ে যেতে পারব মনে হচ্ছে। কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে ?

নিশ্চয় ! অন্য সাধারণ মেয়ের এ রকম হলে এতটা ফ্যাসাদ হত না, তুমি বেশি রকম সুন্দরী ছিলে কি না, তুমি তাই বেশি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছ। কিন্তু তোমারও সয়ে যাবে। এটা তুচ্ছ হয়ে না যাক, অভ্যাস হয়ে যাবে, বেশি আর পীড়ন করবে না। মাঝে মাঝে হয়তো খুব কষ্ট হবে—কিন্তু সাধারণভাবে একরকম ভুলেই থাকবে। বাইরেও বেরোবে, দশজনের সঙ্গে মেলামেশাও করবে, নিজের একটা জীবনও গড়ে তুলবে।

ঠিক তো ?

ঠিক বইকী। দেশের লোকের কথা যদি ভাবতে আরম্ভ করো, চিকিৎসা করলেই সেরে যায় তবু কত হাজার হাজার মানুষ রোগে ভুগে মরছে আর পঙ্গু হয়ে আছে খেয়াল করো, মনে হবে, দূর, আমার তো কিছুই হয়নি ! যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কত মানুষকে যে কানা খোঁড়া হয়ে, বীভৎস বিকৃত শরীর নিয়ে জীবন কাটাতে হয় যদি ভাব—

অঞ্জলি মন দিয়ে শুনে যায়। যাদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের দরদ জাগার ফলে ডাক্তার কেদার গীতাকে পাবার এবং ডাক্তার পাল হবার সুযোগ নিতে ইতস্তত করেছে, ডাক্তারি জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাই যে বিরাট রুগ্‌ণ জীর্ণ আহত মানবতার দিকে মনটাকে তার ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে এনেছে শুধু নিজে বড়ো হবার স্বপ্ন থেকে, তাদের কথা বেশ খানিকটা আবেগের সঙ্গেই বলে বইকী কেদার !

যদি ডাক্তার হতে, নিজে যদি দেখতে ব্যাপারটা, তুমি নিজেই ভাবতে তোমার কিছুই হয়নি !

অঞ্জলি বলে, এখন দেখছি, বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখানোর বদলে আগে আপনাকে ডাকলেই ভালো হত !

কেদার খুশি হয়ে বলে, বললাম না, ডাক্তারের চেয়ে বন্ধু তোমার বেশি কাজে লাগবে !

অঞ্জলি বলে, আপনি সত্যি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কী ঠিক করলাম জানেন ? ডাক্তারি পড়ব।

গীতা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কেদার এসেছে শুনে তার বুক কেঁপে যায়।

কেদার হয়তো তাকে হার মানাতে এসেছে !

কেদারের মুখ দেখে সে চমকে ওঠে।—কী হয়েছে ? শিগগির বলো।

কেদার শান্তভাবে বলে, তোমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তারপর আমি কী ঠিক করেছি জানাব। বড়ো আমি হব—তোমার বাবার চেয়েও বড়ো ডাক্তার হব। কিন্তু দেশের জন্য যদি কোনো দিন পথের ভিখারি হওয়া দরকার পড়ে, আপত্তি করবে না তো ?

গীতা বলে, দেশের জন্য ? এ কথা আমায় জিজ্ঞেস করছ ? সব ছেড়ে দিয়ে আজ তুমি দেশের কাজে নামো—আমি তোমার সঙ্গে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

কেদার বলে, অতটা পারব না। ঝোঁকের মাথায় ডিগবাজি খেয়ে লাভ নেই। কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পেরেছি, শুধু ডাক্তার হলে আমার চলবে না। মানে, কিছু মনে কোরো না, ঠিক তোমার বাবার মতো হতে আমি পারব না।

গীতা বলে, বাবার চেয়ে বড়ো হতে পারে এমন অনেককে ছেড়ে আমি তোমায় পছন্দ করেছি ভুলে গেছ ?

কেদার তার হাত চেপে ধরে।

বলে, আমি মন স্থির করেছি গীতু। বড়ো ডাক্তার হব আমি—যত বড়ো হতে পারি। জগতে যেখানে যত জ্ঞান আছে কুড়িয়ে আনব। শুধু বিলেত নয়, আমি সোভিয়েটে যাব, চীনে যাব। দেশে ফিরে এত বড়ো ডাক্তার আমাকে হতে হবে, এত প্রভাব অর্জন করতে হবে যাতে করতে চাইলে সত্যি কিছু করার সাধ্য হয়।

গীতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—বাঁচলাম।

কেদার বলে, আমি ভাবতাম যেটুকু শিখেছি এই পিছানো গরিব দেশে তাই নিয়ে কাজে নামাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখছি আমার ভুল হয়েছিল। আমি যা করতে চাই তার জন্য যত শেখার আছে আমাকে শিখতে হবে। পিছানো দেশ বলে শিক্ষাতেও পিছিয়ে থাকলে আমার চলবে না।

গীতার মুখে হাসি ফোটে।

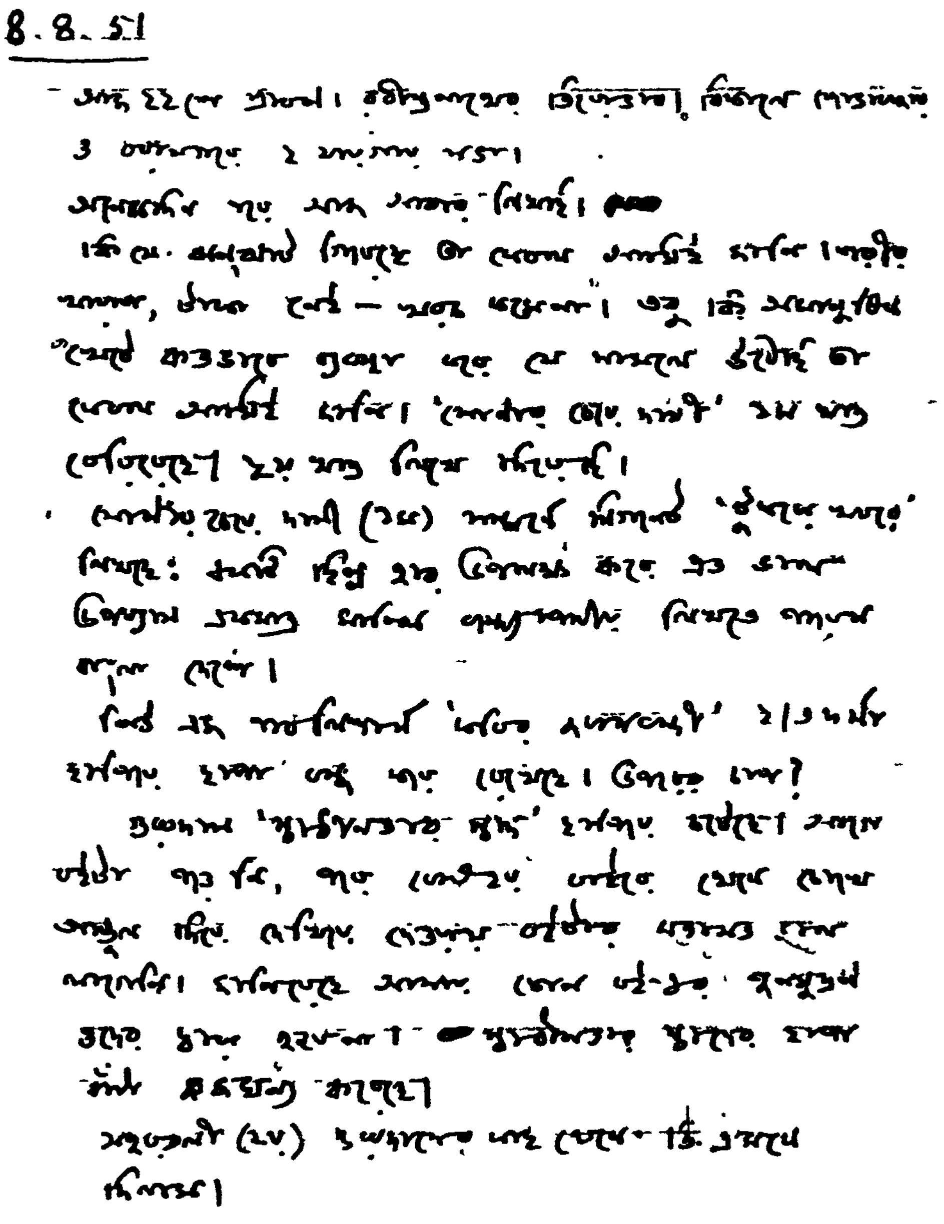

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার অংশ

সোনার চেয়ে দামি

(প্রথম খণ্ড)

সোনার চেয়ে দামি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

বেকার

১

মাসখানেক গলাটা খালি সাধনার।

সোনার হারটি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। এখানে ওখানে ছিঁড়ে যেতে আরম্ভ করার পরেও টিপিটুপে নিয়ে আর সুতো দিয়ে বেঁধে কিছুকাল গলায় লটকানো গিয়েছিল। তা ওভাবে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করাও অসম্ভব হয়ে যাওয়ায় এখন বাধ্য হয়ে বাক্‌সে তুলে রাখতে হয়েছে।

ও হার আর গলায় ঝুলানোর মানে হয় না।

পরতে গেলেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। হয় সুতোর বাঁধন নয় জোড়ের কোনো মুখ। হারটা শেষে কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে জন্মের মতো। তার চেয়ে বাক্‌সে তোলা থাকাই ভালো।

দিনরাত্রি কাটছে একেবারে শূন্য গলায়। ওই যে কথায় বলে গলায় দড়িও জোটে না সেই রকম যেন অবস্থা। সাধনা অবশ্য গলায় দড়ির কথা ভাবেও না, মুখে বলেও না। অত সস্তা মেয়ে সে নয়। কিন্তু অসুবিধাটা সত্যই সে বোধ করেছে নিদারুণভাবে। সর্বদাই কেমন একটা বিশ্রী বেআব্রু ভাব।

রাত্রে অবশ্য কেউ দেখতে আসে না গলায় তার সোনার আবরণের প্রতীক ওই আভরণটি আছে কি না। রাখালের কাছে তার কোনোরকম আব্রু দরকার হয় না এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ রাত্রির শুরু রাত সাড়ে দশটা এগারোটার পর। ভোর থেকে আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শি সবার সামনে শূন্য গলায় বার হতে হয়—এই একটানা অস্বস্তিটাই কাবু করেছে সাধনাকে।

সবাই যেন বিশেষ করে বিশেষ দৃষ্টিতে তার গলার দিকেই তাকায় আজকাল।

মুখে কিছু বলে না অনেকেই। কিন্তু মুখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায় মনে মনে তারা আঁচ করে নিয়েছে ব্যাপারটা কী।

বিশেষত সবাই যখন জানে যে রাখাল আজ অনেকদিন বেকার, ছাঁটাই হবার পর এখন পর্যন্ত আর সে কাজ জোটাতে পারেনি।

রাখাল অনেকদিন বেকার আর সাধনার গলাটা একদম খালি। দুটি সহজ সত্যের যোগ কষে দিলেই কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না অভ্রান্ত ?

সকলের অনুমান যদি সত্য হত, যদি সত্যই বেচে দেওয়া হয়ে থাকত হারটা, এতটা খারাপ লাগত না সাধনার। এ যে একেবারে মিথ্যা অনুমান ! স্বামীর বেকারত্ব তার হারটি গ্রাস করেনি, জলজ্যান্ত জিনিসটা বাস্কে তোলা আছে তবু এ রকম অন্যায় কথা সকলে ভাববে কেন ?

এটাই বড়ো প্রাণে লাগে।

মলিনার মতো যারা একনজর তাকিয়েই বলে, এ কী, গলা খালি যে ?

তারা বাঁচিয়ে দেন সাধনাকে।

বলা যায়, আর বলিস কেন ভাই !

গয়নাটার কী হয়েছে শোনানো যায়। শহরের নামকরা মস্ত জুয়েলারি দোকান একগাদা মজুরি নিয়ে কী ছাইয়ের গয়নাই গড়িয়ে দিয়েছিল, তিনটা বছর টিকল না ?

কী দশা হয়েছে দ্যাখ।

বলে, জিনিসটা বার করে দেখানোও যায়। প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ যে স্বামী বেকার বটে তবু হারটা তার বজায় আছে।

কিন্তু সবাই তো এ রকম সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে না।

শোভার মা বারবার গলার দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

অতিষ্ঠ হয়ে যেচে তাকে গয়নাটা বার করে শোভার মার হাতে দিয়ে বলতে হয়, মাসিমা, দেখুন তো কী জন্য এমন হল ? এত নামকরা দোকানের জিনিস এমনভাবে খসে খসে গেল কেন ? প্যাটার্নটার জন্যে না সোনাই খারাপ?

বেলা আসে। ছেলেবেলার বন্ধু বেলা। গলার দিকে চেয়ে বলে, পাঁচটা টাকা চাইব ভেবেছিলাম। তা বুঝতেই পারছি তোকে কে দেয় ঠিক নেই।

সাধনা ম্লান হেসে বলে, এ আর বোঝা কঠিন কী ?

সাধনা অপেক্ষা করে। বেলা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে কীভাবে কেন হারটা গেল কী বৃত্তান্ত। ভদ্রতা বাঁচিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার সম্পর্ক তার সঙ্গে বেলার নয়।

কিন্তু বেলাও এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা !

অগত্যা তাকেই যেচে বলতে হয়, গলার হারটা—

বেলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক না ভাই, শুনতে চাই না। আমি জানি।

শোন না কথাটা।

না না, আমি শুনব না। জানা কথা আবার শুনব কী ? তোকে বলতে হবে না।

একটা পরামর্শ চাইছি।

পরামর্শ ?

সাধনা হারটা বার করে। বলে, মেরামত করব, না নতুন করে গড়াব ? কোথায় দেব বল তো ? ওই বড়ো দোকানেই দেব, না সাধারণ স্যাকরার কাছে দেব ? বড়ো দোকানে সত্যি আর আমার বিশ্বাস নেই।

বেলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, হারটা তবে বেচিসনি !

সাধনাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, না।

কিন্তু এ ভাবে মুখ রাখা যায় কতজনের কাছে ? যেচে যেচে কতজনকে কৈফিয়ত দেওয়া যায় ? তার কি আর কাজ নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, দুর্ভাবনা নেই ! এর চেয়ে একটা কাগজে লিখে গায়ে এঁটে রাখাই সোজা—গয়না আমার বিক্রি হয়নি গো, তোমরা যা ভাবছ সত্যি নয় !

কিন্তু কেন এই অস্বস্তি ? এই লজ্জাবোধ ? এত তার খারাপ লাগবে কেন ? এ কথাও সাধনা ভাবে।

গুণহীন অপদার্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসর্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনেনি। খাটতে সে অরাজি নয়। যেমন প্রাণপণে খেটে কলেজে সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমনি মন দিয়ে প্রাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ি হতে পারে না। অলস হয়ে সে বসেও নেই। কাজের খোঁজে ঘোরাটাই তার দাঁড়িয়ে গেছে প্রাণান্তকর খাটুনিতে, সেই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া তিনটে টিউশনি। এত চেষ্টা করেও কাজ না পেয়ে হারটা যদি নিরুপায় হয়ে বেচেই দিয়ে থাকে রাখাল, দশজন কী ভাবছে ভেবে তার এত খারাপ লাগার কী আছে ?

আজ তো সকলেরই এ রকম দুরবস্থা। নিছক পেটের জন্য আর একবার উলঙ্গ হওয়া ঠেকাবার জন্য কত লোকে শেষ সম্বলটুকুও বেচে দিচ্ছে। তারাও নয় সেই দলে ভিড়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক।

হারটা এখনও অভাবের গ্রাসে যায়নি। কিন্তু গেলেও খাপছাড়া ব্যাপার হত না কিছুই। দশজনে যদি ধরেই নেয় যে তাই ঘটেছে, সে কেন এত বিচলিত হয় ?

যা খুশি ভাবুক না দশজনে !

কিন্তু এত ভেবেও মনে জোর পায় না কিছুতেই। কোনোমতেই সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে না যে দশজনে মিথ্যা করে তার স্বামীকে তার গলার হারটা বেচে দেবার অপরাধে অপরাধী ভাবছে।

কোথায় যেন বড়ো একটা ফাঁকি রয়ে গেছে জীবনে। শাড়ি গয়না দিয়ে দশজনের কাছে বড়োলোক সাজবে, স্বামী-সোহাগিনি সাজবে—এ চিন্তাটাও আজ হাস্যকর হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে অতল ফাঁকিতে হাবুডুবু খেতে খেতে এ সব ছেলেমানুষি ফাঁকির খেলায় আর মন মজে না, সারা গায়ে গয়না চাপানো বাসন্তীকে দেখলে শুধু হাসি পায় না, গাও যেন ঘিনঘিন করে। অথচ রাখাল তার গলা খালি করে হারটা বেচে দিয়েছে—দশজনের এই ভুল ধারণাটা অসহ্য ঠেকছে তার। খালি গলার দিকে মানুষ নজর দিলে বিশ্রী লাগার সীমা থাকছে না।

হাতে শুধু শাঁখা পরে ভোলার মা পাঁচ বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে ডিম বেচতে আসে, সে নজর দিলে পর্যন্ত !

একতলাটা দুভাগ করা। ও পাশের ভাগটা সম্পূর্ণ বাসন্তীদের দখলে। এ পাশে একখানা ঘরে সাধনা থাকে,—অন্যঘর দুখানা আশাদের। তার স্বামী সঞ্জীব ভালো চাকরি করে।

ছোটোখাটো হলেও এ ভাগের যেটা রান্নাঘর, আগে সাধনাই সেখানে রাঁধত। এখন আশাকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তাদের ভাড়া কমেছে সাত টাকা।

ভাগের দেয়ালে লাগানো তার ঘর। টিনের চালার কলঘরটার মধ্যে একটু সরু ফাঁক, ঘরে যাতায়াতের জন্য। এই ফাঁকের কোণটা ঢেকে নিয়ে সাধনা রান্না করে। উনানের ধোঁয়া আর রান্নার ঝাঁঝ জানালা দিয়ে ঘরে যায়, বসে রাঁধতে রাঁধতে মনে হয় ঘরের দেয়াল আর কলঘরের দেয়াল বুঝি গায়ে ঠেকছে দুদিক থেকেই।

বাসন্তী এসে বলে, কী রাঁধছেন ভাই। লাউখোসার ছেঁচকি ? আঃ, কী সুন্দর যে লাগে ! আমি কখনও ফেলি নে। চিংড়ি দিয়ে মুগডাল ভেজে লাউ রাঁধি, তার চেয়ে ভালো লাগে খোসার ছেঁচকি !

সাধনার চেয়ে দু-চারবছর বেশিই হবে বয়স। একটু বেঁটে, সর্বাঙ্গ পুষ্ট ও স্পষ্ট। সেই সর্বাঙ্গে যেখানে আঁটা সম্ভব সেখানেই গয়না।

বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটোখাটো ব্যাবসা করে বউকে এত গয়না দিয়েছে রাজীব।

তাও সে বউ রোজ কোমর বেঁধে ঝগড়া করে ! প্রত্যেক দিন বাসন্তীর গলা দু-একবার তীক্ষ্ণ উঁচুপর্দায় চড়ে যায়, কলহের ধারালো কথাগুলি এ পাশ থেকেও শোনা যায় স্পষ্ট।

এত গয়না গায়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালের ও পাশ থেকে ঘুরে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে। রাখাল বেকার, সাধনার গলা শূন্য, তবু যেন তার ভাবনা নেই যে ভাব করতে গেলে সাধনা পাছে কিছু চেয়ে বসে।

এক অংশে বাস করেও আশা কিন্তু তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে আশ্চর্য কৌশলে। সঞ্জীবও।

মানুষটা আশা যে বাক্‌সংযমী তা নয়। রাখালের চেয়েও বড়ো রকমের বেকার ঘরছাড়া দেশছাড়া একটা মানুষের বউ ভোলার মা ডিম বেচতে এলে সে একজোড়া ডিম কিনে দশজোড়া কথা জিজ্ঞেস করে। মানুষ এত নিরুপায় হয়েও টিকে থাকতে পারে ধারণা করা কঠিন, তাই বোধ হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে তার ভালো লাগে। সমানভাবে কথা কইতে হয় না, আলাপ করলে টাকা-পয়সা ধার চেয়ে বসবে এ ভয়ও নেই। শুধু ডিমের দামটা দিলেই চলে। বাসি বাড়তি রুটি থাকলে একখানা একটু চিনি দিয়ে ভোলার হাতে দিলে তো কথাই নেই।

পুরানো ছেঁড়া আর ময়লা হোক, ভোলার মার পরনের কাপড়খানা তাঁতের এবং রঙিন। নতুন হলে আশাও নিশ্চয় পরতে আপত্তি করত না। এই কাপড়খানাই সব সময় ভোলার মার পরনে দেখা যায়। সরকারদের মস্ত বাগানটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে তফাতে ফাঁকা জমিতে হোগলার যে খেলাঘরগুলি উঠেছে, তারই একটাতে তারা থাকে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে একটি। ওই হতভাগিই এখন নাকি সবার বড়ো দুর্ভাবনা—ভোলার বাপ-মার।

ভোলার মা কাঁদুনি গায় না। দুর্দশার সে স্তর তারা পার হয়ে গেছে। বোধ হয় সেই জন্যই নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পরেও দাম দেবার সময় আশা যখন অনায়াসে বলে, তোমার ডিমের দাম বেশি ভোলার মা !

তখন ভোলার মা রাগও করে না, নিজের দুরদৃষ্টিকে শাপও দেয় না, সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে, কী কথা কন ? এক পয়সা বেশি না ! বাজার দরে বেচি। উনি পাইকারি দরে কিনা আনেন, খুচরা দরে বেচনের লাভটুকু থাকে।

সাধনাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনে নিবেন না ?

সাধনা মাথা নাড়ে।

তার গলার দিকে চেয়েই যেন ভোলার মাও মাথা হেলিয়ে তার ডিম কেনার অক্ষমতায় সায় দেয়, না কেনাকে সমর্থন করে !

গলার কাছটা শিরশির করে সাধনার। বিছাহারের শূন্যতা যেন বিছার মতো হাঁটছে।

রাখাল পাড়ার একটি স্কুলের ছাত্রকে সকালে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পড়ায়। পড়িয়ে সটান চলে যায় মাইলখানেক দূরে আরেকটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে।

বাড়ি ফিরে নেয়ে খেয়ে বার হয়। সারাদিন ঘোরে চাকরি এবং রোজগারের চেষ্টায়—আরও কীসের ধান্ধায় সাধনা জানে না। সন্ধ্যায় রাখাল একটি ছাত্রীকে পড়ায়—দুঘণ্টা। এই টিশনিটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাসান্তে কটা টাকা পাওয়া যায় বলেই নয়, রোজ এখানে সে চা আর কিছু খাবার পায়—অন্তত দুখানা বিস্কুট।

আশ্চর্য যোগাযোগ ! সারাদিনের শ্রান্তি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু ওই চা খাবারটুকু পেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রভাকে ভালো করে পড়াতে পারে বলে প্রভারাও খুশি হয়ে তাকে রোজ চা-জলখাবার দেয়।

যেদিন বাসে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে নটা হয়। হেঁটে ফিরলে দশটা বেজে যায়।

হেঁটে ফিরলে সাধনা বলে, ছটা পয়সা বাঁচালে। দেহের ক্ষয়টা হিসাব করেছ ? যে রোগটা হবে দুশো টাকায় সারাতে পারবে ?

রাখাল মুখ বাঁকায়।—রোগ হলে আর সারাবে কে ? জ্যোৎস্নারাত, বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। ছ পয়সায় সিগারেট কিনলাম তিনটে।

সাধনা চুপ করে থাকে। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেট কিনতে হবে, তার অজুহাত হল জ্যোৎস্নারাত। সিগারেট কেনার দায়ে রাখাল হেঁটে আসে নি, জ্যোৎস্নারাত দেখে শ্রান্তক্লান্ত অভুক্ত দেহটাকে মনের আনন্দে দু মাইল পথ হাঁটিয়েছে।

খেয়ে উঠে সাধনা মাই দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়। বড়ো হয়েছে, দস্যুর মতো আধ-শুকনো মাই টানে ছেলেটা, বহুক্ষণ মাই দুটি তার টনটনিয়ে থাকে। পোয়াটেক গোরুর দুধ না বাড়ালে আর চলে না।

হঠাৎ তাই সখেদে বলে, হারটার ব্যবস্থা করবে না ? খালি গলায় থাকতে পারব না আমি। নতুন তো চাইছি না, সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। সোনা আছে, শুধু মজুরি দিয়ে গড়িয়ে দেবে, তাও জুটবে না কপালে ? দশজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না !

রাখাল কথা বলে না। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেটের একটি আধখানা টেনে নিভিয়ে রেখেছিল, সকালে খাবে। সেটা নিয়ে রাখাল ধরায়। ঘুম আসছে। ঘুমোলেই একেবারে সকাল। তবু মনে হয় সকালের এখনও অনেক দেরি।

মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকলেও দু-চারজনের কাছে যেচে যেচে কৈফিয়ত দিয়ে আর হারটা যে তার বজায় আছে তার প্রমাণ দেখিয়েই সাধনা দিন কাটিয়ে দিত।

মুশকিল হল হঠাৎ রেবার বিয়েটা ঠিক হয়ে যাওয়ায়।

রেবা রাখালের দিদি অণিমার বড়ো মেয়ে।

বিকালে রেবার বাবা প্রিয়তোষ স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খবরটা দিতে এবং নিমন্ত্রণ জানাতে আসে।

আচমকা সব ঠিক হয়ে গেছে, আগে থেকে কিছুই জানতে পাবেনি, কদিন বাদেই বিয়ে—এত অল্প সময়ের নোটিশে মেয়েব মামা-মামিকে একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসার অপরাধটা প্রিয়তোষ যেন কিছুতেই হজম করতে পারছে না। বারবার সে বলে যে আগের দিন না পারলেও বিয়ের দিন সকালবেলাই তাদের যাওয়া চাই, না গেলে চলবে না। তারা তিন ভাই, ভিন্ন হলেও তিন ভায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রথম বিয়ে হচ্ছে তার মেয়ের—মেয়ের মামা-মামি না গেলে দশজনের কাছে তারা মুখ দেখাতে পারবে না।

অণিমা বলে, তোমরা না গেলে আমারও কিন্তু মাথা কাটা যাবে ভাই। শুধু রাখালকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যেন আবার নিয়ম রক্ষা কোরো না !

অণিমা তার খালি গলার দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে জেনে জোর করে হেসে সাধনা বলে, কী যে বলেন, রেবার বিয়েতে আমি যাব না ?

পরিতোষ বলে, আমরা বরং একটু বসি। রাখালকে নিজে বলে যাব। ও আবার যে রকম মানী লোক—

ওর ফিরতে রাত দশটা।

তাহলে অবশ্য মহাবিপদ। রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকা তো সম্ভব নয় প্রিয়তোষের পক্ষে। কাল পরশু আবার যে একবার আসবে তাও অসম্ভব। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, কতদিকে যে ঝামেলা—

সাধনা হেসে তাকে অভয় দিয়ে বলে, আমায় তো বলে গেলেন, তাতেই হবে।

তার খালি গলার দিকে বিশেষভাবে চেয়ে থেকে প্রিয়তোষ যেন সংশয়ভাবে বলে, হবে তো ? না মরি বাঁচি যে করে পারি—

না না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওর দেখা পাওয়া মুশকিলের কথা। এমনিই ছুটোছুটির অন্ত নেই, তার ওপর আরেক কাজ জুটল, আমার বিয়ের হারটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, দু দিনের মধ্যে সারিয়ে এনে দিতে হবে। আজ করি কাল করি করে অ্যাদ্দিন করেনি, বাক্সে ফেলে রেখেছি হারটা। এবার তো আর গড়িমসি করলে চলবে না। মামি তো আর খালি গলায় হাজির হতে পারবে না প্রথম ভাগনির বিয়েতে।

অণিমার মুখ থেকে ছায়া সরে যায়। প্রিয়তোষ পরম পরিতুষ্ট হয়ে নস্যি নেয়। সাধনার গলা খালি দেখে সেও সত্যি ভড়কে গিয়েছিল। এতক্ষণে সে সিঙাড়ার কোণ ভেঙে মুখে দেয়, ঠান্ডা চায়ে চুমুক দেয়।

একখণ্ড ফেলনা কাগজে রাখালের নাম নিজে সই করে পাড়ার ছেলে নন্দকে দিয়ে শ্রীভারতী থেকে চা ও সিঙাড়া আনিয়ে সাধনা কোনোমতে এদের কাছে মানমর্যাদা রক্ষা করেছে। দোকানটা কাছে, তিনটি বাড়িব পরে বাসচলা বড়ো রাস্তার ধারে পাড়ার রাস্তার মোড়ে—পাকিস্তান থেকে

গোড়ার দিকে যারা এসেছিল তাদের একজন, নাম শ্রীসীতাপতি সাহা, মোড়ে বাড়ি করেছে এবং জয়েন্ট রেস্টুরেন্ট ও ময়রার দোকান খুলেছে। ঘর একটাই, একপাশে কাঁচওয়ালা আলমারিতে রসগোল্লা পান্তুয়া প্রভৃতি সাজানো অন্যপাশে তিনটে ডেস্ক ও বেঞ্চে বসে খাবার বা চা পানাদির ব্যবস্থা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট মামলেট ভেজিটেবল চপ পাওয়া যায়, তার বেশি কিছু নয়, মাংসাদি অপ্রাপ্য। অনেকেই সিঙাড়া দিয়ে চা খায়—সারাদিন শ-দুই লোক। প্রথম প্রথম রাখালের সঙ্গে সাধনা সিনেমা দেখতে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য এই দোকানে চা সিঙাড়া খেত।

সে অনেকদিনের কথা। টাকা ত্রিশেক বাকি পড়েছে। তবু এখনও সাধনা তার স্বামীর নাম-সই-করা কাগজের টুকরো পাঠালে দোকান থেকে খাদ্য আসে।

কারবার ছিল সোনার। দোকান দিয়েছে খাবাবের। মেয়েবা স্লিপ পাঠালেই সীতাপতি মুখ বুজে খাবার পাঠায়।

চা খাবার খেয়ে আপনজনেরা বিদায় নেয়।

এদিকে সাধনার মনে হয় মাথায় যেন তার বজ্রাঘাত হয়েছে। এমনি না হয় এক রকম চলে যাচ্ছিল, খালি গলায় সে বিয়ে বাড়িতে যাবে কী করে ? আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সবাই জড়ো হবে সেখানে, কোন মুখে সে গিয়ে সকলেব সামনে দাঁড়াবে ?

অথচ না গেলেও সে হবে আরেকটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। ওরা নিজে এসে এত করে বলে গেছে, আগেরদিন তারা যদি নিজে থেকে না যায়, পরদিন সকালে নিশ্চয় ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হবে প্রিয়তোষ নিজে কিংবা তার ছেলে কিংবা অন্য কেউ।

না যাবার কোনো অজুহাত নেই।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে সাধনার। এমনভাবে ভিতরটা জ্বালা করে যে সে নিজেই বুঝতে পারে রাখালের উপর এত রাগ আজ পর্যন্ত কখনও তার হয়নি। রাখাল বাড়ি থাকলে আজ এখন বীভৎস কলহ হয়ে যেত। অন্ধ বিদ্বেষে অবুঝের মতোই আঘাত হানত সাধনা।

রাত দশটা পর্যন্ত সময় পাওয়ায় এই মারাত্মক আক্রোশটা তার খানিক জুড়িয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে নিজেই বুঝতে পারে যে এ রকম মবিয়া হয়ে শুধু ঘা দেবাব জন্য আঘাত করার কোনো মানে হয় না। সে রকম সাধ থাকলে এতদিনে রাখালকে সে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারত—নিজেও সেই সঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে।

কিন্তু ক্ষোভ যাবার নয়। রেবার বিয়েতে যাওয়া না যাওয়ার সমস্যা মিটে যায়নি।

রাখাল বাড়ি ফেরামাত্র তাকে খরবটা জানিযেই তিক্তস্বরে না বলে সে পারে না, নতুন কিছু কিনে দেবে সে আশা ত্যাগ করেছি। ভাঙা জিনিসটা শুধু সারিয়ে দেবে, এতদিনে তাও পারলে না, বলে বলে মুখ ব্যথা হয় গেল ! এখন আমি কী উপায় করি ?

আগে যদি তেমন করে বলতে—

সাধনা ঝেঁঝে ওঠে, তেমন করে ? মানুষ আবার কেমন করে বলে ! আমি বলে চুপ করে থাকি, সব সয়ে যাই। অন্য কেউ হলে—

সাধনা অন্য কেউ হলে কী হত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখালের নেই, তবে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। চারিদিকে গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি করে তার মতো উপায়হীনদের পাতা সংসার, প্রাণপাত করেও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। মেজাজ আর তিক্ততার অনেক নমুনাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে সোনার গয়না নিয়েও দু-চারটা কুৎসিত মর্মান্তিক ঘটনা কী আর ঘটে না।

রাখাল নিশ্বাস ফেলে বলে, জানি, অন্য কেউ হলে আমায় ঝাঁটা মারত। আমিও সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতে আসল ব্যাপারের এতটুকু সুরাহা হত না। তোমার সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি তাই—

তামাশা কোরো না।

তামাশা করিনি। এ রকম সস্তা তামাশা আমি করি ? তুমি জানো ওটা সারানো যাবে না, নতুন করে গড়তে হবে।

তাই তো বলছি আমি। সোনা কিনে নতুন জিনিস গড়িয়ে দিতে বলেছি তোমায় ? শুধু মজুরিটা দিয়ে—

চোখে জল এসে যায় সাধনার। চোখ মুছে বলে, এটুকু অন্তত বুঝবে তো তুমি ? এতটুকু তো তাকাবে আমার দিকে ? কদ্দিন হয়ে গেল খালি গলায় সসংকোচে বেড়াচ্ছি। রেবার বিয়ে এসে গেল, এবার কী উপায় হবে ? শুধু মজুরি দিয়ে জিনিসটা যদি করিয়ে রাখতে, আজ এ বিপদ হত ?

মজুরিও তো সোজা নয়। ওদের দোকানে বেশি মজুরি নেয—পঞ্চাশ টাকার মতো লেগে যাবে। বাজে দোকানে সস্তা হয়, কিন্তু দিতে ভরসা হয না। আমি তাই ভাবছিলাম—

তাই করো তুমি, ভেবেই চলো। আমি এদিকে সং সেজে বিয়ে বাড়ি যাই। অন্য হারটা নিয়েছ মনে আছে ?

মনে আছে ? সাধনা তাকে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশের সুরে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোটো হারটি বেচে দেবার কথা রাখালের মনে আছে কিনা—এখনও দু-মাস হয়নি ! বিয়েতে দুটি হার পেয়েছিল সাধনা। চাকরি থেকে আচমকা বেকারত্বে আছড়ে পড়াটা গোড়ার দিকে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে সাধনাই এক রকম জোর করে তাকে দিয়ে ছোটো হারটি বিক্রি করিয়েছিল। রাখাল নিজেই বরং ইতস্তত করেছিল কয়েকদিন। সাধনা দ্বিধা করেনি। বাড়তি ওই হারটা মানেই যখন কিছু নগদ টাকা, কেন তারা অনর্থক অচল অবস্থায় হিমসিম খাবে, পরদিন কী দিয়ে রেশন আনা বাজার করা হবে ভেবে কূলকিনারা পাবে না ? চাকরি কি আর হবে না রাখালের ? তখন আবার সে তাকে গড়িয়ে দেবে ও রকম একটি সোনার হার। কিছু লোকসান হবে—সোনার কারবারিরা সোনা কেনেও লাভ রেখে বেচেও লাভ রেখে। কিন্তু তার আর উপায় কী !

তখনকার চেয়ে আজ তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে, কষ্ট তারা করছে অনেকগুণ বেশি। সেদিন বোধ হয় তারা কল্পনাও করতে পারত না যে এ রকম অনটন সয়েও জীবন থেকে প্রায় সব কিছুই ছাঁটাই করে দিয়ে আধা উপবাসেও তারা বেঁচে থাকবে। মাসে মাসে চাকরির বাঁধা মাইনে বন্ধ হওয়ামাত্র সবদিক দিয়ে এই চরম কষ্ট যেচে বরণ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে আবার একটা কিছু জুটে যাবে এই আশাও সেটা সম্ভব হতে দেয়নি। সম্ভব হলে তাদের সামান্য সম্বলটুকু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত না।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সাধনা সে জন্য কখনও আপশোশ করেনি। যা সম্ভব ছিল না সে জন্য দুঃখ কীসের ? সম্বল খুইয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার বদলে চরম দুর্গতির এই স্তরে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লে হয়তো তারাই শেষ হয়ে যেত। এখনও তবু তারা টিকে আছে, এখনও লড়াই করছে, এখনও আশা আছে সুদিনের। এটুকু বুঝবার মতো সহজ বুদ্ধি সাধনার আছে।

কিন্তু আজ তার হয়েছে কী ? এমন অবুঝের মতো কথা বলছে কেন ? সাধনা কি জানে না নতুন হার গড়াবার মজুরি দেবার ক্ষমতাও তার নেই ? সারা মাস টুইশনি করে যা পায় অনটন সেটা শুষে নেয় তপ্ত তাওয়ায় জলের ফোঁটার মতো ?

নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলিও তাদের মেটে না ? জেনেও আজ এ ভাবে নালিশ জানাচ্ছে, অনুযোগ দিচ্ছে। সেই হারটির কথা তুলে খোঁচা দিতে তার বাধছে না !

সব দিকে সব বিষয়ে এত হিসাব বুদ্ধি বিবেচনা ধৈর্য সাধনার, আজ গয়নার ব্যাপারে সে সম্ভব অসম্ভব ভুলে গেল ?

দুঃখে চোখে জল আসতে পারে। মাঝে মাঝে কাঁদাও দুঃখেরই অঙ্গ। তাতে শুধু ক্ষতি নেই নয়, সেটা ভালোই। কাঁদলে দুঃখের চাপ কমে যায়। সাধনাকে কাঁদতে দেখলে একটা অদ্ভুত অসহ্য কষ্টে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় রাখালের। কিন্তু তার সহজ বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে দেখে কষ্টবোধের সঙ্গে জাগে দারুণ একটা আতঙ্ক।

মনে হয়, সর্বনাশ। তাহলে তো আর বাঁচা যাবে না !

সাধনা যদি ধৈর্য হারায়, অবুঝ হয়ে পড়ে, এ অবস্থায় বাঁচার লড়াই চালাবার সবচেয়ে বড়ো অবলম্বনটাই সে যদি হারায়, দুজনেই তারা শেষ হয়ে যাবে।

ঘুমের মধ্যে খোকা স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। দু বছরের শিশুর স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠার মধ্যেও কেমন একটা অস্বাভাবিক আর্ত সুর। বিকৃত বিভ্রান্ত নিঃস্ব জীবনের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিক্ষোভ এতটুকু অবুঝ শিশুর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভয়ের স্বপ্ন যেন হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভয়ংকর কিছু।

ছেলেকে থাপড়ে শান্ত করতে গিয়ে সাধনা নিজেও যেন শান্ত হয়ে যায়। তার স্বাভাবিক হিসেবি সুরে বলে, আমি বলি কী, এটা বেচে দাও। ওই টাকায় কম সোনার তৈরি হার একটা কিনে ফেলি। একটু সরুই নয় হবে।

না।

কেন ? দোষ কী ?

তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলিনি। তোমার ওই হারটা বেচবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার গায়ের একরতি সোনা জীবনে কখনও বেচব না।

এতক্ষণে সাধনার মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। সেই সকালে তেলের অভাবে বেগুন-ভাজার বদলে বেগুন-পোড়া দিয়ে দুটি খুদ মেশানো চালের ভাত খেয়ে উপার্জনের ফিকির খুঁজতে বেরিয়ে রাখাল রাত প্রায় দশটায় বাড়ি ফিরেছে, এটা কি এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে ? মনে পড়েছে বেকারির খাটুনিতে শ্রান্ত ক্লান্ত আধমরা মানুষটাকে একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করাও দরকার ?

তার হাসি দেখে এই সন্দেহই জাগতে থাকে রাখালের মনে। নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। আর সহ্য হয় না। বোমার মতো ফেটে গিয়ে আজ সাধনাকে চরমভাবে বুঝিয়ে দেবে যে তার কাছে এরকম ফাঁকা হাসি আর ন্যাকামির কোনো দাম নেই।

সাধনা শুধু মুখ ফুটে একটা মিষ্টি কথা বলুক ! তাই যথেষ্ট মনে করবে রাখাল।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, আমি কিছুই ভুলিনি। গা জ্বলে গিয়েছিল তোমার কথা শুনে।

বোমার মতো ফাটার বদলে রাখাল ঝিমিয়ে যায়—তাই নাকি ! কিছু তো বলোনি !

গা জ্বলে গিয়েছিল বলেই বলিনি। বললে ঝগড়া হত। সেদিন বলিনি, আজ বলছি। হারটা বুঝি বেচেছিলে তুমি ? গয়না আমার, তুমি বেচবে কী রকম ? আমার গয়নারও মালিক নাকি তুমি যে ও রকম প্রতিজ্ঞা কর ? সেবারও আমার গয়না আমি বেচেছিলাম, এবারও আমি বেচব। সেবারের মতো এবারও আমার হয়ে তুমি দোকানে যাবে এইমাত্র।

তাই নাকি !

তা নয় ? তুমি পরামর্শ দিতে পার, বারণ করতে পার, ধমক দিতে পার—একবার কেন, একশোবার ! তুমি জোর করে বললে আমি কি সত্যি সে হারটা বেচতাম, না এটা বেচব ? সে হল আলাদা কথা। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বললে কিনা। ও রকম প্রতিজ্ঞা তুমি করতেই পার না।

রাখাল আলনায় ঝুলানো জামার পকেট থেকে আধখানা সিগারেট বার করে এনে ধরায়। এই আধখানা সিগারেট তার রাত্রে খাওয়ার পর টানার জন্য বরাদ্দ করা থাকে। তিক্তস্বরে বলে, প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি। তোমার গয়না তুমি বেচবে কি না বেচবে সেটা ভিন্ন কথা। আমার দরকারে মরে গেলেও আমি তোমার গয়না নিয়ে বেচব না, এ প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি।

না, তাও তুমি পার না। দরকার কি তোমার একার ? ফুর্তি করে উড়িয়ে দেবার জন্য মরে গেলেও বউয়ের গয়না নেবে না, তুমি কি এই প্রতিজ্ঞা করার কথা বলছ ? সংসার চালাবার দরকার তোমার যেমন আমারও তেমনি।

সাধনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কার কীসে কতটা দরকার বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। এতক্ষণের তর্কবিতর্ক রাগ আর ঝাঁঝালো অভিমান কোথায় উড়ে যায় কে জানে, আতঙ্কে রাখালের বুক ধড়ফড় করে। কোথায় গেল সাধনা ? কিছু করে বসবে না তো ?

একপলকে সে বুঝে গেছে, এ সমস্তই ফাঁকি। দশজনের মতো বউ ছেলে নিয়ে সংসার করতে চায় অথচ সংসার করবার জন্য দরকারি পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা তার নেই, নানা প্যাঁচালো কথায় সে তাই সাধনাকে মজিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে খাড়া রাখতে চায় সাধনার কাছে।

স্বামী রোজগার করবে আর বউ ঘর সামলাবে এই চিরন্তন রীতির সংসারটা আজও তার কাম্য হয়ে আছে—অচল হয়ে এলেও যে ভাবে হোক চালিয়ে যেতে হবে। ভিত্তিটা সে বজায় রাখতে চায় আগের দিনের—অথচ আসলেই তার ফাঁকি। সংসার আছে, রোজগার নেই। সংসারের মায়া আছে, রোজগারের সামর্থ্য নেই।

সাধনা ফিরে এসে বলে, তবে তাই ঠিক রইল। সকালে আগে এটা করবে, তারপর অন্যকাজ। খাবে এসো।

আমি তো খাব না।

চোখ বড়ো বড়ো করে সাধনা বলে, খাবে না মানে ? ছেলেমানুষি কোরো না !

ছেলেমানুষের মতো সে ভাতের উপর রাগ করতে পারে ভেবে সাধনা যে ভঙ্গি করে তাতে হঠাৎ তাকে ভারী সুন্দর মনে হয় রাখালের। অনেকদিন পরে মনে হয়। এবং সে জন্য এটাও তার খেয়াল হয় যে সাধনার রূপ-লাবণ্যে আজকাল বেশ ভাটা পড়েছে। তাকে আদর করাও আজকাল এক রকম হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাবে নয়। শক্তি আর ইচ্ছার অভাবে।

খাব না মানে খেয়ে এসেছি। প্রভাদের বাড়ি খাইয়ে দিল।

সাধনা বলে, এতক্ষণ বলোনি ?

বলবার সময় দিলে কই ? ঘরে পা দেওয়ামাত্র গয়নার কথা আরম্ভ করলে।

আমি তবে খেয়ে আসি।

ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাখালের একটা গুরুতর কথা মনে পড়ে যায়। সাধনাকে কথাটা বলতে তার এক মুহূর্ত দেরি সয় না, তাড়াতাড়ি উঠে যায় রোয়াকের কোণে সাধনা যেখানে খেতে বসেছে।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সাধনার।

তুমি তো শুধু নিজের গলার ব্যবস্থা ঠিক করলে। একটা কথা ভেবেছ ?

কী কথা ?

রেবাকে কিছু দিতে হবে না ?

সাধনার হাত অবশ হয়ে ভাতের গ্রাস পড়ে যায়। সুখের বিষয় থালাতেই পড়ে। ভাতের বড়োই টানাটানি আজকাল।

রাখাল চেয়ে দ্যাখে, অ্যালুমিনিয়মের ভাতের হাঁড়িটা শূন্য, সাধনা চেঁছেপুঁছে সব ভাত বেড়ে নিয়েছে। ডালতরকারির পাত্র দুটিও চাঁছামোছা।

অর্থাৎ সে আজ বাইরে থেকে খেয়ে না এলে যে ভাত আর ডালতরকারি দুজনে ভাগ করে খেত, সাধনা একাই তা খেয়েছে। অনেকদিন পরে আজ তাদের পেট ভরেছে দুজনেরই ! তার ভরেছে বড়োলোকের বাড়ির মাংসভাতে, সাধনার ভরেছে স্বামীর ভাগের অন্নটুকু বাড়তি পেয়ে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হেঁশেল তুলে ঘরে গিয়ে সাধনা বাক্‌সো খোলে। কিনে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, নিজের বিয়েতে পাওয়া কিছু দিয়ে যদি মান রক্ষা করা যায়।

গম্ভীর মুখে হুকুমের সুরে রাখাল বলে, সোনার কিছু দিতে পারবে না।

সাধনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—কানপাশাটা নতুন আছে। ওটাই দেব।

তোমার কানপাশা যদি তুমি রেবাকে দাও—

কী করবে ? মারবে ? একটা কিনে দাও, আমারটা দেব না। বারোআনি সোনাতেই কানপাশা হবে।

আমরা রেবার বিয়েতে যাব না।

তুমি না যেতে পার, আমি যাব।

আজ রাত্রে তারা অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়েছে।

আজ রাত্রেই অনেকদিন পরে তাদের সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি সামনাসামনি সংঘাত বাঁধল।

একেবারে চুপ হয়ে গেল দুজনে। পেটভরা অন্ন আর বুকভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে দেয় ?

২

এ কী রকম কলহ ? এতখানি ভদ্র ও মার্জিত ? স্বামী নিষেধ করে দিল, আমার ভাগনির বিয়েতে তোমার বিয়ের গয়না দেওয়া চলবে না। স্ত্রী জানাল, এ হুকুম সে মানবে না। স্বামী বাতিল করে দিল তাদের বিয়েতে যাওয়া। স্ত্রী জানাল, আরেকজন যাক বা না যাক, সে যাবেই।

সেখানেই শেষ।

একটা কটু কথা নয়, রাগারাগি চেঁচামেচি নয়, গলায় দড়ি দিয়ে বা যেদিকে দু চোখ যায় চলে গিয়ে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা নয়, একপক্ষের কপাল চাপড়ানো আর অন্যপক্ষের কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া নয়—এ রকম কিছুই নয় !

একটু নীরস রুক্ষ রাগতভাবে পরস্পরের অ-বনিবনাটা যেন শুধু পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হল।

তবু দুজনেরই মনে হল বিয়ের পর আজ তারা প্রথম সত্যিকারের কলহ করেছে, একেবারে চরম কলহ, লঘুক্রিয়াতে যা শেষ হবে না।

সংযত ভদ্রভাবেই পরস্পরের বুকে যেন তারা বিষমাখা শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

যার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকতে হল তাদের।

তারপরেও অবশ্য সাধারণ দরকারি কথা হল সাধারণভাবেই। খানিকটা প্রাণহীন উদাসীনতার সঙ্গে। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটল দুজনের। প্রাণের জ্বালায় কিছুতে ঘুম না আসায় দুজনের মনে হল ভালোবাসার খেলায় হয়তো বা এই নিষ্ঠুর ব্যবধান খানিকটা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। অন্তত সামঞ্জস্য ঘটানো যাবে খানিকটা।

কিন্তু চাইলেই যেমন চাকরি মেলে না, শুধু সাধ হলেই তেমনি বিবাদও ঘুচে যায় না মানুষের। সাধের সাধ্য কী বাস্তবকে বাতিল করে দেয় !

সকালে পাড়ার ছেলেটিকে পড়াতে গিয়ে রাখাল ভাবে, তার ছাত্রটির মা-বাবার মতো প্রাণ খুলে কোমর বেঁধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তারা যদি ঝগড়া করতে পারত, ওদের মতোই আধঘণ্টার মধ্যে আবার সবে মিটমাট করে নিতে পারত নিজেদের মধ্যে—যেন কিছুই ঘটেনি!

সকালবেলা কলতলায় জলের জন্য দাঁড়িয়ে বাড়ির পাশের অংশের নতুন ভাড়াটে রাজীবের স্ত্রী বাসন্তীর চড়া ঝাঁঝালো সরু গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে সাধনা ভাবে, ছোটোবড়ো সব ব্যাপারে সেও যদি এ রকম যখন তখন মেজাজ দেখাত আর রাখাল সেটা সয়ে যেত!

রাখালের সকালের এই ছাত্রটি সতীশ মল্লিক চৌধুরীর ছেলে বিশু। দেবেন ঘোষের দোতলা বাড়িটা কিনে নিয়ে সতীশ সপরিবারে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে বসবাস করতে এসেছে। বিশু সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে, বুদ্ধি একটু ভোঁতা। কিন্তু মুখস্থ করে পরীক্ষায় বেশ পাশ করে এসেছে বরাবর।

গোড়ায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাকে পড়া বোঝবার চেষ্টায় রাখাল হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে এখন সে বিশুকে যতটুকু তাব সহজবোধ্য ততটুকু বুঝিয়ে বাকি পড়া মুখস্থ করতে দেয়।

মাসকাবারে বেতনের টাকা নেবার সময় মনটা একটু খচখচ করে। কিন্তু উপায় কী। একটি ছাত্রের সঙ্গে লড়াই করে সে তো সংসারের একটা ব্যবস্থা পালটে দিতে পারবে না একা।

সতীশ ছেলেমেয়েকে দামি পেস্ট আর দাঁতের বুরুশ কিনে দিয়েছে, নিজের কিন্তু তার দাঁতন ছাড়া চলে না। ছত্রিশ হাজার টাকায় কেনা তার এই বাড়িটাতে যেটা ছিল পৃথক কিন্তু পাকা বাথরুম, সেটাকে সে পরিণত করেছে গোয়ালঘরে। তিনটি গোরুর মধ্যে একটি গাভিন, অন্য দুটি দুধ দেয়।

একটির বাছুর মরে গেছে। দেশে সতীশেরা বাছুর-মরা গোরুর দুধ খেত না। এখানে গয়লা রামেশ্বরের পরামর্শে মরা বাছুরের চামড়া খড়ে জড়িয়ে বাঁশের বাতার ঠ্যাং লাগিয়ে সামনে রেখে গোরুটির দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে এ গোরুর দুধটা ছেলেমেয়েরাই খায়। বাছুরওয়ালা গোরুটির দুধ ভিন্ন দোয়া হয় সতীশের জন্য, জ্বালও দেওয়া হয় ভিন্ন কড়াইয়ে। নিয়ম-ভাঙা অনিয়ম তার চেয়ে ছেলেমেয়েদের পক্ষে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

দোতলায় কোনার ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকখানা আছে কিন্তু সেখানে সতীশ বসবে নিজে। অন্তঃপুরে নিরিবিলিতেই ছেলেপিলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ছেলের মাস্টারও খানিকটা গুরুজাতীয় মানুষ। পরের মতো তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখতে মন খুঁতখুঁত করে। শিক্ষাদানের মতো পুণ্যকাজটা তিনি বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরে করবেন এটাই সঙ্গত।

ভক্তিভাজন পুণ্যকর্মা মানুষ বলেই বাড়ির লোকের সাধারণ চা-খাবারের ভাগ রাখালকে দেওয়া হয় না। বিশু খাবার খায়, একবাটি দুধ খায়, রাখাল জানালা দিয়ে খানিক তফাতে ফাঁকা মাটির মধ্যে ছেলেখেলার ঘরের মতো ছোটো ছোটো কুঁড়ে দিয়ে গড়া উদ্‌বাস্তুদের কলোনিটার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলার মা ওই কলোনি থেকে ডিম বেচতে বেরোয় চারিদিকের পাড়ায়।

দেখা যায়, রাস্তার কলটাতে কলোনির দশ-বারোটি মেয়ে বউ ভিড় করেছে।

পূজাপার্বণের প্রসাদ মাঝে মাঝে রাখাল পায়। বিশুর মা অথবা তার বিধবা বোন নির্মলা থালায় সাজিয়ে ফলমূল নাড়ু মোয়া তক্তি সন্দেশ ইত্যাদিতে প্রায় পনেরো-বিশরকমের প্রসাদ এনে দেয়।

বলে, প্রসাদ খান।

বিশুর মার রং কালো। দেহটি যেন সযত্নে কুঁদে গড়া। কে বলবে তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড়ো মেয়ের বয়স সতেরো-আঠারো এবং সম্প্রতি মেয়েটির একটি ছেলে হওয়ায় সে দিদিমা হয়েছে। পয়সারও অভাব নেই—অন্তত এতকাল মোটেই ছিল না—খাটবার লোকেরও অভাব নেই, তবু প্রাণের উল্লাসে বিশুর মা সংসারের পিছনে কী খাটুনি খাটে আর কত নিয়মনীতি মেনে চলে দেখে রাখাল বুঝতে পেরেছে তার দেহের ঠাট কীসে এ রকম বজায় আছে।

শুধু ভালো খাওয়া ভালো থাকার জন্য নয়। দেহ মনের সমস্ত অকারণ ক্ষয়ক্ষতি নির্যাতন বর্জন করার জন্য। সতীশের সঙ্গে যখন তখন ঝগড়া করে কিন্তু মানুষটা সোজা সহজ সংযমী-সংস্কার কুসংস্কার গ্রাম্যতা সভ্যতা নিয়মনীতি সমেত নিজের জীবনে মশগুল। স্বামীর সঙ্গে কলহ তার কাছে সংসারধর্ম ঠিকমতো পালন করারই একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার, তার বেশি কিছু নয় !

ব্রত-পূজাপার্বণের উপলক্ষে বিশুর মার উপবাস লেগেই আছে। আজ বা এ মাসে এটা খেতে নেই, কাল বা ও মাসে ওটা খেতে হয়, এ সব নিয়ম পালনের ব্যাপারেও সে খুব কড়া।

প্রথম প্রথম অবজ্ঞার হাসি ফুটত রাখালের মুখে। ভাবত, ময়রার অরুচি জন্মে মিষ্টান্নে। সব রকমের পুষ্টিকর সুখাদ্য যার এত বেশি জোটে যে শুধু চেখে দেখতে গেলে পেট খারাপ হতে বাধ্য, সে ব্রতপার্বণের অজুহাতে উপোস করবে না তো করবে কে ?

ক্রমে ক্রমে সে বুঝেছে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাটা। বুঝেছে সাধনাকে পেট ভরে খেতে না পেয়ে চোখের সামনে রোগা হতে যেতে দেখে। পুষ্টিকর খাদ্য সে পায় না, আগেও পেত না। সে অতীতকে আজকের তুলনায় তার সুদিন মনে হয়, তখনও তার খাদ্য ছিল সাধারণ ডালভাত। তবে পেটটা তখন দুবেলা ভরত, আজ তাও ভরে না।

বিশুর মা চিরিদিন দুধ ঘি মাছ খেয়েছে, আজও খায়। কিন্তু উপোস আর খাদ্যের এত বাছবিচার তার ভালো জিনিসে অরুচির জন্য নয়। শরীর রক্ষার জন্যই এ সব তাকে পালন করতে হয়। নিয়মিত শাঁসালো খাবার খাওয়ার এটাই হল নিয়ম। বারোমাস মাছ দুধ ক্ষীর সব ঠিক এ ভাবেই খেতে হয়। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে।

কিন্তু এ দেশে বিশুর মার মতো জমিদার গিন্নি হবার ভাগ্য আর কজনে করেছে। বারোমাস যারা পেট ভরে ডালভাতও পায় না তারাও তো এ সব ব্রতপূজার নিয়ম মানে, উপোস করে। এমনিই যাদের কম বেশি নিত্য উপবাস, তাদের বেলাও বাড়তি উপোসের প্রথা কেন ?

বাইরে ঠিকা ঝি মায়ার গলা শোনা যায়, ও বেলা এসবোনি মা, আগে থেকে বলে রাখলুম। দুদিন উপোস আছি।

বিশুর মা বলে, উপাস খালি তুমি করছ নাকি ? আমরা উপাস করি না ? উপাস কইরা কাম করন যায় না ?

তা জানিনে মা। ও বেলা পূজা দিতে যাব।

তাই কও, পূজা দিতে যাইবা।

সেই পুরানো দিন থেকে এ সব উপোসের বিধি চলে আসছে, সবাই যখন পেট ভরে খেতে পেত ? ও রকম দিন কি কখনও ছিল এ দেশে ? কেউ গরিব ছিল না, সবাই মিঠাই মন্ডা যত খুশি খেত ? রাখাল বিশ্বাস করে না। দরকার মতো অন্ন পেত মানুষ, সাধারণ শাকান্ন। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে খেতে হয় এমনি সব ছাঁকা ছাঁকা খাদ্য সকলের জুটত বারোমাস, এ অবাস্তব কল্পনা।

বাড়ির ঝি মায়ার বয়স সাধনার চেয়ে বেশি হবে না। বারান্দা মুছতে মুছতে সে দরজার সামনে আসে। ঠাকুর ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত তার মুছবার সীমা, চৌকাঠ পার হওয়া বারণ।

গরিবের সাধ করে উপোস দিয়ে লাভ কী বাছা ?

হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ঘর-মোছা ন্যাতা উঁচু করে ধবে মায়া একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু আচমকা বলেই কথাটা সে হাল্কা ভাবে নেয় না। এ মানুষটা তার সঙ্গে তামাশাই বা করতে যাবে কেন ?

গরিব বলে ধম্মোকম্মো রইবেনি ?

তা রইবে। এমনি তো খেতে জোটে না, ফের উপোস দিয়ে কী হয় ?

নিয়ম আছে, মানতে হয় !

তাই বোধ হয় হবে। রোজ পেট ভরা শুধু শাকান্ন জুটলেও মাঝে মাঝে উপোস দিলে উপকার হয়। একদিন তাই সকলের জন্যই এ নিয়ম হয়েছিল, রাজবানি বা চাকরানির মধ্যে তফাত করা দরকার হয়নি। আজ মায়াদের পেট ভরে না কিন্তু নিয়মটা রয়ে গেছে।

নীচে নেমে বিশুব মাকে দেখে রাখাল আজ অবাক হয়ে যায়। বেনারসি পরেছে দেখে নয়, গায়ে তার গয়নার বহর দেখে। কোনো অঙ্গই বুঝি বাদ যায়নি, মোটা মোটা দামি দামি গয়না চাপিয়েছে নানা প্যাটার্নের। এত সোনাও আঁটে একটা মানুষের গায়ে !

অথচ, আশ্চর্য এই, এতদিন তাব গায়ে গয়নার একান্ত অভাবটাই খাপছাড়া মনে হত বাখালের। হাতে ক-গাছা চুড়ি আর গলায় সাধাবণ একটি হার ছাড়া কোথাও সোনা তার চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত !

সতীশের বেশ দেখে বোঝা যায় কর্তা-গিন্নি কোথাও যাবে।

বিশুর মা বলে, কুটুমবাড়ি যামু, গাড়ির লেইগা খাড়াইয়া আছি। এমন মানুষ আর সংসারে পাইবা না। সময় মতো খেয়াল কইরা গাড়িটা আনতে দিব—

সতীশ বলে, দেই নাই ? কখন লোক পাঠাইছি। হারামজাদা রসিকটা কোনো কামের না।

যেমন মানুষ তুমি, তোমার লোকও জোটে তেমন !

রাস্তায় নামতে নামতে রাখাল ভাবে, কুটুম বাড়ি থেকে ফিরে বিশুর মা কি গয়নাগুলি খুলে রাখবে ? এ রকম কোনো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সে গয়না গায়ে চাপায় না কেন ?

এত গয়না আছে অথচ দু-একখানাব বেশি গায়ে চাপায না, কে জানে এর মধ্যে কী বহস্য আছে !

ছেলের জন্য সারাদিনে মোটে এক পোয়া দুধ। মাই ছাড়ানো উচিত ছিল ক-মাস আগেই কিন্তু ওই জন্যই সম্ভব হয়নি। এক পোয়া দুধে ওর কী হবে ? কিন্তু এদিকে বুকের দুধও তার শুকিয়ে এসেছে। ক-দিন পরে দুধের বরাদ্দ আরেকটু না বাড়ালে উপায় থাকবে না।

উনান ধরিয়ে সাধনা জল মিশিয়ে দুধটুকু জ্বাল দিচ্ছে, এত সকালে বাসন্তী এল।

ওদিকে বিশুর মার গায়ে রাখাল যেমন দেখেছে তার সঙ্গে তুলনা না হলেও বাসন্তীর গায়েও গয়না কম নয়। সোনাদানা যা কিছু আছে দিনরাত সে গায়ে গায়েই রাখে। সকালবেলা এখন ঘরে পরার সাধারণ শাড়ি শেমিজের সঙ্গে গায়ে এত গয়না শুধু বেখাপ্পা ঠেকে না, অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে রাত্রে সে কি এতগুলি গয়না গায়েই শোয় ? অথবা রাত্রে কিছু খুলে রেখে সকালে ঘুম ভেঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারবার মতো আগে গয়নাগুলি গায়ে চাপায় ?

সাধনার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়ো। কিন্তু মুখখানা তার চেয়েও কাঁচ দেখায়। তাকে দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে মানুষটা সে অতিমাত্রায় ঝগড়াটে আর ঝগড়ার সময় তার গলা দিয়ে অমন বাঁশির মতো সরু আওয়াজ বার হয় !

সাধনা বলে, ঘরে চলুন, এখানে আমারই বসার জায়গা হয় না।

বাসন্তী বলে, না না, বসব না। আপনি কাজ করেন। এখন কথা বলার সময় আপনারও নেই আমারও নেই। আমিও ভাত চাপিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে সে মেঝেতেই বসে পড়ে।

উনি বাজারে গেলেন। আমি ভাবলাম, এই ফাঁকে আপনাকে একটা দবকারি কথা বলে যাই।

তার কাছে দরকারি কথা ? সাধনা একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, বলুন না ?

বলি। আগে বলুন রাগ করবেন না ?

রাগ করব ? কী কথা বলবেন যে রাগ করব ?

আগে কথা দিন রাগ করবেন না। নইলে বলব না ?

তার আদুরেপনায় সাধনার হাসি পায়। একটু আহ্লাদি না হলে সব সময় এত গয়না গায়ে চাপিয়ে রাখার সাধ কারও হয় ! সে মৃদু হেসে বলে, বেশ তো কথা দিলাম।

বাসন্তী ইতস্তত করে, অকারণে একবার একটু হাসে, তারপর বলে, আপনাব ভাঙা হারটা আমায় বেচে দিন। বাগ করবেন না বলেছেন কিন্তু।

রাগ করবে না কথা দিলেও মুখ অন্ধকার হয়ে আসে সাধনাব। সে তিক্তস্ববে বলে, আপনি কী করে শুনলেন আমাদের কথা ? আপনাদের ঘব থেকে বুঝি শোনা যায় ?

বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

আপনাদের কথা ? কই আপনাদের কথা তো শোনা যায় না কিছু ?

তবে কী করে জানলেন আমি হার বেচব ?

আপনিই তো আমাকে পরশু দিন বললেন ভাই ! বেচবার কথা বলেননি, বলেছেন ওটা আর সারানো যাবে না, নতুন গড়িয়ে নেবেন।

সাধনা লজ্জা পায়। তাই বটে, তার বাকসে তুলে বাখা ভাঙা একটি হাবেব কথা কাউকে বলতে সে কী বাদ রেখেছে। তার একটা ভাঙা হাব আছে, সেটার বদলে সে নতুন হাব গড়িয়ে নেবে এ খবর যে সারা শহরে রটে যায়নি তাই আশ্চর্য।

কিছু মনে করবেন না। আমারই ভুল হয়েছে।

মনে তো করবেন আপনি। আমি কোন স্পর্ধায় আপনার ভাঙা হাব কিনতে চাইব ? তাই জন্যে তো কথা আদায় করেছি, বাগ করবেন না। কাল বুঝি এই নিয়ে কথা হয়েছে কর্তার সঙ্গে ? আমি সব শুনে ফেলেছি ভাবছিলেন বুঝি ?

বাসন্তী সজোরে মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, একটা কথাও শুনিনি। আপনাদের ঘরের কথা শুনতে পেলেও শুনতে যাব কেন ভাই ?

পরক্ষণে মুখের ভাব ও গলার স্বর পালটে বলে, ওমা, ওদিকে ভাত চড়িয়ে এসেছি। আমি বরং খোলাখুলি সব বলি আপনাকে। আপনার কাছে লুকোব না। শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি হারটা কিনতে চাইলে আপনাদের কোনো অপমান নেই। আপনাদের কোনো ক্ষতি নেই, এদিকে আমার যদি একটা উপকার হয়-- -

সাধনা বলে, তাই ভাবছি। ভাঙা হার কিনবেন কেন ?

সে কথাই বলছি। কথাটা কিন্তু ভাই কাউকে বলবেন না। কাউকে বলবেন না মানে অবিশ্যি আপনার উনিকে বাদ দিয়ে। ওনাকে তো নিশ্চয় বলবেন !

বাসন্তী একগাল হাসে। হাসিটা যতখানি সম্ভব বজায় রেখে বলে, ব্যাপারটা কী জানেন. লুকিয়ে কিছু নগদ টাকা জমিয়েছি। টাকা কি লুকিয়ে রাখা যায় ? তাই ভাবলাম, আপনার ভাঙা হারটা কিনে রাখি, টাকার বদলে সোনা থাক। লুকোচুরিরও দরকার থাকবে না। কে জানছে বাক্‌সের ভাঙা হারটা

আমার নয় ? মেয়েছেলেদের কোন গয়না আস্ত আছে কোন গয়না ভেঙে গেছে অত খবর কি ব্যাটাছেলে রাখে ?

সাধনা মনে মনে ভাবে, তা এককাঁড়ি গয়না থাকলে আর কী করে খবর রাখবে !

বাসন্তী এবার মুখখানা গম্ভীর করে। বলে, আপনাদের ভাববার কিছু নেই। দোকানে ওজন করিয়ে দর কষে আনবেন, যা দাম হয় আমি তাই দেব। দোকানে বিক্রি করতেন, তার বদলে আমায় করছেন।

সাধনা একটু ভেবে বলে, আপনি নতুন কিনবেন না কেন ?

বাসন্তী মুচকে হাসে। এবারও মুচকি হাসিটা বজায় রেখেই বলে, আসল কথা, টের পেয়ে যাবে। নতুন সোনার গয়না কি লুকানো যায় ? তা ছাড়া, আর গয়না চাই না ভাই, ঢের আছে। টাকার বদলে সোনা রাখব, নিজের জমানো টাকা কেন নষ্ট করব নতুন গড়াবার মজুরি দিয়ে ?

সে উঠে দাঁড়ায়—নাঃ, ভাত আমার পোড়া লাগবে ঠিক। এখন বলবেন, না আরেকজনের সাথে পরামর্শ করে—?

সাধনা বলে, কিনতে চাইলে আপনাকে দেব না কেন ?

বাসন্তী যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়।

খানিক পরেই রাখাল ফিরে আসে।

বিশুকে পড়িয়ে সে সাধারণত বাড়ি আসে না, সোজা চলে যায় দু-নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে। এ ছাত্রটির বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে, হেঁটে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। আটটা থেকে নটা পর্যন্ত তাকে পড়াবার কথা। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিশুকে পড়িয়ে কাছাকাছি হলেও নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে যাবার সময় থাকে না।

সাধনা ভাবে, রাখাল কথা তুলবে। নইলে বাড়ি এল কেন ?

রাখাল ভাবে, সাধনা নিশ্চয় বুঝেছে এখন তার ঘরে আসার মানে। সেই নিশ্চয় আগে কথা তুলবে।

ডাল চাপিয়ে সাধনা বলে, রেশন এলে ভাত হবে। কাল ব'লে রেখেছি।

রাখাল বলে, কার্ড আর থলি দাও। বিমলকে পড়াতে যাবার পথে কার্ড জমা দিয়ে যাব। এখন বড়ো ভিড়। আসবার সময়—

বরাবরই তাই তো কর। এদিকে আমার উনুন যাবে কামাই। একদিন আগে রেশনটা এনে রাখলে দোষ হয় ? কয়লা কিনতেও তো পয়সা লাগে ?

সাধনার গলা চড়েছে। পার্টিশনের ও পাশে বাসন্তী যাতে অনায়াসে শুনতে পাবে, এতখানি চড়েছে।

জীবনে আজ পর্যন্ত সে এতখানি গলা চড়িয়ে সাধারণ কথা কেন কোনো কথাই বলেনি।

সত্যবাবু আজ টাকা না দিলে রেশন আসবে না।

তার দু-নম্বর ছাত্র বিমলের বাবা সত্যবাবু সরকারি উকিল। তার কাছে মাসকাবার বলে কিছু নেই। অবশ্য শুধু এটা ঘর থেকে টাকা বার করে পাওনা মেটাবার বেলায়। পাওনা সে কারও বাকি রাখে না, যাকে যা দেবার শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেয়, কিন্তু সময়মতো দেয় না। টাকা সম্পর্কে তার মূলনীতি হল, নগদ যা আসবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে আনা, যা দিতে হবে তা যতদিন সম্ভব দেরি করে ঘর থেকে বার করা। মাসে দশ বারো তারিখের আগে রাখাল তার কাছে ছেলে পড়ানোর মজুরি আদায় করতে পারে না।

সাধনা তা জানে। সত্যবাবুর কাঝে গতমাসের বেতন আদায় করে তবে আজ রাখাল রেশন আনবে এটাও তার আগে থেকেই জানা। কিন্তু জানা হল নিছক জ্ঞান। ছাঁকা জ্ঞান দিয়ে মানুষ কারবার করেছে, কেউ কোনোদিন শুধু জ্ঞান ধুয়ে জল খেয়ে প্রাণ ঠান্ডা রাখতে পারেনি।

সাধনা বলে, রেশন না এলে একলা আমি উপোস দেব না।

আজ টাকা না দিলে কাজ ছেড়ে দেব।

তা ছাড়বে বই কী, নইলে চলবে কেন ? একটা কাজ ছেড়েছ গোঁয়ারতুমি করে, অভিমানে আরেকটা কাজ ছেড়ে একেবারে উপোস তো দিতেই হবে।

রাখাল একটু থ বনে যায়। সাধনার তাহলে মুখ খুলছে ? এবার তারা কলহবিদ্যায় ক্রমে ক্রমে ধাতস্থ হবে নাকি ?

আটটা বাজে, আমি যাই।

বলেই রাখাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন পালিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। সত্যবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার সময় নির্দিষ্ট আছে। আজ সত্যবাবুর কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর বাকি মজুরিটা আদায় করতেই হবে, নইলে রেশন আসবে না। সময় মতো কাজ হওয়া দরকার। সাধনা এ সব বোঝে।

তবু সাধনার বুক জ্বলে যায়। কিছুতে তুলল না হারেব কথাটা ! ব্যবস্থা কবাব জন্য সেই আবার নিজে থেকে তোষামোদ করুক, এই ইচ্ছা রাখালের ?

এদিকে রাখালের প্রাণটাও জ্বালা করে। রেশন কার্ড আর থলিটাও এগিয়ে দেবে না সাধনা, তাকেই খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে হবে ! তা, তার মতো অপদার্থ মানুষ আর কী ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে ?

জ্বালার উপর জ্বালা ! একজনের মর্মান্তিক অভিমানের, আরেকজনের সর্বনাশা আত্মগ্লানির।

৩

রাখাল বেরিয়ে যেতেই পাশের ঘরের আশা এসে বলে, চিনিটা দেবে ভাই ?

রেশন আনতে গেছে। এলেই দেব।

আশা মুখ ভার করে ফিরে যায়।

আধকাপ চিনি ধার করেছিল, তারই জন্য তাগিদ। পাশের ঘরে থাকে, তবু কত অনায়াসে সঞ্জীব আর আশা তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে ভাবতে গেলে সাধনার মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে, সব সময় নয়।

আজ ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চাপড় মারে আশার গালে। রেশন কার্ড আর থলি নিয়ে রাখালকে বেরোতে দেখেই যে আশা চিনিটুকু ফেরত চাইতে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিনি সাধনা দিতে পারবে না জানে, সে জন্য বিরক্ত হবার সুযোগ জুটবে। টাটকা তাগিদটা ভুলতেও পারবে না সাধনা, খানিক বাদে রেশন এলে চিনিটাও ফেরত দেবে।

তারই আগেকার রান্নাঘরটি দখল করে রাখে, দিনে শতবার মুখোমুখি হতে হয় উঠানে বারান্দায় কলতলায়, আশা যেন তাকে দেখতেই পায় না। কত লোকের সঙ্গে যেচে কত কথা বলে সঞ্জীব, রাখালের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও যেন বোবা বনে থাকে। এক বাড়িতে পাশাপাশি থেকেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ওরা একান্ত নিস্পৃহ, উদাসীন।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজল দিদি ?

জবাব আসে ঘড়ি ঠিক নেই।

এই বেঠিক ঘড়ি ধরেই ঠিক সময়ে সঞ্জীব কিন্তু আপিস যায়, রেডিয়ো চালায়। পিয়ন যাকে সামনে পায় তার হাতেই দু-ঘরের চিঠি দেয়। তাদের চিঠি সঞ্জীব বা আশার হাতে দিলে পিয়নকে ফিরিয়ে দেয়, বলে, আমাদের চিঠি নয়।

বলে ঘরে চলে যায়।

সঞ্জীব আপিস গেলে আশা ঘরে তালা দিয়ে রান্নাঘরে যায়—দশ মিনিটের জন্য নাইতে গেলেও ঘরের দরজায় তালা পড়ে ! পাশেই আছে সস্ত্রীক এক বেকার !

তবু আশার কাছেই সাধনা আধকাপ চিনি ধার করেছিল। কী করে করেছিল কে জানে ?

আশা গয়না পরে কম। হাতে দু-গাছা করে চুড়ি আর গলায় একটি হার। ভালো ভালো রঙিন শাড়ি ছাড়া তার সাধারণ কাপড় একখানাও নেই, তার বাড়িতে ব্যবহারের জামাও বিশেষ ধরনে ছাঁটা। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু পাকানো চুলের যে দলাটি ঘাড়ের কাছে ঝোলে খোঁপার চেয়ে তার বাঁধন শক্ত মনে হয়—সাধনা তো কখনও খসতে দ্যাখেনি। বাড়িতে সব সময়ে সে স্যান্ডেল পায়ে দেয়।

তাকে দেখলেই টের পাওয়া যায় গয়না তার যথেষ্টই আছে কিন্তু বেশি গয়না গায়ে রাখা সে অসভ্যতা গ্রাম্যতা মনে করে।

নটার আগেই সঞ্জীব নাইতে যায়। ফরসা রোগা মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারির মতো দেখতে। উঠানটুকু পার হবার সময় পলকের জন্য সে একবার সাধনার রান্নার জায়গাটুকুর দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে।

হঠাৎ কী মনে হয় সাধনার, ছেলেকে কোলে নিয়ে একটা চায়ের কাপ হাতে করে সে যায় বাসন্তীর কাছে। বলে, আধকাপ চিনি ধার দেবেন ?

ধার দেব না। আধকাপ চিনি আবার ধার দেব কী রকম ভাই ?

আজকাল চিনি কি এমনি নেওয়া যায়, না দেওয়া যায় ? বাসন্তী কাপটা ভর্তি করে চিনি এনে দিয়ে হেসে বলে, এখন আমার বাড়তি আছে। আমার যখন দরকার হবে, আমিও গিয়ে খানিকটা চেয়ে আনব।

সাধনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। আশার কাছে আধকাপ চিনি ধার নেওয়ার ধাক্কায় এই সহজ আদান-প্রদানের সম্পর্কটা সে ভুলতে বসেছিল ?

ফিরে গিয়ে আধকাপ চিনি নিয়ে সাধনা আশার রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনার চিনিটা দিদি।

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি নাওয়া সেরে ইতিমধ্যে খেতে বসেছিল। সে মুখ তুলেও চায় না।

সাধনা বলে, আপনার আপিসটা কোথায় ?

সঞ্জীব বলে, ক্লাইভ স্ট্রিটে।

এখন কি ক্লাইভ স্ট্রিট আছে ? নতুন কী নাম হয়েছে না ?

গায়ের জোরে সাধনা যেন ওদের উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে আশাকে পর্যন্ত ডিঙিয়ে একেবারে সঞ্জীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবে ! ভাব করলেই বেকার তারা অনুগ্রহ চেয়ে বসবে ভেবে তোমাদের যতই মিছে আতঙ্ক থাক, সে যেন তা গ্রাহ্য করবে না !

চিনিটা ঢেলে রেখে আশা খালি কাপটা এগিয়ে দেয়। তবু নড়ে না সাধনা।

সত্যবাবুর কাছে টাকা পেয়ে রেশন আর তরকারি আনলে তবে তার আজ রান্নাবান্নার হাঙ্গামা। সামনে মানুষ থাকতে কেন সে অবসরের সময় দুটো কথা কইবে না ?

আশা তাকে বসতে বলে না। বিব্রত সঞ্জীব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হঠাৎ বলে, আপনি বসুন ?

আশার দিকে একনজর তাকিয়ে সাধনা হেসে বলে, না যাই, কাজ আছে।

নিজের ঘরে গিয়ে তার কান্না আসে। মনে হয় গায়ের জোরে সে যেন সঞ্জীবের কাছে সার্টিফিকেট আদায় করেছে যে সেও একটা মানুষ, একজন বেকার মানুষের বউ হলেও। এ রকম সার্টিফিকেটের দরকারও তার হচ্ছে ?

ছি ছি !

বাইরে থেকে ডাক আসে, রাখালবাবু আছেন ? রাখালবাবু ?

রাজীবের গলা। মোটাসোটা কালো মানুষটিকে সাধনা চোখে দেখেছে, সামনাসামনি এ পর্যন্ত কখনও ওর সঙ্গে কথা বলেনি। বাড়িতে গেলে রাজীব নিজেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তার পর্দা রক্ষা করে !

বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে সাধনা বলে, উনি তো বাড়ি নেই।

তবে তো মুশকিল হল !

কিছু বলার থাকলে বলে যান।

রাজীব ইতস্তত করে বলে, রাখালবাবু চাকরি খুঁজছেন—একটা খবর পেয়েছিলাম। আজকেই ওনার যাওয়া দরকার, তা আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি—

আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিয়ে যান, উনি গিয়ে দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। কখন যাবেন ?

রাজীব একেবারে ছাপানো ঠিকানা তাকে দেয়—কার্ড নয়, একটা ছাপা বিলের মাথাটা ছিঁড়ে দেয়। সাধনা জানত রাজীব লেখাপড়া বেশি করেনি, তার কথার ধরন ও চালচলনে সে অল্প শিক্ষিত ছোটো ব্যবসায়ীর সেকেলে ভোঁতা ভাবটাই পুরোমাত্রায় প্রত্যাশা করছিল। আজ সামনাসামনি মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। মার্জিতরুচি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে কোনোই তো তফাত নেই তার ! এই রাজীবের ব্যাবসা বিড়ির পাতা আর বিড়ির তামাকের ! শুখা আর পাতা বেচে, তাও বন্ধুর সঙ্গে ভাগে, বাসন্তীকে গায়ে সে এত গয়না দিয়েছে ! লুকিয়ে বাসন্তী এত টাকা জমিয়েছে যে তার ভাঙা হারটা কিনে টাকার একটা অংশকে সোনা করে জমানো সে সুবিধাজনক মনে করে !

রাজীব জানায় বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে রাখাল যেন যায়। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে চেনা একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, সে আবার রাখালকে নিয়ে যাবে যে আপিসে চাকরি খালি আছে—হাঙ্গামা অনেক !

হাঙ্গামা বইকী। ঘরে গিয়ে সাধনা তাই ভাবে। এমন লোকও আছে জগতে আপনজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া যাদের কাছে ডালভাত—মায়ের পিসতুতো ভাই সম্পর্কে এমনি একজন মামা থাকায় ওই বাগানওলা বাড়ির হাবাগোবা ছেলে কুমুদ চাইতে না চাইতে তিনশো টাকার চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটোখাটো ব্যবসায়ী রাজীব তো সে দরের বা স্তরের মানুষ নয়, এ বাজারে একজনকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই তার পক্ষে হাঙ্গামার ব্যাপার বইকী !

স্বেচ্ছায় যেচে সে এই হাঙ্গামা করতে চায় কেন ?

রাখাল তার আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়। ভালোরকম জানাশোনাও নেই তাদের মধ্যে। রাখালের চাকরির জন্য তার এত মাথাব্যথা কেন ?

বাসন্তী বলেছে ?

বাসন্তী কেন রাখালকে চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা রাজীবকে বলবে ? তার স্বার্থ কী ?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। ঠিকমতো বোঝা গেল না। শুধু ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ নিয়ে যে জগৎ চলে না, এ কি তারই একটা প্রমাণ ? আধকাপ চিনি ধার চাইতে যেতে বাসন্তী কী রকম খুশিতে ডগমগ হয়ে কাপ ভর্তি চিনি দিয়ে বলেছিল যে ধারের কারবার তাদের মধ্যে নয়, বারবার সে দৃশ্য মনে আসে। মনে আসে তার হারটি কিনতে চাওয়ার ভূমিকা করা। এ ভাবে হারটা কিনতে চাওয়ায় পাছে তাকে অপমান করা হয়, সে রাগ করে, এ জন্য সত্যই ভয় ছিল বাসন্তীর !

রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর অনেক অমিল, অনেক বিষয়ে রাজীবকে তার অবিশ্বাস। শুধু রাজীবের বেলা নয়, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে বাসন্তীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বড়ো কম। এটা বাসন্তী গোপনও করে না এবং সাধনাও আগেই টের পেয়েছিল।

পুরুষ রাখাল তার ভাঙা হারটা দোকানে বেচতে যাবে এ চিন্তা কি অসহ্য ঠেকেছে বাসন্তীর ? জমানো টাকা সোনা করতে চায় এসব কি তার বানানো কথা ? আসলে তার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে সে ব্যবস্থা করতে চায় যে পুরুষ এবং স্বামী রাখালের বদলে সে যাতে হারটা নিজেই বেচতে পারে, নগদ টাকাটা যাতে সে-ই হাতে পায় ?

অথবা এ সমস্ত তারই উদ্ভট কল্পনা ?

জানালা দিয়ে দেখা যায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেরা একলা অথবা দু-তিনজন একসাথে, মেয়েরা আট-দশজন দল বেঁধে। সেও এমনিভাবে স্কুলে যেত, বেশি দিনের কথা নয়। তখনও টের পেত বাপের তার অভাবের সংসার। ওই ছেলেমেয়েরাও কি টের পায় আজকের সংসারের ভয়াবহ অভাব—দু-চারজন ছাড়া ? কোনো মন্ত্রে বয়স কমে গিয়ে একবার যদি সে ভিড়ে পড়তে পারত ওদের দলে ! নিদারুণ অস্থিরতা জাগে সাধনার, একটু ছটফট করে বেড়াবার জায়গা পর্যন্ত তার নেই। এই একখানা ঘরে সে একা। তার কাজ নেই, বেঁচে থাকার মানে নেই। এক পোয়া দুধ জ্বাল দিয়ে আর একমুঠো ডাল সিদ্ধ করে উনানটাকে নিভতে দিয়ে তার শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা যে কতক্ষণে দুটি চাল আসবে শাকপাতা আসবে, আবার উনান ধরিয়ে ভাত তরকারি রাঁধবার সুযোগ পাবে !

বাক্‌সো খুলে সাধনা ভাঙা হারটা বার করে। খোকা ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে তাকিয়েও দ্যাখে না। আবার সে বাসন্তীর কাছে যায়।

বাসন্তী চুলে তেল দিচ্ছিল, নাইতে যাবে। আজকেই আগে সে দুবার বাসন্তীকে দেখেছে—গায়ে শুধু তার গয়নার আবরণ নয়, মোটা ছিটের জামা কাপড় যেন বোরখার মতোই গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তার নারীত্বকে ঢেকে রেখেছিল।

এখন শুধু ফিনফিনে একখানা পাতলা কাপড় আলগাভাবে গায়ে জড়ানো।

রাজীব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দেহকে সে আড়াল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কী হয়েছে ভাই ?

কিছু হয়নি। হারটা সত্যি কিনবেন ?

কিনব না ? আমি কি তামাশা করছিলাম আপনার সঙ্গে ?

তবে কিনে নিন।

বাসন্তী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ওজন হল না, আজকে সোনার দর কত জানা নেই—

সাধনা বলে, ওজন তিন ভরি ধরুন। দোকানের রসিদ এনেছি, তিন ভরি দেড় আনা ওজন লিখেছে, দেড় আনা বাদ দিন। সোনার দর কাগজেই আছে—

বাসন্তী হঠাৎ হাসে, তা তো আছে, কিন্তু সোনামণিই যে নেই !

তার মানে ?

তুমি বোন বড্ডো ছেলেমানুষ।

সাধনা ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

বাসন্তীও গম্ভীর হয়ে বলে, ঝোঁকের মাথায় ছুটে এলে, একবার ভাবলেও না আরেকজনকে গোপন করে এটা আমায় বেচে দেয়া যায় না ? সে ভদ্দরলোকের কিছু জানা না থাকলে বরং আলাদা কথা ছিল। মেয়েদের অমন আড়ালে আড়ালে অনেক কিছু করতেই হয়। কিন্তু এটা জানা বিষয়, তুমিই এটা নিয়ে কত পরামর্শ করেছ মানুষটার সঙ্গে। তাকে একেবারে বাদ দিয়ে কি এটা বেচতে পার ?

আমার জিনিস—

হোক না তোমার জিনিস। এ তো শুধু তোমার সোনার জিনিস। তুমি নিজে কার জিনিস ? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে ? যতক্ষণ বাঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো ?

সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ !

বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝানু হবে, পনেরো বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায় ? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ !

এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে ?

আরে কপাল ! এ নাকি ফন্দি আঁটা, মতলব আঁটা ? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে এটা। ব্যাটাছেলের মতো ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মতো মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আঁটার কী আছে ? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ ? ছেলেমানুষের মতো ঝোঁকের মাথায় চলবে ? সাধ করে জেনেশুনে সুখশান্তি নষ্ট করবে ? না ভাই, ওটা মোটে কাজের কথা নয়।

ছেলের কান্না শুনে সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বাড়িতে পা দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দ্যাখে, তার ছেলে আজ আশার কোলে উঠেছে !

তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় আশা বলে, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? একলা ফেলে রেখে গেছ ছেলেটাকে ? রোয়াক থেকে পড়ে মাথাটা যে ফাটেনি—

একলা কেন ? তুমি তো ছিলে।

সাধনা হাসে কিন্তু আশা গম্ভীর মুখেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। এ তো হাসি তামাশার কথা নয় !

রেশন, কিছু তরকারি আর আধপোয়া মাছ নিয়ে রাখাল বাড়ি ফেরে। সত্যবাবুর কাছে মাসভর খাটুনির মজুরির টাকা আজ সে আদায় করে ছেড়েছে। তার চাইবার ধরন দেখে আজও তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবার সাহস সত্যবাবুর হয়নি।

সাধনার কাছে রাজীবের কথা শুনে সে বলে, ভাঁওতা বোধ হয়।

তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে মানুষটার লাভ কী ?

কে জানে কী মতলব আছে। সোজাসুজি আমায় বললেই হত !

স্থিরদৃষ্টিতে সে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

তরকারি কুটবে কী, সে দৃষ্টি দেখে মাথা ঘুরে যায় সাধনার !

সারাদিন বাইরে কাটাও, কখন তোমার দেখা পাবেন ?

পাশাপাশি ঘর, ইচ্ছা থাকলে আর দেখা হত না ? রাত্রে তো বাড়ি ফিরি আমি ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখালের একটা চাকরি বাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তী রাজীবের উপর চাপ দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়ে গিয়েও মুখ ফুটে বাসন্তীকে সে কিছু বলতে পারেনি। কুণ্ঠা বোধ করেছে। মনে হয়েছে বাসন্তী যদি আড়াল থেকে তার ভালো করতে চেয়ে থাকে এ বিষয়ে তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াই ভালো।

বাসন্তী যেচে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, কেন চায় সে হিসাবটা এখনও সাধনার ঠিক হয়নি বলে এই কুণ্ঠা। বাসন্তী যদি তার প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে হেসে বলেই বসে যে, হ্যাঁ ভাই, আমিই ওকে বলেছি—কী ভাষায় কীভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে সাধনা ? নিজের মান বাঁচিয়ে জানাবে ?

রাজীবের ঠিকানা-লেখা কাগজটা নাড়তে নাড়তে রাখাল আবার ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমার জন্য হঠাৎ এত দরদ জাগল কেন ? আমি তো ভদ্রলোককে চাকরি খুঁজে দিতে বলিনি ? চাকরি কিনা গাছের ফল, যেতে যেচে প্রতিবেশীদের বিতরণ করেন।

এবার সাধনা শান্ত সুরে বলে, অন্য কারণও তো থাকতে পারে ?

কী কারণ ? ভালো জানাশোনা পর্যন্ত নেই—

তোমাদের নেই, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাব আছে।

ও তাই বলো ! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে তাদের স্বামীদের দিয়ে তুমি আমার চাকরি জোটাবার চেষ্টা করছ ? বেশ, বেশ—এবার তাহলে আর ভাবনা নেই !

রাখাল একখানা চিঠি লিখতে বসে। চিঠিখানা রাখাল তিনশো মাইল দূরে তার ভাইয়ের কাছে লিখছে জানতে পারলে সাধনার মাথা ঘুরে যেত। হাতের কাজ করতে করতে সে বাসন্তীর সহজ বাস্তববুদ্ধির কথা ভাবে—বাসন্তী ঠিক করেছে। তারা কত শিক্ষিত ভদ্র ভালোমানুষ, তাদের মধ্যে কত বিশ্বাস আর ভালোবাসা। এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে রাখালকে অন্তত একবার না জানিয়ে হারের ব্যবস্থা সে করতে পারে না, ওটা সংসারের নিয়ম নয় !

নিয়ম নয় এই হিসাবে যে শুধু এই গোপনতাটুকুর জন্য স্বামীকে যা খুশি তাই ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। রাখাল পছন্দ করুক না করুক, তার অবাধ্যতায় যতই রাগ করুক, গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে যাক—সে হবে আলাদা কথা। রাখালকে জানিয়ে কাজটা করলে রাখাল কোনোমতেই এটাকে তার সামনাসামনি বিদ্রোহ করার অতিরিক্ত অন্য কিছু বানাতে পারবে না। না জানিয়ে করলে যা খুশি মানে করতে পারবে তার কাজের।

তাই বটে। এমনিই রীতি এ সংসারের। তারাও বাদ নয়। রাখালকে না জানিয়ে সে ভাব করেছে বাসন্তীর সঙ্গে শুধু এই জন্যই এমন অসম্ভবও সম্ভব হল। গোপন করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, জানাবার কথা মনে আসেনি আর প্রয়োজন বোধ করেনি বলেই হোক, সে জন্য কিছুই আসে যায় না। স্বামীকে না জানিয়ে পাড়ার একটি বউয়ের সঙ্গে ভাব করেছে এটাই হল আসল কথা।

রাখাল তাই নানারকম মানে করতে পেরেছে অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার। রাজীব যেচে তার চাকরি করে দিতে চায়, কেন সে যখন বাড়ি থাকে না ঠিক সেই সময়ে কথা বলতে আর ঠিকানা দিতে আসে সাধনার কাছে, তারই মানে।

ধারালো মানে, কাঁটা-ভরা মানে। দুজনেরই মনকে যা কাটবে আর বিঁধবে।

মনের মধ্যে মানে করতে করতে তাই সে ও রকম স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে পেরেছে।

এও তবে সম্ভব জগতে ? রাখালের পক্ষে এ সব কথা ভাবা ?

কলের মতো কাজ করে যায় সাধনা। জগৎ সংসারে যেন জীবনের জোয়ার-ভাটা নেই, স্তব্ধ থমথমে হয়ে গেছে সব। ভাত নামায়, আলু কুমড়ার তরকারি চাপায়, আধপোয়া মাছ সাঁতলে ঝোল করে—তারই ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে আধ-শুকনো মাই চুষতে দেয়।

এ সব যেন অন্য কেউ করছে, সাধনা নয়।

কত বিশ্বাস, কত ধারণা, কত সংস্কার যে তার মিথ্যা হয়ে গেছে এই একটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ায়—যা সম্ভব কী অসম্ভব এ বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত করার দরকার হয়নি এতদিন, সেটা একেবারে কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেওয়ায়। উনান নিভে এসেছে।

কয়লা রাখার পুরানো ভাঙা বালতিটার দিকে চেয়ে সাধনার হঠাৎ হাসি পায়। এক টুকরো কয়লা নেই। অন্তত পাঁচ সের কয়লা এনে দেবার জন্য রাখালকে বলতে হবে। নইলে মাছের ঝোল নামবে না।

ঘরে গিয়ে তাক থেকে একটা বই নিয়ে আসে—মস্ত এক গয়নার দোকানের ক্যাটালগ। কত প্যাটার্নের সাধারণ অসাধারণ কত রকমের সোনা আর জড়োয়া গয়নাব ছবিসুদ্ধ তালিকাই যে বইটাতে আছে ! যত্ন করে তাকে তুলে রেখেছিল—কোনোদিন যদি দরকার হয় প্যাটার্ন বেছে পছন্দ করার !

পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উনানে দিয়ে সে ঝোলটা রাঁধে।

রাখাল এসে লেখা চিঠিখানা তার হাতে দেয়। তার দাদা প্রসন্নকে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা খুলে লিখে রাখাল জানিয়েছে যে সাধনা যদি মাস তিনেক গিয়ে তার কাছে থেকে আসে তাহলে বড়োই উপকার হয়। ইতিমধ্যে রাখাল তার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

পড়ে চিঠিটাও সাধনা উনানে গুঁজে দেয়।

তুমি যাবে না ?

না।

ভায়ের কাছে বোন যায় না।

এ অবস্থায় যায় না।

রাখাল ব্যঙ্গ করে বলে, এ অবস্থায় আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে মানুষ নাচতে নাচতে যায়, ভায়ের বাড়ি যায় না, না ?

সাধনা কড়াই কাত করে মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

৪

রাখাল স্নান করে নিজেই ভাত বেড়ে খায়। ডাল তরকারি দিয়ে খায়।

বড়ো মাছের আধপোয়া পেটি এনেছিল সাত আনা দিয়ে। চমৎকার ছিল মাছটা। পোড়া মাছের গন্ধ শুঁকেই খাওয়ার সাধ মেটাতে হল।

খেয়ে উঠেই জামা গায় দেয়। বলে, কই। ঠিকানাটা দাও।

পুড়িয়ে ফেলেছি।

বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসো।

তোমার এ চাকরি করতে হবে না।

রাখাল কাঠের চেয়ারটাতে বসে। বলে, তোমার কি মাথা বিগড়ে গেল ? একজন চাকরি করে দিচ্ছে, চেষ্টা করব না ? তার মনে যাই থাক—

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সাধনা ফোঁস করে ওঠে, মাথা বিগেড়েছে তোমার, আমার নয়। বারবার বলছি মানুষটার সঙ্গে আগে আমার একটা মুখের কথা পর্যন্ত হয়নি, শুধু ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, তবু তোমার ওই এক চিন্তা !

গলা চড়িয়ে চিৎকার করে সাধনা যোগ দেয়, ভদ্রলোকের মনে কিছু নেই, থাকতে পারে না। যদি কিছু থাকে সব তোমারই মগজে।

তবে তো কথাই নেই। ঠিকানাটা জেনে এসো।

রাখালের শান্তভাবে সাধনা বড়োই দমে যায়। ঝিমিয়ে গিয়ে গভীর একটা হতাশা বোধ করে। নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিই জেনে যাও।

রাখাল বলে, সেই ভালো। যাবার সময় চাকরটার কাছেই জেনে যেতে পারব।

রাখাল বেরিয়ে যায়। সাধনার হারের কথা উল্লেখও করে না।

রাখাল বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই ভোলার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকে, খোকার মা কী করেন ?

সাধনা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে, ডিম রাখব না ভোলার মা।

একটা কথা ছিল।

শিথিল আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে সাধনা উঠে আসে, কী বলবে বলো ?

ভোলার মা তার মুখের থমথমে ভাব নজর করে দ্যাখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না যে তোমার জ্বর এসেছে নাকি ? কীসের প্রক্রিয়ায় এমন হয় সে ভালো করেই জানে। কথায় এর প্রতিকার নেই।

বলে, ভিতরে একটু আড়ালে গিয়া কমু কথাটা। আর কিছু না, একটা পরামর্শ দিবেন।

এত মানুষ থাকতে তার কাছে ভোলার মা পরামর্শ চায় ?

ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে ভোলার মা বলে, অন্য মাইন্‌ষেরে জিগাইতে সাহস পাইলাম না। কার মনে কী আছে কেডা কইবো ?

বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের কোণে বাঁধা এক জোড়া সোনার মাকড়ি বার করে, সাধনার সামনে রেখে বলে, আর কিছু নাই, এইটুক সোনা সম্বল ছিল।

ভোলার মার কয়েকটা টাকার দরকার। মাকড়ি দুটো বাঁধা রাখবে। কার কাছে গেলে ভালো হয় যদি বলে দেয় সাধনা ? যার কাছে গেলে কাজও হবে, জিনিসটা গচ্ছিত রেখে ভোলার মাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ?

বাঁধা রাখবে ? বেচবে না ?

না, বেচুম না। সবই তো বেইচা দিছি, এই একখান চিহ্ন রাখুম।

কীসের চিহ্ন ? প্রথম বয়সে ভালোবেসে ভোলার বাবা মাকড়ি দুটো কিনে দিয়েছিল তাকে।

আজও ভোলার মার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে স্বামীর প্রথম বয়সের ভালোবাসা ! সে দিনগুলি স্বপ্নের মতো বহুদূর পিছনে পড়ে আছে—সোনার মাকড়ি দুটি তার বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিথ্যা স্বপ্ন নয়, সত্যই একদিন জীবনে এসেছিল সেই দিনগুলি !

কী ভাবেন ?

সাধনা লজ্জা পায়—নিজের কাছে। সে-ই ভোলার মার অতীত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

আমার টাকা নেই।

আপনে যদি না পারেন, কইয়া দ্যান না কার কাছে যামু ?

তাই বা কার নাম করি বলো ? কে নেবে কে নেবে না—

ভোলার মা চুপ করে থাকে।

দু-একজনকে বলে দেখতে পারি।

বৈকালে আসুম ?

এসো।

ভোলার মা মাকড়ি দুটি বাড়িয়ে দেয়। সাধনা আশ্চর্য হয়ে বলে, রেখে যাবে ?

যারে কইবেন, জিনিসটা দেখাইবেন না ?

ভোলার মা চলে যাবার পর সাধনা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে সে কেন বিশেষ করে তার কাছে এসেছিল। ভোলার মা টের পেয়ে গেছে তার অবস্থা। সেও নামতে আরম্ভ করেছে ভোলার মার স্তরে, তাদের দুজনেরই অবস্থা খানিকটা ইতরবিশেষ।

সে তাই অনেকটা কাছের মানুষ ভোলার মার ! সে সহজেই বুঝবে ভোলার মার কথা, সহজেই অনুভব করতে পারবে মাকড়ি বাঁধা রেখে কটা টাকা পাওয়া তার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার ! অন্যে তো এতখানি মর্যাদা দেবে না ভোলার মার প্রয়োজনকে।

হয়তো গায়েই মাখবে না তার কথা। হয়তো সন্দেহ করবে নানারকম। আধঘণ্টা জেরা করে বলবে, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা করো !

তাই, আশা যদিও প্রায়ই তার কাছে ডিম রাখে, নানাকথা জিজ্ঞাসা করে এবং মাকড়ি বাঁধা রেখে টাকাও সে অনায়াসে দিতে পারে তাকে, তবু, আগে সে পরামর্শ চাইতে এসেছে সাধনার কাছে।

খেয়ে উঠে ঘরে তালা দিয়ে সাধনা বাসন্তীর কাছে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তার ভাঙা হার, বলে, তুমি তো এমনি নেবে না হারটা, দোকানে যাচাই না করে ?

বাসন্তী বলে, নেয়া কি উচিত ? তুমিই বলো ভাই ? বেশি দিলে ভাববে দয়া করেছি, কম দিলে ভাববে ঠকিয়েছি।

তবে চলো দোকানে যাই, যাচাই করিয়ে আসি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, তুমি আমি একলাটি যাব ? কিছু যদি হয় ?

সাধনা হেসে বলে, কী হবে। বাঘে খাবে ? পুরুষের চেয়ে মেয়েদের রাস্তায় ভয় কম, তা জানো ? তুমি যদি মিথ্যে করে একজনের নামে বলো, এ লোকটা অভদ্রতা করেছে, কেউ আর তার কথা কানেও তুলবে না, দশজনে মিলে মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

বাসন্তী মাথা নেড়ে বলে, সেটাই তো খারাপ। আমরা যেন মানুষ নই, ইয়ে ! রাস্তার মানুষের কাছেও আমরা আহ্লাদি।

দুপুরবেলার আলস্যে আর শৈথিল্যে যেন থইথই করছে বাসন্তী, দেখে মনে করা দায় যে, সেও আবার ভালো করে গা ঢাকে, উঠে চলে ফিরে বেড়ায়, সংসারে গিন্নিপনা করে। সে পছন্দ করে না, কিন্তু উপায় কী, পুরুষের কাছে মেয়েরা আহ্লাদি। খারাপ হলেও নিয়মটা মেনে নিয়ে সে দুপুরবেলা ঘরের কোণে একা থাকার সময়েও আহ্লাদি হয়েই আছে। যে ভূমিকা অভিনয় করতেই হবে বরাবর, দুদণ্ডের জন্য তার হাবভাব চালচলন ছাঁটাই করে রেখে তার লাভ কী ?

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, মানুষটা ফিরলে বলতে হবে তোমার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

মিছে কথা বলবে ?

মিছে কথা ? তোমার যেন সব তাতেই খুঁতখুতানি। মিছে কথা কী গো ? তোমার সাথে দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম এটুকু শুধু জানাব মানুষটাকে। সত্যি সত্যি তো বেরুচ্ছি তোমার সাথে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কোথা গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে ?

ইস্‌ ! জিগ্যেস করলেই হল ! আমি কি বাঁদি নাকি, খুঁটিয়ে খুঁটিযে সব বলতে হবে ? বেরিয়েছিলাম, জানিয়ে দিলাম, ফুরিয়ে গেল। কোথা গেছিলাম, কী করেছিলাম, খুশি হয় বলব, খুশি হয় বলব না—জিগ্যেস করলেই বলতে হবে নাকি আমায় !

সাধনাকে খালি ঘরে একলা রেখে সে বাথরুমে যায়। আশার ঘরে এত দামি দামি জিনিস নেই, আশার বাক্‌সে এত টাকা আর গয়না নেই—আশা পারত না।

দুজনে বাসে চেপে গয়নার দোকানে যায়। মস্ত দোকান, সাবি সারি কাঁচের শো-কেসে ঝলমল করছে হরেক রকমেব গয়না। কত নাম, কত বৈচিত্র্য, কত রকমেব রুচির কাছে কত ধরনের আবেদন। চাবিদিকে তাকাতে তাকাতে একটু ভয় ভয় করে, একটু ছমছম কবে গা।

শত শত মেয়েলোকেব মনপ্রাণ রূপযৌবন যেন রূপক হয়ে ঝলমল কবছে শো কেসে।

৫

রাজীব বলে, আসুন রাখালবাবু, বসুন। একটা সিগারেট খান !

একটা টুল এগিয়ে দেয়। পার্টনার দীননাথেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, কী আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন মশাই, কাল দীনুর কাছে শুনলাম চাকরিটার খবর, আজ খেয়ে দেয়ে দোকানে বেরুব, স্ত্রী জানালেন আপনি নাকি চাকরি খুঁজছেন। ভাবলাম কী, এমন সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। একে প্রতিবেশী, তায় আবার গিন্নির বন্ধুর হাজব্যান্ড ! লাগিয়ে দিতে পারি তো আমায় পায় কে ? ঘরে খাতির, আপনাদের কাছে খাতির !

বাজীব একগাল হাসে।—আপনাতে আমাতে বেশি আলাপ হয়নি, স্ত্রীরা দুজনে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন।

অনর্গল কত কথাই যে বলে রাজীব পাঁচ-সাতমিনিটের মধ্যে ! বাড়িতে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ছাড়া তার গলা এক রকম শোনাই যায় না। বাডিতে কম কথা বলাটা বোধ হয় বাইরে পুষিয়ে নেয় !

বলে, কিন্তু দাদা, যদি ফসকেই যায়, রাগ করবেন না যেন।

না না, রাগের কী আছে ? আমার জন্য চেষ্টা করেছেন এটা কী কম কথা হল !

যদি ফসকে যায় ! যদি ! চাকরি হওয়া সম্পর্কে এরা এতখানি সুনিশ্চিত যে না-হওয়াটা নিছক 'যদির' কথা ! আশায় বাখাল অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

দীননাথ বলে, তুমি তো একধার থেকে বকে চলেছ। কোথায় চাকরি কী চাকরি সে সব বিত্তান্ত বলো ভদ্দরলোককে ? ওঁরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে ?

সে তো তুমি বলবে।

দীননাথ অত্যন্ত শীর্ণ মানুষ। গায়ের হাড়গুলি যেন তার পাঞ্জাবি ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কথা বলার সময় থেকে থেকে চোখ মিটমিট করে। রং খুব ফরসা। চেহারায় সে যেন একেবারে রাজীবের রূপধরা বিপরীত !

দীননাথ বলে, আপনি বন্ধু মানুষ, খুলেই বলি আপনাকে। আপিসটা আমার এক আত্মীয়ের। ব্যাপারটা হল কী জানেন, ইনকাম ট্যাক্সের চোটে তো আর করে খাবার পথ নেই মানুষের। কর্তাদের একটু কড়া দৃষ্টি পড়েছে এই আত্মীয়টির ওপর। কাগজে-কলমে একটা পোস্ট আছে—সেলস্‌

অর্গানাইজার। আপিস-টাপিসে আসেন না, ঘুরে ঘুরে সেল অর্গানাইজ করে বেড়ান আর মাসে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে নেন। বুঝলেন না ?

দীননাথ নিজের মনেই হাসে—নীরবে। শব্দ করে হাসাটা বোধ হয় তার আসে না।

বলে, তা এবার একবার মানুষটার সশরীরে হাজির হওয়াটা দরকার পড়ে গেছে। ওরা বলছে, তোমাদের এইটুকু কারবার, পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সেলস্ অর্গানাইজার রেখেছ ? মজাটা দেখুন একবার। আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে অর্গানাইজার রাখি, আর হাজার টাকা দিয়ে রাখি, তোদের কীরে বাপু ? বাজার ধরতে লোকে গোড়ায় টাকা ঢালে না, লোকসান দেয় না ? কিন্তু তা বললে চলবে না, প্রমাণ দিতে হবে ওই পোস্টে সত্যি লোক আছে।

রাখাল চুপ করে শুনছিল। আশা ঘুচে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেয়েছে। তার বদলে এবাব যেন রাজীব কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে মনে হয় !

রাখাল বলে, আমাকে ওই কাজে লাগাবেন ?

ঠিক ধরেছেন ! আপনার মতো লোক হলেই ভালো। অনেক কাল অন্য আপিসে কাজ করেননি, কেউ বলতে পারবে না আপনি এ পোস্টে ছিলেন না।

রাখাল মৃদু হেসে বলে, পাঁচশো টাকাই পাব তো আমি ?

দীননাথও মুচকে হেসে বলে, দু-একমাস পাবেন বইকী ! তবে কী জানেন, এ বাজারে পাঁচশো টাকা মাইনের লোক রেখে কি ব্যাবসা চলে ? পরে ওটা মিউচুয়ালি ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। আপনারও যাতে সংসারটা চলে, কোম্পানিরও যাতে—বুঝলেন না ?

বুঝলাম বইকী ! পুরানো পে বিলে আমাকে সই করতে হবে তো ? পোস্টে যে নামে লোক আছে সে নামটাও নিতে হবে নিশ্চয় ?

দীননাথ নীরবে সায় দিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বলে, আপনার কোনো রিস্ক নেই। রাজীবের বন্ধু মানুষ আপনি, আপনাকে করে দিতে পারি কাজটা। গোড়ায় দু-তিনমাস ওই পাঁচশো টাকাই পাবেন, তারপর এ পোস্টটা তুলে দিয়ে অন্য একটা কাজ দেয়া হবে আপনাকে। ভেবেচিন্তে বলুন লাগবেন না কি। আরও একজন ক্যান্ডিডেট আছে, আজকেই একজনকে লাগিয়ে দেয়া হবে। বুঝলেন না ?

রাখাল লক্ষ করে যে রাজীবের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে, রীতিমতো শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনোভাব রাখাল অনুমান করতে পারে। চাকরিটার মধ্যে যে এত প্যাঁচ আছে এটা তার জানা ছিল না। এখন সে পড়ে গেছে মহা দুর্ভাবনায়। রাখালের ভালোমন্দের জন্য তার ভাবনা নয়, ভাবনা বাড়ির সেই মানুষটির জন্য, যার কথায় রাখালকে সে এই চাকরির খোঁজ দিয়েছে। রাখাল যদি মরিয়া হয়ে রাজি হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসাদে পড়ে, বাসন্তীর কাছে সহজে সে রেহাই পাবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না মশাই, এ কাজ আমার পোষাবে না।

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে !

দীননাথ বলে, সে তো আপনার ইচ্ছা। তবে, আপনি হলেন আমাদের রাজীবের বন্ধু, ভেতরের কথা সব খুলে বলেছি আপনাকে। দেখবেন যেন—

রাখাল বলে, সে জন্য ভাববেন না। তাছাড়া, সত্যি সত্যি আসল কথা কিছুই বলেননি আমায়। কার ব্যাবসা, কোন আপিস আমি কিছুই জানি না। ইচ্ছা থাকলেও আমি কোনো ক্ষতি করতে পারব না।

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলে, দাদা, ইচ্ছা থাকলে সবাই ক্ষতি করতে পারে।

কে জানে। তবে আমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন আর কথা কী !

রাজীব বলে, এ সব ভেবো না দীনু, রাখালবাবু খাঁটি মানুষ। আমি জানি তো ওঁকে।

রাখাল বিদায় নিলে তার সঙ্গে রাস্তায় নেমে গিয়ে রাজীব অপরাধীর মতো বলে, কিছু মনে করলেন না তো রাখালবাবু ?

চাকরি যেন গাছের ফল ! পচে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মানুষ যেন প্রতিবেশীদের যেচে যেচে চাকরি বিতরণ করে !

এ কথা বলায় সাধনা চটে গিয়েছিল। কারও কোনো মতলব না থাকলে, ভিতরে কোনো প্যাঁচ না থাকলে চাকরি যেন এ ভাবে হাওয়ায় উড়ে এসে হাজির হয় বেকারের কাছে, ছাঁটাই বেকারি দুর্ভিক্ষের অভিশাপে কান্নায় কান্নায় ভরা এই দেশ।

রাজীবের মতলব ছিল শুধু বউয়ের একটু মন জোগানো। তাতেই যেন রাজনীতি উলটে গিয়েছে সংসারের ! এ ভাবে যে চাকরি হয় না বেকারের এ সত্যটা মিথ্যা হয়ে গেছে। সাধনা চায়, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে বাধ্য। তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে খাতির করার জন্যই অঘটন ঘটতে হবে সংসারে।

সাধনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার আজ নতুন হতাশা এনে দিয়েছে রাখালকে। সাধনা তার সাধারণ বাস্তববুদ্ধি হারাতে বসেছে ভেবে তার ভয় হয়েছিল, আসলে এ বুদ্ধি কোনোদিনই ছিল না তার।

তার স্বভাবে একটা ধৈর্য আর সংযম ছিল, সাধারণ সহজ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা ভাসাভাসা বাস্তববোধ ছিল। তার বেশি কিছু নয়। সাধারণ হিসাবে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেই সঙ্গে খানিকটা ধৈর্য আর সংযমের সমাবেশ—এটাকেই সে মনে করেছিল সচেতন বাস্তববোধ। দুঃখের দিন শুরু হবার পর এটাকেই সে ধরে নিয়েছিল পরম আশীর্বাদ বলে।

ভেবেছিল, যেমন বিপাকেই পড়ুক আর যত মারাত্মক হোক অবস্থা, শেষ পর্যন্ত দুর্দিন সে পার হয়ে যাবে। সাধনা আরও শোচনীয় করে তুলবে না অবস্থা, পদে পদে ব্যাহত করবে না তার লড়াই, সবটুকু জীবনীশক্তি সে কাজে লাগাতে পারবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।

বরং নানাভাবে তাকে সাহায্যই করবে সাধনা। শুধু সেবা করে ভালোবেসে নয়, সব কষ্ট আর জ্বালা লুকিয়ে সব সময় হাসিমুখ দেখিয়ে নয়—ও সব অতটা দরকারি মনে করেনি রাখাল। বাস্তব-বুদ্ধি দিয়ে সাধনা বাস্তব অবস্থা বুঝে তার সঙ্গে চলতে পারবে—এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড়ো ভরসা। কদিন ধরে ভাঙতে ভাঙতে আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সে ভরসা। সে রকম বাস্তববুদ্ধিই নেই সাধনার, সে করবে স্রোতে গা ভাসিয়ে ধ্বংসের দিকে চলার বদলে অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রেখে বাঁচার চেষ্টায় তাকে সাহায্য !

একটা গোড়ার হিসাবেই তার ভুল হয়ে গেছে। বড়ো মারাত্মক ভুল।

গোড়া থেকে খেয়াল রাখলে ধৈর্য আর সংযমের সীমা পার হয়ে সাধনাকে সে নতুন এক বিপদ হয়ে উঠতে দিত না, অন্যভাবে সামলে চলতে পারত এদিকটা। গোড়া থেকে জানা থাকলে আজ সাধনার উপর সব আস্থা হারিয়ে নিজেকে এত বেশি নিরুপায় অসহায় মনে হত না।

দিনের পর দিন কী শক্তিটাই তাকে ক্ষয় করে আসতে হয়েছে দেহ আর মনের। প্রথম থেকে না জেনে আজ এই অসময়ে জানা গেল সাধনা তার সাথি নয়, বোঝা।

চায়ের কাপ সামনে রেখে রাখাল ভাবে। নতুন করে আবার হিসাব মেলাবার চেষ্টা করে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে চায়ের দোকানে আধঘণ্টা বসা ভালো। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা রাখাল জেনেছে।

দেয়ালে গত বছরের ক্যালেন্ডারের একটা ছবি ঝুলানো। অতি সুন্দর ছবি বলে ক্যালেন্ডার শেষ হয়ে গেলেও ছবিটা টাঙানো আছে। বড়োই জনপ্রিয় হয়েছে ছবিটি। বনবাসিনী স্বামীসোহাগিনি সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্না হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণকে। ছবির দিকে তাকানোমাত্র বোঝা যায় সীতার কী আবদার—জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই !

রাজার মেয়ে আর রাজার যে ছেলে রাজা হবে তার বউ। কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল ! সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয়নি সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোনার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোনার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।

গয়না ফেলে আসতে মায়া হয়নি, সে কি এই জন্য যে চোদ্দো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে ? চোদ্দো বছর পরে রাম আবার রাজা হলে ওই রেখে যাওয়া সোনার গয়নার সঙ্গে আরও কত গয়না যোগ হবে সীতার !

নয়তো নতুন প্যাটার্নের নতুন একটা গয়নার মতো সোনার একটা হরিণ দেখে এমন মোহ কি জাগতে পারে সীতার, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত যার তুচ্ছ করে ফেলে আসতে একবার ভাবতে হয়নি ?

চা জুড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাথাটা বেঞ্চের উপর নেমে আসে রাখালের। চায়েব জন্য পয়সা দিতে হবে। চায়ের কাপে একটা চুমুক না দিয়েই বেচারি গভীর ঘুমের কবলে গিয়ে পড়েছে।

তাকে যে চা দিয়েছিল সেই ছোকরাই একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকে, বাবু—

দোকানের মালিক গিরীন সামনে ছোট্ট টেবিলটিতে ক্যাশ বাক্‌সো রেখে নিজের সাত বছরেব পুরানো মোটা কাঠের টুলে বসে চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টি পেতে রাখে। সে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, এই চোপ, ডাকিস নে। খবরদার বলে দিলাম।

ঘণ্টু কাছে সরে এসে বলে, মোটে এক কাপ চা নিয়েছে—

হল বা এক কাপ চা, নিয়েছে তো !

ঘণ্টু চোখ বুজে একটা অদ্ভুত মেয়েলি ভঙ্গি করে। ছেলেটার মেটে মেটে ফরসা রং, মুখে বসন্তের দাগ, গোলগাল চেহারা। ঘণ্টুর চালচলনে খানিকটা মেয়েলি ভাব আছে, বউ-বউ ভাব ! গলায় তার একটি সোনার চেন হার।

গিরীন বলে, আরে শালা, খদ্দের হল খদ্দের। খাতির পেলে আরাম পেলে তবে তো একদিনের খদ্দের দশদিন আসবে। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না বাবু, ঘুম ভেঙে খুশি হবে। ভাববে যে না, এ দোকানটা ভালো।

বলে গিরীন ঘণ্টুর গালটা টিপে দেয়।

বেঞ্চ থেকে যখন সে মাথা তোলে বেলা পড়ে এসেছে।

ঘণ্টু বলে, রাতে ঘুমোননি বাবু ?

রাখাল নীরবে চায়ের দামটা তার হাতে দেয়। অপরাধীর মতোই তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে এতক্ষণ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার মতো নিরাপদ আশ্রয় !

পথে অসংখ্য মানুষ। দোকানে লোক কম, কাপড়ের দোকানেও—যত ভিড় গিয়ে যেন জমেছে রেশনের কাপড়ের দোকানে। সাধনাকে এ মাসে একখানা কাপড় দিতেই হবে। আগেকার কখানা ভালো কাপড় ছিল বলে এ পর্যন্ত কোনোমতে চলেছে, আর চালানো অসম্ভব। সেলাই করে চালিয়ে দেবারও একটা সীমা আছে, যার পরে আর চলে না, নিজে থেকে কাপড় ফেঁসে যায়।

তার নিজের ? তাকে তো বেরোতে হবে টুইশনি করতে, চাকরি খুঁজতে। তার নিজেরও একেবারে অচল অবস্থা। কী দিয়ে কী ভাবে কী করবে ভেবেও কূল পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধনা এদিকে যাবেই তার ভাগনির বিয়েতে, নতুন হার গলায় পরে যাবে ! নিজের কানপাশা রেবাকে উপহার দিয়ে সম্মান বজায় রাখবে।

তীব্র জ্বালাভরা হাসি ফোটে রাখালের মুখে।

প্রভাকে পড়াতে যেতে আবও প্রায় দুঘণ্টা দেরি। রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হবে এ সময়টা। আরও একটা টুইশনিও যদি জোটাতে পারত !

পথেই সময় কাটায়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় ছোটো পার্কটার বেঞ্চে বসবার জায়গার খোঁজে—বেঞ্চ খালি নেই। মানুষ বেড়াতে বেরিয়ে বেঞ্চ কটা দখল করেনি। যারা বসেছে তারই মতো তাদেরও দরকার হয়েছে কোথাও একটু বসবার। এটা বোঝা যায়।

এক বাড়ির রোয়াকে বসতে পায়। তাও নির্বিবাদে নয় !

কী চান ?

কিছু না। একটু বসছি।

জানালায় উঁকি দেওয়া প্রৌঢ় মুখটি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আড়ালে সরে যায়।

কয়েক হাত তফাতে ফুটপাতে ঘোমটা টেনে একটি বউ বসে আছে। তার সামনে বিছানো ন্যাকড়ায় পড়ে আছে একটি ঘুমন্ত কঙ্কাল শিশু। বউটির সর্বাঙ্গ ঢাকা, সেলাই করা শতজীর্ণ ময়লা কাপড়েই ঢাকা, শুধু ডান হাতটি বার করে পেতে রেখেছে নিঃশব্দ প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার সামনে পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মিছিল পার হয়ে যায়। তিনটিই চলেছে একদিকে। মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দুটি মিছিল, একটি মজুরের। উদ্‌বাস্তুদের মিছিল, ছাত্রছাত্রীর মিছিল, ধর্মঘটি মজুরের মিছিল। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা দাবিগুলি উঁচু করে তুলে ধরে একসঙ্গে মুখে দাবি ঘোষণা করতে করতে চলেছে মিছিলগুলি। রাখাল ভাবে, প্ল্যাকার্ডে লিখে আর মুখে দাবি ধ্বনি তুলে ঘোষণার বোধ হয় দরকার হয় না আর। সব মানুষের আজ কীসের অভাব আর কী কী চেয়ে মানুষ মিছিল করে কারও কী অজানা আছে !

ঘোমটা তুলে দিয়ে তিনবারই বউটি যতক্ষণ দেখা যায় মিছিল দ্যাখে, তারপর আবার ঘোমটা টেনে ডান হাতটি তেমনিভাবে একটু বাড়িয়ে ধরে বসে থাকে। মুখ দেখে বোঝা যায় বয়স তার সাধনার চেয়েও কম হবে।

এই বউটিকে যদি সাধনা একবার দেখত !

কিন্তু সত্যই কিছু লাভ হত কি দেখে ? এই বউটিকে না দেখুক, এরই মতো অভাগিনি বউ আজ পথেঘাটে ছড়িয়ে আছে দেশের, তাদের দু-চারজনকে কি আর দ্যাখেনি সাধনা ?

সাধনা কি জানে না দেশের বেশির ভাগ লোকের আজ কী অবস্থা এবং সে জন্য নিজেরা কেউ তারা দায়ি নয় ?

কিন্তু দেখেও সাধনা দেখবে না, জেনেও সে জানবে না। তাকেই সে দায়ি করে রাখবে সব দুর্ভাগ্যের জন্য ! সে বুঝবে না যে ঘরের চাপে বাইরের চাপে রাখাল যদি পঙ্গু হয়ে যায় তারপর হয়তো তারও একদিন এই বউটির দশাই হবে।

প্রভা বলে, জ্বর নিয়ে পড়াতে এলেন নাকি ?

জ্বরের মতো হয়েছে একটু।

তবে এলেন কেন ?

রাখাল মনে মনে বলে, এলাম কেন ? না এলে তোমরা যে রাগ করবে !

মুখে বলে, খানিকক্ষণ পড়িয়ে যাই। একেবারে ফাঁকি দিলে চলবে কেন ?

প্রভা মুখ ভার করে বলে, ভাগ্যে আমি আপনাকে মাইনে দিই না—টাকাটা বাবার। নইলে সত্যি একবার চটতে হত। মুখের ওপর এমন করে কাউকে ধিক্কার দিতে আছে ?

ধিক্কার কীসের ?

প্রভা একটু হেসে বলে, আমরা জন্ম জন্ম দাসীর জাত, মেয়েমানুষ। ধিক্কার দেবার এ কৌশল আমরা জানি। জ্বর গায়ে রাঁধতে গিয়ে আমরা যখন বলি, না রেঁধে উপায় কী, সবাই খাবে কী—তখন সেটা পুরুষদের ধিক্কার দিয়েই বলি।

তোমাকে রাঁধতে হয় নাকি ?

বলেই রাখাল গুম খেয়ে যায়। আগের বার ধিক্কার না দিয়ে থাকলেও এ কথাটা রীতিমতো খোঁচা দেওয়া হয়ে গেছে। বড়োলোকের মেয়েকে এ প্রশ্ন করার একটাই মানে হয়।

মুখখানা সত্যই ম্লান হয়ে যায় প্রভার। এত উজ্জ্বল তার গায়ের রং যে মুখে একটু মেঘ ঘনালেই মনে হয় দুর্যোগ ঘনিয়েছে।

রাখাল আবার বলে, কিছু মনে কোরো না প্রভা।

প্রভা বলে, কেন মনে করব না ? আমার বাবা কি খুব বেশি বড়োলোক ? বারোশো টাকা মাইনে পান। আজকের দিনে বারোশো টাকা পেলে কেউ বড়োলোক হয় ? টাকাব ভাবনায় রাত্রে বাবার ঘুম হয় না তা জানেন ?

রাখাল বিব্রত হয়ে বলে, আমি এমনি বলেছি কথাটা। একটা রাঁধুনি তো আছে, তোমরা না রাঁধলেও চলে, এর বেশি কিছুই বলতে চাইনি।

প্রভা কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিতে রাজি নয়।

সে ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তা না চাইলেও এটা সত্যি যে আমাদের সম্পর্কে আপনাদেব অনেক ভুল ধারণা আছে। রাঁধতে হয় না বলেই কি আমি স্বাধীন ? যাদের রাঁধতে হয়, আমিও তাদেরই দলের। খানিকটা আরামে থাকি, এইটুকু তফাত।

রাখাল আর কথা কয় না। এবার কিছু বলা মানেই ছাত্রীর সঙ্গে তর্কে নামা। প্রভা নতুন থিয়োরি শিখেছে, সবটাই অতি রোমাঞ্চকর। তফাত থাকলেও যে রাঁধুনি রাখে পয়সা দিয়ে সে সমান হয়ে গিয়েছে দুবেলা যাকে পয়সার জন্য পরের বাড়ি হাঁড়ি ঠেলতে হয় তার সঙ্গে—এই অতি মনোরম সিদ্ধান্ত সে আবিষ্কার করেছে একেবারে অন্যন্তরের অন্য এক সত্য থেকে। বড়ো ধনী ছাড়া বড়ো ধনিকের শাসনে সবাই এ দেশে নিপীড়িত। দুর্মূল্য খোলা বাজার আর চোরাবাজার শুধু তার বাবার মতো বারোশো টাকা আয়ের মানুষকে কেন আয় যাদের আরও অনেক বেশি তাদেরও জোরে আঘাত করেছে—মাঝারি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত আজ বেসামাল হবার উপক্রম। ধনিক শাসনের অবসান শুধু গরিবের নয়, এদেরও স্বার্থ।

এ পর্যন্ত অবশ্যই সত্য কথাটা। কিন্তু এই সূত্র ধরেই প্রভা যখন তাদের সঙ্গে সাধনাদের তফাতটা, অগ্নিমূল্যেও যারা আরাম-বিলাস কিনতে পারে তাদের সঙ্গে যাদের স্রেফ ভাতকাপড়ের টানাটানি তাদের তফাতটা নিছক আরামে থাকা না থাকায় দাঁড় করায় তখন গা জ্বালা করারই কথা।

আরামের অভাব আর আসল অভাব প্রভার কাছে এক।

প্রভা টেবিলের বইগুলি ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, এ পড়া আজ পড়ব না। চুপ করে গেলেন কেন জানি। ভুল কথা কী বললাম আজ তাই পড়ান আমাকে। বেশ, আপনার কথাই ঠিক—

আমি তো কিছুই বলিনি !

চুপ করে থাকা মানেই বলেছেন। আপনি ভাবছেন, গরিবের মেয়ের সঙ্গে আমার তুলনা ! তারা ভালো করে খেতে পরতে পায় না আর আমি দামি শাড়ি পরি, মাছ দুধ খেয়ে মোটা হই !

প্রভার গড়ন সত্যই একটু মোটাসোটা ধরনের। তাই নিজের কথায় নিজেই সে একটু মুচকে হাসে।

কিন্তু ভালো খেতে পরতে পাই বলেই কি আমি পুরুষের অধীন নই, পুরুষের সম্পত্তি নই ? আমার বেলা ভিন্ন নিয়ম ? গরিব ঘরের মেয়েদের বেলা স্পষ্ট চোখে পড়ে, আমাদের বেলা আড়ালে থাকে এইমাত্র।

এবার তার মনের গতি ধরতে পেরে রাখাল হেসে বলে, তুমি ঠিক উলটোটা বলছ। ওটা বরং গরিবের ঘরেই খানিক আড়াল থাকে। মেয়েরা যে পুরুষের সম্পত্তি বড়োলোকের ঘরেই এটা সব দিক থেকে চোখে পড়ে। সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে আদরে আহ্লাদে যে রাখে, তার মানেই তো তাই। নিজের সম্পত্তি তাই এত আদর এত যত্ন। গরিবের ঘরেই হঠাৎ ধরা যায় না। মেয়েরা যেরকম খাটে আর কষ্ট করে তাতে মনে করা চলে তারা কারও সম্পত্তিই নয়, বেওয়ারিশ জিনিস। নিজের সম্পত্তির কেউ এত খারাপ ভাবে রাখে ?

প্রভা দমে গিয়ে বলে, তাইতো ! এটা তো ভাবিনি ? আমি ভাবতাম মালিক মানেই যে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে !

যেমন মিলের মালিক ?—রাখাল হাসে, মালিক কি মিলের ওপর অত্যাচাব করে ? মিলটার জন্য তার যত দরদ ! অত্যাচার করে মিলে যারা খাটে তাদের ওপর—কত কম পয়সায় যত খাটুনি আদায় করতে পারে।

রাখালেব চা আর খাবার আসে। ভালো দামি খাবার, ডিমের মামলেট।

জ্বরের ওপর খাবেন ?

রাখাল খেতে আরম্ভ করে বলে, জ্বর নয়, জ্বর ভাব। খেতে না পেলেই সেটা হয়।

প্রভা নীরবে তার খাওয়া দ্যাখে। মনের মধ্যে তার পাক দিয়ে বেড়ায় একটা প্রশ্ন—বেকার জীবনের দারিদ্র্য কি পরিবর্তন এনেছে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ? যদি এনে থাকে, সে পরিবর্তনের মর্মকথা কী ? জানে যে দারিদ্র্য রসকষ শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কীবকম হয় তার ভিতরের রূপটা ? পরস্পরের সম্পর্কে মিষ্টতার অভাব ঘটে, কারণে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ তো তাদের করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয় দুজনকে, মেনে নিতে হয় পরস্পরকে। কেমন হয় তাদের এই আত্মীয়তা ? সব কিছু সত্ত্বেও আপন হওয়া ?

নিস্তরঙ্গ ভোঁতা হয়ে যায় ? যান্ত্রিক হয়ে যায় ? বাস্তব বাঁধনে বাঁধা নিরুপায় দুটি নরনারীর স্থূল সম্পর্ক দাঁড়ায় ?

অথবা দুঃখকষ্ট হতাশার প্রতিক্রিয়ায়, সংঘর্ষের জ্বালায় স্থূল বাস্তব আত্মীয়তাটুকু হয় উগ্র, অস্বাভাবিক, রোমাঞ্চকর ?

কথাটা এমন জানতে ইচ্ছা করে প্রভার !

কিন্তু এ কথা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না রাখালকে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে বোধ হয় জানাও যায় না এ সব কথা।

অন্য আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রভার। যে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করছে তারই সম্পর্কে।

ভেবেচিন্তে এ বিষয়েই সে প্রশ্ন করে। বলে, আচ্ছা, স্বাধীনভাবে যে মেয়েরা রোজগার করে তারা কি সত্যিকারের স্বাধীন ?

এ প্রশ্নের মানে রাখাল জানত। এটা প্রভার ব্যক্তিগত প্রশ্নও বটে।

স্বাধীনভাবে রোজগার করে ? কোন দেশের মেয়ের কথা বলছ ? এ দেশে পুরুষেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পায় না, মেয়েরা কোথা থেকে সে সুযোগ পাবে ? রোজগার করে এই পর্যন্ত। এ ধারণাই বা তুমি কোথায় পেলে নিজে রোজগার করলেই মানুষ স্বাধীন হয় ? পুরুষরা অন্তত তাহলে স্বাধীন হয়ে যেত ? সত্যিকারের স্বাধীনতা অনেক বড়ো জিনিস।

মেয়েদের চাকরি-বাকরি করার তো তাহলে কোনো মানে নেই ?

মানে আছে বইকী ! মস্ত মানে আছে। এ দেশে বেশ কিছু মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে রোজগার করতে বেরিয়েছে, এ একটা কত বড়ো পরিবর্তনের লক্ষণ আমাদের চেতনার। এটা কী সোজা কথা হল ? সব চেয়ে বড়ো কথা কী জানো ? যারা রোজগার করতে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি তারাও এটা মেনে নিয়েছে। মেয়েমানুষ আপিস করে শুনে ঘরের কোনার ঘোমটা-টানা বউও চোখ বড়ো বড়ো করে গালে হাত দেয় না। সেকেলে গোঁড়া পুরুষ এটা পছন্দ না করলেও সায় দিয়েছে—আমার ঘরে ও সব চলবে না, তবে সমাজে চলছে, চলুক। পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে মেয়েরা রোজগার করুক এটা চালু হয়ে গেছে সমাজে—কিছু মেয়ের চাকরি করার চেয়ে এটাই বড়ো কথা।

পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে ?

চায়ের কাপে শেষ চুমক দিয়ে রাখাল স্থিরদৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তাছাড়া কী উপায় আছে ? সামাজিক অনুমোদন মানেই পুরুষের অনুমোদন। এটা হল চাকবি-বাকরির বেলায়। অন্যভাবেও মেয়েরা রোজগার করে—সমাজে সে নোংরা উপায়টাতে সায় দেয় না, সয়ে যায়। কিন্তু ও সব কারবারও পুরুষরাই চালায়, তারাই কর্তা।

প্রভা কাতরভাবে বলে, এতকাল নারী আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কী ?

রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে; অনেক কিছু করেছ। সারা দেশের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছ। মেয়েপুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছ। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী আন্দোলন তো নিছক সস্তা শখের ব্যাপার—মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সে জন্য তাদের স্বার্থে ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝালঝাল টকটক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেছে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।

রাখাল একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা সিগারেটই তার সম্বল ছিল।

বলে, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোনো লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাতকাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া—হলে দুটোই একসাথে হবে নইলে কোনোটাই হবে না।

প্রভা সংশয়ের সঙ্গে বলে, আপনি ধাঁধায় ফেললেন। মেয়েরা এ রকম পদানত হয়েই থাকবে, তার মানে আন্দোলন করবে শুধু পুরুষেরা ?

রাখাল খুশি হয়ে বলে, ভাগ্যে আজ পড়তে না চেয়ে তর্ক পড়েছ প্রভা। নইলে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত তোমার সম্পর্কে, ভাবতাম তুমি বুঝি শুধু বই মুখস্থ আর পরীক্ষা পাশ কর।

প্রভা খুশি হয়ে মাথা নত করে টেবিলে আঙুল দিয়ে লাইন টানে।

রাখাল বলে, কিন্তু এত মেয়ে লড়াই করছে, গুলির সামনে পর্যন্ত বুক পেতে দিচ্ছে, তবু তোমার এ ধাঁধা কেন ?

সে তো শুধু কিছু অগ্রণী মেয়ে।

অগ্রণী হয় কারা ? যারা পিছিয়ে আছে তাদের যারা এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে কোনো মিল নেই, সম্পর্ক নেই ? একজনও যখন এগিয়ে যায় বুঝতে হবে পিছিয়ে থাকলেও দশজনের মধ্যে সাড়া এসেছে, সমর্থন এসেছে—সে তারই প্রতীক। নইলে সে কী নিয়ে কীসের জোরে এগোল ? পুরুষেরা এগিয়ে গেলে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। মেয়েদের দমিয়ে রেখে বাদ দিয়ে কি পুরুষের লড়াই চলে ?

প্রভা তবু ছাড়বে না। মৃদু হেসে বলে, লড়াই পুরুষের, তবে মেয়েদেরও দরকার বলে দয়া করে সঙ্গে নেয়। আমিও এই কথাই বলছিলাম।

রাখালের মুখেও হাসি ফোটে।—দয়া মায়া সমাজ তো মেয়ে-পুরুষ সব জড়িয়ে দিচ্ছ কিনা, তাই এই ধাঁধাও কাটবে না। দয়া ? দয়া আবার কীসের ? অবস্থা পালটে দিয়ে যে পুরুষ লড়াই করছে, অবস্থাটা কী আর কেন না জেনেই সে লড়াই করছে ? মেয়েপুরুষের বর্তমান সম্পর্কটাও তো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরেকটা অভিশাপ—পুরুষের পক্ষে অভিশাপ, সে তা জানে। এ অভিশাপ দূর করাও তার কাজ।

একটু থেমে রাখাল আবার বলে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের চেতনা যে স্তরেই থাক, এ চেতনাটাও থাকে। না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত জাগে না জাগে না কবে লেখা হয়েছিল মনে আছে ?

প্রভা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কোনো একটা প্রশ্ন করবে কী করবে না ভেবে সে ইতস্তত করছে বুঝে রাখালও চুপ করে অপেক্ষা করে।

একটা কথা বললে রাগ করবেন ?

কথাটা না শুনে কী করে বলি ?

যে কথাই হোক, আগে বলুন রাগ হলেও রাগ করবেন না। একটিবার নয় রাগ না করার চুক্তিতে একটা কথা আমায় বলতেই দিলেন !

বেশ তাই হবে, বলো।

প্রভা গম্ভীর হয়ে মুখের ভাবে গুরুত্ব আনে। জোর করে সোজা তাকিয়ে থাকে রাখালের চোখের দিকে।

আপনি এত বোঝেন। সাধনাদি কেন ঘর ছেড়ে বেরোন না ? শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন ?

এ রকম প্রশ্ন রাখাল কল্পনাও করেনি। মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আলোচনা থেকে প্রভা একেবারে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসবে এটা সত্যই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। রাগ হয় প্রচণ্ড, মুখ তার লাল হয়ে যায়। দেখে মুখখানা ম্লান হয়ে আসে প্রভার।

[illegible] সামলে যায় রাখাল। রাগ করবে না কথা দিয়েছে বলেই শুধু নয়, প্রভা যে তাকে খোঁচা দিতে বা অপমান করতে কথাটা জিজ্ঞাসা করেনি এটা খেয়াল করে। মনের মধ্যে এ ধাঁধাটাও পাক খাচ্ছিল তার। সরলভাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে এর সমাধান কী।

সাধনাদিকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতে প্রভা।

তিনি তো বুঝিয়ে দিতে পারবেন না।

তুমি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে। তোমার সাধনাদি বুঝিয়ে দিতে পারবে না সে কেন ঘরের কোনায় দিন কাটায়। তার মানেই সে এ সব বোঝে না।

আপনি বুঝিয়ে দেন না ?

রাখাল ম্লান হেসে বলে, বুঝবে কেন ? এ সব বুঝিয়ে দেবার চুক্তিতে তো তাকে বিয়ে করিনি !

এটা রাগের কথা রাখালের।

বাড়ি ফেরার পথে রাখালেরও মনে হয়, তার কথায় একটা ফাঁকি আছে।

সত্যই সে কি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সাধনাকে যে তাকে আর তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আর তার একার নেই ? এ জন্য নেই যে এটা তার অসাধ্য হয়ে গেছে এমনি আজ দুরবস্থা দেশের ?

না, আন্তরিকভাবে বাস্তব উপায়ে এ চেষ্টা সে কোনোদিন করেনি।

কথাই শুধু বলেছে নানারকম। দেশবিদেশের কথা শুনিয়েছে সাধনাকে, দেশের আজ কেন এমন ভয়ংকর অবস্থা সেটা ব্যাখ্যা করেছে অনেকটা নিজের বেকারত্বের সাফাই হিসাবে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে নিজের দোষে সে বেকার নয়, সাধনা যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা তার অপরাধ নয়, দেশের মানুষ যাদের বিশ্বাস করেছিল, যারা সত্যিকাবের মুক্তি এনে দেবে ভেবেছিল, এটা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সে ভাগাভাগি করতে চায়নি সাধনার সঙ্গে। যেভাবে পারে একা সে ভরণ-পোষণ করবে তাকে আর তার আগামী সন্তানদের, নীড় বেঁধে নিয়ে রক্ষা করবে নেই নীড়, বিয়ের এই চুক্তিটা নিজেই সে পালন কবতে চেয়েছে প্রাণপণে ! অক্ষমতার জন্য তাই অবস্থার অজুহাত দিয়ে, নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ত দিয়ে শুধু মান বাঁচাতে চেয়েছে সাধনার কাছে।

আসলে আজও তার মন মজে রয়েছে আগের দিনের ফেলে আসা জীবনধারাব রসে। চাকরি করে দুটো পয়সা এনে ছোটো একটা ঘর বেঁধে সীমাবদ্ধ জীবনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ নিয়ে দিন কাটাবার অভ্যাসে আজও নেশার মতো তাকে টেনেছে, আজও সে জের টেনে চলতে চায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই অভ্যাসের !

জানে যে জগৎ পালটে যাচ্ছে, তাদের ঘর-সংসার ভেঙে দিচ্ছে সেই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে, শেষ হয়ে আসছে তাদের মতো মানুষের পুরানো ধাঁচেব জীবনযাত্রা। আর ফিরে আসবে না তাদের আগেকার জীবন।

তবু, জেনেও এখনও সে আঁকড়ে থাকতে চায় সেই জীবনকেই, যেটুকু আজও বজায় বাখা যায় সেইটুকু দিয়েই আজও মন ভুলাতে চায় নিজের যে এখনও টিকে আছি, টিকিয়ে রেখেছি পারিবারিক জীবন।

নিজে একা একটু অংশ নিয়েছে সকলের দুরবস্থার সত্যিকারের চেষ্টায়, নতুন করে সব গড়ার লড়ায়ে। এটুকু করেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

বাসে উঠে দেখা হল বেলার স্বামী ধীরেনের সঙ্গে।

বেলা সাধনার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই সূত্রে রাখাল ও ধীরেনের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও দুজনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

বোঝাই বাসে কথা হয় না। প্রভা আজ না পড়ায় রাখাল সকাল সকাল ছুটি পেয়েছে, বাসে এখন যাত্রীদের গাদাগাদি। পুরো টাইম পড়িয়ে রাখাল যেদিন বাসে ওঠে সেদিনও অবশ্য কিছুটা পথ তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

শহরতলির কাছাকাছি গিয়ে ধীরেনের পাশেই বসতে পায়।

বলে, খবর কী ?

সেই এক খবর।

কিছু হল না ?

কী করে হয় ! রামরাজ্যে কিছু হয় না।

চাকরি দানের সরকারি আপিস সম্পর্কে ধীরেন তার নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনি আরম্ভ করে, কাহিনি শেষ না হতে বাস দাঁড়ায় তার নামবার স্টপেজে। সে বলে, নামুন না খানিক বসে গল্প করে যাবেন ?

এখান থেকে রাখালের বাড়িও মোটে কয়েক মিনিটের পথ। সে ধীরেনের সঙ্গে নেমে যায়।

সরু গলির মধ্যে চারকোনা উঠানের চারদিকে ঘর তোলা সেকেলে ধরনের পুরানো একটি দোতলা বাড়িতে ধীরেনের আস্তানা—একতলায় একখানি ঘব, আলো বাতাস খেলে না। সমস্ত বাড়িটাতে এমনিভাবে একখানা দুখানা ঘর নিয়ে মোট ন-ঘর ভাড়াটে বাস করে। সকালে বিকালে নটি ছোটোবড়ো পরিবারের উনানে যখন প্রায় একসঙ্গে আঁচ পড়ে অনেককে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় রাস্তায়।

বেলা বলে, আসুন।

সে হাতকল চালিয়ে ফ্রক সেলাই কবছিল। তার নিজের মেয়েটির বয়স মোটে দুবছর, ফ্রকটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের। আরও দু-তিনটি সেলাই করা শায়া ব্লাউজ পাশে পড়ে আছে, কিছু আলগা ছিটের কাপড়ও আছে।

এত কী সেলাই করছেন ?

বেলা শুধু একটু হাসে।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ধীরেন গম্ভীর শুকনো গলায় বলে, পাড়ার লোকের ফরমাশ সব। উনি বাড়িতে দর্জির দোকান খুলেছেন।

বলে সে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেলা বলে, গয়না বেচে খাচ্ছি। বিয়েতে কলটা পেয়েছিলাম। শখের জিনিস ঘর সাজিয়ে রেখে লাভ কী ? এমনি কত জামা সেলাই করে দিয়েছি কতজনকে, আজ দরকারের সময় দুটো পয়সা যদি রোজগার হয়, দোষের কী আছে বলুন ?

কে বলে দোষ ?

উনি খুঁতখুঁত করেন। পাড়ার চেনা লোকের কাছে পয়সা নিয়ে জামা সেলাই করব, ওনার সেটা পছন্দ হয় না।

পছন্দ না হয়ে উপায় কী ?

উপায় নেই। তবু পছন্দ হয় না !

রাখাল ভাবে, সাধনার কল নেই। কিন্তু কল থাকলেও সে কি নিজে উদ্যোগী হয়ে এ ভাবে কিছু রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে পারত ? এদিকটা খেয়াল হত না সাধনার, সে হয়তো বলত যে নগদ যা পাওয়া যায় তাতেই কলটা বেচে দাও, সেই টাকায় কিছুদিন চলুক !

৬

কী দোলটাই যে খায় সাধনার মন !

এক সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে বিপরীত আরেক সিদ্ধান্তে !

বাসন্তী একরাশ নোট দিয়েছে তাকে—কারণ, হারের দামটা সে যা দিয়েছে তার মধ্যে দু-চারখানা পাঁচ টাকার ছাড়া বাকি সব দুটাকা একটাকার নোট।

সংসারের খরচ থেকে একটি দুটি করে বাসন্তী টাকাগুলি জমিয়েছে।

বাসন্তী নিজে এসে গুনে দিয়ে গিয়েছিল নোটগুলি। সাধনা আরেকবার গুনে বাক্‌সে তুলে রেখেছিল—ট্রাঙ্কের মধ্যে তার গয়না রাখার ছোটো বাক্‌সে। বাক্‌সে যেন আঁটে না এত নোট !

ক-ভরি সোনার বদলে একরাশি টুকরা কাগজ।

প্রথমে তার মনে জেগেছিল একটা দ্বিধা। রাখালের ভরসা না কবে কাল আবার বাসন্তীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে নিজেই কিনে আনবে নতুন হারটা ? অথবা রাখালকে টাকা দেবে কিনে আনতে ?

রাখালকে জানানো হয়নি সে নিজেই হার বিক্রির ব্যবস্থা করেছে !

হার কেনার ব্যবস্থাটাও যদি রাখালকে না জানিয়ে করে ? যে ব্যবহারটা রাখাল জুড়েছে তার সঙ্গে তার একটা উচিত মতো জবাব দেওয়া হবে সে অত তুচ্ছ নয়, পরাধীন দাসী নয় !

বাড়াবাড়ি হবে ? হোক বাড়াবাড়ি ! তাকে নিয়ে রাজীবের মিথ্যা মতলব আন্দাজ করে বাড়াবাড়ির চরম করেনি রাখাল ? সে কেন অত সমীহ করে চলবে তাকে ?

তবু নানা সংশয় জাগে। একটা অজানা আতঙ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় প্রাণটা। জোর করে সে রেবার বিয়েতে যাবে, রাখাল না গেলেও একা যাবে—এই ঝগড়াটাই কোথা থেকে কীসে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক নেই। রাখাল এখনও তার হুকুম ফিরিয়ে নেয়নি, সেও ছাড়েনি তার জিদ। এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তাদের এই বিরোধ যে এ বিষয়ে তারপর একটি কথাও হয়নি তাদের মধ্যে !

রাখাল অপেক্ষা করছে সে কী বলে কী করে দেখবার জন্য। হয়তো রাখাল আশাও করছে যে সে তার জিদ ছেড়ে দিয়েছে তাই আর হারের কথা তুলছে না। আর এদিকে সে অপেক্ষা করছে রাখাল নিজে থেকে তার হুকুম ফিরিয়ে নেবে, নতুন হার এনে দেবার জন্য ভাঙা হারটা চেয়ে নেবে, আরেকবার তাকে বিবেচনা করার সুযোগ দেবে যে বিয়েতে সত্যি সে যাবে কিনা।

এ ব্যাপারেই কী ঘটে না ঘটে, আরও গোলমাল সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে ?

তার ভয় করে। মনে হয় নিজের দোষেই হয়তো সে নিজের সর্বনাশ করে বসবে। সবদিক দিয়ে দারুণ দুঃসময়, অর কাজ নেই অশান্তি বাড়িয়ে।

এই ভয়টাই আবার যেন তাকে ঘা মেরে কঠিন করে দেয়। এই ভয় যেন তাকে বলে দেয়, তোমার মতো নিরুপায় অসহায় কেউ নেই, রাখাল ছাড়া তোমার আর গতি নেই, তোমার সাধ্য নেই রাখালের বিরুদ্ধে যাবার। রাখালের ইচ্ছা অনিচ্ছা খুশি অখুশিই তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা খুশি অখুশি। রাখাল যদি রাখে তবেই তোমার মান থাকে। রাখাল খেতে পরতে না দিলে তুমি খেতে পাবে না, ন্যাংটো হয়ে থাকবে, খেয়াল নেই তোমার ?

আগে খেয়াল ছিল না সত্যই, নিজের জিদ বজায় রাখতে গেলে রাখাল শেষ পর্যন্ত কী করবে এই ভয় এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে।

একেবারে যেন ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে নিজের সম্পর্কে তার মর্যাদাবোধ, এ সংসারে তার অধিকারবোধ মনুষ্যত্ববোধ !

এই তবে তার আসল সম্পর্ক রাখালের সঙ্গে, সংসারের এইখানে তার আসল স্থান ?

ও বাড়ির সুধা নিয়মিতভাবে মারধোর লাথি-ঝাঁটা পায় স্বামীর কাছে। সুধার সঙ্গে তার আসলে কোনো পার্থক্য নেই। রাখাল যে তাকে মারধোর করে না সেটা নিছক রাখালের রুচি ! এর মধ্যে তার কোনো বাহাদুরি নেই।

তখন আবার বিগড়ে যায় সাধনার মন। এক উগ্র প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগে তার মধ্যে। হোক তার সর্বনাশ, ভেঙে চুরমার হয়ে যাক তার সংসাব, ঘুচে যাক স্বামীর কাছে তার সব আশাভরসা—নত সে হবে না কিছুতেই।

খেতে পরতে দেয় বলে, চিরকালের জন্য তার স্বামীত্বের পদটা দখল করেছে বলে, রাখাল যদি এই জোর খাটিয়ে তাকে দমিয়ে রাখতে চায়—একবার সে চেষ্টা করে দেখুক ! দেখুক যে ঠিক মাটি দিয়ে গড়া তার সাধনা নয়, সেও রক্তমাংসের মানুষ, নিজের মান বাঁচাতে সেও শক্ত হতে জানে।

ছেলে কোলে সে রাস্তায় নেমে যাবে। ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি করবে। দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি নেবে। তবু—

আবার দোল খেয়ে মন চলে যায় অন্যদিকে। আবার মনে পড়তে থাকে যে রাখাল এ পর্যন্ত তাকে অপমান বিশেষ কিছুই করেনি ! সেই যে হর্তাকর্তা বিধাতার মতো সোজাসুজি তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল যে রেবার বিয়েতে তার যাওয়া হবে না, তারপর থেকে এক রকম গুম খেয়েই আছে মানুষটা। রাগ করে একজন গুম খেয়ে থাকলে তাতে তার অপমান কীসের ?

তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছে কিছুদিনের জন্য। দুরবস্থায় পড়লে এমন কী কেউ পাঠায় না ? এতে তার প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানে ঘা লাগবে কেন ?

যেচে চাকরি দিতে চায় বলে রাজীবের মতলব সম্পর্কে যে ইঙ্গিত সে করেছে, সেটা রাজীবের সম্পর্কেই। রাজীবের মনের মধ্যে কী আছে না আছে সে কথা বলায় তার অপমান কীসের ? সে রাজীবকে প্রশ্রয় দেয় এ রকম ইঙ্গিত তো রাখাল করেনি।

নিজেই সে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে। যা শুধু মনোমালিন্য স্বামী-স্ত্রীর সেটাকে দাঁড় করিয়েছে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকা না থাকার প্রশ্নে।

তাছাড়া,—সাধনা এ কথাটাও ভাবে,—সংসারে সে তো একা নয় স্বামী যাকে খেতে পরতে দেয়, স্বামীই যার একমাত্র গতি। সব স্ত্রীরই একদশা। এ জন্য বিশেষভাবে নিজেকে ধিক্কার দেবার কী আছে ?

স্বামীত্বের অধিকার যদি রাখাল একটু খাটাতেই চায়, আর দশজনের মতো সেটুকু মেনে নিলেই বা দোষ কী ? সুধার মতো লাথি আর চাবুক সয়ে যাবার প্রশ্ন তো নয় !

কিন্তু বেশিক্ষণ একভাবে থাকে না তার মন। পালা করে নরম আর গরম হয়, আপস থেকে বিদ্রোহে গতায়াত চলে।

ভোলার মা বলেছিল বিকালে আসবে।

বেলা পড়ে আসে, তার দেখা নেই। এ আবার আরেকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সাধনার। হার বিক্রির টাকা থেকে সে নিজেই মাকড়ি দুটো বাঁধা রেখে ভোলার মাকে পঁচিশটা টাকা দেবে ভেবেছে।

ভরি খানেক কম সোনার একটা নতুন হার সে কিনবে। দোকানে দেখে এসেছে, ও রকম সোনাতেও সর্বদা ব্যবহারের হার মন্দ হয় না।

কিছু টাকা তার বাঁচবে।

কিন্তু টাকা রাখলে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাবে। তার তো বাসন্তীর মতো অবস্থা নয় যে সংসারের খরচ থেকে বাড়তি দু-পাঁচটাকা সরিয়ে সরিয়ে রেখে জমাতে থাকবে, খরচ করার দরকার হবে না।

তার চেয়ে মাকড়ি বাঁধা রাখলে হার বেচা পঁচিশটা টাকাও যদি টিকে যায়।

কিন্তু ভোলার মা আসে না কেন ? টাকার দরকার বলে সোনা ফেলে রেখে গেছে, তার কি তাগিদ নেই এসে খবর নেবার ? সাধনা নিজেই এমন অধৈর্য হয়ে ওঠে যে নিজেই সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

গিয়ে দিয়ে এলে কেমন হয় টাকাটা ভোলার মাকে ?

ওই তো চোখের সামনে দেখা যায় কুঁড়েঘরগুলি। এই তফাত থেকেই ঘরগুলিকে একে একে সে গড়ে উঠতে দেখেছে, এখান থেকেই এতদিন তাকিয়ে দেখেছে ঘরগুলিকে। ভোলার মা ছাড়া আর কারা এখানে থাকে, কীভাবে অতটুকু ঘরে থাকে, কিছুই সে জানে না।

গেলে দোষ কী ?

পাঁচটার পর আর ধৈর্য থাকে না সাধনার। ব্লাউজের ভিতরে টাকা নিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেড়াতে পুকুরপাড় ঘুরে সে ছোটোখাটো কলোনিটিতে যায়। কাছাকাছি গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সমান দূরে দূরে সাজিয়ে বসানো ছাঁচে ঢালা ছোটো ছোটো ঘর, টুকরো টুকরো বাগান, সরু সরু পথ—চারিদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। ঠিক যেন ছবির মতো। ঘর হারানো মানুষগুলি সব গড়েছে নিজের হাতে। এখনও কোনো ঘরের টুকিটাকি কাজ চলেছে, কাজ করছে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ! কয়েক হাত বাগানটুকুতে পুরুষ লাগাচ্ছে সবজিচারা, পুকুর থেকে জল এনে দিচ্ছে তার বউ। রাস্তার কল থেকে কেউ কলসি করে জল আনছে, কেউ ধরাচ্ছে উনান, কেউ বেঁধে দিচ্ছে আরেকজনের চুল।

ভোলার মার ঘরটি পুব-দক্ষিণ কোণে। কলোনির একজন ঘরটা সাধনাকে দেখিয়ে দেয়।

সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে বলে, কী চান ?

ভোলার মা ঘরে নেই ?

মা ? মা ডিম বেচতে গেছে।

ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাধনা বলে, তুমি দুর্গা, না ?

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে দুর্গা বলে, আসেন, বসেন।

একটা চওড়া বেঞ্চের মতো মাটির দাওয়া, তাতে একটা তালপাতার চাটাইয়ের আসন দুর্গা বিছিয়ে দেয়। বসতে বসতে সাধনা বলে, বসব কী, আমি তোমার মার খোঁজে এলাম, তোমার মা হয়তো ওদিকে আমার বাড়ি গেছে।

ভিতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, দুগ্‌গা, জিগা তো ওইটার ব্যবস্থা করছেন নাকি ?

দুর্গা বলে, মা আপনাকে মাকড়ি দুইটা দিছে না ? কিছু করছেন ?

এরা সবাই তবে জানে ? ভোলার মা চুপিচুপি লুকিয়ে মাকড়ি দুটি বাঁধা রাখতে তার শরণাপন্ন হয়নি ! এই একটা খটকা ছিল সাধনার মনে।

সে বলে, হ্যাঁ, ব্যবস্থা করেছি। সেই জন্যই খুঁজতে এসেছিলাম তোমার মাকে।

গায়ে কাঁথা জড়িয়ে রাধেশ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। চুলে পাকধরা লম্বা চওড়া মস্ত একটা মানুষ, ঠিকমতো খেতে পেলে বোধ হয় দৈত্যের মতো দেখাত। কতকাল ধরে উপবাসী দেহে স্বাস্থ্যের জোয়ার নেই, শুধু ভাটা। হাড় আর চামড়া শুধু বজায় আছে।

জ্বর নিয়া উইঠ্যা আইলা ক্যান ?

মেয়ের প্রতিবাদ কানেও তোলে না রাধেশ। ক-হাত তফাতে উবু হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। ভোলার মারে কইয়া দিছিলাম, মাকড়ি তুমি বেচবা না, কিছুতেই বেচবা না। ভালো মাইনষের কাছে বাঁধা দিয়া টাকা পাইলে আনবা, না পাইলে আনবা না। দুই মাসে পারি ছয় মাসে পারি মাকড়ি আমি খালাস কইরা আনুম। মাকড়ি বেইচা বিয়া দিমু না মাইয়ার।

রাধেশ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশে।

মেয়ের বিয়ে নাকি ?

হ। তেরো তারিখে লগ্ন আছে, পার কইরা দিমু।

ভোলার মা তো বিয়ের কথা কিছু বলেনি ?

কী কইব কন ? নামেই বিয়া, নম নম কইরা সারুম। তবু কয়টা টাকা লাগব।

পঁচিশ টাকায় মেয়ের বিয়ে ! দুর্গাকে ভালো করে দেখতে দেখতে সাধনা আশ্চর্য হয়ে বিবরণ শোনে। এখানকারই আরেকটি কুঁড়েঘরে থাকে ছেলেটি, নাম তার বিষ্ণুচরণ। মা আর বিবাহিতা এক বোনকে সাথে করে এখানে মাথা গুঁজেছিল। দূরে আরেক পাড়ায় ঘর বেধে বোনকে তার স্বামী নিয়ে গেছে। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মা মরে গেছে বিষ্ণুর। কী অসুখ হয়েছিল কে জানে ! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, প্রথমে জায়গা মেলেনি, মরবার আধঘণ্টা আগে ঠাঁই পেয়েছিল সমিতির বাবুদের চেষ্টায়।

তা ওদিকে বিষ্ণুকে থাকতে হয় একা, এদিকে এতবড়ো মেয়ে নিয়ে তাদেরও ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই। শকুন হারামজাদাগুলির নজর যেন খালি খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোন গরিব অসহায়ের ঘরে অল্পবয়সি মেয়ে আছে। দুপক্ষে তারা তাই পরামর্শ করে বিয়েটা ঠিক করেছে। দেনাপাওনা কিছু নেই, কাপড়গয়না থালাবাসন কিছুই লাগবে না, যেমন আছে মেয়ে আর ছেলে ঠিক তেমনিভাবেই শুধু বিয়েটা হবে কলোনির দশজনের সামনে।

তবু শাখা-সিঁদুর তো চাই, পুরুত তো চাই, টুকিটাকি এটা ওটা তো চাই যা না হলে বিয়েই হবে না। একটি করে মিষ্টি দেওয়া হবে কলোনির সকলকে, সকলের মিলিত হুকুমেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে একটির বেশি মিষ্টি দেওয়া। পেট ভরে খাবে শুধু বিষ্টুর বোন আর ভগ্নিপতি।

তবু পঁচিশ টাকায় বিয়ে ! সাধনার বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। হাতে আরও কিছু টাকা আছে, তার সঙ্গে এই পঁচিশ টাকা যোগ হবে নিশ্চয়।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে যাবে ? সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

না কুলাইয়া উপায় কী ? কুলান লাগব।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে না নিলে বিয়ে হয় না, প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হয় করে আরও বেশি খরচ করার ক্ষমতা হবে সেই অজানা অনাগত দিনের আশায়। সবাই এটা বোঝে। তাই পঁচিশ টাকাতেই বিয়েব ব্যবস্থা হয়েছে। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্বীকৃত ব্যবস্থা।

দুর্গা চুপ করে দাঁড়িয়ে শোনে। মেটে রং, রোগা গড়ন, আধ-রুক্ষ একরাশি চুল। এত চুল বলেই বোধ হয় বিয়ের কটা দিন আগেও যথেষ্ট তেল দিয়ে চুলের রুক্ষতা সম্পূর্ণ ঘোচানো যায়নি।

হাতে দুগাছা করে নকল সোনার চুরি, কানে ওই নকল সোনাবই দুল !

কথা কইতে কইতে ভোলাব মা এসে পড়ে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল, আশার কাছে খবর পায় যে তাকে এদিকে আসতে দেখা গিয়েছে। ভোলার মার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি যে তার খোঁজে তাদের কুঁড়ের দিকেই গিয়েছে সাধনা।

ভোলার মা কৃতজ্ঞতা জানায় অপরূপভাবে !

শুধু বলে, ভালোমন্দ মানুষ চিনতে আমাগো ভুল হয় না।

অনেক দেখে অনেক ঠেকে সে নির্ভুল যাচাই করতে শিখেছে সৎ মানুষ আর অসৎ মানুষকে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল মাকড়ি নিয়ে। সাধনা মানুষটা ভালো। সন্দেহাতীতভাবে ভালো।

ভোলার মাকে টাকা দিয়ে সাধনা একটু খুশি মনেই ঘরে ফেরে। উপর উপর কতটুকুই বা দেখেছে আর কতটুকুই বা জেনেছে এখানকার মানুষের দিবারাত্রির জীবন, তবু তার মনে হয় সে যেন কিছুক্ষণের জন্য নতুন একটা জগৎ থেকে ঘুরে এল। ঘরের এত কাছে জীবনের একটা অতি সহজ প্রাথমিক সত্য এমনভাবে বাস্তব রূপ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে এটা যেন এখনও তার বিশ্বাস হতে চায় না, চোখে দেখে কানে শুনে আসার পরেও। তার ধারণাতীত ছিল এই সহজ সত্যটা। এত অসহায়

এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভিত গাঁথে !

পঁচিশ টাকায় আয়োজন করে ছেলেমেয়ের বিয়ের।

এতদিন সাধনার কাছে বিয়ের মানেটাই ছিল রোমাঞ্চকর স্বপ্নকে বাস্তব করা উপলক্ষে হইচই আনন্দ উৎসব। সমস্ত কিছু ছাঁটাই করে এরা বজায় রেখেছে শুধু বিয়ের আয়োজনটুকুকে ! খরচপত্রের আনন্দ উৎসব করার সাধ্য নেই বলে দমে গিয়ে বাতিল করে দেয়নি ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া।

ওখানে যেতে হবে মাঝে মাঝে। কী দিয়ে কীভাবে ওরা সংসার চালায় ভালো করে জানতে হবে।

এইটুকু সময় নিজের চিন্তা ভুলে ছিল। ঘরের তালা খুলতে খুলতে ক্ষণিকের জন্য পিছু হটা সমুদ্রের মতোই তার চিন্তাভাবনা দ্বিধা সংশয় জ্বালা ভয় ছুটে এসে তার মনকে দখল করে।

এত জটিল এত বেখাপ্পা তার জীবন ! অভাবের শেষ নেই একদিকে, অন্যদিকে সীমা নেই অশান্তির।

কেন এমন হয় ? কেন তারা এই বিরোধ আর অশান্তি দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্তত মিলেমিশে শান্তিতে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে পারে না ? তাদের চেয়েও কি মনের জোর বেশি ভোলার মায়েদের ? বিদ্যাবুদ্ধি বেশি ?

শুধু রাখাল নয়, সকলের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে একটা আকণ্ঠ সাধ জাগে সাধনার। সবাই তারা কথা বলে পরামর্শ করে বিদ্বেষ আর ভুল বোঝা মিটিয়ে নেবে, তাব মনেও কেউ আঘাত দেবে না, সেও এমন কিছুই করবে না যাতে কারও রাগ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে।

ঝোঁকটা চাপতে পারে না সাধনা। তখনই উঠে আশার ঘরে যায়—সরলভাবে প্রাণ খুলে আশার সঙ্গে আলাপ করবে। একরকম পাশাপাশি ঘর, অথচ তারা ভুলেও একজন আরেকজনেব ঘরে যায় না, একী অর্থহীন অকারণ বিরোধ।

উনানে আঁচ দিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আশা চুল বাঁধছিল। আয়নায় সাধনাকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না, সেই ভাবেই যেন আয়নায় সাধনার প্রতিচ্ছবিকে জিজ্ঞাসা করে, কী বলছ ?

এমনি এসেছিলাম, গল্প করতে।

ও ! বেশ তো।

মুখ ফেরায় না আশা, চুল বাঁধা স্থগিতও করে না এক মুহূর্তের জন্য। সাধনা দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে বসতেও বলে না।

সাধনা ঠিক করেই এসেছিল যে আশা কী ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, নিজের মান অপমান নিয়ে মিথ্যে কাতর হবে না, অন্য সমস্ত হিসাব বাদ দিয়ে সরল সহজ প্রীতিকর কথা আর ব্যবহার দিয়ে আশাকে সে জয় করে ছাড়বে !

বড়ো দমে যায় সাধনা। তার কান দুটি ঝাঁঝা করে। কিন্তু যেচে গল্প করতে এসে আচমকা ফিরেই বা যাওয়া যায় কী করে ?

সেদিন আশাকে উপেক্ষা করে ওদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের জোরে রাজীবের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিল। সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। সেটা ছিল ওদের সংকীর্ণতাকে তুচ্ছ করে গায়ের জোরে নিজের মহৎ ও উদার হওয়া।

আজ নত হয়েই এসেছে আশার কাছে। এসেছে একটা অবাস্তব মিথ্যা উদারতার ঝোঁকে !

মরিয়া হয়ে সে আবদারের সুরে বলে, আমার চুলটা বেঁধে দাও না !

আমি পারিনে।

কাল বেড়াতে এসেছিল ঘোষালদের মেজোবউ, আশা গল্প করতে করতে সযত্নে তার চুল বেঁধে দিয়েছিল।

অগত্যা কী আর করে, সাধনাকে বলতে হয়, আচ্ছা যাই, উনুন ধরাবো।

আচ্ছা।

প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় সাধনার। আজকেই ও বেলা কড়াইসুদ্ধ মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দেবার সময় ভাপ লেগে কিছুক্ষণ তার হাত যেমন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

না আপসের ভরসা নেই, এ অশান্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। নিজেব মনটা ঝেড়ে মুছে সাফ করে সে যদি যেচে নত হয়ে আপস করতে যায়, তার অপমানটাই তাতে বেশি হবে, আবও সে ছোটোই হয়ে যাবে শুধু, তাছাড়া কোনো লাভ হবে না।

তাকে ভুল বুঝবে মানুষ, ভাববে যে তার বুঝি কোনো মতলব আছে !

এ জগতে বোঝাপড়া নেই। যে যেমন বোঝে সেটাই আঁকড়ে থাকবে।

গভীর হতাশা বোধ করে সাধনা। জীবন নয়, এ যেন একটা যন্ত্র। নিজের ধরাবাঁধা নিয়মে একভাবে পাক খেয়ে চলবে, কারও সাধ্য নেই এতটুকু এদিক ওদিক করে।

হৃদয় মনের কোনো মূল্য নেই এই যান্ত্রিক জীবনে।

নইলে হাসিমুখে ছাড়া কথা ছিল না যে রাখাল আর তার মধ্যে, একটু মুখভাব কবলে পাঁচ মিনিটে যে রাখাল তার মুখে হাসি ফুটিয়ে ছাড়ত, সেই রাখাল নিজে আঘাত দিয়ে তাকে আহত করেও অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলেছে !

সকাল সকাল রাখালকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুঝি আশা জাগে সাধনার।

কিছু হল নাকি ?

না।

চাকরিটা কীসের ?

জোচ্চুরি করে জেলে যাবার।

সাধনার মুখ ছোটো হয়ে যায়।

ব্যাপারটা কী হল বলো না ?

বলব আবার কী ? নিজেরা একটা ফাঁদে পড়েছে, আমায় জবাই করে বাঁচবার মতলব ছিল। নইলে যেচে কেউ চাকরি দিতে চায় ?

তার সঙ্গে ভালো করে কথাও কি বলতে চায় না রাখাল ? তার আগ্রহ টের পায় না ? এমন ভাসাভাসা জবাব দেবার নইলে আর কী মানে থাকতে পাবে !

অনেক কথা বলার ছিল সাধনার। কিন্তু তার সঙ্গে যার কথা বলার সাধ নেই তাকে নিজের কথা গায়ের জোরে যেচে যেচে শুনিয়ে আর লাভ কী ? যেচে তাকে চাকরি দিতে চাওয়ার মধ্যে মতলব ছিল রাজীবের, কিন্তু সে যা ভেবেছিল সে রকম মতলব নয়, অন্য মতলব ছিল, এ প্রমাণ পেয়ে কি একটু নরম হওয়া উচিত ছিল না রাখালের ? যে বিশ্রী মতলবের ইঙ্গিত সে আজকেই করেছিল চাকরিটার খোঁজে বেরোবার আগে, সে কথা মনে করে সাধনার কাছে একটু লজ্জা পাওয়াও কি উচিত ছিল না তার ?

রেবার বিয়েতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বলে কী সম্পর্ক চুকে গিয়েছে তাদেব !

এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাতে হয়।

কী বিড়ম্বনা জীবনে !

সাধনাকে অমানুষ মনে হয় রাখালের। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে মনে হয় একটা সচল মাংসপিণ্ডে যেন ক্ষুদ্র স্বার্থপর এক টুকরো প্রাণ বসিয়ে জীবন্ত মানুষটা তৈরি হয়েছে। হয়তো কোনো দোষ নেই সাধনার। সংসার তাকে গড়ে তুলেছে এমনিভাবে, ছোটো করে দিয়েছে তার মনটাকে। হয়তো প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে খানিকটা সংশোধন সে করেও নিতে পারত তাকে।

কিন্তু সে জন্য তো বাতিল হয়ে যায় না এ সত্যটা যে সে অতি নিচুস্তরের ঘৃণ্য মানুষ।

সেই সাধনা, যার হাসি দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। যার সরল নির্ভর, শান্ত মধুর প্রকৃতি আর কেরানির সংসারের স্বল্প আয়োজন নিয়েই সংসার করার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে মনে হত, কত সৌভাগ্য তার যে এমন বউ পেয়েছে !

আজ কী স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়েছে তার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয় আর অবুঝ একগুঁয়ে মনের পরিচয়। এ পরিচয় কী করে এতদিন তার কাছে গোপন ছিল ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয় !

হয়তো তাই হবে। এ সব ছোটো হৃদয় ছোটো মনের মানুষ অল্প পেয়েই খুশিতে গদগদ হয়ে যায়, নিজেকে ধন্য মনে করে। তখন হয়ে থাকে একেবারে অন্যরকম মানুষ !

আবার সেটুকুর অভাব ঘটলেই একেবারে বিগড়ে যায় এ সব মানুষ। একেবারে বিপরীত রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জীবন খালি হয়ে গেল, শরীরে খালি হয়ে এল জীবনী শক্তি, সোনার হারের অভাবে খালি গলার শোকেই সে আকুল ! রেবার বিয়েতে যাওয়ার ছলে সে গড়িয়ে নিতে চায় নতুন হার ! ক-দিন জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ভাতের হাঁড়ির মতো হয়ে আছে তাব মুখ, অস্থির উন্মনা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কথাবার্তা চালচলন !

তার নিজের বা তার ছেলের বা স্বামীর একটা অসুখ হলে চিকিৎসা হবে না জানে, অথচ নতুন হার গলায় দিয়ে সেজেগুজে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কনেকে নিজের কানপাশা উপহার দিতে পারবে না বলে, দশজন আত্মীয়বন্ধুর কাছে মিথ্যা সম্মান মিথ্যা সমাদর পাবে না বলে, পাগল হয়ে যেতে বসেছে !

তাকে আর তার রকম-সকম দেখে কে না বুঝবে যে এটা শুধু তার একটা জোরালো সাধ নয়, সাধটা না মিটলে সে শুধু গভীর মনোবেদনা পাবে না—এটা তার জীবনের চরম কামনায় দাঁড়িয়ে গেছে, এ কামনা না মিটলে হয়তো সে সত্যই পাগল হয়ে যাবে।

ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় রাখালের। নিরুপায় বিদ্বেষে নিশ্বাস তার আটকে আসতে চায়।

নতুন হার তাকে এনে দিতেই হবে। নিয়েও যেতে হবে রেবাব বিয়েতে। তাছাড়া উপায় নেই। এই সামান্য ব্যাপারে মাথা বিগড়ে দেওয়া যেতে পারে না সাধনার। যত প্রতিক্রিয়া হবে সব ভোগ করতে হবে তো তাকেই।

ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে।

রাখালকে সাধনার পাষণ্ড মনে হয়। রক্তমাংসের মানুষ নয়, অস্বাভাবিক অমানুষিক কিছু দিয়ে গড়া। চোখ ফেটে তার জল আসতে চায়। যে রাখাল এত বড়ো বড়ো কথা বলত, এত ছোটো তার মন ? পাশাপাশি শুয়েও সে ভুলতে পারে না তাদের কলহ হয়েছে ? পাশাপাশি শুয়ে নীরব উপেক্ষায় তাকে কাবু করে কলহে জয়ী হতে চায় ? এত সে নীচ ?

সাধনার সহ্য হয় না। সে উঠে গিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

রাখাল বলে, কী হল ?

সাধনা বলে, কী আবার হবে !

রাখাল একটু চুপ করে থেকে বলে, কাল তোমার হারটা বদলে আনব। এতই যখন ইচ্ছা তোমার, রেবার বিয়েতে নিয়ে যাব।

উঠে বসে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে সাধনা বলে, দ্যাখো, আমিও একটা মানুষ ! ও রকম কোরো না তুমি আমার সঙ্গে। একদিন বাড়ি ফিরে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

রাখাল চুপ করে থাকে। সেটা আর আশ্চর্য কী ? যে মতিগতি সাধনার, যে রকম অবুঝ সে, অজ্ঞান মানুষ, তারই জন্য সারাদিন বাইরে প্রাণপাত করে ঘরে ফিরে তাকে দেখতে না পাওয়া আশ্চর্য কিছুই নয়।

রাখাল চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে ভাবে।

কিন্তু এতদূর তো গড়াল গলার একটা হার আর বিয়ে বাড়ি যেতে চাওয়ার উপলক্ষে, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে ? আর কি উপলক্ষ আসবে না ? দিন দিন কি আবও বিগড়ে যেতে থাকবে না সাধনার মন ?

আসল কথা, এ দারিদ্র্য সইবার শক্তি নেই সাধনার। আর কিছুদিন এ ভাবে চললে সে ভেঙে পড়বেই।

সাধনা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু রাখালের চোখে ঘুম আসে না। জেগে থেকে চোখ বুজে সে ক্রমে ক্রমে সাধনার অপমৃত্যু ঘটতে দেখতে পায়।

শুধু সাধনা মরছে না, তাকেও ঘায়েল করে দিয়ে যাচ্ছে।

৭

ভাঙন ধরলে এমনি তির্যকগতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই শুধু হয় তার এঁকে বেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের বিপ্লব তাই আসে অতিবিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবেব মাবফতে, যতক্ষণ না প্রকৃত বিপ্লব রূপ নেয়।

সকালে বিশুকে পড়াতে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেই রাখাল বিশুর মাকে দেখতে পায়। গবদেব শাড়ি পবে সদাস্নানেব ঘব থেকে বেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গে তার ঠিক আগের মতোই গয়নাব অভাব।

কখন ফিরলেন ?

বিশুর মা দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলে, কাইল ফিরছি বাবা। ওইদিন ফিরুম ভাবছিলাম, কুট্‌ম ছাড়ল না। শুক্‌না ক্যান দেখায় তোমারে, খারাপ নাকি শরীর ?

না, শরীর ভালোই আছে।

পড়াতে পড়াতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। বিশুর মতো ভোঁতা ছেলেও টের পায় আজ কিছু হয়েছে তার মাস্টারমশায়ের।

নির্মলা আজও তাকে প্রসাদ দিয়ে যায়। কালীঘাটে পূজা দেওয়ার প্রসাদ, বিশুর মার সঙ্গে এসেছে।

নির্মলা বলে, এই ঘরে তো পড়াইতে পারবেন না আইজ। ঠাকুরের পূজা শুরু হইবো। বড়ো ঘরে বসেন গিয়া।

আজ পূর্ণিমা খেয়াল ছিল না রাখালের। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সকাল সন্ধ্যায় বিশেষভাবে ঠাকুরের পূজা হয়।

বিশুর মার শোয়ার ঘরখানাই এ বাড়ির সেরা ঘর। নির্মলা সেই ঘরের মেঝেতে দামি চিকন পাটি বিছিয়ে দেয়। এটি শীতলপাটিও বটে। বেত অথবা অন্য কীসের ছাল দিয়ে এ পাটি তৈরি হয় রাখাল জানে না। ছাল-বাকল দিয়ে যে এমন মসৃণ আর পাতলা জিনিস তৈরি হয় এটাও তার আগে জানা ছিল না। পাকিয়ে রাখলে বাঁশের চেয়ে মোটা হয় না, বিছিয়ে দিলে এতখানি ছড়িয়ে যায় যে চার-পাঁচজন অনায়াসে শুতে পারে।

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড ভারী খাট, একেবারে নতুন। দেশ থেকে খাট আনা যায়নি, কিন্তু খাটে না শুয়ে বোধ হয় ঘুম আসে না বিশুর মা আর সতীশের। তাই নতুন খাট কেনা হয়েছে। অন্যদিকের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলি ছোটোবড়ো ট্রাংক আর স্যুটকেস—সব রঙিন কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে তোলা কাঁচা ছবি আর কাঁচা হরফের বাণী—রাধাকৃষ্ণের কোনো অঙ্গ সরু কোনো অঙ্গ মোটা, 'পতি পরম গুরু' আপন গুরুত্বে আপনিই এলিয়ে পড়েছে। খানিক পরেই শঙ্খ ঘণ্টা বেজে ওঠে। পূজা শুরু হয়। বিশুর মা একবার ঘরে এসে বাক্সো খুলে পুরানো দিনের দুটি রুপোর টাকা নিয়ে যায়।

পুরুতকে আজও সে পুরানো দিনের জমানো রুপার টাকা দিয়ে দক্ষিণা দেয়। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে বাজে ধাতুর টাকা বা ছাপানো নোটে দক্ষিণা দিতে হলে না জানি কত মর্মাহত হবে বিশুর মা !

বিশুকেও যেতে হয় ঠাকুরঘরে। বিশুর মা নিজে এসে ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায়।

আধঘণ্টা পরে বিশু ফিরে আসামাত্র রাখাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ আর সময় নেই। আটটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।

মনে হয় সে ভীষণ চটে গেছে ঠাকুর পূজার নামে তার ছাত্রের পড়াশুনার গাফিলতিতে।

বিশু ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে ডাইকা নিয়া গেলো—

আচ্ছা, আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি দিয়ে নামে। যেন একরকম পালিয়ে যাবার মতো অতি ব্যস্ততার সঙ্গে সে চলে যেতে চায় এ বাড়ি ছেড়ে।

নির্মলা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলে, শোনেন, শোনেন, প্রসাদ নিয়া যান।

সিঁড়ির নীচে একতলা এখন জনশূন্য। বুড়ি রাজু শুধু একমনে বাসন মেজে চলেছে কলতলায়।

নির্মলা বলে, পুরুষ মানুষের এত তাড়া ? কই যাইবেন ?

আরেকটি ছেলে পড়াতে যাব।

ইস্ ! একেবারে বিশ্রাম পান না। ক্যান এত খাইট্যা মরেন আপনে ? কার লেইগা খাটেন ? আমার সয় না আপনার কষ্ট।

এ মিথ্যা আবেগ নয়। নির্মলার চোখে মুখে ফুটে পড়ে তার দরদ। ব্যাকুল দুটি চোখ সে পেতে রাখে রাখালের মুখে। তবু, ভয়ংকর এক বিপদের মতোই তাকে মনে হয় রাখালের।

নির্মলা তার হাত ধরে। বলে, ঘরে আইসা দুইদণ্ড বসেন। আসেন দুইটা কথা কই।

আজ নয়, আরেকদিন।

কিন্তু এ সুযোগ তো আসবে আবার একমাস পরে, আরেকটা পূর্ণিমা এলে।

ডরান নাকি ?

রাখাল মাথা নাড়ে।—দরকার আছে।

তবে ওই বেলা আইবেন ? সন্ধ্যাকালে ? দুই ঘণ্টা পূজা হইব।

যদি পারি আসব।

রাখাল আর দাঁড়ায় না। বাইরে গিয়ে ছেঁড়া স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে।

ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্মলা তাব পালিয়ে যাওয়া চেয়ে দেখে।

সোনা যে ওজনে এত ভারী রাখালের জানা ছিল না। বিশুব মাব সেকেলে ধরনের গযনাগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। কোঁচায় বাঁধা ক-খানা মাত্র গয়নাব ওজনটা বাখাল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে।

ভোলার মা আজও ডিম বেচতে বেরিয়েছে, প্যাসেজে ডিমেব টুকবি সামনে রেখে সে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আশার জন্য। আশা হাত ধুয়ে এসে দর করে পছন্দ কবে ডিম কিনবে।

ভোলার মাই রাখালকে সাবধান করে দেয়, ব্যাগটা পইড়া যাইবো, ঠিকভাবে থোন।

টাকা নেই, কিন্তু পুরানো শখের মানিব্যাগটা আছে। পড়ি পড়ি অবস্থা থেকে ব্যাগটা পকেটের ভিতর ঠেলে দিয়ে রাখাল ঘরে চলে যায়।

আজও সোজা দু-নম্বব ছাত্রটিকে পড়াতে চলে যাবার বদলে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে নানা কথা মনে হয় সাধনার। আজও কি রাখাল প্রত্যাশা করেছে যে সাধনা নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে হারের কথা বলবে ?

সামনাসামনি এ টালবাহানা অসহ্য মনে হওয়ায সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে তার উনানের পাশে চলে যায়। তাতে সুবিধাই হয় রাখালের। কোঁচা থেকে খুলে গয়না কটা একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে একখানা আস্ত খবরের কাগজে জড়িয়ে পুঁটলি কবে নেবার সুযোগ পায়।

চাকবির খববের আশায় আজও সে প্রতি ববিবার দুখানা কাগজ কেনে, মাঝে মাঝে দরখাস্তও পাঠায়।

বিছানায় স্থির হয়ে বসে মিনিটখানেক সে ভাবে। নিজেব ভিতবটা তার এত বেশি ধীব শাস্ত মনে হয় সে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো আযনায নিজেব মুখ দেখে প্রায় চমকে ওঠে।

গামছায় মুখ মুছে সে মৃদুস্বরে সাধনাকে ডাকে। সাধনা ঘরে এলে বলে, তোমার হারটা দাও।

কেন ?

আজ একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

তোমার কিছু করতে হবে না।

করতে হবে না ?

না যা করবার আমিই করব।

একটু যদি ভাববার সময় পেত সাধনা ! আচমকা ডেকে বিনা ভূমিকায় হারের কথা না তুলে তার প্রস্তাবের জবাব দেবার জন্য কয়েক মিনিট প্রস্তুত হবার সময় যদি রাখাল তাকে দিত ! এমন স্পষ্টভাবে সোজাসুজি রাখালকে বাতিল করে দেওয়ার বদলে এই সুযোগে সে নিশ্চয় রাখালকে জানিয়ে দিত যে হারের ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই অর্ধেকটা করে ফেলেছে।

রাখাল চলে যাবার পর সাধনা এই কথাই ভাবে আর আপশোশ করে। রাখাল নিজে থেকে নরম হয়ে তার কাছে হাব মানতে চাইল আর সে কিনা সংঘাতের জের টেনে আরও উগ্র, আরও কঠিন হয়ে উঠল !

রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবে, এই তো স্পষ্ট লক্ষণ বিকারের। হিসাব তার ভুল হয়নি, মাথা সাধনার বিগড়ে যেতে বসেছে। কঠিন রোগের চিকিৎসার মতোই এই কঠিন দারিদ্র্যের চাপ থেকে সাধনাকে একটু মুক্তি দেওয়া আজ একান্তভাবে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে দুর্দশা হয়তো তার

একদিন ঘুচবে, সাধনাকে সুখে রাখার ক্ষমতা হবে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হবে না তখন। আজকের বিকৃতিতে সারাজীবনের বিকারের বোঝা করে নিয়ে একটা অসহ্‌ বোঝার মতোই হয়ে থাকবে সাধনা।

হাতের কাগজে মোড়া পুঁটলিটার ওজন থেকে এতক্ষণে যেন বুকে বল পায় রাখাল। যাই সে করে থাক, সাধনাকে বাঁচাবার জন্য করেছে। জীবনের অনেকটাই এখনও বাকি তার উপায় কী !

পোদ্দারের দোকানে গয়নাকটা বিক্রি করে রাখাল একুশ শো সাতান্ন টাকা পায়। কত হাজার টাকার গয়নাই যে আছে বিশুর মার ! সমস্ত সোনার কত সামান্য একটু অংশ সে এনেছে। পোদ্দার কয়েক শো টাকা ঠকিয়েছে ধরে নিলেও তারই দাম পাওয়া গেছে দু-হাজারের বেশি।

তাকে আরও বেশি ঠকাবার সাধ ছিল পোদ্দারের।

বুকভরা লোম আর মুখভরা মেছেতার দাগ পোদ্দারটির। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করতে করতে সে যখন মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়, বলতে থাকে যে অনেক ভেজাল আর ময়লা মেশানো আছে গয়নাগুলির সোনার অঙ্গে, গিনির চেয়েও বিশ টাকার মতো কম হবে এ সোনার দর, ব্যাপারটা রাখাল বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে যে তার ভাবসাব দেখেই পোদ্দার অনুমান করে নিয়েছে পিছনে গোলমাল আছে তার এই গয়না বেচতে আসার।

এক মুহূর্তের জন্য অবসন্ন বোধ করে রাখাল।

এক মুহূর্তের জন্যই। এক মুহূর্তে সে যেন নিজের সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র মনে মনে আউড়ে নেয়। না, সে চোর নয়। সে চুরি করেনি।

এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

মুখ গম্ভীর করে কড়া সুরে সে বলে, তবে থাক, অন্য জায়গা দেখি। বিশ টাকা কম ! একী তামাশা পেয়েছ ? আমার ঘরের জিনিস, আমি জানি না সোনা কেমন ?

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, রেগে বলে, থাক না মশায়, অত ঘষবেন না। আমার বাড়িতে বিপদ, নষ্ট করবার সময় আমার নেই।

পোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সবিনয়ে বলে, বসেন না বাবু, বসেন। ভুল সবারই হয়। ওহে সুবল, তুমি একবার দ্যাখো দিকিন—

তারপর একেবারে বিশ টাকা নয়, গিনি সোনার বাজার দরের চেয়ে চার টাকা কম ধরা হয় তার সোনার দাম। এ-বাবদে ও-বাবদে অবশ্য আরও কিছু বাদ যায়।

তা যাক। গলা কাটার অধিকার নিয়ে সকলে সব ব্যাবসা করবে এটাই প্রথা, এটাই প্রকাশ্য স্বীকৃত নিয়ম। একেও গলা কাটতে না দিলে চলবে কেন।

বাড়ি ফেরবার পথে সেই দোকানে বসে ঘণ্টুর দেওয়া এক কাপ চা খায়। বুকের কাঁপুনি একটু সামলে নেবার জন্য খায়, বুকে তার এতটুকু কাঁপন ধরেনি। শক্ত পাথর হয়ে গেছে হৃদয়টা। বিবেকের দংশনে কাতর হবার বিলাসিতা কি পোষায় তার মতো লোকের ?

ভয় ? না এতটুকু ভয়ও তার নেই। ভয় পাবার কোনো প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। আবার কোনো বিশেষ উপলক্ষে গায়ে গয়না চাপাবার দরকার হলে তবেই হয়তো বিশুর মা টের পাবে তার গয়না কয়েকখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোনো কারণে আজকেই যদি টের পায়, যদি তাকে সন্দেহও করা হয়, কিছুই তার করতে পারবে না ওরা।

ঘরেই তাদের অনেক লোক, অনেক বাজে লোক। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে তাকে জোব করে সন্দেহ করার সাহস পর্যন্ত ওদের হবে না।

ও সব চিন্তা নয়। শান্ত হয়ে বসে একটু তার ভাবা দরকার টাকাগুলি কীভাবে ব্যবহার করবে।

সব টাকাই কি কাজে লাগাবে এই অসহ্য দারিদ্র্য সাধনার পক্ষে একটু সহনীয় করে আনতে, যত দিন পারা যায় অথবা খানিকটা এই কাজে লাগিয়ে বাকিটা লাগালে কোনো স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায় ?

সে চোর নয়। এ জগতে কারও কোনো ক্ষতি না করে একজনের একস্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগ আরও দু-একবার পাওয়া যাবে, এ চিন্তাটাই হাস্যকর। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সে নিরুপায় হয়ে পড়বে একান্তভাবেই।

খুব সাবধানে চারিদিক হিসাব করে সব কিছু বিচার করে এ টাকা কাজে লাগাতে হবে।

শুধু সাময়িকভাবে নয়, সাধনাকে বাঁচাবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও যাতে সম্ভব হয়।

টাকাগুলি রাখবে কোথায় ? বাড়িতেই রাখবে। না, তার কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই। টাকাগুলি ধরা পড়লে অবশ্য সত্যটা সেটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে যে সে-ই গয়না নিয়েছে, বিপদেও সে পড়বে। কিন্তু সে চোর নয়, এ বিপদকে ভয় করলে তার চলবে না। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রাখার ফন্দিফাকির আঁটতে গেলেই সে মনেপ্রাণে এবং কার্যত চোর হয়ে যাবে !

সে চোর নয়। সে চুরি করেনি। কেউ তার কিছু করবে না, করতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার একমাত্র অবলম্বন। ভয়ের তাড়নায়, বিপদের কল্পনায় আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে এই বিশ্বাসের গোড়া আলগা করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তার।

শেষ পর্যন্ত জগৎ যদি তাকে চোর বলে জানে, তাকে চোরের শাস্তি দেয়, এই বিশ্বাসের জোরেই মাথা উঁচু করে পরম অবজ্ঞার সঙ্গে সেই শাস্তি সে গ্রহণ করতে পারবে।

ঘন্টু বলে, একটা চপ খাবেন বাবু ? কাটলেট ?

একুশ শো সাতান্ন টাকা সাড়ে এগারো আনা পয়সা সঙ্গে আছে, তবু রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না কিছু খাব না।

চপ কাটলেট খাবার পয়সা কোথায় ? তার নিজের সাড়ে এগারো আনা থেকে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে, চপ কাটলেট খেলে তার চলবে কেন ?

তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ টাকা সে জন্য নয়।

বাড়ি ফিরতেই সামনে পড়ে সঞ্জীব।

এই নিরীহ গোবেচারি মানুষটা বাড়িতে তাকে এড়িয়ে চলে বলে কিছু মনে করে না রাখাল। কেন এড়িয়ে চলে জেনে বরং তার একটু অনুকম্পা মেশানো করুণাই জাগে। আশার ভয়ে সে বাড়িতে তার সঙ্গে মেশে না, সে জন্য মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বলে রাস্তায় বা দোকানে দেখা হলে যেচে নানাকথা আলাপ করে !

আপিস যাননি ?

মুখ কাঁচুমাচু করে সঞ্জীব বলে, না, আজকে যাইনি, শরীরটা ভালো নেই—

মল্লার মতো একটু সে হাসবার চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে ঠিক চোরের মতোই এদিক ওদিক চেয়ে ঘরে চলে যায়।

বোধ হয় নিষিদ্ধ মানুষ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য !

আশাকে তার এই পিটানি খাওয়া শিশুর মতো ভয় করে চলা উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া মনে হয়। মনে হয় এ বুঝি শুধু নিরীহ মানুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন নয়, আরও কী আছে এর পিছনে, আশার কাছে সে বোধ হয় গুরুতর কোনো অপরাধে অপরাধী !

ঘরে গিয়ে কাগজে মোড়া নোটের বান্ডিলটা তার স্যুটকেসে কাপড়ের তলায় রেখে রাখাল সাধনার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসে। তাকে বুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, বাইরে গোলমাল শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় !

এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মনকে শক্ত করে দৃঢ়পদে যে বাইরে আসে।

না, তার খোঁজে তার কাছে কেউ আসেনি।

আদালত থেকে লোক এসেছে ডিগ্রি জারি করে সঞ্জীবের অস্থাবর মালপত্র ক্রোক করতে।

আদালতের লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবি গায়ে মোটাসোটা মাঝবয়সি যে লোকটি এসেছিল, সে সঞ্জীবকে বলে, বেশ লোক তো তুমি, বাঃ ! হাতে পায়ে ধরে এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে লুকিয়ে আছ ? সেই থেকে আমরা গাছতলায় ঠায় বসে আছি তোমার জন্য !

সঞ্জীব কথা কয় না।

লোকটি আবার বলে, ভেবেছিলে আমরা মতলব বুঝিনি তোমার ? এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে ? গাছতলায় বসে নজর রাখব ভাবতে পারনি, না ?

মাঝে মাঝে সকালের দিকে লোকটিকে আসতে দেখা গেছে সঞ্জীবের কাছে। এসে কড়া নাড়তেই সঞ্জীব তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যেত। আজ বোঝা যায়, সে আসত পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিতে !

রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা হাঁ করে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে ছিল, সঞ্জীব হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলতে সে ছুটে আসে।

কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? এ সব কী ব্যাপার ?

রাখাল এগিয়ে এসে সোজাসুজি ধমক দেয় সঞ্জীবকে, বলে, কাঁদছেন কেন কচিছেলের মতো ? ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দুজনে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন, পরামর্শ করুন।

অন্য অবস্থায় তার স্বামীকে রাখাল এ ভাবে ধমকালে আশা বোধ হয় তার গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিত ! আজ সে নীরবে তার কথাই মেনে নেয়।

সোজা ঘরে চলে যায়। গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে তার হালকা খাটের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়। সঞ্জীবও ঘরে যায় ধীরে ধীরে।

রাখাল বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় !

পাওনাদার লোকটিকে বলে, দশ মিনিট সময় দিন বেচারাদের। বুঝতে পারছেন তো, ভদ্রলোক বাড়িতে কিছু জানাননি ? এবার হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সাধনা এসে দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এইমাত্র আকাশ থেকে তার অজানা অচেনা এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।

আশাদের ঘরের ভিতর থেকে প্রথমে কোনো কথাই শোনা যায় না বাইরে। একটু পরেই গলা চড়ে যায় আশার। তার প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসে।

আমায় না জানিয়ে তুমি এত টাকা দেনা করেছ ! দেনা করে রেডিয়ো কিনেছ, কাপড় গয়না কিনেছ আমার জন্য ! এ দুর্বুদ্ধি কে দিল তোমাকে ?

কী করব ? মাইনেতে কুলোয় না—

সে কথা বলতে পারতে না আমায় ?

বলিনি ? কতবার বলেছি, টাকায় কুলোচ্ছে না, খরচা না কমালে চলবে না—

ওভাবে তো সবাই বলে। এদিকে বলছ খরচ কুলোয় না, ওদিকে শখ করে রেডিয়ো কিনে আনছ। কী করে আমি বুঝব তোমাব সত্যি কুলোয় না ?

আমি—

চুপ কবো। চুপ কবো তুমি। এখন কী উপায় কবা যায ভাবতে দাও আমায !

তার রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ বাব হয়। সাধনা তাড়াতাড়ি গিয়ে কড়াইটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে আসে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপব অন্ধকাব থমথমে মুখ নিয়ে আশা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাড়ার যে দু-চারজন লোক ব্যাপার জানতে এসেছিল এবং এতক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তাদেব দিকে একবার চেয়ে রাখালকে সে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি দোকান আছে রাখালবাবু, গয়না কেনে ?

বাজারের দিকে আছে।

আপনি একটু সঙ্গে যাবেন ওনার ? আমাব কটা গয়না বেচে টাকা নিয়ে আসবেন ?

রাখাল বলে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নেই আপনাদেব ?

সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, মৃদুস্বরে সে বলে, আছে, টাকা নেই।

রাখাল বলে, আমি বলি কী, গয়না না বেচে ব্যাংকে জমা দিযে লোনের ব্যবস্থা করুন। গয়না বেচলেই লোকসান।

আশা দাবুণ হতাশার সুরে বলে, ব্যাংক থেকে টাকা তো পাব কম ? ইনি যে আবও কয়েক জায়গায় দেনা করে বসেছেন। একবার বেচে না দিলে কি সব শোধ করা যাবে ?

তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা কবে নেবেন। একবারে কিছু দিয়ে তারপর মাসে মাসে কিছু কিছু শোধ দেবেন।

আশা নিশ্বাস ফেলে বলে, তাই ভালো। আপনি একটু সঙ্গে যাবেন তো ? ওঁকে দিয়ে আমার ভরসা হয না।

আশা অনাযাসে এ কথা বলে এবং কথাটা কাবও কানে বাজে না,—সাধনারও নয় ! কে না জানে যে আশার ভযেই সঞ্জীব বাখালকে বাড়িতে এড়িযে চলে কিন্তু মানুষকে এড়িয়ে চলার মতো শক্ত নয় বলে পথেঘাটে দোকানে দেখা হলে বাখালেব সঙ্গেই সে গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে। সেই আশা এখন বুদ্ধি পরামর্শ চাইছে রাখালেব কাছে, ঘোষণা কবেছে যে রাখাল ছাড়া সঞ্জীবকে দিয়ে তার ভরসা নেই ! এ সব কথা মনে পড়ে কিন্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন সে বিপদে পড়েছে, এখন তো বিচারের সময নয় আশার।

আশার এই আকস্মিক বিপদ সামলে দেবাব দায়িত্ব রাখাল আগেই নিয়েছে—যখন সে সঞ্জীবকে ধমক দিয়ে আশার সঙ্গে ঘরের মধ্যে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছিল।

সে ছাড়া কার ভরসা করবে আশা ?

সঞ্জীব পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কথা বলে পাওনাদার লোকটির সঙ্গে। গায়ের গয়না বাক্সের গয়না পুঁটলি করে এনে আশা হাতে তুলে দেয় রাখালের !

হাঙ্গামা সেরে রাখাল ফেরামাত্র ঘরে গিয়ে সাধনা বলে, এটা কী রকম ব্যাপার হল ? এমন ছেলেমানুষ ভদ্রলোক ?

ছেলেমানুষ, তবে খুব বেশি আর কী এমন ছেলেমানুষ ? শখের জন্য খেয়ালের জন্য যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয় না লোকে ? এ তো শুধু স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য কিছু দেনা করেছে। ভেবেছিল সামলে নেবে, জের টেনে চলতে চলতে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

সব গোপন রেখেছিল স্ত্রীর কাছে !

গোপন না রাখলে কি খুশি রাখা যেত স্ত্রীকে ? স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশি হয় ? এতটা গড়াবে এটা তো ভাবেনি সঞ্জীব। তারপব বেকায়দায় পড়ে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা করতে করতে একটু দিশাহারা হয়ে গেছে। নইলে মাল ক্রোক করতে এসেছে, গাছতলায় তাদের বসিয়ে রেখে এসেও মুখ ফুটে স্ত্রীকে বলতে পারে না ব্যাপারটা, চুপ করে বসে থাকে ?

তাই বটে। পুরুষ মানুষ কীভাবে কেঁদে ফেলল !

পুরুষ মানুষের কি কাঁদা বারণ ?—রাখাল হাসে, বলে, মাঝে মাঝে আমিও ভাবতাম, চাকরির পয়সায় মানুষটা এমন চাল বজায় রেখেছে কী করে ! আজকালকার দিনে দেড়শো দুশো টাকায় দুটি মানুষেরও ভালোমতো খাওয়া পরা থাকা চলে না।

রাখালের ভাবান্তর লক্ষ করছিল সাধনা, লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়নি তাদের, কোনো কথাই হয়নি। এমন সহজভাবে রাখাল কথা বলছে, হাসছে, যেন তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ বা বিভেদ কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই।

আশাদের এই খাপছাড়া ব্যাপারটা ঘটায় রাখাল কি এখনকাব মতো একেবারে ভুলে গেছে সব ?

সে নিজেও যে সহজভাবেই কথা বলছে রাখালের সঙ্গে এটা খেয়াল হয় না সাধনাব।

খেয়ে উঠে রাখাল বলে, কই তোমার হারটা দাও।

সাধনা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে।

তামাশা করছ না তো ? এত কাণ্ডের পর তুমি যেচে—

এত কাণ্ডের পর মানে ? আমি কি কখনও বলেছি তোমার ভাঙা হাবটা বদলে দেব না ?

মুখে না বললেও—

তুমি তাই ভেবে নিয়েছ ?

সাধনা একটু চুপ করে থেকে বলে, হাব আমি বেচে দিয়েছি।

কীভাবে কার কাছে বেচে দিয়েছে তাও সে খুলে বলে। একটু বেপরোয়া বেশ করেছির ভঙ্গিতেই বলে।

আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ?

কেন করব ? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হারের কোনো ব্যবস্থা করবে না—

কবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ?

নইলে চেয়ে তো নিতে হারটা ?

তাই তো চাইলাম আজ। আজ আমার সময় আছে, সুবিধা আছে।

সাধনা ঠোঁট কামড়ায়। এই কী মানে তবে হঠাৎ তার সঙ্গে রাখালের সহজভাবে হাসিমুখে কথা বলার ? সমস্ত মনোমালিন্যের সমস্ত ভুল বোঝার দায়িত্ব সে তার ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় ?

রাখাল বলে, যাকগে। টাকাটা আছে তো ? না খরচ করে ফেলেছ ?

টাকা আছে। আমি ভাবছিলাম নিজে গিয়ে কিনে আনব।

সে তো আমার ওপর রাগ করে ভাবছিলে।

রাগ হবার কারণ থাকলেই মানুষ রাগ করে।

রাখাল এ কথা এড়িয়ে গিয়ে বলে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করে আনলে কিন্তু মন্দ হয় না।

সাধনা বলে, যেমন হোক, তুমি আনলেই হবে। মিছিমিছি দুজনের ট্রামবাসের পয়সা খরচ।

রাখাল আশ্চর্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে দোকানে গয়না কিনতে গেলে মিছামিছি একজনের ট্রামবাসের পয়সা বেশি লাগবে, এই হিসাব করছে সাধনা !

সাধনা তাকে টাকা বার করে দেয়। বলে, বলে দিচ্ছি শোনো। ওটা ছিল তিনভরি সাত আনি—যেমন প্যাটার্ন হোক তুমি আড়াই ভরির মতো আনবে। বাকি টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবে।

কী করবে টাকা দিয়ে ?

বিপদ-আপদের জন্য তুলে রাখব !

রাখাল বেরিয়ে যাবার পর বহুদিন পরে আশা আজ তার ঘরে আসে !

তাকে দেখে বোঝা যায় না এইমাত্র তার গয়নাগুলি সে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়েছে। গায়ে তার সামান্য গয়নাই থাকত, গা থেকে তাও সে খুলে দিয়েছে।

আশার দুঃখ হয়েছে না রাগ হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। আচমকা সে যেন পড়ে গেছে এক বিষম ধাঁধায়। ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝে উঠতে পারছে না।

বসে হঠাৎ ঘুম ভাঙা মানুষের মতো মুখ করে বলে, এমন অদ্ভুত মানুষও দেখেছ ভাই ?

তোমাকে যেমন ভালোবাসেন তেমনি ভয় করেন কিনা।

বাব্বা, জন্মে জন্মে আমার এমন ভালোবাসায় কাজ নেই ! ভালোবাসার চোটে আমার গয়নাগুলি যেতে বসেছে।

একটু থেমে আশা বলে, তোমাদের দেখে মনে হত, বাঃ, আমি তো বেশ সুখেই আছি ! বাস্‌রে, এই নাকি সেই সুখ ! চাদ্দিকে দেনা করে করে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। রেডিয়ো ফেডিয়ো সব বেচে দিয়ে একেবারে আদ্দেক করে ফেলতে হবে খরচ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার। প্রথম থেকে বললেই হত চাল কমিয়ে দিতে হবে। গরিব মানুষ, গরিবের মতোই থাকতাম !

সাধনার গলার দিকে চেয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে আশা জিজ্ঞাসা করে, গলারটাও বেচতে হয়েছে নাকি ?

না। ভেঙে গেছে, বদলাতে দিয়েছি।

বলে সে হাসে।

বেচতে হয়তো হবে দুদিন বাদে !

রাখালের এনে দেওয়া নতুন হার পরে সাধনা রেবার বিয়েতে যাবে। যাবে কী যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না ? আবার ভাবে, কী লাভ হবে গিয়ে ?

রাখাল বলেছে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হবার কথা। তাকে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সে নিজের কাজে যাবে, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবে বিয়ে বাড়িতে।

রেবাকে কানপাশা দিতে হবে না সাধনার। কোথা থেকে নাকি কিছু বাড়তি টাকা পাবে রাখাল, রেবার জন্য একটা দুল সে কিনে নিয়ে যাবে।

বাসন্তীকে নতুন হারটা একবার দেখানো উচিত ভেবে সাধনা সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বদলে গলায় লটকে দেয়। ও বাড়িতে গিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না সাধনার। গায়ে তার গয়নার চিহ্নও যেন নেই। এত গয়না সে সর্বদা গায়ে চাপিয়ে রাখত যে গলার একটা হার আর হাতে শুধু দুগাছা করে চুড়ি থাকায় তাকে যেন উলঙ্গিনি মনে হচ্ছে।

সাধনা বলে, এ কী ব্যাপার ?

বাসন্তী বলে, আর বলো কেন ভাই। আমার যথাসর্বস্ব গেছে।

চুরি হয়ে গেছে ? কখন চুরি গেল ?

চুরি নয়। ওনার সেই যে বজ্জাত পার্টনারটা মিথ্যে চাকরির খবর জানিয়ে তোমাদের কাছে আমার গালে চুনকালি মাখিয়েছে, সেই ব্যাটার কাজ। ফন্দি করে ওনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে বসেছিল।

সাধনা বলে, কিন্তু তোমার গয়না—?

বাসন্তী বলে, ওনাকে বাঁচাবার জন্য সব দিতে হয়েছে। শুধু গয়না নয় ভাই, পয়সাকড়ি সোনা-টোনা যা জমিয়েছিলাম, সব ঢেলে দিতে হয়েছে। কী কবি, গয়না গেলে পয়সা গেলে আবার আসবে, সোয়ামি গেলে আর তো পাব না!

নিজের হারের কথা না তুলেই সাধনা ঘরে ফেরে।

রাখাল বলে, ট্যাক্সি আনব ?

সাধনা বলে, না, ট্যাক্সি লাগবে না।

কেন ?

আমরা ও বিয়েতে যাব না। বেলা পড়ে এলে তুমি আমি দুজনে ভোলার মার মেযেব বিয়ে দেখতে যাব।

হারটার জন্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। নতুন হার বাক্সে তুলে রেখে সাধনা গলাটা আবাব খালি করে ফেলে।

সোনার চেয়ে দামি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখকের কথা

পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মতো তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দামি কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড়ো হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাকনাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপস'।

আপস

১

সোনা ওজনে খুব ভারী।

সোনা নামক ধাতুর এই বিশেস গুণের খবর কলেজে পড়বার সময়েই রাখাল জেনেছিল। জেনেছিল বই পড়ে। সোনার চেয়ে ভারী সোনার চেয়ে দামি ধাতু আছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। যেমন এটম বোমা তৈরির ধাতু আবিষ্কার করতে হয়েছে বিজ্ঞানকেই এগিয়ে গিয়ে। বিজ্ঞান শুধু নতুন খোঁজে—নতুন পথ, নতুন বিকাশ, বস্তু ও জীবনেব নতুন নাম।

দামের হিসাবে সোনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান।

কিন্তু তবু সোনার চেয়ে দামি হতে পারেনি সেই ধাতু যে ধাতু দিয়ে মানুষ আজকাল এটম বোমা বানায়।

এখনও সোনাই মানুষের সবচেয়ে জানাচেনা আপন পদার্থ, সোনাকেই মানুষ আরও বেশি বেশি আপন করতে চায়, সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে ব্যাকুল হয়ে থাকে চিন্তাভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষা।

সোনার রঙেই সবচেয়ে রঙিন হয় জীবন !

কী ওজনে আর কী দামে সোনার সাথে পাল্লা দিতে পারে যে অসাধাবণ ধাতু, সে ধাতুর সঙ্গে পরিচয় নেই সাধারণ মানুষের।

প্রয়োজনও নেই। সোনাই মানুষের। আদরেব সোনামানিক।

জানা কথাটা রাখালেব অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়েছিল সেদিন, বিশুকে পড়াতে গিয়ে ঘর খালি পেয়ে বিশুব মার একরাশি গয়নাব সামান্য একটা অংশ যেদিন না বলে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। গয়না কটাব ওজন তাকে আশ্চর্য কবে দিয়েছিল।

রাখাল জেনেছে, সোনার আরেকটা ওজন আছে।

অন্য রকম ওজন।

অবস্থার ফেরে সোনা যখন চাপ দেবার সুযোগ পায় মানুষের বিবেকে, তখন বিবেকে চাপানো সেই সোনার চেয়ে ভারী আর কিছুই থাকে না এ জগতে।

ফাঁক পেলেই সোনা বিবেকে চেপে বসে।

যুক্তি অযুক্তি কিছুই খাটে না, মনের জোরে তুচ্ছ করা যায় না, বেপরোয়া বেশ করেছি মনোভাব দিয়ে দেওয়া যায় না উড়িয়ে।

না বলে একজনের গয়না ধার হিসাবে নিলেও বিবেককে সে গয়না কামড়াবেই কামড়াবে। চোর হয়ে চুরি করলেই বরং এত বেশি কামড়ায় না। চোর ছ্যাচোরের কাছে সোনার চেয়ে দামি কিছুই নেই !

বড়ো বড়ো রাজা মন্ত্রী চোরের বিবেকে একেবারেই কামড়ায় না। প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে কামড়ায় না। বিশেষভাবে চুরি করার বিশেষত্বকে দেশসেবায় নীতি হিসাবে প্রচার করার প্রচণ্ড নেশায় মশগুল হয়ে থাকে।

জেনে বুঝে চোর হলে তো ফুরিয়েই গেল বিবেকের বালাই, বিবেক বিসর্জন দিয়ে চুরি করলাম। চোর আমি হব না কিছুতেই—এ সংস্কারকেও খাতির করব, আবার চোর যা করে ঠিক সেই কাজটাই করব কতগুলি যুক্তি খাড়া করে, এতে কী আর রেহাই মেলে।

নিজেকে রাখাল চোর ভাবে। তবু বিবেক কামড়ায়।

কারণ নিজের কাছে সে অস্বীকার করে না যে নিজের হিসাব তার যাই হোক, দশজনের হিসাবে সে চোর ছাড়া কিছুই নয় !

দশজনের হিসাবে চোর হলেও নিজের হিসাবে চোর নয় ! এ কি নীতি ভাঙবার জন্য নৈতিক সমর্থন সৃষ্টির সেই চির পুরাতন ধাপ্পাবাজি নয় ? বড়ো বড়ো অনেক নীতিজ্ঞ মহাপুরুষ যে নৈতিক ধাপ্পাবাজির জোরে মানুষের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা চুরি করে ? ধরতে গেলে আসলে যাদের কল্যাণে রাখালকে নিরুপায় হয়ে উদ্‌বাস্তু এক জমিদারের বউয়ের সেকেলে ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো স্নেহে তাকে আপন করার সুযোগ নিয়ে তারই অনেক গয়নার ক্ষুদ্র অংশ গয়না কটা না বলে নিতে হয়েছে ?

এ সব জানে রাখাল।

এ সব প্যাঁচ কষে, এ সব ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে পারলে তো কথাই ছিল না। তার কাজ করার এবং উপার্জনের অধিকার অন্যে চুরি করেছে বলেই তার চুরিটা চুরি নয়, এটা শুধু হাস্যকর অজুহাত কেন, নৈতিক যুক্তিই নয় রাখালের কাছে। যে স্বার্থ চুরি-চামারিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়েছে শতগুণ সেটাই যে আবার সংগ্রামেব পথে সাধাবণ মানুযের বীব মানুষ হওয়ার রেট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ দিকটা ভুললে চলবে কেন তার ?

ছাঁটাই হয়ে বেকার হয়ে বছর দেড়েক সেও কি অংশ নেয়নি এই বাঁচার সংগ্রামে ?

অন্যায়কে নিজের অন্যায়ের কৈফিয়ত দাঁড় করাবার ফাঁকি রাখাল জানে।

কোনো নৈতিক সমর্থনই সে সৃষ্টি করেনি নিজের কাজের। সমস্ত কাহিনি শুনে কেউ যদি তাকে চোর বলে, সে প্রতিবাদ করতে যাবে না। এইটাই তার দশজনের হিসাবে নিজেকে চোর মনে করার মানে।

তার নিজের হিসাবের মানেটা খুব সোজা। বিশুর মার গয়না সে চুরি কবেনি, শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে নিয়েছে। ঋণ হিসাবে নিয়েছে।

প্রচুর গয়না আছে বিশুর মার। একেবাবে অকেজো অনাবশ্যক মাটির ঢেলার মতোই রাশিকৃত সোনা তোরঙ্গে পড়ে আছে। এই সামান্য ক-খানা গয়নার অভাব টেরও পাবে না বিশুর মা।

না জানিয়ে চুপিচুপি নিয়েছে। কিন্তু আর কী উপায় ছিল ? বলে কয়ে নিতে চাইলে এ জগতে কে তাকে দিচ্ছে ঋণ ? কে স্বীকার করছে যে বেকার নিরুপায় তারও যোগ্যতা আছে দাবি আছে ঋণ পাবার ?

সরকারের পর্যন্ত ঋণ দরকার হয়, সকলের ধন কেড়ে নিয়ে যে ক-জন হয়েছে কুবেরের মতো ধনী, তাদের বশংবদ যে সরকার। সরকার কোটি টাকা ঋণ চাইলে কয়েক ঘণ্টায় সে টাকা উঠে যায়। ঋণ দিতে উৎসুক অনেকের টাকা বাতিল করতে হয়।

তাকে কে ঋণ দিচ্ছে পাঁচটা টাকা ?

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রাশি রাশি সোনা অকেজো করে যদি ফেলে রাখতে পারে মানুষ, সেও তার চরম প্রয়োজনের সময় না বলে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ধার নিতে পারে।

সাধনা যখন ভেঙে পড়েছে, সেই সঙ্গে ভেঙে চুরমার করে দেবার উপক্রম করেছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন, আর কোনো উপায় না থাকলে এভাবে ঋণগ্রহণের অধিকার তার নিশ্চয় জন্মায়।

সাধারণ সুখের লোভে, সাধারণ অভাব অনটনের হাত থেকে রেহাই পেতে সে বিশুর মার গয়নাগুলি নেয়নি। এদিক দিয়ে সে খাঁটি থেকেছে নিজের কাছে। গয়না ক-টা বেচে দুহাজারেরও বেশি টাকা পকেটে নিয়ে খিদেয় যখন ঝিমঝিম করছিল জগৎ তখনও সে প্রশ্রয় দেয়নি একটি চপ খাবার ইচ্ছাকে। ওই দুহাজার টাকা নয়, পকেটে হাত দিয়ে হিসাব করেছিল নিজের এগারো আনা পয়সার !

সাধনাই ছিল তার সবার সেরা যুক্তি।

আকস্মিক বেকারির অসহ্য চাপে সাধনার সাময়িক উন্মত্ততা সামলাতে হবেই, যেভাবে হোক ঠেকাতে হবেই তার নিজেকে ধ্বংস করার সঙ্গে স্বামীপুত্র সংসারটাও ধ্বংস করে দেওয়া। বিশুর মার গয়না নেওয়া উচিত কী অনুচিত সে বিবেচনার সুযোগ পাবে অনেক, সাধনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে সারা জীবনটাই তাদের যাবে ভেস্তে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার এই হিসাবটাই সাধনা দিয়েছে ভেস্তে।

সাধনা এক রকম তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অতটা বিগড়ে সে যায়নি, এত বেশি অসহ্য তার হয়নি স্বামীর বেকারত্বের দুর্দশা যে আত্মহারা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভেঙে পড়বে। তার জন্য বিশুর মার গয়না নেবার কোনোই দরকার ছিল না রাখালের !

শুধু তাই নয়।

যেদিক দিয়ে যেভাবে তার উচিত ছিল অবস্থাটা সহনীয় করতে সাধনাকে সাহায্য করা, সেদিক দিয়ে সেভাবে কোনো সাহায্যই সে করেনি তাকে। তাকে নরম জেনে দুর্বল জেনে তেমনি রেখে দিতে চেয়েছে। চরম দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এতটুকু ভাগাভাগি করতে চায়নি বাঁচার ও বাঁচাবার দায়িত্ব, স্বামীত্বের অহংকারে আগের মতোই সাধনাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে জীবনসংগ্রামের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে। একাই সে দিবারাত্রি ভেবেছে কীসে কী হবে আর কীভাবে কী করা যাবে, অথচ বিশেষ কিছু করতে না পেরেও দাবি ঠিক খাড়া রেখেছে যে যতটুকু সে করতে পারে তাই মানতে হবে সাধনাকে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শান্তভাবে সমস্ত নতুন দুঃখকষ্ট সয়ে যেতে হবে।

সেই একমাত্র রক্ষাকর্তা সাধনার। তাকে রক্ষা করার জন্য যে অমানুষিক চেষ্টা আর পরিশ্রম সে করে চলেছে তাতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সাধনার।

আর কিছুই তার করার দরকার নেই। কৃতজ্ঞ থাকবে আর নীরবে অবিচলিতভাবে সব সয়ে যাবে। তার না জানলেও চলবে সমস্যাটা কী এবং তার ভারটা লাঘব করতে কিছু না করলেও চলবে।

সাধনারও যে প্রয়োজন আছে নতুন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করা, এটা সে খেয়ালও করেনি !

এই ঘরের কোণে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপন করতে করতে আশেপাশের জীবনের বাস্তবতা থেকে সাধনা নিজেই ধরতে পেরেছে এবার তারও একটু বদলানো দরকার, শুধু আগের দিনের শোকে কাতর হয়ে থাকলে চলবে না। নিজের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই সাধনা হতাশাকে ঠেকিয়েছে, খানিকটা বদলে দিয়েছে নিজেকে।

সে তাই কৃতজ্ঞতা পায়নি সাধনার। তাকে শুধু ক্ষমা করে মেনে নিয়েছে।

বিশুর মার গয়না বেচা টাকা রোজগারের উপায়ে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে অবস্থার খানিকটা উন্নতি করেও সে সাধনার কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না। সে তাকে শেখায়নি মিলেমিশে চরম দুর্গতিকে গ্রহণ করার প্রয়োজন, তাদের সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সচেতনভাবে জবরদস্ত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন।

অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধনাকে এটা বুঝতে হয়েছিল—একা একা।

সে শুধু আপস করেছিল। রাখালের সঙ্গে নয়, বাস্তবতার সঙ্গে।

রাখাল কীভাবে প্রাণপাত করে নিজের বিবেককে পর্যন্ত বাঁধা রেখে সর্বনাশের মোড় ঘুরিয়েছে, দুরবস্থাকে আয়ত্ত করেছে, সে জন্য মাথাব্যথা নেই সাধনার।

কর্তব্য করছে বাখাল। যা সে নিজেই করতে চায়, একলা করতে চায়, যা করে সে স্বামী হয়ে থাকতে চায় সাধনার, সেটুকু শুধু করছে রাখাল !

আগে আপিসে চাকরি করে করত। এখন অন্যভাবে সেই কাজ করছে।

তার বিবেক বাঁধা রাখাব আসল ব্যাপারটা অবশ্য সাধনা জানে না। তাকে সে জানায়নি। বিশুব মার গয়নার কথা খুলে জানিয়ে অনর্থক তার মনের শান্তি নষ্ট করার কোনো মানেই রাখাল খুঁজে পায় না।

হঠাৎ এতগুলি টাকা সে কোথায় পেল তার কৈফিয়ত হিসাবে জানিয়েছে যে হীনতা স্বীকার করে চেনা একজন ধনীর কাছে টাকাটা সে ঋণ নিয়েছে, শোধ দিতে না পারলে দায়ে ঠেকবে।

নিজের কাছে দায়ে ঠেকবে, নিজের বিবেকের কাছে !

দেখো, যেন বিপদে পড়ো না !

আজও রাত নটা-দশটায় ফিরতে হয়। তবে বাসেই ফিবতে পাবে। পুরো প্যাকেট সিগাবেট পকেটে নিয়ে।

খাওয়ার আগে বিশ্রামের ছলেও একটা সিগারেট টানা যায়। বিয়েতে পাওয়া খাটেব বিছানায় পা তুলে বসে সিগারেটে টান দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে রাখাল বলে, উঃ, কী ভীষণ দিনগুলিই গেল !

সাধনা যন্ত্রের মতো সায় দিয়ে বলে, সত্যি।

তুমি পেট ভরে ভাত পেতে না, একফোঁটা দুধ পর্যন্ত পেতে না !

সত্যি। দুধ খেতে আমার ঘেন্না করে।

খোকনকে তিনপোয়া দুধ খাওয়াও তো ?

কী করে খাওয়াব ? পেট ছেড়েছে যে। আজ সারাদিন শুধু বার্লি খাইয়েছি।

এমন কিছু বড়োলোক হয়ে যায়নি রাখাল। একটু সামলে উঠতে পেরেই দু-একটা দিকে বাড়াবাড়ি করার তার ঝোঁক চেপেছে। ছেলেটা মোটে একপোয়া দুধ খেত আর টেনে টেনে টনটনিয়ে দিত সাধনার মাই, তাই সে একজন বাঙালি গোয়ালিনি আর একজন পশ্চিমা গোয়ালার কাছে দুধ রোজ করেছে দুসের।

নামেই অবশ্য দুসের দুধ। খাঁটি দুধেব জলীয় সংস্করণ। মানবী মা হোক আর গোমাতাই হোক কারও দুধ জমাট বস্তু নয়। খাঁটি দুধও জলের দ্বারাই তরল হয়ে থাকে। কিন্তু রাখাল যে দুসের দুধ রোজ করেছে তার মধ্যে সেরখানেক বাড়তি জল।

কল আর পুকুরের জল।

শুধুই কি কলের জল আব পুকুবের জল ?

দেশসেবা, ত্যাগ আর গণতন্ত্রের নামে সর্বাঙ্গীণ চোরামির যুগে দুধ-বেচুনেরাও কি আয়ত্ত করবে না সামনে দাঁড়িয়ে গোরুব বাঁট থেকে জলহীন বালতিতে দুধ ঝরে পড়াটা শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে যে দুধ কিনবে তাকেও ঠকাতে ?

গোমাতার মুখের খাদ্য কন্ট্রোল করে বাঁট থেকে ঝরা খাঁটি দুধকে কলের বা পুকুরের (কখনও নর্দমার) জল মেশানো দুধের মতোই পরিমাণে বাড়তি তরল করার কৌশল তারা জানে।

রাখাল তাই বলে, কেন মিছে মাথা গরম করছ ? একটাকা সের চাল যে হিসাবে কিনি, জল মেশানো দুধও কিনি সেই হিসাবে। চোরাবাজারি চালের দাম দুধের দাম অনুপাতে ঠিক আছে।

মানেটা এই যে চাল আছে কন্ট্রোলে তাই তার চোরাবাজার। দুধ কন্ট্রোলে নেই তাই তাতে ভাঁওতা।

ভগীরথের গঙ্গা আনার মতো সে যেন দুধের বন্যা এনে দেবে না খেয়ে শুকিয়ে আমসি-বনা তার বউ আর ছেলের পেটে।

রাখাল চিন্তিত হয়ে বলে, খোকনের দুধ হজম হয় না ? তোমার দুধ খেতে ঘেন্না হয় ? কে জানে বাবা এ সব কী ব্যাপার !

খেতে বসে আশা করে, সাধনা মাছের কথা তুলবে। নিজে থেকে ভালো মাছ এনেছে, বেশি করে এনেছে—দুজন মানুষের জন্য তিনপোয়া মাছ। কিন্তু সাধনা সাধারণ কথাই বলে, মাছ সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করে না।

একদিন মাছের কড়াই উনানে উলটে দিয়েছিলে, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ? ভাপ লেগে সারাদিন মুখটা জ্বালা করেছিল। যেমন বোকার মতো রেগেছিলাম, তার শাস্তি।

সাধনা হাসে, সহজ শান্তভাবে। জিজ্ঞাসাও করে মাছটা রান্না কেমন হয়েছে, আরেক টুকরো খাবে নাকি রাখাল ? কিন্তু মাছ ভালোবাসে বলে তার জন্য বেশি করে মাছ আনায় সে বিশেষভাবে খুশি হয়েছে কিনা টেরও পাওয়া যায় না।

একটু অন্যমনা উদাসীন ভাব সাধনার। বছরখানেক দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তেও তার যে প্রাণশক্তি, ছোটো সংসারটি নিয়ে মেতে থাকাব যে আবেগ উদ্দীপনা বজায় ছিল, একটু স্বচ্ছলতা ফিরে আসতেই যেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তার আনন্দ ছিল যেমন উচ্ছ্বল, রাগ অভিমানও ছিল তেমনি প্রচণ্ড।

খুশির কারণ ঘটলে আগের মতো ডগমগ হয়ে না উঠুক, তেজের সঙ্গে একবার যদি সে রাগও করত !

কোমর বেঁধে প্রাণ খুলে একবার ঝগড়া করত রাখালের সঙ্গে !

সম্পর্ক তাদের বজায় আছে আগের মতোই, আগের মতোই তার বউ হয়ে আছে সাধনা, মা হয়ে আছে তার ছেলের, সংসার করছে—কিন্তু কেমন একটু শান্ত সংযতভাবে, একটু আবেগহীনভাবে।

আগের মতো সাধনা আর নেই।

আজকাল সে খুব পাড়া বেড়ায়।

উদ্‌বাস্তু কলোনিটাতে রোজই একবার ঘুরে আসে। সাধনার কাছ থেকেই রাখাল শুনতে পায় এই সংকীর্ণ এলাকার বাইরের জগৎটুকুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার নানা বিবরণ।

রাখালের মনে হয়, সাধনা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে পাড়ার ঘরে ঘরে আর উদ্‌বাস্তুদের ওই ছোটো বসতিটুকুতে।

আগেও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর রাখত আশেপাশের ঘরে ঘরে কী ঘটছে না ঘটছে। তিন-চারটি বাড়ির সাত-আটটি পরিবারের জীবনযাত্রা তার প্রায় নখদর্পণে ছিল, কার ঘরে কী রান্না হয়েছে আর কার একটু সর্দি হয়েছে সে খবর থেকে কার দূর দেশের আত্মীয়স্বজন কী বিষয়ে চিঠি লিখেছে সে খবর পর্যন্ত। কেবল সাধনা বলে নয়, সব বাড়ির মেয়েরাই এ রকম খবরাখবর রেখে থাকে। শহরতলি পাড়ায় এটা আজও বজায় আছে, মেয়েদের মৌখিক গেজেটে প্রত্যেক পরিবারের খবরাখবর অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের জানাজানি হয়।

সাধনা হয়তো ন-মাসে ছ-মাসে কদাচিৎ পাঁচ-দশমিনিটের জন্য যায় মল্লিকদের বাড়ি, কিন্তু বীরেন দত্তের বউটির সঙ্গে তার খুব ভাব।

তার নাম প্রতিভা।

প্রতিভার আবার গলায় গলায় ভাব মল্লিকদের বাড়ির শোভার সঙ্গে।

প্রতিভার কাছে সাধনা হাঁড়ির খবর পায় মল্লিকদের, তারই মারফতে আবার সাধনার হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় মল্লিকদের বাড়ি। যা শোনে এবং যা জানে সাধনা আবার তা শোনায় আরও দু-একজনকে যাদের সঙ্গে তার ভাব আছে। তাদের কাছে খবর শোনে অন্য বাড়ির।

তারা আবার শোনায় অন্যদের।

এমনিভাবে জানাজানি হয়।

একজনকে যে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয় তা নয়, সব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় তাও নয়। দু-চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। পাড়ার কোনো বাড়ির মানুষের চালচলন স্বভাবচরিত্র, সংসারের অবস্থা আর গতি-প্রকৃতি কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

কিন্তু সে ছিল আলাদা ব্যাপার। সে ছিল শুধু তথ্য জেনে কৌতূহল মেটানো। আজকাল সাধনার শুধু খবর শুনে সাধ মেটে না, নিজে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে আসে মানুষগুলির সঙ্গে। যে বাড়িতে তার ছিল ন-মাসে ছ-মাসে একদিন বেড়াতে যাওয়া, নিতান্তই নিয়ম রক্ষার জন্য, সে বাড়িতে আজকাল সে ঘনঘন যাতায়াত করে। যাদের সে পছন্দ করত না, যাদের সঙ্গ ছিল বিরক্তিকর, যেচে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করে।

ছোটোবড়ো নীড়গুলিতে ছড়ানো জীবনে সে যেন সন্ধান করছে গভীরতর কোনো তাৎপর্য, নতুন কোনো মানে বুঝবার চেষ্টা করছে চেনা মানুষগুলির জানা জীবনের।

জানা জীবন ভেঙে পড়ছে, গতি নিয়েছে অজানা অনিবার্য পরিণতির দিকে। তা, জীবন তো আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংস হচ্ছে অবস্থাটা। ধ্বংসের পথে কোনো নতুন অবস্থায় জীবন আবার নতুন রূপ নিতে চলেছে জানবার বুঝবার জন্য কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার।

তারও কিনা সেই একই পথে গতি !

রাখালের কাছে আজকাল শুধু সে পাড়ার গল্পই করে না, অনেক জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে যায় তার বর্ণনায়। রাখালকেই সে প্রশ্ন করে তা নয়। তার নিজের মনেই জেগেছে প্রশ্নগুলি এবং সর্বত্রই সে খুঁজছে জবাব, সেগুলির যেটুকু ক্ষেত্র তার অধিগম্য, যে ক-জন মানুষ তার জানা-চেনা। শকুন্তলাকে যে দেখতে এসেছিল আধবুড়ো বিপত্নীক এক ব্যবসায়ী সে গল্প শোনানোর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তার এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরা যে বিয়ে ছাড়া গতি নেই মেয়েটার, আর কোনো যোগ্যতার ব্যবস্থা করা হয়নি, তবু মেয়েটার বিয়ে দিতে এত উদাসীন কেন ওর বাপ-ভাই ? এমন খারাপ অবস্থা তো নয় যে বিয়ে দিতে পারছে না ? মানুষও তো ওরা খারাপ নয়, বজ্জাত নয় ? মেয়েরও তো এমন কোনো খুঁত নেই, বাপ-ভাই যাকে ঠিক করুক তাকেই বিয়ে করতেও সে রাজি ? এমনভাবে বয়স বেড়ে চলেছে, আগে হলে বাড়ির লোক কবে পাগল হয়ে উঠত মেয়েটাকে পার করার জন্য, আজ কোথা থেকে কীভাবে এই অদ্ভুত গা-ছাড়া নিশ্চেষ্ট ভাব এল ? এর আসল মানেটা কী ?

এটা বিশেষভাবে শকুন্তলা সম্পর্কে প্রশ্ন। অবিকল না হলেও মোটামুটি একই রকম প্রশ্ন জাগে লতিকা আর অমিয়ার সম্পর্কে।

বিয়ে তাদের হচ্ছে না কেন ?

কয়েক বছর আগে এ রকম পরিবারের এই বয়সের এ রকম মেয়েদের কুমারী দেখা যেত না। স্কুল-কলেজে পড়ে, টাইপরাইটিং শেখে, ভুখা মানুষদের ওপর গুলি চললে এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দেয়, সে রকম মেয়ে এরা নয়।

আগের মতোই ঘরে ক, খ শেখা সেলাই শেখা রান্না শেখা অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা সব মেয়ে।

নীচের ভাড়াটের সঙ্গে দত্তদের যে আরেকবার মারামারি বাধবার উপক্রম হয়েছিল তাতে সাধনা আশ্চর্য হয়নি। সে ভেবে পায় না দুটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও কী করে নামল এই ঝগড়ায়, গলা চড়িয়ে কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিল ? সে তো নিজে গিয়ে দেখে এসেছে যে এ দুটি বাড়ির মেয়েরা ছোটোলোক হয়ে যায়নি, তবু ?

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী নিজে শিক্ষিতা, লেখাপড়ায় নাচে গানে তার মেয়ে দুটি এ পাড়ায় অতুলনীয়া, ভাড়াটে সুধীর মুখার্জির স্ত্রীর এমন মিশুক স্বভাব, তার ছেলের বউ অঞ্জলি এমন লাজুক প্রকৃতির, তার মেয়ে নমিতার এমন সরল হাসি মিষ্টি কথা—তবু ?

সেনদের নতুন রাঁধুনিটাও আবার পালিয়ে গেছে জানিয়ে সাধনা আগের মতো বিনয় সেনের বউ সুহাসিনীর মন্দ স্বভাবের কথা বলে ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেয় না, ওদের বাড়ি ঝি রাঁধুনি টেঁকে না কেন এ রহস্যকে নতুন করে তুলে ধরে মাথা ঘামায়।

সুহাসিনীর স্বভাবের জন্য হতেই পারে না, অন্য কারণ আছে।

বারোমাস রোগে ভুগে সত্যি ভারী খিটখিটে স্বভাব হয়েছিল, কিন্তু পরপর দুটি ছেলে মরে গিয়ে সে তো শোকে কাবু হয়ে বিছানা নিয়েছে, ভালোমন্দ কোনো কথাই কাউকে বলে না ? চাকর ঠাকুর ঝি রাঁধুনির উপর বরাবর সে সংসারের সব ভার ছেড়ে দেয়, আগে তবু দেখাশোনা করত তারা কী করছে না করছে, আজকাল তো জিজ্ঞাসাও করে না ? রাঁধুনিটার হাতেই সে তো সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, সে যা করে তাই সই, তবু কেন তিনদিন কাজ করেই এ লোকটাও পালিয়ে গেল ?

কেন বারবার এ ব্যাপার ঘটবে, কারণ কী ?

ঘোষালদের বাড়িতে লোক বেশি, খাটুনি বেশি, মাইনে কম ; ঘোষাল-গিন্নির যেমন ছুঁচিবাই তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা খেঁচাখেঁচি বলে ওদের কাজ ছেড়ে এসেছিল রাঁধুনিটা এ বাড়িতে। এখানে ছোটো সংসারে বেশি বেতনে নিজের খুশিমতো নির্বিবাদে কাজ করার সুযোগ পেয়েও আবার কেন ফিরে গেল ঘোষালদের বাড়িতে ?

আশি টাকা উপার্জনে একখানা ঘরে পরেশের সংসার, তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, এক ফোঁটা দুধ রাখে না। দুধ ছাড়া যদি না চলে ছেলেপিলের, ওরা বেঁচে আছে কী করে ? খেলাধুলো করার জোর কোথায় পায় ? আবার যে ছেলেপিলে হবে পরেশের বউ অমলার, সে জন্য ওদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই কেন ?

ওরা অবশ্য বলে যে মরতে বসেছি। কিন্তু মুখে বললেই তো হয় না। দুশ্চিন্তায় ওরা পাগল হয়ে গেল কই ?

কাছেই ওই উদ্‌বাস্তু কলোনি, ওদের একই দেশ থেকে যারা এসে বাড়ি কিনেছে এখানে, তারা কেন ভুলেও দেশের লোকের কলোনিতে পা দেয় না ? রাখালের ছাত্র বিশুর বাড়ির লোকেরা কেন এড়িয়ে চলে কলোনির হোগলার ঘরের বাসিন্দা দেশের লোককে ?

এমনি কতভাবের কত যে জিজ্ঞাসা সাধনার।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাখাল। সাধনাকে তার মনে হয় আনমনা উদাসীন—তাকেও যে সাধনার অবিকল সেই রকম মনে হয় এটা এখনও খেয়াল হয়নি রাখালের।

দিনরাত অত কী ভাব ?

দিনরাত ভাবি ? দিন তো কাটে বাইরে, রাত নটা পর্যন্ত।

তুমি দিনরাত ভাব। ঘরেও ভাব, বাইরেও ভাব।

দিনরাত ভাবি জানলে কী করে ?

ও বোঝা যায়।

কী করে ?

এ সব তার আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার কৌশল। সাধনা কিন্তু রাগ করে না।

বলে, বাড়িতে যতক্ষণ থাকো, আগেও থাকতে, এখনও থাকো। আগে এ রকম ভাবতে না। একদিন দুদিন নয়, রোজ ভাবতে দেখছি। শুধু বাড়িতে একটু ভেবে এ রকম চিন্তা কেউ তাকে তুলে রাখতে পারে ? আমার কাছে লুকিয়ো না। কিছু হয়ে থাকলে আমায় না বলে লাভ নেই জানো তো ?

বলতে বলতে সাধনা আরও কাছে সরে এসে বসে। গরমে ঘামাচিতে ছেয়ে গেছে রাখালের গা, আদর করে ঘামাচি মেরে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত কেমন বিকল হয়ে যায় রাখাল !

বিশেষ কিছু ভাবছি না। কী করব না করব এই নানাচিন্তা।

বলে রাখাল তাকে বুকে টেনে নেয়।

দোকান ভালো চলছে না ?

দোকান ঠিক চলছে। রাজীব পাকা লোক।

তবে ? ধারের টাকার কথা ভাবছ ? কত বলছি খরচ বাড়িয়ো না—

রাখাল শুনতে পায় না তার কথা !

সে তখন ভাবছে, সব কথা খুলে বলবে কি সাধনাকে ? খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলবে সে কী করেছে এবং কেন সে তা করেছে ?

কিন্তু সাধনা কি বুঝবে তার কথা ? বিশুর মার গয়না লুকিয়ে নিয়েও কেন সে চোব হয়ে যায়নি, তার মানেও বুঝবে ? রাখাল নিজেই মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দেয়—না, সাধনা বুঝবে না। তার কাছে এটা আশা করাই অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা !

সাধনাও সেই দশজনের একজন তার কাজকে যারা চুরিই বলবে এবং তাকে ভাববে চোর।

চুরি সে করেছে একা। তাই নিজের বউয়ের কাছেও চোর হয়ে গেছে। চোরেরও বউ থাকে, স্বামীকে চোর হিসাবেই সে নেয়। সাধনা চোরের বউ হিসাবে তাকে চোর বলে নেবে না, দশজনের একজন হয়ে তাকে চোর ভাববে।

শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে আসে রাখালের অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ। সেটা টের পেয়েই মুখ ম্লান হয়ে যায় সাধনার, তার বুক থেকে মুক্তি নিয়ে তফাতে সরে বসে হাই তুলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে।

এই ভাবনার মানেই সে জানতে চেয়েছিল রাখালের কাছে, সে ভাবনা আদরের আলিঙ্গনকেও এভাবে শিথিল করে দিতে পারে, আজ পর্যন্ত কখনও যা ঘটেনি !

দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে রাখাল তাকে আদর করেনি, তার দিকে ফিরে তাকায়নি —সে ছিল ভিন্ন কথা। তাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে রাখাল অন্যমনস্ক হয়ে ঝিমিয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন, একেবারেই দুর্বোধ্য।

২

রাজীবের সঙ্গে বিড়ির পাতা শুখার তামাক আর সিগারেটের কারবারে নেমে রাখাল দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করছে।

পাতা শুখা আর সিগারেটের নতুন ছোটোখাটো দোকান, পাইকারি মাল কিনে খুচরো বেচার লাভ, তাও আবার রাজীবের সঙ্গে বখরায়। তবু, সেই আগেকার কেরানিগিরির চেয়ে ভালো

রোজগার হচ্ছে বইকী তার। বেকার হয়ে তিনটে টিউশনি করেও যে শোচনীয় অচল অবস্থায় পড়েছিল, সেটার অবসান হয়েছে।

টিউশনির টাকা পেলে তবে রেশন আসবে, বাজার আসবে এবং উনানে হাঁড়ি চড়বে, এই অসহ্য দুর্দশা আর নেই। এখন সে চোরাবাজার থেকে দু-পাঁচসের চাল যখন খুশি কিনতে পারে, দুবেলা মাছ খাওয়াতে পারে সাধনাকে, ছেলের জন্য রোজের দুধ দরকার হলে আরও আধসের বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই সেদিনও আধপোয়া দুধ বাড়াতে পারেনি বলে ছেলেকে মাই ছাড়াতে পারেনি সাধনা। ছেলে দস্যুর মতো শুষেছে আর ব্যথায় টনটন করেছে তার আধশুকনো মাইগুলি।

ব্যাংকে কয়েক শো টাকাও জমেছে রাখালের।

কিন্তু টিউশনি একেবারে ছাড়েনি রাখাল, সকালে বিশুকে আর সন্ধ্যায় প্রভাকে নিয়মিত পড়ায়। দুনম্বর ছেলেটিকে পড়াবার সময় পায় না। আগে ভোরে উঠে বিশুকে পড়িয়ে সটান চলে যেত এই ছাত্রটির বাড়ি, এখন যায় দোকানে। রাজীব অবশ্য তার আগেই দোকান খুলে বসে।

লাভে তো ভাগ বসাবেই, ব্যাবসাটাকে কোন দিকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবার ঝোঁক চাপবে তাও ঠিক নেই, তবু নগদ দুটি হাজার টাকা দিয়ে রাখাল যে ব্যাবসাটা তার শুরু করতে সাহায্য করেছে তাতেই রাজীব কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে।

রাজীব বলে, আপনি ভাই যখন খুশি আসবেন, যতক্ষণ খুশি থাকবেন, কোনো হাঙ্গামা করতে হবে না আপনার। আপনি টাকা দিয়েছেন তাই ঢের।

রাখাল কিন্তু আপিসের ডিউটি করার মতো ঘড়ি ধরে নিয়মমতো দোকানে যায়, রাজীবের সঙ্গে খাটে। রাজীবের সসংকোচ প্রতিবাদ কানে তোলে না।

বলে, না ভাই, হাত-পা গুটিয়ে বাবু সেজে বসে থাকতে পারব না। টাকা আপনিও দিয়েছেন আমিও দিয়েছি, আপনি সব ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন আর আমি লাভের ভাগটুকু নেব, তা হয় না।

ঝঞ্ঝাট কী ? এই কাজ করে এসেছি চিরকাল, আমাদের কি গায়ে লাগে ? আপনি শিক্ষিত মানুষ, বিদ্যাচর্চা হল আপনার কাজ। এ সব নোংরামি কি আপনাদের সয় ? আপনার টাকাটা না পেলে দোকান স্টার্ট হত না আমার। আপনার কাছে কেনা হয়ে আছি দাদা।

ও কথা বলবেন না। আমার টাকা না পেলেও আপনি ঠিক দোকান দিতেন, অন্য একজন ঠিক ভিড়ে যেত আপনার সঙ্গে। আমার মতো আনাড়িকে পার্টনার করেছেন, আমারই সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আপনার কাছে।

রাজীব সবিনয়ে বাতিল করে দেয় তার কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন, কিন্তু খুশি আর তৃপ্তি যেন চোখে মুখে তার ধরে না। সেই যে যেচে একদিন সে রাখালের চাকরি করে দিতে চেয়েছিল তার আগেকার কারবারের বজ্জাত পাষণ্ড পার্টনারটির মারফতে, চাকরির নামে মারাত্মক এক চোরামির ফন্দি[illegible] পড়ার উপক্রম ঘটেছিল রাখালের, সে জন্য লজ্জার সীমা ছিল না রাজীবের। বেকার রাখাল সোজাসুজি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বাঁচিয়েছিল বলে রাজীবও যেন বেঁচে গিয়েছিল। শ্রদ্ধার যেমন তার সীমা থাকেনি মানুষটার উপর, না জেনে না বুঝে ভালো করার নামে তাকে বিপদে ফেলতে গিয়েছিল বলে মরমে মরে থাকাও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি বহুদিন।

চাকরি করে না দিতে পেরে থাক সাথে নিয়ে ব্যাবসায়ে নামিয়ে দুপয়সা আয়ের ব্যবস্থা সে যে তার করে দিতে পেরেছে, এ জন্য তাই আনন্দের সীমা নেই রাজীবের। রাখাল কৃতজ্ঞভাবে কথা বললে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা গোলগাল মুখে দাঁতন-ঘষা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফোটে, ছোটো ছোটো ধীর শান্ত চোখে ঘনঘন খুশির পলক ফেলা চাঞ্চল্য আসে।

খাঁটি শহর এলাকায় ট্রাম-চলা বাস-চলা রাস্তার ধারে ছিল রাজীবের আগের দোকান—আগের সেই বজ্জাত পার্টনার দীননাথের সঙ্গে। সে দোকান গেছে যাক, রাজীবের এখন আর আপশোশ নেই। কী বোকাই তাকে বানিয়েছিল হারামজাদা ! সাধারণ দোকানদার সে, পাইকারি কিনে খুচরো বেচার সাধারণ ব্যাবসায়ী, তাকে উঁচুদরের ব্যাবসায়ী করার লোভ দেখিয়ে, বড়োবাজার থেকে মাল কেনার বদলে বড়োবাজার যেখান থেকে যেভাবে মাল কিনে আনে সেখান থেকে সেইভাবে মাল আনিয়ে ব্যাবসা ফাঁপানোর ভাঁওতা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে জোগাড় করা কয়েকটা ওয়াগনের সরকারি পারমিট দেখিয়ে, একজন মন্ত্রীমশায়ের একজন ভাগনেকে দোকানে মহাসমাদরে চা বিস্কুট খাইয়ে, কীভাবেই না মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল তার।

তারপরেই সর্বনাশ হয়ে যেত, একেবারে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হত, যদি না বাসন্তী গায়ের সব গয়না খুলে দিত, ট্রাংকে তার বিয়ের বেনারসির নীচে লুকানো নোট কাঁচা টাকা আর ভাঙা গয়নার সোনায় হাজার পাঁচেক টাকা বার করে দিত !

কত জন্ম তপস্যা করে না জানি সে এমন বউ পেয়েছে, এমনি চরম বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য যে পাঁচ-ছবছর ধরে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে নতুন গয়না আদায় করেছে, খুঁটে খুঁটে নোট আর কাঁচা টাকা জমিয়েছে, অচল গয়নার সোনা কিনে রেখেছে !

লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে। ভাগ্যে সে স্ত্রৈণ হয়েছিল !

এবার থেকে আরও সে পোষ মানবে বাসন্তীর !

নতুন পার্টনার নিয়ে শুধু বাস-চলা রাস্তায় তিন হাত চওড়া দশ হাত গভীর একটা খোপরে সে নতুন দোকান খুলেছে। মস্ত বড়ো এলাকার বাজারটার কাছাকাছি।

বাড়ি কাছে হয়েছে দুজনের।

চার পয়সা বাস-ভাড়া লাগে।

রাখাল মাঝে মাঝে ব্যাবসায় বুদ্ধির পরিচয়ও দেয়। সেটা আসলে অবশ্য তার বাস্তববুদ্ধি।

পাঁচশো সিগারেটের মোড়ক কিনতে আসে একজন খদ্দের। দেখেই বোঝা যায় সে পানবিড়ির দোকানি নয়, খুচরো বেচার জন্য পাইকিরি সিগারেট কিনছে না। তার বেশভূষা আর চেহারাটাই সাংস্কৃতিক। বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, দাঁতে ভাঙন ধরেছে, মুখের চামড়ায় ছাইবর্ণ নেমে এসেছে—কালো মেয়ের মুখে একগাদা সস্তা পাউডার মেখে তেলচিটে গামছা দিয়ে ঘষে তুলে দেবার মতো, তবু চোখে যেন জ্বলছে অতৃপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা, যে ভুখা কোনোদিন মেটে না তাকেই বাড়িয়ে যাওয়ার তপস্যার জ্বালা।

আসুন বামাচরণবাবু, আসুন। ভালো আছেন তো ? অনেকদিন বাদে এলেন। এ নতুন দোকানেও আপনি আসবেন—

রাজীব যেন ভাষা খুঁজে পায় না বিনয় জানাবার, নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তার আসনে বসায় বামাচরণকে, দোকানের খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতাপত্রের তলায় আড়াল করা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পুরাতন একটি ছাপা বই টেনে বার করে সামনে ধরে বলে, আজও মাঝে মাঝে আপনার কবিতার বইটা পড়ি আজ্ঞে ! কবিতা লিখেছেন বটে সত্যি ! রামায়ণ পড়ি মহাভারত পড়ি, প্রাণটা যেন ঠান্ডা হয়ে না পড়ে। তখন আপনার বইটা পড়ি।

বামাচরণ মৃদু মৃদু হাসে। রাজীবের দেওয়া সিগারেটটা ধরায়।

রাজীব বলে, আর লিখলেন না ? বারো-চোদ্দোবছর আগে লিখেছিলেন এ বইটা, আর লিখলেন না ?

লিখেছি। এবার ছাপাব ভাবছি।

নিজে ছাপবেন ?

নিজে ছাপাব কী মশায় ? আমার গরজ পড়েছে। সবাই ছাপাতে চায় আমার নতুন বইটা। সবাই বলে আপনি অনেকদিন কবিতার বই ছাপাননি, আমায় ছাপাতে দিন আপনার নতুন বইটা। কাকে দেব তাই ভাবছি।

ছাপানো হলে একটা বই দেবেন কিন্তু আমায়।

বলে দামি সিগারেট প্যাকেটের পাঁচশো সিগারেটের একটা মোড়ক তার সামনে ধরে দিয়ে রাজীব ক্যাশমেমো কাটতে যায়।

বামাচরণ বলে, ইস্‌, আমি টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি একদম !

দিয়ে যাবেন একসময়।

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গুরু-কবি এবং তার ভক্ত-শিষ্যদের আলাপ শুনছিল। এবার সে জোর দিয়ে বলে, ধারে তো দেওয়া যাবে না মাল !

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরায়। বামাচরণকে বলে, ইনি আমার নতুন পার্টনার।

বামাচরণ বলে, ও বেলাই টাকা দিয়ে মালটা নিয়ে যাব।

রাখাল হাতজোড় করে, মাপ করবেন, নতুন দোকান, শ্রীজহরলাল স্বয়ং এক পয়সা ধার চাইলে দেবার সাধ্য নেই !

বামাচরণ রাজীবের দিকে তাকায়। রাজীবও একবার তার দিকে তাকিয়ে তার পুরানো ছেঁড়া কবিতার বইটার পাতা উলটে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকে।

বামাচরণ বলে, আচ্ছা ও বেলায় আসব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও আমাকে।

রাখাল বলে, কী সিগারেট চান ?

নাম শুনে বলে, এক প্যাকেট সাড়ে আট আনা।

সাড়ে আট আনা দামের একটা সিগারেট প্যাকেট সে মোড়ক খুলে বার করে সামনে ধরে দেয়। আরেকবার বলে, সাড়ে আট আনা।

বামাচরণ বেরিয়ে যায়।

রাজীব হাসিমুখে তাকায়। তারিফ করে বলে, আপনি সত্যি অলরাউন্ড মানুষ দাদা ! এককথা এককাজ, ইদিক উদিক নেই। তা শক্ত মানুষ না হলে কি পারতেন ? অমন অবস্থা গেল, জমানো টাকাটি ঠিক রেখে দিয়েছেন। কী করে যে পারলেন ভাই, ভেবে পাইনে। দুহাজার টাকা জমা রয়েছে, ইদিকে দিন চলে না—আমি হলে কবে উড়িয়ে দিতাম।

প্রশংসা শুনে একটু যেন ম্লান গম্ভীর হয়ে আসে রাখালের মুখ। রাজীব ভাবে—না জেনে কিছু অন্যায় কি বলে ফেললাম না কী রে বাবা ! তারপর ভাবে—দুঃখদুর্দশার দিনগুলির কথা ভেবে হয়তো এই ভাবান্তর ঘটেছে রাখালের।

রাজীবের এখন চলছে নিজের দুর্দিন।

ছোটোখাটো এই দোকানটি আবার দিয়েছে বটে রাখালের সঙ্গে, কিন্তু আগের ব্যাবসায়ের তুলনায় এ কিছুই নয়।

শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা।

নিজের সমস্ত শখ, বাসন্তীর সমস্ত আবদার, জীবনকে সরস করার নানা উপায় আর উপকরণ, হঠাৎ সব বাতিল করে ছেঁটে ফেলে দিতে হয়েছে। অভ্যস্ত পরিপূর্ণ জীবনটা যেন পরিণত হয়ে গেছে অনভ্যস্ত শূন্য জীবনে।

সর্বাঙ্গে গয়না আঁটা থাকত বাসন্তীর, দামি দামি রঙিন শাড়িই শুধু সে পরত। চেয়ে দেখেই সুখে আনন্দে থইথই করত রাজীবের মন। উঠতে বসতে বাসন্তীর ছিল ঝগড়া আর নালিশ, কথা যেন বলত শুধুই মুখ ঝামটা দিয়ে। কিন্তু ওটাই ছিল বাসন্তীর আদর সোহাগ আহ্লাদ আবদারেব বিশেষ ধরন, ঝগড়াটে হয়ে থেকেই সে একেবারে জমিয়ে দিত রসিয়ে দিত জীবনটাকে।

পাড়ার মানুষ বলে কুঁদুলে বউ—তারা কী জানবে সে কেমন কোঁদল, তারা কী বুঝবে রাজীব কেন নিরীহ গোবেচারি সেজে থাকত !

তারা তো হিসাব রাখত না বাসন্তী কখন ঝগড়া করে, কখন করে না। দরকারি কথা বলার সময়, রাজীবের শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে থাকার সময়, নিরালায় আদর সোহাগের সময় ওই ঝগড়াটে মানুষটাই আবার কেমন অন্যরকম মানুষ হয়ে যেত, রাজীব ছাড়া কে তা জানবে !

সেই বাসন্তীর গায়ে আজ গয়না নেই—গলায় একটি হার আর হাতে তিনগাছা করে চুড়ি। সেই বাসন্তী আজ ঝগড়া করতে ভুলে গেছে।

জীবন-যাত্রার আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন থতোমতো খেয়ে গেছে, শান্ত নির্জীব হয়ে গেছে। রাজীবের জন্য গভীর সহানুভূতিতে যন চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কলহ করা নেই, মান অভিমান নেই, লীলা-চাপল্য নেই।

দামি শাড়িগুলি আজও পরে। অনেক শাড়ি ব্লাউজ জমানো আছে, বহুদিন চলবে। একই জামাকাপড়ে জড়ানো সেই একই মানুষ, তার সেই একই রূপ-যৌবন, তবু রাজীব তার দিকে তাকিয়ে আগেকার পুলক অনুভব করতে পারে না। মনে হয়, তার বাসন্তী আর নেই।

বাসন্তী বদলে গেছে।

বদলে গেছে, কিন্তু তিতোও হয়নি, টকেও যায়নি। মুখ গোমড়া করে থাকে না বাসন্তী, হাহুতাশ করে না, কখনও তাকে বিরূপ দেখা যায় না রাজীবের উপর। কোঁদল করা লীলাখেলার উদ্দামতাটুকু বাদ দিলে সে ধীর শান্ত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কী, সে জন্য আকর্ষণ যে তার কমেছে রাজীবের কাছে মোটেই না নয়। আজকাল বরং নতুন ভাবে বেশি করে টানছে বাসন্তী—দাসী রাঁধুনির মতো তাকে খাটতে দেখে দিনরাত তাকে সোহাগে আদরে ডুবিয়ে রাখবার সাধটা অদম্য হয়ে উঠেছে !

এত ভালো লাগছে, নতুন রকম ভালো লাগছে, তাকে আদর করতে !

কিন্তু তবু রাজীব আগের বাসন্তীকেই ফিরে চায়।

নাঃ, উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার, ব্যাবসাটা গড়ে তুলতে হবে। লাখপতি হতে চায় না রাজীব, প্রাসাদ চায় না মোটর গাড়ি চায় না—শুধু আগের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চায়। বাসন্তীর গায়ে গয়না উঠবে, সতেজ জীবন্ত হয়ে উঠে আবার নানা বায়না ধরবে বাসন্তী, ঝংকার দিয়ে ঝগড়ার ঢংয়ে আবার সে প্রেমালাপ করবে তার সঙ্গে !

রাখাল তার মনের কথা জানলে নিশ্চয় মনে মনে বলত, এই নাকি প্রেম তোমার কাছে ? টাকায় যা খাড়া ছিল, টাকার অভাবে যা ফুরিয়ে গেছে, আবার টাকা হলেই যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ?

রাজীব এ সব বোঝে না। রাখালের কাছে টাকা শুধু টাকাই, রাজীবের কাছে তা নয়। টাকা ছাড়া যদি মানুষ বাঁচে না আর সেটা যদি সস্তা না করে দেয় বাঁচাকে, টাকা ছাড়া ভালোবাসা না জমলে সেটা খাপছাড়া হয় কীসে, প্রেমকে সেটা ছোটো করে দেয় কোন যুক্তিতে ?

সব দিক যার টানাটানি তার জীবনে আনন্দ আসবে কোথা থেকে ? দরকার মতো যার টাকা নেই তার আবার প্রেম-ভালোবাসা, তার আবার বেঁচে থাকার সুখ !

বিড়ির পাতা শুখা তামাকের বস্তায় ভরা ছোটো লম্বাটে ঘরখানায় বসে কেনাবেচার অবসরে দুজনের মধ্যে যে এ রকম দার্শনিক কথা একেবারেই হয় না তা নয়।

সব মানুষেরই দর্শন আছে, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া কোনোও মানুসের চলে না। জীবনদর্শন ছাড়া মানুষের জীবন নেই কোনো স্তরের। হয়তো সেটা পণ্ডিতের দর্শন নয়, ছাঁকা তত্ত্বের জটিল দর্শন নয়। নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারের দর্শন, নিজের জীবন আর জগৎটার একটা নিজের বোধগম্য মানে খাড়া করার দর্শন।

রাজীব হয়তো ওই কথাই বলে, টাকা ছাড়া সত্যি সুখ নেই দাদা !

রাখাল হেসে বলে, টাকার সুখ কি আসল সুখ ?

সুখের আবার আসল নকল আছে নাকি ? সুখ হল সুখ। অসুখ হল অসুখ !

ও ভাবে ধরলে কথাটা তাই বটে, আমি বলছিলাম মানুষের মনে করার কথা। আসলে যা সুখ নয় সেটাকেও মানুষ সুখ ভেবে নেয়। ওটাকেই বলছিলাম নকল সুখ। আপনি বলছেন টাকার কথা। টাকা থাকলেই কি সুখ হয় ?

তাই কি হয় ? এককাঁড়ি টাকা হলে কি এককাঁড়ি সুখ হয় ? টাকা হলেও সুখ একদম নাও হতে পারে। তবে কিনা টাকা নইলেও আবার সুখ কিছুতে হবার নয়, সুখের জন্যও টাকাটি চাই। টাকা বাদ দিলে উপোস দেয়া সুখ, সে হল মশাই সাধুসন্নেসীর সুখ।

আর আপনার আমার সুখ ?

এই ভাতকাপড় আরাম-বিরাম শান্তি—

তবেই দেখুন, আপনি সব জড়িয়ে দিচ্ছেন। বাঁচাব জন্য ভাত কাপড় চাই, আরও কতগুলি ব্যবস্থা চাই। তার মানেই টাকা চাই, টাকা দিয়ে এ সব ব্যবস্থা হয়। সুখ-শান্তি এ সব তার পরের কথা। আগে বাঁচা চাই ঠিক, নইলে সুখ-শান্তি কীসের ? কিন্তু বাঁচবার ব্যবস্থা হলেই কি সুখ-শান্তি ব্যবস্থা হয় ? সে হল আলাদা ব্যবস্থা। টাকা চাই স্রেফ বাঁচার জন্য, টাকায় সুখ হয় না।

রাজীব দমে গিয়ে দাড়িতে হাত বুলায়, তার চোখ মিটিমিট করে। এবার সে ধাঁধায় পড়ে গেছে !

রাখাল আবার বলে, সুখ মানেই হল আনন্দ। আনন্দ মানুষকে সৃষ্টি করতে হয়। টাকা দিয়ে কেনার জিনিস নয় ওটা। টাকার অভাবে কী হয় ? বাঁচার কষ্ট—জীবনে ওই আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় মানুষের। এই হিসেবে যদি বলেন টাকা ছাড়া সুখ হয় না, তাহলে অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই হিসেবটুকু ভুললে চলবে না, সুখ আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে।

রাজীব বলে, কিন্তু রাখালবাবু, আসলেই যে খটকা বাধছে। কোনো অভাব নেই, অশান্তি নেই, রোগ-বালাই নেই—পাঁচজনকে নিয়ে এ রকম বাঁচাটাই তো সুখের, তাতেই তো আনন্দ মানুষের। আনন্দ আবার ভিন্ন করে সৃষ্টি করতে হয়, তার মানে তো বুঝলাম না মশাই ! বিশেষ আনন্দ হয়, বড়োদরের আনন্দ হয়, সে আলাদা কথা। তার জন্য সাধন-ভজন যোগ-টোগ দরকার হয়। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষের সাধারণ আনন্দ, দুঃখ কষ্ট রোগ ব্যারাম তা থাকলে সে তো আপনা থেকেই জুটবে।

জুটবে ? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন তবু সুখশান্তি আনন্দ জুটবে ? অভাব নেই আপনার একার, যে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার, বাইরে যে দশজনের সঙ্গে কারবার, তাদের তো আছে। বাইরের মানুষ কেন, ঘরের মানুষের সঙ্গে কত বিষয়ে আপনার স্বার্থের মিল নেই। স্বামী-স্ত্রীর পর্যন্ত সব স্বার্থ এক নয়। পাঁচজনের সঙ্গে সামলে-সুমলে সামঞ্জস্য করে আপনাকে চলতে হবে, পাঁচজনকে সুখী করতে হবে, হাসি খেলার আয়োজন করতে হবে, স্নেহ করতে ভালোবাসতে হবে, শত্রুর সাথে লড়তে হবে—আরও কত কী করে তবে না খানিকটা আনন্দ জুটবে আপনার।

এবার রাজীব খুশি হয়ে ওঠে।

হাঁ হাঁ, এটা ঠিক বলেছেন ভাই। একেই বলছেন সৃষ্টি করা ? তা হলে তো ঠিক আছে কথাটা ! এটাকেই তো আমি বাঁচা বলছিলাম ! নইলে কলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচাটা কী আর বাঁচা !

রাখাল অস্বস্তি বোধ করে !

এত সহজে আগাগোড়া বুঝে ফেলার মতো সোজা কথা সে বলেনি। তার নিজের কাছেই সবটা স্পষ্ট নয় বলে অস্বস্তি আরও বেশি হয়। এত সহজে স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল রাজীবের কাছে কথাটা ? তার মনে কত সংশয় কত অস্পষ্টতা--রাজীব আঁচ করে ফেলল আসল কথাটা ?

রাখাল ধরতে পারে না যে তার সঙ্গে রাজীবের এটাই তফাত—সে সংশয়ী আর রাজীব বিশ্বাসী। সংসারে ধনীত্ব আর দারিদ্র্য—এটাই তো আসলে তাদের এত কথা বলার মূল কথা। জীবনই তাদের আনন্দ, তার বাড়া আনন্দ আর নেই। বহু জীবনকে দীন করে পঙ্গু করে কিছু জীবন এই পূর্ণতা এই সার্থকতা আত্মসাৎ করতে চায়,—মানুষের সুখ বলো আনন্দ বলো তার মূল সমস্যা ওইখানেই। নইলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে মানুষ, আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছে—একে বলা যায় জীবনে আনন্দসৃষ্টির প্রক্রিয়া। এই সত্যের ঝাপ্‌টা লেগেছে রাখালের বিশ্লেষণী মনে—সেই ঝলকমারা আলোয় সে মানে খুঁজছে একটি নীড়াশ্রয়ী মানুষের জীবনে আনন্দ আসে কীসে আর কেন।

সংশয়ের জের তাই তার মিটছে না। রাজীবের এ সব বালাই নেই। সংঘাত সংকীর্ণতা অসম্পূর্ণতা নিয়ে নীড় বেঁধে ঘর করার যেটুকু আনন্দ তাতেই সে বিশ্বাসী—টাকার অভাবটা না থাকলেই হল !

রাখাল নিজেও ওইটুকুই চায়—যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে সাধনাকে নিয়ে সংসার করাব—আনন্দটুকু। কিন্তু সে ভাবে অনেক বড়ো বড়ো কথা।

তার চিন্তা আর কাজে, আদর্শ আর জীবনে, সামঞ্জস্য নেই।

তাই তার সংশয়ও ঘোচে না।

৩

এখনও ভোরেই বিশুকে পড়াতে যায়।

আগে মাঝে মাঝে খালি দেবতার প্রসাদের ভাগ পেত এ বাড়িতে, আজকাল নিয়মিত চা-জলখাবার জোটে।

আগে চা জলখাবার দেওয়া হত না তাকে সম্মান করেই ! জমিদার-গিন্নি হলেও বিশুর মা হঠাৎ পূর্ববঙ্গের গাঁ থেকে উৎখাত হয়ে শহরে এসেছে, শতাধিক বছরের পুরানো। ধারার জের টেনে টেনে সেখানে চলছিল জীবনযাপন,—ক্রিয়াকর্ম ব্রতপূজা গুরুসেবা ইত্যাদি সমেত।

রাখাল উঁচুজাত, ছেলের বিদ্যাদাতা গুরু। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া তাকে কি আর কিছু খেতে দেওয়া চলে ?

গুরুদেব সম্পর্কে বিশুর মার সংস্কার ভাঙেনি। তবে সংস্কারটার ডালপালা নতুন জীবনের বাস্তবতা কিছু ছেঁটে ফেলায় ছেলের প্রাইভেট টিচারকে গুরুস্থানীয় করে রাখাব বদলে স্নেহ দিয়ে একটু কাছের মানুষ করে ফেলেছে।

ঘরের লোকের চা-জলখাবারের ভাগ তাকে দিতে এখন আর বাধে না বিশুর মার।

স্নেহ আর চা-জলখাবার জুটছে রাখালের, আগে যে অসাধারণ শ্রদ্ধা আর সম্মান পেত সেটা ঘুচে গেছে। শুধু বিশুর মা নয়, এ বাড়ির প্রায় সকলের কাছেই।

নির্মলা পর্যন্ত তাকে যেন আর সমীহ করে না।

এই সরলা ও মুখরা ক্ষীণাঙ্গী বিধবা তরুণীটিকে সেদিন পর্যন্ত রাখাল বিশুর মার নিজের বোন বলেই জানত। সম্প্রতি জেনেছে যে সে তার জ্যাঠতুতো বোন।

নির্মলা নিজেই তাকে জানিয়েছে। নির্মলাই প্রতিদিন তাকে চা-জলখাবার এনে দেয়। একটা মানুষকে জলটুকু খেতে দেওয়াও কি ঝি চাকরের মতো বাজে মানুষের কাজ ?

বিশু সেদিন সেই সময়টাতেই নীচে গিয়েছিল। বিশুকে নীচে দেখেই নির্মলা তাড়াতাড়ি শুধু খাবারটা নিয়ে এসেছিল, নইলে সাধারণত চা আর খাবার সে একসাথেই আনে।

রাখালের সঙ্গে একা কথা বলার জোরালো ঝোঁক আছে নির্মলার।

সরলভাবে সে নিজেই জানিয়েছে রাখালকে যে নিশ্চিন্ত মনে প্রাণে খুলে কথা কইতে না পেলে কি আলাপ করে সুখ হয় ?

নির্মলা বলেছিল, জানেন, এই ঘরবাড়ি জমিদারি সব আমার পাওনের কথা। বিষয় ছিল আমার বাপের, বিশুর বাপের না। কেমন ছিল কইরা উইড়া আইয়া জুইড়া বইল অবাক হইয়া ভাবি।

সতীশবাবুর জমিদারি নয়?

নির্মলা হেসেই আকুল।

জামাইবাবুর জমিদারি ? কী কথা যে কন ! জমিদারি ছিল ঠাকুরদাদার। আমাব বাপেরে দিয়া গেছিল, ত্যাজ্যপুত্র করছিল দিদির বাপেরে। বুঝলেন না ?

হঠাৎ শুনে জটিল ব্যাপারটা সত্যি বোঝেনি রাখাল।

আপনার বাবা—দিদিব বাবা— ?

দুই ভাই ছিল। ঠাকুরদাদার দুই পোলা।

রাখাল তবু তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসুভাবে।

নির্মলা হেসে বলেছিল, আঃ, আপনে তো জানেন না কিছুই। কথাডা কী, আমাব বাপ ছিল ঠাকুরদাদার বড়ো পোলা, দিদির বাপ ছিল ঠাকুরদাদার ছোটো পোলা। বুঝলেন না ?

হ্যাঁ, এবার বুঝলাম।

দিদির বাপ, মানে আমার খুড়া, জোর কইরা কইলকাতা আইছিল। কলেজে পড়বো বিলাত যাইবো খিস্টান হইবো, এইসব মতিগতি ছিল দিদির বাপের। লেখাপড়া শিখবা বিদ্বান হইবা, ঢাকা কলেজে পড়ো না গিয়া তুমি ? তা না, কইলকাতা আইসা পড়নের ঝোঁক চাপল দিদির বাপের। আমার বাপ ঢাকা কলেজে পড়ছিল। দুই-তিনবার ফেল কইবা আর পড়ে নাই, বাড়িতে আইসা বইয়া ছিল। কাণ্ডটা দ্যাখেন ভাইবা, আমার বাপে বিয়া করছিল আমার মায়ের সতিনরে, পোলাপান হয় নাই কয়েক বছর। ঠাকুবদা খুড়ারে হুকুম দিছিল, তুমি বাড়ি আইসা বিয়া কর। দিদির বাপের কী তেজ ! কইয়া পাঠাইল যে বাড়িও ফিরুম না বিয়াও করুম না।

নির্মলার কথা বলার ভঙ্গিটি অতি মনোরম। যাকে বলে চোখে মুখে কথা কওযা, কথার সঙ্গে চোখে মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে চলা। হাতও কাজে লাগে কিন্তু সেটা হাতে নাড়া হয় না, কথার টানের ওঠা নামার সঙ্গে সহজ ভঙ্গির মুদ্রা রচনা করে।

কথা বলার চেষ্টা যেন তার ক্ষীণ দেহের একটা আবেগ ব্যাকুলতারও রূপায়ণ।

শুধু কথা বলার ভঙ্গি নয়, কথার সুরটিও তার মিষ্টি।

তার কথা শুনতে বড়ো ভালো লাগে রাখালের।

বিশু ফিরে আসার পরেও নির্মলা তার কাহিনি বলে যায়। বিশু গোড়ায় উপস্থিত থাকলে এ সব কথা হয়তো সে তুলতই না। কিন্তু এতটা এগিয়ে বিশুর খাতিরে এখন আর মাঝখানে থামতে সে রাজি নয়। বিশু শুনুক যা খুশি ভাবুক। যদি বলে দেয়, দিক !

নির্মলা গ্রাহ্য করে না !

নির্মলার কাকাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়। বিয়ে করা নিয়ে বাপের সঙ্গে বিবাদ করে ছমাসের মধ্যে সেই বিয়েই সে করল, ঢাকার এক সাধারণ উকিলের মেয়েকে। কে জানে এর মধ্যে আরও কী

রহস্য ছিল ? যাই হোক, বিয়ের এক বছরের মধ্যে জন্মে গেল বিশুর মা। নির্মলার বাবা পরপর তিনবার বিয়ে করেছিল—ছেলেপিলে আর হয় না। শেষে চারবারের বার নির্মলার মাকে বিয়ে করার পর জন্মাল নির্মলা।

বাপের জমিদারি পাওয়া উচিত ছিল নির্মলার। কিন্তু ঠাকুরদাদা আর তার বাপ মারা যাবার পর ত্যাজ্যপুত্র খুড়াটি এসে জমিদারি দখল করে বসল। তাকে নাকি ত্যাজ্যপুত্র করা হয়নি, কোনো দলিল নেই।

মুখের কথার মূল্য নাই, নাই ? বাপে কইল তুমি আমার পোলা না, তোমারে এক পয়সা দিয়া যামু না। খুড়া কইল, তোমার সম্পত্তি আমার কাছে গোরক্ত, মাতৃরক্ত। সেই মানুষটা দিব্যি উইড়া আইসা জুইড়া বইল জমিদারি, তারে যে বাপে ত্যাগ করছিল তার দলিল নাই !

সাদাসিদে বাস্তব কাহিনির মধ্যে যেন পুরাণের আমেজ মেলে। মধ্যযুগের জীবনধারার জের টেনে চলেছে মানুষ আজকের দিনেও। এত ওলট-পালট হয়ে গেল জগতে, এক রাষ্ট্রে জমিদারি ফেলে আরেক রাষ্ট্রে পালিয়ে এল সতীশ, তবু সে রয়ে গেল জমিদার ! সেই যে কবে চাষির মাটিতে কামড় দিয়েছিল জমিদার, প্রলয় ঘটে গেলেও সে কামড় যেন আলগা হবার নয় !

বাড়িতে ঢুকবার সময় বাইরের রোয়াকে দুজন প্রৌঢ়বয়সি মুসলমানকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখছিল রাখাল,—একজন থেলো হুঁকোয় টানছিল তামাক। দেখলেই বোঝা যায় সতীশের চাষি প্রজা, কাল পাকিস্তান থেকে এসেছে, রাত্রে এ বাড়িতেই ছিল। মাঝে মাঝে এ রকম দু-একজন চাষিকে এসে দু-একদিন থাকতে দেখা যায়। বাইরের ঘরে ওদের শোয়ার জন্য পৃথক তক্তাপোশের ব্যবস্থা আছে। খাওয়ার জন্য পৃথক থালা বাসনের ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার পর নিজেরাই ধুয়ে মেজে সাফ করে রাখে।

কোথায় সেই জমিদারি—জমিদার এসে আস্তানা গেড়েছে কোথায়। কে জানে এখানে বসে সে কী করে চালাবে জমিদারি, কী করে ভোগ করবে অন্যে যে জমি চাষ করে তার পুরুষানুক্রমে পাওয়া স্বত্ব !

দোতলার ঠাকুর ঘরেই আজও সে বিশুকে পড়ায়। প্রতি পূর্ণিমার বিশেষ পূজাব দিন বিশুর মার শোবার ঘরে পড়াবার ব্যবস্থা হত, যে সুযোগে রাখাল বিশুর মার গয়না কখানা সরাতে পেরেছিল। সে ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা তিথিতে ছাত্রকে আর তার পড়াতেই হয় না। রাখালকে বলে দেওয়া হয়েছে, ওই দিন তার ছুটি।

বিশুর মার শোবার ঘরের বন্ধ দরজায় আজকাল তালা ঝুলতে দেখা যায়।

কে জানে কতদিন পরে বিশুর মা টের পেয়েছিল যে তার ক-খানা গয়না কমে গেছে। একদিন হঠাৎ তার শোবার ঘরের দরজায় তালা দেখে বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল রাখালের।

প্রতি পূর্ণিমায় তার ছুটি। বিশুর মার ঘরের দরজায় তালা!

বিশুর মা কী জেনেছে যে গুরুর মতো শ্রদ্ধেয় বিদ্যাদাতা রাখাল নিয়েছে গয়না ক-টা।

কিন্তু দিন যায় কিছুই বোঝা যায় না। কারও কাছে আকারে ইঙ্গিতেও শোনা যায় না যে বিশুর মার ঘর থেকে রহস্যজনকভাবে দুহাজারেরও বেশি টাকা দামের সোনার গয়না উধাও হয়ে গেছে।

বিশুর মার কথা আর ব্যবহার থেকেও কিছু টের পাওয়া যায় না।

ব্যবহার খানিকটা বদলে গেছে বিশুর মার' কিন্তু একজন গয়না চুরি করেছে সন্দেহ জাগলে কথা ব্যবহারের যে রকম পরিবর্তন হওয়া উচিত, মোটেই সে রকম নয়। বরাবরই বিশুর মার কথায়

ব্যবহারে প্রকাশ পেত স্নেহের ভাব, আগে তারই মধ্যে থাকত একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ না করার সংযম।

এটাই শুধু অন্তর্হিত হয়েছে।

তার মুখ শুকনো দেখলে আগে বিশুর মা বলত, তোমারে য্যান কাহিল দেখায় বাবা ?

আজকাল সে উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, রাখাল ! মুখ শুকনা যে ? অসুখ করছে না কি ?

আগে শুধু উপর উপর জিজ্ঞাসা করত রাখালের ঘর সংসার আপনজনের কথা। আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়।

নিজের হাতে তৈরি করা পিঠা পায়েস খেতে দিয়ে সামনে বসে তার নতুন ব্যাবসা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে খুঁটিনাটি এত কথা জেনে নেয় যে তার শতাংশ জানবার আগ্রহ সাধনার দেখা যায়নি।

ব্যাবসায় কত টাকা লাগিয়েছে এবং টাকা কোথায় পেয়েছে, শুধু এই কথাটা সে ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না।

অন্য সব কথা শুনে বলে, বেশ করছ রাখাল। লক্ষ্মী সাইধা ঘরে আসেন না, তেনারে আনন লাগে।

চিন্তিত ও গম্ভীর দেখায় বিশুর মাকে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আনমনে বলে, লক্ষ্মীর আবার যাওনের মন হইলে ঠেকান দায়। আমাগো দ্যাখো না ? সব ফেইলা থুইয়া চইলা আইলাম। আদায়পত্র নাই, টাকা আননের হাঙ্গামা, প্রজাগো মতিগতি বিগড়াইয়া গেছে—

হঠাৎ নিজের কথা বন্ধ করে বিশুর মা ডাকে, নির্মলা ? রাখালেরে আরেকটু পায়েস দিয়া যা।

পায়েসে থাকে সিদ্ধ করা চাল—জিনিসটা এঁটো। ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া যাকে কিছু দেওয়া যেত না, আজ তাকে বিশুর মা যত্ন করে নিজের হাতে রাঁধা পায়েস খাওয়ায় !

শুধু তাই নয় ! জিজ্ঞাসা করে, আমার রাঁধা পায়েস বউমা খাইবো না ?

কেন খাবে না ! আমি তো খেলাম ?

বিশুর মা হাসে।—তুমি ব্যাটাছেলে, মাইয়ালোকের বাছবিচার বেশি থাকে না ?

বিশুর মা কি জেনেও চুপ করে আছে ? তুচ্ছ করে বাতিল করে দিয়েছে তার গয়না চুরির অপরাধ ? সন্দেহ হলেও জোর করে মন থেকে দূর করে দিয়েছে সন্দেহটা ?

শুধু সন্দেহ করে অবশ্য মুখে কিছু বলা যায় না সোজাসুজি। কিন্তু এ রকম আত্মীয়ের মতো সুমিষ্ট ব্যবহার কি করা যায় আর সেই মানুষটার সঙ্গে ? কথা বলার বদলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে সাধ যায় না ?

ছেলের মাইনে করা মাস্টার ! ইচ্ছা হয় না তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিতে ?

অথবা সত্যই বিশুর মা তাকে মনেপ্রাণে এতখানি স্নেহ করে বসেছে যে প্রাণঘাতী অভাবের তাড়নায় সে যা করে ফেলেছে সেটা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে ? সামান্য গয়না যা গেছে সে তো আর ফিরবে না, লজ্জা দিয়ে তাকে দমিয়ে দিলে লাভ হবে না, তার চেয়ে সে সামলে-সুমলে উঠুক—একটা অপরাধ করে ফেলেছে বলেই নিজেকে অমানুষ ভেবে সে যেন তলিয়ে না যায় ?

অথবা খটকা যা কিছু সব তার নিজের মনের ? পূর্ণিমার দিন পূজার সমারোহ হয় শুধু এই জন্যই তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, গয়না হারিয়ে গিয়েছে বলেই শুধু সাবধান হবার জন্য ঘরের দরজায় তালা পড়েছে, গয়না হারানোর ব্যাপারে তার সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি বিশুর মা ?

সেটা অসম্ভব নয়। কবে কখন কীভাবে গয়না কটা গেছে বিশুর মা টের পায়নি। একদিন কিছুক্ষণের জন্য সে শোবার ঘরে একলা বসে ছিল শুধু এই জন্য তাকে সন্দেহ করার কথা হয়তো কল্পনাও করতে পারে না বিশুর মা !

রাখাল বাজারে যায়। বাজারটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই দোকানে চলে যাবে।

বাড়ি ফিরতে সাধনা বলে, তোমার বিশুর মা একবাটি পায়েস, এই এত পিঠে আর একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেশ ভালো একখানা রঙিন শাড়ি। দেখে কিন্তু খুশি হতে পারে না রাখাল।

এই একখানা শাড়ি দিতে মরবে না বিশুর মা। যাকে স্নেহ করে তার বউকে এ রকম দশখানা শাড়িও সে দিতে পারে ! কিন্তু এ তো শুধু একটা দুর্বলতার নমুনা। অনেককে স্নেহ করে অনেককে দরাজ হাতে দান করার যে স্বভাব জমিদার-গিন্নি বিশুর মার ছিল, এ শুধু এখনও সেটা বজায় থাকার নমুনা। জমিদারি ফেলে পালিয়ে এসেও সব দিকে বিরাট চাল বজায় রেখে চলেছে বিশুর মা। বেহিসাবি অর্থহীন চাল—শুধু জের টানা।

সাধনা বলে, ছেলের মাস্টার, তাকে এত খাতির !

রাখাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে চটে যায়। বলে, যা-তা বোলো না। খাতির আবার কী ? উনি আমায় মায়ের মতো স্নেহ করেন।

সাধনা আশ্চর্য হয়, আহত হয়। তারপর সেও রাগ করে। বলে, বড়োলোকের শখের স্নেহ ! আমি এ কাপড় নেব না। তোমার মনিব গিন্নির কাপড় তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

রাখাল গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি না নাও, আমি নেব। লুঙ্গি করে পরব।

জানিয়ে দিয়ো আমি কাপড় নিইনি।

তোমার দরকার থাকলে তুমিই জানিয়ে দিয়ো।

খুব তাড়াতাড়িই রাগটা পড়ে যায় সাধনার। স্নান করে রাখাল বেরিয়ে যাবার আগেই। গা মুছে ঘরে এসে রাখাল দেখতে পায়, শাড়িখানা পরে সাধনা দেয়ালে টাঙানো আয়নায় দেখবার চেষ্টা করছে তাকে কেমন মানিয়েছে।

সাধনা একটা বড়ো আয়না চেয়েছিল। মানুষ-প্রমাণ আয়না, যার সামনে দাঁড়ালে চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়।

তুমি আমাকে দেখছ—আগাগোড়া দেখছ। তুমি কী দেখছ আমি সবটা দেখতে পাইনে। শুধু মুখটা দেখি, ঘাড়টা দেখি, কোনো রকমে চুলটা বাঁধি।

নিজেকে দেখে করবে কী ?

তুমি কী দ্যাখো সেটা দেখব। দাও না একটা বড়ো আয়না কিনে ?

বেশি দিনের কথা নয়। খোকা যখন জন্ম নেবার প্রথম নোটিশ জানিয়েছে ইঙ্গিতে।

ও রকম আয়না একটা কিনে দিত রাখাল। কী ভাগ্য, ঘটনাচক্রে কেনা হয়নি ! তখনকার সেই সুগঠিতা সুললিতা রূপলাবণ্যময়ী সাধনা এই ক-বছরে রোগা হয়ে কালচে মেরে লাবণ্য হারিয়ে কী দাঁড়িয়েছে সেটা শুধু সেই চোখ দিয়ে দেখছে তাই ভালো। তার সহ্য হয়।

বড়ো আয়নায় আগে নিজেকে নিজের চোখে দেখে রাখলে আজ সেই আয়নায় নিজেকে দেখে সাধনা নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত।

তুমি পায়েস খাবে না ?

এক পেট খেয়ে এসেছি।

এত পায়েস কী করব ! নষ্ট করার চেয়ে বিলিয়ে দেওয়াই ভালো ! খোকাকে একটু ধরবে, পাঁচ মিনিট ?

দেরি করো না কিন্তু।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, কেন, আপিস আছে নাকি তোমার !

মুখে তার হাসি দেখতে পায় বলেই অগত্যা রাখাল চুপ করে থাকে, নইলে হয়তো রাগের চোটে আবার একটা কড়া কথা বলে বসত।

তার দোকান সম্পর্কে সাধনার অবজ্ঞা আর উদাসীনতা মাঝে মাঝে গায়ে তার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কারবারের জন্য কীভাবে টাকা জোগাড় করেছে সেটা না হয় নাই জানল সাধনা। এই দোকানের কল্যাণে বীভৎস দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে, এটা কী খেয়াল থাকে না তার ? এমন অনায়াসে অবজ্ঞাভরে বলতে পারে যে দোকানে যাবে সে জন্য আবার তাড়া কীসের ?

হয়তো দোকানের মূল্য আছে সাধনার কাছে, তার দোকানে যাওয়া না যাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব নেই। রাজীব দোকান চালায়, রাজীব সব করে—তার দোকানে যাওয়াটা নিছক শখের ব্যাপার। তার গেলেও চলে না গেলেও চলে।

এটা ভাবলে জ্বালা আরও বেশি হয় রাখালের। সেই সঙ্গে বোধ করে একটা খাপছাড়া ভোঁতা বেদনার পীড়ন। চাকরি আর মাস্টারি করা ছাড়া সাধনা তার আর কোনো যোগ্যতায় বিশ্বাস করে না বলে নয়, সাধনার কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নই তার মনে আসে না। এ শুধু মানসিক বেদনা বোধ, শোক দুঃখ আতঙ্কের মতোই বাস্তব কিন্তু চিনে জেনে নেবার মতো স্পষ্ট নয়।

নিজের জন্য খানিকটা পায়েস তুলে রেখে সাধনা পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তাকিয়ে যায় আশার দিকে।

ভাত চড়িয়ে আশা তরকারি কুটছিল, সঞ্জীবকে তার অপিসের ভাত বেঁধে দিতে হয়। কত সমারোহ ছিল তার রান্নার, সে সব আজ চুলোয় গেছে। ধার করে করে সঞ্জীব তাকে আরামে বিলাসে রেখেছিল, আজ সে নিরাভরণা হয়ে দিন কাটায়, একটার বেশি তরকারি রাঁধে না।

মাছ খায় একবেলা, সপ্তাহে একদিন কী দুদিন।

আশাকে পায়েসের ভাগ দিতে ইচ্ছা হয় সাধনার কিন্তু সাহস পায় না। আশা হয়তো অপমান বোধ করবে !

পুকুরপাড় ঘুরে সাধনা যায় উদ্‌বাস্তু কলোনিতে। আজকাল ওখানে যাতায়াত তার বেড়েছে। দুর্গার নতুন সংসারটা দেখে আসবার আগ্রহটাই তার সবচেয়ে প্রবল। পঁচিশ টাকায় পার করা মেয়ে, তারই কাছে ভোলার মার মাকড়ি বাঁধা রেখে জোগাড় করা পঁচিশ টাকা !

আজও ভোলার মা মাকড়িটা ছাড়িয়ে নিতে পারেনি।

দুর্গা বলে, আসেন দিদি, বসেন।

পায়েস দেখে বলে, ওমা ! নিজের হাতে পায়েস আনছেন ? আমারে ক্যান ডাইকা পাঠাইলেন না দিদি, গিয়া নিয়া আইতাম ?

তাতে কী, আমি নিয়ে এলে দোষ আছে কিছু ?

না না, দোষের কথা কই নাই।

বিয়ের পরেও দুর্গার চুলের আধা রুক্ষতা অদৃশ্য হয়নি। নিরুপায় নিরাশ্রয় এক মানুষের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়ের অনুষ্ঠানের মারফত এসেছে আরেক নিরুপায় মানুষের ঘরে, একরাশি চুলে তেলের কমনীয়তা সে কোথা থেকে কী দিয়ে কেমন করে আনবে ! সাধনা ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি যে রাখালের বেকারত্ব তার চুলেও ক্রমে ক্রমে রুক্ষতা এনে দিচ্ছিল—রান্না করার এবং মাথায় দেওয়ার দুটো তেলের শিশিই খালি দেখে তাকে তখন হিসাব করে বেছে নিতে হত কোন তেলটা আনতে হবে।

মুখের শুকনো ভাবও ঘোচেনি দুর্গার। মনের আনন্দ আর আহ্লাদে বুঝি এ শুকনো ভাব ঢাকা পড়বারও নয়, অতি বাস্তব অভাবের এটা সৃষ্টি তবে শুকনো মুখেও তার ঘনিয়ে আছে একটা সুখের উত্তেজনা, চাউনি হয়েছে আরও ঘন ও গভীর।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, বিষ্ণু ঘরে নেই ?

ওই ব্যাপারে গেছে।

ব্যাপার জানে সাধনা। এই জমি থেকে ছোটো কলোনিটা উৎখাত করার একটা অপচেষ্টা চলেছে। জমিটা প্রভাত সরকারের। তার প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়িটার গা ঘেঁষে বহুকাল জঙ্গল হয়ে পড়েছিল জমিটা, কোনোদিন কারও কোনো কাজেই লাগেনি। সামান্য কিছু খাজনার বিনিময়ে আশ্রয়হীন মানুষগুলিকে জঙ্গল সাফ করে কাঁচা ঘর তুলে বাস করতে দেবার প্রস্তাব সে খুশি হয়েই গ্রহণ করেছিল। সিকি মাইল তফাতে নাগদের মাঠে হোগলার ঘরের যে প্রকাণ্ড কলোনিটা গড়ে উঠেছে, সেখানকার বাসিন্দাদের নিজেদের সমিতি আর স্থানীয় উদ্‌বাস্তু সমিতি মিলিতভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। ওই কলোনির বাড়তি লোক আর নবাগত কয়েকটি পরিবার এখানে এই ছোটো কলোনিটি গড়েছে।

জঙ্গল ঢাকা পোড়ো অব্যবহার্য জমিটাকে চোখের সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ছোটো ছোটো ঘর উঠে ছবির মতো রূপ নিতে দেখে প্রভাতের মাথায় কে জানে কী এক নতুন পরিকল্পনা এসেছে জমিটাকে অন্য কাজে লাগাবার, এখন সে কলোনির বাসিন্দাদের তুলে দিতে চায়। অনেকটা দূরে, শহরতলির প্রায় শেষ প্রান্তে আর একখণ্ড জমি সে এদের দেবে, নিজের খরচে ঘরগুলি সেখানে সরিয়ে দেবে।

সে জায়গাটা ভালো নয়। জমিটা রাস্তার ধারেই বটে এবং রাস্তার এ ধারে কয়েকখানা ঘরবাড়িও আছে, কিন্তু জমিটা শুধু নিচু মাঠ আর জলা, খানিক তফাতে রেললাইন।

কলোনির লোকেরা ওখানে উঠে যেতে রাজি হয়নি।

এই নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে।

দুর্গার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কলোনির নানাবয়সি কয়েকটি মেয়ে বউ এসে দাঁড়ায়। এদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিচয় ঘটেছে।

সকলের সঙ্গে সে আলাপ করে। ভুবনের বউ রাজু প্রায় সমবয়সি, তার কাছে খবর নেয় ভুবনের কাজ হয়েছে কিনা। দীনেশের ষাট বছরের বুড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করে, দীনেশের বউ পদ্মর জ্বর কমেছে কিনা। তেরো বছরের তুলসীর কাছে জেনে নেয় তার মা কী করছে। এই সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে করতে উঠে পড়ে কলোনি থেকে তাদের তাড়াবার চেষ্টার কথা।

দীনেশের বুড়ি মা বলে, আমাগো মইরাও শান্তি নাই !

সাধনা বলে, সত্যি, এ কী অন্যায় জুলুম !

এদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথায় মেতে গিয়ে সাধনা ভুলে যায় যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে বলে সে রাখালের কাছে ছেলেকে রেখে এসেছে।

আধঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যায় তার বাড়ি ফিরতে।

বাড়ি ফিরে দ্যাখে, তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাসন্তী গল্প করছে শোভার সঙ্গে, রাখাল বেরিয়ে গিয়েছে।

বাসন্তী বলে, বাঃ ভাই, বেশ ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? যা রাগটা রেগেছে তোমার কর্তাটি !

ছি ছি, কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গিয়েছি !

বেশ করেছ। রোয়াকে বসে গম ঝাড়ছি, মুখ অন্ধকার করে রাখালবাবু তোমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হাজির। গম ঝাড়ছি দেখে বললেন, ও, আপনিও কাজে ব্যস্ত ! আমি বললাম, এ কাজ দুঘণ্টা বাদে করলেও চলবে, ও বেলা করলেও চলবে, কী বলবেন বলুন না ? বললেন তোমার কথা— আসছি বলে ছেলেকে গছিয়ে দিয়ে তুমি নাকি ভেগেছ, উনি বেরোতে পারছেন না। আমি বললাম, আমার কাছে রেখে যান না খোকাকে ? বললে তুমি বিশ্বেস করবে না ভাই, ছেলেটাকে দড়াম করে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। আমিই যেন অপরাধ করেছি ! খোকা বেচারা কেঁদে যায় আর কী, কত কষ্টে যে ঠান্ডা করেছি তোমার ছেলেকে।

রসিয়ে রসিয়ে কথা কইতে বড়ো ভালোবাসে বাসন্তী। কথা বলার এমন একটা নাটকীয় উপলক্ষ পেয়ে তার যেন খুশির সীমা নেই। এতক্ষণ বোধ হয় সবিস্তারে শোভার কাছে বিবরণ দিচ্ছিল, সাধনা এসে পড়ায় আরেকবার বলার সুযোগ পেয়েছে।

পরনে তার বেনারসি, জর্জেটের ব্লাউজ ! দেয়ালের ও পাশ থেকে একই বাড়ির একদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একদিকের দরজা দিয়ে এ পাশে আসবার জন্য সে বেনারসি শাড়ি আর জর্জেটের ব্লাউজ পরেনি, এই দামি জামা কাপড়ে রানি সেজেই সে কুলো দিয়ে রেশনের গম ঝাড়ছিল।

রাজীবের জেল ঠেকাতে আর নতুন করে ব্যাবসা গড়ে তুলতে সে শুধু জমানো টাকা আর গায়ের গয়নাই দেয়নি, তার জন্য কাপড় কেনা নিষেধ করে হুকুম জারি করেছে।

দামি দামি ভালো ভালো শাড়ি জমেছে অনেক, সর্বদা পরে পরে সেগুলি সে ছিঁড়ছে। অসময়ে তার জন্য কম দামি কাপড় কেনার পয়সা খরচ করারও দরকার নেই রাজীবের।

বলে, দুবছর চালিয়ে দেব।

রাজীবের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য। দেশ জুড়ে কাপড়ের হাহাকারের জন্য যদি তার এই সিদ্ধান্ত হত যে যারা উলঙ্গিনি হতে বসেছে তারা যতদিন কাপড় না পায় আমি একখানা কাপড়ও কিনব না, তাঁতের রংবেরঙের শাড়ি থেকে জর্জেট বেনারসি পর্যন্ত জমানো শাড়িগুলি আটপউরে কাপড়ের মতো ঘরে পরে ছিঁড়ে প্রায়শ্চিত্ত করব এতদিন কাপড়-চোরদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য !

সাধনা ভাবে, এ সব কথা কি উঁকিও মারে না বাসন্তীর মনে ?

সাধনা কিনা সদ্য সদ্য ঘুরে এসেছে উদ্‌বাস্তু কলোনি থেকে নিজের চোখে দেখে এসেছে মেয়েরা সেখানে কী দিয়ে কীভাবে লজ্জা নিবারণ করছে, জেনে এসেছে মালতী কেন আজ তিনদিন ঘর থেকে বার হতে পারে না—বেনারসি পরা বাসন্তীকে দেখে কথাটা তাই তার জোরের সঙ্গে মনে পড়ে। স্বামীর জন্য—বিপদগ্রস্ত স্বামী যাতে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সামলে সুমলে নিতে পারে, আবার ফিরিয়ে আনতে পারে সোনার গয়না আর জর্জেট বেনারসি কিনে দেবার সামর্থ্য— বাসন্তীর পণ শুধু এই জন্য !

মোটাসোটা আঁটোসাঁটো ফরসা সুন্দরী স্বামী সোহাগিনি বউ। স্বামী বই সে জানে না !

পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টারও বেশি দেরি করে ফেলায় নিজেকে সত্যই অপরাধিনী মনে করে দ্রুতপদে সসংকোচে সাধনা বাড়ি ফিরেছিল। ভাববার চেষ্টাও করেছিল কীভাবে কী বলে ক্রুদ্ধ রাখালের কাছে কৈফিয়ত দেবে।

বাসন্তীর কাছে রাখালের কীর্তিকাহিনি শুনতে শুনতে তার মুখে মেঘ নেমে আসে।

তবু সে চুপ করে থাকে।

তার চুপ করে থাকা আর তার মুখের কঠিন ভাব ভড়কে দেয় বাসন্তীকে। সে একটু শঙ্কিত ভাবেই দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ রকম কী করতে আছে ভাই ? কিছু হয়েছে নাকি ? তা যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভাবনা নেই। যতই রাগ হয়ে থাক, ফিরে আসতে আসতে রাগ অনেকটা

জুড়িয়ে যাবে। যা ঘটেছিল বললেই তখন মিটে যাবে ব্যাপার। বরং উলটো তুমিই ভাই একহাত নিতে পারবে মানুষটাকে, বলতে পারবে, এখুনি আসব বলে গেলাম আর ফিরলাম না, একবারটি দেখতে হয়তো বিপদে আপদে পড়েছি নাকি, কী হল আমার ? ডাকাতে ব্যাংক লুঠছে, একটা মেয়েছেলেকে একলা পেয়ে—

তুমি আর পেনিও না। দিনের বেলা দশজনের মধ্যে কী আবার হবে ? কলোনির ওদের সাথে কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে, কী করা ? তাই বলে এ রকম গালাগালি করবে ! আমি শুধু ছেলে আগলে থাকব, আমার অধিকার নেই আধঘণ্টা বাইরে থাকার ? চাকরি তো নয়, দোকানে যাবে। একটু দেরি করে দোকানে গেলে কি পৃথিবী রসাতলে যেত ? ভারী তো বিড়ির দোকান !

সাপের ফণা তোলার মতো মুখ উঁচু করে বাসন্তী বলে, ছি, ভাই, ছি ! যার থেকে ভাতকাপড় তাকেই তুমি অমন তাচ্ছিল্য কর ! বিড়ির দোকান বলে তোমার ঘেন্না ! আমি তো বিড়িওয়ালার বউ, আমায় তবে নিশ্চয় ঘেন্না কর !

সাধনা বিপাকে পড়ে নরম সুরে বলে, আমি তাই বলেছি ? তোমার সব উলটো মানে। আপিস তো নয়, নিজেদের দোকান, আধঘণ্টা দেরি করে গেলে কী হয় ! আমি যে এদিকে খেটে মরছি, আমার ছুটি চাই না ? আমি আধঘণ্টা ছুটি নিলেই দোষ ?

বাসন্তী গালে হাত দেয়। তুমি থেকে একেবারে তুই-এ নেমে আসে। বলে, ছুটি নিয়েছিস ? ছুটি ? তোর নিজের সোয়ামি, নিজের ঘর সংসার, তোরই সব, তুই আবার ছুটি নিবি কাব কাছে ?

সাধনা একটু হাসে, তা বইকী, আমারই সব, আমিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলে তাই মেজাজে আগুন ধরে যায় !

হাওয়া খেতে গেছিলি ? বলে গেছিলি, আমি আধঘণ্টা হাওয়া খেতে গেলাম ? কাজে বেরোবে মানুষটা, একটু ধরো বলে ছেলেকে চাপিয়ে দিয়ে গেলি উধাও হয়ে ! রাগ তো করবেই মানুষটা, একশোবার করবে। নিজেই তো বুঝিস রাগ করবে। নিজেই তো তুই ইচ্ছে করে রাগিয়েছিস !

বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায় থমথম করে বাসন্তীর মুখ। এ পর্যন্ত কখনও সাধনা তার এ রকম ভাবান্তর ঘটতে দেখেনি। কড়া সুরে বাসন্তী বলে, ওই এক ধুয়া উঠেছে শুনি, আমরা নাকি দাসী বাঁদি। যতই সুখে রাখুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানি ! ওনারাই কত্তা, মালিক, খুশি হলে মাথায় রাখেন খুশি হলে পায়ের নীচে মাড়ান। এমনি হই বা না হই, আসলে দাসী বাঁদি ! এ আসল আবার কীরে বাবা ! বেশ তো, দাসী হলে দাসী বাঁদি হলে বাঁদি—তাই যদি রীত হয় সংসারের, তাই সই ! তা নিয়ে মাথায় ঘা করে আর করছি কী ? কিন্তু সব নাকি ওনাদের খুশিতে হয় ! আমরা কি না পুতুল, ওনাদের হুকুমে উঠি বসি, খুশি অখুশি খাটাই না মোটে ! এমন ছিষ্টিছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখিনি ভাই ! সবাই আমরা খুশি খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কায়দায় আমরা জোর খাটাই।

আশার দিকে চেয়ে বাসন্তী লজ্জার সঙ্গে হাসে, আশাদি চুপ করে শুনছেন, আমি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।

আশা সত্যই এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি।

আগেও সে কম কথা বলত, বেকারের বউ সাধনার সঙ্গে এক রকম ভালোমন্দ কোনো কথাই বলত না। তার এই অবজ্ঞায় কীভাবেই যে মাঝে মাঝে জ্বলে যেত সাধনার গা, এমন একটা উগ্র ইচ্ছা জাগত গায়ে পড়ে আশাকে অপমান করবার।

কিন্তু সে আশা আর নেই।

এখন সে মনের দুঃখে চুপচাপ থাকে এটা জানা থাকায় তার নীরবতায় কেউ ক্ষুণ্ণ হয় না। আগে সে চলত দূরত্ব বজায় রেখে, আজকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

বাসন্তীর কথা শুনে আশা বলে, আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

খুব বকবক করি, না ?

তাতে কী, প্যানপ্যান তো করেন না। একজন কম একজন বেশি কথা কইবে, তাই তো উচিত।

সাধনা ভাবে, এতই সামান্য কী তফাতটা ? হুড়মুড় করে দুর্দিন এসে ঘাড়ে চেপেছে দুজনেরই, বাসন্তী বরং অভাবে পড়েছে আশার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা থেকে। বাসন্তী কাতর হয়নি, খানিকটা সামলে নিয়েছে। সে ভুলতে পারে, হাসতে পারে, বকবক করতে পারে। আশা যেন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে, মনের জোরে সর্বদা নিজেকে তার খাড়া রাখতে হয়।

সে নিজে ? তার যখন ছিল দুর্দশা, এরা দুজন ছিল সুখে। আজ এদের অবস্থা গেছে বদলে, তার শেষ হয়েছে অসহ্য অভাবের দিন। নিজে সে বদলায়নি ?

৪

বর্ষা আসি আসি করছে।

এলে বাঁচা যায়। গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষের।

প্রতিবারই মনে হয়, এবারেব গবম বুঝি আর সয় না। কিন্তু এ যেন শুধু কথা ফেনিয়ে বলার মতো বাড়িয়ে মনে হওয়া। কে না জানে যে গরম প্রতিবারই অসহ্য মনে হয় কিন্তু দিব্যি সয়ে যায় মানুষের, ফ্যানের বদলে যাদের শুধু ভাঙা হাত পাখা সম্বল, তাদের আরও সহজে।

এবার কিন্তু সত্যই অসহ্য হয়েছে। নতুন রকম ভীষণ রকম গরম পড়েছে বলে নয়, জীবনটাই অনেক নতুন আর বাড়তি শোষণে সহ্যশক্তিতে ভাঁটা পড়িয়ে দিয়েছে বলে। বেঁচে থাকাটাই এমন ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গরমের কষ্টটা মনে হচ্ছে প্রকৃতির ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের মতো !

গরমকে এয়ার কন্ডিশন্‌ড্ করার স্বাদটা এ পাড়ার কয়েকজনের চোখে দেখা আছে। কয়েকটা সিনেমায় বাস্তবকে মার্কিনি আর খানিকটা ব্রিটিশ ধরনে উড়িয়ে দেবার প্রচারের সঙ্গে ঘণ্টা দুই গরম দেশে গরমকালে সর্বাঙ্গীণ শীতলতা ভোগ করতে দেওয়া হয়।

সাধনা বাসন্তী বা আশারা কেন, বাসন্তীর ঝি বকুল পর্যন্ত অনেকবার এ ঠান্ডা সহ্য করেছে !

ঝির কোলে মেয়েকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশে বসিয়ে বাসন্তী সিনেমা দেখত। যাত্রা থিয়েটার দেখতে যাবার স্বদেশি সেকেলে ফাশনকে সে বিদেশি সিনেমায় যাওয়া পর্যন্ত টেনে এনেছিল।

এখন অবশ্য সে সিনেমাব নেশা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, বকুলকেও ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দুঃখের দিনে সিনেমায় গিয়ে দুদণ্ড দুঃখ ভুলে থাকা যায়, অভাবের অনেক জ্বালা থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য গরিবেরাই বেশি সিনেমা দ্যাখে—এ সব কথার মানে বোঝে না বাসন্তী। কেন রে বাবা, এত খাতির করা কেন দুঃখকে ? আনন্দ করার জন্য নয়, দুঃখকে একটু এড়িয়ে যাবার জন্য সিনেমায় যেতে হবে ?

সিনেমা ছাড়ার চেয়ে বকুলকে ছাড়তেই বরং তার কষ্ট হয়েছে ঢের বেশি।

বকুল কেঁদেকেটে অনর্থ করে বলেছিল, মোকেও শেষে ছাঁটাই করলে মা ? এত বছর খাটছি তোমার সংসারে ?

বাসন্তীও কেঁদে ফেলেছিল।—আমরাও যে ছাঁটাই হয়েছি বাছা ? তোকে পুষব কী করে ? মাসে তুই দুবার তিনবার মাইনে নিয়েছিস, একবার দেবার সাধ্যি যে আমার ঘুচে গেছে লো হারামজাদি !

আমি এক টুকরো মাছ খেলে তুই দু-টুকরো খেতিস, আমায় যে ডাল দিয়ে ডালের বড়া দিয়ে চালাতে হচ্ছে মা ?

কেঁদোনি মা। পায় পড়ি তোমার। ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও মোকে, তুমি কেঁদোনি। আচ্ছা মা, এমন ছিষ্টিছাড়া অঘটন কেমন করে ঘটল বলো দিকিন, কে ঘটাল ? এতকালের চাকরানিটাকে বিনে মায়নায় ভাতকাপড়ে রাখতে পারবে না, এমন দশা কেন হল তোমার ? সারা দেশে কি শনির নজর পড়েছে ?

স্বাধীন হতে গেলে এ রকম হয়।

স্বাধীন হইনি তবে ? স্বাধীন হলে কী হবে ? তুমি ফের রাখতে পারবে মোকে ?

আবার হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বকুল বলেছিল, কবে তবে আমরা স্বাধীন হব মা ? কবে সেদিন আসবে মা ?

পরনে তার বাসন্তীরই সাতাশ টাকা দামের পুরানো একটা তাঁতের শাড়ি। প্রায় নতুন শাড়িটা। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল বকুল। সাতমাসের অকাল প্রসবের রক্তে ভেসে গিয়েছিল তার ছাপা শাড়িটা, মাস তিনেক আগে বাসন্তীই একটি মাসও আর টিকবে না বলে সংকোচের সঙ্গে যে শাড়িটা তাকে দান করেছিল।

বাসন্তী ব্যবহার করলে একমাসেই ছাপা শাড়িটা ছিঁড়ে ফেঁসে যেত সন্দেহ নেই, তিন-চারদিন পরে পরেই সে লন্ড্রিতে সাফ করতে দিত শাড়িটা। বকুল তিনমাস একটানা ব্যবহার করেছে, দু-এক জায়গায় সামান্য মোটা সেলায়ের চিহ্ন পড়া ছাড়া কোথাও একটা নতুন ফুটো, পয়সাব মতো ফুটোও হয়নি শাড়িটাতে।

কাপড়টা খুলে ফেলে সাতাশ টাকার তাঁতের শাড়িটায় জড়িয়ে বকুলকে পাঁজাকোলে তুলে এনে তার দামি পাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

ডাক্তার ডেকেছিল ষোলো টাকা ভিজিটেব।

অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল পাড়ার একজনের গাড়িতে সাত টাকা ভাড়া দিয়ে। ভাড়া হিসাবে নয়, পেট্রোলের দাম হিসাবে প্রভাত নির্বিকার চিত্তে সাত টাকা আদায় করেছিল। তবু, তার নামটা বাসন্তী প্রকাশ করে না।

বকুল ঝির জন্য তার শোকটা আন্তরিক। নিজেই আজ সে ঘর ঝাঁট দেয় বাসন মাজে বলে নয়। এ সব সে করছে নিজের খুশিতে রাজীবের আপত্তি উপেক্ষা করে, গায়ের জোরে।

রাজীব বলে, একটা ঠিকে ঝি রাখতে পারি না ভেবেছ নাকি ?

বাসন্তী বলে, তুমি আর কথা কোয়ো না। পার্টনার যাকে বোকা পেয়ে পথে বসায় তার মুখে আবার কথা ! নবাবি যখন করতে হয় আমিই করব, তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না ! বুঝলে ?

লোলুপ চোখে রাজীব তাকে দেখে। একযুগ ধরে তার প্রেমে ভাটা পড়ল না, দিনদিন যেন নেশার মতোই চড়ছে।

মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে বাঁকা চোখে বাসন্তী তাকিয়ে নেয়।

ঠিকে ঝিদের ঝাঁটা মারি। যেদিন পারব আবার বকুলকে রাখব।

লোকের বাড়ি ঝি আসে, ঝি চলে যায়—আগে বাসন্তী বুঝতে পারত না এ ব্যাপারের মানে। এখন খানিকটা টের পেয়েছে, বকুলকে ছাড়িয়ে দেবার পর।

ঝি পুরানো হওয়া আজকাল অসাধারণ ব্যাপার। পুরানো দিনের মতো আদর দিয়ে আপন করে সে ঠিকে ঝি বকুলকে এত বছরের পুরানো করেছে, কিন্তু সেটা আজ কজন পারে ? সে নিজেও আজ পারছে না।

গিন্নিদের আর ঝিদের মধ্যে শুধু পয়সা আর খাটুনি লেনদেনের চাঁছাছোলা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। দোষ কোনো পক্ষেরই নয়। নিজেদেরই জোটে না গিন্নিদের, তিন বাড়ি খেটে ঝিদের ভরে না পেট।

সাধনাকে সে বলে, তাই বটে ভাই। অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট। ঝিরা টিকবে কীসে ? ছাঁকা মাইনে, বাঁধাধরা ছাঁকা কাজ, দুটো মিষ্টিকথা পায় না। ঝিকে মিষ্টিকথা মানুষ বলবেই বা কোন ভরসায় ? আজ এটা কাল ওটা চেয়ে বসবে—দেবার সাধ্যি কই ? ছাঁকা মাইনে দিয়ে রাখতে পারলে আমি কি বকুলকে ছাড়াই ! না চাইতে এটা ওটা কত কী পেয়েছে, দুটো একটা টাকা যখন তখন চেয়ে নিয়েছে, মাইনে থেকে কখনও কাটিনি। আজ কোন মুখে শুধু মাইনেটা ধরে দেব ?

যা বোঝে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বাসন্তী, যেটুকু বোঝে সহজভাবে সোজাসুজি বোঝে। তার এই সহজ বাস্তববোধ মাঝে মাঝে বিচলিত করে দেয় সাধনাকে।

অভাবে তারও স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। চাকুরে স্বামীর সঙ্গে যে উগ্র ব্যবহার কল্পনাতেও আনতে পারত না, স্বামীটি বেকার হতেই তার চেয়ে বেশি উগ্রচণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অভাব আশাকে করে দিয়েছে ঠিক তার বিপরীত—নির্জীব নির্বাক মূর্তিমতী হতাশার মতো।

অথচ কত সহজভাবে বাসন্তী মেনে নিয়েছে অভাবকে !

কত অনায়াসে বাতিল করে দিয়েছে আগের দিনের জের অতীত সুখের জাবর কেটে দুঃখ দুর্দশাকে আরও বেশি অসহ্য করা। সেই বাসন্তী বিশেষ কাবু না হয়েই রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে—মেয়েকে রাখে ; রানির মতো যার আলস্য উপভোগের ঢং দেখে সেদিনও গা জ্বলে গিয়েছে সাধনার !

কিন্তু কেন ? কেন বাসন্তীর পক্ষে এটা সম্ভব হল ? সে যা পারেনি, আশা যা পারছে না, বাসন্তী কেন তা পারবে ?

এ প্রশ্নের জবাব সাধনা পায়। বাসন্তীর কাছেই পায়।

কিছুদিন পরে বাসন্তীর চোখে মুখে সে দেখতে পায় ক্লেশের ছাপ, ক্লান্তির চিহ্ন। তার পরিপুষ্ট সর্বাঙ্গের অত্যধিক লাবণ্য ধীরে ধীরে খরচ হয়ে যাচ্ছে টের পাওয়া যায়।

এই তবে আসল মানে বাসন্তীর এত সহজে এত অনায়াসে দুঃখকে বরণ করার ? জীবনীশক্তি সে সঞ্চয় করেছিল অনেক, তার বা আশার যে সুযোগ কোনোদিন জোটেনি।

জমানো গয়না জমানো টাকা দিয়ে সে স্বামীকে উদ্ধার করেছে বিপদ থেকে। জমানো স্বাস্থ্য আর অনাহত আনন্দ ভরা মন নিয়ে নেমেছে অভাবে সঙ্গে লড়াই করতে।

তাজা দেহ তাজা মনকে ক্ষয় করার সুযোগ পেয়ে বাসন্তী সতেজে খাড়া থাকতে পেরেছে। তাদের মতো আগে থেকেই ওর দেহ আর মনের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়নি।

তাই সা [illegible] ক।

ওই গরম সহ্য হওয়া আর অসহ্য হওয়ার মতো একই ব্যাপার। জীবনীশক্তি বজায় থাকলে গ্রীষ্মও যেমন সয়, দুঃখও তেমনি সহজে কাবু করতে পারে না মানুষকে। বাসন্তী মোটাসোটা মানুষ, গরমে তবু তাদের চেয়ে তার কষ্ট হয়েছে কম।

অভাব তাকে কাবু করতে পারছে না এখনও।

দুজনের অতীত জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে মনে সাধনা থ বনে থাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে আগে নয়, রাখালের চাকরি যাবার পর সম্প্রতি তারা দুঃখের স্বাদ পেয়েছে। আগে নাকি তারা সুখে ছিল ! আজ এমনই চরম দুরবস্থা যে তুলনার ফাঁকিতে এই পরম মিথ্যাটাও সত্যের মতো মনে হয়।

অভাব ছিল না কবে ? কেরানির মেয়ে কেরানির বউ সে আর তার মতো অন্য সকলে কবে জেনেছে প্রাচুর্যের স্বাদ, কবে মুক্ত থেকেছে আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার আবহাওয়া থেকে ? কোনোমতে বেঁচে থাকাটাই চিরদিনের অভ্যাস, দেহমনের সর্বাঙ্গীণ ঘাটতিই চিরন্তন প্রথা—অবনতি হতে হতে চাকরি গিয়ে রাখাল বেকার হয়ে পড়ামাত্র একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হওয়ায় মনে হত সুদিনই ছিল বুঝি আগেকার কোনোমতে টিকে থাকার দিনগুলিও !

বাসন্তী এতকাল এড়িয়ে এসেছে এই অপূর্ণতার চাপ। পিছিয়ে সে আছে অনেক দিক দিয়ে, যে সব বিশ্বাস ধারণা সংস্কারকে বাতিল করে দিয়ে তাদের মতো মানুষেরাও এগিয়ে গেছে এখনও সেসবের গুদাম হয়ে আছে তার মনটা, কিন্তু জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির অভাব সে জানেনি, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন সংঘাত বাধেনি তার পিছিয়ে পড়া জীবনের।

এই পর্যন্তই ভাবতে পারে সাধনা। বাসন্তীর সঙ্গে নিজের এই একপেশে অসম্পূর্ণ তুলনা তাকে উন্মনা করে দেয়, ঈর্ষা মেশানো বিষাদ আর নৈরাশ্য জাগায়।

এত দাম জীবনে প্রাথমিক মোটা প্রয়োজনগুলির ? জীবনকে রসালো আনন্দময় করার জন্য এত জরুরি এই ভিত্তি শক্ত করে গাঁথা ?

অনভ্যস্ত টানাটানি আর অবিশ্রান্ত খাটুনি যেন রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর নতুন এক ধরনের প্রণয়লীলা ! তাদের স্থূল অমার্জিত ঘন গাঢ় রসালো প্রণয়ের যেন নতুন একটা পর্যায় আরম্ভ হয়েছে অভাবের দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে। বিলাসব্যসন ত্যাগ করে রান্না করা বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়ায় মেতে গিয়ে রাজীবকে যেন আবার নতুন করে জমিয়েছে বাসন্তী।

দুজনের হাবভাব কাবু করে দেয় সাধনাকে !

মুখে শ্রান্তির ছাপ পড়েছে বাসন্তীর কিন্তু রসে আহ্লাদে প্রাণটা যেন তার থইথই করছে !

তার কাছে গোপন করে না বাসন্তী। নালিশ জানায়। মনের মানুষের সোহাগের বন্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে সখীর কাছে দম নেবার অবসরটুকুতে থমথমে আনন্দের ভঙ্গিতে নালিশ করে !

বুড়ো বয়সে এমন করে পিছনে লেগে থাকে ভাই ! কষ্ট করছি দেখে সোহাগ বাড়িয়েছেন ! জ্বালাতন হয়ে গেলাম।

জ্বালাতন বইকী !

ঈর্ষা থেকে আসে আত্মগ্লানি। স্থূল অমার্জিত জীবন ? ওদের সারা বাড়ি খুঁজে রামায়ণ মহাভারত আর দু-একখানা সতীর অমুক সতীর তমুক ছাড়া বই মেলে না একখানা ? চিঠি লিখতে বসলে কলম ভাঙার উপক্রম হয় বাসন্তীর ?

কী এসে গিয়েছে তাতে ওদের !

আর কী লাভ হয়েছে তাদের বই মাসিকপত্র খবরের কাগজ পড়ার সাধ আর চিন্তা করার সাধ্য থেকে, কিঞ্চিৎ সভ্যতা ভব্যতা আর মার্জিত রুচি থেকে !

অভাব অনটন পর্যন্ত ওরা তলিয়ে দিয়েছে স্থূল আনন্দ আর উন্মাদনায়।

আর অভাব মিটে গেলেও তাদের জীবন হয়ে আছে নিরানন্দ প্রাণহীন একঘেয়ে দিন কাটানো।

বাস্তব দুঃখের সঙ্গে সখীর এই অবাস্তব বাকচাতুরি আর ছেলেখেলা কোথায় ভাবিয়ে তুলবে সাধনাকে, তার বদলে তার জাগে ঈর্ষা আর খেদ।

বহুকাল ধরে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তারা কী হয়েছে আর সদ্য সদ্য দুঃখের সঙ্গে পরিচয় শুরু হওয়ায় বাসন্তীরা কী হয়েছে—তারই মধ্যে সে করছে তুলনা !

দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়েও সে যে ভেঙে পড়ার উপক্রম করেছিল রাখালের বেকারত্বের ধাক্কায়, সে অভিজ্ঞতা না নিয়েই যে বাসন্তীকে শুরু করতে হয়েছে দুর্দিনের যাত্রা এটা খুব সরল সহজ বাস্তব হিসাব।

কিন্তু এটা মনেও আসে না সাধনার।

সে ভাবে না যে সঞ্চিত বাড়তি শক্তি তো বাসন্তীর শেষ হয়ে যাবে দুদিনেই, কীসের জোরে তখন সে বইবে অনভ্যস্ত দুর্দশার বোঝা ?

ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি দাইগিরি করেও বঞ্চিত সংকুচিত অপূর্ণ জীবনকে প্রেম দিয়ে রস দিয়ে কাব্য দিয়ে আনন্দময় করার চিরন্তন উপদেশটাই হাতেনাতে সবে পালন করতে শুরু করেছ বাসন্তী। ক-দিন আর লাগবে ফাঁকিটা প্রকট হতে ?

ইতিমধ্যে বাসন্তীদের নীচের তলায় একদিন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটে—প্রৌঢ়বয়সি চরণ দাস। হরেকৃষ্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ করে। তার স্ত্রী রাধা কালো এবং রোগা, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আসে রাধার বিধবা বুড়ি মা আর আঠারো উনিশ বছরেব ভাই গৌর। সেও ওই কারখানায় ঢুকেছে চরণের চেষ্টায়।

নীচের তলাটা যেন হঠাৎ মানুষে আর কলরবে ভরে যায়। দুখানা ঘরে এতগুলি মানুষ !

বাসন্তী কল্পনাও করতে পারে না।

বাড়িভাড়া প্রায় তিন ভাগের দু ভাগ কমিয়ে দেবার জন্য বাসন্তীই উৎসাহী হয়ে তার সংসারটা গুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেড়খানা ঘর আর খোলা ছাতটুকুতে।

ভাড়াটে বাহিনী দেখে তার সত্যি সত্যি রাগের সীমা থাকে না।

তোমাব এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আর তুমি ভাড়াটে পেলে না ?

রাজীব ভড়কে গিয়ে বলে, কেন কী হল ? কোনো হাঙ্গামা করেছে নাকি, বজ্জাতি ?

ওবা এতগুলি লোক আমায় জানালে না কেন ?

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আমি কী জানতাম ? বন্ধু একে জুটিয়ে দিলে, বললে যে লোক খুব ভালো, কোনোরকম গোলমাল করবে না। চরণবাবুকে শুধিয়েছিলাম ওরা লোক কজন, কী বিত্তান্ত। তা আমায় বললে যে স্বামী-স্ত্রী আর কটি ছেলেপিলে।

বাসন্তী ঝংকার দিয়ে বলে, তবে তো খুব ভালো লোক, গোড়াতেই মিছে কথা বলেছে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও জোটে তেমনি।

তা, ওরা লোক বেশি তো আমাদের কী এমন অসুবিধে ?

আহা মরি, যা বলেছ ! নীচের তলায় হাট বসালে, আমাদের কী অসুবিধে ! আমি থাকব না এখানে, তুমি অন্য বাড়ি খোঁজ করো।

অনেকদিন বাদে আজ রেগেছে বাসন্তী, রাগ করে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলেছে।

কোঁদল করা নয়। আগের মতো কোঁদল করতে বোধ হয় ভুলেই গেছে বাসন্তী। তবু তার কাছে একটা মুখ ঝাম্‌টা পেয়ে রাজীবের খুশির সীমা থাকে না।

খুশি হয়ে করে কী, এই সকালবেলাই বাসন্তীর স্থায়ী কড়া হুকুম অগ্রাহ্য করে বাজার থেকে প্রায় সোনার মতোই দুর্মূল্য আস্ত একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আসে !

খুশি হলে হোক। নইলে এই নিয়ে ঝগড়া করুক। রাজীবের মনটা ছটফট করছে বাসন্তীর কোঁদলের স্বাদ পাওয়ার জন্য।

মাছ দেখে বাসন্তী মুখ বাঁকিয়ে, আড়চোখে তাকায়। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে !

রাজীব কৃতার্থ হয়ে যায়।

ঘুষ দিচ্ছ ? এত বড়ো মাছটা যে আনলে, কে খাবে ? তিনবেলা করব আমি—কাল বাসি মাছ খাওয়াবো।

মাছ খাওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি তোমার ?

সেই হিসাব ধরেছ ? একা একা ভালো জিনিস খেতে বিশ্রী লাগে ?

লাগে না ?

আজকাল আর বিশ্রী লাগে না গো, লাগে না। নিজের জোটে না, পরকে দেব !

মাছ দেখে হেসে ফেলে রাজীবকে কৃতার্থ করেছিল বাসন্তী, হালকা সুরে হলেও শেষ কথাটা বলে সেই আবার তাকে আহত করে।

বাসন্তীর মুখে অভাবের উল্লেখ শুনলেই তার আঘাত লাগে না—এভাবে বলা হলে লাগে !

একটু ম্লান গম্ভীর মুখেই সে দোকানে যায় সেদিন।

দেখে বাসন্তীরও মনটা যায় খারাপ হয়ে !

ধীরে ধীরে সে নীচে নামে।

তফাত থেকে দেখেই নিজের বাড়িতে মানুষের যে ভিড়টা তার অসহ্য ঠেকেছে, সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে সে দেখবে সইয়ে নেওয়া যায় কিনা।

ঘর গুছানো আর রান্নাবান্না নিয়ে তারা ব্যস্ত তখনও ঘরে অনেক জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, রাধা আর তার বড়ো মেয়ে প্রণতি কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগেছে সেই বিশৃঙ্খলার পিছনে।

মালপত্রের মতোই এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে বসে ছড়িয়ে আছে ছয়টি ছেলেমেয়ে-—বড়োটির বয়স দশ-এগারোর বেশি নয় !

প্রণতির বয়স পনেরো-ষোলো হবে।

ঘর গুছোচ্ছেন ?

হ্যাঁ, দেখুন না চেয়ে, কী ঝঞ্ঝাট দিব্যি ছিলাম, কী যে পোকা ঢুকল মাথায়। নিজেব বাড়ি ভাড়া দিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো। কোথায় রাখি এখন এত জিনিস ?

সেটা মিছে নয়। তাকালেই বোঝা যায় জিনিসপত্রগুলি শুধু চরণদাসের একার জীবনে সঞ্চয় করা নয়, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে জমছে। জীর্ণ পুরানো একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য কত জঞ্জালও যে আছে। ফেলতে বোধ হয় মায়া হয়।

আপনাদের নিজেদের বাড়ি ছিল নাকি ?

তবে না তো কী ? কত বললাম, একখানা ঘর অন্তত নিজেদের জন্য রাখো, তাতে বাড়তি জিনিসপত্র থাকবে। তা নয়, সবটা বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলেন।

কোলের ছেলেটি দোলায় ঘুমোচ্ছিল। দোলা টাঙানো হয়েছে সর্বাগ্রে। এমন আচমকা চিৎকার করে ছেলেটা কেঁদে ওঠে যে বাসন্তী চমকে ওঠে।

কী হল ?

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে মুখে মাই গুঁজে দিয়ে রাধা বলে, কিছু হয়নি।

বসতে বলে না কেন কে জানে ! বোধ হয় ভেবেছে, এক বাড়িতে থাকে, দরকার হলে নিজেই বসবে ! ছোটোখাটো রোগা কালো মা-টির জন্য বাসন্তী মায়া বোধ করে, কিন্তু ছেলেমেয়ের পালটি দেখে তার অস্বস্তিরও সীমা থাকে না। দিনরাত এরা হট্টগোল করবে—এইটুকু বাচ্চাটার পর্যন্ত কী গলা ফাটানো কান্না !

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না বাসন্তী।

৫

বাসন্তীও মাঝে মাঝে সাধনার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরোয়।

নীচের তলার হইহই কিচিরমিচির ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না। বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মাঝে মাঝে সে তার সহজ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনার মনের নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার সূত্র ধরিয়ে দেয়।

মল্লিকদের শোভার বিয়ে না হওয়ার রহস্য সে জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেয় সাধনাকে।

মল্লিকদের বাড়ি লোক অনেক। অনেক লোক মানেই অনেক হাঙ্গামা, অনেক কাজ। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন ব্যস্ত আব বিব্রত হয়ে থাকে, অবিশ্রাম খাটে।

বুড়ো রাজেন মল্লিক পেনশন পায়। দুই ছেলে চাকরি কবে, এক ছেলে ডাক্তারি পড়ে, এক ছেলে বখামি করে ঘুরে বেড়ায়, আরেক ছেলে পড়ে স্কুলে। শোভার বড়ো বোনের বড়ো ছেলেটিও এখানে খরচ দিয়ে থেকে কলেজে পড়ে, তার বাবা মফস্বলেব শহরের ডাক্তার। বড়ো ছেলের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, মেজো ছেলের দুটি এবং আরেকটি শিগগির হবে। এ ছাড়াও থুড়থুড়ে একজন বুড়ি থাকে বাড়িতে, শোভার সে পিসিমা, রাজেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

তা ছাড়াও মাঝে মাঝে আত্মীয়কুটুম্ব আসে।

তবে দু-চারদিনের বেশি থাকে না। যাবা আসে তারা নিজেবাই এটা ভালো করে বোঝে যে আজকের দিনে এর চেয়ে বেশি চাপ দিতে গেলে সহ্য হবে না, আত্মীয়তা কুটুম্বিতাব বাঁধন ছিঁড়ে যাবে।

বড়ো মেয়ে মেজো মেয়ে মাঝে মধ্যে দু-একমাস থেকে যায়, খরচ দিয়ে। বড়ো জামাই ডাক্তার, মেজো জামাই মোটামুটি ভালোই চাকরি করে।

ছেলেদের চাকবি-বাকরি পড়াশুনা সবই শহবে। দেশেব সম্পত্তি বেচে দিয়ে রাজেন এই ছোটোখাটো বাড়িটা কিনেছিল। বাড়িটা রাজেনের, শুধু এই একটি সূত্রে বাঁধা হয়ে এতগুলি প্রাণীর জীবনযাত্রা এখানে একত্র হয়ে আছে।

মোটামুটি মিলে মিশেই আছে। ঝগড়াঝাঁটি যা হয় তার চেহারা এখনও পারিবারিকই বটে। বড়ো স্বার্থের সংঘাত ঘটবার কারণ এখনও ঘটেনি।

রাজেন পেনশন পায়, বাড়িটাও তারই।

কিন্তু ভাঙন ঠেকাবে কে ? কাল যা ভেঙে দিতে চায় ? ভাঙনের পোকা কুরে কুরে ক্ষয় করেছে ভিতরে ভিতরে, তলায় তলায়। নজর করলে বাইরে চোখে পড়ে এই ধরনের পাবিবারিক প্রাচীনতা আর জীর্ণতা। অন্ধবিশ্বাসী তবু আশা করে, হয়তো আবও অনেককাল টিকে যাবে !

স্কুল কলেজ আপিস, বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা, অসুখ-বিসুখ পূজাপার্বণ—এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংসারযাত্রায় কোনোরকমে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করতে হয় মেয়েদের। অবশ্য যার যতখানি করণীয় এবং যে যতখানি না করে পারে তারই হিসাবে।

রান্নাকরা বাসনমাজা কাপড়কাচা ছেলেধরা সেলাইকরা—নানাকাজে শুধু হাত লাগাতেই হয় না শোভাকে, নানাকাজ সম্পন্ন হওয়ার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়।

সেই তো শুধু ঝাড়া হাত-পা এ বাড়িতে, জোয়ান বয়সি সুস্থ সমর্থ মেয়ে। শোভাও মনে করে না তাকে বেশি রকম খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অন্যায় ভার চাপানো হয়েছে তার ঘাড়ে। নিজেদের বাড়িতে যতটা পারে খাটবে না মেয়েছেলে, চালু রাখবে না সংসার ?

অনাদর অবহেলা নেই। ডাল তরকারি যদি কম পড়ে যায়, হাঁড়িতে ভাতে টান পড়ে, সেটা শুধু তার একার বেলা নয়, কারও ইচ্ছাকৃত নয়। যে দিনকাল যে ব্যবস্থা রেশনের আব যে দাম কালোবাজারি চালের, পুরুষ আর ছেলেপিলেদের খাওয়ার পর মেয়েদের বেলা ও রকম কম পড়বেই।

তার পাতেই বরং বেশি ভাত দেবার চেষ্টা হয়, বউদি ডালের বাটি কাত করে দেয় তারই পাতে।

সবাই যেমন পরে সেও তেমনি পরে সেলাইকরা কাপড়। বউদিদের চেয়ে বরং তার কাপড়টাই আসে আগে, না চাইতে তার জামার ছিট কিনে আনে ভায়েরা।

শোভার কেন বিয়ে হয় না আবিষ্কারের চেষ্টায় এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাধনা পরিবারটিকে পরীক্ষা করেছে।

বাসন্তী বলে, ওমা, তা আনবে না ? মায়ের পেটের বোন, বাপ বেঁচে রয়েছে, ছেলেপিলের জামার ছিট এনে সেলাই করিয়ে নেবে শুধু ?

তাই বটে। ছিট শুধু শোভার একার জন্য আসেনি, শুধু নিজের জামাটিই সে সেলাই করবে না !

চা করে বড়ো বউ নিজে এনে দেয় ননদকে।

শুনে বাসন্তী বলে, ওমা, তা দেবে না ? একলা নিজে ক-টাকে সামলাবে ? ননদ যদি না বোগা ছেলেটার ঝঞ্ঝাট পোয়াত, রাতে ঘুমোতে না পেয়ে মরে যেত না বড়ো বউ !

এই জন্য বাড়িতে আদর শোভার ? সবার জন্য খেটে মরে, সবার দায় সামলায়, তাই তার খাতির ? বিনা মাইনেতে এমন প্রাণ দিয়ে খাটবার লোক মিলবে না বলে ?

না না, ছি ! খাটতে না পারলে, আলসে কুঁড়ে হলে কি ফেলে দিত ? সবাই হয়তো এতটা সন্তুষ্ট থাকত না, এইমাত্র। বোন বলেই আদর-যত্ন করে, সবার জন্য এত করে বলে আরও খুশি সবাই, এইমাত্র। মেয়েটাও কি ও সব ভেবে খেটে মরে ? নিজের বাপভায়ের সংসার বলেই খাটে।

মুখে তর্ক করে না সাধনা, মনে মনে বলে, সে তো নিশ্চয় ! বাপভায়ের সংসার বলে প্রাণের তাগিদে প্রাণপাত করে খাটে বলেই তো তার এত দাম ! হাজার টাকা মাইনে দিয়েও তো এমন লোক মিলবে না যে 'আপনজনের জন্য করছি জেনে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে করবে !

কিন্তু তাই বলে বাপ মেয়ের, ভায়েরা বোনের, বিয়ে না দিয়ে আইবুড়ো করে ঘরে রেখে দেবে নিজেদের স্বার্থে ?

বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি গেলে সবাই মুশকিলে পড়বে, তাই বুঝি বিয়ে দেবার গরজ নেই ?

বাসন্তী হেসে ফেলে, ধেত, কী যে সব অদ্ভুত কথা তোমার মনে আসে ভাই ! বাপ ভাই কখনও তা করতে পারে ? বিয়ে দিতে পারলে বরং দায় চুকবে, হাঁপ ছাড়বে !

তবে ?

সুবিধামতো পাত্র পায় না, এই আর কী। যা দিনকাল ! তা ছাড়া, শুধু খাটতেই পারে মেয়েটা, আর কী আছে যে ভালো ছেলের পছন্দ হবে ? ওদের এখন উঁচু নজর—এদিকে মেয়ের যে চেহারাও নেই, লেখাপড়া গানবাজনাও শেখায়নি, সেটা খেয়াল রাখে না।

যে দিনকাল ! ওরা যেমন পাত্র চায় সে রকম পাত্রের পছন্দসই পাত্রী নয় শোভা !

শোভার সেজো বোন প্রভা কদিন হয় বাপের বাড়ি এসেছে। তার স্বামী রামনাথও এসেছে সঙ্গে।

মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আজ সাধনা বিশেষভাবে আলাপ করে রামনাথের সঙ্গে, ভালোভাবে লক্ষ করে প্রভার হালচাল। এমন কিছু অসাধারণ সুপাত্র নয় রামনাথ, মানানসই বয়স, মোটামুটি চেহারা ও স্বাস্থ্য, মোটামুটি ভালো কাজ করে। শোভার চেয়ে প্রভাও এমন কিছু বেশি লেখাপড়া গানবাজনা শেখেনি, দেখতেও সে বোনের তুলনায় এমন কিছু রূপসি নয়। রামনাথ নিজেই তাকে দেখে পছন্দ করেছিল—দশ বছর আগে দাবিদাওয়াও তাদের পক্ষে ছিল সাধারণ।

আজ রামনাথের মতো পাত্র অনেক বেশি দুর্মূল্য ! শোভার মতো মেয়েকে আজ যদি আরেকজন রামনাথ বিয়ে করেও, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে তাদের বর্ধিত মূল্য !

শুধু বেকার বেড়েছে বলে নয়, যত উপার্জন হলে বুক ঠুকে বিয়ে একটা করে ফেলা যায় সেটা আকাশে চড়ে গিয়েছে বলে, খাদ্যবস্ত্রের মতোই ঘাটতি দেখা দিয়েছে সাধারণ যোগ্য পাত্রের !

তাই এসেছে এই উদাসীনতা। যেমন চায় তেমন বিয়ে দেবার সাধ্যও তাদের নেই।

চোখকান বুজে যেমন তেমন একজনের হাতে সঁপে দেওয়া যায় শোভাকে। আগের দিনে দরকার হলে তাই দিত। এই আশা থাকত যে যতই খাবাপ হোক বিয়ে, যত সামান্যই জুটুক যে জন্য বিয়ে দেওয়া জীবনের সেই সার্থকতা – বাপের বাড়ি আইবুড়ো হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে সে অনেক ভালো ! বর বুড়ো হোক, সেদিক থেকে ব্যর্থ হোক মেয়ের জীবন, খেয়ে পরে সংসারে গিন্নি হয়ে দিন কাটাবার সুখটা সে পাবে। অথবা জোয়ান বয়সি অকেজো অপদার্থ হোক বর—তার বাপ দাদা ভালো ঘরের মানুষ, তারা স্বামীর দিকটি ছাড়া অন্যদিকে সুখে রাখবার চেষ্টা করবে মেয়েকে।

আজ আর এ সব ভরসা নেই। ভালো বর ছাড়া কোনোদিকে আশা করার কিছু নেই যে বাপের বাড়ি কুমারী হয়ে পড়ে থাকার দুর্দশার চেয়ে বিয়ে দিলে অন্তত সামান্য একটু ভালো হবে মেয়ের জীবনটা ?

প্রভার সঙ্গে কথা কইতে কইতে শোভার উপর বাড়ির মানুষের নির্ভরতা লক্ষ করে মনে মনে সাধনা সায় দেয়। দশটা ঝি দশটা রাঁধুনি দশটা দাইয়ের মতোই তাকে ছাড়া গতি নেই এ বাড়ির ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষের--এর চেয়ে আর কী চরম ব্যর্থতা কল্পনা করা যায় একটি বিকাশোন্মুখ নারী জীবনের !

কিন্তু এর চেয়েও বীভৎস ভয়ানক ব্যর্থতা সহজেই কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে এ দেশে। গায়ের জোরে ঋষির মন্ত্রের অচ্ছেদ্য বাঁধনে চিরকালের জন্য বেঁধে ওকে যে কোনো একটা পুরুষের দাসী করে দিলে ওই নতুন তাঁতের শাড়িটি হয়তো আর ওর গায়ে উঠবে না, মাছের টুকরো না পেলেও ঝোল আর আলুর টুকরো দিয়ে পেট ভরে যে ভাত খেয়েছিল ও বেলা তার বদলে নুনভাত না পেয়ে উপোস করেই দিন কাটবে !

ও শোভা !—সাধনা ধৈর্য হারিয়ে ডাকে,—বাড়িতে একটা লোক এলে বুঝি ফিরে তাকাতেও নেই ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজেনের ডাক শোনা যায়, শোভা ? আমার ওষুধটা দিয়ে গেলি না মা ?

এবং অন্যদিক থেকে বড়ো বউ বরদার সকাতর আহ্বান আসে, ও ঠাকুরঝি ? দুধ-বার্লিটা এনে দাও ? একেবারে খেয়ে ফেলল যে আমায় ?

খলে পুতা দিয়ে বাপের ওষুধটা মাড়তে মাড়তে শোভা কাছে এসে দাঁড়ায়। নীরবে মাথা নেড়ে একবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে বাপের ডাক এসেছে, আরেকবার ইঙ্গিত করে যেদিক থেকে এসেছে বরদার সকাতর আবেদনের হুকুম। ক্লিষ্টক্লান্ত স্বরে বলে, কেমন আছেন ?

বিয়ে হলে চুলোয় যেত, প্রত্যক্ষ -রণের জ্বলন্ত আগুনে। বিয়ের নামে সঁপে না দিয়ে বাপ-দাদা তাকে ভাজাভাজা করছে বাপ-দাদার উপর নির্ভরশীল তেইশ-চব্বিশবছরের কুমারীত্বের তপ্ত তেলে।

শোভা ? ওষুধ খাবার সময় যে পেরিয়ে গেল মা !

ঠাকুরঝি, দুটোতে মিলে যে চেঁচাচ্ছে ভাই !

শোভা চেঁচিয়ে বলে, আসছি।

সেটা দুদিকেরই জবাব হয়।

দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বলে, দেখছেন তো, খেটে খেটে সময় পাই না। আপনাদের বাড়ি যাব ভাবি, হয়ে ওঠে না।

দেখছি বইকী বোন ? পাঁচ-দশটা স্বামী আর বিশ-পঁচিশটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার চালাচ্ছ।

প্রভা মুখে একটা পান পুরে দিয়ে বলে, ওকে আমি একমাসের জন্য নিয়ে যাব। খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কালি মারিয়ে দিয়েছে চেহারায়। যেমন বুদ্ধি হয়েছে বাবার, তেমনি স্বার্থপর হয়েছে দাদা। বিয়ের যুগ্যি মেয়েটাকে কোথায় একটু ভালো খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে রেখে সুশ্রী করবে, ঝিয়ের মতো চেহারা করিয়েছে।

রামনাথ সিগারেট ধবিয়ে বলে, সুধীরবাবুর ছেলেটার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে বলেছিলে তুমি –

চুপ করো তুমি '

ঠিক কথা। শোভাব সামনে সত্যই বলা উচিত নয় যে কোনো এক বাবুব কোনো এক ছেলের সঙ্গে তাকে জুটিয়ে দেবার কথা তারা ভেবেচিন্তে পবামর্শ করে এসেছে !

মনে তার আশা জাগবে, নানা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে ! তারপর যদি কোনো কাবণে বিয়েটা না হয় ?

ছেলেকে বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিল, আশার জিম্মায়। এমন সে প্রাযই রেখে যায় আজকাল। আশা আপত্তি করে না, বিরক্ত হয় না। তার নিজের ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট নেই, বাড়ি থেকে এক বকম বেরোয় না, সাধনার ছেলেটাকে একটু দেখলে দোষ কী ?

বরং ভালোই লাগে ছেলেটিকে নিয়ে থাকতে। মনটা একটু অন্যদিকে যায়।

কী পরিবর্তনটাই ঘটে মানুষের ! কী অদ্ভুতভাবেই উলটে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ক ! চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়িতে থেকেও যার সঙ্গে কথা কইতে বিরক্তি বোধ হত, যেচে আলাপ করতে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালে, আয়নায় যাকে দেখেও মুখ ফিরিয়ে তাকাত না, আজ সে খুশি হয়েই তার ছেলেকে পাহারা দেয় তাকে একটু নির্বিবাদে পাড়া বেড়াবার সুযোগ দিতে ।

এমন বিশেষ কোনো উপকার সাধনা তার করেনি যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে, কোনো প্রত্যাশাও রাখে না তাদের কাছে। সাধনাদের দিক থেকে এই প্রত্যাশার ভয়েই কিছুদিন আগে আরও বেশি করে সে ওদের এড়িয়ে চলত !

আজ উলটে গেছে অবস্থা। আশা টের পেয়েছে, তাদেব মতো মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আর দরিদ্রকে এড়িয়ে চলা যায় না। একটা জেল তৈরি করে নিজেকে সেখানে কয়েদ করতে হয়।

সাধনার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে সোজাসুজি এ সব কথাও বলে। তাদের আগের দিনের সম্পর্কের কথা।

সে বলে, গরিবরাই বরং ফাঁকতালে চায় না, হাত পাতে না। এ দেশে তাহলে ভিখিরিই গিজগিজ করত। তোমার দুর্দশা দেখে সত্যি কষ্ট হত ভাই, বিশ্বাস করবে ? কিন্তু ভাবতাম, নরম দেখলেই আজ এটা চাইবে কাল ওটা চাইবে, হঠাৎ এসে বলবে বড়ো বিপদে পড়েছি, কটা টাকা দাও। তুমি চাইতে না বলে আবার রাগও হত !

সাধনার মুখে হাসি ফোটে।

ও সব টের পেতাম। কখন কী চুরি করি এ ভয়টাও তোমার ছিল।

এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে থেকে আশা জোর দিয়ে বলে, মিছে বলব কেন ? সত্যি সে ভয় ছিল। রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের ধন চুরি—কবিতাটা মুখস্থই করেছিলাম ছেলেবেলা, সত্যিকারের চোর কারা চিনিনি। ভাবতাম যার নেই, সেই বুঝি চুরি করে দায়ে ঠেকে !

এত খোলাখুলি কথা কয়, কিন্তু আশার মনের নাগাল যেন পায় না সাধনা। ভেতরটা যেন তার আড়ালেই থেকে যায়। বোঝা যায় ভেতরে তার তোলপাড় চলছে দুঃখ আর বিষাদের—কিন্তু তার রকমটা যেন রহস্যময়।

আশা নিজে থেকে কথা কয় কম। সাধনা তাকে কথা বলায়।

আশা হতাশায় ঝিমিয়ে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় খাড়া রাখছে নিজেকে, কিন্তু সেটাই কি সব? ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার হয়ে যায়নি তার। সঞ্জীব চাকরি করছে, দেনা শোধ করে দায়মুক্ত হতে যতদিনই লাগুক একদিন তার আগের অবস্থা ফিরে আসবে। চিরদিন সে কষ্ট পাবে না।

এমনভাবে কেন তবে মুষড়ে গেছে আশা?

কষ্ট সইতে পারে না, সে জন্য ঝিমিয়ে যাক, বিমর্ষ হয়ে থাক, কখনও ভুলেও কি হাসতে নেই, দু-দণ্ডের জন্য সজীব হতে নেই ভবিষ্যৎ সুখের দিনের কথা ভেবে?

সাধনা বলে, আমাদের সত্যি মনের জোর বড়ো কম।

কে বললে?

দুঃখ-কষ্ট পেলেই আমরা দমে যাই। সুখের দিনও যে আবার আসবে সেটা ভাবি না।

আসবে ভাবলেই কি দুঃখ ঘুচে সুখের দিন আসে মানুষের?

ভাবলেই আসে না তা ঠিক। কিন্তু একদিন তো আসবেই? দুঃখ তো চিরস্থায়ী নয়?

নয়? এ দেশে কত লোকে দুঃখে জন্মে দুঃখেই মরে তুমি জানো?

সাধনা একটু বিপাকে পড়ে ভাবে, এর মনটা তো বড়োই বাঁকা। কাদের সুখ দুঃখের কথা বলছি নিশ্চয় বুঝেছে, অথচ না বোঝার ভান করে টেনে আনল দেশের লোকের কথা।

তবে সেও একটু সাধারণভাবে ভাসাভাসাভাবে কথাটা তুলেছে বইকী। যেন সাধারণ সমস্ত মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখের কথা বলছে।

সাধনা তাই খানিকক্ষণ একদৃষ্টে দেয়ালে টাঙানো সঞ্জীবের বাঁধানো ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়ার কারবার করতে করতে বেশ চালাক হয়ে উঠেছে সাধনা আজকাল।

আমাদের সুখ দুঃখের কথা বলছিলাম। তোমার আমার কথা। মিছিমিছি কেন যে আমরা পর হয়ে থাকি? প্রাণ খুলে দুটো কথা কইলেও তো প্রাণটা হালকা হয়? আমরা একজন কি সিঁদ কেটেছি আরেকজনের সুখের ভাণ্ডারে?

তখন ভরা দুপুর বৈশাখী নিদাঘ দুঃখী আশাকে রোজ এ সময় খানিক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখে। তার সুখের ভাণ্ডারে না হোক দুপুরবেলার ঘুমের ভাণ্ডারে সাধনা আজ সিঁদ কেটেছে।

নতমুখে মেঝেতে হাত রেখে বসেছিল আশা। তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল মেঝেতে ঝরে পড়তে দেখে সাধনা ভাবে,—সেরেছে।

তবে মিছেই সে এতদিন সখিত্ব করেনি বাসন্তীর সঙ্গে। মনে অতি ক্ষীণ একটু দ্বিধার ভাব জাগে মাত্র, তাতে শেষ পর্যন্ত আটকায় না। এগিয়ে গিয়ে আঁচল দিয়ে সে চোখ মুছিয়ে দেয় আশার। কিন্তু না বলে একটা মিষ্টি কথা, না দেয় তাকে লজ্জা পাবার সুযোগ।

সেই অহংকারী আশা আজ আচমকা কেঁদে ফেলেছে কিন্তু কিছুই যেন আসে যায় না তাতে।

যে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়েছে সেই আঁচল দিয়েই সে তার ঘাড় আর কণ্ঠার কাছ থেকে ময়লা ঘষে তুলে আনে। চোখের সামনে ধরে বলে, মেয়েমানুষের গায়ে এত মাটি পড়লে ময়লা জামাকাপড়ের মতো তাকেও ধোপাবাড়ি দেয়া উচিত।

চোখ সজল হলেও মুখে হাসি ফোটে আশার।

ধোপাবাড়ি নয়, হাসপাতাল।

ওমা, তাই বলো!

সাধনা নিজের কান মলে।—ছিঃ আমাকে, একশো ছিঃ! সাধে কী বাসন্তী বলে আমি মেয়েমানুষ নই ? একবাড়িতে থাকি আমার চোখেও পড়ল না ?

আশা চুপ করে থাকে।

যা মনে হত আশার মুখের গোমড়া ভাব, এখন সেটাই সাধনার চোখে ধরা পড়ে তার শ্রান্ত বিষণ্ণ মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা হয়ে।

ভয় পেয়েছ ?

না।

ভাবনা হয়েছে ?

আশার মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে।

সাধনা বলে, তা ভাবনা হয় নানারকম। কিন্তু তুমি নেতিয়ে পড়েছ কেন ভাই ? বাপের বাড়ি ঘুরে এসো না ?

আশা বলে, বাপের বাড়ি আমি যাব না এ অবস্থায়।

সাধনা বুঝতে পারে সে তার কোন অবস্থার কথা বলছে। তার সন্তানসম্ভাবনার অবস্থার কথা নয়। যেতে পারলে ভালোই হত বাপের বাড়ি, কিন্তু বাপের দেওয়া একটি গয়না পর্যন্ত তার গায়ে নেই, ভিখারিনির মতো কী করে সে যাবে বাপের বাড়ি ?

আশার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে খুব কম। আজ বলে নয়, চিরদিনই এদিক থেকে আশাকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সাধনার।

দু-একজন আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় আপনজন আশার কেউ নেই। তার বাপের বাড়িও পশ্চিমে শ্বশুরবাড়িও পশ্চিমে।

আপনজনের অভাবটা আজকাল আশা অনুভব করছে।

মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে! মনে হয় সবাই বুঝি সীতার মতো আমায় বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছে।

সাধনা হাসে। হাসি কথায় সে আশাকে একটু তাজা রাখতে চেষ্টা করে।

কথা কইতে কইতে কড়া নড়ে বাইরের দরজার। দরজা খুলে সুবেশ সুদর্শন অচেনা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কাকে খুঁজছেন ?

পিছন থেকে আশা বলে, শচীনবাবু! আসুন, ভেতরে আসুন।

সাধনাকে পরিচয় দেয়, ইনি আমার ভগ্নিপতি—মাসতুতো বোনের।

সাধনা নিজের ঘরে যায়, শচীন যায় আশার ঘরে। বেশিক্ষণ বসে না মানুষটা, মিনিট কুড়ি পরেই বেরিয়ে যায়। সদর দরজা বন্ধ করে আশা এসে বসে সাধনার ঘরে।

তার মুখ দেখে সাধনা ভড়কে যায়।

মানুষটা এসে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন তুলি দিয়ে নতুন কালো বিষাদ আর হতাশা লেপে দিয়ে গিয়েছে আশার মুখে। শূন্যদৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।

কী হল ভাই ?

এবার আমার গলায় দড়ি দেবার পালা।

গলায় আমাদের দড়ি দেওয়াই আছে। আবার কী হল ?

আশার মুখে এক মর্মান্তিক হাসি ফোটে:—আবার উনি ধার করছেন। আমায় না জানিয়েই করছেন।

উনি বলে গেলেন বুঝি ?

হ্যাঁ। ওঁর কাছেও গিয়েছে টাকার জন্য। দু-তিনবার।

সাধনা একটু ভেবে বলে, এক হতে পারে, সঞ্জীববাবু হয়তো ভেবেছেন আত্মীয়ের কাছে টাকা নিয়ে বাইরের দেনাটা সাফ করে দেবেন। আত্মীয়ের কাছে অতটা কড়াকড়ি হবে না, সুদ লাগবে না, ধীরেসুস্থে শোধ করে দেবেন।

আশা ফাঁকা চোখ তুলে তাকায়।

এ রকম কিছু ভাবলে কি আর আমায় না জানিয়ে ভাবত ? সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে কী আব এ দশা হয় !

কে জানে এ কী ঝোঁক মানুষের, কোথা থেকে আসে ? যে পথে প্রতিকার নেই জানে, আরও বিপদ ঘটবে জানে, অন্ধ হয়ে সেই পথেই চলে ?

মাস দুই আগে সঞ্জীব এই শচীনের কাছে টাকা পাব করেছিল, আশাকে জানায়নি। গতমাসেও আরেক অজুহাতে কিছু টাকা ধার করেছিল। গতকাল আবার টাকা চাইতে গিয়েছিল, নানাকথা মনে হওয়ায় শচীন আজ তার কাছে এসেছিল ব্যাপারটা বুঝতে।

আশাকে সে শক্ত হতে উপদেশ দিয়েছে। এ নাকি বড়ো পিছল পথ, গড়িয়ে চলতে শুরু করলে থামা যায় না।

উপদেশ দিয়ে সঞ্জীবের বদলে আশার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল।

আশা টাকা নেয়নি। বলেছে, যার দরকার তাকে দেবেন। আমার টাকার কোনো দরকার নেই।

পৃথিবীটা যেন কেমন লাগছে ভাই, চিনতে পারছি না। অসম্ভব ব্যাপাব সব সম্ভব হচ্ছে। মাথাটা ঘুবছে বলে ? আমি একরকম ভাবি, আসলে দেখি সব উলটো বকম হয় !

এতটা হাল ছেড়ে দিয়ো না।

হাল আছে না কী যে ধরব ? আমায় সুখে রাখতে না জানিয়ে দেনা কবেছিল, আমাব সুখ ! গয়না দিয়ে জীবন দিয়ে দেনা শুধছি, অসহ্য হলে ভাবছি, আহা, আমার সুখের জন্য মানুষটা পাগল, আমি কষ্ট না করলে কে করবে ?

একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে আশার মুখে, আমার কষ্ট দেখেই আবার ধার করছে নিশ্চয়। আমার সুখের জন্য ! জানে তো সামলে ওঠার আগে আমি মরে গেলেও সুখ নেব না, একটু মাছ পর্যন্ত আমি আনতে দিই না, টাকাটা অগত্যা নিজের সুখের জন্য খরচ করছে।

সাধনারও নিজেকে বড়ো নিস্তেজ অসহায় মনে হচ্ছিল। ম্লান মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরিটা ঠিক আছে তো ? না, এই ভাবে—?

চাকরি ঠিক আছে। ও সব কিছু নয়। আসল ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছি। আমার জন্যে না ছাই, নিজেরই আরাম বিলাস ছাড়া চলে না, কষ্ট সয় না। আগে অজুহাত ছিলাম আমি, এখন আর অজুহাত লাগছে না।

নিজের কপালটা টিপে ধরে আশা।—সে দিন দুটো পাঞ্জাবি করালে। টাকা পেল কোথায় ? না, এক বন্ধুর কাছে পাওনা ছিল, শোধ দিয়েছে। একটু ছিঁড়েছিল জামা—রিপু করে সেলাই করে দুমাস অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু না, তা হয় না, সেলাই করা জামা গায়ে আপিস করা যায় না ! একটা করালেই হত একবারে ? না, দুটো করালেই সুবিধে—খরচ কম লাগে, বেশিদিন টেঁকে, অমুক হয়, তমুক হয়।

খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে আশা। বলে, তোমায় বলব কী ভাই, ও সব কথা মুখ ফুটে বলতে গেলেও নিজেকে হীন মনে হয়। তুমি তো দেখে আসছ, কী রাঁধি কী খাই ? তুমি তো দেখছ,

চেহারা কী হয়ে এসেছে ? ভেতরে ভেতরে টের পাই শরীবে কত জোর কমেছে। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে ওঠে। তোমাদের সঞ্জীববাবুর জন্য এমন ভয় হত গোড়ার দিকে, এই খেয়ে আপিসের খাটুনি খেটে মানুষটা কি বাঁচবে ? মাঝে মাঝে জামায় মাংসের ঝোলের দাগ দেখতে পাই। পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বেরোয়। দেখে কী স্বস্তিই যে পেতাম। ভাবতাম, ভাগ্যে অনেক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে হোটেলে খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়। আমি যার দেনা শুধতে ঘরে শুকিয়ে আমসি হচ্ছি, সে ধার করে সিনেমা দেখবে হোটেলে মাংস খাবে—কেউ তা ভাবতে পারে ? পারে কেউ ?

দুজনেই চুপ করে থাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবে সাধনা। আশা একটুও কাঁদে না কেন ? সব শেষ হয়ে গেছে, কেঁদেও আর লাভ নেই, এ ভাব তো ভালো নয় !

তার ছেলের গালে টোকা দিয়ে আশা আদরের সুরে বলে, দেখি ? রাগ হয়েছে, দেখি ? মা মেরেছে, রাগ হয়েছে, দেখি ?

শিশু মুখের একটা শেখানো ভঙ্গি করলে সে হাসে।

যেন কিছুই হয়নি !

সাধনা ভেবেচিন্তে বলে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। ভুল যদি বুঝে থাক, তুমি নিজেই ভুল বুঝেছ। কেউ যদি ঠকিয়ে থাকে, তুমি নিজের বোকামিতেই ঠকেছ ! আমি তাই বলি কী, গায়ের জ্বালায় ঝগড়া না করে, সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি কথা কয়ে বোঝাপড়া করে নাও।

কথা কওয়ার আর কী আছে ?

আছে বইকী ? শুধু মানুষটাকে দেখো না, অবস্থাটাও খেয়াল করো।

আশা মুখ বাঁকায়। অর্থাৎ তার চেয়ে আজ কার অবস্থা খারাপ ?

ওর মনের জোর নেই এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। উপায় কী বলো ? তুমি তো আব গড়েপিটে মানুষ করোনি তাকে। মানুষটা কষ্ট সইতে পারেন না, সইতে শেখেননি। কী এমন হাতিঘোড়া চান ? ধার যে করেন, ফুর্তি করতেও নয়, বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও নয়। দুটো জামা পরবেন, একটু সিনেমা দেখবেন, ভালোমন্দ এটা-ওটা খেয়ে খিদে মেটাবেন। আসলে এ তো সামান্য চাহিদা। বরাবর পেয়ে এসেছেন, এখন পান না, সে দোষ তো সঞ্জীববাবুর নয়। নিরুপায় হলে কষ্ট করতেই হয় মানুষের, সেটাই উনি পারছেন না। তোমার মনে জোর আছে তুমি পারছ, ওঁর সে জোরটুকু নেই। নইলে যতটা খারাপ ভাবছ, অতটা খারাপ নয়।

তুমি যে উকিলের মতো ওকালতি করলে !

সঞ্জীববাবুর উকিল নই, আমি তোমার স্বার্থই দেখছি। মানুষটা ভালো কিন্তু ভদ্রলোকের মনের জোর নেই—এটা তোমাকে মানতেই হবে। মেনে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে, সব দিক যাতে বজায় থাকে।

আশা তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, এর পরেও বজায় থাকবে ? কী করে বজায় থাকে। সর্বনাশ হতে বসেছিল, চাকরিটা পর্যন্ত যেত। আমি অতি কষ্টে ঠেকিয়েছি। আবার কে ঠেকাবে ? মনের জোর তো আর আকাশ থেকে আসবে না।

সাধনা বলে, আমিও তাই বলছি। এটুকু তোমায় বুঝতেই হবে ভাই। তুমি নিজে কষ্ট করে ব্যবস্থা করে সামলাতে পারবে না। একবার চেষ্টা করেছ বেশ করেছ, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেল। তুমি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মনের জোর এনে দিতে পারবে না। নিজে বিপদে পড়ে পোড় খেয়ে নিজের মনটাকে নিজেকেই ঠিক করতে দিতে হবে ওঁকে। যার দায়িত্ব তাকেই সব ছেড়ে দাও। যা কিছু আসল ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুমি যতটা পারো সামলে-সুমলে চলবে, সাহায্য করবে।

ফল কী হবে সে তো জানা কথা ! নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে।

সে তো এমনিও ডোবাবেন, ওমনিও ডোবাবেন, তুমি কিছু করতে পারছ কী ? ডুবতে বসলে বরং বাঁচার চেষ্টা আসবে, মনটা শক্ত হবে।

আশা সংশয়ভরে বলে, এততেও যার শিক্ষা হল না, সে কি শিখবে কোনোদিন ?

সাধনা ভরসা দিয়ে বলে, শিক্ষা হতে দিলে কই তুমি ? বিপদে পড়তে না পড়তে সামলে দিলে। কষ্ট যা করার তুমি করছ, তার গায়ে কি আঁচ লাগছে ? মনে যত কষ্ট হোক, অনুতাপ আপশোশ হোক, ওটা শিক্ষার ব্যাপার নয়। হাতে-নাতে শিখতে দিতে হবে। চাকরি যায় যাবে, চান্দিকে দেনা করে করবে। তোমার কপালেও দুঃখ আছে অনেক। কিন্তু কী এমন সুখে আছ ? ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কদিন চালাবে ? তার চেয়ে মানুষটার চেতনা হোক, দুজনে মিলে আবার উঠবে।

আশা তো বোকা নয়। সাধনা এত কথায় যা বোঝাতে চেয়েছে, সে দুকথায় তাব আসল মানেটা তুলে ধরে।

বলে, সোজা কথায়, আমাকে কর্তালি ছাড়তে বলছ। সরলা অবলা বউ হব, স্বামীর ওপর নির্ভর ? সে আনবার মালিক এনে দেবে, আমি রেঁধে দেব। কোথা থেকে কী করে আনছে সে ভাবনা তার।

সাধনা একটু হাসে।

হাবা সাজতে কি পারব ?

পারবে। পারতে হবে। আজ মিলেমিশে বোঝা বইতে চায় না, জোর করে বোঝার ভাগ নেওয়া কি খুব সম্মানের ? দেখলেই তো, ওতে লাভ হয় না, বোঝা নিয়ে টানাটানি মারামারিই ঘটে। ঘরে চুপচাপ ভালোমানুষটি সেজে থাকেন, বাইরে গিয়ে নিজের মূর্তি ধরেন। তার চেয়ে যেমন চান তাই হোক। দুদিন যাক, টের পাবেন, নিজেই ডাকবেন পাশে এসে দাঁড়াও, হাত মেলাও।

আশা বুদ্ধিমতীর মতো বলে, কথায় তো হল। দেখি কাজে কী হয় !

বাসন্তী সব শুনে বলে, তুইও যেমন ভাই, জলের মতো সব বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিলি। একটা নীতি খাড়া রেখে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা ঘর-সংসার করতে পারে ?

তুই তো করছিস। ছিটেফোঁটা সুখ চাই না, হলে আগের মতো, নইলে নয়। ঝি পর্যন্ত রাখিস না।

বাসন্তী গালে হাত দেয়।—এটা নীতি নাকি ? আশাদি যে কষ্ট করে আসছে, ওর নাম নীতি করা বুঝি ? দরকার হয়েছে, উপায় নেই, তাই আমিও এ সব করছি, আশাদিও করছে। কিন্তু তুই আশাদিকে যে পরামর্শ দিয়েছিস ভাই সে একেবারে খাসা নীতি ! তুমি ও রকম ছিলে আজ থেকে এ রকম হবে, নরম হয়ে থাকবে, রাগ হলে ঝগড়া করবে না, নালিশ করবে না, কিচ্ছু করবে না ! তাই নাকি মানুষ পারে ?

জোরে জোরে মাথা নাড়ে বাসন্তী, উহুঁ, পারে না। তাছাড়া কার যে দোষ তুই ধরতেই পারিসনি। ওর জন্যেই তো মানুষটা ফের বিগড়েছে।

তাই নাকি ?

তাই। একশোবার তাই। কর্তালি করেছে তো কী হয়েছে ? তুমি বউ, বউ হয়ে কর্তালি করো না যত পারো, মাস্টারনি হয়ে কর্তালি করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বউ হবার সাধ্যি নেই, শাসন করার গুরুঠাকুর ! না খেয়ে না পরে আমি কী কষ্টটাই করি ! আমি মনে মনে কী বলি জানো ? বলি, আহা, মরি মরি ! হাসি নেই, কথা নেই, মুখটা যেন ভাতের হাঁড়ি, বাড়িতে যেন দশটা রুগি মরো-মরো।

চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ভাব—অমন কষ্ট নাই বা করতে তুমি ! তার চেয়ে হেসে দুটো কথা কইলে মানুষটার বেশি উপকার হত।

বাসন্তী কথা বলছিল উনান সাজাতে সাজাতে। আবদার জানিয়ে বলে, মুখে একটা পান গুঁজে দে না ভাই ?

পান মুখে এলে চিবিয়ে গালে রেখে বলে, এটুকু যদি বোঝাতে পারতে, কাজ হত। মানুষ তো লোহায় তৈরি নয় ? ঘরে একটু আদর পেলে স্বস্তি পেলে ও মানুষটা কখনও ধার করে বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখত, হোটেলে খানা খেত ? তারা অন্য জাতের লোক। ঘরে তারা গোবেচারি সেজে থাকে না বউয়ের ভয়ে, বউকে লাথি মেরে গয়না নিয়ে ফুর্তি করতে যায়।

কথাটা লাগসই মনে হয়। কিন্তু খটকা যায় না। এতই কি সহজ এ ব্যাপারের শেষ কথা ?

একজন বাইরে লড়বে, ক্ষতবিক্ষত হবে, ঘরে ফিরলে আরেকজন তাকে একটু আরাম দেবে বিরাম দেবে ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেবে মমতার—বাস, আর কিছুই চাই না ?

এতখানি সহজ আর ব্যক্তিগত এ লড়াই ?

ঘর হল পুরুষ সৈনিকের দেহমনের হাসপাতাল আর মেয়েরা হল তাদের নার্স ?

তাই তো ছিল এতকাল ! লড়াই তবে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে কেন ? ভাঙন ধরছে কেন এই অপরূপ ব্যবস্থায় ?

এক-একটি নীড় তো এক-একটি দুর্গ বিশেষ ছিল রোজগেরে স্বামীর। তার মনের মতো হাসি আনন্দ আদর মমতা তার জন্য তৈরি হয়েছে সেখানে ! মেয়েরা বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহিণী হয়ে তো ভেঙে ফেলেনি সে দুর্গ, ওলট-পালট করে দেয়নি পুরুষের লড়াই করে ঘরে ফিরে শান্তি আর স্বস্তি পাবার ব্যবস্থা ?

হাসিমুখে দুটো কথা কইবে আশা ? পেটের সঙ্গে প্রাণটা যখন জ্বলছে তখন নিজের বগলে সুড়সুড়ি দিয়েও হাসি আনতে পারে মানুষ ?

হাঁড়িতে ভাতের অভাবের জন্য মুখটা যখন ভাতের হাঁড়ি—

ঘরে ফিরে সাধনা উনান ধরায়। হাঁড়ি চাপাতে হবে।

৬

রাখাল বলে, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

সাধনা ভাবে, সর্বনাশ ! কী দুঃসংবাদ কে জানে !

হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে সাধনা এসে বসে। রাখাল তার ধোয়া হাতে তুলে দেয় নয়া প্যাটার্নের নতুন সোনার দুল।

এই কথা !

না, এটা আসল কথা নয়।

আসল কথাটা ব্যাবসা নিয়ে। এতদিন রাজীবের আগেকার দায় ছিল, সম্প্রতি সেটা শেষ হয়েছে। আর তাকে দফায় দফায় কিস্তির টাকা দিতে হবে না। টাকাটা সে কারবারে লাগাবে। রাখালকেও সে অনুরোধ করেছে, লাভের অংশ কম টেনে কারবারে লাগাতে।

সাধনা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

অত খুঁটিনাটি বুঝিনে আমি। আমায় কী করতে হবে বলো।

আগে হয়তো রাখাল আহত হত। প্রিয়া কবিতা বোঝে না জানালে নতুন কবি যেমন আহত হয়। শুরুতে প্রায় কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনা নিয়েই সে নোংরা অশ্রদ্ধেয় বিড়ির পাতা শুখা তামাকের ব্যাবসা শুরু করেছিল, ধরাবাঁধা জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেটাই ছিল নতুন সৃষ্টির ঝোঁক।

আজকাল ও সব অভিমান তার ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে বলে, আসল কথা, কিছুদিন কষ্ট করতে হবে।

করব !

তার এই নির্বিকার উদাসীন জবাবটা আঘাত করে রাখালকে।

শেষকালে কেঁদেকেটে ঝগড়া করে অনর্থ কোরো না। বেশিদিন নয়, কয়েক মাস একটু টানাটানি যাবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তো।

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে রাখাল হাতের মোটা চুরুটটা মুখে গুঁজে ধরায়। শুধু বিড়িপাতা শুখা আর সাধারণ চলতি সিগারেট নিয়ে তাদের কারবার—সম্প্রতি সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকরকম চুরুট তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কবে এককালে ছবি আঁকা পদ্য লেখার ঝোঁক চেপেছিল কিছুদিন, সেই বিদ্যা নিয়ে নিজে একটা চৌকো পিচবোর্ডে জ্বলন্ত চুরুট ধরা একটা হাত এঁকে তার নীচে লিখেছে, 'চুরুট খান : একটা চুরুট দশটা সিগারেট, পঞ্চাশটা বিড়ির শামিল ! দাম কত সস্তা পড়ে ! তিনবার চারবার নিভিয়ে খান একটা চুরুট !'

রাজীব সংশয়ভরে বলেছিল, ঠিক কথা লেখা হল কি ? এ রকম হলে সবাই তো চুরুট খেত !

রাখাল বলেছিল. এটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে বেঠিক কথা লিখতে হয়। ওটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট।

বটে নাকি।

তবে ? একটা বিজ্ঞাপন দেখান তো আমায় যা স্রেফ ভণ্ডামি আর মিথ্যা নয় ? কেমন করে বোকা লোককে ভাঁওতা দিয়ে ঠকানো যায়, এটাই হল বিজ্ঞাপনের আর্ট। নইলে কী করে বিজ্ঞাপন দিতে হয় তার এক্সপার্ট নিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার বড়ো বড়ো কোম্পানি গড়ে ওঠে ? পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন থেকে মডার্ন বিজ্ঞাপন সব ওই এক ধাপ্পাবাজি।

রাজীব আমতা আমতা করে বলে, আপনিও শেষে ওই ধাপ্পাবাজি করে বসলেন ?

মোটেই না। আমি শুধু জানিয়ে দিলাম আমাদের এখানে চুরুটও পাওয়া যায়।

সাধনা কী ভাবছে বুঝতে না পেরে রাখালের মুশকিল হয়। রাগত মনোভাবটা দমন করে চুরুটে টান দিয়ে রাখাল বলে, রাজীবটা হল গিয়ে একেবারে সেকেলে ব্যাবসায়ী। আমি যেমন চাকরি করতাম, ও ঠিক তেমনি ব্যাবসা করে। বাপ-ঠাকুর্দার বাঁধা নিয়মে। জগৎ পালটায় তো ওদের নিয়ম পালটায় না। সকাল সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেবার কী ঘটা ! কালীর ছবিকে প্রণাম করবে, গণেশকে প্রণাম করবে, তারপর মাথা ঠেকাবে কাঠের ক্যাশ বাক্সোটায়।

ক্যাশটাই তো আসল।

রাখাল হাসে, ক্যাশ ছাড়া বোঝেই না। ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত খোলেনি। লোহার সিন্দুক আছে, আবার ব্যাংক কেন ? আমিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছি।

নতুন দুল কানে লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে সাধনা বলে, এটা না আনলেও চলত। এ সব ঝোঁক আমার কেটে গেছে। দ্যাখো না খালি গলায় ঘুরে বেড়াই ?

এ বৈরাগ্য চলবে না। আমি এদিকে কতরকম ভাবছি, বিকালের পড়ানোটা ছেড়ে দিয়ে আরও কোমর বেঁধে নেমে পড়ব, টাকা করব,—গয়না পরতে তোমার অরুচি জন্মাবে কী রকম ?

অনেক টাকা করবে ভাবছ না ? লাখ টাকা ?

লাখের বেশি নেই ?

সাধনা সোজা তার দিকে তাকিয়ে বলে, কী আশ্চর্য দ্যাখো, আমি জানতাম তোমার এ ঝোঁক আসবে ! খুব যখন টানাটানি চলছিল, তখন মনে হয়েছিল কথাটা। টাকার জন্য ভীষণ কষ্ট পেলে, এরপর তোমার রোখ চাপবে টাকা করার। তাই সত্যি হল।

আমি কিন্তু মোটে দু-চারমাস এ সব ভাবছি। রাজীবের সঙ্গে কারবারে না নামলে হয়তো কোনোরকমে দিন চালাবার চিন্তাই করতাম।

এ ঝোঁক তোমার আসতই। একটু সামলে নেবার অপেক্ষায় ছিলে।

তুমি চাও না টাকা ?

চাই ! গয়না পবব না পরব জানি না, চারবেলা ভোজ খাব আর দুঘণ্টা অন্তর নতুন নতুন কাপড় পরব !

টাকার চিন্তার চেয়ে টাকা করার চিন্তায় রাখাল আজ কম মশগুল নয়। টিউশনি, ফালতু রোজগার আর চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে সময়ও তার এখন কম যায় না টাকা করায় চেষ্টায়।

একটা ব্যাপার বড়োই অদ্ভুত ঠেকে তার কাছে। আজ আরও বেশি টাকা করার নেশায় মেতে থাকার সঙ্গে আগের দিনের সেই দিবারাত্রি টাকার ভাবনা আর ছেলে পড়িয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াবার ধান্ধায় মেতে থাকার মধ্যে সে যেন একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পায় ! টাকাব অভাবে কষ্ট পাওযাটুকু বাদ দিলেই যেন মিলে যায় নেশাটা। সেদিন টাকার চিন্তায় ডুবে থাকত নিরুপায় হয়ে, আজ স্বেচ্ছায় টাকার চিন্তায় ডুবে আছে !

টাকার চিন্তা ছাড়া একদণ্ড শান্তি নেই !

তবু, চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে গেছে। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটছেই ব্যাবসা সূত্রে, জানাচেনা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম উঠে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও আজকাল মাঝে মাঝে দেখা হয়, পাড়ার লোকের সঙ্গে চলে মেলামেশা আর মনে প্রাণে উদাসীন হয়ে থাকার বদলে স্বেচ্ছায় তাদের ভালোমন্দের খবর রাখা।

সাধনা যেমন জমিয়ে তুলেছে পাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে সেরকম মেলামেশা নয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বসে বসে গল্প জমিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করার সময় তার নেই।

কাজে যেতে আসতেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ বসে থাকে দাওয়ায়, কেউ সামনে পড়ে পথে, কারও সঙ্গে দেখা হয় মুদি দোকানে রেশন-খানায় বাজারে, কারও সঙ্গে বাসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা হয়, তাতেই আদান-প্রদান হয় আসল খবরগুলির, তাতেই বজায় থাকে এবং গড়ে ওঠে হৃদ্যতা।

কারও বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, কাজে বেরিয়ে যাবার সময় একটু ঘুরে খবর জেনে যাওয়া যায় কয়েক মিনিট বাড়তি সময় দিয়ে।

দোকান যেদিন বন্ধ থাকে সেদিনও নিজের কাজে ঘরের কাজে তাকে ছুটোছুটি করতে হয়, তবু দেখা যায় পাড়ায় বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি ক্রিয়াকর্মে গিয়ে সামাজিকতা বজায় রাখা থেকে পাড়ার বৈঠক বা আড্ডায় গিয়ে বসার জন্য সময়ের অভাব হয় না মোটেই।

এই মেলামেশার ফলে স্থানীয় নানারকম লৌকিক ব্যাপারে তাকে আজকাল ডাকা হয়। সে সবে অংশ নিতেও তার অসুবিধা হয় না।

এমনি পার্থক্য টাকার চিন্তায় হন্যে হয়ে বেড়ানো আর টাকা করার সাধকে সাধনায় দাঁড় করানোর মধ্যে !

সময় তখনও থাকত। কিন্তু আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সামাজিকতার জন্য সময় দেবে কে ? সে ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে ? মেলামেশার বদলে ঘরের কোণে একলা বসে চিন্তাজ্বরে মুহ্যমান হয়ে

থাকতেই তখন ভালো লাগত। দেখা হলে পাড়ার মানুষের কুশল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দাঁড়াবার তাগিদ জাগত না, হাঁটতে হাঁটতেই ছুঁড়ে দিত দুটো চলতি শব্দ—চলে যাচ্ছে !

কাজের মানুষ দশজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার সময় পায় না—এ মিথ্যা অজুহাত ফাঁস হয়ে গেছে রাখালের কাছে।

সেও আজ কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ।

দশজনের জীবনকে সাধ্যমতো এই সম্মানটুকু দেওয়ায় যেন বিবেকের জ্বালাও তার খানিকটা শান্ত হয়েছে—যে দশজনে বিশুর মার গয়নার ব্যাপার জানলে তাকে চোর বলত।

সাধনার যে শান্ত নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার ভাব আরেকটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে, দশজনের সম্পর্কে দুজনেরই মাথা ঘামাবার মাধ্যমে যেন তারও ঘোরটা কেটে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

সাধনা বলে, শোভার বিয়ে ঠিক হল শেষ পর্যন্ত।

রাখাল বলে, শুনলাম ওর দাদার কাছে। আপশোশ করছিল, বোনের জন্য শেষে বুড়ো বর আনতে হল, লেখাপড়াও ভালো জানে না। কিন্তু উপায় কী, শোভার বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।

সাধনা খুশি হয়ে বলে, তুমি শুনেছ সব ?

শুনেছি বইকী। তোমাব কাছে শুনেছি, ওদের কাছেও শুনেছি।

বাসন্তীর সঙ্গে কত কথা হয়েছিল শোভার বিয়েব সমস্যা নিয়ে, কত পরিষ্কার মনে হয়েছিল সমস্যাটা। বরটি কেমন সমস্যা তা নয়, সমস্যা মোটামুটি খাওয়াপরা জোটার। আজ আবার বিষম খটকা লেগেছে সাধনার মনে। প্রায় ষাট বছরের বুড়ো ? শোভা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে ! মন খারাপ হবার লক্ষণও দেখা যায়নি !

অবুঝ কচি মেয়ে নয়। বুড়ো বরের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেবার তথাকথিত ব্যাপারও নয়। শোভা শুধু মুখ ফুটে না বললেই এ বিয়ে ভেঙে যায়।

কিন্তু না যে বলেনি ! জিজ্ঞাসা করা হলে বরং নীরবে সায় দিয়েছে।

মনের ঝাঁঝটা কথায় বেরিয়ে আসে সাধনার, বলে, মেয়ে নাকি এই বরের নামেই খুশি ! এ কী ব্যাপার, অ্যাঁ ? কোনো মেয়ে এমন বিয়ে চাইতে পারে ?

রাখাল তার জানা যুক্তিটাই দেখায় শোভার পক্ষে বলে বাপের বাড়ি চাকরানির মতো জীবন কাটাতে হয়। স্বামী বুড়ো হোক আর যাই হোক, নিজের সংসারে খেয়ে পরে থাকবে।

সেটাই কি সব ?

সব নয়, মন্দের ভালো।

সাধনা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। খাওয়াপরাব জন্য এ রকম একজনের পাশে শোয়াব চেয়ে স্বাধীনভাবে ঝি-গিরি করা ভালো নয় ?

শুধু ঝি-গিরি ? তুমি পাগল হলে নাকি ? আসলে তুমি নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ ও মেয়েটাকে। ঘরের জন্য ও রকম বরের কথা ভাবতেও তোমার ঘেন্না হয়। কিন্তু শোভার কি সে তেজ আর চেতনা আছে ? ওর কাছে ঘর আগে।

আজও এমন মেয়ে রয়ে গেল কী করে ?

রেখে দেওয়া হয়েছে বলে !

এত কাণ্ড চারিদিকে, ওর মনে কি ধাক্কা লাগে না ?

লাগে। ঢেউ ওঠে, মিলিয়ে যায়। তবে এ তো নিষ্ফল হবার নয়, একদিন প্রতিক্রিয়া হবেই। অন্য মেয়ে হলে বিয়ের আগেই কেলেঙ্কারি করত, কারও সঙ্গে হয়তো বেরিয়েও যেত। ওর প্রতিক্রিয়া আসবে বিয়ের পর। যখন টের পাবে কীভাবে কী জন্য ঠকেছে।

কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও ! সুমতিদের মতো মেয়েরা আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয় –ঘরের কোণে নিরীহ গোবেচারি শোভারা মুখ বুজে উদয়াস্ত খেটে যায়, বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে মেনে নেয় ভাগ্যে যেমন জোটে ঘর আর বর !

প্রাণটা জ্বলে যায় সাধনার।

আরও জ্বলে যায় নীলাম্বরী শাড়ি পরে শোভাকে আজ একা বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে।

দিদি আপনাকে যেতে বলেছে।

তা নয় বলেছে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো ?

আমি একটু নমিতাদের বাড়ি যাব।

সাধনা হেসে বলে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বুঝি বেরিয়েছ ঘব ছেড়ে ? খুব ফুর্তি হয়েছে, না ?

শোভার নত চোখ আর মৃদু হাসি দেখে গালে তার একটা চড় মারতে সাধ হয় সাধনার !

মুখভার করার প্রতিবাদটুকুও জানাতে পারে না ? ওর মনে ঢেউ ওঠে না ছাই হয় !

ওর ভাগ্য-মানা মনের ডোবায় ঢেউ তোলার সাধ্য নেই কালবৈশাখী ঝড়েরও !

নিজের বেলা যে রকম বিয়ের কথা ভাবতেও তার ঘেন্না হয়, সেই বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে সেজেগুজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে—জগৎকে যেন জানিয়ে দিতে চায় যে এতদিনে গতি হল তার !

দুর্গার কথা সে ভাবে। ঘর-হারানো গরিব পরিবাবের মেয়ে পঁচিশ টাকার বিয়েতে শুধু বর পেয়েছে, ঘর-হারানো বর। ঘবের চেয়ে বড়ো হয়ে থেকেছে মানুষ। ঘর ভেঙে পড়ার অভিশাপ কি তবে আজ দরকার শোভার মতো মেয়েদের নিজেকে মানুষ বলে জানতে পারার জন্য ?

এতই বিতৃষ্ণা জন্মে মেয়েটার উপর, মানুষ হিসাবে এতই সে তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে যে তার কথা ভাববার প্রয়োজনও যেন তার ফুরিয়ে যায়।

নিজের এবং অন্যান্য জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ সংঘাত যে আলোড়ন তোলে তার মনে শোভা তার মধ্যে গুলিয়ে গিয়ে বাতিল হয়ে যায়।

আশা কী বোঝাপড়া করেছে সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুই সে খুলে বলেনি সাধনাকে। গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করার সংকোচটাও সাধনা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে মনে হয়, তার পরামর্শই গ্রহণ করেছে আশা। নরম হয়ে বিনীতা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছে।

পরিবর্তন বিশেষ কিছুই ঘটেনি সংসারযাত্রায়, সব দিক দিয়ে যে কঠোর আত্ম-নির্যাতনের ব্যবস্থা চালু করেছিল আশা সেটা মোটামুটি এখনও বজায় আছে, সঞ্জীব শুধু ভয়ে ভয়ে যেন আশার নতুন মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বাজার থেকে আনছে একটু মাছ, কালোবাজার থেকে আনছে দু-একসের চাল।

একখানা নতুন শাড়িও সে কিনে দিয়েছে আশাকে।

আশা চুপচাপ মাছটুকু রাঁধছে, হাঁড়িতে চাল চড়াচ্ছে পেট ভরে খাওয়ার মতো, নতুন শাড়িটা গায়ে জড়াচ্ছে।

জিজ্ঞাসাও করছে না তুমি টাকা পেলে কোথায়, মুখ ফুটে প্রতিবাদও জানাচ্ছে না।

মুখখানা তার হয়ে আছে ম্লান এবং গম্ভীর। কথা সে বলছে আরও কম। সঞ্জীব যা বলে যা করে তাই সই, তার কিছু বলারও নেই করারও নেই।

নীরবে নিজের মনে নিজের কড়া দুঃখ ক্ষোভ আর বিদ্রোহের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখছে।

সঞ্জীব আপিস চলে গেলে তার এঁটো থালা গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে কলতলায় যেতে যেতে হঠাৎ ঝনঝন করে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ ছটফট করে বেড়ায় ঘরে আর বাইরে। হঠাৎ বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে।

তারপর উঠে স্নান না করেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসে দু-একগ্রাস খায়—উঠে দাঁড়িয়ে ঘটির জল ঢকঢক করে মুখে ঢেলে লাথি মেরে ভাতেব থালা মাছের বাটি ছিটকে সরিয়ে দিয়ে, ঘটিটা আছড়ে ফেলে ঘরে।

সাধনা আসছে টের পেয়েই ভেতর থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

আধঘণ্টা পরে অবশ্য নিজেই সে সাধনার ঘরে যায়।

শুধু একটু হাসে। সত্যই হাসে।

সাধনা সাহস পেয়ে বলে, পরামর্শ দিয়ে আমি বুঝি তোমার অনিষ্টই করলাম ভাই।

আশা তেমনিভাবে হাসে। বলে, শুনে রাগ কোরো না, তোমার পরামর্শ আমি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছি।

তবে---?

সে তুমি বুঝবে না।

সতীশের শরীব দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। কোনো অসুখ নয়, শুধু ভাঙন। বিশুর মার ধোয়া মোছা গোবর লেপা ব্রত পার্বণ পূজা আর প্রসাদ ও দক্ষিণা বিতরণ বজায় থাকলেও সব যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

আরেক দিন আরেক উপলক্ষে রাখাল পায়েস পিঠে পায। কিন্তু সে যেন নেহাত তাকে না দিলে নয় বলে, আগে মহাসমারোহে দেওয়া হয়েছে বলে, কোনোরকমে নিয়মরক্ষার জন্য দেওযা হল।

নির্মলা বলে, কইতে আমার মাথা কাটা যায় আপনের কাছে। গোবুগুলারে পশ্চিমা গোয়ালার কাছে বেইচা দিছে। কত কইলাম, দুধ দেয়, গোবু বেচেন ক্যান দিদি ? দিদি কয়, তুই মুখ বুইজা থাক মুখপুড়ি !

একটা নিশ্বাস ফেলে নির্মলা।

মুখপুড়ি কয়। ক্যান, মুখ পুড়াইলাম কীসে ? জানি আপনে মানুষ না, দেবতা। জানি কোনোকালে ভুইলা আমার হাতখান ধরবেন না। ভাবি, না ধরলেন হাত, দেবতা মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছেন আপনে, আপন ভাইবা আপনে দরদ দিয়া দুইটা কথা কইলে আবাগি আমার পাপের জন্ম ধন্য হইব।

নির্মলা কপাল চাপড়ায় ডান হাত দিয়ে।—দিদির বড়ো খাতিরের মানুষটা সতীশবাবু। কয়বার গুন্ডা ডাকাইতের নাখান হাত ধরছে দিদি জানে ? দিদি মন্দিরে পূজা দিবাব যায়, বুড়া রাক্ষসটা আমারে চাইয়া [illegible] যায় দিদির ঘরে।

নির্মলা কেঁদে ফেলে।—আপনে [illegible]বতা। পায়ে ধইরা কইলেও হাত ধরেন না। আপনে ক্যান খাইটা মরেন ? আপনার ক্যান টাকা নাই ? আমি জানি, আপনাগের টাকা থাকে না। ডাকাইতগুলার টাকা ছাড়া কথা নাই, আপনে কী নিয়া পাল্লা দিবেনই? চুরি ডাকাতি আপনার কাম না।

রাখাল তার হাত ধরে। নিজের দেবতাত্ব ভুলে গিয়ে অবশ্য নয়।

নির্মলারও সে ভুল হয় না।

সহজে আর ভাঙবার নয় তার বিশ্বাস। ব্রতপূজা অন্তহীন আচারবিচার বাইরের নানা আড়ম্বরের আড়ালে মনুষ্যত্বহীনতার আড়ত জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে তার জীবন কেটেছে,

ছেলেবেলা বিধবা হয়ে আজ তার সাতাশ বছর বয়স। সে বিশ্বাস করতে পারত না যে নিজে যেচে হাত ধরে টানলেও মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে,—দেবতা ছাড়া এটা অসাধ্য।

রাখাল তাই তার কাছে সত্যই দেবতা।

রাখাল গভীর মমতার সঙ্গে বলে, যে সব দিন চলে গেছে, যেতে দাও। যে জেলখানায় আটক ছিলে সেটা ভেঙেই পড়ছে। আপশোশ করে লাভ কী হবে ? জীবন তো তোমাব ফুরিয়ে যায়নি, এবাব অন্যভাবে গড়ে তোল জীবনটা।

একটি হাত তাব ধরাই থাকে রাখালের হাতে। অন্যহাতে চোখ মুছে সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এই জীবন দিয়া আর কী করুম ?

জীবন কি ফেলনা মানুষের ? আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কী করে নতুন জীবন গড়বে।

হাত টেনে নিয়ে নির্মলা গড় হয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

ষোলো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল নির্মলা, বাইশ বছব বয়সে বিয়ে হবে শোভাব। দুজনেই তারা জানে না জীবন নিয়ে কী করবে। হতাশার সঙ্গে মানুষেব উপর তীব্র একটা বিদ্বেষ আছে নির্মলাব— জীবনেব অভিজ্ঞতায় যার জন্ম। আশ্চর্য এই, শোভাব হতাশাও নেই জ্বালাও নেই।

কেন জ্বালা নেই বলে গায়ের জ্বালায় সাধনা আক্ষেপ করেছে তাব কাছে !

শোভারও একদিন আসবে হতাশা আর জ্বালাবোধ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে আসবে। যে কৃত্রিম কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে তার মন সেটা কেটে গেলেই আসবে।

সাধনা বলে, ও মেয়েটার কথা বোলো না আমায়, ঘেন্না হয়। তোমার ওই নির্মলার জন্য মায়া হয়, বেচারির উপায় ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটা কী ? ও তো আর বেড়াজালে আটক থাকেনি জন্ম থেকে !

সাধনার কাছে এতটুকু ক্ষমা নেই শোভার !

তার নিজের জীবনের সমস্ত বন্ধন সংকীর্ণতা অসহায়তা আর অপমানেরই প্রতীক হয়ে যেন দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

প্রভার সঙ্গে শোভা তাব বাড়িতে বেড়াতে এলে ভদ্রতার খাতিরেও সে এই ঘৃণা আর অবজ্ঞা চাপতে পারে না।

শোভা টের পেয়ে বলে, সেজদি, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সে চলে গেলে প্রভা হেসে বলে, আগে ঘর ছেড়ে বেরোত না। ক-দিন খুব যাচ্ছে বন্ধুদের কাছে। আজকালকার মেয়ে তো, বিয়ের আগে জামা-টামার প্যাটার্নটি পর্যন্ত নিজেরাই পরামর্শ করে ঠিক করবে !

প্রভার হাসিভরা মুখেও একটা চড় কষিয়ে দেবার সাধ জাগে সাধনার। বিয়ের নামে বেশ্যাবৃত্তি করার সুযোগ পেয়েছে বলে শোভা খুশি, প্রভাও খুশি বোনকে এই সুযোগ জুটিয়ে দিতে পারছে বলে !

ভোলার মা আজও ডিম বেচে। মাঝখানে গরমে ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত বলে কিছুদিন ডিম বন্ধ রেখে তরকারি বেচেছিল। কুমড়োর ফালি, কাঁচা আম, কাঁচা লংকা, লেবু এই ধরনের তরকারি। দু-একপশলা বৃষ্টি নেমে গরম কমায় আবার সে ডিম বেচছে, তার সঙ্গে কিছু কিছু তরকারি বেচাটাও বজায় রেখেছে।

রাখাল বলে, তুমিও কারবার বাড়াচ্ছ ভোলার মা ?

উপায় কী কন ? লাভ থাকে না।

ঠিক বলেছ। আমাদেরও ওই দশা। মালের দর চড়ছে, লাভ জমে যাচ্ছে ওপরের দিকে, আমাদের কপালে ঢুঢু !

ভোলার মার কাছে একটা গুরুতর খবর শুনে সাধনা কলোনিতে গিয়েছিল, সেখানে দেখা হল সুমতির সঙ্গে।

সেও ওই বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছে।

বলে, আপনি প্রায়ই এদিকে আসেন শুনেছি।

আমি এমনি আসি এদের সঙ্গে কথা-টথা বলতে। কী হাঙ্গামা হয়েছে শুনছিলাম।

প্রভাতবাবু শাসিয়ে গেছে, নিজেরা না উঠে গেলে মেরে তাড়াবে।

তাড়ালেই হল ! পাড়ায় লোক নেই !

সাধনার উষ্ণতায় একটু আশ্চর্য হয়েই সুমতি তাব দিকে তাকায ! বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু লোক থাকলেই তো হয় না, তাদের একসাথে জোটাতে হয়। প্রভাতবাবুর ভাড়াটে লোক হঠাৎ এসে হাঙ্গামা করবে। বড়ো কলোনি হলে ভিন্ন কথা ছিল, এইটুকু কলোনি, ক-জন আর মানুষ। পাড়ার লোক আসতে আসতে এদেব দফা শেষ হয়ে যাবে !

শুনে সাধনা চিন্তিত হয়ে বলে, প্রভাতবাবু শাসিযে গেছে, ওকেও শাসিয়ে দিলে হয় না ? দশজনে গিয়ে যদি আগে থেকে ধমকে দেয় যে এ সব কুবুদ্ধি চলবে না, ওর কি সাহস হবে হাঙ্গামা করতে ?

সুমতি আবার একটু আশ্চর্য হযে বলে, আপনি তো মন্দ কথা বলেননি ! হাঙ্গামা হবার আগেই ঠেকাবার চেষ্টা করলে দোষ কী ? আমি আজকেই সমিতির সভায় তুলব কথাটা।

কথা বলতে বলতে শোভার কথা উঠে পড়ে।

সুমতি বলে, শোভার বিয়ে হচ্ছে জানেন ? মল্লিকদের বাড়ির শোভা ?

শুনেছি।

কী কাণ্ড দেখুন, মেয়েটা গিয়ে আমায় ধরেছে, বিয়ে বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। এত লোক থাকতে আমায় গিয়ে ধরেছে, এই সেদিন আমি জেলে থেকে বেরিয়ে এলাম ! ওর বাড়ির লোকেব সঙ্গে শুধু জানাশোনা আছে, এই পর্যন্ত। আমি বলতে গেলে তারা শুনবে কেন আমার কথা ? বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমাব কথা বলার কী অধিকার ? শোভা ছাড়বে না, আমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সাধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে শুনছিল, শোভা চায় না বিয়েটা হোক ?

তাইতো বলছে। তিনবার গিয়েছে আমার কাছে। কত বুঝিয়ে বলেছি তোমার মতো নেই এটা জোর করে বাড়ির লোককে জানিয়ে দাও। নিজে না পারো, বউদিরা আছে, দিদি আছে, তাদের কাউকে দিয়ে বলাও ? তা, বলে কী, বলতে টলতে ও পারবে না, বলে কিছু লাভ নেই। কী ভীবু বলুন তো মেয়েটা ? বলে কি না, আপনি তো নানাকাজ করেন, আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিন। তার মানে বুঝেছেন ? বাড়িতে লড়াই করার সাহস নেই, চুপিচুপি পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমায়। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল মেয়েটা। নিজে কিছু করতে পারবে না, আমাকে করতে হবে। আমি আন্দোলন করি কি না, তাই বুঝি ভেবেছে একটা আন্দোলন করে ওর বিয়েটা ঠেকাতে পারব !

সাধনা বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আমি তো ভাবছিলাম, মেয়েটার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, বিয়ে হলে হোক না হলে না হোক সব সমান ওর কাছে। তাই তো ! বাড়িতে মুখ ফুটে কিছুই বলে না, আপনাকে গিয়ে ধরেছে !

বলুন তো ? শক্ত মেয়ে হয় পরামর্শ দেওয়া যায়। আত্মীয়বন্ধু হলেও বরং চেষ্টা করা যায়।

সাধনা চুপ করে ভাবে।

সুমতি কথা পালটে বলে, প্রভাতবাবুকে আগেই ধমকে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোক ডাকতে গেলে রাখালবাবুর আসা চাই কিন্তু।

রাখালবাবুকে বলবেন।

রাখাল মেলামেশা করে পাড়ার লোকের সঙ্গে কিন্তু হাঙ্গামার ব্যাপারে সে মাথা গলাবে এটা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।

সাধনা সোজা গিয়ে হাজির হয় মল্লিকদের বাড়ি। সময় অসময় খেয়াল থাকে না।

শোভা রাঁধছিল।

প্রভা বলে, আসুন, আসনু। এমন সকালবেলা হঠাৎ ? রান্না নেই ?

দুটি লোকের আবার বান্না। শোভা কই ?

মেজো বউ বলে, রাঁধছে বুঝি। বসুন না দিদি ? বীরেনবাবুর বউ আপনার খুব প্রশংসা করে।

সাধনা হেসে বলে, প্রশংসা মানে নিন্দা তো ? আমি শোভাকে একটু ডেকে নিতে এসেছি।

এখন ? দরকারটা কী দিদি ?

সাধনা নির্ব্বিবাদে মিছে কথা বলে, একটা খাবার করেছি, একটু চেখে আসবে।

চালাক কম নয় সাধনা। অন্য কারণে ডাকলে হয়তো প্রভারাও কেউ সঙ্গে যেত, এমনিই যেত। কিন্তু খাবার খেতে যখন শোভাকে একলা ডাকা হয়েছে, আর কেউ যাবে না জানা কথা, নিরিবিলি সে কথা কইবার সুযোগ পাবে শোভার সঙ্গে।

খাবার অবশ্য সে আনতে দেয় শোভার জন্য। ময়রা দোকান থেকে তৈরি খাবার। বলে, খাবার খেতে ডাকিনি কিন্তু, তোমার বিয়ের কথা বলতে ডেকেছি। আমার কাছে লুকোবে না কিছু। লজ্জা করবে না।

শোভা মুখ বুজে থাকে।

তুমি চাও না তো এ বিয়ে হোক ?

শোভা একটুখানি মাথা নাড়ে। না-চাওয়াটা যেন তার তেমন জোরালো নয় !

সত্যিই চাও না, না, শুধু একটু অনিচ্ছার ব্যাপার ? যদি ঠেকানো যায় ভালোই, না গেলে আর উপায় কী—এ রকম ভাব নয় তো তোমার ? চুপ করে থেকো না ভাই, স্পষ্ট করে কথা কও।

চাই না তো। আমি মানুষ না ?

সাধনা খুশি হয়ে বলে, মানুষ যদি তো চুপচাপ আছ কেন ? স্পষ্ট জানিয়ে দাও এ সব জোরজবরদস্তি চলবে না। তুমি না চাইলে কেউ বিয়ে দিতে পারে তোমার ? বাইশ বছর বয়স হয়েছে, এমনিতেই তো তুমি স্বাধীন, আইন দিয়ে তুমি বিয়ে ঠেকাতে পার। সকলে রেগে যাবে, বাড়িতে অশান্তি হবে, এ ভয়েই যদি মুখ বুজে থাক, তবে আর তুমি মানুষ রইলে কীসে ? একটা বিপদ ঠেকাবে, সে জন্য ঝঞ্ঝাট পোয়াবে না ?

শোভার মুখে একটা নিরুপায় হতাশার ভাব দেখা দেয়। একবার সে চোখ তুলে তাকায়। ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে।

আপনারা বুঝছেন না। সুমতিদিও খালি এই কথা বলছে। জোর করে তো বিয়ে দিচ্ছে না।

তবে তুমি ভাবছ কেন ? মুখ ফুটে জানিয়ে দাও, বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

আপনি বুঝবেন না। মুখ ফুটে কী জানাব ? কী বলব বাবাকে দাদাকে ? আমার যে কিছু বলার নেই।

সাধনা খানিক চুপ করে থাকে।

সত্যি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

শোভাও একটু চুপ করে থেকে বলে, কত বছর ধরে চেষ্টা করছে তো, এর চেয়ে ভালো জুটল না। কোন মুখে বলব এটাও বাতিল করে দাও ? যখন জিজ্ঞেস করবে, আমি তাহলে কী করব, আমার গতি কী হবে, কী জবাব দেব ?

বলবে যে তুমি আইবুড়ো থাকবে।

খাওয়াতে পরাতে পারবে না জানিয়ে দেবে।

পারতে হবে। কেন তোমায় লেখাপড়া শেখায়নি, মানুষ করেনি ?

শোভা আশ্চর্য হয়ে বলে, কী বলছেন ? এ কথার মানে হয় ? বোনেদের যেমন শিখিয়েছে, যেমন মানুষ করেছে, আমাকেও তেমনি করেছে। অবস্থাটা পালটে গেছে বলেই তো, নইলে বাবার কী দোষ, দাদার কী দোষ ? পাবলে তারা আমার বোনেদের মতো আমারও উপায় করে দিত। কী অবস্থা হয়েছে সেটা বুঝি তো। কোন মুখে বলব ?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। কঠিন দেখায় তার মুখখানা। শোভাকে খাবার দিয়ে বলে, খেয়ে নাও। খাবার খাওয়াবো বলে ডেকে এনেছি।

শোভা খায় এবং তার খাওয়ার রকম দেখেই বোঝা যায় পেটে তার চনমনে খিদে। আহা, তা হবে না ? বাইশ বছরের জোয়ান মেয়ে, তারও যদি না জোরালো খিদে পায়, তবে তো ধরে নিতে হবে মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে নির্বিশেষে মানুষ ডিসপেপটিক হয়ে জন্মায়।

রাত্রে সবে রাখাল বাড়ি ফিরেছে, প্রভাত সরকারের বাড়ি যাবার জন্য তাকে ডাকতে আসে।

খবর পাওয়া গেছে, আজ শেষরাত্রেই খুব সম্ভব প্রভাতের ভাড়া করা লোকেরা কলোনিতে হানা দেবে। এ বিষয়ে সোজাসুজি কথা বলার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক এখুনি তার বাড়িতে যাবে।

যাবে নাকি ?—সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

ঘুরে আসি।

জামা কাপড় না ছেড়েই রাখাল বেরিয়ে যায়।

প্রভাত বাইরের ঘরেই ছিল। বসে বসে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করছিল তিনজন লোকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বামাচরণকে দেখেই রাখাল চিনতে পারে।

রাজীবের ভক্তির সুযোগে শ-পাঁচেক সিগারেট ধারে বাগাতে সেই যে দোকানে গিয়েছিল, তারপর লোকটিকে আর দ্যাখেনি রাখাল। চেহারাটা কিন্তু স্পষ্ট মনে ছিল।

লোকটা যেন বাস্তব জ্ঞানের প্রতীক, তাই একবার দেখলেও অঞ্জনের মতো চোখে লেগে থাকে।

পাড়ার জন পনেরো ভদ্রলোককে এত রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে প্রভাত বেশ খানিকটা ভড়কে যায়।

কী ব্যাপার ?

সুমথের বয়স কম। কলেজে পড়ে। সেই মুখ খোলে সবার আগে। বলে, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে এই কলোনির লোকদের পেটাবেন। আমরা তাই এসেছি—

প্রভাত চটে বলে, যেখান থেকে উড়ো খবর পেয়েছ, সেখানে গেলেই হত ?

রাখাল তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে বলে, না না, কথাটা তা নয় প্রভাতবাবু। ছেলেমানুষ ঠিক বলতে পারছে না। কলোনির লোকেরা বলছে, আপনি ওদের মারধোর করে তাড়াবেন বলে

শাসিয়েছেন। একটা গুজবও রটেছে যে আপনি নাকি গুন্ডা ভাড়া করে রেখেছেন। আমরা গুজব শুনেই বিশ্বাস করে ছুটে এসেছি তা নয়। একজন ভদ্রলোক এ সব করবেন বলে আমরা বিশ্বাস কবি না। আমরা একটা অনুরোধ জানাতে এসেছি আপনাকে।

প্রভাত বলে, ও !

সুমথ বলে, অনুরোধ মানে ? এই মানুষটার কাছে অনুরোধ মানে ?

তার কথা কানে না তুলেই রাখাল বলে, আপনি কলোনির লোকদের উঠে যেতে বলছেন, আমরা চাই না এ নিয়ে কোনো হাঙ্গামা হয়। আপনি ওদের বুঝিয়ে হোক, অন্যভাবে হোক চলে যেতে রাজি করাতে পারেন, আমাদের কিছুই বলার নেই। পাড়ার মধ্যে আমরা হাঙ্গামা চাই না।

বামাচরণ প্রভাতের পিছন থেকে বলে, ইনিও কি হাঙ্গামা চান মশাই ? আপনারা বাজে গুজব শুনে ব্যস্ত হয়েছেন।

তবে তো কথাই নেই।

ফিরে যেতে যেতে অসন্তুষ্ট সুমথ বলে, একটু শাসিয়ে দেওয়া হল না, কিছু না, অনুরোধ জানিয়ে শেষ হয়ে গেল ?

রাখাল হেসে বলে, আবার কী রকম হবে শাসানি ? সাবধান, খববদাব, মাথা ফাটিযে দেব, এই সব বললে তুমি বুঝি খুশি হতে ? তার চেয়ে দশজন ভদ্রলোকের কাছে নিজেব মুখে জানাল ও সব ফন্দি এর নেই, সব বাজে গুজব, এটা ভালো হল না ? এ ভাবে হাঙ্গামা করার রাস্তা ওর বন্ধ হয়ে গেল না ?

বিনয় সেন বলে, ঠিক কথা। এ ভাবে বলাই ঠিক হয়েছে।

এদিকে প্রভাত জিজ্ঞাসা করে, কী করা যায় হে ?

বামাচরণ বলে, নাঃ, ও সব প্ল্যান চলবে না। আপনাকে তো বাস কবতে হবে এখানে, পাড়ার লোকদের নিয়ে। অন্য বুদ্ধি করতে হবে।

রাখালের কাছে কিছুই শুনতে হয় না সাধনার। খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণই সে জানতে পারে। লজ্জায় তার যেন মাথা কাটা যায় !

রাখাল সকলকে সামলে দিয়েছে, ঠান্ডা করে দিয়েছে। প্রভাতকে ভালো করে শাসিয়ে দেবার সুযোগ কেউ পায়নি শুধু রাখালের জন্য !

গায়ে পড়ে নেতৃত্ব নিয়ে রাখাল বড়োলোক বজ্জাতটার কাছে শুধু অনুরোধ উপরোধেব প্যানানি গেয়ে এসেছে। কেউ একটু গরম হয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছে, সকলকে সায় দিতে সে বাধ্য করেছে তার ভীরু সবিনয় নিবেদনে যে প্রভাতবাবু দয়া করে পাড়ার মধ্যে হাঙ্গামা করবেন না !

সুমথ বলে, আর বলবেন না সাধনাদি। আমি একটু শাসাতে গেলাম ব্যাটাকে, রাখালদা আমাকেই শাসিয়ে দিলেন !

যে তীব্র আর অসীম ঘৃণা সাধনা তার চোখে দেখতে পায় তাতে তার চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সাধনাও আর আগের দিনের ঘরের কোণের সেই জীবটি নেই।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, সুমতি তোমার কে হয় ?

এক মুহূর্ত চোখ পাকিয়ে চেয়ে থেকে সুমথ আচমকা হেসে ফেলে।

আমার নাম সুমথ, ওর নাম সুমতি, তাই বলছেন ? সুমতি আমার কেউ হয় না।

তোমাদের খুব ভাব দেখি কি না—

আমার চেয়ে দু-তিনবছর বয়সে বড়ো দু-ক্লাস উঁচুতে পড়ে।

সুমথ মুখে এমন একটা গম্ভীর ভাব এনে কথাটা বলে যে এবার সাধনা হেসে ফেলে।

মেয়েরা বয়সে একটু বড়ো হলে, দু-এক ক্লাস উঁচুতে পড়লে তাদের সাথে ভাব হতে পারবে না, এমন কোনো আইন আছে নাকি ভাই ?

তা অবশ্য নেই, ও সব গোঁড়ামিতে আমি বিশ্বাসও করি না। কিন্তু কী জানেন, মেয়েরাই কেমন যেন একটু—

ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেয় ? পাত্তা দেয় না ?

সুমথ মুখ লাল করে বলে, আপনি কিছু বোঝেন না। আপনার শুধু ওই এক চিন্তা। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যেন আর কোনো রকম সম্পর্ক নেই। আমি কি পাত্তা চেয়েছি যে সুমতি পাত্তা দেবে না ?

আমি কি তোমার কথা বলেছি ? আমি সাধারণভাবে দশটি সাধারণ ছেলের কথা বলছি। তুমি নয় মহাপুরুষ, তোমার কথা বাদ দিলাম !

সুমথের মুখে যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

দেখে সাধনা ভাবে, সেরেছে ! ঝগড়া করবে না তো, ছেলেমানুষি বিক্ষোভের ঝড় তুলে ? তারপর আবার কান্না শুরু হবে না তো, ছেলেমানুষি দুঃখের কান্না ?

কিন্তু সাধনা কি জানে নিজে সে কোথায় আছে আর কোথায় পৌঁছেছে এ যুগের বিদ্রোহী ছেলে !

তাকে অবাক করে দিয়ে বুড়োর মতো সুমথ বলে, আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি। আপনি বাঁশঝাড় দেখে বন চিনেছেন। বড়ো মেয়েদের জন্য অনেক ছেলের পাগলামি আসে বইকী, নিশ্চয় আসে ! অনেক ছেলে মানে কত ছেলে সেটাই আপনি জানেন না। ওরা কোন শ্রেণির ছেলে সেটাও হিসেব করেন না।

তাই নাকি !

তাছাড়া কী ? জোয়ান মদ্দ পুরুষের চেয়ে আপনারা এই সব কলেজি ছেলেদের বেশি ভয় করেন—এড়িয়ে চলেন। তাতে এই সব ছেলেরা আরও বেশি করে আপনাদের দিকে ঝোঁকে কি না, আরও বেশি পাগল হয় কি না, আপনারা তাই ভারী মজা পান, খুশি হন।

সাধনা গালে হাত দেয়।

কিন্তু ছেলে বলতে আজকাল ওদের আর বোঝায় না সাধনাদি, বুঝলেন ? সব ছেলের মধ্যে বড়োলোক আর পাতি বড়োলোক ছেলে ক-টা ? ওদের মধ্যে বাঁকা রোমান্সের ব্যারামটা ছড়ানো গিয়েছিল বলে সব ছেলে ওই ব্যারামে ভোগে বলা ভারী অন্যায় আপনাদের।

সাধনা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, সত্যি অন্যায়। যে বিষয়ে কোনোদিন ভাবিনি, সে বিষয়ে বড়ো বড়ো কথা বলার রোগ আমাদের সত্যি আছে ভাই। হাওয়ায় চড়ে বেড়াই তো আমরা।

তার এই বিনয়ে খুশি হয়ে সুমথ বলে, এবার ভাবছেন তো ? ভাবতে হচ্ছে তো আজকাল ? তবেই বুঝে দেখুন। আপনারা ঘরের কোণে জীবন কাটান, আপনাদের পর্যন্ত এ সব না ভেবে উপায় থাকছে না। ছেলেরা কী রকম ভাবনায় পড়েছে ভাবুন তো ? কী জানেন সাধনাদি, ছেলেদের দোষ নেই, ছেলেদের বিগড়ে দেবার জন্য ভীষণ চেষ্টা করা হয়।

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, শুধু ছেলেদের নয় ভাই। পরশু দিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। কী ভিড় ! সিনেমা দেখে এসে মনে হচ্ছিল, দূর, এভাবে বেঁচে থাকাই মিছে। তার চেয়ে সব কিছু চুলোয় দিয়ে মজাদার রংদার কিছু করা যাক।

সুমথ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসে সাধনাকে। বলে, আপনাকেও গেঁয়ো ভাবতাম। মাপ চাইছি !

সাধনা অনুযোগ দিতে রাখাল হেসে বলে, এটা তোমার ছেলেমানুষি গায়ের জ্বালা। মারব কাটব ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব—এ সব বললেই কি বেশি শাসানো হত ? না গালাগাল দিয়ে অপমান করলে বেশি ভয় পেত ? দশজনের কথার জোরটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা কেন আগে থেকেই ধরে নেব যে আমরা বলার পরেও নিজের মতলব হাসিল করার স্পর্ধা লোকটার হবে ? আগে থেকে ভয় দেখাতে যাব কেন ? তাতে আমাদেরই দুর্বলতা প্রকাশ পেত।

প্রভাতবাবু শুনবে তোমাদের কথা ?

শুনবে না ? ওর এটুকু বুদ্ধি নেই ? সবাই বারণ করলে সে কাজটা যে করা যায় না, মূর্খেও এটা বোঝে।

সাধনা যতটা জ্বালা বোধ করেছিল, রাখালের এই সামান্য কয়েকটি কথায় সেটা একেবারে জুড়িয়ে যাবে, এটা যেন তার পছন্দ হয় না। অথচ রাখাল ঠিক কথাই বলেছে—এটা না মেনেও উপায় নেই নিজের কাছে।

সাধনার তাই অন্য একটা জ্বালা আছে।

সে কি রাখালের চেয়ে সব দিক দিয়েই ছোটো ? বিদ্যায় বুদ্ধিতে বাস্তববোধে আত্মসংযমে কর্মনিষ্ঠায়—মনুষ্যত্বে ? মানুষ হিসাবে রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করার কথাটা জীবনে আজ প্রথম মনে আসে সাধনার। বেকার রাখালের সঙ্গে এতবড়ো প্রচণ্ড সংঘাত গেল, ভেঙে প্রায় চুরমার হবার উপক্রম হল তাদের জীবন—কিন্তু তখনও এ রকম তুলনামূলক আত্মসমালোচনার চিন্তা তার খেয়ালেও উঁকি মেরে যায়নি।

সে শুধু বিচার করেছে রাখাল কেমন মানুষ, কেমন স্বামী।

ভাঙনটা সামলে নেবার পর আত্মসমালোচনা অবশ্যই এসেছে। নিজের কতগুলি বড়ো বড়ো দোষ আর ভুল সে আবিষ্কার করেছে নিজেই। নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে যে দোষ কেবল রাখালের একার ছিল না, নিজেও সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধৈর্য হারিয়েছিল, নিজের সুখ দুঃখ অর্থাৎ স্বার্থটাই সব চেয়ে বড়ো করে ধরেছিল।

কিন্তু রাখালের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেনি।

মানুষ হিসাবে তুলনা।

মানুষের যেগুলি গুণ, মানুষ হিসাবে যাতে পরিচয় মানুষের, রাখালের সঙ্গে নিজের সেই গুণগত তুলনা। কোন গুণটা তার বা রাখালের আছে বা নেই, কোন গুণটার বিকাশ কতখানি হয়েছে তার আর রাখালের মধ্যে।

একটু ভেবে দেখবার অবসর চেয়ে প্রাণটা যেন ছটফট করে সাধনার।

এ দেশের মেয়েরা পিছিয়ে আছে। সে তা জানে এবং মানেও। রাখালের তুলনায় সে কোনোদিক দিয়ে কতখানি পিছিয়ে আছে একান্তে একটু হিসাব করে দেখার জন্য তার যেন ধৈর্য ধরে না।

কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে শ্রান্তক্লান্ত মানুষটা বাড়ি ফিরেছে, জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট একটু বিশ্রাম করছে—এখন ওকে এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে রুটি বেড়ে খেতে দেওয়া আর মন বুঝে ঘুমানোর আগে একটু গা ঘেঁষে যাওয়া ইত্যাদি কর্তব্যগুলি পালন না করে নিজের চিন্তা নিয়ে মশগুল সে কোন হিসাবে হয় ?

যার খাচ্ছে যার পরছে যার ভাড়া করা ঘরে মাথা গুঁজে আছে, মানুষ হয়ে তার জন্য একটু না করলেই বা চলে কী করে ?

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আদান-প্রদানের একটা বাস্তব নিয়মনীতি আছে তো।

মন কিন্তু মানে না।

জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। রুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে যেতে উঠানটুকুতে যে জ্যোৎস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছা হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওই আকাশে। সাধনাও ভাবে যে এ কী আশ্চর্য ব্যাপার ? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির তফাত তো এই যে পৃথিবীর ঘরবাড়ি মাঠ পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলোমাখা রূপ নিয়ে ধরা দেয় চোখে—চোখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোৎস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয় ?

মেঘ আর চাঁদের আলোয় মেশানো শোভা হোক, অথবা নির্মেঘ আকাশের শোভা হোক ?

বাইরে কড়া নড়ে।

রুটির থালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে সাধনা শুধোয়, কে ?

বন্ধ দরজার ও পাশ থেকে বামাচরণ বলে, প্রভাতবাবু এসেছেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দুটো কথা কইবেন।

একমুহূর্ত ভাবে সাধনা।

প্রভাতবাবুরাই কি তবে তাকে একান্তে একটু চিন্তা করার ছুটি এনে দিল ?

অথবা কর্তব্য হিসাবে দরজা না খুলেই এদের বলবে, একটু দাঁড়ান, উনি খেতে বসেছেন, আসছেন ? বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্ত রাখালের সামনে রুটি-তরকারির থালাটা ধরে দিয়ে সে খেতে আরম্ভ করলে ধীরেসুস্থে বলবে যে বাইরে কে বুঝি তোমায় ডাকছে ?

শ্রান্তি ?

ক্লান্তি ?

ক্ষুধা ?

চুলোয় থাক সব !

সাধনা দরজা খুলে দেয়।

বলে, আসুন।

ভরা জ্যোৎস্নায় তার দিকে চেয়ে প্রভাত যেন থতোমতো খেয়ে ভড়কে যায় !

আমতা আমতা করে বলে, রাখালবাবু আছেন ?

তখন খেয়াল হয় সাধনার। হায়, ছুটি পাবার আশায় দিশে হারিয়ে সে একবারে ভুলে গেছে যে সে তার বউয়ের চাকরিতে ডিউটি করছে। আশারা শুয়ে পড়েছে দরজায় খিল দিয়ে। শায়া ব্লাউজ খুলে ফেলে রেশন-মার্কা সুপারফাইন নতুন শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে সে রেশনের গমভাঙা রুটি আর আলুপেঁয়াজের তরকারি থালায় নিয়ে খেতে দিতে যাচ্ছিল রাখালকে।

কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। উপায় কী।

একটু দাঁড়ান, আমি ভদ্রমহিলা সাজি, বলে তো আর এদের সামনে শায়া ব্লাউজ গায়ে চড়ানো যায় না।

সাধনা স্পষ্ট সহজভাবে বলে, ভেতরে আসুন, উনি ঘরে আছেন। খেতে বসেছেন।

বলে সে নিজেই এগিয়ে যায়। তার নিজের হাতে তৈরি পাশাপাশি লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা আর সরস্বতীর বাহন হাঁস আঁকা আসনে উপবিষ্ট রাখালের সামনে থালাটা নামিয়ে দেয়।

বলে, প্রভাতবাবুরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন।

বলে, প্রভাত আর বামাচরণকে ডেকে বলে, আসুন। ঘরে আসুন। চেয়ার-টেয়ার নেই, খাটেই বসুন দুজনে। উঠছ কেন তুমি ? খেতে খেতেই কথা বলো না এঁদের সঙ্গে।

বাইরে সাধনার বিছানার চাদরটা শুকোচ্ছিল, সেটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আশা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কে এল ?

সাধনা একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, প্রভাতবাবু ওর সঙ্গে কইতে এসেছেন। কলোনির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয়।

এতই আত্মসচেতন হয়েছে সাধনা আজকাল যে আশার কাছে এই গর্বপ্রকাশ তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে ভাবে, আমার হয়েছে কী ? কী নিয়ে আমি ফুটানি করলাম আশার কাছে ?

প্রভাতের মতো লোক তাদের বাড়িতে এসেছে বলে অথবা পাড়ার মধ্যে রাখাল নেতার সম্মান পেয়েছে বলে তার অহংকার—সাধনা বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ হাতে খেলনা পাওয়ার মতো দুটো কারণেই যে বুকটা হঠাৎ তার বেশ একটু ফুলে উঠেছে, নিজেকে এতটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য সাধনার জন্মেনি।

তাহলে অনেক সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কাছে, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত।

তার আত্মচিন্তা আর আত্মসমালোচনাও যে কোন চেতনার প্রক্রিয়ায় পাক খাচ্ছে সেটা ধরা পড়ে যেত তার কাছে। রাখালের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে ছোটো মনে হবার বদলে কী যে তাকে পিছনে কোথায় ঠেলে রেখে দিয়েছে সেটা জানতে পারত।

কী কথা হয় শোনার জন্য আশাও দরজার কাছে তার পাশে দাঁড়ায়।

প্রভাত বলে, অসময়ে এসে আপনাকে আমরা বিরক্ত করলাম। আপনি খেয়ে নিলেই পারতেন।

রাখাল বলে, খাবখন সে জন্য কী। মেয়েদের বুদ্ধি তো, দুজন ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছেন, পরে খাবারটা দিলেই হয়। বলে গেলেন, রুটি চিবোতে চিবোতে কথা বলো ! ভাত হলে তবু তাড়াতাড়ি গেলা যেত।

বামাচরণ বলে, তা যা বলেছেন দাদা ! রুটি চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। ক-বছর বাদে দেখবেন বাঙালির মুখের চেহারা পালটে গেছে। রোজ মুখের নতুন রকম ব্যায়াম হচ্ছে তো !

বলে সে সশব্দে হাসে।

প্রভাত বলে, তাহলে আর আপনার দেরি করিয়ে লাভ নেই, কথাটা সেরে ফেলা যাক। সেদিন আপনারা দশজনে গেলেন, সকলের সামনে আর তর্কের কথা তুললাম না। আপনারা ধরে নিয়েছেন, গোলমাল বুঝি আমিই করতে চাই। আমার মশাই হাঙ্গামা করে লাভ ? সে দিনকাল কি আর আছে যে জমিদারি দাপটে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেব ? কথাবার্তা বলে ন্যায়সঙ্গত একটা মীমাংসা হোক, তাই তো আমি চাই।

রাখাল বলে, সেটাই তো ভালো কথা।

আপনারা সেদিন আমায় বলে এলেন, হাঙ্গামা যেন না হয়। হাঙ্গামা করার কথা আমি ভাবিওনি। কিন্তু এদিকে কলোনির লোকেরা যে আমায় পিটোবে বলে শাসাচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখছেন না ?

সে কী কথা ? কলোনির লোকেরা যদি গোলমাল করে, আমরা দশজনে ওদেরও নিশ্চয় শাসন করে দেব।

সাধনা চুপ করে থাকতে পারে না।

ভিতরে গিয়ে সোজাসুজি প্রভাতকে বলে, কিন্তু ওরাই বা মিছিমিছি আপনাকে পিটোতে চাইবে কেন প্রভাতবাবু ?

বিছানার চাদর জড়ানো ঘরের বউকে কলোনিবাসীর পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে দেখে প্রভাত একটু ভড়কে যায়। তার হয়ে বামাচরণ বলে, সেই কথাই বলছি আমরা। উচিত কী অনুচিত বিচার

করবে না, কোনো কথা শুনবে না, ওদের জিদ বজায় রাখবে। এইখানে জমি দখল করে থাকবে, আর কিছু বিবেচনা করতে রাজি নয়। নড়তে বললে মাথা ফাটিয়ে দেবে, মারামারি করবে।

ওরাই বা কোথায় যায় বলুন ? একবার নিরাশ্রয় হয়েছিল, কুঁড়েঘরে মাথা গুঁজে আছে। আবার কি নিরাশ্রয় হতে বলেন ওদের ?

ওই তো মুশকিল, ওরাও ঠিক একগুঁয়ের মতো কথা বলছে। আমরা ওদের নিরাশ্রয় হতে বলছি কী বলছি না—

যেখানে উঠে যেতে বলছেন, সেখানে মানুষ থাকতে পাবে না।

বামাচরণ অসহায়ের মতো একটা নিশ্বাস ফেলে। গভীর আপশোশের সঙ্গে বলে, আপনিও সব কথা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন—কী আর বলা যায় বলুন ?

রাখাল এবার বিরক্তি জানিয়ে সাধনাকে বলে, তুমি আবার তর্ক জুড়লে কেন ? ওরা কী বলছেন শোনা যাক আগে ?

সাধনা চুপ করে থাকে।

বামাচরণ প্রভাতের দিকে তাকায়।

প্রভাত বলে, তুমিই বলো।

বামাচরণ বলে, দেখুন, এ ভদ্রলোককে আপনারা একেবারে ভুল বুঝেছেন। কলোনির লোকেরাও ভুল বুঝেছে, আপনারাও ভুল বুঝেছেন। কলোনির ওদের ও জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা এঁর মতলব নয়, ইনি যে প্ল্যান করেছেন সেটা ওদেরও মঙ্গলের জন্যই। এঁর কি স্বার্থ নেই ? নিশ্চয় স্বার্থ আছে, শুধু ওদের মঙ্গল করার জন্যই ইনি প্ল্যানটা করেননি। এঁর স্বার্থও বজায় থাকবে, কলোনির ওদেরও একটা স্থায়ী ভালো ব্যবস্থা হবে—এই জন্যই এঁর এত উৎসাহ।

প্ল্যানটা কী ?

বামাচরণ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে শোনায়। আসল ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয় কিন্তু সে এমনভাবে বলে যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে শ্রোতা দুজনের মাথায় ঢুকবে না।

কলোনির জমিতে প্রভাত একটা কারখানা গড়বে। স্টোভ, ল্যাম্প, লোহার উনান, বালতি ইত্যাদির কারখানা। কারখানার সঙ্গে সে তৈরি করবে খাটুয়েদের বসবাসের জন্য বড়ো একটা ব্যারাক। এই কারখানায় সে কাজ দেবে কলোনির লোকদের—যতজন কাজ করতে চায়। ব্যারাকের পাকা ঘরে তারা বাস করতে পাবে।

বামাচরণের ব্যাখ্যা শুনতে প্রভাত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মুখপাত্র থামতেই সে বলে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আমার, অনেকদিনের লাইসেন্স নেওয়াই আছে। এইসব মানুষগুলির কথা ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল যে ফ্যাক্টরিটা স্টার্ট করে দিলে এদেরও আমি একটা হিল্লে করে দিতে পারি তখন ভাবলাম, তাহলে আর দেরি করা উচিত নয়। এখানে আর ক-জন লোক থাকে ? সকলেই অবশ্য ফ্যাক্টরিতে আসবে না, কেউ কেউ এ দিক ও দিক অন্যকাজে ভিড়ে গেছেন। বেশির ভাগ লোককেই আমি কাজ দিতে পারব—বরং আরও লোক আমার দরকার হবে।

বামাচরণ বলে, বাইরের লোক কিছু নিতে হবেই। এরা সবাই আনাড়ি—কাজ শেখাতে হবে। কিছু কাজ-জানা লোক ছাড়া তো ফাক্টরি চলবে না।

রাখাল বলে, আপনার এ প্ল্যানের কথা তো কেউ শোনেনি প্রভাতবাবু ?

শুনতে না চাইলে কাকে শোনাবো বলুন ? ওদের বলতে গেলাম, তোমাদের ভবিষ্যতে উপকার হবে, ছ-মাস আট মাসের জন্য জমিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় থাকবে যাও। শুনেই সকলের মেজাজ গরম—তাড়াবার চেষ্টা করলে আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে ! কাকে কী বলব বলুন ?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, ওদের যেখানে যেতে বলছেন, কারখানাটা সেখানে করুন না ?

বামাচরণ একটু হাসে।

কর্তারা ওখানে করতে দেবেন না। ওখানে কী সব করা হবে, পাঁচ-সাতবছর পরে প্রভাতবাবুকেই ছেড়ে দিতে হবে জমিটা। টেম্পোরারি শেড ছাড়া ওখানে কিছু তোলার হুকুম নেই। বুঝলেন ?

সাধনা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী যে সব গোলমেলে ব্যাপার !

বামাচরণ সায় দিয়ে বলে, আর বলেন কেন ! গবর্নমেন্টের কোন কাজের মানেটা আমরা বুঝতে পারি ? সব গেলেমেলে ব্যাপার।

বামাচরণ মুখে গবর্নমেন্টের সমালোচনা শুনে সাধনা কী বলবে ভেবে পায় না।

রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, সত্যিই যদি আপনি এটা করতে চান প্রভাতবাবু—

সত্যই চাই মানে—

রাখাল শান্তভাবেই বলে, ওভাবে নেবেন না কথাটা। আমি বলছি দশজনকে কনভিন্স করানোর কথা। আপনার প্ল্যান খুব ভালো, সকলের খুশি হয়ে মেনে নেবার কথা। কলোনির ওরা এত কষ্ট করছেন—কয়েকটা মাস একটু খাবাপ জায়গায় গিয়ে থেকে যদি ভবিষ্যতের উপায় হয়, ওরা এককথায় রাজি হবেন। কিন্তু বোঝেন তো, নানালোকের মনে নানাপ্রশ্ন জাগবে। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত কিছু না করেন—

প্রভাত বলে, তাহলে মীসাংসা কী করে হবে বলুন ? আমি কারখানা দেব, ওরা আমার জমি আটকে রাখবেন, এতো আর হয় না ! আমি বাধ্য হয়েই যেভাবে পারি ওদের তুলে দেবার চেষ্টা করব।

রাখাল বলে, সকলকে যদি ডাকা যায়, আপনার কথাটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে রাজি আছেন ? কারখানায় ওদের সকলকে কাজ দেবেন, ব্যারাকে থাকবার ব্যবস্থা করবেন—এ সব জানিয়ে দেবেন ?

নিশ্চয় !

প্রভাত ও বামাচরণ চলে যাবার পর রাখাল খেতে বসলে সাধনা বলে, তুমি কত বড়ো দায়িত্ব নিলে বুঝতে পারছ ?

আমার কী দায়িত্ব ?

তুমিই তো ডাকবে সকলের মিটিং ? তোমার সেই মিটিংয়েই তো প্রভাতবাবু তার প্ল্যানের কথা বলবেন আর ওদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে ? তোমাকে দায়ি করবে না লোকে ?

মুখের চিবানো রুটি গিলে রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো !

আজ সে আচমকা টের পায় যে দশজনের ব্যাপারে এগিয়ে গেলে দায়িত্ব এসে চাপবেই !

সে হয়তো স্থির করবে না কিছুই, কী করা উচিত বা অনুচিত কোনো পরামর্শই হয়তো দেবে না, শুধু প্রভাতের প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য অগ্রণী হয়ে দশজনকে একত্র জড়ো করাবে।

তবু, সেই দশজনের জমায়েতে যে সিদ্ধান্ত হবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকবে তার।

কেন সে দশজনকে জড়ো করতে এগিয়ে গিয়েছিল ? চুপচাপ গা বাঁচিয়ে না থেকে কী তার প্রয়োজন হয়েছিল দশজনের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার ? নিজের কাজ করে যাক আর চুপচাপ নিজের ঘরের কোণে বসে থাক—কেউ তাকে কোন বিষয়ে দায়ি করবে না।

কিন্তু দশজনের ব্যাপারে এক পা এগোলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না।

দশজনের ভালোমন্দ তো ছেলেখেলা নয় যে দায়িত্ব এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে ভালো করতে আসরে নামা যাবে।

নাম কেনা যাবে সস্তায় !

সাধনা তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলে, দ্যাখো, একার বুদ্ধিতে কিছু করা আমার মত নয়। মিটিং ডাকার কথাটা প্রভাতবাবুদের বলা তোমার উচিত হয়নি। আগে পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর ভালো মনে করলে জানালেই হত। তুমি হুট করে মিটিং ডাকার দায়িত্বটা নিয়ে বসলে !

তুমি থামো। দোহাই তোমার !

কেন, অন্যায় কথাটা কী বললাম ?

অন্যায় কথা বলোনি। আমায় একটু রেহাই দাও।

মেজাজ বিগড়ে গেছে রাখালের ! তার দায়িত্বের কথাটা সাধনা মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়—মনে পড়িয়ে দিয়ে সমালোচনা জুড়েছে বলে। চুপ করে থাকলে রাখালের রাগ হত না। জের টেনে উপদেশ দিতে আরম্ভ করায় সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের।

কারণ, সাধনার কথাগুলি যেমন ঠিক, তেমনি বেঠিকও বটে। এ কথা সত্য যে একার বুদ্ধিতে কাজ করা ভালো নয়— কিন্তু তাই বলে কখনও কোনো অবস্থায় কেউ কোনো ব্যাপারে নিজের বুদ্ধির দায়িত্ব নেবে না, তাহলেই বা চলে কী করে ?

দায়িত্ব যদি সে নিয়ে থাকে, নিয়েছে। সে জন্য এত সমালোচনা করা ও উপদেশ ঝাড়াব দরকার কী সাধনাব ? এই হল রাখালের বাগের কারণ।

সাধনার মনটাও তার ভালো ছিল না। শরীরটাও ছিল খুব শ্রান্ত।

রান্নাঘবে হেঁশেল গুছানোই ছিল। তবু সেখানেই যায় সাধনা। আর কোথাও গিয়ে একটু একা হবার জায়গা তার নেই।

সে শুধু ছোটো নয়। রাখালও তাকে ছোটোই ভাবে। আজ তার চরম প্রমাণ মিলেছে। ঘবসংসার বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ স্বার্থের কথা নয়। কলোনির মানুষগুলি সম্পর্কে তার আগ্রহেব খবর রাখাল রাখে। ওদের ভালোমন্দেব প্রশ্ন নিয়ে ঘরোয়াভাবে তার সঙ্গে আলাপ করতে রাখাল নারাজ নয়– শুধু এ প্রশ্ন কেন, দাম্পত্য আলাপ-আলোচনার স্তরে দেশবিদেশের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে রাখালের আপত্তি হয় না।

কিন্তু কলোনির ওই মানুষগুলির বাস্তব প্রত্যক্ষ সমস্যা নিয়ে দাম্পত্যালাপের বদলে সমালোচনা ও পরামর্শ শুরু করামাত্র ছোটো মুখে বড়ো কথা শুনেই রাখালের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

প্রভাত ও বামাচরণকে সরাসরি ঘরে এনেছিল বলে রাখাল বিরক্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে ! বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু রাগ করেনি। এখন সাধনা বুঝতে পারে রাখালের রাগ হয়েছিল তখন যখন সে যেচে মাথা গলিয়েছিল তাদের আলোচনায়, সবাসরি প্রভাতকে প্রশ্ন করেছিল, তর্ক জুড়েছিল।

আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে সাধনার কাছে।

পাড়ায় এত লোক থাকতে প্রভাতেরা তাদের ঘরে এসেছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে— আশার কাছে এ জন্য রীতিমতো সে গর্ববোধ করেছিল।

গর্ব সে একাই বোধ করেনি।

রাখালের কাছেও এ একটা স্মরণীয় ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নেতা হিসাবে গণ্য হবার অভিমানের স্বাদ পেয়েছে রাখাল—প্রভাত ও কলোনিবাসীদের সংঘাতের একটা মীমাংসা করার দায়িত্ব পেয়ে সে সুখী বই অসুখী হয়নি।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। আসলে একটা জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্য রাখালের দুশ্চিন্তা জাগেনি। কীভাবে সে কী ব্যবস্থা করবে এ সব কথাই সে ভাবছিল গভীরভাবে।

দুর্ভাবনায় নয়, এই ভাবনায় ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল তার মুখ।

এ ব্যাপারে রাখাল এগিয়ে যাবে। কিন্তু তার উপদেশ ও পরামর্শ শুনতে সে রাজি নয়।

অথচ কাজে রাখাল সাধনার উপদেশ অনুসারেই চলে। সাধনা তাকে অন্যের সাথে পরামর্শ করতে বলেছিল এটা অবশ্য খেয়াল না রেখেই।

নিজেই সে হিসাব করে। এবং হিসাব করে পরদিন সকালে যায় সুমতির কাছে।

সুমথ তখন সুমতির কাছে সাধনার সঙ্গে তর্কাতর্কির গল্প করছিল।

সুমতি খুশিতে গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে না বলে রাখাল একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

সুমথের উপস্থিতিটা তার পক্ষে বরদাস্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুমতি বলে, আসুন রাখালবাবু। সকালবেলাই যে ?

একটু দরকারি কথা ছিল।

বলে সে সুমথের দিকে বিশেষভাবে তাকাতে আরম্ভ করতে না করতে সুমথ যেন অদৃশ্য হয়ে যায় !

কী কথা বলুন ?

সবকথা খুলে বলার ইচ্ছা রাখালের ছিল না। সুমতিকে মোটামুটি প্রভাতের প্ল্যানের কথা জানিয়ে মিটিং ডাকতে তার সাহায্য চাইবে ভেবেছিল।

কিন্তু সুমতির সঙ্গে পারা দায়।

সে জেরা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকথা জেনে নেয়।

তারপর মন্তব্য করে, ওদের কোনো মতলব আছে। নইলে এ প্ল্যানের কথা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিল কেন ? ওদের তো নিশ্চয় জানাত, তোমাদের মঙ্গালের জন্যই তোমাদের তাড়াচ্ছি !

রাখাল বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

তবে মিটিং ডাকার ভার নিলেন কেন ?

সুমতি শুধু প্রশ্ন করেছে। সাধনা স্পষ্ট নিন্দা করেছিল। কিন্তু দুজনের কথার সুর যেন একই !

রাখাল ভেবেচিন্তে বলে, মিটিং ডাকাই তো ভালো? আগে ওদের অন্যরকম মতলব ছিল, সে তো জানা কথাই। জোরজবরদস্তি করে সকলকে ভাগাবার ফিকির ছিল। কিন্তু যাই হোক, সে সব মতলব তো ছাড়তে হয়েছে। এখন সকলের সামনে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে কারখানা গড়বে, সকলকে কাজ দেবে—খানিকটা করতে হবে নিশ্চয়। একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না।

ওদের বিশ্বাস কী ?

কিন্তু আর কী করার আছে বলুন ? এ ভাবে তবু ওদের খানিকটা বাঁধা যাবে, ওদের নিজেদের কথায়। কিছু না করে পারবে না কলোনির লোকদের জন্য। অন্যদিকে দেখুন, ওদের এ প্ল্যানটা না মানলে ওরা কি ছেড়ে কথা কইবে ? যেভাবে পারে কলোনির লোকদের তাড়াবেই। গুন্ডা লাগাবে, পুলিশ আনবে—

সেই ভয়ে—?

ভয়ে নয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আপনি আমি প্রাণপণ করেও ওদের কি রাখতে পারব এই জমিতে ? ধরুন আপনি আমি রক্ত দিয়ে ওদের ওখানে রাখলাম, কুঁড়েগুলি টিকিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর ? দু-চারহাত জমিতে হোগলার ঘর তুলে বুনো অসভ্যের মতো ওদের জীবন কাটবে, এটাই কি আমরা চাই ? প্রভাতবাবুর জমিতে এভাবে মাথা গুঁজে থেকেই কি এদের মোক্ষলাভ হবে ? মানুষ হয়েও এ রকম অমানুষের মতো বাঁচার জন্যই কি এরা লড়াই করবে, আর আমরা সেটাই আদর্শ বলে ধরে নেব ?

সুমতি চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, ভিখারিরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না দিলে ভিখাবিরা বাঁচবে না, সকলে ওদের ভিক্ষা দিন—এই বলে কি আমরা আন্দোলন করব ? কলোনির ওরা বিপাকে পড়েছে সত্যি। কিন্তু আমরা কি কলোনিটা কোনোরকমে বজায় রাখতে আব সব ভুলে গিয়ে প্রাণ দেব ? এদিকে যে দুর্ভিক্ষে লাখ লোক মরছে ?

সুমতি বলে, আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।

রাখাল বলে, মাথা আমারও ঘুরছে। রামরাজ্যে হনুমান না হয়ে মানুষ হতে চাইলে মাথা ঘুরবেই।

পাড়ার দু-চারজনেব সঙ্গে রাখাল কথা বলে।

বীরেন ছাড়া বাকি ক-জনেই আপিসগামী মানুষ। একেবারে ঘড়ির কাঁটায বাঁধা জীবন—বাসে দারুণ ভিড় হয় বলে কত মিনিট বাড়তি সময় রিজার্ভ রাখা দরকার তাও হিসাবে বাঁধা। রাখাল সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে, তারাও অল্প কথায় সায় দেয়। রাখাল দায়িত্ব নিয়ে যা করবে তাতেই তাদের সমর্থন আছে।

দোকান বাজাব রেশন ইত্যাদি জরুরি কর্তব্য সারতে হবে আপিস যাওযাব আগে, বিস্তাবিত আলোচনাব সময় নেই ?

রাখাল আর সে রাখাল নেই। আগে সে ভেবে বসত যে সবাই এরা গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। গন্ডগোলে কাজ নেই ! কিন্তু আজ সে জানে যে এরা বড়োই বিব্রত এবং ব্যতিব্যস্ত কিন্তু কেবল সেই জন্য সমর্থন জানিয়ে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এটা নয়।

তাকে এরা বিশ্বাস করে। এবা জানে এ ব্যাপারে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। ভুল সে করতে পারে কিন্তু কোনোবকম মতলব হাসিল কবাব বজ্জাতি তার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এটুকু বিশ্বাস যাকে করা যায় না তেমন কেউ এলে এদের রকম যেত বদলে, অগ্রিম ঢালাও সমর্থন জানিয়ে দেবার পবিবর্তে একেবারে অন্যভাবে অন্যভাষায় কথা বলত !

বিনয় যেন প্রায় কৃতজ্ঞতায় গলে গিযে বলে, হ্যাঁ দাদা আপনি একটু লাগুন, হাঙ্গামা-টাঙ্গামা যাতে না হয় দেখুন। আমরা আপনার সাথে আছি।

বাড়িওলা বীরেনের অনন্ত অবসর। সময় কাটতেই চায় না—অতিভোগে প্রায পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভোগশক্তির ভোঁতা মন্থর দিনগুলি কাটানোই তার দারুণ সমস্যা।

রাখালকে সে যেন আঁকড়ে ধবে। খুঁটিয়ে খুঁটিযে সে যেন জানাব চেষ্টা কবে বাখালও যা জানে না, কতরকম যে মন্তব্য করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

রাখাল শেষে ধৈর্য হারিয়ে বলে, প্রভাতবাবু আর বামাচবণ তো আপনাব সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন দত্তমশাই। আপনি তো সবই জানেন ?

অন্য লোকে লজ্জা পেত কিন্তু লজ্জাশরম সবই ভোঁতা বীরেন দত্তের।

আহাঃ, সেই জন্যেই তো, সেই জন্যেই তো ! ওরা এক রকম বলে গেল বলেই তো জানতে চাইছি আসল ব্যাপারটা কী। আপনি তো আর মিছে কথা কইবেন না ? আপনার স্বার্থ কী ?

ভিজে কাপড়ে বিশ-বাইশবছরের একটি মোটাসোটা মেয়ে এসে বলে, বাবা, আদ্দেক নাইতে নাইতে কল বন্ধ করে দিল।

ক্রোধে লতিকার বিস্ফারিত চোখমুখ—দেহের গড়ন যেমন হোক মুখখানা প্রতিমার মুখের মতো সুন্দর—দিশেহারা রাগে এখন অবশ্য কুৎসিত দেখাচ্ছে। সাবানের ফেনা লেগে আছে গলায় আর কাঁধে-পিঠে।

কে বন্ধ করলে ? ব্যাটাছেলে ?

না। অঞ্জলি। বললে কী জানো ? ওপরের কলে নিজেদের কলে নাইবে যাও—এ সব ট্যাক্‌টিক্‌স আমরা জানি। আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কলে বালতি বসালে। ট্যাক্‌টিক্‌স মানে কী বাবা ?

অন্তরীক্ষ থেকে মেয়েলি গলায় মন্তব্য আসে—সকলকে শোনানোর মতো জোর গলায় মন্তব্য : টিপটিপ জল পড়ে কলে, বালতি ভরতে আধঘণ্টা লাগে, উনি নিজেদের কল ছেড়ে আধঘণ্টা ধরে নাইতে এসেছেন। এ সব মতলব আমরা যেন বুঝি নে !

বীরেন সখেদে বলে, বাড়ি বলুন, জমি বলুন, ভাড়া দেওয়া ঝকমারি মশায় ! দেশের আইন হয়েছে তেমনি। যে দখল করেছে তারই দখলিস্বত্ব !

রাখাল হেসে বলে, না মশাই, না। তা হলে তো সত্যিকারের রামরাজ্য হয়ে যেত। জমিটমি সব জমিদার জোতদারেরই আছে—যারা চাষ-আবাদ করে, তারা কি আর দখলিস্বত্ব পেয়েছে জমিতে ? বাড়ি ভাড়ার আইন তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মশায়।

বীরেন দত্ত কথাটা বুঝতে একটু সময় নিতে চায়। তার মোটাসোটা মেয়েটা এতক্ষণ ভিজে কাপড়টা টেনেটুনে লজ্জা করার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করতে করতে ফোঁস করে বলে, আমাদের বাড়ি, বাবা গাঁটের পয়সা খরচ করে বাড়ি করেছে, দূর হয়ে যেতে বললে যায় না কেন ইয়ের ব্যাটাব্যাটিরা ?

কেন যাবে ? ভাড়া তো দিচ্ছে।

ভাড়া চাইনে। দয়া করে দূর হয়ে যাক।

বীরেন দত্ত এতক্ষণে মুখ খোলে, খক্‌খক্‌ করে কাশতে কাশতে হাত তুলে তাদেব বাজে তর্ক থামাতে বলতে বলতে দিশেহারার মতো হঠাৎ উঠে গিয়ে রঙিন কাঁচের আলমারি খুলে কী একটা ওষুধ মুখে পুরে দেয়। আস্তে আস্তে কাশিটা থামে।

কী বলছিলেন কথাটা ? বাড়িভাড়া আইনটা না হলে আমরা বাড়িওয়ালারাই মারা পড়তাম ?

পড়তেন বইকী ! আপনাদের লোভের সীমা নেই, লিমিট রাখতেন না, বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়তেন। ফলটা হত উলটো।

কী রকম ?

মানুষ খেপে যেত। যতটা শোষণ করতে পারছেন তাও পারতেন না। শোষণ করারও রীতিনীতি আছে তো ? একটা সীমা বজায় রাখতে হয়। আপনাদের লাভ ঠেকাবার জন্য নয়, অসম্ভব লোভ করতে গিয়ে আপনারা পাছে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেন, সেটা ঠেকাবার জন্য আইন হয়েছে।

বীরেন দত্ত বাঁকা হাসি হাসে।

আপনাদের কী আর বলব মশাই, আপনারা নাকের ডগাটি শুধু দেখতে পান। বলি, লিমিটি বজায় রাখার জন্যই যদি আইন, শুধু বাড়িভাড়ার বেলা এত কড়াকড়ি কেন ? চোরাকারবারের লাভে বুঝি লিমিট লাগে না ? কাপড়ের লাভে ? চিনির লাভে ?

ও সব অব্যবস্থা—

ও সব অব্যবস্থা থাকতে পারে—বাড়িভাড়ার বেলাতেই ব্যবস্থাটা জরুরি হয়ে উঠল। ওই যে বললাম, নাকের ডগা ছেড়ে আপনাদের চোখ চলে না ! বাড়িওলারা যদি লাখপতি কোটিপতি হত, তাহলে আর এ আইনের বালাই থাকত না। মুনাফা যারা লুটছে তারা বাড়িভাড়ার পিত্যেশ করে না। ইয়া বড়ো বড়ো বিল্ডিংয়ে ক-টা প্রাণী বাস করে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশটা ভাড়াটে বসাতে পারে—বসায় ?

লতিকা ফোড়ন কাটে, কেন ওঁর সঙ্গে তর্ক করছ বাবা ? উনিও ভাড়াটে—বাড়িওলাদের খারাপ ছাড়া ভালো ভাবতেই পারবেন না। উনি ভাড়াটাই দেখবেন—বাড়ি করতে কত খরচ হয় সে হিসেব তো ধরবেন না !

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রাখাল। কলোনির দিকে চলতে চলতে ভাবে, বাড়িওলারা কি মাঝারি আর ছোটো ব্যবসায়ীদের দশায় পড়েছে? এদিকটা চিন্তাই করা হয়নি একেবারে!

সাধনাকে ঘিরে বৈঠক গড়ে উঠেছে কলোনির অধিকাংশ লোকের আর সাধনার অদম্য সাধ জাগছে রাখালের কিছু করার আগেই প্রভাত আর বামাচরণের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতে।

কিন্তু মুশকিল এই, চক্রান্তটা কী সে ঠিক জানে না।

সকলে যখন প্রশ্ন করবে সে জবাব দেবে কী?

রাখালের সঙ্গে প্রভাতদের পরামর্শের কথা উল্লেখ না করে সে তাই ভাসাভাসাভাবে তাদের সতর্ক করে দেয়, সবাই সাবধান থাকবেন কিন্তু। ভাববেন না শুধু গায়ের জোরে আপনাদের ভাগাবার চেষ্টা করবে। নানারকম ফন্দিফিকিরও করবে, ভালোমানুষ সেজে এসে ভাঁওতা দেবে?

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে, শুনেছেন কিছু?

স্পষ্ট কিছু শুনিনি। ভাসাভাসাভাবে কানে আসছে।

ভুবন বলে, আমরা সাবধান আছি। তবে জানেন তো আমাগো কপাল!

অঘোর বলে, আপনেরা যদি সহায় থাকেন, দুষ্ট লোকের সাধ্য কী কিছু করে?

রাজু বলে, আপনাগোই ভরসা করি। সরকার কন বড়োলোক কন, কেউ আমাগো পক্ষে নাই।

সাধনা বলে, আপনারা শক্ত থাকবেন, নইলে আমরাই বা কী করব? এখানকার লোকদের সঙ্গে কোনো কারণে যেন ঝগড়া না হয় খেয়াল রাখবেন। কেউ কেউ ভাবে, আপনারা এসে দুর্দশা বাড়িয়েছেন। না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। ক্ষতি এরা করবে না বিশেষ, তবে মুখে একটু খোঁচা-টোচা দিলে সয়ে যাবেন, এড়িয়ে চলবেন।

হ, ঠিক কথা।

হে রাখাল, একবার তোমার সেই সাধনার রকম-সকম দ্যাখো, এতগুলি লোককে সে কেমন উপদেশ দিচ্ছে শোনো। কোথায় ছিলে কোথায় আছ একবার খেয়াল হোক!

সুমতি, বীরেন আর বিনয়ের সঙ্গে রাখাল এসে সাধনাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে নিয়ে সে কী রকম জমিয়ে বসেছে এটুকুই তার নজরে পড়ে, তার কথাগুলি শুনতে সে পায় না।

রাখাল বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়।

তুমি আবার এখানে কী করছ?

এঁদের সঙ্গে কথা কইছি।

চটাং করে জবাবটা দেওয়া হয়। রাখালের বিরক্ত হবার জবাবে। এবং সকলেই সেটা টের পায়।

রাখাল অনির্দিষ্টভাবে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে। এখানকার সকলকে একটু ডেকে আনুন, একটা দরকারি কথা আছে।

কয়েকজন যারা বাকি ছিল তারা এলে রাখাল প্রভাত সরকারের বক্তব্যটা তাদের কাছে পেশ করে এবং তারই জের টেনে আপশোশের সুরে শেষ করে, আপনারা নাকি প্রভাতবাবুর মাথা ফাটিয়ে দেবেন বলেছেন? দেখুন, আমরা আপনাদের হয়ে প্রভাতবাবুকে বলে দিলাম তিনি যেন কোনো হাঙ্গামা না করেন, কিন্তু আপনারা যদি—

তার কথা শেষ হবার আগেই সাধনা মুখ খোলে।

প্রভাতবাবু এঁদের মেরে তাড়াবেন বলেছিলেন, এঁরাও তাই তার মাথা ফাটাবার কথা বলেছিলেন। এঁরা যেচে তাঁকে শাসাতে যাননি।

বিনয় সেন বলে, থাকগে রাখালবাবু, ও কথা আর তুলবেন না।

রাখাল কথাটার জের টানে না। বিস্ময় আর অস্বস্তি মেশানো দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

সুমতি বলে, আমরা একটা মিটিং ডাকব। প্রভাতবাবু সকলের সামনে তাঁর প্ল্যানের কথা বলবেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে কারখানা আর ব্যারাক তৈরি হলে আপনাদের ফিরিয়ে আনবেন, কাজ দেবেন। আপনারা কী বলেন ?

সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। খানিক আগেই সাধনা তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। প্রভাত হঠাৎ এ রকম ভালো মানুষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে এমনিতেই তাদের যথেষ্ট সংশয় জাগত, সাধনা সাবধান করে দেওয়ার ফলে সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

ভুবন সাধনাকেই জিজ্ঞাসা করে, আপনে কী কন ?

শুধু তার একার প্রশ্ন হলে কথা ছিল না, সাধনা কী বলে শুনবার জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গেই সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে রাখালেরা সত্যই থ বনে যায়।

এদের উপর এত প্রভাব সাধনার !

আর সাধনা নিজেকে বোধ করে অত্যন্ত অসহায়।

আমি কী বলব বলুন ? আপনারা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন।

সে যে তাদের মঙ্গল করতে চাওয়ায় ফিকিরে নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় না এটা সকলে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কর্তালি করার সুযোগ দিলেও সেটা সে ঝপ্ করে নিয়ে নেয় না বলে।

তাদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তালি করার জন্য কত রকমের কত লোক যে চেষ্টা করছে দিনরাত। দরদি সেজে মাভৈঃ মাভৈঃ বুলি আওড়াচ্ছে !

কাজেই তার মতামত শোনার আগ্রহ সকলের আরও বেড়ে যায়।

বিষ্ণু বলে, আপনে কী মনে করেন কন, তারপর আমরা পরামর্শ করুম।

সাধনা বলে, আমার মনে খটকা আছে। প্রভাতবাবুর কী মতলব জানি না, তবে গোলমাল নিশ্চয় করবেন। এদের একবার তুলে দিতে পারলে আবার ফিরে আসতে দেবেন মনে হয় না।

ঘরের কোণে তর্ক-বিতর্ক নয়, ভেবেচিন্তে রাখাল যা করবে স্থির করেছে এখানে প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সাধনা করছে তার বিরোধিতা !

বীরেন বলে, না না, ও রকম মতলব থাকলে প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতেন না, লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হতেন না ! তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতেন।

বিনয় আমতা আমতা করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। আইনের প্যাঁচে একটু ঠেকেছেন কিন্তু সে জন্য আটকাবে না, শেষ পর্যন্ত পুলিশ এনে উনি আপনাদের তুলে দিতে পারবেন।

বিষ্ণু বলে, না, তা পারবেন না। উকিলের পরামর্শ নিছি।

সাধনা বলে, পুলিশ দিয়ে তাড়াতে পারলে কি প্রভাতবাবু এত প্ল্যান ভাঁজতেন ?

রাখাল বলে, তোমার এ সব কথা বলার দরকার কী ?

সাধনা বলে, আমার যা মনে হয় বললাম।

সুমতি বলে, আমরা খবর নিয়েছি, কারখানা উনি সত্যই করবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিষয়ে কথা ঠিক রাখবেন কিনা বলতে পারি না, তবে এখানে কারখানা হবে এটা মিথ্যা নয়।

রাখাল বলে, তাহলে আর কথা কী ? ঝগড়া করে আপনারা টিকতে পারবেন না। প্রভাতবাবুর প্ল্যান আপনারা যদি না মানেন, লোকে আপনাদেরই দোষী ভাববে। তখন প্রভাতবাবু যাই করুন, আপনাদের পক্ষ হয়ে কেউ কিছু বলবে না।

বিষ্ণু ভুবনেরা সাধনার দিকে তাকায়। সাধনা আবার অসহায় বোধ করে।

ভেবেচিন্তে সে বলে, ওটা হিসেব করেই অবশ্য প্রভাতবাবু প্ল্যানটা করেছেন। আপনাদের ভালো করতে চান অথচ আপনারা সেটা মানছেন না শুনলে কিছু লোক বিগড়ে যাবে সত্যি। তাই বলে সবাই যে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে তার কোনো মানে নেই। প্রভাতবাবুকেও তো জানে সবাই ?

রাখাল আবার বিস্ময় ও অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সাধনা ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে একচোট বেঁধে যাবে রাখালের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাখাল এ প্রসঙ্গই তোলে না। বোধ হয় সাধনাকে চটাতে সাহস পায় না ! বিরক্ত ও গম্ভীর ভাবটা তার বজায় থাকে।

দুদিন পরে মিটিংটা বসবার আগে সাধনাকে কাপড় বদলাতে দেখে রাখাল প্রশ্ন করে, মিটিংয়ে যাবে নাকি ?

যাব।

বক্তৃতা করবে তো ?

আমায় আবার কবে বক্তৃতা করতে দেখলে ?

আগে দেখিনি, এবার হয়তো দেখব। কোনো কথা পছন্দ না হলে উঠে বলতে আরম্ভ করবে।

দরকার মনে করলে যদি বলিই, তাতে দোষ আছে কিছু ? তুমি কি চাও না আমি বাইরে যাই, কুনোভাবটা কাটিয়ে উঠি ? অন্য মেয়ে যারা সভায় বক্তৃতা দিতে পারে তাদের তো খুব শ্রদ্ধা কর তুমি ! আমার বেলা বুঝি উলটো নিয়ম ?

রাখাল কাবু হয়ে বলে, তুমিও সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও না, আমি কি বারণ করছি ? আমি বলছিলাম, পাড়ার দশজনের সামনে আমায় যেন অপদস্থ কোরো না !

সাধনা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কথা শুনলে সত্যি রাগ হয় মানুষের। আমি অবশ্য খালি দেখতে যাচ্ছি কী হয়, কিন্তু তোমার মতে সায় না দিতে পারলে তুমি অপদস্থ হবে কেন ?

হব না ? এক সভায় এক ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বলছে—

স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বলছে না ? স্ত্রী তাতে অপদস্থ হয় না ?

আহা, এ মিটিংয়ে তোমার তো বলার কথা নয় ! আমিই কথাটা তুলব।

তাতে কী এল গেল ? তুমি বলবে না আমি বলব সেটাই কি বড়ো কথা ? অতগুলি লোকের ভালোমন্দের কথাটা আসল নয় ?

রাখাল আর তর্ক করে না।

কিন্তু মিটিংয়ে কলোনির মেয়েদের কাছে তাকে বসতে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সুমতি আর সাধনা ছাড়া পাড়ার মেয়েরা কেউ এ সভায় আসেনি, আসবার কথাও নয় তাদের। সুমতি তাদের কাছে বসতে পারল, কলোনির মেয়েদের গা ঘেঁষে ছাড়া সাধনা বসবার জায়গা খুঁজে পেল না।

ছোটো সভা। পাড়ার কিছু লোক, কলোনির লোক, আর নাগদের কলোনির সমিতির কয়েকজন সদস্য হাজির আছে। রাখাল প্রথমে সভার আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত করে। ছোটোখাটো যেমন হোক, প্রকাশ্য সভাতে দাঁড়িয়ে রাখাল জীবনে এই প্রথম বক্তৃতা দেয়।

নিরপেক্ষভাবে সব কথা বলে ভালোই গুছিয়ে মোটামুটি সে। কিন্তু সাধনার মনে হয়, নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা যেন সে করছে বাড়াবাড়ি রকম। প্রভাতের পক্ষেই যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার অতিরিক্ত নিরপেক্ষতা।

প্রভাত আর তার পরিকল্পনাকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়ে বামাচরণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে।

শুনে বড়োই রাগ হয় সাধনার।

কে কী ভাববে না ভাববে সে সব কথা তার মনেও আসে না, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমরা প্রভাতবাবুর গুণকীর্তন শুনতে আসিনি। প্রভাতবাবু যে নিজের কথা রাখবেন, পরে গোলমাল করবেন না, তার গ্যারান্টি কী সভায় আগে স্পষ্ট করে বলা হোক। সেটাই আসল কথা।

সভা থমথম করে। রাখালের মুখ লাল হয়ে যায়। আমরা ! শুধু কলোনির লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেনি সাধনা, তাদের সঙ্গে যেন এক হয়ে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে !

কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেই প্রভাত খুশি হত, কিন্তু সাধনার জন্যই শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয় না।

প্রভাত বলে, এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে আমি কথা দিচ্ছি, তাই কি যথেষ্ট গ্যারান্টি নয় ?

সাধনা বলে, না। মুখের কথা দুদিন বাদে অদলবদল করা যায়। আপনি নিজেই হয়তো ভুলে যাবেন কী বলেছিলেন, বলবেন, আমি এ রকম বলিনি, ও রকম বলেছিলাম। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আপত্তি হচ্ছে কেন ?

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলে, কিছু না, কিছু না ! আপত্তি কীসের ?

পরদিন সকালে দেখা যায় তাদের বাড়ির সদর দরজায় এবং পাড়ার অনেকগুলি দেয়ালে সাধনাব নামে ছড়া কেটে পোস্টার আঁটা হয়েছে রাতারাতি !

বাড়ির কাছে কলোনিতে সুন্দর ছোঁড়া থাকে,
সাধনাদিদি পোষ মেনেছেন, পিরিতের দড়ি নাকে।
রাখাল দাদার আক্কেল গুড়ুম
বাকিটা অশ্লীল !

বাসন্তী বলে, সত্যি আক্কেল গুড়ুম করেছিস ভাই ! কী ধিঙ্গি হচ্ছিস দিন দিন ? পাড়া তোলপাড় হচ্ছে তোর কথা নিয়ে !

কেন ? সুমতি তো হরদম সভা করে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন একটা সভায় একটু বলেছি, সবার তাতে টনক নড়ল কেন ?

তুই কী সুমতি ? ওর বিয়ে হয়নি, কলেজে পড়ে, অনেককাল মিটিং করছে, ওরটা সয়ে গেছে সবার। সবাই জানে, ও ওই রকম। তুই ছিলি ঘরের বউ, হঠাৎ একদিন সভায় দাঁড়িয়ে কোমর বেঁধে স্বামীর সঙ্গে লড়াই করলি—চাদ্দিকে হইচই পড়বে না ?

স্বামীর সাথে লড়াই ? আমি তো ঝগড়া করলাম প্রভাতবাবুদের সাথে ?

লোকে বুঝি জানে না রাখালবাবু ওদের দলে ? তাই তো বলছে সবাই যে কাণ্ড দ্যাখো ! দুপক্ষের ঝগড়া, স্বামী নিয়েছে এ পক্ষ বউ গিয়েছে অন্য পক্ষে ! রাখালবাবু চটেননি ?

কথা বন্ধ করেছে।

করবেন না ? তেমন সোয়ামি হলে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দিত !

ইশ ! সে দিন আর নেই !

নেই ? তুই হাসালি ভাই। এ পাড়াতেই দু-চারজন মাঝে মাঝে পিটোয় !

এ কথা সে কথার পর বাসন্তী হঠাৎ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, কলোনির সুন্দর ছোঁড়াটা কে ভাই ?

সাধনাও হেসে বলে, কে জানে ! ওরাও জানে না, তাহলে নামটা বসিয়ে দিত।

কী বজ্জাত, অ্যাঁ ? ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিবি না ?

কেন ছিঁড়ব ? দশজনের পড়তে ভালো লাগলে পড়ুক !

ছড়া পড়ে লোকে যে হাসাহাসি করে না এমন নয়, কিন্তু বেলা নটা নাগাদ দেখা যায় পাড়ার লোকেই একে একে পোস্টারগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সাধনাদের দরজায় লাগানো পোস্টারটাই বরং ছেঁড়া হয় সবার শেষে !

কয়েকদিনের মধ্যে কুঁড়েগুলি সরে গিয়ে কলোনির জমিটা শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে।

সাধনার মনে হয়, শূন্যতা লেপে যেন মুছে দেওয়া হয়েছে একটা ছবিকে।

কিছুদিন পরে ফাঁকা জমিটাতে তোড়জোড়ের সঙ্গে কারখানা তৈরির কাজ আরম্ভ হলে সে স্বস্তি বোধ করে।

প্রভাত সত্যই কারখানা গড়ছে বলে শুধু নয়। জায়গাটার শূন্যতা ঘুচে গেছে বলেও !

রাখাল কথা বন্ধ করুক, তার নামে ছড়া কেটে পোস্টার লাগানো হোক, পাড়ার মেয়েরা তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাক, একটা প্রায় বৈঠকের মতো ছোটোখাটো সভায় উদ্‌বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে তেজের সঙ্গে একটু তর্ক করায় সাধনার কপাল একদিকে গেছে খুলে।

সভাসমিতির পক্ষে তার মূল্য টের পেয়ে গিয়েছে আশেপাশের সভাসমিতির উদ্যোক্তারা।

কয়েকদিন বাদেই প্রকাশ্য সভায় যোগদানের জন্য তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। শ্রোতা হিসাবে নয়, কিছু বলার জন্য।

সুমতির সঙ্গে আসে মধ্য-যৌবনা একটি মহিলা। সাদাসিধে চেহারা, সাদাসিধে বেশ, চোখদুটির শান্তভাবেব জন্য দৃষ্টি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে না।

গলার আওয়াজ ও কথা মার্জিত ও সুস্পষ্ট বলে মিষ্টতাটাও হঠাৎ খেয়াল হয় না।

সুমতি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি প্রমীলা বসু, আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছেন।

নামটা ভালোভাবেই শোনা ছিল। সাধনা রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়ে। জীবনে সে কখনও নামকরা মানুষের সংস্রবে আসেনি, পুরুষ বা নারী।

নার্ভাস হয়ে সে শুধু বলে, আসুন, বসুন।

সাধারণ আলাপ পরিচয় হতে হতেই সে অবশ্য ধাত ফিরে পায়। এ রকম নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে বিনা নোটিশে একেবারে ঘরের মধ্যে পাওয়া অভ্যাস ছিল না বলেই প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিল।

খানিক আলাপ করে প্রমীলা বলে, সামনের রোববার আমরা একটা মিটিং ডাকছি—হাইস্কুলের হলটাতে হবে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন তো ? এমনিতেই এ দেশে শিশুমৃত্যুর হার কীরকম, একটু দুধটুধ না পেয়ে ছোটো ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা এ সব তো আপনার জানাই আছে। তার উপরে আরও কতগুলি বাড়তি কারণ ঘটে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে ওদের। যেমন ধরুন, বাঙালি ছেলেমেয়ের রুটি সয় না। কিন্তু চাল কমিয়ে দিয়েছে, বাধ্য হয়ে খেতে হয়। চীন থেকে বিনা শর্তে চাল দিতে চায়, সে চাল নেবে না। দুধ যেটুকু জোটে তাতেও ভেজাল—

প্রায় জানা কথাই সব বলে প্রমীলা। অবস্থা যে কী ভয়ানক বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই কারও জানতে আর বাকি নেই। কিন্তু বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের দিক থেকে সমস্যাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে সামনে ধরে বলে প্রমীলার কথা শুনতে শুনতে সাধনার মনে হয় সব জানা থাকলেও সে অবস্থাটা একেবারেই ধরতে পারেনি।

প্রমীলা বলে, সাধারণভাবে শিশুকল্যাণ আন্দোলন তো চলছেই। এই মিটিংয়ে আমরা বিশেষভাবে জোর দেব—সহজে অবিলম্বে যে সব বিষয়ে প্রতিকার করা যায়। যেমন ওই চালের কথাটা। খাদ্য-সমস্যা নিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো নিয়ে সাধারণ আন্দোলন চলছে—আমরা ও দিকে যাব না। আমরা শুধু দাবি করব, ছোটোদের কার্ডে চালের পরিমাণ বড়োদের সমান করা হোক। এই ধরনের সব আলোচনা। আপনাকে যেতে হবে।

সাধনা জানে তা'কে শুধু মিটিংয়ে যেতেই বলা হচ্ছে, সে তাই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব। শুধু মেয়েদের মিটিং ?

না, পাবলিক মিটিং। তবে মেয়েরা যাতে বেশি সংখ্যায় যান সে চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।

মিটিংয়ে ? কী যে বলেন ! আমি কি বক্তৃতা দিতে জানি ?

বক্তৃতা কেন দেবেন ? শুধু বক্তৃতায় আসর জমিয়ে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন কি আছে ? আপনি সোজা ভাষায় আপনার মনের কথা বলবেন।

তাও কোনোদিন বলিনি !

তাতে কী ? আপনি তো বোবা নন, কথা বলতে জানেন !

প্রমীলা হাসে—এই সেদিন একটা সভাতে সদ্য সদ্য গাঁ থেকে এসে গেরস্ত চাষি ঘরের বউ-দশ-বারোমিনিট একটানা বলে গেল। কী চোখা চোখা ধারালো সব কথা ! নাম করা বড়ো বড়ো বক্তার চেয়ে বেশি কাজ হল বউটির কথায়। প্রাণে যখন জ্বালা ধরে যায় সোজা স্পষ্ট কথা বলতে কি আর ট্রেনিং দরকার হয় ?

সাধনা আজকাল চালাক হয়েছে। সে একটু ভেবে বলে, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

রাখালবাবু ? ওঁকেও যেতে হবে—কিছু বলতে হবে। আমরা ওঁকেও বলেছি।

সাধনা খুশি হয়। রাখাল নিশ্চয় আজ ভালোভাবে তার সঙ্গে কথা কইবে। তাকে আর তুচ্ছ করতে পারবে না। কলোনির ব্যাপার নিয়ে যেচে কথা কইতে গিয়ে সে রাখালের বিরোধিতা করে বসেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তো রাখালের সঙ্গে তার কোনো মতের অমিল নেই। ছোটো ছেলেমেয়েরা ভাত না পেয়ে ভেজাল খেয়ে বিনা চিকিৎসায় অব্যবস্থায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেও চায় রাখালও চায় এর প্রতিকার।

তাছাড়া সে যেচে সভায় যাবে না। তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সভায় গিয়ে কিছু বলার জন্য—শুধু সুমতিকে পাঠিয়ে দায়সারা হিসাবে নয়, স্বয়ং প্রমীলা বসু বাড়ি বয়ে এসে তাকে অনুরোধ করে গেছে !

স্ত্রীর এ সম্মানে কি খুশি না হয়ে পারবে রাখাল ?

রাখাল কথা বন্ধ করেছে।

তার মানে এই নয় যে বাড়িতে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকে ! সে বাজার করবে সাধনা রাঁধবে, সে ওষুধ এনে দিলে সাধনা সময়মতো ছেলেকে খাওয়াবে, ডাক্তার তাকে নির্দেশগুলি জানিয়ে দিলেও সাধনাই সেগুলি পালন করবে, দু-ঘণ্টা অন্তর থার্মোমিটার দিয়ে ছেলের টেম্পারেচারের চার্ট রাখবে, এক বিছানায় না হলেও এক ঘরে শুয়ে রাত কাটাবে, জ্বরো ছেলেটার কান্নায় বহুবার দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে,—একেবারে বোবা হয়ে থেকে কি আর এ সব চালানো যায় !

কথা বন্ধ করেছে মানে একান্ত দরকারি সংসারি কথা ছাড়া একটা কথাও সে বলে না।

মিষ্টিকথা দূরে থাক, কড়া কথাও নয় !

সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, সাধনাকে সে পনেরো দিন ছোঁয়নি !

এটা সংযম নয়। সংঘাতের সাংঘাতিক অঘটন।

ভয়ানক কলহ আগেও হয়েছে। চিরতরে যেন সম্পর্ক ঘুচে যাবে এমন কুৎসিত নিষ্ঠুর কলহ। তখন কেঁদে মুখ ফোলায়নি সাধনা, ঘৃণা আর বিদ্বেষেই মুখ তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে, গম্ভীর নিস্পৃহভাবে নীরবে সে রাতে রুটি বেড়ে খেতে দিয়েছে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত রাখালকে। রাখালও তীব্র বিতৃষ্ণায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠে খাটে বসে একটা সিগারেট টেনে মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে এবং হয়তো বা ঘুমিয়েও পড়েছে।

এ রকম কলহের পর সাধনা কিছু খেত না, জোরালো খিদে পেলেও খেত না। কারণ দুর্ভিক্ষ এসে গেলেও সে তো আর সত্যিসত্যি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েনি—রাত্রে অনশন ধর্মঘট করবে ভেবেই কি বিকালে রাখাল ফিরবার অনেক আগেই রুটি সেঁকতে সেঁকতে সে তিন-চারখানা রুটি বিনা উপাদানে খেয়ে নিত ?

না খেয়ে হেঁশেল গুছিয়ে সে ঘরে গিয়ে মেঝেটা আরেকবার ঝাঁট দিয়ে শুয়ে পড়ত। এবং বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্যসত্যই ঘুমিয়ে পড়ত !

মাঝরাত্রে রাখাল এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলত, মেঝেতে শুয়েছ যে ? ঠান্ডা লাগবে না ? অসুখ করবে না ? বিছানায় এসে শোও।

রাখাল তাকে ডেকেছে বিছানায় গিয়ে শুতে এবং সেও বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। এবং তারপর কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে যে রাখাল নামক পুরুষ এবং সাধনা নামক নারীটির মধ্যে সেইদিন কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়েছিল !

দুজনে যেন চিরদিনই একদেহ একপ্রাণ !

সকালে অবশ্য তারা স্বীকার করেনি রাত্রে দুজনের কোনো বিবাদ ছিল না। গম্ভীর মুখেই রাখাল বাজার এনে দিয়েছে এবং ঘৃণায় বিদ্বেষে বিকৃত মুখ নিয়েই সাধনা রান্না করেছে।

তবু তখন তাদের ঘৃণা রাগ বিতৃষ্ণা যেমন সত্য ছিল তেমনি সত্য ছিল ও সব নিয়েও সারাদিন ঘরসংসার চালিয়ে যাওয়া এবং রাত্রে সব সমস্যা পরদিনের জন্য ধামাচাপা দিয়ে রেখে অভ্যস্ত মিলনে একাত্ম হওয়া।

এবার প্রায় পনেরো দিন দিনের বেলা তারা বিবাদ এবং পরস্পরকে ঘৃণা করার পাটটা বজায় রেখে এসেছে বেশ খানিকটা নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা ও উদারতার ঠাট দিয়ে, কিন্তু রাত্রে তারা জেগেছে ঘুমিয়েছে পরস্পরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে !

খোকার জ্বর বলেই সাধনা যেন সেই অজুহাতে নতুন একটি শয্যা সৃষ্টি করেছে যুদ্ধের এমার্জেন্সিকে প্রাধান্য দিয়ে। মেঝেতে মশারি সমেত সে শয্যায় রাখালের যেন প্রবেশ নিষেধ।

রাখালও যেন তাদের বহু বছরের পুরানো বাসরশয্যার খাটে শুয়ে সাধনার প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করে গাঢ় ঘুমের দুর্ভেদ্য বাঁধ রচনা করেছে প্রতিরাত্রে।

শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। জ্বরে কাতর ছেলেটা কেঁদে ঘর ফাটিয়ে দিলেও তার ঘুম ভাঙে না।

আগে ছেলের কান্নায় যে বারবার জেগে যেত, সাধনার সামান্য কাশির শব্দে যার ঘুম ভেঙে যেত, সে আজ চৌদ্দ-পনেরোটা রাত যেন বোমা ঠেকানো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে।

এ সংযম সে পেল কোথায় ?

শুধু তাই নয়।

তার সম্পর্কে অদ্ভুত বৈরাগ্য আর গাঢ় ঘুম ছাড়াও আরেকটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়াটা বাদ যাচ্ছে রাখালের !

আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনও ঘটেনি। বাইরে নেমন্তন্ন থাকলেই কেবল রাত্রে বাড়িতে খাওয়াটা বাদ যেত রাখালের, তার জন্য রান্নাই হত না। আগে থেকে কিছু জানা নেই, হঠাৎ কোনো যোগাযোগ ঘটে রাত্রির ভোজনটা জুটে গেল—এটা ঘটত কদাচিৎ।

এবারকার মনান্তরের পনেরো-ষোলোটা দিনের মধ্যে এটা ঘটেছে সাতবার। গোনা গাঁথা হিসাব আছে সাধনার।

রান্না হয়েছে তার জন্য। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে সে জানিয়েছে যে খাবে না।

আজও ফিরে এসে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে বলে, আমি খেয়ে এসেছি।

ঘুমে আর শ্রান্তিতে তার ঢুলুঢুলু চোখ দেখে সাধনার মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, মমতার যেন বন্যা বয়ে যায় তার হৃদয়ে।

প্রমীলার কথা শুনে আজ সে মিটমাটের আশা পোষণ করছিল কিনা, বোধ হয় সেই জন্য !

সব ভুলে যায় সাধনা। হাসিমুখে বলে, জানো রোববারের সভায় আমাকেও যেতে বলেছে। প্রমীলা বসু নিজে—

বলতে বলতে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় রাখালের। রাখাল মুখ ফিরিয়ে নেয়। খানিকটা তফাতে সরে যায়।

পক্ষাঘাতে সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে যায় সাধনার। যেভাবে দোল খায় পায়ের নীচের পৃথিবী, কী করে যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভেবে পায় না।

তবু জোর করে সাধনা নিজের মনকে বলে, সে নিশ্চয় ভুল করেছে ! রাখালের মুখে সে গন্ধ নয়। নিজে সে ঠিক বুঝতে পারেনি।

কিংবা রাখাল হয়তো কোনো ওষুধ খেয়েছে—ডাক্তারের নির্দেশমতো। কথা বন্ধ, অসুখ হলেও রাখাল তো তাকে জানাবে না। ওষুধটার জন্যই গাঢ় ঘুমও হচ্ছে রাখালের।

যন্ত্রের মতো রান্নাঘরে গিয়ে রুটি নিয়ে দুখানা কোনোরকমে খায়, হেঁশেল তুলে রান্নাঘর বন্ধ করে উঠানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতোই জ্যোৎস্নায় ভাসানো আকাশের দিকেও চোখ তুলে তাকায়।

তারপর ঘরে যায়।

রাখালের তখন নাক ডাকছে।

রুগ্ণ ছেলেটা ক্ষীণস্বরে কাঁদছিল। তাকে উপেক্ষা করে সাধনা খাটের দিকে এগিয়ে যায়।

তখনও সে ভাবছে, সন্দেহ মিটিয়ে নেব ? না, সংশয়টুকু আঁকড়ে থাকব ?

কিন্তু তা তো আর হয় না। স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে নিজে ভুল করেছি মনে করে কতক্ষণ আর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ?

যেন আত্মহত্যা করছে এমনিভাবে সে ঝুঁকে পড়ে রাখালের মুখের উপর !

এতখানি প্রত্যক্ষ নির্ভুল পরীক্ষার অবশ্য কোনোই দরকার ছিল না। মশারি তুলতেই রাখালের নিশ্বাসের গন্ধ বেশ ভালোভাবেই তার নাকে গিয়েছিল।

গা গুলিয়ে বমি আসে। বাইরে ছুটে গিয়ে সাধনা যা কিছু খেয়েছিল সব বমি করে ফেলে।

অনভ্যস্ত পদার্থটা একটু বেশি পান করে ফেলায় রাখালেরও আজ বমি আসছিল। তার নিশ্বাসে পদার্থটার গন্ধ শুঁকেই সাধনা বমি করে ফেলে।

আশা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে ভাই ? বমি করছ কেন ?

সঞ্জীবও উঠে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। ওর নেশা ভালো ভালো জিনিস খেয়ে দামি দামি জামা পরে সিনেমা থিয়েটার দেখে সুখে থাকার জন্য ঋণ করে গোল্লায় যাওয়া।

আর সংঘাতের জাঁতাকল থেকে ত্রাণ পাবার আশায় রাখাল ধরেছে নতুন নেশা।

বমি করেছে। কাজেই দু-একমিনিট কথা না বলাটা বেখাপ্পা হবে না। তাকে দম নিতে হবে তো।

সেই অবসরে সাধনা একটু ভেবে নেয়।

আশার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটের ডগায় ঠেলে এসেছিল : তোমার মতো আমারও বরাত খুলেছে ভাই !

কিন্তু জবাবটা সে ঠেকিয়ে রাখে। এইমাত্র টের পেল রাখাল মদ খেয়েছে। যা ছিল অসম্ভব তাই সম্ভব হয়েছে। যা ছিল কল্পনাতীত তাই বাস্তব হয়েছে। আরও হয়তো কত কিছু জানবার বুঝবার ভাববার থাকতে পারে এ বিষয়ে।

হয়তো রোজ খায় না, আজ কোনো বিশেষ কারণে রাখাল মদ খেয়েছে।

মদ মেশানো ওষুধও তো থাকে। খোকা হবার পর সেও টনিক খেয়েছিল মদ মেশানো।

এ রকম একটা ধাক্কা খেয়ে তার তো এই অবস্থা। এখন তার এমন কিছু বলা উচিত কী আশাকে পরে দরকার হলেও যা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ?

অসম্ভব যখন সম্ভবই হয়েছে, তার কি উচিত নয় আগে ভেবে দেখা কী করে এটা হয় ?

রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে, তার মতের বিরোধিতা করেছে, প্রভাতকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, আরেক সভায় কিছু বলার নিমন্ত্রণ জানাতে প্রমীলার মতো মানুষ বাড়ি বয়ে এসেছে, রাখাল মদ খেয়েছে বলেই তাব কি আত্মহারা হওয়া উচিত ?

মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল তো রাখাল হয়নি ?

মুখের গন্ধ ছাড়া তো টেরও পাওয়া যায়নি সে মদ খেয়েছে !

আশা ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে আজ রাত্রেই সাধনা কত কী পাগলামি করত কে জানে। আশাকে সব বলে ফেলার ঝোঁকটা সামলাতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা খুঁজে পায়।

ভিতরে তার যাই হোক, বাইরে নিজেকে সংযত রাখে অনায়াসে।

আশাও অবশ্য শুধু প্রশ্ন করেই দাঁড়িয়ে থাকেনি, ছুটে গিয়ে এক ঘটি জলও এনেছিল।

আশা আবার জিজ্ঞাসা করে, কী হল ভাই ?

মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে সাধনা শান্তভাবে বলে, কী জানি, গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল।

রাখালবাবু ফেরেননি ?

খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে।

খুব শক্ত ঘুম তো রাখালবাবুর !

কানের কাছে মুখ এনে আশা চুপিসারে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার ? আবার নাকি ?

সাধনা বলে, যাঃ ! অত বারবার খায় না !

গলা একটু উঁচু করে সঞ্জীবকেও শুনিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, কৃমির জন্য বোধ হয়।

সঞ্জীব এগিয়ে এসে বলে, কৃমিই হবে। বেশি রুটি খেলে ভীষণ কৃমি হয়। শ্যামবাবু বলেছিলেন, রুটি খেতে আরম্ভ করার পর বাড়িসুদ্ধ সকলে মাসে দুবার করে কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন।

সাধনা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সঞ্জীববাবু, অ্যালকোহল খেলে নাকি কৃমি মরে যায় ?

সঞ্জীব বলে, কী জানি, বলতে পারছি না। কৃমির জন্য ভিন্ন ওষুধ আছে জানি।

রুটি খেয়ে খেয়ে আমারই বমি হল। ছোটো ছেলেমেয়েরা কী করে রুটি খেয়ে সহ্য করে মাগো !

রাত্রি প্রভাত হবেই। যেমন রাত্রিই হোক।

সকালে প্রথামতো সাধনা রাখালকে চা আর খাবার দেয়—মুখ হাত ধুয়ে রাখালও প্রথামতো রান্নাঘরে একটা আস্ত ইঁটকে পিড়ি করে প্রাতরাশ খেতে বসে।

প্রথায় একটু তারতম্য করেছে সাধনা। রাখাল ঘুম ভেঙে উঠবার আগে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে এগারো পয়সার এক ছটাক নিরামিষ গাছগাছড়াগত ঘি মুদি দোকান থেকে আনিয়ে বাসি রুটির বদলে দুখানা পরোটা ভেজে দিয়েছে রাখালকে।

রাত্রে রাখাল খায়নি। তার ডিমটাও গরম করে দিয়েছে—ঝোলটা নিজেই চেখে পরীক্ষা করে দেখেছে টক হয়ে গিয়েছে কি না।

রাখাল ডিম আলু ঝোল সব কিছু দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলে, ডিমে আবার আলু দাও কেন ? আলুর সের কত হয়েছে জান ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখাল দোকানে চলে যাবার পর নিজের ধৈর্যশক্তির জন্য সে গর্ব বোধ করে।

শেষ বোঝাপড়া করে ফেলার অদম্য সাধকে সে আজ অসীম সংযম দিয়ে দমন করেছে !

মন সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। রাখালের সঙ্গে আর নয়। এবার চুকেবুকে যাওয়াই ভালো !

কোথায় যাবে কী করবে তাও সে ঠিক করে ফেলেছে রাত্রেই। কলোনির লোকেরা যেখানে সরে গিয়ে নতুন কুঁড়ে তুলেছে সেখানে ওদের সাহায্যে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাস করবে। মান অভিমান বিসর্জন দেবে। পেট চালাবার জন্য একমাত্র দেহ বিক্রির উপায়টা ছাড়া যে কোনো উপায় মাথা পেতে নেবে।

সকালে সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। বোঝাপড়াটা শুধু কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে।

রাখাল যে কী করে মদ ধরতে পারে এই অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ব্যাপারটা সে কয়েকদিন একটু বুঝবার চেষ্টা করবে।

হয়তো এটা নিছক দুদিনের একটা পরীক্ষা রাখালের, —খাপছাড়া হলেও হয়তো রাখাল খেয়ালের বশেই নেশা করার অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখছে। হয়তো ব্যাবসার জন্য—লাখ টাকা করার নতুন স্বপ্নটা সফল করার জন্য—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে মদটা দু-চারদিন বাধ্য হয়ে গিলতে হচ্ছে রাখালের।

কিংবা হয়তো তার জন্যই মদ খাচ্ছে রাখাল ! তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও এক বাড়িতে পরের মতো বাস করার চাপটা হয়তো অসহ্য হয়ে উঠেছে রাখালের পক্ষে, তাকে বাতিল করে এক ঘরে রাতের পর রাত কাটানো অসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ায় উন্মাদের মতো হয়তো সে এই উপায় অবলম্বন করেছে। মদ খেয়ে এসে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমানো যায়, সাধনার অদম্য আকর্ষণ ঠেকানো যায়, তার কাছে নত হতে হয় না !

এটাই যদি কারণ হয় রাখালের মদ খাওয়ার, তাহলে অবশ্য শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিতেই হবে সাধনাকে।

পুরুষ মানুষ দু-একদিন মদ খেলে তার জাত যায় না। সোজাসুজি খোলাখুলিভাবে বাইরেই হোক বা বাড়িতে তার সামনেই হোক—রাখাল দু-একদিন মদ খেলে সেটা তুচ্ছ করার মতো উদারতা সাধনার আছে।

কিন্তু তার জন্যই যদি রাখাল মদ ধরে থাকে, তবে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম। দু-একদিন নয়, নিয়মিতভাবে নেশারই বিকৃত তৃষ্ণায় রাখাল যদি মদ খেতে শুরু করে থাকে—তবু তাকে ক্ষমা না করে উপায় থাকবে না সাধনার।

শোধরাতে পারবে কী পারবে না সে ভিন্ন কথা। তারই জন্য মাতাল হয়ে থাকলে মাতাল স্বামীর ঘর সাধনাকে করতেই হবে !

অবশ্য, তারই জন্য রাখাল এই মারাত্মক কাণ্ড শুরু করেছে কিনা সাধনা তা জানে না। রাখালের মদ খাওয়ার কোনো সঠিক মানেই ঢুকছে না তার মগজে। কয়েকদিন ধৈর্য ধরে রাখালের এই নতুন ব্যাধির মানেটা বুঝবার চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে সাধনাকে।

মশা রক্ত শোষণ করে রক্তে রেখে যায় ম্যালেরিয়া—শোষক সমাজকে শুষে রেখে দেয় বেকারত্ব ইত্যাদির অভিশাপ। এই তো সেদিন সাধনা রাখালের বেকারত্বকে ব্যাধি বলে ভুল করেছে, অনেক অন্যায় করেছে। পরে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে অনেক ধিক্কার দিয়েছে সে জন্য।

রাখালের বেকারত্বের ব্যাধিটাও ছিল তার কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। রাখাল বেকার হয়েছে এটা যেন ছিল রাখালেরই অপরাধ, এত লোকে চাকরিবাকরি করছে তবু রাখাল কোন যুক্তিতে বেকার হয়—এই ছিল তার বিচার !

পাড়ার অনেকেই মদ খায় না রাখাল কেন মদ খাবে—এ রকম সিধে বিচাব করে শেষ সিদ্ধান্ত কবা আজ অসম্ভব হয়ে গেছে সাধনার পক্ষে।

ব৷সন্তী৷কেও ক-দিন খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

সাধনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, মেয়েমানুষের যন্ত্রণার কি অন্ত আছে ? মানুষটার রকম-সকম সুবিধে লাগছে না ক-দিন ধরে—কিন্তু কিছু বলছে না মুখ ফুটে। নিজে থেকেই বলবে ভেবে চুপ করে আছি, কিন্তু এবার শুধোতে হবে।

রকম-সকম সুবিধে লাগছে না মানে ?

মানে একটু বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে। বাইরে মুশকিলে পড়লে ব্যাটাছেলের যেমন হয়। দোকানে কিছু গোলমাল হয়েছে জানো ? তোমার কত্তা কিছু বলেছে ?

সাধনার মনে একটা প্রশ্ন ঝিলিক মেরে যায়—তাই কি তবে কারণ রাখালের মদ খাওয়ার ? বাইরে কোনো মুশকিলে পড়েছে—কারবারে কাজেকর্মে গন্ডগোল ঘটেছে ? তার জন্য নয় !

কিছু তো বলেনি আমায়। রাজীববাবুর কী বেখাপ্পা চালচলন হয়েছে ?

মন মেজাজ ভালো থাকছে না।

ভাসাভাসা জবাব দিয়ে বাসন্তী যেন কথাটা চাপা দিয়ে দেয়।

নেশা করে রাখাল মরার মতো ঘুমায়। রাজীবের ধাত অন্যরকম, তার জাগে ফুর্তির ঝোঁক। তার ফুর্তির ঠেলা সামলাতে হয় বাসন্তীকে—হাসিমুখে। নেশার খেয়াল সব স্বীকার করে নিতে হয়। নইলে যে কোনো লাভ নেই বাসন্তী তা জানে। রাগারাগি করলে নেশার ঝোঁক ব্যাহত হলে, মদ গিলে রাজীব আর বাড়ি আসবে না—একজনের ঘরে গিয়ে উঠবে যেখানে পয়সা দিয়ে অবাধে ফুর্তি করা যায় !

ও সব বদ খেয়াল রাজীবের কোনোদিন নেই। কিন্তু নেশা করলে কতগুলি পাগলামি তার আসবেই। ঘরে তাকে নিয়ে পাগলামি করতে পেলেই তার চলে।

সে সুযোগ না দিয়ে তাকে নেশা করে বাজারের মেয়েলোকের ঘরে যেতে বাধ্য করার মতো বোকা বাসন্তী নয়।

কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে তো একটা বোঝাপড়া চাই। চুপ করে থাকলে চলবে কেন ?

বাসন্তী বলে, তোমার মুখে রোজ গন্ধ পাচ্ছি। এত বাড়াচ্ছ কেন ? রোজ তুমি মাতাল হয়ে এসে দাপট চালাবে—আমার শরীরটা কি লোহা দিয়ে গড়া ?

সকালে বেলা বাড়লে রাজীবকে খেতে দিয়ে বলে।

রাজীবের কৃত্রিম উন্মত্ততার কোনো সমালোচনাই বাসন্তী করে না। রাজীব নেশার ঘোরে যা বলেছে যা চেয়েছে তাই সই !

মাথা হেঁট করে খায় রাজীব। বিবেক তার এখন অনুতাপে গলে যেতে চাইছে। রাত্রে কীভাবে নির্যাতন করেছে বাসন্তীকে কিছুই সে ভুলে যায়নি। রাত্রে সব সয়ে গেছে বাসন্তী। সকালে তাকে চা খাবার দিয়েছে। কে জানে কাকে দিয়ে কীভাবে মাছ আনিয়ে ঝোল রেঁধে ভাত বেড়ে দিয়েছে দোকানে যাবার আগে।

আপিসি বাবুর বউ নয়। বিড়িপাতার দোকানদারের বউ। তবু যেন আপিসি বাবুদের বউদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তাকে বাবুর মতো আরামে রাখতে চায়। আঁধার থাকতে উঠে উনানে আঁচ দেয় !

চালতার টক অদ্ভুতরকম ভালোবাসে রাজীব—টক-পাগল মেয়েদের চেয়েও।

চালতার টক পর্যন্ত বাসন্তী রেঁধেছে তার জন্য !

রাজীব বলে, না, টক খাব না।

বাসন্তী বলে, বকলাম বলে ?

না, দাঁত ব্যথা করছে। মাড়ির সেই দাঁতটা।

আজ তবে না গেলে দোকানে ? পুষ্পের মাকে দিয়ে একটা পাঁট আনিয়ে রেখো। রাতে ব্যথা বাড়লে খেয়ো।

রাজীব হেসে বলে, সে জন্য নয় গো—দাঁতের ব্যথার জন্য নয়। তোমার কাছে লুকোই নাকি আমি কিছু ? ভদ্দরলোকের ছেলের সঙ্গে ভিড়ে মোর দফারফা হতে বসেছে। ঝোঁকের মাথায় ক-দিন যা মাল গিলছে রাখালবাবু—

ওমা ! এই ব্যাপার ? রাখালবাবুর সঙ্গে খাচ্ছ !

আর বল কেন। কোনোদিন খেত না, হঠাৎ জোরসে চালিয়েছে। একদিন কামাই নেই।

একটু সামলাতে পারো না ?

হাঃ, ওকে সামলাবে ! বিদ্যেওলি বউ নিয়ে হয়েছে বেচারার মুশকিল ! মাল টানতে টানতে বলে কী জানো ? বলে বউ তো নয়, যেন মাস্টার ! যেন থানার মেয়ে দারোগা ! কত লেখাপড়া শিখেছে, কী জ্ঞানবুদ্ধি—তবু কোনো দিক সামলাতে পারছে না। মানুষটা ভেঙে যাচ্ছে দিন দিন।

লেখাপড়া জানা বাবুদের বড্ড বেশি মান অভিমান। একটু ছুঁলেই যেন ফোসকা পড়ে। একটু বুঝিয়ে বলতে পার না ?

কী করে বুঝাই বলো ? এত জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা, সব জানে বোঝে। মুখ্যু মানুষের কথা শুনবে কেন ?

বাসন্তী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মুখ্যু মানুষ ? আমার বাবা মুখ্যু মানুষই ভালো ! বইয়ের জ্ঞান না থাক, কাণ্ডজ্ঞান তো আছে !

রাজীব দাঁতের ব্যথা নিয়েই দোকানে যায়। বাসন্তীও জানে যে দাঁতের ব্যথা তেমন মারাত্মক না হলে দোকানে না যাওয়ার বিলাসিতার মানে হয় না—তাদের পোষায় না ও সব। দোকানে না গিয়ে বাড়ি বসে থাকলে কী দাঁতের ব্যথা রেহাই দেবে, কমে যাবে !

দাঁত যা ব্যথা দেবার দেবেই। ঘরেও দেবে দোকানেও দেবে। দোকানে গেলে বরং রোজগার হবে দুটো পয়সা !

রাখাল দোকানে যাবে বটে। রাজীব না গেলে যে দোকান একেবারে খোলা হবে না এমন নয়। কিন্তু রাখালের উপর অন্য হিসাবে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা এখনও বজায় থাকলেও তার দোকান চালানোর ক্ষমতায় রাজীব বিশ্বাস হারিয়েছে।

সে শুধু যেন নীতি খাটায়। নীতি খাটিয়ে দোকান ভালো চললে খুশিই হত রাজীব। কিন্তু বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান ! চালানোর নীতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না রাখালের বইয়ে-পড়া উচিত-অনুচিতের জটিল অঙ্ক কষে বার করা নীতির !

বামাচরণকে সত্যই কী আর ভক্তি করত রাজীব। লোকটাকে সে বজ্জাত বলেই জানত। কিন্তু তার মুশকিল হল এই যে লোকটা কবিতা লিখতে পারত—কবিতার একটা বই লিখে ফেলা শুধু নয়, সেটা ছাপিয়ে একখানা উপহার দিয়েছিল রাজীবকে।

অগত্যা তাকে ভক্তি করতে হয়েছিল। কবি—ছাপার অক্ষরে ছাপানো বইয়ের কবি ! সে কেমন মানুষ জানবার অধিকার তো নেই বিড়িপাতা শুখার দোকানদার অল্প শিক্ষিত রাজীবের। সাধু সন্ন্যাসী যোগীর মতো কবিও হল আলাদা জগতের মানুষ, উঁচু জগতের মানুষ—লাখপতি কোটিপতি রাজা জমিদারদের বড়োলোকামি উঁচু জাতটার কাছে ঘেঁষা ভিন্ন আরেকটা জগতের মানুষ।

কবিতা লিখে এবং ছাপানো কবিতার পাঁচসিকে দামের একখানি বই তাকে উপহার দিয়ে বামাচরণ বোধ হয় কয়েক বছরে তিন-চারশোটাকার সিগারেট ধারে খেয়েছে তাব দোকান থেকে।

'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' কথাগুলি সোনালি অক্ষরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার কোনো অর্থই রাজীব বুঝতে পারেনি দশ বছরে। বাকি যারা নেবার তারা নেবেই। তাদের ঠেকানো যায় না।

চোরা কাববার চলছে দেশে। একটু সবকারি সুবিধা পেলেই একজন ব্যাবসা বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি উলটে দিয়ে মোটা লাভ বাগাচ্ছে। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছে না লাভ টানবে কোথা দিয়ে কীভাবে।

তখন যদি নতুনভাবে লাভ করার কাযদা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং একজন কবি ছাপানো কবিতার বই দিয়ে তাকে শিক্ষিত মার্জিত কাব্যরসিকের মতন খাতির করে, সে কি ভড়কে না গিয়ে পারে ?

কে জানে। হয়তো তার বিড়িপাতা শুখা তামাকের দোকান করাই ভুল। কালোবাজারি বড়ো ব্যাপারীদের দাপট সইতে হয়েছে বলেই হয়তো সে তেজি কালোবাজারি বাঘের তুলনায় স্রেফ ছুঁচো বনে গেছে !

এই গভীর আত্মগ্লানি বোধ করার সময় এসেছিল কবি বামাচবণ। কবি কি কখনও ছুঁচোকে কবিতার বই উপহার দেয়—এত বড়ো বড়ো মানুষ থাকতে ?

কবির খাতির হতাশার গ্লানি দূর করে সত্যই জোর এনে দিয়েছিল রাজীবের মনে। নিজেকে ছোটো মনে করার আপশোশ কেটে গিয়েছিল।

কে বলে সে বাজে মানুষ ?

বামাচরণ ধারে সিগারেট নিতে আরম্ভ করলে সে গোড়ায় বোধ করেছিল আনন্দ !

গুরুদেবকে কিছু দান করার সুযোগ পেলে তার বাবার যেমন আনন্দ হত !

ক্রমে ক্রমে জানা গিয়েছিল বামাচরণের ধারে জিনিস নেবার কৌশলটা। মাঝে মাঝে নগদ দিয়েও সিগারেট কিনত, মাঝে মাঝে পুরানো ধার দু-পাঁচটাকা শোধও দিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যেত বাকির পরিমাণটা তার বেড়েই চলেছে।

কবির কাছে সম্মান লাভের ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শোনার জন্য কয়েক বছর ধরে এই খেসারত দিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীবকে।

রাখালের সঙ্গে নতুন দোকান খোলার পর সে বাদ না সাধলে কবিকে যোগী ভাবার দাম সে আরও কতকাল দিয়ে চলত কে জানে। তবে বামাচরণ আর নতুন কবিতার বইটই বার না করায়

এবং মোট বাকির পরিমাণটা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ানোয়, ভক্তিতে একটু ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছিল রাজীবের।

সন্ন্যাসী নতুন নতুন ক্ষমতার পরিচয় না দিলে পুরানো ম্যাজিকে মুগ্ধ ভক্তের মোহ যেমন ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে থাকে !

বামাচরণকে সোজাসুজি ধারে সিগারেট দিতে অস্বীকার করায় রাজীব রাখালকেই প্রায় ভক্তি করে বসেছিল !

দীর্ঘদিনের একটা আধ্যাত্মিক বাঁধনের ফাঁস থেকে এমন অনায়াসে যে তাকে মুক্তি দিতে পারে সে তো সহজ সাধারণ মানুষ নয় !

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ভক্তি ও আস্থা নষ্ট হয়েছে রাজীবের।

রাখালের বাস্তব-বুদ্ধি কেমন যেন খাপছাড়া। কখনও লোহার মতো শক্ত আর কখনও মাখনের মতো নরম হয়ে সে তার বাস্তববুদ্ধি খাটায়। দু-একবার ঠিকমতো লেগে যায় না এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক উলটোরকম হয়। যখন শক্ত হওয়া দরকার—যেমন বামাচরণের বেলা সে হয়েছিল—তখন সে হয় নরম আর যখন নরম হওয়া উচিত, যেমন সরকারের লোক নরেশবাবু দোকানে এলে একটু ভদ্রতা করা দরকার—তখন সে হয় শক্ত আর গরম !

লুকনো গাঁজার খোঁজে তাই না সেদিন দোকানে তার খানাতল্লাশি হয়ে গেল !

গাঁজা অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু নরেশবাবুর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার না করলে পরেরবার গাঁজা যে তার দোকানে পাওয়া যাবে না তার স্থিরতা কী ?

বিনা দোষে লোক ছাঁটাই হয় বলে, দেশে ভাতকাপড়ের অভাব বলে, চোরা কারবার আর দুর্নীতি চলে বলে সরকারের উপর তার ভীষণ রাগ। নরেশ ঘুষ খায় বলে গায়ে তার ভীষণ জ্বালা। বেশ তো—এ সবের প্রতিকার যে ভাবে হয় করবে যাও। একটা দোকান দিয়ে আর দশটা দোকানের মতো চালাবে না, গোঁয়ারতুমি করে দফা শেষ করবে দোকানের, তা বলে দোকান করার দরকারটা কী ছিল ?

মুদিখানা হোক বিড়ির দোকান হোক কিছু লোকের সঙ্গে বাকিতে কারবার করতেই হবে। চাকরেবাবু মাসের শেষভাগে ধার নিয়ে মাসকাবারে শোধ দেয়। এক দোকানে না দিলে অন্য দোকান তাকে বাকি দেবে। পুরানো চেনা খদ্দেরের হাতে কোনো সময়ে টাকা নেই—কয়েকদিনের জন্য বাকিতে চাল চাইলে তাকেও দিতেই হবে।

বাকি দিলে সবটা আদায় হবে না, কিছু টাকা মারা যাবে, এটা হিসাবে ধরে নিয়েই বাকিতে কারবার করতে হয়। এটা সাধারণ চলতি নিয়ম।

নইলে খদ্দের মারা যাবে। অন্য দোকানি বাগিয়ে নেবে।

কিন্তু রাখাল এ নিয়ম বুঝতে চায় না, মানতে চায় না ! কী হওয়া উচিত আর কী হওয়া উচিত নয় শুধু এই হিসাব কষে সে বাস্তব নিয়ম-নীতি উলটে দিতে চায় !

রাখালের জন্য কয়েকজন ভালো ভালো খদ্দের তারা হারিয়েছে।

এদিকে কারবার বাড়াবার জন্য তার মনগড়া অবাস্তব পরিকল্পনা এবং অবাস্তব ঝোঁকটাও ক্রমাগত সামলে চলতে হচ্ছে রাজীবকে।

শুধু চাইলেই যে কারবার হু হু করে বাড়ানো যায় না, সেটাও বাস্তব নিয়মে নির্দিষ্ট রেটে ঘটে, এই সহজ সাধারণ কথাটাও যেন বুঝতে চায় না রাখাল। রাজীবকে ভীরু কাপুরুষ জড়ধর্মী মানুষ মনে করে।

সেটা টের পায় রাজীব। সাধারণ দোকানদার বলে অশ্রদ্ধা টের না পাবার মতো ভোঁতা সে নয় !

রাখাল বলে, আপনি অতিরিক্ত সাবধান। একটু রিস্ক না নিলে উন্নতি করা যায় ?

রাজীব বলে, বাজারটা দেখছেন না রাখালবাবু ? এ বাজারে টিকে থাকা দায়, রিস্ক নেবেন কোন ভরসায় ?

একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে !

এই সেদিন তো রিস্ক নিয়েছিলেন, আগের পার্টনারের সঙ্গে। সে একবাব ডুবিয়ে দিয়েছে বলে বুঝি আর সাহস পাচ্ছেন না ?

আপনি বুঝছেন না রাখালবাবু। বিস্ক আমি নিতে যাইনি। সে ব্যাটা কতগুলি ভাঁওতা দিয়েছিল, আমি সেটা ধরতে পারিনি। কেন পারিনি জানেন ? আমার ঘাড় ভাঙবার মতলবে ভাঁওতা দিয়েছিল, কিন্তু মিছে কথা বলেনি। যা বলেছিল সব ও ব্যাটা করতে পারত—আমরা দুজনেই আজ কোথায় উঠে যেতাম। আমাকে ঠকিয়ে সস্তায় কিছু মেরে দেবার কোনো দরকার ছিল না। কত আর মারলি তুই ? প্ল্যানটা খাটালে যে দুজনেই ফেঁপে যেতাম দু-তিনবছরে—হাজারগুণ বেশি জুটত তোর ! কিন্তু মানুষের দুর্মতি হলে সে কি বাঁকা পথ ছাড়া চলে ?

রাখাল সাগ্রহে বলে, ও রকম একটা প্ল্যান করুন না ?

রাজীব মনে মনে বলে, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে ! রাতারাতি বড়োলোক হতে না চাইলে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষটা তুমি এমন বোকার মতো কথা বলো !

মুখে বলে, কী নিয়ে প্ল্যান করব বলুন ? ওর সুযোগ-সুবিধা ছিল—ক্ষমতাওলা লোকের সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভব অসম্ভব অবস্থা বিবেচনা করে তবে তো প্ল্যান করা চলে ? আমাদের না আছে টাকার সম্বল, না আছে অন্য সম্বল। কী দিয়ে প্ল্যান করবেন ?

বাখালেব মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে বাজীবও দমে যায়।

রাখালের সাহায্যেই নতুন দোকানটা খোলা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই রাখালকে সে ভয় করতে শুরু করেছে !

ধাতটা হল ভদ্দবলোকের, চাকরে মানুষেব। খেয়ালের বশে দোকানটাকে সেই আবাব ডুবিযে না দেয় !

বাসন্তী বলে, এ আবার কী ধিঙ্গিপনা লো ? এ সব কী শুনছি ? খুব নাকি কর্তালি শুরু করে কর্তাকে নেশায় ডুবোচ্ছ ?

কার কাছে শুনলি ?

আমি আবাব কার কাছে শুনব, গেবস্ত ঘরের বউ ? যাব কাছে শোনার কথা তাব কাছেই শুনেছি।

কী বললেন তিনি ?

বললেন আপনার গুণপনার কথা—আপনার কর্তাটির কাছে যেমন শুনেছেন তাই বললেন।

সাধনা অধীর হয়ে বলে, কী বলেছে বল না শুনি ভাই ?

বাসন্তী চোখ পাকিয়ে তাকায়, কড়া সুরে বলে, আমার কাছে ন্যাকামি করিস নে ভাই। আমি তো জানি তুই কেমন ব্যবহার জুড়েছিস মানুষটার সঙ্গে ? এই দিনকাল, বাইরে হাজাররকম ঠেলা সামলাতে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, ঘরে তুই একটু শান্তি দিস না মানুষটাকে। তোর জন্য আমার ওই মানুষটাকে পর্যন্ত বেশি মাল টানতে হচ্ছে।

মাল মানে মদ, না ? উনিও খান ?

বাসন্তী ছাদের দিকে মুখ উঁচু করে বলে, ভগবান !

মুখ নামিয়ে বলে, সত্যি ন্যাকামি করছিস, না সত্যিসত্যি কথা কইছিস বুঝতে পারছি না ভাই। নইলে আজ তোতে আমাতে শেষ ঝগড়া হয়ে সম্পর্ক চুকে যেত।

সাধনা উদাসভাবে বলে, চুকিয়ে দিলেই হয় সম্পর্ক !

তার এই ভাবান্তর বাসন্তীকে সতর্ক করে দেয়। মনপ্রাণ দিয়ে সখী হয়ে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল যে তারা দুজনে একস্তরের জীব নয়। একেবারে উপরতলার মানুষের পদাঘাতে প্রায় তাদের স্তরে নেমে এলেও সাধনা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিছক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার বেশি আত্মীয়তা করতে চায়নি।

তাহলেই তো বাসন্তীর মুশকিল। আপন ভেবে যার মঙ্গল করতে সে ছুটে এসেছে, কয়েকটা সহজ বাস্তব কথা যাকে বোনের মতো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, সে যদি না আপন ভাবে তাকে, তাব প্রাণখোলা সহজ সরল কথা না শুনতে চায়, যুক্তি দিয়ে তর্ক-বিতর্কের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে মনের কথা বুঝিয়ে বলার শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতা তো তার নেই !

ওভাবে মনের কথা খুলে বলার চেষ্টা ত্যাগ করে সে অগত্যা ঘটনাটা খবরের কাগজে রিপোর্ট দেওয়ার মতো সোজাসুজি বাসন্তীকে জানাবার চেষ্টা করে, বলে, সন্ধ্যা হতে না হতে তোমার কর্তা ওনাকে মাল খেতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। উনি তো দশটার আগে দোকান ছেড়ে বেরোবেন না, মিছিমিছি রোজ মালও উনি খান না—তোমার কর্তাটি তাই দোকানে মাল আনিয়ে খান। গোড়ার দিকে গুম খেয়ে চুপচাপ একলাটি খান। তারপর ওনাকে দু-একপাত্র চুমুক দিতে এগিয়ে দেন। এমনি উনি খেতেন না, কিন্তু এভাবে একজন এগিয়ে দিলে মানুষ না খেয়ে পারে ? তোমার কর্তার মান রাখতে ওনাকেও গিলতে হয়।

সাধনা বলে, সে তো বুঝলাম। আসল কথা বলো।

আসল কথা মানে তোমার কথা তো ? রোজ নাকি তোমার কথা ওঠে। কিছুক্ষণ চুপচাপ মাল টেনে নেশা হলে রাখালবাবু তোমার কথা পাড়েন। কতরকম যে গুণকীর্তন করেন তার নাকি ঠিক ঠিকানা নেই। সে সব যাক, আসল কথা বলেন, তুমি নাকি আর বউ নেই, ও সব পাট তুলে দিয়েছ। তোমার কর্তার মুখে শুনে আমার কর্তাটি যা বলেছে আমি কিন্তু তোমাকে তাই বলছি ভাই !

হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বলে যাও।

ওই তো বললাম ? তোমার কর্তা নালিশ করেন, তুমি নাকি বউ নেই, একদম স্বাধীন কলেজে-পড়া কুমারী মেয়ে হয়ে গেছ—ছেলেটার দিকেও নাকি তুমি তাকিয়ে দেখ না। তুমি নাকি ইস্তিরি-ধর্ম পালন কর না, একমাসের ওপর কাছে ঘেঁষতে দেওনি বেচারাকে।

সাধনা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচালি ভাই !

কী রকম ?

আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার জন্যেই কি মদ ধরেছে ? বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তুই আমাকে বুঝিয়ে দিলি, আমারই দোষে বেচারা ছাইপাঁশ খেয়ে গোল্লায় যাচ্ছে !

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে পলকহীন বড়ো বড়ো চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। এতদিন সে যেন একেবারেই চিনতে পারেনি সাধনাকে।

সত্যি অবাক করলি ভাই। তোর বিদ্যাবুদ্ধিকেও বলিহারি যাই। কী দিয়ে মানুষটাকে এতদিন বশে রাখলি তাই আমি ভাবি। তোর গুণে নয়, মানুষটা নিজের গুণে তোর বশ হয়ে ছিল। তোর সত্যিকার চেহারা ধরা পড়েছে, তাই আজ বেচারা মদ খায়।

তার মানে ?

তোর সঙ্গে অমিল হয়েছে বলে মাল খাচ্ছে ভাবছিস ? পুরুষ মানুষের গরজ পড়েছে বঁউয়ের খাতিরে মদ খাবার ! তোর জন্যেই যদি মদ খাবার মতো অবস্থা হয়ে থাকে—অনেক আগে তোকে

লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মনের মতো আরেকটা বউ সে আনতে পারত না ? বউ যেন এতই দামি যে ব্যাটাছেলে আরও দু-চারটে বউ পোষার মতো টাকা খরচ করবে, শরীর নষ্ট করবে, একটা বউয়ের জন্য ! কেন নিজেকে বাড়াস ভাই, নিজেকে ভাঁড়াস ? সোজা কথা বাঁকা করে নিয়ে কেন মিছে অশান্তি সৃষ্টি করিস ?

সাধনা মৃদুস্বরে বলে, সোজা কথাটা কী ?

সোজা কথাটা হল, রাখালবাবুর মতো লোক যখন হঠাৎ মদ ধরেছে, এমনিতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে মানুষটার, ধাক্কা সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে। ঘরে কোথায় একটু শান্তি দিবি, ঠিক উলটোটা করছিস--শত্রুতা জুড়েছিস !

কিছু হয়ে থাকলে বলবে না আমায় ?

তেমন ব্যবহার করলে হয়তো বলত। ভালোবাসা থাকলেই পুরুষমানুষ সব সময় সব কথা কি বউকে বলে ? বউকে ভয়ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে যায়। জানার সাধ থাকলে অবিশ্যি পেটের কথা বার করতে কতক্ষণ ?

সাধনা তিক্ত সুরে বলে, সে তুমি পার। তোমাদের সে সম্পর্ক বজায় আছে। আমরা বিগড়ে গিয়েছি একেবারে।

তোমরা বিগড়ে যাওনি। তোমাদের সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটাই হয়েছে মুশকিল। রাখালবাবু আপিস করছেন বিড়ির দোকানে, ঘরসংসার ফেলে বউ মানুষ তুমি বাইরে করছ ধিঙ্গিপনা—এ সব কি আর মিছিমিছি ঘটেছে ? দিনকালটাই গেছে বিগড়ে, তোমরা খাপ খাচ্ছ না। তোমরাও বিগড়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না, দিব্যি খাপ খেয়ে যেতে !

অবস্থা বদলে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না।

এই কথা তাকে শুনিয়ে গেল বাসন্তী!

তার এই অনেকদিনের জানা কথাটা !

এমনভাবে শুনিয়ে গেল যেন আসল অপরাধটা অবস্থার, সব কিছুর জন্য দায়ি পরিবর্তনটা, তাদের খাপ খাওয়াবার অক্ষমতা নয়।

কথাটা সত্য এবং সহজ। বাসন্তী পর্যন্ত এটা ধরতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত হিসাবে তাদের জীবনে ভাঙনটা অবশ্যম্ভাবী, নীচের স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার তাদের হতেই হবে. কিন্তু সেটা এমন কদর্য কুৎসিত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই ঘটতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই !

ভাঙনের বাস্তবতা সুখকর হয় না, হতে পারে না, তা জানে সাধনা। মধ্যবিত্তের অনেক মিথ্যা স্বপ্ন ও কল্পনা, বিশ্বাস ও ধারণা, অবাস্তব আবাম বিলাস ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক হবেই।

যদিও ভাঙার সঙ্গে গড়াও চলে, নতুন সম্পর্কের মধ্যে জীবন আরও ছড়ানো ও জমাট হয়, নতুন আশা জীবনের আনন্দ ও সার্থকতার নতুন রূপ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু এতো তা নয়। এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিত বিড়ম্বনা ! দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বইকী !

এই বিকৃত অমানুষিক অবস্থাটা তাদের ভদ্র জীবনে রূপান্তর ঘটাবার জন্য অপরিহার্য ছিল না এবং তাদের ভেঙে নতুন মানুষ করার প্রয়োজনেও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি !

ভাঙন নয়। এই অবস্থাটাই অসহ্য হয়েছে তাদের। রাখাল শুধু বেকার হয়নি বিনা দোষে. শুধু অর্থাভাবই ঘটেনি তাদের—রাখাল আজ শুধু অনভ্যস্ত উপায়ে জীবিকাই অর্জন করছে না—তখন

যেমন আজও তেমনি ফাঁকি আর ধাপ্পাবাজি দিয়ে টিকিয়ে রাখা বিকারের বিরাট বেড়াজালে তাদের আটক রাখা হয়েছে !

রাখালদের বেকার হয়ে না খেয়ে মরার দশা হয় কিন্তু বেকারত্বের প্রতিকারের বদলে বিরাট তোড়জোড়ের সঙ্গে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে ভদ্রজীবনের কৃত্রিমতা অবাস্তবতা সম্পর্কে মিথ্যা মোহ। রাখালের মতো ভদ্রলোকদের জীবনের বাস্তবতা যেমনই দাঁড়াক, ভদ্র থাকাই অসম্ভব হয়ে যাক, ভদ্রজীবনের নিছক সাজানো-গোছানো খোলসগুলি, কৃত্রিমতাগুলি, অবাস্তব ভাবাবেগগুলি জীবনের সেরা সম্পদ হিসাবে মহাসমারোহে বাঁচিয়ে রাখা হয় !

তলিয়ে সব না বুঝুক, বাসন্তী জীবনের সহজ নিয়ম মানে। সে তাই টের পেয়েছে জীবনে কত অনিয়ম আমদানি হওয়ায় তাদের আজ কী দশা ! নীচের তলার সাধারণ গরিব মানুষের সবরকম দুর্দশাই আছে, একেবারে না খেয়ে মরা পর্যন্ত চরম দুর্দশা,—কিন্তু মৃত জীবনের ভূতের বোঝা তাদের সইতে হয় না।

তারা যতই পিছিয়ে থাক, সংস্কার ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাক, তারা নিজের জগতেই আছে, রুক্ষ কঠোর বাস্তবতা নিয়েই আছে।

সেখান থেকে শিশুর মতো হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোলেও প্রতিদিন এগোচ্ছে।

রাখাল সাধনাদের মতো জরি চুমকি বসানো লাল নীল বাতি দিয়ে সাজানো হাতির দাঁতের কারুকার্য করা কৃত্রিম অবাস্তব মিনার ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর ঝঞ্ঝাট তাদের নেই।

ভদ্রঘরের ছেলে বাধ্য হয়ে কারখানায় খাটছে কন্ডাক্টরি করছে, ফেরিওয়ালা হয়েছে—কিন্তু সেটা যেন জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য নয়, ভদ্রজীবনটাকে কোনোরকমে বাঁচাবার জন্য !

এ দায় নেই বাসন্তীদের। ছলনা চাতুরি নিয়ে নয়, হিসাব করা পলিসি নিয়ে নয়, রাজীবের জ্বর হলে সালসা খাওয়ানোর মতো প্রয়োজনীয় মনে করেই অন্যভাবে তার শরীর মন অসুস্থ দেখলে বাসন্তী অনায়াসে তাকে বলতে পারে : শরীর খারাপ লাগছে ? একটা পাঁট এনে খেয়ে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ো না !

সোজা কথাটা সে বোঝে। দরকার হলে পাঁট রাখাল খাবেই। মৃত্যুপণ করে চেষ্টা করলে একদিন কী দুদিন হয়তো সে ঠেকাতে পারবে রাজীবকে—তার পরদিন তার মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে রাজীব বাইরে পাঁট খেয়ে আসবে !

অসুখের মতোই এ রকম একটা অবস্থা আসে শরীর মনের। পাঁট না খেয়েও অবশ্য সে অবস্থার প্রতিকার করা যায়। কিন্তু যে অবস্থায় তারা আছে তাতে সেটা সম্ভবপর কোনো প্রতিকার নয়—অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা।

সোভিয়েটে নাকি এভাবে এই কারণে কারও মদ খাবার দরকার হয় না। এ সব উদ্ভট রোগের নাকি মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে সে দেশে।

ভাগ্যবান দেশ। ধন্য দেশ।

কিন্তু বাস্তব জীবন পিষে দমিয়ে দিয়েছে রাজীবকে। এটা কোনও বীজাণু-ঘটিত রোগ নয়, সমগ্র জীবনের মাস-বছর-ঘটিত বাস্তবতার সৃষ্টি করা রোগ।

পাঁট না খেলে রাজীব তিন-ভাগ রাত ছটফট করবে। মদ না খেয়েও মাতালের চেয়ে বেশি আবোল-তাবোল বকবে—শ্যামাসংগীত উলটে-পালটে গাইবে, কপাল চাপড়াবে—শরীর মনের যন্ত্রণায় যেন মদমাতালের চেয়েও কষ্ট পাবে।

পরদিন হয়ে থাকবে নির্জীব প্রাণহীন মানুষ।

তার চেয়ে কী আসে যায় এ সময় একটু খেলে ? শরীর মনের কষ্টটা ভুলে বেলা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা তাজা বোধ করলে ?

মাসে দু-তিনদিনের বেশি তো আর দরকার হয় না !

যারা নেশার জন্য নিয়মিত খায় তাদের কথা আলাদা। তাদের সাংঘাতিক রোগ। সব দিক দিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।

ডেকে আনে কিন্তু সেও তো রোগী ? নীতি কথায় কি রোগ সারে ? বাস্তব লাগসই চিকিৎসা ছাড়া ?

তাই বটে। নইলে কারখানায় প্রাণপাত করে যারা খাটে তাদেরও অনেকে রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে কয়েক আউন্স জলমেশানো আধ্যাত্মিক দাওয়াই খেতে যাবে কেন ?

জীবনের বাস্তবতাই এ রোগের জন্য দায়ি।

কী করবে ভেবে পায় না সাধনা।

বেকার রাখাল তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। চরম দুরবস্থা বলে সে যেতে রাজি হয়নি। এবার কিছুদিন ঘুরে আসবে ?

কিন্তু কী লাভ হবে তাতে ? তাকে নিয়ে যখন আসল সমস্যা নয় রাখালের, তার জন্য যখন মদ খাওয়া নয়, সে সরে গেলে কী আসবে যাবে রাখালের !

ঘরের অশান্তি থেকে রেহাই পাবে ? আগে হলে এভাবে উভয় পক্ষের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব মনে করত সাধনা। সেদিন আর নেই। তফাতে সরে গেলে দুজনে যে ধরনের শান্তি পাবে তার দাম খুবই সামান্য হয়ে গেছে তার কাছে।

সে জানে, সম্পর্ক বজায় রেখে দূরে সরে গেলে তুচ্ছ খুঁটিনাটি সংঘাতগুলিই শুধু বাতিল হবে, রাগ দুঃখ অভিমান আর দুশ্চিন্তায় যা পুষিয়ে যাবে শতগুণ !

রবিবার রাখাল জানায়, সে সভায় যাবে না।

আমি যাব বলে ?

রাখাল চুপ করে থাকে।

আমার বাইরে যাওয়া তুমি পছন্দ করছ না কেন ?

পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। এক মিটিংয়ে দুজনের যাওয়া উচিত নয়।

কেন ?

তোমার আমার মত মেলে না বলে। আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আগেকার সভায় সংঘর্ষ ঘটাবার পর আজ প্রথম তাদের মধ্যে সংক্ষেপে সংসারের দরকারি কথা ছাড়া বোঝাপড়ার কথা হয় কয়েকটা।

সাধনা থেমে না গিয়ে বলে, একটা বিষয়ে মত মেলেনি বলে কি সব বিষয়ে অমিল হবে ?

কোনো বিষয়ে আমাদের মতের মিল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এক রকম ভাব, আমি আরেক রকম ভাবি।

আগে মিল ছিল, নতুন কথা কী এমন ভাবতে আরম্ভ করেছি যে সব দিক দিয়ে অমিল হয়ে গেল ?

ভাবছ বইকী। আসল কথাটাই অন্যভাবে ভাবছ। স্ত্রীর যেটা সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হওয়া আমি উচিত মনে করি, তুমি তার উলটোটা উচিত মনে করছ। আমার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছ—

আমি করেছি ? তুমিই কথা বন্ধ করেছ, আমায় এড়িয়ে চলছ, মদ খাচ্ছ। তুমি যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, যেমন চাইবে তেমনিভাবে চলতে হবে, এটাই যদি আমার সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য মনে কর—

রাখাল চুপ করে খানিকক্ষণ তার মুখের দিয়ে চেয়ে থাকে।

তুমি বুঝবে আশা করি না। কতগুলি বাঁধা বুলি আর ছাঁকা নীতি শিখেছ, তুমি আর কিছু শুনতেও চাও না, বুঝতেও চাও না। আমার হুকুম মেনে চলবে কী চলবে না, সে প্রশ্নই আলাদা। আগে কি হুকুম মেনে চলতে ? আমি বলছি স্ত্রী হিসাবে তোমার যেটা করা উচিত, নিজে থেকেই করা উচিত। তোমার আমার স্বার্থ এক, এই সোজা কথাটা মানার সঙ্গে আমার হুকুমে চলার সম্পর্ক কী ? আমি বড়ো হলে, টাকা করলে, নাম কিনলে তুমিও সে সব ভোগ করবে, আমি পথের ভিখারি হলে তুমিও পথে বসবে, উপোস করবে। এটা তো অতি সহজ সরল কথা। আমি সুখী না হলে তোমার সুখী হবার সাধ্য আছে ? তুমি বলবে এটা ভাবী অন্যায়, সমাজেব এটা বিশ্রী অনিয়ম, এ রকম ব্যবস্থার জন্যই স্ত্রীকে স্বামীর দাসী হয়ে থাকতে হয। বেশ কথা, আন্দোলন চালাও, অন্যায় অবিচাবেব প্রতিকার কর। কিন্তু স্ত্রী হয়ে থেকে স্বামীর স্বার্থ দেখবে না কোন যুক্তিতে ?

তোমার কোনো স্বার্থের হানি করেছি ? সেদিন সভায় বলেছিলাম বলে তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে ? বরং দেখতেই পাচ্ছ, দশজনের কাছে তোমার আমার দুজনেরই মর্যাদা বেড়েছে।

তোমার বেড়েছে—আমার নয়। লোকে বলছে রাখালবাবুব স্ত্রী না থাকলে প্রভাত ওদের ঠকাত। অর্থাৎ রাখালবাবু ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাজে লোক, তাঁর দ্বারা কিছু হত না।

তুমি উলটো মানে করছ। আমায় ভালো বললে তোমায় বাজে লোক বলা হয না। আসলে, তুমি ভুল করতে যাচ্ছিলে, আমি ঠিক করেছি, তাই তোমার রাগ। তোমায় না বলে লোকে আমায় কেন ভালো বলবে !

তীব্র বিরক্তি আর হতাশা ফোটে রাখালেব মুখে। স্থিরদৃষ্টিতে চেযে সে বলে, তোমায কিছু বলা বৃথা। তুমি নিজের ভাবনাতেই মশগুল। তোমায় হিংসা কবব আমি ? তুমি যাও না দশটা সভায়, নাম কেনো মর্যাদা বাড়াও। আমি বারণ করছি ? আমি যাব মধ্যে আছি সেখানে মাথা গলিযে আমার বিরোধিতা করবে কেন ? দেশে কি আর আন্দোলন নেই, সমিতি নেই, সভা হয় না ? দেশেব লোককে কি অন্যভাবে কেউ ঠকাচ্ছে না ? তোমার মতামতেব স্বাধীনতা আছে, সেটা প্রকাশ কবাব স্বাধীনতা আছে—কিন্তু যেখানে তোমাব স্বামীর মর্যাদার প্রশ্ন সেখানে স্বামীর স্বার্থটাই তুমি দেখবে আগে। সেদিনের সভায় আমার জন্য তোমার মাথাব্যথা দেখা যায়নি, এটাই আসল কথা। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ার বদলে কমে যাক, আমি ছোটো হই দশজনেব কাছে, সে জন্য তোমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

রাখাল একটু থেমে যোগ দেয়, তুমি ভাবছ একদিনের একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি। সামান্য ব্যাপার নয়। সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আমার সমস্ত স্বার্থই তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি নাম করব, টাকা করব শুধু এই স্বার্থ নয়—তাহলেও একটু ভরসা থাকত ! আমার বদনাম হলে যে তোমারও লজ্জা, আমি পয়সা না কামালে যে তুমিও উপোস করবে, তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তোমার কাছে। আমি আর স্বামী নই তোমার কাছে। একটা অভ্যাস টেনে চলছ। নিয়ম রক্ষা করছ, এইমাত্র।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তুমি আর স্বামী নেই মানে তোমার জন্য আমার ভালোবাসা নেই ?

ভালোবাসা ? ভালোবাসা আছে কী নেই সে আলাদা কথা, স্বামী-স্ত্রী না হয়েও ভালোবাসা নিয়ে মানুষ একসাথে থাকে। তাদের কথাও আলাদা। আমি বলছি, আমরা স্বামী-স্ত্রী একটা বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক আছে আমাদের। সমাজটা খারাপ হোক, এ সমাজে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক না থাক—সম্পর্কটা তো আছে। এ সম্পর্কের মূল নিয়ম হল—স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ এক হবে। ছোটোখাটো খুঁটিনাটি স্বার্থ নিয়ে দুজনে হাজার বিরোধ থাক—মূল স্বার্থে তফাত থাকবে না। হাতের বাড়তি টাকাটা দিয়ে

স্ত্রীর একখানা গয়না হবে না স্বামীর একটা শখ মিটবে তা নিয়ে মারামারি হোক—স্বামীর রোজগার বাড়ুক এটা হবে দুজনেরই স্বার্থ।

সাধনা নতমুখে ভাবে।

মনের কথাটা বলবে রাখালকে ? রাখাল আরও বেশি রাগ করতে পারে, আরও বেশি ত্যাগ করতে পারে তাকে, এ আশঙ্কা থাকলেও বলবে ?

রাখাল হয়তো বুঝতেও পারে তার কথাটা। একেবারে তো মূর্খ নয় মানুষটা।

ভেবেচিন্তে বলাই ঠিক করে সাধনা। যে অবস্থায় তারা এসে পৌঁছেছে, খোলাখুলি কথা বলাই ভালো।

টাকার চেয়ে নামের চেয়ে স্বামী মানুষ হিসাবে বড়ো হোক এই স্বার্থটা যদি বড়ো হয় স্ত্রীর কাছে ?

আমি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি ? ক-দিন মদ খাচ্ছি বলে ? তোমার জন্যই আমি মদ খাচ্ছি। এ অবস্থা মানুষের সহ্য হয় না।

বাসন্তীর কাছে সাধনা কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সহজ মোটা একটা কথা সেদিন সে বুঝিয়ে না দিলে আজ নিজের ভাব-প্রবণতার ফাঁকি নিয়ে সে ফাঁপড়ে পড়ে যেত।

তুমি তাই ভাবছ—কিন্তু স্ত্রীর জন্য কেউ মদ খায় না। তোমার কী হয়েছে আমি জানি না—কিন্তু মদ খাওয়ার জন্য আমায় দায়ি কোরো না।

রাখাল অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

সাধনা বলে, তোমায় অমানুষ বলিনি। মানুষ হিসাবে বড়ো হও মানে বলছি না যে গান্ধিজির মতো সাধুপুরুষ হতে হবে। টাকা-পয়সা নাম-যশের চেয়ে দশজনের স্বার্থ তোমার কাছে বড়ো হবে—আমি শুধু এইটুকু চাই।

টাকা করব না ? দেশের লোক খেতে পরতে পায় না, তাই বলে টাকা করে নিজে সুখে থাকার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অপরাধ ?

নিশ্চয় না। মানুষের ঘাড় না ভাঙলেই হল। তুমি আমি দশজনের মতো সাধারণ মানুষ—তোমায় অসাধারণ মানুষ হতে বলব কেন ? সব ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু দেশোদ্ধার করতে নামলে ভালো হত, এমন কথা আমি ভাবিও না। আমিও কি ঘরসংসার ফেলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাবছি ? তুমি ভালো জিনিসটি আনলে তৃপ্তির সঙ্গে খাই না ? ভালো কাপড় পরি না ? তবে কিনা দশজনের জন্য যতটা সাধ্য করতে হবে। আগের মতো শুধু নিজেদের নিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না।

আমিও তো তাই বলছি। আমি কি নামের কাঙাল, না নেতা হবার শখ আছে আমার ? গা বাঁচিয়ে না থেকে যতটা পারি দশজনের লড়ায়ে এগিয়ে যাব,—তাতেই দশজন আপন ভাববে। সুমথেরা ভুল বুঝে সব গন্ডগোল করে দেবে টের পেয়েছিলাম বলেই না এগিয়েছিলাম ? অতগুলি লোকের সর্বনাশ হবে বলে ? আগে অনায়াসে এড়িয়ে যেতাম—আজকাল চেষ্টা করেও পারব না। রাতে ঘুম হবে না।

সাধনা জোর দিয়ে বলে, তা হলে তোমার আমার মতের অমিলটা হচ্ছে কোথায় ?

রাখালও সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তাই নিয়ে।

সাধনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

রাখাল বলে, বাস্তব জগৎ বদলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনটা বদলাচ্ছে, তুমি আমি দুজনেও বদলাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি এ পরিবর্তনটার সঙ্গে অন্য সব কিছুর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলবার,

বাস্তব যতটা বদলেছে, আমি যতটা বদলেছি তার সঙ্গে। যে রেটে বদলেছি তার সঙ্গেও। যেন বাড়াবাড়ি করে না বসি, যেন না ভাবি যে সব কিছু বদলে নতুন হয়ে গেছে বা দু-চারদিনের মধ্যে হল বলে, যেন না ভাবি যে আমিও আর সেই রাখাল নেই—একেবারে অন্য একটা মানুষ হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি গা ছেড়ে দিয়েছ, ধরে নিয়েছ যে তুমিও আর সে সাধনা নেই, তোমার জীবনটাও একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটা পরিবর্তন সত্যি ঘটেছে, তুমি সেটাকে কল্পনায় বাড়িয়ে নিয়েছ হাজার গুণ।

একটু ইতস্তত করে রাখাল যোগ দেয়, রাঁধছ বাড়ছ ছেলে মানুষ করছ আমার সেবা করছ কিন্তু ভাবছ যে তোমার আমার যে সম্পর্কটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়ে একেবারে নতুন রকম একটা সম্পর্ক হয়েছে। নিজেকে তুমি আমার স্ত্রী ভাবছ না, আমাকে তোমার স্বামী ভাবছ না। মানুষ হিসাবে আমি তোমার অধিকার মানছি না, শুধু অন্যায় আর অবিচার করছি। আমি তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই—সেটা আমার ভীষণ অপরাধ ! তোমায় আগে মানুষ ভাবতে হবে—তারপর তোমার স্ত্রী ভাবা চলবে। আমি যেন তোমায় মানুষ ভাবি না—তোমায় গোরু ছাগল ভেবে এতদিন তোমায় সঙ্গে ঘরসংসার করেছি।

সাধনা চুপ করে থাকে।

সে আরও শুনতে চায় বুঝতে পেরে রাখাল বলে, আমি তোমার মালিক, তুমি আমার সম্পত্তি এটা কি তুমি অস্বীকার করছ ? আমি কি এটা জানি না ? আমি কি কালা যে যারা এই সত্যটা আবিষ্কার করে পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছেন, আমি তাদের কথা শুনতে পাব না ? আমি কি নতুন মার্কিনি দর্শন প্রচারের দালাল যে এ সত্যটা অস্বীকার করব ? আমি রোজগার করে তোমায় খাওয়াই পরাই, আমার ভাড়া করা ঘরে থাকতে দিই—আমি তোমার মালিক বইকী ! খোকনকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা গোরু কিনে পুষলে আমি তারও মালিক হতাম। তাই বলে আমি কি তোমাকে আর গোরুটাকে সমান করে দিতাম ? আমার সম্পত্তি হলেও তোমাকে মানুষ ভাবতাম না ? মানুষ বলেই তোমায় আমি বিয়ে করেছি, তোমার স্বামী বা মালিক হয়েছি।

রাখাল একটু থামে। সাধনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে দেখেও তার সংশয় জাগে যে সে তার কথার মর্ম বুঝবে কিনা ! তার নিজের সম্পত্তি, নিজের স্ত্রী—শাস্ত্র এবং আইন যাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করার অধিকার তাকে দিয়েছে—অথচ প্রায় তিন সপ্তাহ সে তাকে স্পর্শ করেনি ! তাকে মানুষ ভাবে বলেই যে তার এই প্রাণান্তকর সংযম—এটুকু কি মাথায় ঢুকবে সাধনার ?

এ যে তার রাগ অভিমান নয়, এতে যে তার বাহাদুরি নেই, সত্যই তাকে মানুষ মনে করে বলে তাকে বাধ্য হয়ে এ সংযম পালন করতে হচ্ছে, এই সহজ সরল কথাটা ?

সাধারণ কলহ বিবাদ হলে আলাদা কথা ছিল। এখনকার অচল অবস্থায় সাধনাকে অপমান করার সাহস তার নেই। সে মানুষ বলেই নেই !

কোন দিক দিয়ে কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া আসবে সে জানে না। কিন্তু সাধনা মানুষ বলেই প্রতিক্রিয়াটা যে সাংঘাতিক হবে এটুকু জানে।

ধীরে ধীরে সে বলে, মনুষ্যত্বের দাবি নিয়ে সেন্টিমেন্টাল হলে, ঝোঁকের মাথায় যন্ত্রের মতো বিচার করলে, ফলটা মারাত্মক হয়। আসল কথাটাই গুলিয়ে যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। একটা মানুষেরই কীর্তি—একদল মানুষের। এই দলের সঙ্গে বাকি মানুষের একটানা বিবাদ। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ বিক্ষোভ বিদ্রোহ সব কিছুর গোড়ায় ওই সংঘাত। সোভিয়েটে চীনে বিপ্লব ঘটেছে এই কারণে—পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষেরা ক্রমে ক্রমে জয়ী হচ্ছে। এ সব মোটামুটি তুমিও জানো আমিও জানি। এখন কথাটা হল এই। তুমি আমি চাইলেই মানুষের সব অধিকার পেয়ে যাব না। আমাদের ক্ষোভ আছে, দাবি আছে, লড়াই চলছে নানাভাবে—

এ একটা প্রক্রিয়া। ক্ষোভ আছে—কিন্তু বাস্তবকে ভুলে শুধু ক্ষোভটা ফেনিয়ে পাগল হলে তো চলবে না আমাদের। আমাদের বাঁচতেও হবে—যতই বঞ্চিত হই আর অপমান সই, জীবনটা আমাদেব ফেলনা নয়। এটুকু বুঝে, লড়াই চলছে জেনে, ধৈর্য আমাদের ধরতেই হবে, বাস্তবকে মানতেই হবে। তা না হলে, হতাশা আসবে, বৈরাগ্য জাগবে, মন বিগড়ে যাবে, জ্বালাটা অসহ্য হয়ে খুন করার কিংবা আত্মহত্যার ঝোঁক আসবে।

আমার কী হয়েছে ?

তোমার মন বিগড়ে গেছে, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুমি শুধু ভাবছ স্ত্রী হওয়ার জন্য তোমার জীবনে কত অপমান পরাধীনতা অসম্পূর্ণতা। জ্বালাটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তুমি একটা অবাস্তব অসম্ভব জীবন চাইছ—এ জীবনটা ভালো লাগছে না। জীবনটা মায়া, জগৎটা মায়া, সব কিছু বাজে, ক্রমাগত এ সব ভাবতে ভাবতে যেমন বৈরাগ্যের বিকার আসে, চোখ বুজে একটা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতে সাধ হয়—তোমারও তাই হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে আড়ি করলে এই বিপদ হয়। আমি যে চাকরি করতাম—কতগুলি অন্যায় অবিচাব অপমান মেনে নিয়েই করতাম। আজ ব্যাবসা করি বলেই কি আমি স্বাধীন হয়ে গেছি ? আরও দশজনের মতো মানুষ হিসাবে অনেক অপমান সইতে হয়। আমার কি জ্বালা ছিল না, এখন জ্বালা বোধ করি না ? কিন্তু অনেক অন্যায় অবিচার সংকীর্ণতা ব্যর্থতা আছে বলে নিজের জীবনটা খারিজ করিনি। প্রতিকার চেয়ে লড়াই করব, বাস্তবকে বদলে দেব—কিন্তু প্রাণের জ্বালায় বেঁচে থাকার ওপরেই বিতৃষ্ণা আনব কেন ? তাহলে তো সব ফুরিয়ে যাবে। নিজের জীবনকে ভালো না বাসলে কীসের জন্য আমি লড়াই করব ? আমার লড়াই তা হলে একটা ফাঁকা আদর্শের জন্য লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে !

যিনি সব কিছু ছেড়ে সারা জীবন শুধু লড়াই করছেন, শুধু আন্দোলন নিয়ে আছেন, তাঁর কি ফাঁকা আদর্শের লড়াই ?

নিশ্চয় না। তিনিও নিজের জীবনকে ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁর ধাতটা বিশেষ রকমের বলে সৈনিকের জীবনটাই তার ভালো লাগে। নিজেব জীবনটা যদি কেউ তুচ্ছ ভাবে, জীবনটা বিস্বাদ লাগে—দশজনের জন্য সে লড়াই করতে যায় না, বনে গিয়ে তপস্যা কবে।

সাধনা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

আমি যে সভা-সমিতিতে যাব, কিছু কিছু আন্দোলনে যোগ দেব ভাবছি—

তুমি মুক্তি চাইছ, একটু বৈচিত্র্য আর উত্তেজনা চাইছ। নইলে আমি মানুষ ভাবি না বলে তোমার প্রাণে এত জ্বালা, জীবনে ঘেন্না ধরে গেল—তুমি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে না লড়ায়ে ? কিন্তু তোমার গোড়া আলগা হয়ে গেছে—তুমি জোর পাবে কোথায় ? তুমি সাধারণ মানুষ, ক্রমে ক্রমে তুমি তৈরি হবে—বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তোমার লড়ায়ের ঝোঁক আসেনি, এসেছে বৈরাগ্য। তোমার সাধারণ স্বামীটা প্রাণপাত করছে তোমায় সুখী করার জন্য, সাধারণ একঘেয়ে জীবনটা কোথায় তুমি—

সাধনা আচমকা জিজ্ঞাসা করে, তুমি মদ খাচ্ছ কেন ?

রাখাল বলে, তোমার জন্য। তবে তুমি যেভাবে ভাবছ, সেভাবে তোমার জন্য নয়। তুমি সত্যি দায়ি নও। আমি সন্ন্যাসীও নই, আদর্শ নিয়ে আমার দিন কাটে না, জীবনটা আমি ভোগ করতে চাই। কিন্তু এ জীবনটার ওপরেই তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রাণ দিয়ে এত চেষ্টা করলাম—সব গেল ভেস্তে। মনের দুঃখে অবশ্য মদ খাচ্ছি না—ক-দিন থেকে ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলাম না। এ ভাবে চলে না, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—তবু মনটা ঠিক করতে পারছিলাম না। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। রাজীবের সঙ্গে একদিন খানিকটা গিলে দেখলাম—প্রাণটা ঠান্ডা করা যায়। রাত্রে তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমানো যায়।

কিন্তু মদ খেলে শুনেছি—

না, নেশা চড়লে ও সব ঝিমিয়ে যায়। বেশি খেলে বউকে মারধোর করার ঝোঁক আসে। অন্যের কাছে তোমায় গালাগালি করেই আমার সাধ মিটে যেত। ঘুম পেলে বাড়ি আসতাম।

মন ঠিক করেছ ?

করেছি।

আমায় তাড়িয়ে দেবে ?

তাড়িয়ে দেব কেন ? আমরা ভিন্ন থাকব।

ও ! ত্যাগ করবে ! মনস্থির করেছ, আর খাবে না তো ?

আবার কেন খাবো ?

এত কথার পরেও সভায় যাওয়ার সময় হলে সাধনা বলে, চলো না দুজনেই যাই ? যে ক-দিন একসাথে আছি ঝগড়া করে লাভ কী ? সভায় তোমার আমার মত মিলবে।

রাখাল থতোমতো খেয়ে বলে, চলো।

পাওনাদারের তাগিদে বাড়িতে টেঁকা দায়।

সঞ্জীবের পাওনাদার।

দোকানে দোকানে দেনা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে দেনা, বাড়িওলার কাছে দেনা। চক্ষুলজ্জার বালাই এখনও শেষ হয়ে যায়নি সঞ্জীবের, সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষরাত্রে উঠে রান্না করে, ভোর ভোর খেয়ে সঞ্জীব বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে।

পাওনাদার তাগিদ দিতে এলে সে প্রথমে আশাকে বলেছিল, বলে দাও বাড়ি নেই।

আমি বলতে পারব না।

তারপর সঞ্জীব সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটাবার ব্যবস্থা করেছে।

বাড়িভাড়া নিয়ে মুশকিলে পড়েছে রাখাল। নিজে বাড়িওলা না হয়েও সে দাঁড়িয়ে গেছে সঞ্জীবের পাওনাদারে। বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছিল নিজের নামে, সঞ্জীবকে ঘর ভাড়া দিয়েছে সে। বাড়িওলা মাসে মাসে সমস্ত অংশের ভাড়া তার কাছে আদায় করে নেয়, সঞ্জীবের টাকাটা সে পায় না।

তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছে। চারিদিকে তার যেমন ঋণের বহর, ভাড়া পাবার আশা রাখাল রাখে না।

নতুন মাসের পয়লা তারিখে অনেক রাত্রে সঞ্জীব বাড়ি ফিরতেই রাখাল রাগারাগি করে, কড়া সুরে বলে, মাইনে পেয়েছেন, আমার টাকাটা এখুনি দিয়ে দিন।

আজ বেতন পাইনি। কাল পেলেই আপনাকে দিয়ে দেব।

পরদিন দুপুরে রাখাল বাড়ি নেই, সঞ্জীব একটা লরি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাড়াহুড়ো করে মালপত্র যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই গাড়িতে তুলতে আরম্ভ করে।

আশা এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়।

আমরা চল্লাম।

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার আর কী পালিয়ে যাচ্ছি। আমায় কিছু জানায়নি, একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বলছে পাওনাদারের জ্বালায় টেঁকা যাবে না, কিছুদিন সময় নিয়ে সামলে নিই, তারপর সকলের টাকা শোধ দিয়ে দেব।

কিন্তু আপিসে গিয়ে সবাই ধরবে না ?

আপিস কোথা—আপিস নেই। চাকরি থেকে ক-মাস আগে ছাঁটাই হয়েছে। কাল টের পেলাম।

তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাধনার ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। আজকালের মধ্যে যার প্রসববেদনা জাগার সম্ভাবনা, নিঃসম্বল নিরুপায় স্বামীর সঙ্গে সে কোথায় চলেছে কে জানে !

খাওয়া পরার কষ্ট সইতে পারে না বলে চাকরি থাকতে ধার করতে শিখেছিল। চাকরি যাবার পর সেই উপায়ে কয়েক মাস চালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে সে নয় পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচবে—কিন্তু এবার আশাকে সে বাঁচাবে কী করে, নিজে বাঁচবে কী দিয়ে ? ঋণ করার অফুরন্ত উৎস তো মানুষের থাকে না !

আমার কাছে থেকে যাও। আমি যেভাবে পারি—

শীর্ণ বিবর্ণ মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফোটে আশার।

সে তো বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে পারি। না ভাই, মরতে হয় ওর কাছে থেকেই মরব, ভাড়ার টাকাটা বাকি রয়ে গেল—

হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আশার।

জীবনে আর কারও সঙ্গে ভাব করব না। আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? তোমার সঙ্গে ভাব করে তোমাদের ঠকিয়ে পালাচ্ছি, ঠকাবার জন্যই যেন ভাব করেছিলাম।

তোমার কী দোষ ?

দোষ বইকী। অনেক আগেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল। আমি কি ওর সঙ্গে পালাতাম ভেবেছ ? কী করব, দায়ে ঠেকেছি। অনেক পাপ করে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি।

বাড়ি ফিরে সব শুনে রাখাল রেগে টং হয়ে বলে, আমার এতগুলি টাকা মেরে দিলে !

একলা তোমার নয়। অনেকের মেরেছে।

এ সব মানুষকে ধরে চাবকানো উচিত !

বাসন্তী বলে, আহা বেচারা। কী করবে ? যা দিনকাল। ভদ্রঘরের ছেলে, নরম ধাত নিয়ে গড়ে উঠেছে। ঠেলায় পড়লে কী সামলাতে পাবে ? জিনিসপত্রের দামে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত ! মাইনেতে কুলিয়ে গেলে কি বেচারা ধার শুরু করত, এভাবে ডুবত ?

রাখাল সঞ্জীবকেই চাবকাতে চেয়েছিল। বাসন্তী তাকে দোষী করতে রাজি নয় !

সাধনা বলে, ধারের জন্য কিন্তু চাকরিটা যায়নি। আপিসের কর্তার সঙ্গে তর্ক করেছিল।

বাসন্তী বলে, ওমা ! এত তেজও ছিল মানুষটার ? তবেই দ্যাখো, মানুষ কি আর ছাঁচে গড়া হয় ! একটা মানুষের মধ্যে কতরকমের ধাত মেশাল থাকে। এদিকে বেহায়ার মতো ধার করে, অন্যদিকে তেজ দেখাতে গিয়ে চাকরি খোয়ায় !

আনমনে কী যেন বলে বাসন্তী।

সাধনা বলে, খালি খালি লাগছে বাড়িটা।

বাসন্তী বলে, আমি আসব। বাড়িতে হাট বসিয়েছে, বাড়ি খুঁজতে বলে দিয়েছি—আর খুঁজতে হবে না। ভাড়াও কম লাগবে।

ওই একখানা ঘরে হবে ? মালপত্র আঁটবে তোর ?

আঁটালেই আঁটবে। গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি হবে।

ক-দিনের অসুখে শোভার দাদার বউ মারা যায়। বাঁচানো যেত, তবু মারা যায়।

চোখে জল আর মুখে রেহাই পাবার নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে শোভা এসে ধরা গলায় বলে, বউদিই শেষে আমায় বাঁচিয়ে দিলে গেল।

শোভা চোখ মোছে। আবার চোখে জল আসে। হাসবে বলে কাঁদে।

এবার একটা লোক রাখতেই হবে—তার বদলে আমি খাটব। এবার জোর গলায় বলতে পারব, বিয়ে ভেঙে দাও।

সাধনা চুপ করে থাকে।

শোভা বলে, আমি কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছিলাম সাধনাদি। আপনারা তো কাজ-টাজ জুটিয়ে দিলেন না, আমি নিজেই জুটিয়েছিলাম।

কী কাজ ?

রাঁধুনির কাজ। আর কী কাজ জোটাব বলুন। আর কী শিখেছি রান্নাকরা বাসন মাজা ছাড়া ? ও বাবা, রাঁধুনির কাজ জোটানোও কী কঠিন ব্যাপার ! কেউ আমাকে রাখতে চায় না ! বিনয়বাবুর রাঁধুনি পালিয়েছে, আমি গিয়ে ধরে পড়লাম আমাকে রাখতেই হবে। বিনয়বাবু সুহাসিনীদি দুজনে কিছুতেই রাজি হল না। আমি যত জোর কবি, ওরা তত বলে, না বাবা, তোমায় রাখলে তোমার বাপদাদা গোলমাল করবে। প্রভাতবাবুর বামুনটা দেশে যাবে শুনে আমি গিয়ে ধরে পড়লাম, ওরাও কিছুতে রাজি হয় না। আমার বাপ-দাদা হাঙ্গামা করবে ! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে জন্মানো কী ঝকমারি ভাবুন তো ? শেষকালে প্রভাতবাবুর বন্ধু বামাচরণবাবু বললেন, পাড়ায় এত কাছে রাঁধুনির কাজ নেওয়া তো উচিত নয়, বাপ-ভায়ের একটা সম্মান আছে তো ? দূরে এক বাড়িতে আমায় কাজ জুটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোক আবার একটা কবিতার বই লিখেছেন।

সাধনা গম্ভীর হয়ে বলে, বউদি মরে গিয়ে সত্যি তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। বুড়োর হাত থেকে শুধু নয়, আরেকটা সর্বনাশের হাত থেকে। বামাচরণ তোমায় রাঁধুনির কাজ দিত বিশ্বাস করলে তুমি ?

শোভাও গম্ভীর হয়ে বলে, না দিলে না দিত। যে কাজ দিত তাই করতাম !

তবু বাড়িতে বলতে না বিয়েতে তোমার মত নেই ?

আপনি বুঝছেন না। কোন মুখে বলতাম ? ওরা আমাকে খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্পষ্ট কথা। ঝি রাঁধুনি হিসাবেও পুষতে পারবে না—ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজত, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে ঠিক হবার পর বাড়িতে আমায় কোনো কাজ করতে দিত না। রাঁধতে গেলে বাসন মাজতে গেলে বউদি বলত, থাক থাক, দুদিন বাদে আমাকেই তো সব করতে হবে। মাও সায় দিত বউদির কথায়। এবার উপায় নেই, লোক রাখতেই হবে। বউদি মারা যাবার ঠিক দুদিন পরে দাদা সুর পালটে মাকে বলেছে, বড্ড বুড়ো, শোভাকে ওর হাতে দিতে আমায় মন সরছে না ! ছেলেমেয়ে রাখছি রাঁধছি বাড়ছি—আমাকে ছাড়া তো এখন চলবে না। নিজেরাই এবার বিয়ে ভেঙে দেবে, আমার কিছু বলারও দরকার হবে না।

শোভা একটু হেসে খোঁচা দিয়ে বলে, আপনি বুঝবেন না সাধনাদি। রাখালবাবু বেশ রোজগার করছেন, স্বামীর আদরে একটি বাচ্চা নিয়ে সুখে আছেন—আমাদের ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

কথা হচ্ছিল রান্নাঘরে। রাখাল দাড়ি কামিয়ে তেল মাখতে এসে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছিল।

এবার দরকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে, তুমিও কিন্তু ভদ্রঘরের ভেতরের অবস্থাটা ঠিক জানো না শোভা। তুমি শুধু তোমাদের একটা ঘর দেখেছ। স্বামী বেশ রোজগার করে আনলেও ভদ্রঘরে সুখশান্তি থাকছে না !

আগে হলে সাধনা চটে যেত। রাখালের আসল জ্বালাটা টের পেয়েছে বলে আজ সে একটু বিরক্তও হয় না।

শোভা চটপট জবাব দেয়, কী করে থাকবে ? দশটা ভদ্রলোকের ঘরে সুখশান্তি থাকবে না—একটা ঘরে শুধু খানিকটা রোজগার হচ্ছে বলে কখনও তা থাকে ?

রাখাল একটু ভড়কে যায়।

সরষের তেলের শিশিরটার দিকে চেয়ে দেখতে পায়, শুধু তার গায়ে মাখার মতোই একটু তেল অবশিষ্ট আছে। সে পাঁচ ছটাক করে তেল আনে—একবারে বেশি তেল আনলে সাধনা নাকি বেশি তেল খরচ করে !

তার বেশ রোজগারের এটাই তো বেশ একটা নমুনা !

কিন্তু হার রাখাল মানবে না কিছুতেই। অন্তত তর্কে তাব জেতা চাই, কথায় জেতা চাই।

সে বলে, কিন্তু শোভা, তোমার দাদা তো আবার বিয়ে করবে। বাড়ির চাকরি তখন তো থাকবে না তোমার ?

দাদা আবার বিয়ে করবে ? আগে চাকরে লোক বউ মরতে মরতে আবার বিয়ে করত। সেদিন আছে আজকে ? বউদির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দাদা এ কথাও ভাবছে না যে বাঁচা গেছে, একটা বোঝা কমেছে, রেহাই পেয়েছি ? আবার একটা বউ এনে বোঝা বাড়াবে দাদা ? আপনারা শুধু আগের দিনের হিসেব কষছেন, ব্যাপার কিছু বুঝছেন না।

সাধনা ও রাখাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

আগের দিনের হিসাবের জের টানছে তারা !

শুধুই কি পরের বেলা ? নিজেদের বেলা নয় ?

রাখাল তবু গোঁয়ারের মতো গায়ের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে হালকা তামাশার সুরে বলে, আমায় বিয়ে করবে শোভা ?

শোভা বলে, এক্ষুনি। সাধনাদির সতিন হব, সে তো আমার ভাগ্যি !

প্রভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ শুরু হবে, কবে দুর্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে বলে মনে হয় খুবই যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে শেডটা।

বাসন্তী আসবে বলেও এ বাড়িতে উঠে আসেনি। বলেছে, থাকগে ভাই। এইটুকু ঘরে ওঁর অসুবিধা হবে সত্যি।

আসলে মায়া কাটাবার মানুষ তো নয় বাসন্তী ! উড়ে এসে যারা তার ঘরবাড়ি দখল করেছে, ভাড়াটে হয়ে তারাই তাকে বেঁধেছে নতুন মায়ায়। একপাল ছেলেমেয়ে সমেত চরণদাসের পরিবারটি বাড়িতে ভিড় করায় তার দম আটকে এলেও ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাসন্তীর।

তাড়াতাড়ি উঠে গেলে অন্যকথা ছিল। একবাড়িতে মানুষ বাস করলে তাদের বেশিদিন এড়িয়ে চলা একপাল ছেলেমেয়ে হইচই করে বলে খারাপ লাগা কি আর বাসন্তীর পক্ষে সম্ভব !

নিরীহ গোবেচারি রাধাকে হাসিমুখে চব্বিশ ঘণ্টা সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু গরম গরম মমতা বোধ করে বাসন্তী, নীচের তলায় গিয়ে তার সংসার করা দেখতে দেখতে তাকে মায়া করতে তার ক্রমেই যেন বেশি বেশি ভালো লাগে !

তার মেয়েটাকে প্রায় বেদখল করে ফেলেছে রাধার বড়ো তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের বাচ্চা ভাইটি বড়ো রোগা, খেলাধুলা করে না, হাসে না, আদর সইতে পারে না। বাসন্তীর নাদুস-নুদুস মেয়েটাকে ওরা তাই কাড়াকাড়ি করে কোলে নেয়, আদর করে, খেলা দেয়।

আর রাধার রোগা বাচ্চাটার বড়ো বড়ো চোখের করুণ চাউনি দেখে এমন মায়া হয় বাসন্তীর যে দিনে দশবার তাকে কোলে না নিয়ে সে পারে না !

কাজেই বাড়ি বদলের কথাটা এখনও মুখে বললেও কাজে আর সেটা হয়ে ওঠে না।

রাখাল বলে, ওর বাপের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক লোক ?

সাধনা বলে, মস্ত সংসার।

বিয়ের পর শুধু একলাটি থাকা অভ্যাস। ভাড়াটের ভিড় আসতে প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল, এখন আবার ভালো লাগছে।

তুমি দেখছি মনস্তত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছ !

রাখাল চেষ্টা করে একটু হাসে।

সাধনাও হাসে।

সিদ্ধান্ত তাদের বজায় আছে। রাখাল মন ঠিক করে ফেলেছে যে আব নয় এবার তারা ভিন্ন বাস করবে। সাধনাও সেটা মেনে নিয়েছে শান্তভাবেই।

সে জন্য দুজনেই তারা পরস্পরকে কী দিলাম আর কী পেলাম তার হিসাব, বিরোধ আর তিক্ততার হিসাব এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো স্থগিত রেখেছে।

যে ক-দিন একসাথে আছে ঝগড়া করে লাভ কী ?

সব চাওয়া-পাওয়া কলহ-বিবাদের চরম মীমাংসা তো হয়েই গেছে, আর মিছে কেন কামড়াকামড়ি করা ?

স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকলেও তারা যেন আর স্বামী-স্ত্রী নেই। দুটি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করছে, যথাসময়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবের আকাশের ঝড় থেমে গেছে।

নতুন ভাড়াটে এসেছে আশাদের ঘরে।

চেনা ভাড়াটে। সুমতি আর তার স্বামী অশোক।

সুমতির বিয়ে হল হঠাৎ। বিয়েটা অবশ্য তাদের স্থির হয়েছিল অনেককাল আগে থেকেই।

অশোক মেসে থেকে চাকরি খুঁজছিল বহুদিন, একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সুমতিকে বিয়ে করেছে।

তার আপনজনেরা থাকে পশ্চিমে। বিয়ে উপলক্ষে তারা এসে আবার ফিরে গেছে। সুমতিকে নিয়ে অশোক নীড় বেঁধেছে আশাদের ঘরে।

গড়া নীড় ভেঙে পড়ায় এ ঘর থেকে পালিয়ে গেছে সঞ্জীব আর আশা, নতুন চাকরি নিয়ে সুমতি আর অশোক এসে উঠেছে সেই ঘরে।

সুমতি বলে, আমিও একটা চাকরি পেয়ে গেলাম, নইলে কী আর একজনের সামান্য মাইনের ভরসায় আমরা বিয়ে করতাম ? দুবছর অপেক্ষা করে আছি, আরও দু-একবছর অপেক্ষা করতাম।

বলে, এখনও কীরকম সব পচা ব্যবস্থা চালু আছে দেখুন। চাকরি পেলাম বলেই কি বিয়ে করলাম ? বিয়ে করলাম বলেই আবার চাকরিটা পেলাম ! ম্যারেড মেয়ে চাই—বিয়ে না হলে চাকরিটা পেতাম না ! সামান্য বেতন, একজনেরই ভালো চলবে না, সে জন্য আবার ম্যারেড হওয়া চাই !

নব-দম্পতি। ভালোবাসার বিয়ে—দুবছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর !

সাধনা ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না জানি করবে দুজনে। ভালোবাসার কত বিচিত্র লীলাখেলা দিয়ে রোমাঞ্চকর করে তুলবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলনকে !

রাখালকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে করতে তার কী সহ্য হবে চোখের সামনে ওদের উদ্দাম উচ্ছল ভালোবাসা, সরস মধুর মিলন, পৃথিবীতে স্বপ্নজগৎ রচনা করা ?

দুজনের কাণ্ড দেখে সে থ বনে যায়। সে যেমন ভেবেছিল সে রকম কিছুই দুজনকে করতে না দেখে !

হাতে যেন স্বর্গ তারা পায়নি, সুখে আনন্দে অন্তত কিছুদিনের জন্য দিশেহারা হবার মতো কিছুই যেন ঘটেনি !

মিলনটা যেন তাদের একটা সাধারণ ঘটনা।

দুজনের আনন্দ টের পাওয়া যায় ! সুমতির মুখে কেমন একটু রুক্ষতার ছাপ ছিল, সেটা উপে গিয়ে নতুন লাবণ্যের সঞ্চারটা স্পষ্টই চোখে পড়ে।

দুজনে সুখী হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু দুজনের হাসি গল্প মেলামেশা ঘরকন্না সবই যেন শান্ত আর সংযত। হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্দামতা নেই।

একদিন রাত্রে ওরা দুয়ার বন্ধ করলে সাধনা চেষ্টা করেও নিজেকে ঠেকাতে পারে না, খানিকক্ষণ চুপিচুপি দুয়ারের ফুটোয় চোখ পেতে উঁকি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে মনে হয়, সে যেন নতুন রকম ম্যাজিক দেখে এল।

বিয়ের এতকাল পরে সংঘাতে সংঘাতে সম্পর্ক এক রকম ছিঁড়ে যাবার পর, ভিন্ন হয়ে শান্তিতে থাকা ঠিক করার পর, তার আর রাখালের সম্পর্ক যেমন দাঁড়িয়েছে, বুদ্ধঘরের গোপনতায় ওই নবাববাহিত মানুষ দুটির সম্পর্কও প্রায় সেই রকম—উচ্ছ্বাস নেই, গদগদ ভাব নেই।

তফাত শুধু এই যে তাদেব ঝিমানো নিস্তেজ ভাবের বদলে ওরা অনেক বেশি সতেজ, হাসিখুশি।

রাখালকে কয়েকদিন খুব চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

বাসন্তীর কাছেই কারণটা জানতে পারায় সাধনা তাকে আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

কোথা থেকে সংগ্রহ করে রাখাল নাকি আরও দশ হাজার টাকা ব্যাবসায়ে লাগাবে।

তাদের দুজনের বর্তমান দোকানে নয়, নতুন একটা ব্যাবসায়ে।

দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ব্যাবসা শুরু করবে রাখাল, কোথায় টাকা পাবে, কীসের ব্যাবসা করবে কোনও কথাই সে সাধনাকে জানায়নি !

আগে হলে সাধনা খেপে যেত, এখন নিশ্বাস ফেলে সে শুধু ভাবে, না জানাবারই কথা ! তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী ?

নাঃ, আর দেরি করা নয়। এবার সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দাদার কাছে চলে যাবে।

কিন্তু পরদিন রাখাল নিজে থেকেই তাকে সব জানায়। বলে, ক-দিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। তোমার কী মনে হয় বলো তো ?

সতীশের অসুখটা চাপা পড়েছে কিন্তু দেহের অনেককালের অনেকগুলি চাপা রোগ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। আরও কিছুকাল বাঁচবে, কিন্তু বিছানাতেই কাটবে তার বেশির ভাগ সময়।

বিশুর মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছে। কিছু আয়ের ব্যবস্থা না হলে এভাবে আর কতদিন চলবে ? পুঁজি কমছে—কিছুকাল পরে পুঁজি খাটিয়ে আয়ের ব্যবস্থা করার উপায়টাও হাতের বাইরে চলে যাবে।

একটা ব্যবস্থা রাখালকে করে দিতেই হবে এবার। ছেলের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে রাখাল তার। রাখাল নিজে কী অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় সামলে উঠেছে বিশুর মা তা জানে, রাখাল তার জন্য একটা উপায় করে দিক।

গয়না বেচে হাজার দশেক টাকা দেবেন। আমি ভাবছি দায়িত্বটা নেওয়া যাক। নতুন ব্যাবসায়ে খাটানো যাক টাকাটা। আমিও ওর কাছে ঋণী—

ঋণী—?

তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। রাজীবের সঙ্গে দোকান করার টাকাটা বিশুর মার কাছেই পেয়েছিলাম।

ও !

সে উপকার ভোলা যায় না। প্রাণ দিয়ে খেটে নতুন ব্যাবসাটা দাঁড় করাতে পারি—আমার খাটুনির দামে ওই ঋণটাও শোধ হবে, পরে লাভের অংশও পাব।

কী ব্যাবসা করবে ?

ভাবছি, যে সব ব্যাবসার কিছুই জানি না তার কোনও একটার মধ্যে না গিয়ে এতদিন যে কারবারের খুঁটিনাটি জানলাম বুঝলাম সেটাই করব। দোকান আছে থাক, ওই সঙ্গে বিড়ি বানাবার ছোটো একটা ফ্যাক্টরি করব। শুধু ব্যাবসা নয়, এর আর একটা দিকও আছে। কতগুলি লোককে খেটে খাবার সুযোগ দিতে পারব।

না চললে, টাকাটা নষ্ট হলে, তোমার দায়িত্ব কী ?

এমনি কোনো দায়িত্বই থাকবে না। ইচ্ছা করলে টাকাটা আমি মেরেও দিতে পারব। আমাকে এতটা বিশ্বাস করছেন, এ সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার !

আশ্চর্য ব্যাপার আবার কী ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না সংসারে, চেনাজানা মানুষকে ? এতদিন দেখছেন তোমায়, বুঝতে পেরেছেন বিশ্বাস করতে হলে তোমাকেই করা যায়। ওর বোন তো তোমাকে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করে।

শান্তভাবে সহজভাবে তারা কথা বলে।

কে বলতে পারে, ছোটোখাটো বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকেই হয়তো বিশুর মা আর আমাদের কপাল ফিরে যাবে। হাজার বিড়িতে কিছু বেশি মজুরিও হয়তো দিতে পারব।

এ কথাটাও এমনভাবে বলে রাখাল যে বেশ বোঝা যায় আশা ও আবেগ উদ্দীপনা জাগিয়ে সাধনার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সত্যিই ত্যাগ করেছে, সাধনাকে বিশ্বাস করানোয় প্রয়োজন যেন তার সত্যই ফুরিয়ে গেছে।

ইচ্ছা করলে সাধনা সোজাসুজি প্রতিবাদও করতে পারে। বলতে পারে, ছাই পারবে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। ওভাবে কোনো কথা না বললেও সাধনা তাকে সাবধান করে দেয়, বলে, রাজীববাবুর পরামর্শ নিয়ো। উনি এ লাইনে অনেককাল আছেন !

নিজে উদ্যোগী হয়ে তাড়াতাড়ি দাদার কাছে যাবার ব্যবস্থা করার কথাটা এরপর সাধনা ভুলে যায় !

প্রভাতের কারখানার শেডটা উঠছিল ধীরে ধীরে, হঠাৎ একদিন খুব তাড়াতাড়ি কাজ এগোচ্ছে দেখা যায়।

চশমা-পরা প্রৌঢ় বয়সি মোটাসোটা অচেনা এক ভদ্রলোককে মোটরে চেপে প্রতিদিন কাজ পরিদর্শন করতে আসতে দেখা যায়।

বিড়ির কারখানা আরম্ভ করা নিয়ে রাখাল খুব ব্যস্ত ছিল, তবু পরদিন সে ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তার মোটর এলে কথা বলতে যায়।

ফিরে আসে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে।

বলে, প্রভাত সত্যিই আমাদের ভাঁওতা দিয়েছে।

কী ব্যাপার ?

কারখানা করবার কোনো মতলব প্রভাতের ছিল না। সব এই ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছে। ওদের উঠিয়ে না দিলে জমি বিক্রি হয় না, তাই ও সব ভাঁওতা দিয়েছিল। ফ্যাক্টরি করবে, সকলকে কাজ দেবে, থাকবার ঘর করে দেবে—সব বাজে কথা। বামাচরণ মাঝখানে ছিল, দুজনের কাছে কমিশন বাগিয়েছে।

রাগটা প্রভাতের উপর, কিন্তু সে তো আর সামনে নেই, সাধনার দিকে এমনভাবে চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে যে মনে হয় এখুনি সাধনাকেই মেরে বসবে !

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমার কথাই ফলল। আমায় বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিল !

সাধনা শান্তভাবে বলে, তোমার একার দোষ নয়, আরও অনেকে তো ছিল। এঁকে সব কথা বললে না ?

বললাম বইকী ! ইনি বললেন, প্রভাত কী বলেছে না বলেছে তার দায়িত্ব ইনি নেবেন কেন ? কারখানায় আনাড়ি লোক দিয়ে কী করবেন ? তবে ছুটকো কাজের জন্য দরকার হলে দু-একজনকে নিতে পারেন—সে তখন দেখা যাবে !

সাধনা ফোঁস করে ওঠে !

ইস্, বললেই হল দেখা যাবে ! প্রভাতবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছে, জমি যে কিনবে ওই চুক্তিটাও তাকে মানতেই হবে। অত আইন বাঁচিয়ে বজ্জাতি করা চলবে না। এতগুলি লোকের কাছে কথা দিয়েছে সেটা ঢের বড়ো আইন।

সাধনা সত্যি রেগেছে। এতকাল রাগ দেখাত শুধু তারই উপর, তাই বুঝি রাখালের চোখে পড়ত না তার রাগের ভঙ্গিটা কত সুন্দর। এক অন্যায় কারসাজির বিরুদ্ধে তাকে রাগতে দেখে রাখাল আজ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

সে হেরে গিয়েছে। প্রভাত বজ্জাতি করবে কী করবে না এই নিয়ে কী তীব্র মন কষাকষি হয়ে গেছে তাদের—। প্রকাশ্য সভায় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কলোনির লোকেদের পক্ষ নেওয়ায় সাধনাকে সে প্রায় শত্রু মনে করে বসেছিল।

সাধনার কথাই ফলেছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাধনার কাছে হেরে গিয়ে এতটুকু জ্বালা তো রাখাল বোধ করছে না ! বরং কীভাবে যেন জুড়িয়ে গেছে সাধনার উপর রাগ আর অভিমানের জের।

অন্যায়টা বড়ো হয়ে ওঠায় তাদের দুজনেরই এবার অন্যায়টার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে জেনে তারা যেন সরে এসেছে কাছাকাছি, তুচ্ছ হয়ে গেছে তাদের সংঘাত।

সাধনা বলে, কালকেই একটা মিটিং ডাকতে হবে। এ ভদ্রলোককে জানিয়ে দিতে হবে জমি আর কারখানা কেনার সঙ্গে উনি প্রভাতবাবুর চুক্তিটাও কিনেছেন।

রাখাল বলে, নিশ্চয়। কলোনির ওদের সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার।

ঠিক বলেছ। ওরা প্রত্যাশা করে আছে, ব্যাপারটা ওদের জানাতে হবে। চলো না তুমি আমি এখুনি যাই ? আলু কুমড়োর তরকারি আর ডাল হয়েছে, এসে তোমায় বেগুন ভেজে দেব।

তাই চলো।

সাধনা শুধু একনজর তাকায় পরনের কাপড়টার দিকে, বদলায় না। শুধু চুলটা একবার আঁচড়ে নিয়ে স্যান্ডেলে পা গলায়।

বলে, পয়সা নিয়ো, মাখন আনতে হবে। এমনি মাখন খাবে, পাতে খাবার সময় একটু একটু গলিয়ে ঘি করে দেবখন।—এ আবার কী ? একেবারে চমকে গেছি।

অনেকদিন এভাবে রাখাল আচমকা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেনি, সাধনার তাই সত্যই চমক লেগে খানিকক্ষণ বুকটা ধড়াস ধড়াস করে !

পথে নেমে চলতে চলতে রাখাল বলে, সেদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়েছিলাম। আমার হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল।

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক ধরতে পারিনি, কিন্তু একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল কথাগুলি। ঠিক কথাই যেন বলছ কিন্তু কোনো একটা হিসাবে যেন গোলমাল হচ্ছে।

আসল হিসাবেই গোল হয়েছিল। আমি যে বলেছিলাম স্বামীর স্বার্থ সম্পর্কে তুমি উদাসীন হয়ে গেছ, সাধারণ স্ত্রীর জীবনে তোমার বিতৃষ্ণা এসেছে—ওটা ভুল বলেছিলাম।

জীবনে আমার বিতৃষ্ণা আসেনি মোটেই ! তবে তোমার সম্পর্কে মনটা বিগড়ে গেছে কিনা ঠিক জানি না। মিথ্যে বলব কেন, আগের মতো ভাবতে পারি না তোমাকে। তুমি আদর করবে আর আমি আহ্লাদি খুকির মতো গলে যাব ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে।

আমারও করবে। আসলে আমিই মনে মনে চাইতাম আমরা আবার আগের মতোই হই, আগের জীবনটা ফিরে আসুক ! তুমি বিগড়ে গিয়েছ, তোমার জন্য সেটা হচ্ছে না ভেবে তোমায় দোষী করেছিলাম। দোষ হয়তো তোমার আছে খানিকটা, কিছু বাড়াবাড়ি সত্যি করেছ—কিন্তু সেটা তোমার একার দোষ নয়। আমিও বুঝতে না পেরে বাড়াবাড়ি করেছি। তোমার পক্ষে যেমন হওয়া বা দেওযা আর সম্ভব নয়, তাই দাবি করেছি ! আসল কথা কী দাঁড়িয়েছে সেটাই হিসেব করিনি। আমাদের আগের জীবন আর ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে—স্বামীভক্তি-টক্তি অনেক কিছু।

রাখাল একটা বিড়ি ধরায়।—অন্যরকম ভাবলেও আমি আসলে কিন্তু ভুল করে তোমার কাছে একটু স্বামীভক্তিই চাইছিলাম।

রাখাল হাসে।—তুমি ওটা দিতে পারলে আমার চৈতন্য হত নিশ্চয়, দেখতাম আমার কাছেও মিথ্যা হয়ে গেছে জিনিসটা, বিশ্রী লাগছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনোরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালোবাসার মূল কথা যে, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এ সব ফাঁকি আর চলবে না।

বাসের জন্য বড়ো রাস্তার মোড়ে সুমতি আর অশোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। দুজনে একসঙ্গেই চাকরি করতে বেরিয়েছে।

সাধনা বলে, ওদের কিছু বোলো না এখন। আপিসে লেট হয়ে যাবে। ফিরে এসে তো শুনবেই সব।

মোড়টা পেরিয়ে জোর দিয়ে রাখাল বলে, আমি রোজগার করি তুমি ঘরে বসে খাও এ জন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তব স্বপ্ন দেখা—নিজেদের ফাঁকি দেওয়া। তবু মোটামুটি ওটাই হবে আমাদের নতুন সম্পর্কের ভিত্তি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এটা আমাদের ভালো লাগবে। মাসখানেক আমরা তো দিব্যি আছি।

সত্যি।

কত বিষয়ে আমাদের ভুল বোঝা রয়ে গেছে, ভিন্ন হব ভেবে মনমরা হয়ে আছি, কীরকম বিশ্রী বাধোবাধো ভাব রয়ে গেছে—তবু একটা মাস বেশ কাটল আমাদের। জঞ্জাল সাফ করে নিলে আমরা আরও ঢের বেশি সুখে দিন কাটাব—ঝগড়া করতেও আবার মজা লাগবে মাঝে মাঝে ঝাল খাওয়ার মতো।

সাধনা হাসে। বলে, খোকাকে বাসন্তীর কাছে রেখে এসেছি। কথা আমাদের সারাজীবনে ফুরোবে না, পা চালিয়ে এগিয়ে চলো।

স্বাধীনতার স্বাদ

স্বাধীনতাব স্বাদ প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র

লেখকের কথা

এই উপন্যাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিনবছর আগে—শেষ হয় '৫৭-এর গোড়ার দিকে।

এক

দারুণ গুমোট-করা বর্ষার দুপুর। আকাশটা যেন গাঢ় ভাপ্‌সা চাপ হয়ে নগরের বুকে চেপে নেমে এসেছে, মরা বাতাস নড়ে না। শ্মশানপুরীর মতো চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম, জনহীন রাজপথ। কদাচিৎ দু-একটি গাড়ি সচল শঙ্কার মতো হুস পার করে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ক্রমাগত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে দু-একজন পথিক। চারিদিকে ভয়, জমজমাট কৃত্রিম আতঙ্কে। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসে। সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও টের পাওয়া যায় তীক্ষ্ণ কুৎসিত হিংসার ধার। দোকানগুলি বন্ধ, রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলির একটি ঘরের জানালাও খোলা নেই। কোনো জানালার পাট একটু ফাঁক করে, কোনো জানালার খড়খড়ি একটু তুলে ক্ষণিকের জন্য ভয়ার্ত ক্লিষ্ট মুখ উঁকি দেয়।

এর মধ্যে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখা যায়। গলির মোড়ের কাছে বড়ো রাস্তার মাঝখানে থেমে ট্যাক্সিটা একজন প্রৌঢ় বয়সি ভদ্রলোক ও একটি যুবককে নামিয়ে দেয়।

রাস্তার এদিকের এলাকায় গলির মধ্যে কারফিউ। ট্যাক্সিতে ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন শিখ—এদের সাথে না নিয়ে দেড় টাকার পথে পনেরো টাকায় আসতেও ট্যাক্সিটা রাজি হয়নি। দোষ দেবে কে ? মৃত্যুর আতঙ্কে থমথম করছে চারিদিক, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করা যায়, জীবনের মূল্য নিয়ে কে দরদস্তুর করবে ? গুমোটে ঘেমে ঘেমে প্রমথর শরীর ভিজে গিয়েছিল, এতক্ষণে কেঁপে শিউরে উঠল জলে-ভেজা কুকুরের গা-ঝাড়া দেবার মতো !

সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে প্রমথ ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বারংবার সে তাকাচ্ছে প্রণবের দিকে। প্রণবের দীর্ঘ বেঢপ দেহ, মোটা কাপড়ের বিনা নীলে সাবান-কাচা পাঞ্জাবি, চশমা আর সিগারেট তার আশা, ভরসা ও সাহস।

ডাস্টবিনের ময়লা ছাপিয়ে উঠে রাস্তায় ছড়িয়েছে, পচে গেঁজে উঠেছে পরশুর মুষলধার বৃষ্টিতে। ভাড়া পেয়েই ট্যাক্সিটা দিশেহারার মতো সেই ছড়ানো ময়লা তছনছ করে এ এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল। চার পা শূন্যে তুলে পড়ে আছে মরা কুকুরটা, বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। মানুষের পচা কুৎসিত মৃত্যুর সত্য ও বাস্তব প্রতীকের মতো। সন্তর্পণে কয়েকটি খড়খড়ি উঠল কয়েক বাড়ির কৌতূহলী জানালায়, বন্ধ পানের দোকানের পাটাতন ফাঁক করে উঁকি মারল দুটি পশ্চিমদেশীয় মুখ। গলির মুখে দোতলা বাড়ির রকের ছায়ায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত পাগলির উলঙ্গ দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে ঝিমোচ্ছিল, ধীরে ধীরে উঠে এসে গরম পিচের তপ্ত তাপে ক্ষণেক মোহাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁকা আঙুলগুলি আধ সোজা করে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ঝেঁঝে বলল, পয়সা দে !

মৃতপুরীর প্রেতিনীর মতো তার সর্বাঙ্গ আলস্যে শিথিল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ—জীবন্ত প্রখর সূর্যালোকে মানুষ যখন ইটের কোটরে কোটরে আত্মগোপন করে থরথর কাঁপছে, একা সে রানির মতো ভয়ার্ত মুহ্যমান জগৎকে জয় করে পথে দাঁড়িয়ে তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে পথিক-প্রজার কাছে খাজনার মতো দাবি করছে ভিক্ষা !

এই অকথ্য অস্বাভাবিকতাই যেন গায়ের জোরে হয়েছে স্বাভাবিক !

ভাগেন মশাইরা, ভাগেন ! কোথাকার বোকা হাঁদা ? পালান, পালান !

যে চেঁচায় তাকে দেখা যায় না, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গাঢ় স্তব্ধতায় এমন-ভাবে হারিয়ে মিশিয়ে যায় গলার আওয়াজ বনে-জঙ্গলে গভীর রাত্রে নিশাচর পাখির আচমকা

চিৎকারের মতো যে পরক্ষণে খটকা লাগে সত্যই কেউ চেঁচিয়েছে কিনা ! তারপর একদিক থেকে মিলিটারি ট্রাকের ঘর্ঘর ধ্বনি দ্রুতগতিতে চড়তে চড়তে ভেসে এসে সব শব্দের রেশ আর নিঃশব্দতা ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। হাত ধরে প্রমথকে প্রণব গলির মোড় থেকে অপর দিকের ফুটপাথে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারফিউ এলাকার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো নিরাপদ কিনা জানা নেই। অনেক কিছুই জানা নেই। কীসে কী হয় বোঝা অসাধ্য। কার আইন, কেই বা জানে, মানেই বা কে।

গা ছমছম করছে, প্রণব।

এত দূর এসে দু পা যেতে ? এই গলি তো ?

দ্বিধার সঙ্গে প্রমথ সায় দেয়। এই সংশয়ের জন্যই এতক্ষণ ইতস্তত করা, হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকে পড়তে মন সরছে না। এমনভাবে বদলে গিয়েছে পথটার চেহারা, এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে চিনিয়ে দেবার চিহ্নগুলি যা স্মৃতিকে সাহায্য করতে পাবত। দর্জির একটা দোকান ছিল মনে আছে, ওই আধপোড়া কালচে-মারা ঘরটা কি সেই দর্জির দোকান ? সারি সারি রঙিন কাপড় ব্লাউজ ফ্রক শুকোত একটা দোতলা বারান্দায়, তারই উপরে তেতলার বারান্দায় ফেলা থাকত চিক—ওই যে খাঁ-খাঁ করছে শূন্য বাড়িটা, মানুষ নেই, জামাকাপড় নেই, চিক নেই, জানালা দরজা এলোমেলোভাবে হাঁ করে অথবা বন্ধ হয়ে আছে, ওটা কি সেই বাড়ি ? গলিটা জনহীন। গলিতে স্রোতের মতো একটানা আনাগোনা ছিল মানুষের।

প্রণব বাস্তববাদী মানুষ, বাস্তব অবস্থার অভাবনীয় উদ্ভট পরিবর্তন ঘটলে বিচলিত হয়, দিশেহারা হয় না।

এ ঠিকানায় ওরা না-ও থাকতে পারে !

প্রমথ একটু ইতস্তত করে বলে, না, এখানেই আছে। চিঠি পেয়েছি।

মণি চিঠি লিখেছে ? আশ্চর্য তো। কদিন আগে ?

চার-পাঁচদিন হবে।

চার-পাঁচদিন ! প্রণব মনে মনে ঝাঁঝালো কৌতুক অনুভব কবে। দশ-বিশবছরের লোকজনে ভরপুর বাড়ি একবেলায় বিনা নোটিশে খালি হয়ে যাচ্ছে, প্রমথ হিসাব ধরেছে চার-পাঁচদিন আগে পাওয়া চিঠির ! মুখে সে কিছু বলে না। প্রাণের মায়া প্রমথর কম নয়, বিপদের পরিমাণটাও তার অজানা নেই। তাকে আরও বেশি ভড়কে দিয়ে কোনো লাভ হবে না।

হ্যাঁ, তার নিজেরই লাভের হিসাব। টাকাপয়সা নামযশের লাভ নয়। কালোবাজার লাভালাভের ব্যাকরণগত মানে পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছে। প্রণবের হিসাবে লাভ নেই মানে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেটা পালন করা, সম্পন্ন করার জন্য প্রমথকে ভড়কে দিয়ে লাভ নেই !

এটা সত্যই আশ্চর্য যে নিজেও সব দেখেশুনে ভালো করে অবস্থা বুঝেও আর না এগোবার কথা প্রমথ একবারও বলেনি। এখানে এসেও ফিরে যাবার কথা সে ভাবছে না, তাহলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিত না। প্রাণের মায়া যত থাক, যতই ভীরু তার প্রকৃতি হোক, ভয়ে বিবর্ণ আধমরা হয়েও সে বাকি পথটুকু এগিয়ে যাবে !

হয়তো একেই মনের জোর বলে ! প্রণব জানে না। তার এত ভয়ও নেই, এত বেশি মনের জোরের দরকারও তার হয় না। সবটাই তার কাছে অভিনব।

গলির ভেতরে একটু এগোলেই মণিমালাদের বাড়ি, বেশি দূর নয়। হয়তো কোনো বিপদ ঘটবে না। কারফিউ ভাঙার জন্য তো নয়ই।

দাঁড়িয়ে লাভ নেই, যেতে যদি হয় চলুন।

গলির মধ্যে উষ্ণ ভাপসা ছায়া। ভয় তারা করছিল গলির ভিতরটাকে, দু-পা এগোতে না এগোতে আক্রমণ কিন্তু এল বড়ো রাস্তার দিক থেকেই। গলির মোড়ে অতক্ষণ ইতস্তত করাটা তাদের বোকামি হয়েছে, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা হনহন করে গলিতে ঢুকে পড়লে ওরা মনস্থির করতে করতে তারা গলির মধ্যে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত।

ছোরা আর লোহার ডান্ডা হাতে দুজন মানুষ দ্রুতপদে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে, নিঃশব্দে, উল্লাস বা ধিক্কারের আওয়াজ না তুলে, হত্যা করতে। কলের মতো যেন নকল করছে বুনো শিকারি পশুর। এরা দুজন আর ওরা দুজন পরস্পরকে জীবনে কখনও দ্যাখেনি, শুধু জামাকাপড়ের পার্থক্য থেকে পরস্পরকে শত্রু বলে চিনেছে। অতর্কিতে আঘাত হানতে এরা নিঃশব্দে আক্রমণ করেছে কিন্তু এদিক-ওদিকে ততক্ষণ সোরগোল উঠেছে ছড়ানো বহু কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকারে, তারই প্রতিধ্বনি উঠেছে তেমনি চিৎকার ও শাঁখের শব্দে। শহরের সাম্প্রতিক জীবনে এ নিত্যকারের ঘটনা, সকাল-সন্ধ্যা দিবা-রাত্রির কাহিনি—দুজন আর দুজনের সংঘাত বিরাট সমগ্র ঘটনার সামান্য একটা তুচ্ছ অংশমাত্র। প্রমথ প্রায় প্রতিরোধের সময়ও পায় না, সে হকচকিয়ে গিয়েছিল, তার খালি হাত দিয়ে আঘাত ঠেকাবার অন্ধ দিশেহারা চেষ্টার পাশ কাটিয়ে একটা ছোরা কাঁধের নীচে ঢুকে যায়। প্রণবের কোমরে গোঁজা ছিল কৃপাণ, সতর্ক উৎকর্ণ থাকা আর দিশেহারা না হওয়াটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অভ্যাসে।

তবে সে-ও নিজেকে বাঁচাতে পারত কি না সন্দেহ। এদের দেখেই চেনা যায় এরা শহরের এ ব্যবসায়ে পুরানো ঘাগি লোক, ছোরা ডান্ডা চালাবার কায়দা জানে, বিদ্বেষে উন্মাদনায় হঠাৎ যাদের মাথায় খুন চেপেছে, এরা তারা নয়। সাধারণ আনাড়ি লোক এভাবে দুজনে মিলে আক্রমণ করে না। দল বেঁধে দলীয় উন্মত্ততায়, দিশেহারা উত্তেজনায় এলোমেলো বিশৃঙ্খল হানা দেয়। দুপক্ষেই এই নিয়ম।

এক বাড়ির ছাদ থেকে ইট পড়ছিল, এ পাশের বাড়ির রোয়াকের নীচে একটা ফটকা বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল, লক্ষ্যটা খুব বেঠিক হয়েছে, হয়তো তাদের বাঁচিয়ে ছুঁড়তে হওয়ার জন্য। তারপর একটা বন্দুকের আওয়াজ হল।

চোখের পলকে আক্রমণকারী দুজন মিলিয়ে গেল গলির মোড়ের দিকে।

প্রণবের মাথার বাঁ দিক খানিকটা কেটেছে, ডান্ডা পিছলে যাওয়ায় মাথা ফাটেনি। কাঁধে ঘা লেগে বাঁ হাতটা একটু অবশ বোধ হচ্ছে। প্রমথর ক্ষতের মুখে হাতের তালু দিয়ে চেপে তাকে জাপটে ধরে সে এগোয়। প্রমথ টলতে টলতে চলে। কয়েকখানা বাড়ি পেরিয়ে দোতলা বাড়িখানার দিকে সে কষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে ক্ষণকাল চিনবার চেষ্টা করে।

এই বাড়ি।

প্রমথ মুখে রক্ত তুলে বলে।

মধ্য ভারতের এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র শহর থেকে মণিমালার চিঠি পেয়ে এত দূরে এসে বাড়ির দুয়ারে এভাবে প্রমথ মারা যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। সাত বছরে কত বদলে গিয়েছে জগৎ, মণিমালার জন্য সে টান কি আর ছিল প্রমথর, মণিমালারই কি আছে ? তবু মামার জন্য তার অসহ্য আশ্চর্য শোক দেখে কে বলবে সাত বছর স্নেহ মমতার আদান-প্রদান চিঠিপত্রেও এক রকম বন্ধ ছিল। সাত বছর আগে কী উপলক্ষে এসে কয়েকটা দিন সে এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল সেটাও মণিমালার ভালো মনে নেই, হয়তো কোনো উপলক্ষই ছিল না। আসলে মণিমালাকে দেখতেই সে এসেছিল, সেই আসল কারণটাই তার মনে আছে। তবে বিশেষভাবে দুঃখ পাবার বিচলিত হবার কারণ

মণিমালার আছে। কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টেকা যায় না বলে কিছুদিন গিয়ে মামার কাছে থেকে আসবার ইচ্ছা জানিয়ে সে এতকাল পরে চিঠি লিখেছিল প্রমথকে। চিঠি পেয়ে প্রমথ নিজেই এভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে অত দূর দেশ থেকে, এটা অবশ্য সে আশা করেনি। পুরানো দিনেব মতো প্রমথর ভালোবাসার এই অভাবনীয় প্রমাণ পাওয়ার জন্য হয়তো তার দুঃখটা এত বেশি জোরালো হয়েছে।

ও মামা, তুমি এমন দাগা দিলে তোমার মণির মনে ?

মরা মানুষটাকেও প্রাণে ব্যথা দেবার অনুযোগ দিয়ে কাঁদা পুরানো মণিকে যেন আবার নতুন করে চিনিয়ে দেয় প্রণবের কাছে। বহুদিনের অসাক্ষাতে পরিচয়টা তার মনে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। মৃদু কোমলভাবেই মণি কাঁদে, চেঁচামেচি তার কোনোদিনই আসে না। তার একগুঁয়ে মৃদুতার জোরটা প্রণবের মনে পড়ে যায়। শহরের জীবনের একটানা আতঙ্কের চাপে মনটা চড়া সুরে বাঁধা বলেই বোধ হয় মৃদুস্বরে হলেও কথা বলে সে কাঁদছে, নইলে হয়তো নিয়মমতো গুম খেয়ে শুয়ে পড়ে নিজের মনে নিঃশব্দেই কাঁদত।

সুশীল বলে, তোমাকে আজ থাকতে হয় প্রণব। কারফিউর মধ্যে যাওয়াও উচিত নয়, তা ছাড়া নানারকম হাঙ্গামা আছে—

ঠাকুরপো না থাকলে হবে কেন ?—কান্নার মধ্যেই মণি বলে।

থাকতে তাকে হবে প্রণব জানত, এদের মুখ থেকে স্পষ্ট আবেদন শুনে নিশ্চিন্ত হল। তাকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল সুশীল, মণিরও তাতে সায় ছিল,—অন্য একটা বাড়ি থেকে। এদের মতিগতিতে তার ছেলেবেলা থেকে বিশ্বাস কম, কখন কীসের জেব টানবে এরাই সেটা ভালো জানে। নিজে থেকে থাকার কথাটা যে তুলতে হল না তাই ভালো। সে-ই এক রকম হাঙ্গামা সাথে করে বয়ে এনে ঘরে তুলেছে, তার দায়িত্বের ঘোষণাটা এদের মুখেই মানানসই হয়েছে !

থাকব বইকী। ব্যবস্থা যা করার করতে হবে।

কাল সকালে ছত্রিশ ঘণ্টার কারফিউ শেষ হবে, তার আগে কোনো বিষয়ে কিছু কবার উপায় নেই। তার আশ্বাসে সুশীল-মণিরা স্বস্তি পেয়েছে আন্দাজ কবা গেল সহজেই।

মনটা ঢিল দেয় প্রণব। তা ছাড়া উপায় কী। সপরিবারে মণিকে সে দেখল অনেকদিন পরে। শহরের অন্য প্রান্তের বাড়িটা থেকে তাকেই উপলক্ষ করে মণিরা ভিন্ন হয়ে চলে আসার পর বছর চারেক আগে একবার দেখা হয়েছিল সুরেন কাকার বাড়িতে। সুরেন কাকার বাড়িতে ছিল তার মেয়ের বিয়ের সমারোহ, দেখা হলেও কথাবার্তা কিছুই হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে আর সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে সুরেন কাকার বাড়ির দরজায় মণিকে সেই যে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল, সেই ছবিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে তার মনে আছে। মনে হয়েছিল, একটি কিশোরী মেয়ে যেন বড়ো বড়ো ছেলেমেয়ে ও প্রৌঢ় স্বামীর মস্ত সংসারের গিন্নি সেজে আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে। সেটাই যেন সব, স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলি যেন নিছক তার ওই গিন্নি সাজারই একটা অঙ্গ। মণির আর ছেলেমেয়ে হয়নি, এটা খুবই আশ্চর্য, তবে হয়তো অসম্ভব নয়। একসাথে থাকার সময় সে বাড়িতে কীভাবে সে যেন মানিয়ে যেত সংসারের বউ-গিন্নি হিসাবে, তার কচি কিশোরীর মতো চেহারা চোখেও পড়ত না, শুধু মনে হত সে বড়ো রোগা। বাইরে কোথাও গেলে কিন্তু তাকে দেখে আর ভাবা যেত না সে এতগুলি সন্তানের মা, চারটি দেওর, দুটি ননদ, কয়েকটি ভাগনে-ভাগনি, বিধবা পিসশাশুড়ি আর একটি পেনশনভোগী রায়বাহাদুর শ্বশুরের বিরাট সংসার সে চালায়। সে বাড়িতে তাকে যেমন পাকা গিন্নিই মনে হত, আজও তাই মনে হল। ক-বছরে ছেলেমেয়েরা

বেড়েছে, লম্বা-চওড়া হয়েছে। বড়ো ছেলে সুধীন পড়ছে কলেজে, বড়ো মেয়ে আশা ষোলোয় পা দিল। আশা পেয়েছে এ বংশের ধাঁচ, বর্ষার কলাগাছের মতো তার বাড়, তার চেয়ে আজ অনেক ছোটোখাটো মণিমালা, গড়ন তার মেয়ের তুলনায় অনেক বেশি কিশোরী মেয়ের মতো। তবে মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, সে লাবণ্য আর নেই, ফরসা হাতে নীল শিরা দেখা যায়।

তোমার শরীর কেমন আছে মণি-বউদি ?

আমার আবার শরীর, তার আবার কেমন থাকা !

রাত প্রায় সাড়ে-নটার সময় এই প্রশ্নোত্তরে সবাই যেন খানিকটা মাটির মানুষের আলাপ-আলোচনার ধাতে ফিরে এল। মামার জন্য কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিও এসেছিল মণিমালার।

তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ ঠাকুরপো। সে চেহারার চিহ্ন নেই তোমার।

সুশীল বলে, সেদিন কাগজে তোমার নাম দেখছিলাম। এক কোণে ছোটো করে লিখেছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। ইংরেজ সরকার, লিগ কংগ্রেস সবাইকে গাল দিয়ে নাকি বক্তৃতা করেছ। চিরকাল তো গাল দিয়ে এলে, কিছু হল কি ?

যাক গে না।—মণি অস্ফুট স্বরে বলল কী বলল না।

অ্যাঁ ? না, তা বলিনি।—সুশীল মাথা নেড়ে নেড়ে কার কথায় সায় দিল সেই জানে, চশমা খুলে কোঁচড়ের খুট সাফ করে বলল, সভায় বক্তৃতা দাও, যা কর, সেটা আমি অত বুঝি না। মানে, ইতিমধ্যে স্থিতি-টিতি করে নিয়ে বসা তো উচিত ছিল তোমার ! একটা ভালো পোস্ট—চাকরি না কর, সাপ্লাই-টাপ্লাইয়ের একটা ভালোমতো কন্ট্রাক্ট—

যাক গে না।—মণি আবার অস্ফুট বিরক্তির সুরে বলে।

অ্যাঁ ? তা যাক গে, তুমি যা ভালো বুঝেছ—

তোমাদের ওদিকে তো ভয় নেই, না ঠাকুরপো ?

না, ভয় নেই।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা আলাপ চলে, যার মোট কথাটা এই যে সব দিক দিয়েই জীবনটা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, মাঝে মাঝে দূরাগত আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হওয়া, তারপর আবার কথা বলা। শুয়ে পড়ে লাভ নেই, ঘুম আসবে না। সুধীন মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে নজর বুলিয়ে আসে চারিদিকে, ছোটো ছেলেটা খেলার ছলে ছটফট করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। আশার চুল উশকো-খুশকো, মাথা ধরার যন্ত্রণায় সে থেকে থেকে মাথায় ঝাঁকি দেয়, তার কথার মৃদুস্বরে তীব্র বিরক্তির একটা ক্ষীণ কিন্তু কাঁসার মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ বাজে। আজ বড়ো গরম, আকাশে মেঘ জমেছে। দু-একফোঁটা বৃষ্টি বুঝি এক সময় পড়েছিল, তারপর আর বৃষ্টিপাতের লক্ষণ নেই।

মামার জন্য মণির মনঃকষ্ট, তা সে যেমন কষ্টই হোক, শেষ হয়ে গেছে বলা যায় না। তবে কষ্টটার অভিনবত্ব ইতিমধ্যে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। দোতলার ঘরে বসে কথা বললেও নীচের তলায় চাদর-ঢাকা প্রমথকে কেউ ভুলে যায়নি, ইতিমধ্যে সহ্য হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকটা বছর কোন স্তরে ঠেলে দিয়েছে এ বাড়ির শান্ত-কোমল অল্পে-কাতর মানুষগুলির চেতনাকে ! আগে অবাঞ্ছিত আশ্রিত কেউ এ বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে মরলেও তার ধাক্কা অন্তত কয়েকটা দিন সকলকে নিষ্ক্রিয় মুহ্যমান করে দিত। আজই শেষ দুপুরে পথ থেকে শোচনীয় ভয়ংকর মৃত্যুর রূপ নিয়ে শ্রদ্ধেয় পরমাত্মীয় আচমকা এ বাড়িতে ঢুকেছে, তার দেহটা পর্যন্ত এখনও শ্মশানে চালান যায়নি, এদের পক্ষে আজ তবু সম্ভব হয়েছে সাধারণভাবে সুখদুঃখের ঘরোয়া আলাপ।

আগের দিনের সে ঘরোয়া সুখদুঃখ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো জলের মতো জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন। সন্দেহ নেই যে তাই থেকেই এ সহনশীলতা, ব্যাকুলতার এই আত্মনাশের আপস ! সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কি না জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কি না জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়িতে সকলে একত্রে উদ্‌বেগ-আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।

তবু তারা আলাপ করে, অবস্থা তাদেরও নিজের তালে গড়ে-পিটে সাথে সাথে টেনে নিয়ে চলেছে বলে।

প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়ে প্রণব স্টেশনে গিয়েছিল। তখন সে জানত না তার সঙ্গে তাকেও এ বাড়িতে আসতে হবে। হয়তো বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেত, হয়তো ভেতরে ঢুকে বসে যেত কিছুক্ষণ। অত চুলচেরা জটিল হিসাব সে করেনি, সেটা তার আসে না। কবে সুশীলেরা পণ করেছিল তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে না, হয় সে যাবে নয় তারা যাবে বাড়ি ছেড়ে,—সেই পণ বজায় রাখার অজুহাতে দশজনের হইচই-হট্টগোল-ভরা সংসারের অসুবিধা এড়িয়ে নিভৃতে নিজেদের মনে স্বাধীনভাবে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে এ বাড়িতে উঠে এসেছিল, মনে তার আছে সব কথাই। কিন্তু সেই অকারণ মিথ্যা কলহ আর অশান্তির কোনো গুরুত্ব সে দেয় না, দেবার দরকাব হয় না। তার ক্ষোভও নেই, অভিমানও নেই।

ইংরেজ রাজের পুলিশ একদিন তার ঘরটা সার্চ করেছিল। তাতে সরকাবি কলেজের অধ্যাপক পরিবারের কাছে এমন বিপজ্জনক বিপ্লবী যদি হয়ে উঠেই থাকে যে তার সঙ্গে একত্র বসবাস আব উচিত মনে করা যায়নি, সেটা খাপছাড়া কিছু হয়নি। ভাই বলেই বরং বিপদের ভয় ছিল বেশি। স্বদেশি ছেলে স্বদেশি ভাইয়েব শুধু বাপ-ভাই হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব হওয়ার জন্যও এ দেশে অনেকের ভাগ্যে কম লাঞ্ছনা জোটেনি। তবে তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য এবা অমন উঠে-পড়ে লেগেছিল কেন প্রণব ভালো বুঝতে পারেনি ! শুধু তার সঙ্গ বর্জন করাটাই মণির বাড়ি ছাড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। অন্য সবার সাথে থাকার দায়িত্ব ঝক্কি আর বিড়ম্বনা এড়িয়ে নিজেদের রোজগার শুধু নিজেদের জন্য খরচ করে নিজেদের মনের মতো স্বাধীন সুখী নীড় গড়ার প্রবল সাধটাও ছিল। তাকে তাড়ালে তো এ সাধ মিটত না, বরং দায়িত্ব আরও বেড়ে যেত।

পরে মনে হয়েছে, ভিন্ন হবার সংকোচ কাটাতে এরা অত বেশি বাড়াবাড়ি করেছিল তাকে নিয়ে, সকলকে ফেলে সরে যাওয়া যে স্বার্থপরতা নিজেদেরই, এ বোধ থাকায় অজুহাতটা ফেনিয়ে বড়ো করেছিল।

মণিরও কিছুই ভুলে যাবার কথা নয়। গোড়া থেকে মনে বোধ হয় তার অনেক স্মৃতিই বিঁধছিল। সুশীল বেশি রাত্রে শুতে যাবার পর সে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রণবকে বলে, এ বাড়িতে তুমি এই প্রথম এলে। তোমাকে দোষ দিই না ঠাকুরপো। সত্যিই দিই না। কেন আসবে তুমি ? তোমাদের ভাইদের মধ্যে কী হয়েছে না হয়েছে আমি অত তার ধার ধারি না, কদ্দিন ভেবেছি তোমায় একটা চিঠি লিখি, আমাদের তো আর ঝগড়া হয়নি। কিন্তু লিখতে পারিনি। তোমার কাছে তো আমি তোমার দাদার বউ। কে জানে তুমি কী ভাববে !

দাদার বউ নও নাকি ?

মণি এই প্রথম একটু হাসে। তার হাসিও প্রায় তেমনই আছে, পাতলা দুটি ঠোঁটের হাসি নয়, সমস্ত মুখ দিয়ে যেমন হাসত। কেবল আগের মতো তেমন তাজা নয় তার হাসিটা। ভিন্ন হয়ে স্বাধীন-ভাবে নিজের ঘরকন্না গড়ে তুলতে মুখের হাসি তবে ম্লান হয়ে গেছে মণির ? আকাশ-কুসুমের সাধ বুঝি তার মেটেনি !

যার-ই বউ হই, তোমায় আমায় কীরকম ভাব ছিল বলো তো ?

সে কথা মিথ্যা নয়, তাই পরবর্তী পরিণতিটা আজও প্রণবের ধাঁধার মতো লাগে ! মণির উৎসুক ব্যাকুল প্রশ্নে সমস্ত অতীতটা নতুন করে আনন্দময় ছেলেমানুষির এক নিষ্ফল অধ্যায়ের মতো মনে ভেসে আসে। ছোট্ট অপটু শরীর আর মিষ্টি কচি মনটুকু দিয়ে জীবনের আশেপাশের পরিসরটুকু মণি জয় করতে চেয়েছিল। দু-চারজনকে ছাড়া মাঝারি আকারের পরিবারটিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করতে পারেনি বলেই কী মণির হাঁপ ধরেছিল। আরও ক্ষুদ্র পরিসর চেয়েছিল অবাধ মোহ বিস্তারের, সবাই যেখানে তারই মায়ায় পোষ মানবে, বশ হবে ? টান কম ছিল না প্রণবের, মণি বাপের বাড়ি গেলে ব্যাকুল হয়ে সে তাকে দেখতে যেত, তাগিদ দিয়ে ফিরিয়ে আনত। হাসি কথা সমবেদনায় তাদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়, সাধারণ পারিবারিক সম্বন্ধ কি তাদের প্রাণের সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি ? কিন্তু হলে কী হবে। মন-প্রাণ তো প্রণব সঁপে দিতে পারেনি মণিকে, বাইরে তার ছড়ানো জীবন গুটিয়ে এনে তার নিজস্ব চিন্তা-জগৎ আলতো করে রেখে মণির মনের মতো হতে পারেনি। মণির মনের সাথে সে চলবে ফিরবে ভাববে বাঁচবে, মণি তার বিয়ে দিয়ে বউ আনাবে, সুখ আনন্দে তার জীবনটা সার্থক করবে মণি। তাই যদি না হয় তবে কীসের ভাব, কীসের মায়া ?

মোটেই যে আপন হল না—সে নয় চুলোয় গেল, কিন্তু ব্যাকুল আগ্রহে যে তার স্নেহ মেনে নিল তার জীবনটাও যদি আত্মসাৎ না করা যায় মিছে বেঁচে আর তবে সুখ কী ? তাই হয়তো এত জ্বালা হয়েছিল মণির !

তাই বোধ হয় সে পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রণবকে বোঝাবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে কীভাবে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল সবার জন্য কিন্তু কেউ তার মর্যাদা দেয়নি, মান রাখেনি, এতটুকু প্রতিদান তাকে দেয়নি।

চুপি চুপি কত কেঁদেছি, কেউ তোমরা টের পেয়েছ কোনোদিন ? কেউ কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছে আমার দিকে ? পরের ঘর থেকে এলাম, মানিয়ে নিতে আমার কত কষ্ট। কীরকম চালচলন সংসারের, কার মনটা কীরকম, কত ঘা খেয়ে তবে তা আমায় জানতে হয়েছে। বুক দুর-দুর করেছে দিনরাত, কাউকে বলিনি। সবাই দেখেছে হাসিখুশি, সবাই জেনেছে যার যা চাই আমার কাছে চাইলেই পাবে, একদিনের তরে কোনো বিষয়ে কেউ আমার নালিশ শুনেছে ? আমি যে একটা মানুষ—

মণির কান্নাও মৃদু, হাসির মতো সমস্ত মুখখানা দিয়েই সে কাঁদে। কথায় বাধা পড়ে না, আঁচলে নাক মুছে বড়ো জোর দুবার ঢোক গিলতে হয়, চোখে যেটুকু জল আসে তা চোখেই শুকিয়ে যায়। যা সে বলে তার সাধারণ মানে খুব সহজ : মানুষের সেই চিরন্তন নালিশ, কেউ তার ত্যাগের দাম দিল না। কিন্তু এইটুকুই তো সব কথা নয় আসলে, আসল কথাও নয় ! যার চাপে প্রাণে ক্ষোভ আর বেদনা, সেটা জানা না থাকায় সবার মতো মণিরও প্রকাশ করার ব্যাকুলতাই সার হয়, বেরিয়ে আসে সাদা-মাটা সস্তা নালিশ। কী সে দিল মানুষকে আর কীসের দাম কেউ তাকে দিল না মণির তা জানা নেই। জিনিসের দাম টাকায় হয়, তার ত্যাগের দামটা কীসে হত, এ সব তো আর মণি ভাবেনি।

আমার মনটা যদি তোমরা বুঝতে ঠাকুরপো, বুঝতে কেন ভিন্ন হয়েছি। আমার নিন্দেটাই শুধু রটত না চাদ্দিকে, আমারই সব দোষ হত না।

তোমার দোষ ? তোমায় কে দোষ দিয়েছে ?—প্রণব শান্ত সুরে বলে, তোমার নিন্দেও রটেনি চাদ্দিকে ! এতে নিন্দের কথা কী আছে, সব সংসারেই এ রকম ভিন্ন হয়, তোমরা প্রথম নও।

আসল কথা আড়ালেই থেকে যায়। ভিন্ন হওয়াটা সংসারে চালু হয়ে গেছে সত্য, তাতে নিন্দা-প্রশংসার প্রশ্ন নেই, মণিরাও সোজাসুজি তফাত হয়ে এলে এতদিন পরেও এই অপরাধ-বোধ টিকে থাকত না। ভিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটা হয়েছিল কুৎসিত, সেটাই আজও এদের পীড়ন করছে, মণির অস্বস্তিও সেই জন্যই। এ সব পুরানো কথা ঘাঁটাঘাঁটি করার ইচ্ছা প্রণবের ছিল না। বাজে তুচ্ছ হয়ে গেছে এ সব তার কাছে। সে চেষ্টা করে তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয় আলোচনা আরম্ভ করে। শুরু হতে না হতে আলোচনা এসে ঠেকে বর্তমান অবস্থায় ! একমাত্র অতীতের আলোচনায় কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়, অন্য সমস্ত কথায় দাঙ্গা এসে ঢুকবেই, এমন তার ব্যাপ্তি। ঘুম পেতেই প্রণব মণিকে ক্ষুন্ন করেই কথার ছেদ ফেলে শুতে যায়। দিনের পর দিন মারামারি চলবে বলে দিনের পর দিন রাত জেগে জটলাও চালাতে হবে, তার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু আত্মহত্যায় রত শহর কেন মানুষকে ঘুমোতে দেবে ? ঘুম ঘনিয়ে আসতে আসতে সে কোলাহল শোনে—আগুন লেগেছে, আগুন !

কোথায় লেগেছে, আগুন ? ছাদে উঠে দেখা যায়, বড়ো রাস্তার ওপারে অল্প দূরে বস্তিতে আগুন ধরেছে। পাকা বাড়ির আড়ালে বস্তির ঘর দেখা যায় না, বাড়ির মাথা ছাড়িযে উঠেছে শিখা, হলকা আর স্ফুলিঙ্গ। আকাশে আভা পড়েছে।

কেন এরা এমন করছে ঠাকুরপো ?

প্রণব শুনতে পায় না। সে তখন পাশের বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো মোটা ভদ্রলোকটির কথা শুনছে। গলার আওয়াজে ভদ্রলোককে বেশ খুশি আর পরিতৃপ্ত মনে হল। সুশীলকে ডেকে সে বলছিল, দুপুরে গলির ভেতর এসে তিনজনকে সাবাড় করে দিয়েছিল না, এই তার জবাব দেওয়া হল। হাঃ, বেটারা মনে করেছিল, চুপচাপ মার হজম করে যাব, এবার বুঝুক। এমনিভাবে ঠান্ডা করতে হয়, ব্যাটারা কারফিউ পর্যন্ত মানবে না মশায় !

মিশ্র কোলাহল শোনা যাচ্ছিল, হিংস্র গর্জনকে ছাপিয়ে উঠেছে বহু কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। শহরের এ এলাকা প্রণবের ভালো চেনা নেই, তবু সে অনুমান করে, ওটা মজুরবস্তি নয়। মজুররা এ দাঙ্গায় নামেনি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে তারা পাহারা দেয়। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগে এটা কর্তাদের অন্য প্রতিশোধ হলে আলাদা কথা।

সুধী, নীচের দরজাটা দিবি আয় তো।

কোথায় যাচ্ছ ?

ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রণব একটু ব্যাপারটা দেখে আসতে চায় শুনে সুশীল আর মণি সত্রাসে কলরব করে ওঠে। সুধীন আর আশা প্রায় একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে, সত্যি যাবে কাকা ?

তুমি কি পাগল হলে ঠাকুরপো ? কী বলছ তুমি ? ওখানে এখন মানুষ যায় ? এ কোন দেশি বাহাদুরি ?

মণির কাছে যেন এক মুহূর্তে মুছে গেছে মাঝখানের এতগুলি বছরের ব্যবধান এমনি তার ব্যাকুল তীব্র তিরস্কার।—

প্রণব শান্তকণ্ঠে বলে, বাহাদুরি নয়, ও সব বীরত্বের ধার ধারি না। মিছামিছি কেউ যেচে প্রাণ দিতে যায় ?

তুমি জ্যান্ত ফিরবে ভেবেছ ?

তাই তো আশা করি। নেহাত যদি তা না হয়, উপায় কী ? কথাটা কী জান, লোকজন হয়তো এলোমেলো ছুটোছুটি করছে দিশেহারা হয়ে। আমি বলে নয়, যে-কেউ একজন গিয়ে যদি হাঁক দেয়

খানিকটা শৃঙ্খলা আসবে, আগুন নেবানো, মানুষ বাঁচানোর চেষ্টা হবে। অনেকে যারা ভয়ে আসছে না তারাও এসে জুটবে। অনেক কিছু হতে পারে, গিয়ে না দেখলে বুঝব কী করে ?

ছাদের আবছা আলোয় মণির চোখ দেখা যায় না। প্রণবের পিছু পিছু সমস্ত পরিবারটি নিঃশব্দে নীচে নেমে আসে। প্রণব বাইরের দরজা খুলছে, সুধীন হঠাৎ বলে, কাকা, আমি যাব।

আবদার করে নয়, জোরের সঙ্গে বলে। সুশীল ধমকে ওঠে, বাজে বকিসনে।

কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের ঢেউ-লাগা কড়া বাস্তবে পাক দেওয়া এ যুগের তরুণ মন ধমকে অত সহজে কাবু হয় না।

কিছু হবে না, আমি যাই কাকার সঙ্গে।

মণি মৃদুস্বরে বলে, যেতে চাও, যাও।

শুনে প্রণবও আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এখানে প্যাসেজের আলোতে মণির মুখচোখ দেখা যাচ্ছে। সুশীল প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে, যাও মানে ? যাবে কী রকম ? মাথা খারাপ না কি তোমার ?

ইচ্ছে হয়েছে, যাক। ঠাকুরপোর কিছু না হলে সুধী-রও কিছু হবে না।

এবার আর প্রণব দ্বিধা করে না। সে নিজেই ধমক দেয় সুধীনকে। বলে, পাগলামি করো না সুধী। তুমি ঝোঁকের মাথায় বাহাদুরি করতে যাবে, আমি তোমাকে সামলে বেড়াব ? এ সবের মধ্যে যেতে হলে আগে থাকতে তৈরি হতে হয় !

প্রণব শুধু সুধীনকে নিরস্ত করতে ধমক দিয়েছে, কিন্তু তার কথায় সত্যই ধার ছিল—অপমান ছিল। সুধীনের মুখ কালো হয়ে যায়। নীচের ঠোঁট কামড়ে মণি মাথা হেঁট করে।

পরদিন প্রমথের দেহ সংক্রান্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে এসে প্রণব বিদায় নেবে, মণিমালা মরিয়া হয়ে বলে, তোমাকে বলার মুখ রাখিনি আমরা, তবু তোমাকেই বলি ঠাকুরপো।

বলো।

ভিন্ন হওয়ার স্মৃতি মণি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ নিজে সে সত্যই কারও সঙ্গে একদিনের জন্য ঝগড়া করেনি, অশান্তির সামান্যতম বিষয়ে কোনো পক্ষে টেনে কখনও একটি কথাও বলেনি। শেষদিন পর্যন্ত এ ভাবটাই সে দেখিয়ে এসেছে যে ও সব গোলমালের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে ভাব রাখতে চায় সবার সঙ্গে ! বাড়ি ছাড়বার সময় মুখভার করে নয়, সবার কাছে কেঁদেই সে বিদায় নিয়েছিল। তার যেন একান্ত অবাঞ্ছিত এই ঘটনা, নিরুপায় সে অনিচ্ছায় দুঃখ বরণ করল। বোধ হয় সেই জন্যই আজ এই প্রতিক্রিয়া, নিজে ঝগড়া করে এলে হয়তো এ দুর্বলতা তার আসত না।

তুমি তো অনেক খবর রাখো, ভালো পাড়ায় একটা বাড়ি দেখে দেবে ? এখানে যেভাবে দিন কাটাচ্ছি ঠাকুরপো, আমি পাগল হয়ে যাব।

প্রণব একটু চিন্তা করে।

বাইরে কোথাও যেতে পার না ?

কোথায় কার কাছে যাব ? মামার কাছে যেতে পারতাম, মামার প্রাণটা গেল আমার জন্যে। ভাইদের কাছে গেলে তারা খরচপত্র নেবে না, বিরক্ত হবে। কদ্দিন থাকতে হয় তাই বা ঠিক কী ? ওভাবে গিয়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না, তার চেয়ে মরাও ভালো। কী যে বিপদে পড়েছি ঠাকুরপো !

সুশীল বাড়ি ছিল না। কাল কারফিউর জন্য কামাই হয়েছে, আজ শ্মশান থেকে সে সোজা আপিস চলে গেছে। প্রণব চিন্তিতভাবে বলে, বাড়ি পাওয়া মুশকিল। রোয়াকটুকু বারান্দাটুকু নিয়ে

গ্যারেজে গুদামঘরে লোকে গাদাগাদি করে আছে। এমনি যাদের ঘরে কুলোয় না, তাদের বাড়ি দশজন আত্মীয়স্বজন আশ্রয় নিতে এসেছে।

তবে ? তবে কী হবে ?

প্রণব খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে পাব। এমনি অসুবিধে হবে, কিন্তু কে কী মনে করছে ভেবে অস্বস্তি ভোগ করতে হবে না।

মণি একবার চোখ তুলে চেয়ে পায়ের গোড়ালি খুঁটতে থাকে। গোড়ালিটা তার অযত্নে ফেটে চৌচির হয়ে আছে, ফাটার দাগে কালো কালো ময়লা জমেছে। তার মসৃণ সুশ্রী টুকটুকে পায়ের অবস্থা নজর করে প্রণবের দুঃখ হয়। ওর মনটাও যে চৌচির হয়ে ফেটেছে, এ তার আরেকটা লক্ষণ।

তাতে কিছু দোষ নেই। ভিন্ন হলেই কি শত্রু হতে হবে ?

কাল মাঝরাত্রে মণি যেমন আচমকা প্রণবের সঙ্গে ছেলেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যাবার অনুমতি দিয়েছিল, এখন তেমনিভাবে হঠাৎ মনস্থিব করে ফেলে সে বলে, তাই যাব। তুমি ব্যবস্থা করো।

সুশীলের মতামতের প্রশ্ন কেউ তোলে না। মণি একবার বলেও না যে উনি ফিরে আসুন, ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি। সোজাসুজি সে প্রণবকে ব্যবস্থা করাব কথা বলে দেয়।

বিকালের দিকে সুশীল ফিরে এলে দেখা যায় তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে এতবড়ো সিদ্ধান্ত করে ফেলার জন্য কিছু মনে করা দূরে থাক, মণির প্রতি সে রীতিমতো কৃতজ্ঞতা বোধ করছে।

প্রণব খুঁজে পেতে একটা লরি জোগাড় করে আনে। সেই দিনই শেষ বেলায তারা এবাড়ি ছেড়ে যায়। মধ্য ভারতেব শহরে মামার কাছে যাবার কথা ভেবে ঘটনাচক্রে মণি ফিবে যায় সেই বাড়িতে সাত-আটবছর যে বাড়িতে ফেরার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তখনও গতরাত্রেব আগুন লাগানো বস্তি থেকে ধোঁযা উঠছে। সমস্ত এলাকায নতুন কারফিউ শুবু হতে আর মোটে আধঘণ্টা খানেক দেরি ছিল।

দুই

মণির মনে পড়ে প্রণব একদিন বলেছিল : জানো, জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না।

দর্শনের সূত্রের মতো এমন ছাঁকা কথাটা সে কী প্রসঙ্গে বলেছিল মণির মনে আছে। প্রণবের সঙ্গেই সেকেন্ড ইয়ারে বিজ্ঞান পড়ত একটি ছেলে, নাম তার আশীষ,—সে সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। চশমা-পরা সুশ্রী লাজুক ছেলেটিকে মণি কতদিন চা খাইয়েছে আলাপ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনোদিন তার লজ্জা ভাঙতে পারেনি। ঘটনাচক্রেও সে একটিবার মণির চোখে চোখে তাকিয়েছে কি না সন্দেহ। প্রণবের তীব্র ব্যঙ্গ মণি ভোলেনি।—একটু ভদ্রতা রেখেছে, সায়ানাইড খেয়েছে, গলায় দড়ি দেয়নি। ছেলেবা যখন ফাঁসিতে ঝুলছে তখন গলায় দড়ি দিলে—?

প্রণব তখন ভাবপ্রবণ ছিল, গলায় গলায় ভাব ছিল মণির সঙ্গে। তার মনও গভীরভাবে নাড়া খেয়েছিল, একসুরে বাঁধা দুটি মন হলে একের ঝংকারে অপরটি যেমন সাড়া দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মরণে সুখ ! কোন জীবন ? কী বিশ্বাস ? এ প্রশ্নের জবাব মণি কখনও জানেনি। জীবিতের সুখদুঃখকে মরণের সঙ্গে জড়ানো তার অদ্ভুত মনে হয়েছে। বিশ্বাসের জন্য মরেও সুখ আছে, এটা চলতি কথা, সবাই জানে। কিন্তু সে হল বিশ্বাসের জন্যই জীবন আর বিশ্বাসের জন্যই মরণের কথা, তেমন আর কটা লোকের হয় ? সংসারে সাধারণ মানুষের যে জীবন, সুখদুঃখের যে ঘটা, তাতে

বাঁচার মধ্যেই সব, ওটাই সীমা। এ জীবনের কীসে কোন বিশ্বাসটা থাকলে মরাও সুখকর হয়, সায়ানাইড খাবার মারাত্মক অবস্থাটা ছাড়া ? তখন তো মরণেই বিশ্বাস, জীবনে নয় ! নিজের মনের এই মেয়েলি তর্কাতর্কিতে অবশ্য মণির খটকা আছে অনেক, কারণ জীবনে সে একটা জিনিসে বরাবর হোঁচট খায়—নতুনত্বে। কোনো নতুনত্বের জন্যই নিজেকে সে কল্পনার সাহায্যে ভেবেচিন্তে এটুকু প্রস্তুত করে রাখতে পারে না যাতে শুধু অবাক হয়ে অভিভূত হয়ে পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করতে পারে, নিজেও মানিয়ে যায় অভিনব যা এল তাকেও মানিয়ে নিতে পারে। সে সোজাসুজি হোঁচট খায় । প্রতিবার টের পায়, তার ভাবার চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম অভিনব হয়েছে বলে তার মুশকিল নয়, ব্যাপারটাই একেবারে অন্যরকম। মোটে সে ধরতে পারেনি, তার ধারণায় আসেনি। যেটুকু তার পরিধি ছিল জীবনের কোনো একটা কিছু নতুনত্ব আসবার আগে, যত অভিজ্ঞতা ছিল, যা এল তা যেন সে জগতের নয়। অন্য এক জগৎ থেকে অজানা বিস্ময়, অভাবনীয় অভিজ্ঞতা এসেছে। অথচ কী আর এমন সৃষ্টিছাড়া পরিবর্তন তার জীবনে ঘটেছে আজ পর্যন্ত, এক জগতের আরেক জগতের যোগ ঘটার মতো ? সাধারণ বাপের বাড়িতে সাধারণভাবে মানুষ হয়ে সাধারণ শ্বশুরবাড়ি আসা, কিছুদিন বউ সেজে সকলের সঙ্গে ঘরকন্না করে স্বামীর সঙ্গে অন্য বাড়িতে ভিন্ন হওয়া, ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার করা। এই সাধারণ জীবনের প্রতিটি সাধারণ বড়ো ঘটনা তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে-চুরে অপ্রস্তুতে ফেলেছে। পনেরো বছরে বিয়ে হয় অনেক মেয়ের, যেমন তারা আশা ও কল্পনা করে শ্বশুরবাড়ি তেমন তাদের হয় না, কিন্তু তার মতো কার মনে হয়েছে যে কুমারী-জীবনের মানুষদেব সংসার থেকে একেবারে অন্যরকম জীবদের মধ্যে এসে পড়েছে ? স্বাধীন সুখী জীবনের কল্পনায় মশগুল আত্মহারা হয়ে ভিন্ন বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছে সেটা আরও ছোটো খাঁচা, আরও বৈচিত্র্যহীন পরাধীন জীবন ? ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে খেয়াল করে, নিজের বয়স বেড়েছে জেনে, এত ছোটো পরিবারের এত সংকীর্ণ জীবনটুকু কানায় কানায় ভরে তুলতে না পারার কষ্টভোগে, বারবার তাকে অপ্রস্তুতে ফেলেছে জীবন।

এতদিন পরে এ বাড়িতে ফিরে এসে তারই আরেক পালা শুরু হল !

এ বাড়িব মানুষের ভিড়টা নয়, তাদেব একাকার জীবনযাত্রার বহর মণিকে আবার ওলট-পালট খাওয়ায়। তার মনের হাল পানি পায় না। এ সবই তাকে প্রণব খুলে বলেছিল। ছোটো দোতলা বাড়িতে এমনিতেও লোক বরাবর বেশি, দাঙ্গার জন্য আরও অনেক আত্মীয়বন্ধু এসে ভিড় বাড়িয়েছে। ধরাবাঁধা পাবিবারিক নিয়মের বাঁধুনি এ বাড়িতে চিরদিনই শিথিল, এখন আরও বিপর্যয় এসেছে তাতে।

কোণের সেই ছোটো ঘরটা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারব। খুব কষ্ট হবে মণি বউদি।

ছাঁত করে হিংসা ঝলক মারে প্রথমে ! ছোটো ঘরটা ছেড়ে দিতে পারব ! দয়া, অনুগ্রহ ! স্বেচ্ছায় তারা দখলিস্বত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে যেন এ বাড়িতে মণির স্বামীর অংশও বাতিল হয়ে গেছে ! কিন্তু না, মণি নিজেই বোঝে, কথাটা তা নয়। প্রণব তা বলেনি। তাদের খাতির করেই ছোটো হলেও আস্ত একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ বাড়িতে এখন একটি সম্পূর্ণ ঘর কারও দখলেই নেই। মণিদের ছোটো ঘরটা ছেড়ে দিলে অন্য ·· লের থাকা খাওয়া বসার ঘোরালো স্থান-সমস্যা আরও ঘোরালো হবে। তা হোক। ও সব অসুবিধা এখানকার সকলের গা-সওয়া আছে, মণিদের মোটে অভ্যাস নেই ওভাবে থাকা।

হিংসা ছাঁত করে বুক ছুঁয়েছিল, সব শুনে প্রতিক্রিয়া হল বিপরীত।

তুমি আমায় কী ভাবো ? সবার কষ্ট হবে, আমি আরামে থাকতে চাইব ? আমায় তুমি চিরদিন ভুল বুঝলে ঠাকুরপো !

আরামে থাকবে না মণি বউদি। কষ্টই পাবে।

চাই না আরাম। মিলেমিশে কষ্ট অসুবিধা সওয়ার চেয়ে সুখ আছে ?

কী ভেবে সে এ কথা বলেছিল, আর কী দেখল এখানে এসে। কষ্ট ? অসুবিধা ? মনে তো হয় না এতটুকু বাড়িতে জনকুড়ি স্ত্রী-পুরুষ আর গন্ডা আড়াই কাচ্চা-বাচ্চারা ছ্যাঁচরা-পোড়া ডালভাত খেয়ে ঘরে-বাইরে রোয়াকে বারান্দায় শুয়ে-বসে জীবন কাটাতে কোনো কষ্ট, কোনো অসুবিধা বোধ করছে। এ যেন খেয়াল-খুশির হাটে এসে পড়েছে মণি, স্বামীপুত্র নিয়ে সেই শুধু এসেছে বাধ্য হয়ে, অন্য সকলের সাধ করে বেড়াতে আসা ! কী খাবে, কোথায় শোবে, কী করে একটু আড়াল পাবে কারও তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা এবং সেটা অকাতরে মেনে নেওয়া যে তাই সই, তাই সই ! সুখে-স্বচ্ছন্দেই বেশ আরামে আছি বলে ভাঁড়ামি করা নয় নিজের সঙ্গে। আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়ে মুখ আলো করে কেউ বসে নেই, দুর্ভোগ হচ্ছে প্রত্যেকের। বর্ষায়, গরমে, ভালো খাওয়ার অভাবে, সবার চেহারাতেই ক্লিষ্টতার ছাপ, টিকে থাকার এত বাস্তব ক্লেশ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ, তারা রোগা হয়ে গেছে, তারা কাঁদে। শুধু এ সব নিয়ে কারও অনর্থক নালিশ নেই, কেউ হা-হুতাশ করে না !

না, শুধু তাই নয়। শুধু মন-মেজাজ বিগড়ে গিয়ে হতাশা ঠেকানো নয়। বাড়িতে সেবার একসঙ্গে তিনজনের গুরুতর অসুখের সময় এবং এবার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সে যেমন মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য শরীর-মন শিথিল করে দিত যে যা হবার হোক তার কিছু এসে যায় না,—এ বাড়িতে সবাই যেন পরামর্শ করে একসঙ্গে তেমনি আলগা করে দিয়েছে ভাবনা-চিন্তা-কষ্টবোধ।

বোধ হয় তাও শুধু নয়। কেমন একটা সামঞ্জস্যও করে নিয়েছে দাঙ্গা-পীড়িত শহরের বেঁচে থাকার সব রকম দুর্দশার সঙ্গে, যেটা নিষ্ক্রিয় গা-এলিয়ে দেওয়া সামঞ্জস্য নয়। তাই এত গল্পগুজব তর্ক-বিতর্ক হাসি-তামাশা, তাই এত গাঁ-ঘেঁষা অন্তরঙ্গতা যাতে হোটেলখানার মতো মায়ালো রসালো ভাবালুতা একেবারে বাদ,—এত এলোমেলো হইচই পর্যন্ত।

সদর দরজায় মোটাসোটা সন্তানবতী একটি বউ মণিকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায়। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সে সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেনি, কয়লার টুকরির দর করছিল। রোগা ঢ্যাঙা, একফালি ময়লা ন্যাতা পরনে এগারো-বারো বছরের একটা মেয়ে, তার মাথায় চারটি ছোটো ছোটো কয়লার টুকরি। চোরা কয়লার ছুটকো ফিরিউলি। দশ আনায় একটা টুকরি, সেব আড়াই কয়লা। দশ টাকা মন দাঁড়ায় !

দরদস্তুর স্থগিত রেখে মোটাসোটা বউটি বলেছিল, এসো ভাই। বলে বস্তির অকালে-পাকা ন্যাংটো-প্রায় মেয়েটাকে বলেছিল, দিয়ে যা। কী আর বলব তোকে। তোকে গাল দিয়ে আর কী হবে ! তোর কয়লাওয়ালা বাবুটার যেন পোলাও খেয়ে কলেরা হয়, কয়লা বমি করে কয়লা হেগে নরকে যায় !

দোতলার দক্ষিণ কোণে ছোটো যে ঘরটি মণিকে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে এই সরস্বতীও থাকত। আরও তিনটি বউয়ের সঙ্গে থাকত, যাদের মোট সাতটি কচিকাচা। সরস্বতী শুধু চেহারায় এবং এ রকম চোরা কয়লার দরদস্তুরেই গিন্নি-বান্নি, বয়স তার মোটে তেইশের কোটায়। চিদানন্দ নামে প্রণবের চেয়ে বয়সে ছোটো যে বন্ধুটিকে একদিন মণি জানত, তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। কোলে দেড় বছরের একটি মেয়ে, মাস চার-পাঁচ পরে আরেকটি ছেলে বা মেয়ে হবে। সরস্বতীকে এ জন্য একটু বেশি মোটা দেখায়।

অন্য তিনটি বউ মণির একেবারে অজানা। প্রণব তাদের কী বলল সেই জানে, হুকুম না অনুরোধ, চারজনে হাত লাগিয়ে দেখতে দেখতে জিনিসপত্র সরিয়ে ছোটো ঘরটা খালি করে দিল।

লজ্জা-সংকোচে মণি হয়তো মরে যেত। কিন্তু এ বাড়িতে ও রকম বাজে মরা সম্ভব ছিল না। অনেক কাল একা থেকে প্রবল হৃদয়াবেগ সামলে চলার অভ্যাস মণি হারিয়েছিল। রোগা ঢ্যাঙা ফরসা বউটি কুলুঙ্গি থেকে তার বেতের ঝাঁপিটি নামিয়ে নিচ্ছে, আচমকা তার হাত চেপে ধরে মণি নাটকে খাপছাড়াভাবে যে কথাগুলি গলগল করে বলে গেল, সে সব সামান্য কারণে শরমে মরে যাবার অবস্থারই সস্তা কথা।

বউটির নাম নীলিমা, ত্রিশ-ঘেঁষা বয়েস, মুখে একটা আশ্চর্য শ্রান্তির ভাব, স্থিরতার মতো ম্লানিমা। তার স্বামী গিরীন এক ইংরাজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। তার মুখেও অবিকল এই রকম ক্লান্ত-স্থৈর্যের ছাপটাই মণির প্রথম চোখে পড়েছে এবং দুজনের এই মিল তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। নীলিমা নীরবে মন দিয়ে তার কথা শুনে বলে, কেন ভাবছ ভাই ? আমরা কি নালায় ভেসে যাচ্ছি তোমার খাতিরে ? আমাদের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ব্যবস্থাই বটে। খোলা ছাদে খানকয়েক মরচে-ধরা টিন পড়েছিল, আর ছিল চুন-সিমেন্ট মাখানো কতগুলি বাঁশ। যুদ্ধের ঠিক আগে দোতলা সম্পূর্ণ করার জন্য কেনা, পুরানো সস্তা মাল। দুজন মিস্ত্রি পাড়াতেই ছিল, কাল্লু ও রহমত। তাদের মধ্যে কাল্লুকে ডাকামাত্র পাওয়া গেল, রহমতের জ্বর। একজন ছোকরাকে সাথে নিয়ে কাল্লু খোলা ছাদে অস্থায়ী একটা চালা খাড়া করার কাজে লেগে গেল।

ওদের কেউ কিছু বলে না ঠাকুরপো ?

এখনও বলেনি।

এ পাড়ায় কাল্লু-রহমতদের বসবাস আশ্চর্য মনে হলেও রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়।

খাটুনে গরিব কিন্তু একচেটিয়া পেশা, ওদের বাদ দিয়ে দালান ওঠে না। এই ইটের অরণ্যে যুদ্ধোত্তর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও চুন-সুরকি-সিমেন্ট-ইটের শিল্পসৃষ্টি যথেষ্ট চলছে এবং সেটা অত্যন্ত লাভজনক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনট্রাক্টর মাধববাবু এ পাড়ারই বাসিন্দা, প্রণবদের এই ছাদ থেকে তার তেতলা বাড়ির জমকালো উপরের অংশটা দেখা যায়, যদিও নীচের দুটো মোটরের গ্যারেজ আড়াল থাকে। মালমশলা দুষ্প্রাপ্য অথচ মাধবকে কনট্রাক্ট দিলে সে তিন মাসে তেতলা দালান তুলে দেবে ! কিন্তু সে জন্য কাল্লু-রহমতদের দরকার। পথটা ভেতরের দিকে গিয়ে যেখানে একটা মাঝারি ও একটা সরু গলিতে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানকার বস্তিটার একাংশে এরা কয়েক ঘর বাস করে।

গোড়ার দিকের উন্মত্ততায় আক্রমণের একটা চেষ্টা হয়েছিল। প্রণব এবং পাড়ার দশ-বারোটি ছেলে ছুটে গিয়ে বুক পেতে রুখে দাঁড়িয়ে সেটা ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, দামি গাড়ির নিঃশব্দ উদারতায় মাধব এসে হাজির।

হুঙ্কার দিয়ে সে বলেছিল, তোমরা কী চাও ? আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ ! আমি সহ্য করব না। হিন্দু কখনও নিরীহ শান্ত মানুষকে মেরেছে, বিধর্মী বলে ? এরা আমার লোক।

এ পাড়ার রতন সান্যাল সবচেয়ে উগ্র, ব্যক্তিগতভাবেও দাঙ্গায় সে সত্যই নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রতিহিংসায় তার পাগল হওয়া আশ্চর্য নয়। রতন ক্ষোভে চিৎকার করে বলেছিল, ওদের পাড়ায় ওরা মারছে না নিরীহ শান্ত মানুষকে ?

মারছে ? ওদের সেই পাড়ায় যাও ! সেখানে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলো ওদের। আছে সে বুকের পাটা ?

এটা প্রকাশ্য নাটক, বাজে অভিনয়। তা দিয়ে ঠেকানো যায়নি। তাহলে খাঁটি আন্তরিক চেষ্টা দিয়ে প্রণবেরাই ঠেকাতে পারত। আসল কথা, মাধব এভাবে রুখে দাঁড়ালে এ পাড়ায় কারও সাধ্য নেই প্রাণের সাধ মিটিয়ে হিংসার ঝাল ঝাড়ে। কারণ এই মাধবই গায়ের ঝাল ঝাড়ার অন্য আয়োজনের নেতা। তার অন্য ক্ষমতাও অনেক !

বাড়ির আনাড়ি সহকারীদের সাহায্যে আটটার মধ্যে কান্নু ছাদে চালা খাড়া করেছিল। কয়েকজন পুরুষ এ চালায় এল। ছোটো ঘরের বাসিন্দা বউ কজন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গেল তাদেব ছেড়ে দেওয়া ঘরে। ব্যবস্থা হল এই। সহজ, সংক্ষেপ ও ঢালাও !

মণি কোথায় অবাক হবে, তার হল জ্বালা।

তুমি এ জন্য আমায় এনেছিলে ঠাকুরপো ? এভাবে অপমান করতে ?

মণিকে সে যেন জোর করে টেনে এনেছে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ! মাঝরাত্রি যখন পার হয়ে গেছে, শ্রান্তিতে যখন আকাশের চাঁদ আর অবুঝ জগৎ সহজ স্পষ্ট বাস্তব ঘুম চেয়ে ধৈর্য হারাতে বসেছে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, তখন এ রকম ন্যাকামিতে মহাপুরুষেরও রাগ হয়।

অপমান হয়েছে ? বেশ, কাল ফিরে যেয়ো।

সে অপমান নয়।

কোন অপমান তবে ?

তুমিও আমায় বুঝলে না ঠাকুরপো !

কথা হচ্ছিল সিঁড়িতে। প্রণব ছাদে উঠছিল। নতুন চালাটার নীচে হোক, খোলা আকাশটার নীচে হোক, কোনো এক জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। মণি নীচে নামছিল ছাদ থেকে নিজের মনে অজস্র মনগড়া অপমান কুড়িয়ে মর্মাহত হয়ে,—ছোটো হোক বড়ো হোক একটা ঘর তাকে দেবার জন্য একবেলায় এ রকম চালা তোলা, সকলেব বসবাস উলটে-পালটে দেওয়া ! এরা তাকে ভেবেছে কী ?

মণি জানত না আবেগেরও সীমা আছে। সে সীমা দেহের—সহ্যশক্তির, হৃদয়ের নয়। প্রণবও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যে অতীত সহজে মরেও মরে না মণিদেব জীবনে। এতদিন পরে এত বয়সে পুরানো ছেলেমানুষির পুনরভিনয় তাকে প্রথমটা প্রায় থতোমতো খাইয়ে দেয়। মণির কিন্তু বাঁধ ভেঙেছে। সে অনায়াসে হাতের ভাঁজে মুখ রেখে তার নিঃশব্দ ভঙ্গিতে কাঁদে।

কেন মিছে এমন করছ মণি বউদি ? শান্ত হও।

শান্ত হচ্ছি ঠাকুরপো।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই সে শান্ত হয়। করুণভাবে একটু হাসে।

এই বোধ হয় প্রথম, না ঠাকুরপো ? যেচে তোমার মায়া চাইলাম ? মনের জোর এমন কমে গেছে আমার !

সেই আত্মনাশা অহংকার। অহংকার অবিকল সেই সরলা ক্ষীণা আনাড়ি তরুণীর বিজয়িনী হতে চাওয়া, জগৎকে জয় করার ইচ্ছা ছেঁটে ছেঁটে শ্বশুরবাড়িটা পর্যন্ত আয়ত্ত না করতে পেরে আরও গুটিয়ে শুধু স্বামীপুত্রের নীড়টুকু সম্বল করা, যেখানে অন্তত সে সর্বতোময়ী। প্রণব একটু আশ্চর্য হয়ে যায় ! এভাবে নিজেকে সামলাবার জোর তবে সেই মণি পায় কোথায় ?

তুমি তেমনি আছ।

আছি ? তেমনি আছি ঠাকুরপো ? তবে কেন তুমি ভালো করে কথা কইছ না আমার সঙ্গে ? কেন পর পর হয়ে তুমি ভালো থাকছ ? শুধু আমি বলে ঠাকুরপো, অন্য মেয়ে হলে, এ রকম ভাব হলে, তোমার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক হয়ে যেত। যেত না ? তুমিই বলো ! সবাই কানাকানি করেছে, উনি পর্যন্ত সন্দেহ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে এতটুকু ময়লা আসেনি। আমরা গ্রাহ্যও করিনি লোকে কী ভাববে, লোকে কী বলবে। নয় কী ?

এত কথার জবাবে প্রণব মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোবে না ?

অপমানে মণি চোখ বোজে। কিন্তু সে ছোটো হয়েছে, জীবনের পরিধি ছোটো করে এনেছে, কখনও হার মানেনি। আজও সে হার না মেনে গাঢ় স্নেহের মৃদু হাসি হেসে বলে, তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে ?

শেষরাত্রে আচমকা ঝড় ওঠে, মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছাদের চালা উড়ে ছত্রখান হয়ে পড়ে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই। প্রণব সিঁড়ির নীচে একতলায় দুজন ঘুমন্ত মানুষের মাঝখানে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে জাগে না। ছাদের মানুষগুলি মাদুর-বিছানা বগলে নীচে নামে, সিঁড়ির নীচে আর পাশের ঘরে শোয়া-বসার আয়োজন করে। গন্ডগোলে প্রণবের ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু সে জাগে না। বস্তুতে গড়া দেহ মানুষের, বিশ্রাম ছাড়া চলবে কেন। তার অনেক কাজ।

একটি দুটি দিন চলে যায়, প্রণবের কাজের চাপটা মণির ঠাহরে আসে। ভাব দেখে মনে হয়। কোনো বিষয়ে প্রণবের এতটুকু তাড়াহুড়া নেই, কিন্তু কীভাবে কত কাজ সে করে সেটা শুধু আন্দাজ করা যায় তার দিকে না চেয়ে তার কাজের হিসাব করলে।

হিসাব করাটা মণির পক্ষে খুব সহজ নয়। শুধু তাকে আর তার কটা ছেলেমেয়ে নিয়ে যে ছোটোখাটো সংসার, সেটা চালিয়ে আসছে সুশীল। এই দায়িত্ব নিয়েই সে কত ব্যস্ত, কত ব্যতিব্যস্ত, রোজ একেবারে হিমসিম খেয়ে যায় ! সে সব ছিল ফেনানো কাজ, একটা কাজের সঙ্গে অসংখ্য অকাজ। তুচ্ছ কাজের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকেও অযথা গুরুত্ব দিয়ে নিখুঁত করার চেষ্টা। এই নিয়েই কী সে ছিল ? এ বাড়ির মোটা কাজ আর মোটা ব্যবস্থা, খুঁটিনাটি নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামানো বর্জন, মণিকে তার সংসারের কথা মনে পড়িয়ে উতলা করে তোলে। ছেলেপিলে সম্পর্কে এদের গা-ছাড়া ভাবকে মনে মনে যথেষ্ট নিন্দা করেও সে সুখ পায় না। ভালোই আছে ছেলেপিলেরা এখানে, যথেষ্ট ভালো আছে, চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে না থেকেও !

বারবার ছোটো ঘরটিতে গিয়ে মণি বসে, আকাশ-পাতাল ভাবে। বেশি ক্ষণ ভাবতে পারে না, দম আটকে আসে তার। একটা আস্ত বাড়িতে তার যে সংসার ছিল, এই বাড়িতে এতটুকু এই ঘরটি ভরাট করার মতোও যেন তা যথেষ্ট বড়ো নয়, আরও ে টা আরও সংকীর্ণ। কারণ, একা সে-ই কেবল একটি ঘর পেয়েছে এ বাড়িতে।

সেদিন সকালে গিরীন বাড়ি ফিবল না। বাত্রে সে আজকাল বাড়ি ফেরে না, কাগজের আপিসেই শুয়ে থাকে। রাত জাগলে বাড়ি ফিরতে তার বেলা হয়, অন্যদিন সকাল সকাল একপ্রস্থ বাজার বা রেশন নিয়ে পৌঁছে যায়। পথে বিপজ্জনক এলাকা পড়ে কিন্তু একটা সুবিধা আছে গিবীনের, আপিসের ভ্যান তাকে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে দেয়। তবে যে অবস্থা শহরের কিছুই আজকাল বলা যায় না। লাটপ্রাসাদের এলাকা ছাড়া কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। গিরীন না এলেও তার সহ-সম্পাদনার খবরের কাগজখানা এসে পৌঁছেছে। হকারদের কাগজ বিলি করা পর্যন্ত কিছু ঘটেনি আশা করা যায়, ঘটলে কাগজের সঙ্গে সে খবরটাও সে দিত। আপিস থেকে বেরিয়ে কোনো কাজে কোথাও কি গিয়েছে গিরীন ? ে থাও আটকে গেছে ? কোনো বিপদ ঘটেছে তার ?

পাড়ার রসময়দের বাড়ি থেকে নীলিমার ভাই গোকুল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আপিসে টেলিফোন করে আসে এগারটার সময়, প্রণব বাড়ি ছিল না। মণি প্রথম জানতে পারে এ বাড়িতে নীলিমার একটি ভাইও থাকে এবং গোকুল নামে নীলিমার মতো রোগা ঢ্যাঙা ও তুলনায় বেশ একটু কালো ছেলেটিই তার সেই ভাই। নীলিমা যে ভাইকেও আগে চিনিয়ে দেয়নি তাও বোধ হয় এদের রীতি। গোকুল খবর নিয়ে আসে, গিরীন ভোরেই আপিস থেকে যথারীতি বেরিয়েছে। বিশেষ কাজে তার কোথাও যাওয়ার খবর কেউ জানে না।

সরস্বতী বলে, তবে তো ভাবনার কথা হল।

উষা বলে, আপনার উনি তো এ রকম খবর না দিয়ে কোথাও যান না দিদি ?

উষা প্রণবের পিসতুতো বোন। পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। সর্বস্ব ফেলে সবাই মিলে শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, উষার তাই যেমন রাগ যত বিদ্বেষ, তেমনি ভয়। যখন তখন সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে গলা ছেড়ে অভিশাপ দিতে শুরু করে, কোনো একটা বা দশটা বিশেষ মানুষকে নয়, একটা সম্প্রদায়ের নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বকে। অভিশাপ দিতে দিতে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দেয়। প্রণব একদিন তাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে তাদের মতো অনেকে এ অঞ্চল থেকেও তার ছেড়ে আসা এলাকায় পালিয়েছে, শুধু সম্পত্তি নয় আপনজনের প্রাণও রেখে গেছে। উষা বোঝেনি। বুঝবার কথাও নয় তাব। প্রণবও আর চেষ্টা করেনি। শুধু বলেছে, কয়েক কোটি লোককে শাপ দিয়ে কী করবি ? কারও গায়ে লাগবে না তার চেয়ে নাম ধরে গাল দে, মনে শান্তি পাবি। প্রণব কয়েকটা দেশি বিলাতি বড়ো বড়ো নাম তাকে শুনিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক নেতার নাম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারের নাম।

উষা আশ্চর্য হয়ে বলে, সাহেবদের শাপ দেব কেন ? ওরা আমার কী করেছে।

মণি এ আলাপ শোনেনি, তখনও সে এ বাড়িতে আসেনি। শুনলে হয়তো উষার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে খুশি হত। ইতিহাস বা রাজনীতি কোনোটা নিয়ে কোনোদিন মাথা না ঘামালেও এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ফসলের চাষের জন্য ইংরাজের প্রাণপাত সাধনা সম্পর্কে সাধারণ চলতি জ্ঞানটুকু তার ছিল।

ভূপেন গিরীনের খবর এনে দেয়।

ভূপেন ভোরে স্নান করে কাজে বেরিয়ে যায়, দুপুরে খেতে আসে। খেয়ে উঠে আধঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা নাগাদ। অনাত্মীয় প্রৌঢ়বয়সি সাদাসিদে নিরীহ মানুষ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, খুব অল্প কথা বলে। খাই-খরচা বছরখানেক এ বাড়িতে আছে, বৈঠকখানায় একটি তক্তপোশে শোয়। ভিড় হওয়ার পরেও এ বাড়িতে শুধু তার শোয়ার ব্যবস্থা অবিকল রয়ে গেছে, কারণ, তক্তপোশটি তার হাত দুই চওড়া, প্রায় একটি চওড়া বেঞ্চের মতো, তাতে একজনের বেশি দুজনের শোবার উপায় নেই।

বৈঠকখানায় প্রণবের বাবা অনুকূল ও বাড়ির আরও তিনজন পুরুষ গিরীনের সম্পর্কে ফলাও করে উদ্‌বেগ প্রকাশ করছিল, জামা খুলতে খুলতে ব্যাপার জেনে ভূপেন আবার বোতাম এঁটে বেরিয়ে যায়। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানায় যে গিরীনের খবর পাওয়া গেছে। মারাত্মক আহত এক বন্ধুর সঙ্গে সে হাসপাতালে গেছে। নিজে সুস্থ এবং অক্ষত আছে গিরীন।

খবর শুনে, নীলিমা এসে শুধায়, কোন বন্ধু, নাম শুনেছেন ?

তোমাদের মনসুর।

কবি মনসুর ? ইস্‌ !

মণি একটু অবাক হয়ে তাকায় নীলিমার দিকে। তার মামার মৃত্যুসংবাদ নীলিমা নীরবে শুনেছিল। তবে তার মামা নীলিমার অচেনা, কবিটি তার চেনা লোক। তবু ?

উষা কাছে ছিল। সে বলে, মোসলা ? ঠিক হয়েছে।

তারপর হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার উনির মোসলা বন্ধু দিদি ? এটা কী রকম কথা হল ?

সে আমারও বন্ধু ভাই।

শুনে উষার মুখ একটু হাঁ হয়ে যায়।

তিনটে নাগাদ গিরীন ফেরে, তার কাছে ব্যাপারটা জানা যায়। শহরের ব্যাপক ও স্থায়ী দুর্ঘটনারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার, মানুষটা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং গিরীনের চোখের সামনে ঘটনাটা

ঘটেছে এইটুকু শুধু এ ব্যাপারের বিশেষত্ব। একটু অবিবেচনার পরিচয়ও হয়তো গিরীন দিয়েছে। মনসুরও বাস্তব অবস্থা ঠিকমতো বিচার করতে পারেনি। সে সেই ধরনের মানুষ, বিশেষ মত পথ বা আদর্শ ধরে যার ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উপরে ওঠার প্রচেষ্টা ছিল না, আপনা থেকে স্বাভাবিক-ভাবেই ও সব বিশ্বাস ও সংস্কার তার মোটামুটি খসে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে নানাস্থানে নানা জাত ও ধর্মের মানুষের ঘনিষ্ঠতায় বড়ো হয়ে তার হৃদয়-মন বিশেষ একটা গড়ন পেয়েছে। নিজেই সে জানে না সে নাস্তিক কি না, তার কথাবার্তা চালচলন খাপছাড়া কি না, তার মানবতা-বোধ আছে কিনা,—ও নিয়ে কখনও মাথাও ঘামায়নি। কবি হিসাবে নজরুলের আধুনিক সংস্করণ হবার চেষ্টাটা তার আন্তরিক, বোধ হয় সেই জন্যই তার কবিতায় সরলতা এবং জটিলতার চরম সমাবেশ ঘটে, একটা লাইন হয় গ্রাম্য ছড়া এবং পরের লাইন শব্দার্থক ধাঁধাকে ছাড়িয়ে যায়,—কবিতা ভালো হয় না। তাতেও মনসুরের যেন দুঃখ নেই। গিরীন তার কবিতার নিন্দা করে সবচেয়ে বেশি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে অফুরন্ত হাসি হেসে যায়, যেন উপভোগ করছে অসংযত ঘরোয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা।

নীলিমা হেন নারী, তারও মায়া হয়েছে। বাধা দিয়ে বলেছে, থামো তুমি। ছাই কবিতা লিখছে সবাই, মাথামুন্ডু নেই। ওর কবিতার তবু দু-চারলাইন বোঝা যায় !

সহানুভূতি জানিয়ে মনসুরের কৃতজ্ঞতা অর্জন করা গেছে কিনা সেটা কিন্তু বোঝা যায়নি।

সকালে আপিসের ভ্যান থেকে এসপ্ল্যানেডে নেমে তার সঙ্গে গিরীনের দেখা হয়। আজকাল ভোরে গিরীন একটু ক্লান্তি বোধ করে, মনটা ভালো থাকে না। চারিদিক থেকে যে সব উত্তেজনাকর খবর এসে জমা হতে থাকে পরদিন পরিবেশনের জন্য তার একটা প্রচণ্ড কষ্টকর চাপ আছে, একটা দুর্বিষহ বিষণ্ণতার দিক আছে, রাত্রে সেটা টের পাওয়া যায় না। সকালে একটা শারীরিক গ্লানির মতো, মাথা ধরে থাকার মতো, নিরানন্দ কষ্টকর ভাবটা অনুভব করা যায়। সারারাত্রি যখন ভয়ানক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের চাপে ঘুম হয়নি। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলি কেটে-ছেঁটে ঢেলে নিতে নিতে প্রতিদিন যে সমগ্র তাৎপর্য পাওয়া যায় তা শুধু অশুভ ইঙ্গিতের, মারাত্মক সম্ভাবনার। সহজে সর্বনাশা দাঙ্গার আগুন নিভবে, সহজে দেশজোড়া বিক্ষোভের মীমাংসা হবে, কল্পনা করাও অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

দেখা-সাক্ষাতে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল, দুজনেই খুশি হয়। মনসুর তাকে চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে চা-ও খাওয়ায়, একটা কবিতাও শুনিয়ে দেয়.

নতুন কবিতা ? নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

কাল লিখেছে।

কবিতার আরম্ভটা মনে আছে গিরীনের : শত সংঘাতে টুটিবে না ভালোবাসা, ভাষা যে রে একাকার ! কবিতা পড়ে চিরদিনের মতো সাগ্রহে মনসুর জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন লাগল ? এবং চিরদিনের মতোই হাসিমুখে নিন্দা শুনেছে। ফকিরচাঁদ লেনে 'কালের কথা' মাসিকপত্রের আপিস, সম্পাদক কেদারনাথের বাড়িরই বৈঠকখানায়—কবিতাটি সেখানে পৌঁছে দিতে বার হয়েছে মনসুর।

গিরীন বলেছিল, ডাকে পাঠিয়ে দিয়ো। নিজে নাই বা গেলে ?

কী হবে ? আমি কাকে ডরাই ! আমার কেউ শত্রু নেই।

এগুলি কবির কথা। আসলে অনেকদিন যাওয়া হয়নি, কেদারের ওখানে গিয়ে আড্ডা দেবার জন্য মনসুরের প্রাণটা আনচান করছিল। গিরীনের প্রাণটাও হঠাৎ কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেদারের ওখানে কেন, বহুদিন সেও দশ মিনিটের জন্য বাড়ির বাইরে কোথাও আড্ডা দেয়নি। আকাশে মেঘ নেই, এই সকালেই চন্‌চনে রোদ উঠেছে, এতক্ষণে চৌরঙ্গির এদিকটা যান-মানুষের সরগরমে জীবন্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করার কথা। মাঝরাত্রি পর্যন্ত যেখানটা গাড়ি-মানুষে গমগম করত, সন্ধ্যা হতে

না হতে আজকাল যে সেখানটা জনবিরল হয়ে আসে, সকালেও যেন তার জের চলছে, ভয়ে সংকোচে অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে আংশিক প্রাণ পাচ্ছে। ট্রাম-বাস অর্ধেক খালি। তার জীবনেও এই ছোঁয়াচ লেগেছে। আপিসে যায়, সেখানেই ঘুমায়, সকালে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, সারাদিন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে গতিবিধি মেলামেশা।

চলো কবি, আমিও যাব।

কাছাকাছি আশেপাশে হাঙ্গামা হয়েছে গিরীন জানত, ফকিরচাঁদ লেন থেকে কোনো গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি। গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে গিরীন জানতে পারত। আর যদি ঘটেই থাকে তাতেই বা কী ? মানুষ কি শুধু আতঙ্কের হিসাব কষেই দিন কাটাবে ! বিশ্রী হতাশা আর ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় গিরীনেরও অদ্ভুত একটা বেপরোয়া ভাব এসেছিল।

এদিকে ফকিরচাঁদ লেনেই রাত তিনটেয় ঘটে গিয়েছিল বীভৎস বিপর্যয়, খবর হয়ে খবরের কাগজের আপিসেও পৌঁছতে পারেনি সকাল পর্যন্ত। সে ঘটনার সঠিক বর্ণনা হয় না, ভাষায় তার রূপায়ণ নেই। পাশের এক পাড়া থেকে এসেছিল সংগঠিত আক্রমণ, অন্ধকারের সেই গোপন অভিযানের সেনাপতি ছিল এই এলাকার ছত্রপতি কলকাতার এক বিখ্যাত গুন্ডারাজ। সহকারী দলবল দিয়ে উন্মাদ জনতাকে হত্যা ও লুঠপাটে পরিচালনা করার এমন সুযোগ তার জীবনে কেন, তার পূর্ববর্তী নামকরা ফারুক সর্দারের একষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত একচেটিয়া স্বরাট গুন্ডামির জীবনেও কখনও আসেনি। ফকিরচাঁদ লেনের হৃদয় প্রতিহিংসায় পুড়ে যাচ্ছিল। কতগুলি বাড়ি থেকে বারংবার টেলিফোন করে পুলিশ বা ফৌজ আনানো যায়নি। কথা বলতে বলতে ফকিরচাঁদ লেনে খানিক এগিয়ে গিরীন হঠাৎ সেই অস্বাভাবিকতা আঁচ করেছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চল ফিরে যাই। অবস্থা সুবিধে নয়।

মনসুর রাত জেগে কবিতা লিখেছে, সে তখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তুমি তো বড়ো ভীরু ?

তারপর ফকিরচাঁদ লেনের বিক্ষোভ ডজনখানেক যুবকের মারফতে কবির উপর আছড়ে পড়েছিল। মনসুরের পরনে ছিল লাল পায়জামা !

পায়জামা ? মনসুর সত্যি পাগল !

পাগল ছাড়া কী। ধুতি-পায়জামা-প্যান্টালুন ইতিমধ্যেই শহরের দাঙ্গা সম্পর্কে মর্মান্তিক রসিকতার মর্যাদা পেয়েছে। মানুষের গায়ে তো আর লেখা থাকে না তার ধর্ম বা সম্প্রদায়। কালা দেশের কালো মানুষের চেহারা প্রদেশে প্রদেশে একই রকম। পোশাক ছাড়া চেনাই দায় হিন্দু কি মুসলমান—যদি না বিশেষভাবে চেনাবার জন্যই দাড়ি-গোঁপ ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। কোট-প্যান্ট-টাই-হ্যাটের নিরাপত্তা দাঙ্গার একমাসের মধ্যে জানা হয়ে গেছে। ট্রাউজার পরে সায়েব সেজে নাকি যে কোনো সময় শহরের যে কোনো এলাকায় গিয়ে নিরাপদে পাক দিয়ে বেড়ানো যায় সাত ছোরার পাশ কাটিয়ে !

পায়জামা পরার জন্যই প্রাণটা যেত মনসুরের। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গিরীন যদি না হঠাৎ দিশেহারার মতো গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করত, এঁকে মারবেন না, ইনি কবি, ইনি—কবি !

আপনি কে মশাই ?

আমার নাম গিরীন রায়। আমি বই লিখি, ইনিও বই লেখেন। এঁর নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রব ওঠে : ছেড়ে দাও।

পাঁচ-সাতটি ছেলের গলা, তারা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, কিছুই করার ছিল না তাদের। প্রাণটা রয়ে গেল কবির, চেঁচামেচি বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওই ছেলে ক-জন একটা গাড়ি জোগাড় করে এনে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

বাঁচবে তো ?

হয়তো বাঁচবে। ঠিক নেই।

এতক্ষণ পরে নীলিমা প্রথম জিজ্ঞাসা করে, তোমার কিছু হয়নি তো ?

এক ঘা ডান্ডা খেয়েছি।

বাঁ হাতটা প্রায় অবশ, টনটনে ব্যথা। মণি এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গিরীনের মুখে যাতনার ছাপটা সবখানি কবি মনসুরের জন্য তার বেদনাবোধের প্রমাণ বলে ধরে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এ রকম বন্ধুত্ব কল্পনা করতে গেলে তার অনেক বিষয়েই মুশকিলের সীমা থাকে না।

সন্ধ্যার সময় এক খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে। চাল-আটা কম পড়েছে এ বেলা, মেয়েরা আলোচনা করছিল সে বিষয়ে কী ব্যবস্থা করা যায়। কিছু চোরাবাজারি চাল এনে রেশনের ঘাটতি পুরনের কথা ছিল গিরীনের, চাল সে আজ আনতে পারেনি। আচমকা একটি মেয়ে আসে এ বাড়িতে, তার চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। তাদের মতো তাদেরই ধরনে শাড়ি-ব্লাউজ পরা, আলগা খোঁপা এবং মাথার পিছনে আঁচল ঠেকানো ঘোমটা। শুধু সিঁথিটা সাদা। নীলিমা তাকে সবিস্ময়ে অভ্যর্থনা জানায়, রশৌনা ! তুমি এখানে ?

তার নাম শুনে মণিরা থ বনে থাকে। রশৌনার চোখ-মুখের কাঠিন্য সুস্পষ্ট, নরম গাল পাতলা ঠোঁটের আড়ালে সে যেন দাঁতে দাঁতে কামড়ে আছে।

তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করতে এলাম।—রশৌনা বলে।

হাসপাতালে গিয়েছিলে ভাই ? সরস্বতী তার মোলায়েম গলায় শুধায়।

সেখান থেকেই আসছি।

নীলিমার মুখে উদ্‌বেগের ছাপ পড়ে।—কী হয়েছে ? ব্যাপার কী ? কবি ভালো আছে তো ?

শরম লাগল না জিগ্যেস করতে ? গলায় আটকাল না ?—আবেগে ফেটে পড়ে রশৌনা, তীব্রতায় তীক্ষ্ণতায় চমকপ্রদ মনে হয় তার জ্বালা আর ক্ষোভ—ফন্দি করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মারলে,—কী হয়েছে, ব্যাপার কী, ভালো আছে তো ! ম' যে বলত তোমাদের জাতটাকেই বিশ্বাস নেই, এমনি করে তার প্রমাণ দিলে ? বন্ধুকে খুন করিয়ে ?

খুন করিয়ে ? নীলিমার চমক লাগে, কী বলছিস তুই ? তিনটের সময় ও দেখে এল—

তুই তুই করিস নে তুই আমাকে ! তুই আমার বন্ধু নোস। তোরা খুনে, তোরা জাহান্নামে যাবি।

উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপে, এলোমেলো নিশ্বাস নেয় কিন্তু তার ঘৃণা-বিদ্বেষের তীব্রতা ভুল করার উপায় নেই, শুধু বেদনায় অভিমানে সে আত্মহারা হয়নি। নীলিমা তাকে ঘাঁটাতে না চেয়ে শুকনো সুরে সোজা প্রশ্ন করে, মনসুর কি বেঁচে নেই ?

মারতেই তো চেয়েছিলে, পারলে না বলেই তো জ্বলেপুড়ে মরছ !

যাক, কবি তাহলে বেঁচেই আছে, শোকের ধাক্কায় মাথা খাবাপ হয়ে রশৌনার এ পাগলামি নয়। ছেলেবেলা থেকে স্কুলে তারা একসাথে পড়েছে, ভাব তাদের আজকের নয়, তাদের সখিত্বের ভিত্তিতেই গিরীন আর মনসুরের পরিচয়, বন্ধুত্ব ! আচমকা এভাবে এসে রশৌনা এ রকম আবোল-তাবোল কথা বলতে শুরু করায় মনে মনে নীলিমা চরম দুর্ঘটনাটাই ঘটেছে বলে ধরে নিয়েছিল। সেটা সত্য নয় জেনে নীলিমা যে কী ভরসা পেল !

রশৌনা সহজেই আবেগ সামলে নেয়। সে সত্যই মনগড়া অভিমানে কাতর হয়ে নালিশ জানাতে আসেনি, রাগের জ্বালা সইতে না পেরে অসময়ে এত দূরে ঝগড়া করতে এসেছে। তার পরের কথা ব্যবহারে সেটা আরও স্পষ্ট হয়। নীলিমা তাকে বসতে বলে, জানতে চায় তাদের

দোষটা কী—যে জন্য এত জ্বালা হয়েছে রশৌনার। রশৌনা বলে সে বসতে আসেনি, কেন তারা এমন কুৎসিত এমন জঘন্য কাজ করেছে তার কৈফিয়ত চাইতেও আসেনি। সে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এসেছে, জানিয়ে দিতে এসেছে আজ থেকে সেও তাদের শত্রু, তাদের সর্বনাশ করা আজ থেকে তার পণ।

তোমরা কাফের, তোমরা পার মুখোশ পরে বন্ধুকে ভুলিয়ে প্রাণে মারতে, আমরা পারি না। আমরা জানিয়ে শত্রুতা করি। তাই বলতে এসেছি, পরে যেন দোষ দিয়ো না বন্ধু সেজে ক্ষতি করেছি।

এ সব কথা মাথা বিগড়ে যাবার লক্ষণ, কিন্তু এ হল্‌কা যে সত্যসত্যই মনে লাগানো আগুন থেকে আসছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে রশৌনার পাগলামির পিছনে। নীলিমা কী বলবে ভেবে পায় না। একদিনে এককথায় তাদের এত দিনের বন্ধুত্ব বাতিল হয়েছে মেনে নেবার অভিনয় করাটাও তার কাছে হাস্যকর মনে হয়।

বন্ধুর মতোই সে তাই বলে, কার কাছে আবোল-তাবোল কী শুনেছিস, ব্যাপার তুই কিছুই জানিস না রশৌনা।

যার জান নিয়ে ব্যাপার, তার কাছেই শুনেছি।

কবি বলেছে ? কবি বলেছে ওকে ভুলিয়ে—?

বলবে না ? তোমরা শয়তান, তোমরা ধাপ্পা দিয়ে জানে মারবার চেষ্টা করবে—

শুকনো চোখ রশৌনা দুবার রগড়ে দেয়। তার সুন্দর চোখ দুটি একটু লাল ও কর্কশ হয়ে আরও অপরূপ হয়েছে।

দাঁড়া, ওকে ডাকি। নীলিমা বলে।

ডাকো না, ডাকো। আমি কাউকে ডরাই না ! রশৌনা বেপরোয়াভাবে বলে।

হাতের ব্যথায় গিরীন একটু কাতরাচ্ছিল, ব্যাপার শুনে সে কাতরানি ভুলে যায়। চিন্তিত হয়ে বলে, যা বলে বলুক মেনে নিয়ো, তর্ক কোরো না, ঘাঁটিয়ো না। সঙ্গে কেউ আসেনি ? কী মুশকিল !

গিরীনকে দেখে গ্রীবা তুলে যে ঘৃণা ও হিংসার দৃষ্টিতে যে ভঙ্গিতে রশৌনা তাকায় তাতে আপাতত তাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করার কথা গিরীন ভাবতেও পারে না।

আপনার কিছু বলার আছে ?

কিছু না। ডান্ডা খেয়ে আমার অবস্থাও একটু কাহিল।

এ কথাটা গিরীন না বললেই পারত।

ও সব চালাকি জানি।

গিরীন একটু নীরব থেকে বলে, কবির জ্বর বেড়েছে ?

আপনার জেনে দরকার ?

গিরীন শান্ত সুরেই বলে, চলুন না কাল একসঙ্গে দেখতে যাই ? নীলিমাও যাবে।

রশৌনার চোখে ছুরির ধার ঝলকে ওঠে, ওঁর ধারে কাছে আপনারা কেউ গেছেন যদি শুনি, পরের বার ছোরা নিয়ে আসব।

গিরীন ও নীলিমা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সরস্বতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বলে, রাত হলে ফিরতে অসুবিধা হবে ভাই।

ঝেঁঝে উঠে কী একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে রশৌনা চেপে যায়। মুখে কথার বদলে তার দু-চোখে জল নামে। দেখে আবার আরেকটা স্বস্তি বোধ করে নীলিমা।

সরস্বতী বলে, একজন এগিয়ে দিয়ে আসুক। তোমায় খাতির করে বলছি না। তুমি যেচে এসেছ, আমরা ডাকিনি। একজনকে সঙ্গে যেতে দেওয়া তোমারই কর্তব্য। মনে যাই থাক, অন্যায় কোরো না ভাই, হাতজোড় করে বলছি।

প্রণববাবু আছেন ?

এতদিনের বন্ধুবা শত্রু হয়ে গেছে কিন্তু শত্রুপুবীর প্রণবকে সঙ্গে যেতে দিতে তার আপত্তি নেই। প্রণবকে মণি আজ আবার নতুন করে চেনে।

প্রণব ফেরেনি। আমি যাই ? সরস্বতী বলে।

না।

স্পষ্ট নিষেধ জানিয়ে যেমন এসেছিল তেমনিভাবে রশৌনা চলে যায়, তফাৎ থাকে এই যে এবার তাকে চোখের জল মুছে নিতে হয়। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, শহরের বর্তমান অবস্থায় একা তাকে এভাবে যেতে দেওয়া অসম্ভব। এখানে অথবা মনসুরের ছোটো ফ্ল্যাটটি যে এলাকায় সেখানে হাঙ্গামা নেই, কিন্তু দাঙ্গার সুযোগে গুন্ডা-বদমায়েশরা শহরের নরক গুলজার করে রেখেছে। গোকুলকে তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে পাঠানো হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে রশৌনার ঠিক সঙ্গে সে যাবে না, একটু তফাতে থাকবে।

মণি সংশয়ভরে বলে, পাগল তো মনে হল না ?

মনে খুব ঘা লেগেছে। কবির কিছু হলে ও সইতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে নীলিমা গিরীনকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যখন এলে কবির জ্ঞান হয়নি ?

ভালো জ্ঞান হয়নি। এলোমেলোভাবে চেতনা হচ্ছিল, আবার ঝিমিয়ে যাচ্ছিল।

কী এমন বলল যে রশৌনা খেপে গেল ?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাল-আটার সমস্যাটা মুলতুবি ছিল। তাকে তুলে রেখে একবেলার জন্য ভুলে থাকার মতোও নয় সমস্যাটা, এতগুলি লোক আজ রাত্রে খাবে কী ?

মণি হঠাৎ বলে, আমার কাছে কিছু চাল আছে, দিচ্ছি।

তুমি চাল পেলে কোথা ? তুমি যা সঙ্গে এনেছিলে সে তো খরচ হয়ে গেছে ?

ভালো চাল তোলা আছে।

ছেঁড়া জামা-কাপড়ের ট্রাংকে সের সাতেক সুগন্ধি আতপ তোলা ছিল, পায়েস-পোলাউ খাওয়ার দামি চাল, সচরাচর মেলা কঠিন। হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে নীলিমা মাথা নাড়ে, না বাবা, প্রাণ ধরে এ চালের ভাত রেঁধে খেতে পারব না শাকপাতা দিয়ে—তোমবা পারবে ? ভাতের চাল আনা হোক, এ চাল দিয়ে কাল বরং ভোজ হবে।

ভুপেন পাড়ার যাদুগোপালেব মুদি দোকান থেকে চোরাবাজারের দরে দশ সের সাধারণ মোটা চাল নিয়ে আসে। মুদি দোকানের সঙ্গেই রেশনের দোকান, একই মালিক। পাড়ার ভিতরের দিকে বস্তির অনেকগুলি কার্ডের রেশন এ দোকান থেকে নেওয়া হয়, সব কার্ডের পুরো রেশন নেবার পয়সা অনেক মেয়ে-পুরুষের সব সপ্তাহে থাকে না, সহায়হীন বুড়িদের সংখ্যাই বেশি এর মধ্যে। তারা যে আটা-চাল ছেড়ে দেয় বাধ্য হয়ে, ওজনের কায়দায় এবং অন্য রকমে যা বাড়তি হয়, যাদুগোপাল সেটা মুদি দোকান থেকে চোরা দরে ছেড়ে দেয়।

প্রণব একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফেরে। মণির কাছে সে রশৌনার খবর শোনে, প্রতিদানে তার খবরটা সে কিন্তু বিশেষ করে মণিকে শোনায় না, খোলা ছাদে রাত্রের আড্ডায় সকলকে শোনায়। বিকালের দিকে একটা মিলিটারি লরি একটি ছেলেকে চাপা দেওয়ায় রাস্তার লোকে লরিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে প্রণব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, লরিটা তখন পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখছিল, এই অপরাধে তাকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

যেখানে যে হাঙ্গামা হোক, তোমার কী সেখানেই যাওয়া চাই ঠাকুরপো ?

মণি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তার জ্বালা হয়েছিল যে প্রণব এতক্ষণ তাকে এ কাহিনি শোনায়নি।

সাধ করে কী যাই!

পরদিন হাসপাতালে মনসুরকে দেখতে গিয়ে তার কাছে গিরীন যে অভ্যর্থনা পেল তা সত্যই চমকপ্রদ। দেখামাত্র মনসুর যেন তাকে কামড়ে দেবে। দু-মিনিটে যে গালাগালিটা সে দিল ঝাঁঝের তার তুলনা হয় না—কবি মানুষ, তাতে আবার নজরুলের ভক্ত, ভাষার তার জোর কত! মনসুরের কাছে এ সব শুনে বাড়ি বয়ে গিয়ে রশৌনা যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব খারিজ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসবে সেটা এখন আর গিরীনের কাছে খাপছাড়া মনে হয় না। বিদায় হবার সময় তবু স্বভাবতই তার চোখে জল এসেছিল।

ডাক্তার ইশারা করে। গিরীন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

আহত অসুস্থ মানুষ, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় যে চড়া জ্বর চলছে। সাময়িকভাবে তার মাথাটা যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে কারও কিছু বলার নেই। এটা নিছক ব্যারাম, ভ্রান্তি,—বিকার। সারা ভারতের স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমানের অবিশ্বাস ও হিংসা কি এই রকম মিথ্যা ভ্রান্তির বিকার নয়? গিরীনেরা শুকনো মুখে আলোচনা করে। ষোলোই আগস্টের সংগ্রাম-ঘোষণার কৈফিয়ত তাই। নেতাদের কৈফিয়ত অবশ্য, কিন্তু নেতা কি আকাশে ঝুলে থাকে, জনতার মাথাই সব নেতার পা দিয়ে দাঁড়াবার একমাত্র আশ্রয়, আত্মীয় নেতা ছাড়া। যে নেতা জনতার আত্মীয় সে শুধু সামনে এগিয়ে থাকে, মাটিতেই দাঁড়ায়। উপরে তাকিয়ে থেকে থেকে এতই কি ঊর্ধ্ব-সর্বস্ব হয়েছে এ দেশের মানুষ যে মাথায় চাপা নেতাদের কথার ঘায়েই মাথা খারাপ হয়ে যায়? অথবা মনসুরকে ধরে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার অতিশয় পার্থিব, অত্যন্ত বাস্তব সংঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে আছে? হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের আল্লার মতো সর্বশক্তিমান তো ইংরেজ নয়, তাদেরও নিজেদের গড আছে। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির যতই কৌশল জানা থাক, ইংরেজেরও সাধ্য কি ভিত্তি ছাড়া ভেদ-সৃষ্টির এমন ভেল্‌কি দেখায়, কোটি কোটি হৃদয়ের শাণিত অভিশাপ থেকে গা বাঁচিয়ে ওই কোটিদেরই পরস্পরের গলা কাটতে নিযুক্ত করে?

সে ভিত্তিও কি ইংরেজের তৈরি? একা ইংরেজের?

'দাঙ্গার ভিত্তি' নাম দিয়ে গিরীন সেদিন সম্পাদকীয় লেখে, পুরো দু-কলমের মতো। ভাষা এমন জোরালো হয় যেন কালির হরফে প্রাণটা তার কথা কইছে। পড়তে পড়তে প্রধান সম্পাদক প্রবীণ সত্যহরি বারবার আত্মবিস্মৃত হয়ে মাথা চুলকোতে যায়, বারবার মসৃণ তেলালু টাকে আঙুল পিছলে গিয়ে তার বিরক্তির সীমা থাকে না।

এটা কী লিখেছ গিরীন?

কোনটা?

আগাগোড়া সবটা। ধর্মকে এভাবে গাল দেবার কোনো মানে হয়?

ধর্ম নয়, ধর্মপ্রবণতাকে। জগতে ধর্মের পাট অনেক কাল চুকে গেছে, পাঁক সার হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস আজ তাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে দেশে যত বেশি জিইয়ে রাখা হয়েছে সে দেশের আজ তত বেশি সর্বনাশ—

আহা, এ সব তো লিখেইছ, পড়লাম। কিন্তু ধর্ম কাকে বলে তুমি যে তাই জানো না গিরীন। ধর্মের নামে অধর্ম চললে সেটা কি ধর্মের দোষ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ সব রইল, ধর্ম শেষ হয়ে গেল? ধর্মভ্রষ্ট হয়েছি বলেই আমাদের এত দুর্দশা। তুমি লিখেছ উলটোটা, ধর্মের জন্যই যেন যত ফ্যাসাদ!

ধর্মের নামেই তো চলছে সব। রাজনীতি, হত্যা, জাল-জুয়াচুরি—

আহা, কথাটাই তো তাই ! ধর্মের নামে এ সব চলছে মানেই তো মানুষ ধর্ম মানছে না, অধর্মের রাজত্ব চলছে। গান্ধীজির অহিংস নীতি শুধু রাজনীতি হলে কি এমন ফ্যাসাদ হত না আমরা এমন ফাঁদে পড়ে কোঁকোঁ করতাম ? উনি নিলেন ধর্মের অহিংসা, তাকে করলেন রাজনীতির কৌশল। এটা অধর্ম, তার ফলও ফলছে। তুমি বরং এটা একটু ঘুরিয়ে লেখো গিরীন, ধর্মভ্রষ্ট হলে জাতির কী অবস্থা হয়। এমনি বেশ হয়েছে লেখাটা কিন্তু—

ধর্ম কী বলুন তবে। কীসের থেকে ভ্রষ্ট হওয়ায় লোকে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে ? কেন ভ্রষ্ট হয়েছে তাও বলুন।

ধর্ম কী বুঝে এডিটোরিয়াল লিখতে হলেই হয়েছে ! সত্যহরি একটু হাসে।

সত্যহরির হাসিটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গিরীন নাছোড়বান্দার মতো বলে, ধর্ম বুঝতে চাই না সত্যহরিদা, ধর্ম সম্পর্কে একটা ধাঁধা মিটলেই আমার চলে যাবে। ধর্ম আছে বলছেন, ধর্ম যদি আছেই তবে মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে কীসের থেকে ? মানুষ যদি ধর্ম ছেড়েই থাকে, ধর্মটা তবে রইল কোথায় ? মানুষকে বাদ দিয়েও ধর্ম বেঁচে থাকে ? তা যদি বলেন, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জল-স্থল-আকাশ-জীবজন্তুর ধর্মকে ধর্মের নামে মানুষের হানাহানির মধ্যে টানি কী করে ?

সত্যহরি মিছেই সম্পাদকত্ব করে প্রবীণ হয়নি, ধাঁ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্মিতমুখে সকৌতুকে বলে, তাহলে ওভাবেই ঘুরিয়ে লেখো না যে দেশে ধর্ম নেই। ধর্ম নেই বলেই মানুষ পশু হয়ে গেছে !

এবার গিরীন ক্লিষ্টভাবে একটু হাসে, এটা ছাপবার জন্য নয় সত্যহরিদা, এমনি লিখেছি। গায়ের জ্বালায়।

লেখা স্লিপগুলি ছিঁড়ে গিরীন টুকরিতে ফেলে দেয়, সত্যহরি মাথা নেড়ে-নেড়ে বলে, উঁহুঁ, ওটা মিছে বললে ভাই। প্রাণের কথাই লিখেছ, ছাপবার সাধ নিয়েই লিখেছ। তবে সাংবাদিক বটে তো, এও তুমি বেশ জানো, প্রাণের কথা স্বাধীনভাবে ছাপবার সাধ প্রাণেই থাকে ! এই আপশোশে মাথায় আমার টাক পড়ে গেল ভাই !

সত্যহরির মুখে মুচকি হাসি।

একই নিশ্বাসে সত্যহরি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, ওই যে লিখেছ ওয়াহাবি রাখিবন্ধন খিলাফৎ চরকা হরিজন সব কিছুব উৎস স্বাধীনতার কামনা, কিন্তু বাধ্য হয়ে ধর্মের আবরণ নিতে হওয়ায় ভেস্তে গেছে। আসলে ওটা তুমি কী বলতে চেয়েছ গিরীন ?

বলতে চেয়েছি, আমাদের ধর্মপ্রবণতা বাঁচিয়ে রেখে, মধ্যযুগে ঠেলে রেখে, শুধু এই একটা চালে ইংরেজ আমাদের—

ওঃ ! বুঝেছি, বুঝেছি।

গিরীন চটে বলে, না, আপনি বোঝেননি। আপনারা বোঝেন না। স্কুলে-স্কুলে ইতিহাস কেন শেখায় বন্দুকের টোটা কামড়ালে গো-মাতাকে কামড়াতে হয় বলে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল, আপনারা তা বোঝেন না। বরং গর্ব অনুভব করেন ! এই যে নৌ-বিদ্রোহ হল, যে জন্য রাতারাতি মন্ত্রী মিশন এলেন, এটা একশো-দেড়শোবছর আগে ঘটলে আমরা স্কুলের ইতিহাসের টেক্সট বুকে পড়তাম : যদিও জাহাজে ছাগলের মাংসই দেওয়া হইত তথাপি দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা গুজব রটায় যে গোরু ও শূকরের মাংস খাওয়ানো হইয়াছে, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নৌসেনারা বিদ্রোহ করে। পড়ে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠত। আর যাই হোক, আমাদের নৌসেনারা ধর্মের অপমান সহ্য করেনি, গোরু-শূকরের মাংস খাওয়ানোর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করেছে। কী মহান এই দেশ ! কত প্রাচীন এই দেশের সভ্যতা !

বাস্‌ রে বাস্‌ ! একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি একেবারে বক্তৃতা দিয়ে বসলে ! এত ফাঁকিবাজি আর সয় না।

সত্যহরি ঘণ্টা বাজায়। উমেশ এলে বলে, দুকাপ চা আন তো বাবা। চললি যে ? শোন।

হাফপ্যান্ট শার্ট-পরা বেঁটে জোয়ান একুশ বছরের উমেশ ঝকঝকে দাঁত বাব করে হাসে, বলে, চা আনুম। আর কী আনুম কন ?

তিন

ট্রাম চালু আছে, বাসও এলোমেলোভাবে চলে। কোনো সেকশানে হাঙ্গামার ফলে একবেলার জন্য বা দু-একদিনের জন্য ট্রাম বন্ধ থাকে, আবার সে লাইনে ড্রাইভার ট্রাম চালায়, কন্ডাক্টর টিকিট কাটে। কোনো কোনো সাংঘাতিক এলাকায় ট্রামে ড্রাইভারের পাশে রাইফেলধারী ইউনিফর্ম দেখা যায়, দৃশ্যটা হাস্যকর ঠেকে নগরবাসীর কাছে। অনেক মোড়েই রাইফেল ও ইউনিফর্মের, মিলিটারি ইউনিফর্মেরও ঘাঁটি বসেছে, রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে সশস্ত্র ট্রাক, নগরে তবু ছুরি-ছোরা অ্যাসিড-বোমার খুন-জখম, লুটপাট, আগুন দেওয়ার সমারোহ বেড়েই চলেছে। নিরাপত্তা কমছে, শঙ্কা বাড়ছে, অরাজকতার সীমা-পরিসীমা নেই। নগরবাসীর তিতো অভিজ্ঞতা তিতো হতে হতে হাস্যকর মনে হওয়ায় ঠেকেছে, আগুনে লাল হতে হতে লোহা চোখ-ঝলসানো শুভ্র দ্যুতিতে ঝলসে ওঠার মতো ক্রোধ আর ঘৃণার উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যেমন উগ্র পরিহাস, উজ্জ্বল ঝকঝকে বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ হাসি হয়ে দাঁড়ায়।

দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে ! হায় রে তামাশা !

বয়সের ভারে নানি বাঁকা হয়ে গেছে, টিলে হয়ে চামড়া ঝুলে গেছে, মাথা-ভরা শনের নুড়ি, নগরের ফুটপাতে গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়, দেয়ালে সে ঘুঁটে থাবড়ে শুকিয়ে সেই ঘুঁটে বেচে সে বেঁচে আছে, সেও বার্ধক্যের হাসিহীন বিদ্রুপের ভাষায় বলে, যত ঢং তত সং। ঢং দেখে সং দেখে বুড়িয়ে গেলাম, আল্লার দোয়ায় এবার গেলে বাঁচি। বড়ো-বড়ো ঘুঁটে বাছা, মোটে মাটি নেই, ন-আনা শ দিবেন। আ লো নাতনি, তুই না দিলে কে দেবে বল ? তোর কাচ্চা মোরে দেখলে বলে, ইলেললায়লা নানি ! আহা, বেঁচে থাক।

সরস্বতী বলে, কী বলছিলে নানি ?

ততক্ষণে নীলিমা মণিরাও এসে দাঁড়িয়েছে। নানিকে পাড়ার সকলে ভালোবাসে। নানির উপযুক্ত একটা ছেলে আছে—পাঁচ-সাতবছর তাকেও পাড়ার প্রায় সব ঘরের মেয়েরা মুখ-চেনা চিনেছে এই জন্য যে, বিয়ে করে তিন-চারবছর ছেলেটা এই মাকে খেতে দেয় না। ছেলেটার বউটা সুন্দরী। মাঝে মাঝে রাস্তার কলে জল নিতে আসে, মাঝে মাঝে দোকানে সওদা করতে যায়। শান্ত সুশ্রী রং, ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, টিকলো নাকে নকল মুক্তার নাকছাবি !

নানি বলে, বলছিলাম, মোড়ে যে কামান নিয়ে গাঁড়া গেড়েছে, ও সব হল সং। রাজা-বাদশারা ঢং করে এমনি সং দিত, রানিও তাই দিয়েছে।

রানি ? রানি কে, কোন রানি ? সরস্বতীকে খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে হয়, রানি মানে কুইন ভিক্টোরিয়া। নানি কী আর জানে না দেশের এখন অন্য রাজা, মহারানির যুগ বহুকাল গত হয়েছে ? অত সে হাবা নয়, তাহলে এই মারাত্মক শহরে গোবর কুড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। আজ যিনি মহামান্য সম্রাট তাঁর নাম পর্যন্ত নানি জানে ! তবে আজও প্রথম বয়সের রাজশক্তির সেই প্রতীকটি মনে তার গাঁথা হয়ে আছে। শুধু প্রতীক, কিছু এসে যায় না। নানি এও

জানে যে টাকা-পয়সায় আঁকা মূর্তি বদল হয়েছে বলেই গরিবের দুঃখ-দুর্দশা বাড়েনি। গরিবানাই বেড়েছে মানুষের।

চলা-ফেরায় নানিও এখন খানিকটা সতর্ক হয়েছে, আগের মতো তাকে আর যখন তখন এদিকে দেখা যায় না। তার ছেলের সুন্দরী বউ এবং বস্তির আরও যে কয়েকটি অল্পবয়সি মেয়ে-বউ এই রাস্তার কলে আসত তারা বস্তির ছেঁড়া পর্দার আড়ালে লুকিয়েছে। বেশি বয়সের স্ত্রীলোকেরা সন্ত্রস্তভাবে আসে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে মাটির কলসি, তারে ঝোলানো টিন বা লোহার পাত্রে জল ভরে চলে যায়।

রসময়বাবুর মেজোছেলে গজেন কিছুদিন থেকে নানির ছেলের বউটির দিকে একটু নজর দিচ্ছিল, অন্য কোনো বাছবিচার করে নয়, বউটির ছিপছিপে সুন্দর চেহারার জন্যই।

বস্তির গরিব ঘরের সুন্দরী বউ বলেই বড়োলোকের ছেলের লোভ করা—তাও খুব ভয়ে ভয়ে, সাবধানে। বউটির নাম পরীবাণু, বাপের বাড়ি বরিশাল জেলায়। নানিও বরিশাল থেকেই অল্প বয়সে স্বামীর সঙ্গে প্রথম কলকাতা এসেছিল। পরীবাণুকে কেন, তার বাপ-মাকেও নানি চোখে দেখেনি, ছেলের বিয়ের সময় সে শুধু ভেবেছিল, ও বাড়িতে মেয়ে যদি থাকে সে খাপসুরত হবে। সেই ভাবনার ফলে পরীবাণু সায়েব-ফার্মের আপিসের দপ্তরি নাজিমের বউ হয়ে কলকাতার বস্তিতে এসেছে। এই ক-বছরে ওদিকে যুদ্ধ-মন্বন্তরের কল্যাণে পরীবাণুর বাপ-চাচারাও ভূমিহীন খেত-মজুরে পরিণত হয়েছে, চাষের সময়টা ছাড়া গাঁ ছেড়ে সদর শহরের বস্তিতে গিয়ে ডেরা বাঁধছে খেটে খেয়ে বাঁচবার জন্য।

তার দুঃখের কাহিনির অঙ্গ হিসাবেই নানি এ সব বিস্তারিত কাহিনি শোনায়। তার দুঃখের কিন্তু হদিস মেলে না দু-একটা অস্পষ্ট হা-হুতাশ ছাড়া। অন্যকে তারা অবস্থা বুঝে দুঃখটা অনুমান করে নেবার বরাত দিয়েই সে যেন খুশি।

তা পরীবাণু বাড়ির সামনের কলে আসে না বলে ডিম-মুরগি কেনার ছলে গজেন বুঝি দু-একবার বস্তিতে তাদের ঘরের দুয়ার পর্যন্ত আনাগোনা করেছিল। নাজিম বউ নিয়ে আরও উত্তরের বড়ো বস্তিটায় উঠে যাচ্ছে। এ বস্তিটা ছোটো, প্রায় চারিদিকেই হিন্দু। মীরবাগান বস্তিতে শুধু বস্তিবাসী গরিব মুসলমানের সংখ্যার ভরসাই পাবে না, সংলগ্ন অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী মুসলিমপাড়ার রক্ষণাবেক্ষণও মিলবে। গজেনের অবশ্য এটা নিছক চ্যাংড়ামি, প্রশ্রয় না পেলে এর বেশি এগোবার সাহস তার হবে না, সে সাধ্যও নেই। হিংসায় যতই বিষিয়ে থাক মানুষের মন, গজেন জানে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে বউটি জাতে মুসলমান বলেই পাড়ার লোকে তার অন্যায় বরদাস্ত করবে না, সে নিজের পাড়ার লোকের কাছেই ঠেঙানি খাবে। একটা ফিঁচকে ছোঁড়ার ফিচলেমির জন্য নাজিমের বস্তি ছেড়ে পালাবার দরকার ছিল না। এই কথাটা নীলিমা নানিকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হিন্দু বলে একটা বজ্জাত ছেলের ভয়ে একটি গরিব মুসলমান পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাবে এটা ভাবতেও তার গা-জ্বালা করছিল।

নানি সায় দেয়, বাঁকা পিঠ একটু সোজা করে শান্ত স্তিমিত চোখে তাকায়, বলে, নাতনি লো, ও ছোঁড়াটা করত কী ? মোর জোয়ান ছেলে কি ও ছোঁড়াটাকে ডরায় ?

যে ছেলে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না তার গর্বেই বুড়ি যেন লাঠির ভর ছেড়ে আরেকটু সিধে হয়ে দাঁড়ায়। না, ওই ভয় নাজিমের স্থানত্যাগের কারণ নয়, কথাটা অন্যরকম। সময় বড়ো খারাপ, মন মেজাজ বড়ো বিগড়ে আছে মানুষের, মাথাগুলি সব বেঠিক। আগে যা হত তুচ্ছ ব্যাপার, সামান্য হাঙ্গামা, দু-চারজনের বেশি লোকে টেরও পেত না কী ঘটেছে না ঘটেছে আজ হয়তো তাই থেকেই সাংঘাতিক কাণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে। কোন ব্যাপার কী দাঁড়াবে কে বলতে পারে ? নানি তো পারে না, নীলিমা কি পারে ? বুঝি নীলিমার ঠাকুর নানির আল্লাও পারে না ! তাই এই সাবধানতা। নয়তো

বজ্জাতের নজর গায়ে না মেখে বা তাদের চ্যাংড়ামির চেষ্টা না ঠেকিয়ে গরিব দুঃখী মেয়ে-বউয়ের দিন গুজরান হয় ?

তা ঠিক নানি। তুমি ঠিক বলেছ। সময়টা সত্যি খারাপ।

এ কথাটা নীলিমার খেয়াল হয়নি। চারিদিকে উদ্যত অসহিষ্ণু হয়ে আছে অন্ধকারের পশুশক্তি, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারকে অবলম্বন করে এ এলাকায় এত যত্নে বজায় রাখা শান্তি লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে। অতি সাবধান, অতি সতর্ক হওয়াই আজ দরকার। নানি পর্যন্ত এটা ঠিক ধরেছে ! নীলিমা বিস্ময়ের সঙ্গে নানির দিকে তাকায়।

কত না জানি বয়স হয়েছে নানির, কবরের শেষ সমাপ্তির আবেশ কতখানি না জানি অবসন্ন অবশ করে এনেছে তার মাথার ভিতরটা তবু সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তার বাস্তব বুদ্ধি আজও বিহ্বল হয়নি। কত সুস্থ সবল বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষের মতামত কত অল্পে গুলিয়ে যায়, জীবনে কখনও সহজ বিচার-বিবেচনা খোলে না—ঘুঁটে-বেচা নানির নিজস্ব স্পষ্ট মতামত আছে। হয়তো ঘুঁটে বেচে খায় বলে, এই বয়সেও খেটে খাওয়ার বিরাম হয়নি বলে। সংসারের মোটা নিয়ম মোটা কৌশল ভুলে গেলে এ লড়াই চালাবে কীসে ?

বেদম বেখাপ্পা লড়াই। রেশন কার্ড হাতেই ছিল, এ বাড়ির দরজায় সরস্বতীর কাছে ঘুঁটের দাম পেয়ে নানি যাদুগোপালের ওই রেশনখানার দোকানে ধন্না দেয়। মানুষ এ দোকানে লাইন দেয় না, কারণ যাদুগোপাল কার্ডগুলিকেই লাইন দেওয়ায়, কোনোদিন পাশাপাশি, কোনোদিন উপরে-নীচে সাজায়। এতে একটা সুবিধা আছে, কার্ড বেছে খাতিরের লোককে আগে রেশন দেওয়া চলে। কিউ দিয়ে দাঁড়ালে অতিশয় মানী ব্যক্তিরও লাইন ভেঙে আগে রেশন লেখানো মুশকিল হয়—সমস্ত লাইনটা হইহই করে ওঠে। কার্ড সাজিয়ে নিরপেক্ষভাবে আগে-পরের নিয়ম রাখাও যায়, খুশিমতো ভাঙাও যায়।

ভিড় থেকে হয়তো ক্রুদ্ধ মন্তব্য আসে : আমরা ওর আগে এসেছি মশাই !

যাদুগোপাল জবাব দেয় : উনি আগে কার্ড জমা দিয়ে গিয়েছিলেন দাদা !

লাইনের অভাবে নিয়মভঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় রাগ চেপে ভিড়ের মানুষটিকে চুপ করে যেতে হয়। যাদুগোপাল এবং তার রসিদ লেখা কলমচিটি গ্রাহ্যও করে না। দু-একজন সাধারণ মানুষের রাগ বিরক্তি প্রতিবাদ অতি তুচ্ছ। সাধারণভাবেই সমস্ত ভিড়টা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত—আজকাল ভিড় মানেই তাই, যেখানেই দশটা লোক জমা হবে সেখানেই উষ্ণ নিশ্বাস ! বাজে কোনো লোক যদি বেশি গোলমাল করে, যদি দাবি করে যে কে কবে কার্ড জমা দিয়ে হাওয়া খেতে গেছে তা তারা জানে না, আগে-পরে যেমন যেমন মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছে সেই নিয়মে রেশন দিতে হবে—তাকে চিনে রাখে যাদুগোপাল। সেই বিদ্রোহী বাজে লোকটিকে !

সে বেচারার পালা এলে কার্ডে তার কত যে খুঁত বার হয়—সে আটা না ভাতখোর সে ছাপ পড়েনি, ভাঁজ করে রেখে রেখে কার্ড ছিঁড়ে সিগারেট প্যাকেটের স্বচ্ছ মোড়কের কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে নম্বর পড়তে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, এখানে সই বা টিপসই পড়েনি, ওখানে হপ্তার নম্বর ঠিকমতো কাটা হয়নি ! অথবা সোজাসুজি : রেজিস্ট্রি খাতার সঙ্গে কার্ড মিলিয়ে দেখতে হবে, দেরি হবে রেশন পেতে !

হয়রান করার আরও আইনসঙ্গত উপায় আছে। জিনিসের মোট দাম হয়েছে এক টাকা তেরো আনা এক পয়সা। সে হয়তো একটা দু-টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।

গম্ভীর মুখে বলা হয়, চেঞ্জ নেই। খুচরো পয়সা আনো।

নোট ভাঙিয়ে সে চেঞ্জ আনতে যায়। যে নিয়মভঙ্গের জন্য সে গোলমাল করেছিল সেই নিয়ম অনুসারেই দোকান থেকে চলে যাবার জন্য তার পালা পড়ে উপস্থিত সবার শেষে !

তুমিই তো বললে বাবা দোকান ছেড়ে গেলে চলবে না, যেমন আসবে তেমনি পাবে ! তুমিই এখন উলটো গাইছ ?

বস্তিবাসীর সঙ্গে গা-ঘেঁষে চাকুরে বাবুরাও দাঁড়িয়েছে, কয়েকজন ভদ্রমহিলাকেও দেখা যায়। আগে হয়তো কারও কারও চাকর বামুনেই বাজার-হাট করত, থলি হাতে আজ নিজেকেই আসরে নামতে হয়েছে—উঁচু থেকে পতনের ধাক্কা এ সব উঁচ্‌-তাকানেদেরই লেগেছে বেশি। এবাই একটু গা বাঁচিয়ে চলে, একটু সম্মান-সুবিধা খোঁজে যাদুগোপালের কাছে। আবদার করে !

রাজেনবাবু বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি পেলে হত, আরেকটা জরুরি কাজ সেরে আপিস যেতে হবে।

কী করি বলুন।

আহা, সবাইকে বলে-কয়েই নিচ্ছি। বলে-কয়ে আমি আগে নিলে কেউ আপত্তি করবে না। আপিস আছে—

ভূষণ বলে, সবাই কাজে যাবে বাবু। আপিস সবারই আছে।

রুক্ষ চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, বোতামহীন ছেঁড়া শার্ট, খালি পা—ভূষণেরও নাকি আপিস আছে ! সবার মনের কথাই সে মুখ ফুটে বলেছে, সকলের নিঃশব্দ সমর্থন মুখের নির্বিকার কঠোর ভাবে ফুটে থাকে। কী বলেছে ভূষণ, কীসে এমন নিষ্ঠুরভাবে সায় দিয়েছে দশজনে ? ভূষণ বলেছে ভাষা কথা, সবাই যাব মানে বুঝেছে : ও অমায়িক মধুর বচনে আর চিঁড়ে ভেজে না গো ! সকলে মুখের ভাবে তিরস্কার জানিয়েছে : কতকাল চুকেবুকে মাঠে মারা গেছে, আবার এ সব ভাঁওতা কেন ? তুমি কে যে তোমার তাগিদ সবার চেয়ে এত বেশি, মিষ্টি কথায় অনুমতি চাইছ জানিয়ে দিলেই সেই খাতিরে আমরা গলে যাব !

কিন্তু নানির কথা ভিন্ন।

সে অন্যভাবে দাবি জানায় এবং সবাই হাসিমুখে তার দাবি মেনে নেয়। ভিড়ের ফাঁক খুঁজে গলিয়ে ভিতরের দিকে যেতে যেতে নানি একটানা বুকনি শুরু করে চাল আটা মেপে কাপড়ে বেঁধে বিদায় হওয়ার আগে আর থামে না। তাব অর্ধেক কথা সকলের সঙ্গে, অর্ধেক আপনমনে এলোমেলো কথা।—নাতনিরা সব ভালো আছে ? আহা হা, বড়ো কষ্ট ভালো থাকা, কোনোদিকে কিছু ঠিক নাই, সব গন্ডগোল। আল্লায় নেয় না, গিয়াও তোমাগো মধ্যে খুঁটি গাইড়া আছি, তোমাগো ভালোই আমাব ভালো, আমার আবার ভালোমন্দ কী !—

রেশন নেবে নাকি নানি ?

হ, পোড়া পেট মানে না। নিজের রেশন নিজেই নিমু, নিজেই রাধুম পোড়া পেটের সেবা করুম।

নাও, তুমি আগে নাও।

এই থুরথুরে নড়বড়ে বুড়ি নিজের চেষ্টায় বেঁচে আছে আজকের দিনে এ যেন সকলের আনন্দ, সকলের গৌরব ! শহরের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মরণের বজ্র আঁটুনির ফস্কা গিরো যেন এই বুড়ি, শুধু টিকে থেকে একাই সে যেন ফাঁস করে দিচ্ছে মরণের বিরাট ষড়যন্ত্রের আসল ফাঁকি ! ইংরেজ-লিগ-কংগ্রেস-চোরাবাজার-গুন্ডা সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে চিরজীবী মানুষের এই গত শতকের লোলা চামড়া বাঁকা পিঠ সোনালি পাটের মুকুট-পরা কনেটি দিব্যি টিকে আছে। বস্তির দিদিমা, কেরানিপাড়ার দিদিমা, যারা খেটে খায় তাদের খাটুনে ঘুঁটে-কুড়োনি দিদিমা। কে হিন্দু, কে মুসলমান !

নানির ক-ছটাক আটা চাল ওজন হতে হতে সিল্কের অত্যধিক লম্বা বেখাপ্পা পাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় বয়সি জমকালো একটা মানুষ আসে। এককালে শক্ত জোরালো মানানসই চেহারা ছিল, এখন একটু নরম হয়ে মুটিয়ে যাওয়ায় বেঁটে-খেটে দেখায়, ছটাক মাপা আটা চাল তিন টাকা সের মাছ-মাংসের

যুগে শহরের রাজপথে ছড়ি হাতে ছোটোলোক জমিদারি সাজপোশাক চেহারা ও চালচলনে গুন্ডা মনে হয়। চুলের টেরি থেকে পায়ের পাম্প-শু পর্যন্ত শান্ত সমাহিত ভাবটাই সেকেলে রাজশাহি বাদশাহি প্রশান্ত উদার অত্যাচারের উগ্র হিংসাত্মক নকল। লোকটি সত্যই রাজা এবং তার প্রতাপও প্রচণ্ড—সে শহরের এই অঞ্চলের খ্যাতনামা গুন্ডারাজ সুবোধকুমার সিংহ।

যাদুগোপাল, আজ আটা চাই যে ?

পাবেন। কার্ডগুলো পাঠিয়ে দেবেন।

সুবোধ সিংহ একা মানুষ, তার বিয়ে-করা বউও নেই, আইনসঙ্গত বাচ্চা-কাচ্চাও নেই। কিন্তু তার তেত্রিশখানা রেশন কার্ড ! সাথী-অনুগতদের সে একশোর উপর বাড়তি কার্ড বিতরণ করেছে। প্রত্যেকটি কার্ড রেজেস্ট্রি করা।

সবাই চুপ করে থাকে, কেউ আড়চোখে তাকায়। সুবোধ একটা সিগারেট ধরায় আমেরিকান সিগারেট লাইটার থেকে। এভাবে রেশনশপে সে আসে না, আসার কোনো মানেও নেই। এ যেন কোনো উচ্চপদস্থ মিলিটারি, পুলিশ কর্মচারী বা কোনো মন্ত্রীর পায়ে হেঁটে রেশনের দোকানে খামখেয়ালি আগমন।

গজেন বলে, কেমন আছেন সুবোধবাবু ?

আছি। চলে যাচ্ছে।

ন্যাকড়ায় বাঁধতে গিয়ে নানির কিছু আটা পড়ে গিয়েছিল, তুলে লাভ নেই, সঙ্গে ধুলোবালিও উঠবে। নানি আপনমনে বলে, যাক, যাক। কাউযা খাইবো, পিপড়া খাইবো !

মুখ তুলে সুবোধকে বলে, কেমন আছ ?

সুবোধ বলে, আছি ভালো।

ভালোই আছ ? আল্লা !

সিগারেটে জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুবোধ বলে, তোমার ছেলের বউ নাকি ভেগেছে নানি ? কার সঙ্গে ভাগল ?

কী নিষ্ঠুর, কী কদর্য রসিকতা !

বউ ? বউ বড়ো ভালো।—নানি কখনও খাঁটি বরিশালি, কখনও খাঁটি কলকাতাই, কখনও মেশাল ভাষায় কথা কয়। এখন তার সুর টান কথা সব কলকাতায়।—ওটা কী কথা বলছ ? তুমি আমার নাতি, আমার ছেলের বউ তোমার মা। তোমার মা ভাগবে কেন, কার সঙ্গে ভাগবে ?

কয়েকজন হেসে ওঠে।

সুবোধ ছড়ি ঘুরিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। মুখ ফিবিয়ে একবার তাকিয়েও যায় না। বাজে গুন্ডা হলে হয়তো বিব্রত বোধ করত, চটে উঠত, মুখে কিছু না বললেও অন্তত ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শাসিয়ে যেত। অথবা হয়তো নিজেও হেসে উঠে হালকা করে দিত অপমানটা। কিন্তু সুবোধ রাজা, বড়ো বড়ো লোক তাকে খাতির করে, গভর্নমেন্ট তাকে ভুলেও ছোঁয় না। উপযুক্ত গুণ ছাড়া এ পদমর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। বেকুফ বললেও আরও বেকুফ বনার লোভ সে সামলাতে পারে।

ভূষণ তারিফ করে বলে, বেশ বলেছ নানি, ঠিক বলেছ !

জোর গলায় বলে—যেতে যেতে সুবোধও যাতে শুনতে পায়।

পয়সা দিয়ে ছটাক মাপা খাদ্য নিয়ে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে একে একে বিদায় নেয় ক্ষুন্ন ক্ষুধার্ত মেয়ে-পুরুষ। নটা বাজে, আপিসে কাজ অপেক্ষা করে আছে, জরুরি কাজ, সম্পন্ন করতেই হবে। ভোরে যে কারখানার কাজ চালু হয়েছে ভোরেই সেখানে চলে গেছে কাজ করার মানুষ, ধর্মঘট লকআউটে বন্ধ কারখানাগুলি ছাড়া। কোনো কোনো আপিস, কোনো কোনো কারখানা দশটায়, এগারোটায় খোলে। সাবান, লজেন্স, পাউডার মাইকা, হ্যান্ডমেড পেপারের ছুটকো কারখানা,

টাইম-শিফ্‌টের নিয়মকানুন এড়াবার এই কৌশল খাটায়। কাজ আরম্ভ করতে দশটা-এগারোটা বাজায়, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত এক শিফটে কাজ চলে ! ওভারটাইমের বালাই নেই।

এগাবোটা নাগাদ দোকান ফাঁকা হয়ে যায় যাদুগোপালের। তেল নুন ডাল মশলার খদ্দের দু-চারজন আসে যায়। টুনটুন ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা চলে, বড়ো রাস্তায় মাঝে মাঝে ট্রামের আওয়াজ শোনা যায়। ধর্মঘটের সময় ট্রামের লাইনে মর্চে ধরেছিল, ধুলোবালি আবর্জনায় প্রায় বুজে গিয়েছিল ইস্পাতের খাদ। ট্রামের চাকা যখন বন্ধ ছিল তখন বন্ধই ছিল। আবার যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন চলতেই থাকবে।

দিগন্ত কাঁপিয়ে মিলিটারি ট্রাক যায়। দোকানেব সামনে দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা গেলেও খানিকক্ষণ যেন নূপুর-ধ্বনির মতো সেই মধুর টুংটাং শব্দ কানেই পশে না।

বেশনের দোকান থেকে কেউ যায় বাজারে, কেউ যায় বাড়ি। বাজারে দু-চাবজনমাত্র যায়, নানির মতো যাদের আপিস নেই বা ভূষণের মতো যাদের রেশন নেওয়া বাজার করাই কাজের অঙ্গ বা গজেনের মতো যারা বেকাব। আপিসগামী লোক সকাল সকাল বাজার না সেরে রেশন দোকানে ধন্না দেওয়ার ফাঁদে ধরা দেয় না—রেশন মেলাব পব আর কোনোদিকে দৃকপাতের অবসর থাকে না। ঘড়িব কাঁটা যেন বুকেব কাঁটা হয়ে বিঁধে বিঁধে চলে।

বাজারে দু-পযসার পুঁই কেনে নানি, ছ-পয়সার এক ছটাক কুঁচো চিংড়ি। কুঁচো চিংড়ি, একটু গন্ধ ছেড়েছে, তারও দেড় টাকা সের। বাস্‌, ওতেই নানিব বাজার খতম। ঘরে দুটো পেঁয়াজ আছে, শিশিতে একটু তেল আছে, ভাঁড়ে নুন আছে, একরত্তি উনানে কাঠির মতো সবু করে চেরা কাঠ জ্বেলে নানি অন্ন প্রস্তুত করবে। আজকের দিনটিতেও নানির অন্ন জুটল !

উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা বস্তিব নোংরা মাটি-আবর্জনার সঙ্গে সর্বাঙ্গের মিতালি করে খেলা করছে। জল আনাব যুদ্ধ শেষ হওয়ায় মেয়েরা এখন ঘবেব কাজে মন দিয়েছে—

আল্লা ! নানিব জল তোলা হয়নি ! ঘবে একফোঁটা জল নেই। চোখ দুটি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসে, মাথা নেড়ে নেড়ে নানি নিজের চিন্তায় সায় দেয। হুঁ, বড়ো বাস্তার টিউবওয়েল থেকে গিযে জল আনতে হবে। জল তোলা বাকি পড়েছে, জল আনতে হবেই।

বেশন আনা নিয়েই মণির সঙ্গে নীলিমার কলহ হযে গেছে। গতরাত্রেই চাল-আটা সব ফুরিযেছে। বাত জেগে মণি শুয়ে ভেবেছে যে পরদিন সকালে কী উপায় হবে, বাড়ির এতগুলি মানুষ কী খাবে।

তুমি কেমন মানুষ গো নিশ্চিন্তি মনে নাক ডাকাচ্ছো ?

সুশীল চমকে জেগে বলেছে, কী হল ?

কী হল ? আমায় বলে দিতে হবে, কী হল ? অন্যের ঘাড়ে এসে চেপে দিব্যি ঝিমুচ্ছো ঘুমুচ্ছো, কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। তুমি কী গো ! আমার মরণ হয় না !

সুশীল ভয়ে ভয়ে বলে, কী করতে হবে না বললে—

বলে দিতে হবে কেন ? তোমার খেয়াল হয় না ?

অগত্যা সুশীলকে এবার চুপ করে গিয়ে আসল কথার জন্য অপেক্ষা করতে হয। রাতদুপুরে শুধু ঝগড়া করার জন্যই মণি নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙিয়ে ঝগড়া শুরু করেনি।

মণি কখনও অকারণে কলহ করে না বা মিষ্টিকথা বলে না, শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়। সে জন্য ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। বড়ো রকম অন্যায়ের জন্য মণি বকতে শুরু করেছে ভেবে সে গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিল !

এবার উঠে বসে একটা সিগারেট ধরায়।

তখন মণি সুর পালটে আসল কথা বলে।

যতীনবাবুর সঙ্গে না তোমার আলাপ আছে ?

ক্লাসফ্রেন্ড ছিল এককালে, এই আর কী !

কাল ভোরে উঠে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে চালের জোগাড় করবে। শুধু অন্যের ঘাড়ে খেয়ে নাক ডাকালেই চলবে না। আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব বলে রাখলাম !

আবছা আবছা রাত থাকতে মণি সুশীলকে ঠেলে তুলে দেয়, রাত্রে সে ভালো করে ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ জাগে। জামা পরে সুশীল পাড়ায় সরকারি পার্কটার দক্ষিণে প্রায় পার্কের মতোই বাগানওলা যতীন চক্রবর্তীর বাড়ির সদর গেটে হাজির হয়। সেই কবে যতীন তার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল, সে প্রায় ঐতিহাসিক ব্যাপার ! মণির তাগাদায় সে মাঝে মাঝে এক রকম গায়ের জোরে যতীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা মাঝে মাঝে করেছে, যতীন কোনোদিন তাতে খুশি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আবার সেই যতীনের দরজাতেই তাকে মাথা খুঁড়তে হবে—মণির হুকুমে !

বাগানের গেটে তালা চাবি নেই, হুড়কোও নেই ! স্পর্শ করতেই লোহার তৈলাক্ত গেট নিঃশব্দে খুলে যায়। বাগানে অবশ্য লাউ-কুমড়া-ঝিঙা-বেগুনের চিহ্নও নেই, শুধু মরশুমি বিলাতি ফুল। ফুল নিয়ে চোর কী করবে, লোহার গেট খুলে রাখলেও তাই এ বাগানে চোর ঢোকে না। তবু, দারোয়ান অবশ্যই আছে, দুজন।

বাড়ির দরজার সামনে নুড়ি-বিছানো ছোট্টো পথ, দুপাশে দুটি লোহার বেঞ্চি। একটা বেঞ্চিতে বসে মন খারাপ করে সুশীল নানাকথা ভাবে, মাঝে মাঝে হাই তোলে। মণি যাই বলুক, যতীন তার যতই এককালের ক্লাসফ্রেন্ড হোক, চারিদিকে আলো হয়ে রোদ ওঠার আগে যতীনের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার সাহস তার নেই। যতীন বিরক্ত হবে।

বসে বসে সুশীল ভাবে, শেলির কবিতা যেভাবে পড়িয়ে আসছে এগারো বছর, তার চেয়ে একটু অন্যভাবে পড়ানো যায় না এবার ? ইংরেজ কবি ছাড়া জগতে কি আর কবি জন্মায়নি ? ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক বলে কি তাকে শুধু ইংরেজ কবিদের কাব্য আর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করেই জীবন কাটাতে হবে ? ভোরে চালের সন্ধানে বেরিয়ে বন্ধুর বাড়ির সামনে লনে লোহার বেঞ্চে বসে এই কথা ভাবে সুশীল, কবিতা পড়াবার ব্যাপারেও এগারো বছর একটানা দাসত্ব করার কথা ! তীব্র ক্ষোভে চোখের সামনে সুন্দর ফুলগুলিও দেখতে পায় না। এ কী অসময়ে মনের অর্থহীন অবাধ্যতা ? আসলে সময় অসময় নেই, মন খারাপ হলেই ক্ষোভে দুঃখে মনের কাঁটা-বনে গড়িয়ে গড়িয়ে এইখানে এসে ঠেকে সুশীল—ইংরেজ কবিদের চিবিয়ে চিবিয়ে নিজে সে আখের ছোবড়ার মতো কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে। ছেলেরা কত রস পায়, তার শুধু দাঁতের কনকনানি।

অনেক বেলায় যতীনের সঙ্গে তার দেখা হয়। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, চেনা মানুষ, তবু এবার যতীন প্রথমে তাকে চিনতেই পারে না, পরিচয় দেবার পর বড়োই যেন আশ্চর্য হয়ে বলে, ও !

তারপর বলে, কী খবর ?

এমনি দেখা করতে এলাম।

যতীন হাসে। এ জগতে কেউ যেন এমনি দেখা করতে আসে তার সঙ্গে, কোনো স্বার্থ ছাড়াই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না যতীনের, স্বার্থের জন্য কাজ করায় মানুষকে সে মন্দ ভাবে না, জগতের সঙ্গে তার নিজেরও স্বার্থ নিয়েই কারবার। এখন কী করছ ?—এ প্রশ্নের জবাবে সুশীল বিখ্যাত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শুনে বরং একটু শ্রদ্ধাই যেন তার জাগে, কারণ এই পরিচয়টা শোনার পরেই সে তার জন্য চা আনতে বলে !

আগে সুশীল কয়েকবার এসেছে, তার পাঁচ-সাতমিনিট সময় নষ্ট করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সত্যই সে জানত না সুশীল ইংরেজির নামকরা অধ্যাপক !

একবার কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাজকর্ম কী কর ?

নিজেকে তুচ্ছ করার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সুশীল বিনয় করে বলেছিল, কী আর করব, মাস্টারি করি।

সেই থেকে যতীনের ধারণা ছিল, সে কোনো স্কুলের মাস্টারজাতীয় তুচ্ছ একটা জীব। সেদিন বিনয়টা না করলে পরে কয়েকবার সোজাসুজি অবজ্ঞা আব অপমানের বদলে একটু খাতির আর এককাপ চা অন্তত সুশীলের ভাগ্যে জুটত !

সুশীলের প্রয়োজন শুনে যতীন একটু আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে কেউ মন-দুই চালের ব্যবস্থার জন্য দরবার করতে আসতে পারে ভেবে তাব আমোদের সীমা থাকে না, এ যেন এক ঘটি জলের জন্য সমুদ্রে গমন ! সে তবু ছোটোখাটো ব্যক্তি, কেউ যদি সত্যিই এ রকম দুমুঠো চালের অনুরোধ নিয়ে স্বয়ং ফারুখসানির কাছে হাজির হয় ? ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টাতেই যতীনের হাসি আসে। বাশি রাশি ধানচাল নিয়ে লীলাখেলায় মশগুল হয়ে থাকায় যতীনের খেয়াল থাকে না যে দু-মন কেন, দু-সের চালের জন্য এই শহরে কত লোক হন্যে হয়ে বেড়ায়, না পেয়ে উপোস পর্যন্ত দেয় !

শুধু দু-মন ?

সুশীল খুশি ও কৃতার্থ হয়ে বলে, বেশি দিতে পারবে ? তাহলে তো ভালোই হয়। তিন মন দাও ?

বেশ মজা লাগছিল কিন্তু পুরানো দিনের বন্ধুব সঙ্গে মজা উপভোগেব সময় ছিল না। দেখা করার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছে, কাজ ও দায়িত্ব কোনোটারই তার অন্ত নেই। মৃদু হেসে খবরের কাগজেব কোণটুকু ছিঁড়ে যতীন জড়ানো দুটি অক্ষরে নিজের নাম লেখে। মুখে একটা ঠিকানা এবং একজনের নাম বলে দেয়।

এখানে গেলেই চাল পাবে।

কখন যাব ?

যখন খুশি। রাত বাবোটায় যেতে পার।

যতীন হাসে।

কত দাম পড়বে ?

যতীন হেসে বলে, দাম ? দাম না দিলে মনটা খুঁতখুঁত করবে ? বেশ, বেশনের দরে দাম দিয়ো।

একখানা লরি-চলাব মতো চওড়া গলি, তার মধ্যে সেকেলে ধাঁচের বহু পুরানো একখানা বড়ো বাড়ি, যেরকম বাড়িতে বিশেষভাবে আড়াল করা অন্দরমহল থাকত। এতবড়ো দোতলা বাড়ির সদর দরজাটি কিন্তু অত্যন্ত ছোটো। নীচের তলায় সামনের ঘর আর উঠানে কেরোসিন কাঠের তক্তা আর সমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পুরানো দিনের কোনো সম্ভ্রান্ত ধনীর বাড়ির নীচের তলায় প্যাকিং কেসের কারখানা হয়েছে—একদিন যেখানে ঝাড়লণ্ঠন-ফরাশের শোভায় আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত মানুষ ও চাকর-দারোয়ানের সমাবেশে জীবনের সমারোহ চলত।

কাকে চান ?

যতীনের বলে দেওয়া নাম বলতেই পাশে অনঙ্গভূষণের পার্টিশান-করা ছোটো অফিসঘরে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরানো জং-ধরা কালচে-মারা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর খানকয়েক

তেমনি পুরানো মোটা কাঠের চেয়ার নিয়ে অফিস। মিলিটারি প্যাটার্নের খাকি ট্রাউজার ও বুশ-শার্ট পরা বছর ত্রিশ বয়সের স্মার্ট চেহারা অনঙ্গকে এই পরিবেশে বড়োই খাপছাড়া দেখায়।

সুশীলকে অনঙ্গ খাতির করে বসায়। যতীনের ইনিশিয়াল করা ডাকটিকিটের মতো কাগজের টুকরোটি দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকায়। কিন্তু ও বিষয়ে কিছু বলে না। দিন-কাল, কংগ্রেস-লিগ সংঘর্ষ, মন্ত্রী মিশন, নোয়াখালি, কলকাতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে আলাপ করে। এই সবই আজকাল এ রকম চলতি ভদ্রতা রাখার ও সাধারণ আলাপ-আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যত্র ও সর্বত্র এ সব বিষয়েও অবশ্য আলোচনা চলে তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাল-ডাল আটা-ময়দা তেল-নুন চিনি-কাপড় ও বেতন-মজুরির আলোচনাই প্রধান।

খানিক কথা চালিয়ে অনঙ্গ চুপ করে এবং অন্যমনস্ক হয়। অর্থাৎ এবার সুশীলের আসল কথা বলার পালা।

কিছু চালের জন্য এসেছিলাম।

অনঙ্গ মৃদু হেসে বলে, তা জানি। কত চাই ?

যতীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে অন্যায় ও অতিরিক্ত দাবি করেছে এইভাবে কাঁচুমাচু করে সুশীল বলে, যতীন বললে মন তিনেক পাওয়া যাবে।

অনঙ্গ থ বনে হাঁ করে চেয়ে থাকে। যতীনের চেয়েও সে যেন বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছে তিন মন চালের অনুরোধ শুনে ! পরক্ষণে তার চোখে-মুখে ঘনিয়ে আসে সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। চালের কারবারের শত্রুপক্ষের চর নয়তো লোকটা ?

একটু বসুন।

উপরে গিয়ে যতীনকে টেলিফোন করে মুখভরা কৌতুকের হাসি নিয়ে সে ফিরে আসে, বলে কীসে নেবেন চাল ?

সুশীল কিছুই আনেনি।

এ সমস্যার সমাধান অনঙ্গই করে দেয়। একটা শতরঞ্চিতে চালগুলি এমন কায়দায় বেঁধে দেয় যে দেখে অবিকল বাঁধা বিছানার বান্ডিল মনে হয়। একটা রিকশাও সে-ই আনিয়ে দেয়।

বলে, গুড বাই !

থ্যাঙ্কস ! থ্যাঙ্কস !

এত কষ্টে জোগাড় করা চাল, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য চাল, একেবারে প্রথম শ্রেণির সেরা তিন মন চাল ! স্বামী যেন অসম্ভব সম্ভব করেছে—গর্বে মণির বুক ফুলে ওঠে !

কিন্তু হায়রে এ বাড়ির মানুষের অদ্ভুত রীতিনীতি চালচলন, এ চাল পেয়েও যেন খুশি হল না বাড়ির লোক, কৃতজ্ঞ হল না মণির কাছে !

নীলিমা মুখভার করেই জিজ্ঞাসা করে, কোথা পেলেন এত চাল ?

বিব্রত সুশীল বলে, আমার একজন জানাশোনা লোক জোগাড় করে দিয়েছে।

এভাবে চাল কেনা ঠিক নয় !

মণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, কেন, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কেনা হয় না ?

নীলিমা বলে, সে আমরা কিনি খোলা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে। না খেয়ে তো মরতে পারে না মানুষ ? দশজনে কেনে, আমরাও যেটুকু দরকার কিনি। এ তো তা নয়।

কেন নয় ? তফাতটা কী হল ? এক গাদা দাম দিয়ে কিনতে হত, এ চাল বরং কনট্রোলের চেয়ে সস্তা দরে পাওয়া গেছে।

সেটা বুঝি তফাত নয় ? দশজনের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কেনা আর যারা ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চুপিচুপি সস্তা দামে জোগাড় করা এক জিনিস ?

কেন নয় ? সেও চাল, এও চাল !

তুমি বুঝবে না। তোমার সে বুদ্ধি নেই।

এ বাড়িতে এসে এমন কঠিন কথা মণি আর শোনেনি।

গোকুল ফোড়ন দিয়ে বলে, এই সোজা কথাটা বুঝলেন না ? এমনি চাল কিনলেও চোরাকারবারিকে কন্‌ডেমন্‌ করা যায়—বাধ্য হয়ে চোরাবাজারে চাল কিনতে হয় বলেই করা যায়। কিন্তু চোরাকারবারিকে খাতির করে চাল কিনে কোন মুখে তার নিন্দে করবেন ?

মণি কথা কয় না !

মণির আরক্ত মুখ দেখে প্রণব তাড়াতাড়ি বলে, যাক যাক। অত সূক্ষ্ম তর্কে কাজ নেই। কয়েকটা দিন তো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

মণি এবার ঝাঁঝের সঙ্গে নীলিমাকে বলে, তোমাদের সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি !

প্রণব আবার বলে, যাক যাক। যেতে দাও।

কেউ আর কিছু বলে না।

মেয়েদের নীতিগত তর্ক কলহেই পরিণত হয়। একটা প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেলে মণি খুশি হত। কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে কলহ চলে না, প্রণবের হস্তক্ষেপের পর কেউ আর তার সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজি নয়। এটাই অসহ্য ঠেকে মণির। নিজের ওপর তার ঘেন্না ধরে যায়। কী এমন বোঝাপড়া আছে ওদের সকলের মধ্যে সে যা বোঝে না ? কী এমন মহাপাপ সে করে এসেছে সারা জীবন আর কী এমন মহৎ জীবন এরা যাপন করেছে যে সর্বদা সে অস্পৃশ্য হয়ে আছে, কারও মনের ছোঁয়াচ পায় না ?

হিংসায় বুক জ্বলে যায় মণির। সেই জ্বালায় সে খুঁজে নেয় এ বাড়ির সবচেয়ে নিরীহ মুখচোরা চিদানন্দের সঙ্গ। চিদানন্দ নামে এ বাড়িতে যে কেউ একজন থাকে এটা যেন সত্যসত্যই একমাত্র সে আবিষ্কার করেছে তার মমতা দিয়ে মানুষ বশ করার অদ্ভুত প্রতিভার জোরে। মমতায় সব মানুষ বশ হয় না আবার মনে-প্রাণে বশ না হলে, অথবা অন্তত বশীভূত হবার যোগ্যতা না দেখালে, মমতা করাও সম্ভব হয় না মণির পক্ষে। তাকে তাই মানুষ খুঁজে পেতে বেছে নিতে হয়।

একেবারে কাদার মতো নিরীহ মেরুদণ্ডবিহীন মানুষও আবার তার ভালো লাগে না, তার মমতায় গলে যেতে চাইলেও নয়। এটাই হয়েছে বিপদ। অন্য সব বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শক্ত মানুষ হবে, নরম হবে শুধু তার মমতা মেনে নেবার বেলা, এ রকম মানুষ সংসারে খুঁজে পাওয়া ভার।

অল্পবয়সি প্রণবকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই প্রণবের দ্বিতীয় সংস্করণ আজ পর্যন্ত আর মিলল না। অগত্যা রুগ্‌ণ নির্জীব চিদানন্দকেই পছন্দ করতে হয়।

বিয়ের ছ-মাস পরে চিদানন্দের টি-বি-র লক্ষণ ধরা পড়েছিল। তাই শুধু তার ফরসা মুখখানা ফ্যাকাশেই হয়ে যায়নি, সরস্বতীর কাছে লজ্জায় দুঃখে সে কেঁদেও ফেলেছিল। গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়ায় রোগটা কেটে গেছে, কিন্তু ছায়া রয়ে গেছে জীবনে। গাঢ় ছায়া।

মাঝে মাঝে পরীক্ষা করাতে হয়।

পরীক্ষার ফলটা জেনেছেন ? মণি প্রথম প্রশ্ন করে। একটু উদ্‌বেগ, একটু ব্যাকুলতার সঙ্গে।

হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। তবে কি না—

চিদানন্দ নিশ্বাস ফেলে হতাশা-ভরা চোখে তাকায়। মণিকে দেখলেই তার ভয় বেড়ে যায়। মণি এত বেশি সহানুভূতি দেখায় যে মনে হয় মণি যেন কোনো গোপনসূত্রে জানে রোগটা তার সারেনি, তার বাঁচার আশা-ভরসা কম।

তার মানে ? মণি বলে। চিদানন্দের ভাবটা এমন ভীতিকর !

ডাক্তারবাবু বললেন, স্বাস্থ্য আরও ভালো হওয়া দরকার। আরও পুষ্টি চাই। পুষ্টিকর জিনিস খেতে বললেন, দুধ মাখন ঘি এই সব—

স্তন্য-বঞ্চিত শিশুর মতো চিদানন্দ মণির দিকে তাকায়। কথা সে এমনিভাবেই বলে, ভেঙে ভেঙে একটু একটু করে অল্পে অল্পে।

তা সত্যি। সকালে শুধু আধকাপ দুধ খান। ওতে কী হয় ? আপনার বেশি করে দুধ খাওয়া উচিত।

এখানে পালিয়ে আসার আগে নিজের বাড়িতে নিজের ব্যবস্থায় সে কী কী খেত তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করে চিদানন্দ বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে ! সে বাড়িটা তার নিজের, অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে যা আয় হত তার সঙ্গে চাকরিব টাকায় এক রকম চলে যেত, তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছিল। এখানে আর কী করে সম্ভব হয় সেসব !

মাসে মাসে তার চাকরির টাকাটা শুধু এখানে সম্বল।

তা বললে কী চলে ? যার যেটুকু দবকার করতেই হবে। ঠাকুরপোকে বলে—

চিদানন্দ আঁতকে উঠে বলে, না না, ও সব বলবেন না ! ও কী করবে ? কেন করবে ? ওর কিছু করার নেই। ঘি-দুধ আমিই খেতে পারি, বাড়ি ভাড়ার আযটা গিয়ে মুশকিল হয়েছে। বুঝলেন না ?

এক পরিবারের মানুষের চেয়েও এ বাড়ির লোকেদের মধ্যে এমন আপনভাব, প্রেমোচ্ছ্বাস বা হিংসা-বিদ্বেষের এমন অভাব যে সব সময় মণির সত্যি খেয়াল থাকে না এখানে বাপ ভাই মা বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ঘরোয়া পরিবার বাস করে না। অতি বড়ো দুর্দিনে নিদারুণ বিপদ তাদের এখানে একত্র করেছে, একসঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনে সকলের এই সুস্থ বাস্তব একতা। তাব বেশি কিছু নয়। প্রণব কাউকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে এ প্রশ্নও যেমন ওঠে না, কারও বেশি রকম স্বার্থত্যাগ বা বিশেষ সুবিধা চাওয়ার প্রশ্নও তেমনি আসে না।

এ মিলিত জীবন এদের খেয়াল নয়, নাটুকেপনা নয়,—সহজ সরল হিসাব যে সকলের মিলিত এই জীবনকে যত দূর সম্ভব সুস্থ ও সুন্দর করায় সবারই লাভ। যতটুকু সামঞ্জস্য চলতে পারে, এভাবেই তা সম্ভব হয়েছে, একজনের বিশেষ সুখ-সুবিধার প্রয়োজনকে তার চেয়ে বেশি বড়ো করা দুর্বল মনের অবাস্তব আসার কল্পনা। সে ভাবপ্রবণতার লেজুড় জুড়লে এই অপরূপ একবেলাও টিকবে কি ?

মণিও জানে, তা টিকবে না। এ সত্যটার মুখোমুখি হলে মণি মোটামুটি আসল কথাটা বুঝতে পারে, কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছে এমন অদ্ভুত আর অনভ্যস্ত যে জিইয়ে রাখতে পাবে না, ভুলে যায়। সতাই তো, এই খুন-জখম অগ্নিকাণ্ড কারফিউর জগতে এর চেয়ে স্বস্তিতে—এর চেয়ে ভালোভাবে চিদানন্দ কোথায় আর থাকতে পারত ? মরণের আতঙ্কে স্তব্ধ নিজেদের সেই এলাকায় গলির ভিতরে বাড়িতে একক অসহায় দিনযাপনের কথা কল্পনা করে মণি শিউরে ওঠে !

ভূতপূর্ব টি-বি রোগী চিদানন্দ, ভালো থাকা ভালো খাওয়ার সঙ্গে যার মরা-বাঁচার সম্পর্ক, তার মন পর্যন্ত এতখানি সবল যে বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থার কথা প্রণবকে বলার নামেই সে আঁতকে ওঠে—সেও জানে যে তার প্রয়োজন আছে বলেই কারও কাছে অবাস্তব দাবি তোলার মানেই হয় না। হোক সে বন্ধু হোক সে আত্মীয়।

সে-ই কেবল এ বাড়িতে এসেও হৃদয়ের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগ খুঁজছে। যে বাস্তবতা সত্য ও সুন্দর তাকে বাতিল করে খুঁজে বেড়াচ্ছে একপেশে স্বার্থপরতার রঙিন হীনতাকে। স্বামীপুত্রের ছোট্ট সংসারটিতে অবিরাম চেষ্টা করেছে যা হয় না তার কত ছোটো ছোটো রকমারি কল্পনাকে সত্য করতে, এখানেও টেনে চলেছে তারই জের।

সন্নেহে তাই সে এ রকম খাপছাড়া প্রশ্নও করে চিদানন্দকে, এখানে আপনার ভালো লাগছে তো ?

চিদানন্দ ইতস্তত করে বলে, ভালো লাগছে, তবে কি না, কী জানেন, এ অবস্থায় কিছু ভালো লাগে ? চারিদিকে এত হাঙ্গামা, কষ্ট করে থাকা আব কী। সবারই সমান কষ্ট।

তবে ? এ তো বড়ো মুশকিল হল মণির ! এখানে এভাবে থাকতে কষ্ট হয়, ভালো লাগে না, তবু থাকতে হচ্ছে বলে আপশোশ বাদ দিয়ে শুধু নয় একেবারে বাঁচার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেও হয় ! এ কী খাপছাড়া কথা যে বিপদ-আপদে দুঃখে-কষ্টে মানুষ বিব্রত হবে না, ব্যাকুল হবে না, হা-হুতাশ করবে না ?

সরস্বতী বমি করছিল, শব্দ শুনে তারা বারান্দায় যায়।

খালিপেটে জল খেয়েছিলে, না ?

মণি সবজান্তার মতো বলে !

বিছানায় গিয়ে সরস্বতী ক্রমাগত বেঁকে বেঁকে গুটলি পাকিয়ে শোবার চেষ্টা করে। দেখে বিছানায় উঠে তার জামার বোতাম আর কোমরে শাড়ির বাঁধন আলগা করে দিতে দিতে মণি চিদানন্দকে বলে, আপনি একটু বাইরে যান, বমি করতে খিঁচ ধরেছে, ডলে দিতে হবে।

নীলিমা ঘরে ঢুকতেই সমস্ত অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, মুখে রোচে না, না খেয়ে রয়েছে, একটু নজরও রাখতে পার না ?

নীলিমা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। কিছু বলে না।

অল্পক্ষণ পরেই সরস্বতী তার হাতটা বুকে চেপে ধরে মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে।

উঠলে কেন আবার ? শুয়েই থাকো না ?

না, উঠি, কমে গেছে, খবর শুনি গে একটু।

গা গুলিয়ে বমি কবে খিঁচ ধরে বিছানা নিয়েছিল পোয়াতি মেয়েমানুষ, খবর শোনার তাগিদে সেও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। ঘটনার পর ঘটনার সর্বগ্রাসী বিরাট বন্যা নেমেছে জগতে, এ দেশে, এই নগরে, জীবনের সমস্ত ভিত্তি পর্যন্ত যেন ভেঙে-চুরে ভাসিয়ে নিয়ে আবার আগাগোড়া নতুন করে গড়বে। কী হচ্ছে, কী হবে জানার জন্য দেহ-মন আকুল উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। রাত্রির আসরটির নেশা তাই প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসেছে সকলকে। সারাদিন প্রাণের ধান্ধায় বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এদিক ওদিক চরে বেড়ায়, কুরুক্ষেত্রের রঙ্গভূমিতে পরিণত হলেও মানুষের চবে বেড়ানো একেবারে রদ হয়নি। হলে অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুও রদ হয়ে যেত সেই সঙ্গে—যে শ্মশানে প্রেতও চরে বেড়ায় না সেখানে হাওয়ার সঙ্গে হাঙ্গামা করার সাধ কার হবে। দিনান্তে একে একে সকলে বাড়ি ফেরে, খিদের তাগিদে তাড়াতাড়ি সকলের খাওয়ার পালা শেষ হয়, ধীরে ধীবে খোলা ছাদে বা কোনো বড়ো ঘরের মেঝেতে আসর গড়ে ওঠে। পাড়ার জানাশোনা লোক দু-একজন আসে, কিছুক্ষণ বসে, খবরাখবর বলাবলি করে, আলোচনায় যোগ দেয়, তারপর যেমন বিনা সমারোহে এসে বসেছিল তেমনিভাবে উঠে চলে যায়।

প্রথমে মণির কাছে যা শুধু গল্প-গুজব হাসি-খেলায় সময় কাটাবার খাপছাড়া আড্ডা বলে মনে হয়েছিল তার আর একটা দিক ক্রমে ক্রমে এখন স্পষ্ট হয়েছে। চারিদিকে যে সব কাণ্ডকারখানা চলার ফলে ঝড়-বাদলের অন্ধকারে বন-বাদাড়ে হারিয়ে যাবার মতো দিশেহারা ভাব জাগে, চব্বিশ ঘণ্টা ভীত বিভ্রান্ত হয়ে থাকতে হয়, সকলের এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে সেটা অনেকখানি কেটে যায়।

সুস্থ বাস্তব চেতনা ফিরে পেতে সাহায্য হয়।

চার

ছোটো হোক বড়ো হোক রাত্রের আসরটি রোজই বসে।

কে কোথায় কোন সূত্রে কী দেখেছে শুনেছে জেনেছে বুঝেছে, কোন বিষয়ে কে কী ভাবছে, তাই কথা-গল্প তর্ক-বিতর্কের মধ্যে এলোমেলো ছাড়া-ছাড়াভাবে জমতে জমতে ক্রমে একটা সংগঠিত ধারণার রূপ নেয়। বিহ্বল চিন্তা এগিয়ে চলার পথ পায়, শৃঙ্খলা পায়। আসরে গিয়ে বসার জন্য মণিও ক্রমে ক্রমে উৎসুক হয়ে উঠছে।

নটার মধ্যে আজ প্রণবও বাড়ি ফিরেছে, তার শরীর ভালো নয়। আজ ঘরোয়া বৈঠকটি বেশ বড়ো হয়েছে, পাড়ার চেনা যারা মাঝে মাঝে আসে তাদেব ক-জন ছাড়াও নতুন তিনজন এসেছে— মণি বা সরস্বতীরাও যাদের আগে দেখেনি।

দুটি অল্পবয়সি তরুণ, দেখে প্রথমেই অনুমান হয় যে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। কারণ, কম খেয়ে বেশি খাটার রুক্ষ কঠোরতার সঙ্গে অদ্ভুত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা মেশানো চিবন্তন ছাপটা আছে, গান্ধীজিও যে ডিসিপ্লিনের প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে গভীর আত্মবিশ্বাস মেশার যা বাইরের রূপ। এ রকম রোগা রুক্ষ ছেলে একটু লাজুক আর চঞ্চল হয়, কখনও স্থির হয়ে বসতে পারে না, প্রায় উশখুশ করার মতোই অকারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের টুকটাক নড়াচড়া চলতেই থাকে, মুখের ভঙ্গি ক্রমাগত বদলায়, দৃষ্টি হয় নত হয়ে থাকে নয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক সঞ্চালিত হয়। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, সংসারে অর্থ, সাজপোশাক আর ললিত-কান্তির অভাব মোটেই তাদের অপরাধ নয় বরং দামি জামাকাপড় আর প্রসাধনের পালিশে চকচকে চর্বির ভোঁতা লাবণ্য যাদের আছে তাদেরই, এ সহজ শিক্ষাটা তাদের কে দেবে ? এ ছেলে দুটির শান্ত ভাব, নির্ভীক সরল দৃষ্টি—এবং তাতে বাস্তবতার মর্মগ্রাহী গভীরতা ! অন্যজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, শ্যামবর্ণ সুশ্রী চেহারা, একমাথা ঘন কালো চুল। পাড়ার উকিল বিনোদবাবুর সে মেজোজামাই, পূর্ববঙ্গে বাড়ি, নাম মনোমোহন। আজ ভোরে সে এসে পৌঁছেছে, তার কাছে পূর্ববঙ্গের কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা গেল। শুনতে শুনতে সকলে মূক হয়ে যায়, নরক এখানেও গুলজার হয়ে আছে তবু সেই সুদূর নোয়াখালির ঝাঁঝটাই যেন বেশি তপ্ত লাগে।

বৈঠকে নবাগত ছেলেদের একজন আচমকা প্রশ্ন করে, ভালো দিক দ্যাখেননি কিছু ?

ভালো দিক ? মনোমোহন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকায, এই পাশবিক কাণ্ডের ভালো দিক ?

প্রণব বলে, অমল খুন-জখমের ভালো দিকের কথা বলেনি। ও সব ঠেকাবার চেষ্টাও তো হচ্ছে।

তুমি কী করে জানলে হচ্ছে ?

এ বৈঠকে মণি এ পর্যন্ত মুখ খোলেনি। আজ হঠাৎ তাকে কথা বলতে শুনে সকলেই তার দিকে তাকায়।

প্রণব বলে, খবর পাচ্ছি।

বানানো খবর।

দাঙ্গার খবরগুলি বানানো নয়, শুধু এই খবরগুলি বানানো ? এ তোমার গায়ের জ্বালার কথা।

আমার আবার গায়ের জ্বালা কীসের !

গায়ের জ্বালা সবারই আছে। সেই সঙ্গে বিচারবুদ্ধিটা ঠিক থাকলেই মুশকিল হয় না। দাঙ্গা হলে সেটা ঠেকাবার চেষ্টা হতে বাধ্য। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা হতে পারে না।

প্রণবের কথায় দ্বিধা নেই, অস্পষ্টতা নেই। সে যেন ঘোষণা করছে যে অসভ্যতা থাকলেও মানুষ অসভ্য নয়, সভ্যই ! তবে সভ্যতা, মানবতা ইত্যাদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কথাগুলি নিয়ে অসভ্য

এবং অমানুষেরাও নানান কায়দায় এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে সোজা স্পষ্ট মানে একটু গুলিয়ে গেছে মানুষের কাছে।

তাই, শুধু মণি নয়, আরও কেউ কেউ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মণি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে, কেন হতে পারে না ?

সাধারণ মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চায় না বলে। ও সব তাদের স্বার্থের বিরোধী বলে।

মণি সংশয়ভরে বলে, তাই নাকি ! যুদ্ধ তাহলে শুধু অসাধারণ লোকেরা করে, সাধারণ লোক নামে না ? এ হাঙ্গামা থেকে সাধারণ লোক বাদ পড়েছে, তারা দাঙ্গা করেনি ?

প্রণব সংক্ষেপে জোর দিয়ে বলে, না, করেনি। সাধারণ মানুষ যুদ্ধেও নামে না দাঙ্গাও করে না।

আজ মণি প্রথম মুখ খুলেছে ! প্রণব বুঝি তাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে দিয়ে বোঝাতে চায় এ সব তোমার অনধিকার চর্চা ?

মুখ লাল করে মণি বলে, তামাশা করছ ?

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, না, এ কী তামাশার ব্যাপার ? একটু ঘুরিয়ে বলি তাহলেই বুঝতে পারবে। সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে নামানো হয়, তাদের দিয়ে দাঙ্গা করানো হয়।

ওঃ ! তোমার সেই সূক্ষ্মবিচার !

সূক্ষ্ম মোটেই নয়, খুব মোটা বিচার। একেবারে গোড়ার বিচার।

এ বিচারটা ভুলে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। এটাই আজ সবচেয়ে বড়ো কথা। সাধারণ মানুষকে আজও কমবেশি ভোলানো যায় খ্যাপানো যায় কিন্তু সহজে সস্তায় না ভুলবার না খেপবার ঝোঁকটাই বেশিরকম জোরালো। আজ তাদের একটা যুদ্ধে নামাতে পৃথিবী জুড়ে ওলট-পালট ঘটনার মতো বিরাট ব্যাপার ঘটাতে হয়। ধর্মের নামে জাতের নামে একটা ছুতো দেখিয়ে ডাক দিলেই মানুষ আর যুদ্ধে নামে না, দাঙ্গা করে না। যুদ্ধ বাধাতে হিটলারদের কী মহামারী কাণ্ড করতে হয়েছিল মনে নেই ? দুশো বছরের গদি আপসে ছেড়ে দিতে না চেয়ে ইংরেজের সাধ্য ছিল না এ রকম দাঙ্গা বাধায়।

মনোমোহন বলে, ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে বইকী ! আমাদের গ্রামেই প্রায় বেধে গিয়েছিল, বাধলে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। চেষ্টা করেই সেটা ঠেকানো গেছে। এ রকম চেষ্টা ছাড়াও কত রকম দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটা ঘটনা শুনুন। ছোটোভাই দলে ভিড়ে গিয়ে একজনের ঘরে আগুন দিয়ে এল, তার রাগ ছিল। প্রাণের মায়া ছেড়ে বড়োভাই সেই বাড়ির সকলকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখে প্রাণ বাঁচাল। ছোটোভাই বাড়ি ফিরে ব্যাপার দেখেই একেবারে খেপে গেল—তখুনি বেরিয়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে। বড়োভাই দরজা আগলে বসে রইল সারারাত, খবর দিতে যেতে হলে আগে তাকে খুন করে যেতে হবে।

মণি আজ প্রথম মুখ খুলেছে। সব বিষয়েই তার কথা বলা চাই। সে বলে, দেখুন, ও রকম দু-চারটে ভালো লোক সব জাতেই থাকে। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

প্রণব মনোমোহনকে বলে, বড়োভাইটা নিশ্চয় পাগল ছিল ? নয়তো কোনো পার্টির মেম্বার ছিল ? নয়তো সাহিত্যিক ছিল ? তাও যদি না হয়, তবে নিশ্চয় ভগবান কিংবা আল্লার খামখেয়ালে সৃষ্টিছাড়া অসাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেছিল !

মণির মুখ আবার লাল হয়ে যায়।

মনোমোহন অস্বস্তির হাসি হেসে একটা বিড়ি ধরায়।

প্রণব বলে, না না, কথাটা তুচ্ছ নয়। এ রকম ছাড়া ছাড়া দু-পাঁচটা ঘটনার কথা আমরা শুনি। নিজেরা দু-একটা দেখেও থাকি। অনেকেই মনে করে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা—একসেপ্শন ! এ সব

ঘটনা থেকে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু কেন তা করা যাবে না ? আগে থেকে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে ঘটনাটা তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে অবশ্যই মনে হবে, ঘটনাটার কোনো মানে নেই, হঠাৎ ঘটে গিয়েছে। কিন্তু আগে ঘটনাটার মানে বুঝে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় ? তখন দেখা যাবে সব জাতের মস্ত মস্ত মহাপুরুষ ক-জন যেমন হঠাৎ জন্মাননি, এ রকম ঘটনা কটাও হঠাৎ ঘটেনি। দশজনের মধ্যে আগে অল্পবিস্তর মহান ভাব, মহত্ত্ব জাগে—তবেই সেই ভাবের একজন মহাপুরুষের জন্ম সম্ভব হয়। দশজনে কাজে পারে না কিন্তু মনে মনে এ রকম ঘটনা যখন কামনা করে, তখনই একজনের পক্ষে সেটা ঘটানো সম্ভব হয়।

সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, মণি পর্যন্ত। প্রণবের গলা চড়েনি, চোখে-মুখে ভাব-তরঙ্গের লীলাখেলার ছাপ পড়েনি, বক্তৃতা দেবার মতো করে সে কথাগুলি বলেনি। তন্ময় হয়ে গেলেও তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সকলের মুখে বৈজ্ঞানিকের মাপকাঠির মতো সঞ্চালিত হয়েছে—কে কতটুকু বুঝছে, কার শুধু ভাবাবেগ ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে সাময়িকভাবে।

সুশীল যেন কোথায় গিয়েছিল। এতক্ষণে ফিরে এসে আজ বেশি লোকের বৈঠক দেখে এবং মণিকে সকলের সামনে বসে থাকতে দেখে সে একমুহূর্ত ইতস্তত করে। তারপর যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে নিঃশব্দে বৈঠকে গিয়ে সবার পিছনে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরায়।

প্রণব হঠাৎ সুর পালটে সোজা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে সুশীলের সিগারেট ধরাবার প্রক্রিয়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, যেমন ধরা যাক ওই দেশলাই কাঠিটা জ্বালানো। ওটা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? তুচ্ছ একটা দেশলাই কাঠির সঙ্গে মানুষের সভ্যতা, মানুষের ইতিহাস জড়িত রয়েছে।

সবে সিগারেট ধরাচ্ছিল, ভড়কে যাওয়ায় সুশীলের হাত থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা তার কোলে জামাকাপড়ের উপরে পড়ে যায়। থাপড়া দিয়ে সহজেই সেটা নিভিয়ে ফেলা যায় কিন্তু ঠেকানো যায় না পাঞ্জাবির গায়ে ছোটো একটি পয়সার মতো ফুটো হওয়া।

সামান্য ব্যাপার। কিন্তু একমুহূর্তে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় আজকের বৈঠকের গভীর গাম্ভীর্য। যে ভাবটা সঞ্চারিত হয়েছিল সেটা উপে যায়। মনে হয়, প্রণব যেন সাধারণ একজন অধ্যাপকের মতোই কয়েকজন আনাড়ি ছাত্রছাত্রীর ইতিহাস কাব্য বিজ্ঞান ধর্ম অর্থনীতি যুদ্ধ শান্তি সব বিষয়ের ছাঁকা মর্মটুকু বুঝিয়ে দিতে চেয়ে নতুন কথা বলার প্রতিভায় সকলের মন হরণ করেছিল কিন্তু একজন দুরন্ত ছাত্র যেমন একটা প্রশ্নে বিদ্যায়তনের বিদ্বান অধ্যাপকের জমানো ক্লাসটা গলিয়ে দেয়, সুশীল তেমনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে প্রণবের ক্লাসটি ভেস্তে দিয়েছে।

অনেক রাত হয়েছে।—মনোমোহন বলে।

আপনি আজ এখানে খাবেন।—মণি বলে।

অমল ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি যাচ্ছি। বাস পাব না।

মণি বলে, তুমিও আজ এখানে খাবে। এখানেই শোবে।

নীলিমা বলে, কী হল তোমার ?

মণি বলে, কিছু হয়নি। এদের আজ এতরাত্রে যেতে দেওয়া যায় না। আমি নয় কিছু খাব না। আমি নয় আজ রাতটা কয়লাগাদায় চট মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেব।

মণি উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথার আঁচল খুলে কোমরে জড়িয়েছে। তার সঙ্গে ঝগড়া না করে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করা সম্ভব নয়।

প্রণব ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, এ কী, সাড়ে নটা বাজে। ট্রাম-বাস সব তো বন্ধ হয়ে গেছে।

সুতরাং মণির কথাই টিকে যায়।

শুধু আজ রাতটুকুর জন্য। মণিও তা বোঝে। সে তাই ভাবে, এই লোকাকীর্ণ বাড়িতে কাল কোথায় সে একটু কাঁদবে—সকলের চোখ এড়িয়ে কান এড়িয়ে নিজের মনে ? তবে সেটা কালকের

কথা। আজ সে জয়ী হয়েছে। আজ এ বৈঠকে এতক্ষণ ধরে সোজাসুজি হোক ঘুরিয়ে হোক প্রণব কথা বলেছে তর্ক করেছে এক রকম তারই সঙ্গে। মণি প্রস্তাব করে, তবে আরও কিছুক্ষণ বসা যাক। না, খাওয়াদাওয়া আগে হবে ?

হবে ?

খাওয়া তো আছেই।

সেই ছেলেটি,—নীলিমার ভাই গোকুল !

মণি বলে, তুমি তো কিছুই বলছ না গোকুল !

শুনছি। বুঝতে চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষ মানে তো মজুরচাষি ?

গোকুলের কথা শুনে সকলেই প্রায় হেসে ওঠে, প্রণব পর্যন্ত। মণি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। এত সহজে আবার ধাতস্থ হয়ে গেল আসরটা ! প্রণবের তো অন্তত খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকা উচিত ছিল।

প্রণব বলে, মজুরচাষি তো বটেই। তার সঙ্গে গরিব মধ্যবিত্ত সবাই।

নীলিমা ভাইকে বলে, এটাও জানিস না তুই এতদিনে ? শুধু কবিতা লিখলে হয় না !

গোকুল বলে, তোমরা যে সব গোল পাকিয়ে দাও ! প্রণবদা বললেন, একটা মানুষকে ধরে সাধারণ মানুষের ঝোঁকটা কোনদিকে ধরা যায়। মজুরচাষি মধ্যবিত্ত সবাই তাহলে এক রকমভাবে নিচ্ছে সবকিছু, সবার রিয়্যাকশন এক রকম ?

সবাই প্রণবের দিকে তাকায়। নাঃ, গোকুল ছেলেমানুষের মতো কথা বলেনি !

মনে হয় গোকুলের প্রশ্ন শুনে প্রণব খুশি হয়েছে। সে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। এতক্ষণ মিছে বকেছি, আমার কথা কেউ ধরতে পারোনি। একটা বিষয়ে আলোচনা শুরু করে আমরা খানিক পরে বিষয়টা ভুলে যাই, সেটাই হয়েছে মুশকিল ! কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি খেয়াল থাকে না।

মণি ধৈর্য হারিয়ে বলে, তুমি বড়ো বক্তৃতা করো ঠাকুরপো। সোজাসুজি বলো না !

প্রণব একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিরীহ এবং প্রতিদিনের নীরব শ্রোতা ভূপেন বলে, না না, একটু গুছিয়ে না বললে এ সব কথা বোঝানো যায় না, বোঝাও যায় না।

প্রণব বলে, আমি যেভাবে বলতে জানি সেভাবেই তো বলব, নইলে বানিয়ে বলতে হয়। যাকগে, আমরা মানুষের দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের কথা বলছিলাম, এসে ঠেকলাম শ্রেণি বিচারে। গোকুল তাই বলছে, আমি শ্রেণিবিভাগটা উড়িয়ে দিয়েছি, যেটা আসল বিচার। সত্যই তো, শ্রেণিটাই মানুষের আসল পরিচয়। যত কিছু লড়াই সব আসলে শ্রেণির লড়াই। প্রণবদা শ্রেণি-ট্রেণি তুলে দিয়ে মানুষকে জনসাধারণ নাম দিয়ে একাকার করে দিয়েছেন, গোকুল এটা বরদাস্ত করে কী করে !

গোকুল একটু হাসে।

আমি কিন্তু যা বলেছি শ্রেণিবিচারের ভিত্তিতেই বলেছি গোকুল। হিন্দু বা মুসলমান বলে কোনো শ্রেণি নেই কিনা, তাই মিছামিছি শ্রেণির কথা তুলে কথা বাড়াইনি। মজুরশ্রেণি সবচেয়ে বেশি দাঙ্গাবিরোধী। কিন্তু আমরা কি সেকথা বলছিলাম, কোন শ্রেণির মধ্যে দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব বেশি বা কম ? যতগুলি শ্রেণি মিলিয়েই জনসাধারণ হোক, আমরা সেই জনসাধারণের মোট মনোভাবটা বিচার করছি। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন নিয়ে মজুর আর চাষির দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকতে পারে, মধ্যবিত্ত আরও খানিকটা ভিন্নভাবে দেখতে পারে ব্যাপারটা, কিন্তু মোটামুটি বড়ো একটা মিল আছে সবার দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই মোট মনোভাবটাই আমাদের বোঝা দরকার।

ভূপেন বলে, আমারও তাই মনে হয়। তবে ভাবি কী, ওভাবে ধরলে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে যায় না ? জনসাধারণ আছে—হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই। অথচ দাঙ্গাহাঙ্গামাটাও বাস্তব, উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রণব বলে, না, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি আঁকড়ে থাকলেই বরং হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু থাকে না। শ্রেণি মেলানো জনসাধারণকে ধরে বিচার করলে সমস্যাটার বাস্তব চেহারা ধরা পড়ে। নীচের তলার মানুষেরা একাকার, মিলটাই তাদের সবচেয়ে বড়ো স্বার্থ—তবু দাঙ্গা হচ্ছে। তাহলেই প্রশ্ন আসে, কেন হচ্ছে ? নীচের তলার সাধারণ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যাতে সর্বনাশ, সেটা কেন ঘটছে ? জবাব খুঁজলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

মণি বলে, নীচের তলায় বুঝি হিন্দু-মুসলমান একাকার ?

বাঁচার স্বার্থে একাকার বইকী। নমাজ পড়ে পুজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচে বলেই নমাজ পড়ে, পুজো দেয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো। কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মারছে, পেটের ধান্ধায় কাবু, তার ওপর হাজারটা কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কি কঠিন ? তবু, একটু চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে, দ্যাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনও যে এই শহরে ট্রামে চেপে বেড়াও, হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে ওই ট্রাম চালাচ্ছে। এদিকে নোয়াখালি, ওদিকে বিহার, কে বলতে পারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কী হবে। আজ এ কথা ভুললে রক্ষা আছে এটা ওপর থেকে চাপানো দাঙ্গা, ওপরওলাদের স্বার্থে ! দুশো বছর যারা শোষণ করছে প্রথম দায়িত্ব তাদের ! উপরতলার তুলনা কব, কারা বেশি অমানুষ, কাদের দায়িত্ব বেশি স্পষ্ট বুঝে নাও, প্রাণ খুলে শাপ দাও, বুকে ছ্যাঁকা লাগলে মানুষ তা দেবেই। আশা-ভরসা রাখো নীচের তলায়।

কী আশা ? কী ভরসা ?

মধ্যযুগে পারা যেত, এ যুগে শুধু ধর্মের জন্য গরিবকে দিয়ে আর হত্যা করানো যায় না। বেহেস্ত বা স্বর্গের নেশা থাকলেও সেখানে সবটা পুরস্কার পাবার আশায় থাকতে মানুষ আর রাজি নয়, কিছু নগদ বিদায়ও চায়। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ভাতকাপড়ের সুখ পেতে হলে এটা করা চাই-ই, এ বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সাধারণ লোকের একটা অংশকে দাঙ্গায় মাতানো গেছে। এখন বাস্তব চেতনাটাই আশা ভরসা এবং ভবিষ্যৎ। হিন্দু মুসলমান যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে যে ওরা আমার ধর্মের পথের কাঁটা, তাদেরও সত্যি সত্যি এটা আসল চিন্তা নয়। এ আদর্শবাদে মত্ত হওয়ায় আসল কারণও বাঁচা-মরার সমস্যা। যে মুহূর্তে ভুল ভাঙবে, টের পাবে যে বাঁচার পথেব কাঁটার চাষটা শুধু ওপর তলায় হয়, সেই মুহূর্তে শত্রু-মিত্র চিনতে পারবে, আর—

বক্তৃতায় ভুল ভাঙবে ? কবে সাধারণ লোকের ভুল ভাঙবে সেই আশায় বসে থাকব ? তা হলেই হয়েছে !

তবে কোন আশায় বসে থাকবে ? একটা আশা তো চাই।

অতি মৃদুস্বরে প্রণব প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। জবাবের জন্য তার নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করাটা অর্থপূর্ণ ব্যাকুলতার মতোই ঠেকে।

শেষে তেমনি মৃদুস্বরে সে নিজেই বলে, বসে থাকার জন্য আশা নয়। কিছু করতে হবে বলেই আশা। এখুনি না হোক, যতকাল সময় লাগুক, আশা নিয়েই মানুষ কাজ করে। নইলে বাঁচার মানে হয় না। তাছাড়া, এ তো খুব সুদূর দিনের আশা নয় আজ ! মানুষের চেতনা আজ কোথায় এসে গিয়েছে—এ আশা বাস্তব হতে বেশিদিন লাগবে না।

রসময় নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথার শেষে প্রণব বলে, বসুন।

গিরীন টেলিফোনে একটা খবর জানিয়েছে, রসময় এসেছে খবরটা জানাতে। আজ সন্ধ্যার পরেই কাগজের আপিসে একটা ছোটোখাটো আক্রমণের চেষ্টা হয়, ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, একজন

দরোয়ানের শুধু সামান্য চোট লেগেছে। গুজব শুনে বা অন্যভাবে খবর পেয়ে বাড়ির লোক ব্যস্ত হতে পারে ভেবে গিরীন জানিয়েছে যে, ভাবনার কোনো কারণ নেই, আপিসটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাগজে কিছু কিছু দাঙ্গা-বিরোধী প্রচার হয় বলে এই আক্রমণের চেষ্টা, তবে কিছু করতে পারবে না জেনেই হানা দিয়েছিল, আসল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো।

আরেকটা খবর গিরীন জানিয়েছে। কোনো সূত্রে সে জানতে পেরেছে তাদের এদিকের এলাকায় হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছে, কিন্তু ঠিক কোন পাড়ায় হবে, প্রণবদের পাড়ায় কিংবা আশে-পাশে সেটা ঠিক জানতে পারা যায়নি।

এ পাড়ায় কি হাঙ্গামা হতে পারে প্রণববাবু ? রসময় চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।

কী জানি। সহজে বাধবে না, তার বেশি বলা কঠিন। যে দিনকাল, গুজব ছড়িয়েই মানুষের মাথা আরও বেশি বিগড়ে দিচ্ছে।

রসময় অল্পক্ষণ বসেই চলে যায়, মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ এবং ঘুম-কাতুরে। এই বাড়ি আর এ বাড়ির মানুষদের সে সাধারণত এড়িয়েই চলে। এ অঞ্চলে হাঙ্গামার সম্ভাবনার কথাটা গিরীন উল্লেখ না করলে নিজে আসত কিনা সন্দেহ।

রসময় চলে যাবার খানিক পরে কাল্লু মিস্ত্রি যেন তার প্রশ্নেরই জবাব নিয়ে আসে।

কী খবর কাল্লু ?

জবর খবর। ইয়াসিন এসেছিল।

এ পাড়ায় এসেছিল ? ইয়াসিন ?

খবরটা সত্যই গুরুতর। ইয়াসিন অন্য এক এলাকার শক্তিশালী গুন্ডা-রাজ বা গুন্ডা-নবাব। নিজের দলের সীমানা ছেড়ে এ সব লোক সহজে অন্য এলাকায় যায় না, কারণ ওই একটা এলাকার মধ্যেই ক্ষমতাটা এদের সীমাবদ্ধ থাকে।

কাল্লু বলে, দুপুরবেলা নাজের আলির বাড়ি এসেছিল, সন্ধ্যার সময় সিংহীকে তুলে নিয়ে তিনজন মোটরে বেরিয়ে গেল। আমাদের আজিজ হল আলি সায়েবের ড্রাইভার, নতুন ঢুকেছে। আজিজ বলল, চৌরঙ্গির বড়ো হোটেলে খানাপিনা করেছে। আরেকজন কে এসেছিল, আজিজ চেনে না, চারজনে সলা হয়েছে খুব।

সিংহী সুবোধ সিংহের চলিত নাম।

প্রণব বলে, ইয়াসিন প্লাস সিংহী। ব্যাপার তো সুবিধে ঠেকছে না। একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

অমলের সঙ্গী সুধীর আগাগোড়া চুপ করে শুনছিল। কাল্লু চলে গেলে সুধীর বলে, ইয়াসিনের একটা গুণ আছে, কথা দিয়ে কথা রাখে। মধু দত্ত লেনের কয়েকজনকে বলেছিল, আপনারা থাকুন, কোনো ভয় নেই। অনেক চেষ্টা করেও কেউ কিছু করতে পারেনি। তারপর হাঙ্গামা হবার আগে নিজেই আমায় জানিয়েছিল, এবার পালান আপনারা, অন্যদিক থেকে চাপ আসছে, আমি সামলাতে পারব না। ঠিক দুদিন পরে আর্মড গার্ডদের ব্যাপারটা ঘটল।

ওটা কী জান, প্রণব মৃদু হেসে বলে, ওদের বিলাস ! গুন্ডারাও সামাজিক জীব, সমাজের বিকার ওদের চালায়। বিনা খরচায় খানিকটা বাহাদুরি হল, ক্ষতি কী ? লাভ থাকলে যাদের ভরসা দিয়েছিল নিজেই তাদের গলা টিপে মারত !

সুধীর বলে, সে তো ঠিক কথাই। স্বার্থ ছাড়া ওরা কী চলে !

মণির অসহ্য ঠেকছিল, দম আটকে আসছিল।

এবার একটু অন্য কথা বলো। দোহাই তোমাদের, মারামারি কাটাকাটি ডাকাত গুন্ডা ছেড়ে অন্য কথা বলো। আর কি কোনো কথা নেই ?

মণির আর্তনাদ সকলকে চমকে দেয় কিন্তু বিভ্রান্ত করে না। গানের সুর যেমন খেলে বেড়িয়ে চড়তে চড়তে চরমে ওঠে, আবাব ফিরে আসে শুরুতে, মণি যেন উচ্চগ্রামে বাঁধা আলোচনা এবং মনগুলিকে আঘাত দিয়ে ফিবিয়ে এনেছে গোড়ায়।

সরস্বতী বলে, সত্যি, আমরা খালি নেতা নিয়ে, মন্ত্রীমিশন নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে, কংগ্রেস-লিগ-কম্যুনিস্ট নিয়ে মেতে আছি। চব্বিশ ঘণ্টা সামলাও সামলাও ভাব। কেন, আমাদের সাধ-আহ্লাদ সুখ-দুঃখ নেই ? নেতাবা চুলোয যাক, রাজনীতি মরুক, টুটু, তুই একটা গান গেয়ে শোনা দিকি লক্ষ্মীটি !

নীলিমা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সার্থক জনম আমার' গানটা গা। সত্যি আমরা সবাই যেন মহাপাপ কবেছি, দিনরাত খালি জপ করছি দেশ আর সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতা, বিপ্লব আর সমাজতন্ত্র। বস্তির গবিব মানুষগুলি পর্যন্ত হইচই ফুর্তি করছে, আমাদের যত দায় !

ঢোলক ঘুঙুর আর মিলিত কণ্ঠের মোটা আওয়াজে সস্তা সংগীতের রেশ সত্যই ভেসে আসছিল। প্রণব মণির কাছে প্রায় কৃতজ্ঞতা বোধ করে। বিপ্লব যে আতিশয্য নয, আত্মহত্যা নয়, মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ম বিধানেই বিপ্লব হয়, সেও প্রায় ভুলতে বসেছিল এটা।

টুটু ভুপেনের মেয়ে, বছর পনেরো বয়স। যেমন রোগা তেমনই কালো, ভয়-ভাবনা-ভীবুতা মাখানো মুখ। গান গাইবার অনুবোধেব জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে এব দিকে ওর দিকে তাকায়, বার কয়েক ঢোঁক গেলে। তারপর মুখ উঁচু করে চাবতলা বাড়ির ছাদ-ঘেঁষা মাঝাবি চাঁদটার দিকে ভ্রুকুটি করে তাকায়। ধীরে ধীরে সে গাইতে আবম্ভ করে, গলার গান যেন তাব নববধূব মতো বিয়ের মন্ত্রের স্বামী সম্ভাষণে চলেছে, প্রথমে এই রকম ধরাবাঁধা নিয়মতান্ত্রিক মনে হয়। ক্রমে মেয়েটা নিজেই মশগুল হতে থাকে নিজের গানে, ক্রমে তার কণ্ঠ ও সুর জগতেব সেবা অভিসারিকাব মতো ঘর বর হিংসা দ্বেষ হানাহানির সীমানা ছাড়িয়ে বিরাট প্রাণের সুববন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে।

গান শেষ করে টুটু নীরবে উঠে গিয়ে আলসে ঘেঁষে দাঁড়ায়। এতগুলি মনকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে তার খেয়ালও থাকে না।

একটি মেয়ের একটি গান বিব্রত অশান্ত পীড়িত মনগুলিকে কীভাবে বদলে দিতে পারে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে আবার যখন ধীরে ধীরে কথাবার্তা আরম্ভ হয়। ছাড়া-ছাড়াভাবে বিচ্ছিন্ন পীড়নের মতো প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি একে একে না এসে বৈঠকে এবার সমগ্র দেশ, বৃহৎ পৃথিবী, সমস্ত মানুষ, অতীত ইতিহাস ও আশাতীত ভবিষ্যতের আনাগোনা চলে নানা কথায়, মানুষের আনন্দময় মুক্ত স্বাধীন জীবনের নূতন ভূমিকা সৃষ্টি হয়। জগতের মানুষ আজ কোন দিকে চলেছে, জীবনের অভিযান কোন সার্থকতার উদ্দেশ্যে, ভারতের কোন মুক্তি জগৎকে মুক্তিব পথে এগিযে নেবে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নূতন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হয়েছে তার কর্মময় বাস্তব চেতন-মুক্তির মর্ম কী, কীসে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ? রাত্রি গভীর হয়ে আসে, লক্ষ লক্ষ স্পন্দিত হৃদয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র মহানগরী আকাশ পর্যন্ত গুঞ্জন মৃদুগুঞ্জনে জীবন্ত স্তব্ধতা বিস্তার করে যেন কান পেতে তাদের কথা শোনে।

পাঁচ

ভোরে দেখা গেল নানি পথের ধারে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। বোসেদের দোতলা বাড়ির নীচের তলায় দালানের গঠনের সঙ্গে একত্র গড়া মার্বেল পাথরের মন্দিরটির ঠিক সামনে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে নানির সর্বাঙ্গ, তাকে ঘিরে রাস্তায় ছড়িয়ে আছে চাপ চাপ অজস্র রক্ত। নানির ওই ক্ষীণ

দেহে এত রক্ত কোথায় ছিল। অথবা এ রক্ত শুধু নানির রক্ত নয়। এ মরণ শুধু নানির মরণ নয় ? দালানসাৎ মন্দিরটির লোহার কোলাপ্‌সিবল দরজার খাঁজে লটকানো গোরুর মাথাটি দেখলে তাই মনে হয়।

কিন্তু কেন এ মর্মান্তিক হত্যা ? এ জগতে কার কাছে নানি কী অপরাধ করেছে ? সে তো প্রিয় ছিল সকলের, বয়সের ভারে বাঁকা হয়ে সে তো ঝুঁকে পড়েছিল কবরের দিকে, আজ বাদে কাল গোবর-কুড়ানো জীবন থেকে আপনা থেকেই মুক্তি পেত ? তার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়েই বা দেওয়া কেন মন্দিরের এই বীভৎস অপমান ? এ এলাকায় হাঙ্গামা ঘটেনি, কিন্তু সারা শহরের মতো এখানেও স্নায়ুগুলি উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়ায় টান-টান হয়ে আছে—এ যদি সেই স্নায়ুমণ্ডলীর ধৈর্য ভেঙে দেবার উসকানি হয়—একসাথে বিপরীত উসকানি কেন ?

নানিকে কি আগে হত্যা করা হয়েছিল ? মন্দিরের গায়ে লটকানো গোরুর মাথাটি তার জবাব ? অথবা ওই গোরুর মাথাটির জবাব নানির এই মরণ ?

যেমন বীভৎস তেমনি রহস্যময় ঘটনা, অনেক ধরনের অনেক প্রশ্নই মানুষের মনে জাগে। কিন্তু প্রশ্ন করার, রহস্য বোঝার, অবসর মেলে কই ? এ কাণ্ড যাদের পরিকল্পনা তারা চুপ করে ছিল না। ভোরের আলো ভালো করে ফুটবার আগে তারাই আবিষ্কার করে নানির দেহ আর গোরুর মাথাটি তারাই শোরগোল হইচই তুলে দেয় চারিদিকে। তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে যায় বিচার-বুদ্ধি বিবেচনা, কীসে কী ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে আগে তা ভেবে নিয়ে তারপর উপযুক্ত প্রতিকার বা প্রতিহিংসার চিন্তা আনা। মানুষের মনকে যখন বারুদে পরিণত করে রাখা হয়েছে তখন বড়ো জোর আগুনের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলার বিবেচনাটুকু তার থাকতে পারে, স্ফুলিঙ্গ এসে ছুঁয়ে ফেললে বারুদের জ্বলে ওঠা আর ঠেকানো যায় না।

নানিকে হত্যা করার শোরগোলে মন্দির অপবিত্র করার দিকটা চাপা থাকে, ধর্মস্থানের কুৎসিত অপমানের হইচইয়ে নানির মরণ মর্যাদা পায় না। কোন অন্যায়টা বড়ো তা নিয়ে অবশ্য বচসা শুরু হবার সুযোগ ঘটে না, ভিড় জমে উঠতে না উঠতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়,—পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর ! মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভালো করেই জানে। বেঁচে থাকতে মাকে খেতে না দিক, তার অপমৃত্যুর সংবাদে নাজিম বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটে এসেছে, সাথে সাথে কিংবা আগে-পরে এসেছে বস্তি আর বস্তির ওপারের মুসলিমপ্রধান এলাকার অনেকে। বুড়ি মাকে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে নাজিম সবে হাঁটু পেতে বসে মায়ের মুখখানা বুঝি উঁচু করতে গিয়েছিল, সোডার বোতলের ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়ে তার জীবন্ত তাজা রক্ত ঝরে নানির চাপ-বাঁধা রক্তে মিশতে থাকে,—শুধু নানির রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গোরুর রক্তও মেশানো হয়েছিল দৃশ্যটায় বীভৎসতা বাড়াবার জন্য। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলির অঙ্গ—সোডার বোতল নিয়ে লোক প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবে নাজিমের মাথাটাই যে ফাটবে সেটা কেউ ভেবে রাখেনি।

কয়েক মিনিটের জন্য তারপর এলোমেলো মারপিট খুন-জখমের চেষ্টা চলতে থাকে, কাপড়ের ভাঁজের আড়াল থেকে ঝকঝকে ছোরা বেরিয়ে এসে রতন সান্যালের পাঁজরে ঢুকে যায়, অ্যাসিডের বাল্‌ব্ ফেটে হিন্দু-মুসলমান দু-জাতেরই কয়েকজনের কালো চামড়ার কিছু কিছু ঝলসে জ্বলে-পুড়ে ইংরেজি সাদা চামড়া হয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি জানায়। আচমকা কোথা থেকে অনেকগুলি লাঠি এসে হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দিতে থাকে মানুষের।

কিছুক্ষণ পরে নাজিমকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে বস্তির দিকের লোকেরা পিছু হটে পালিয়ে যায়, সংখ্যায় তারা কম ছিল। পুলিশ আসে না কেন, সৈন্য ? রসময় টেলিফোনের যন্ত্রটায় ঝাঁকি মারে, সাড়া পেয়ে ব্যাকুলভাবে আহ্বান জানায়, কিন্তু পুলিশও আসে না, সৈন্যও আসে না।

জবরদস্ত ব্রিটিশ-রাজের সৈন্য-পুলিশের কী হয়েছে ? ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বললে যারা শুনতে পেয়ে তাকে শায়েস্তা করে !

বহু নিরীহ লোক যখন হতাহত হয়েছে, লুঠপাটের চরম পালা চলছে, সদলবলে এক দল উন্মাদ যখন গিয়ে বস্তিতে সাত-আটটা ঘরে আগুন দিয়েছে, চোরাবাজারে যে পেট্রোলের টানাটানি সেই পেট্রোল রাশি রাশি ঢেলে আগুন দিয়েছে, তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে ট্রাকে চেপে মিলিটারি এল। বস্তি তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

জ্বালানির অভাবে উনান ধরে না, কাঁকর-মেশানো চালটুকু সিদ্ধ করতে হয়রান হয়ে যায় মানুষ, নানির রাস্তায় কুড়োনো গোবরের ঘুঁটে চড়া দামে বিকোয়, মানুষের এখানে মাথা-গোঁজার ঘর-জ্বালানো আগুন আকাশ লাল করে জ্বলছে। এদিকে পূর্বাকাশে যে সূর্য উঠেছে সেই সূর্য পর্যন্ত যেন ম্লান হয়ে গেছে আগুনের আঁচে আর রঙিন আলোয়।

গিরীন সচকিতভাবে গলিতে ঢুকছিল, মাথাটা তার ঘুরে গিয়েছিল অবস্থা দেখে। কাল বিকালে যখন আপিসে গিয়েছিল হত্যা আর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ সম্পাদনা করে পরিবেশন করার কর্তব্য পালন করতে, আপিসে যখন হানা দিয়েছিল একদল উন্মাদ তখনও সে কি কল্পনা করতে পেরেছিল সকালে বাড়ি ফিরে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। রাত জেগে সাজিয়ে গুছিয়ে একদল দানব আর মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতম খবরগুলি মানুষের এবং মালিকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশনের কর্তব্য পালন করছিল। কাজের টেবিলে পা গুটিয়ে ঘণ্টা তিনেক সে ঘুমিয়েছিল, নানা দুঃস্বপ্ন দেখে তার মধ্যে এভাবে বাড়ি ফেরার ইঙ্গিতও ছিল না। জগতে ধ্বংসের ও সৃষ্টির দ্বন্দ্ব চলুক, তার নিজের পাড়া, তার বাড়ি, তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বউ-ছেলে-মেয়ে নিরাপদে থাকবে, এটা যেন ধরেই নিয়েছিল গিরীন।

হেই শালা, কাঁহা যাতা ! পাকড়ো !

লালমুখো বীরপুরুষদের রুচি-রীতি বিচার-বিবেচনা গিরীনের জানা ছিল, সে ভয়ানক ভয়ে কাছা বেসামাল হবার ভাব দেখিয়ে রসময়ের বাড়ির পাশের একহাত সরু অন্ধগলিতে ঢুকে যায় এবং মিনিট খানেক পরে গলি থেকে বেরিয়ে লালমুখোদের প্রায় পাশ কাটিয়েই তিনটে বাড়ি পেরিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

কোন পথ দিয়ে এলে, নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

রোজ যে পথে আসি।

নীলিমা গালে হাত দেয়।

কেন, ওদিকের গলিটা দিয়ে ঘুরে এলে হত না ? খানিকটা নয় দেরিই করতে ! ওনারা এসে বীরত্ব দেখাচ্ছেন, যাকে পাচ্ছেন ধরছেন পিটছেন চালান দিচ্ছেন, ওর ভেতর দিয়ে আসবার কী দরকার ছিল ?

গিরীন হেসে বলে, আমায় ঠিক তাড়া করেছিল। আমরা ও সব ট্যাকটিক্স জানি। খবরের কাগজের ঘুঘু আমরা। যাকগে, এদিকে কখন লাগল, কী করে লাগল ? কী নিয়ে ঘটনা শুরু হল ?

ওরে উমেশ, নীলিমা ডাকে, হেড কম্পোজিটরকে ডাক, মস্ত নিউজ, ডবল হেডলাইন হবে, সাব-এডিটরবাবুর নিজের নিউজ !

নীলিমার কাছে মোটামুটি বিবরণ শুনে গিরীন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ছাদে যায়। ইতিমধ্যে ছাতে অনেকে এসেছে গিয়েছে, চোখ মেলে চারিদিক চেয়ে দেখেছে, মণি সেই যে ছাদের কোণে আলসে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে নড়েনি। বেলা বেড়ে বেড়ে রোদ কড়া হয়েছে, ঘামে গরমে সে সিদ্ধ হচ্ছে, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে সে চোখ পেতে রেখেছে পথে, তাকিয়ে থেকেছে আগুন-ধরা বস্তির দিকে।

গিরীন কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভিতরের প্রচণ্ড আলোড়ন তার মুখখানা যেন বদলে দিয়েছে একেবারে।

দেখুন কাণ্ড, তপ্ত খোলায় ছিলাম আগুনে এসে পড়লাম। কোথাও কি মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না ? কী আরম্ভ হয়েছে এ সব ? দেশসুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেল ?

উপায় কী বলুন ? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।

অল্প কয়েকদিনেই মণি এ সব কথার মর্ম খানিক বুঝতে শিখেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী ভয়ানক !

ভয়ানক তো বটেই। যারা রাজত্ব করে, রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কিনা !

আচ্ছা, হিন্দু মুসলমান একটা আপস করে ফেলে না কেন ? দেশের লোকের দল তো দুটোই, এটুকু কি বোঝে না নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায় ? দেশটা বাঁচে ?

গিরীন মনে মনেও হাসে না। এই সরল ব্যাকুল প্রশ্নের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এ শুধু মণির একার প্রশ্ন নয়। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ বন্ধু রাজনীতির জট খুলতে খুলতে হয়রান হয়ে আন্তরিক আপশোশে এই সহজ কথাটায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ! আপস মীমাংসার কত ভিত্তিই তো রয়েছে, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে পর্যন্ত সে ভিত্তি খুঁজে পায়। অথচ মীমাংসা কিছুতেই হয় না।

সাধারণ লোকের কাছে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন চোখ রাখে জনসাধারণের দিকে, কোন চোখ রাখে কংগ্রেস আর লিগের দিকে, কার দিকে কোন হাত বাড়ায়, কী খেলা খেলে, কী চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লিগ আমার,—এ জগতে কে একান্তভাবে কার, জানা যেন এতই সহজ !

কেন মীমাংসা হয় না, দেশটা বাঁচে না ? মণির মুখে অসহায় মানুষের হাজার হাজার বার আওড়ানো এ প্রশ্ন তাকে পর্যন্ত যেন আজ বিচলিত করে। আশ্চর্য হয়ে গিরীন আজ প্রথম টের পায় এটা আসলে প্রশ্ন নয়, এ শুধু হৃদয়াবেগ !

চাওয়ার জোরে ভাবের মন্ত্রে রাম-রহিমের মিলন ঘটাবার অফুরন্ত ব্যাকুলতা।

আপস যদি হবে, ব্রিটিশ আছে কেন ?

ওটাই তো আমি বুঝতে পারি না গিরীনবাবু। সংসারে দুজনের যদি একটি বড়ো শত্রু থাকে ওই শত্রুর জন্যই তাদের মিল হয়, এমনি যতই ঝগড়া-ঝাঁটি থাক। এ দেখছি ঠিক উলটো ব্যাপার, আসল শত্রু কোথায়—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা !

কীসের শত্রু ? ব্রিটিশের শত্রু তো নয় !

নয় ? ব্রিটিশ-রাজের শত্রু নয় কংগ্রেস লিগ ?

না। বিপক্ষ। শত্রু যদি হত, আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনও শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরেজের ভরসা। চারিদিকে লাখ লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌসেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন—

সন্ধ্যার বৈঠকে এ সব কথা মণি শুনেছে, অতদূর সে এগোতে চায় না, তার ঘরোয়া হিসাব গুলিয়ে যায়।

এ মারামারি এখন থামাবে কে ?

দেশের লোক উদ্যোগী হয়ে থামালেই ভালো হত, তা সেটা বোধ হয় হবে না। লক্ষ্মণ সেরকম নয়, আগুন আরও ছড়াচ্ছে। কর্তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা না হলে কিছু হবে মনে হয় না। কে জানে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অবস্থা ! তবে গরিব বেচারি আপনার আমার দফা নিকেশ হবে সেটা বলে দিতে পারি। স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছুকালের জন্য ঘুচে গেল, যে পথে এত দূর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড়ো জ্বালা ! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক-শো বছর ধরে এ দেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম—তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড়ো খারাপ। শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

গিরীনের রাত-জাগা চোখে নিজের বিহ্বল চোখ রেখে মণি কৃতজ্ঞভাবে বলে, আপনি এমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

ওদিকে বস্তির জ্বালানির অভাবে কমে-আসা ঝিম-ধরা আগুন, নীচে রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি ও টহল, মাথার উপরে মেঘহীন আকাশে দীপ্ত সূর্যের খটখটে রোদ, দম-আটকানো গুমোট আর গা-পচানো ঘাম, এর মধ্যে মণির ন্যাকামিতে গিরীন সত্যই চটে যায়। অকারণে মণিকে প্রায় চমকে দিয়ে সে ব্যঙ্গ করে বলে, আমিও আপনার মতোই বোকা-হাঁদা কিনা, পরস্পরের কথা আমরা তাই সহজে বুঝি।

মণিকে সবাই আঘাত করে, সবাই তার ঘরোয়া মেয়েলি মেয়েলি হাবভাব চালচলন আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা তেজ-নম্রতাকে অবজ্ঞা করে, সবাই তার অসীম ঔৎসুক্য অনন্ত জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতাকে ন্যাকামি মনে করে চটে যায়। একমাত্র মণি ছাড়া এ বাড়ির সবাই যেন দেশের ধন-সম্পদ দুঃখ-দারিদ্র্য আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা ধর্ম-মোক্ষ-কাম ইত্যাদির বিলি-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি, ছেলে-পিলে কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত। এ দেশে ঘরে ঘরে মণি আছে, দু-একটা নয়, লাখ লাখ আছে, এই ক্ষোভে যেন প্রণব থেকে নীলিমার ভাই গোকুল পর্যন্ত, নীলিমা থেকে বাড়ির ঝি দুর্গা পর্যন্ত মনে মনে সর্বদা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে আছে ! রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেহেতু একটা বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেই হেতু এ দেশে মণির মতো মা-বউ-মেয়েমানুষের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ও অন্যায় হয়ে গেছে !

বিদেশি কর্তারা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেনি, শতাব্দীর অন্ধকারে দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয়রূপী চোখ ঝলসানো আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে রেখে ভাঁওতা দিয়ে এসেছে, জীবনের মান নামিয়ে এনেছে একটানা শোষণে, মিলিটারি বুটের লাথি আর জগতের সেরা ব্যবসায়ী মাথার কৌশলে জীবনের রূপান্তর ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে বিংশ শতাব্দীর এই মাঝামাঝি পর্যন্ত—তবু স্নেহাতুর স্নায়বিক কোমলতার পাঁকে আটকে থাকার অপরাধ যেন শুধু মেয়েদের !

মণি থেকে শুরু করে সরল বোকা গ্রাম্য মেয়েদেরও।

তারা অল্পে ব্যাকুল হয়, ন্যাকামি করে, জীবনসংগ্রামের চেয়ে বড়ো করে তুলতে চায় হৃদয়াবেগকে। মণি কী টের পায় না বাস্তবতার নামে যে রুক্ষতা, কঠোরতা হৃদয়হীনতার কলরব উঠেছে চারিদিকে সেটা শুধু গায়ের জ্বালা, ঝাল ঝাড়া—ব্যাহত, আহত মানুষের ! মেয়েরা আজ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যাকামি আর ভাবপ্রবণতার !

এ বাড়িতে সে একা ওই প্রতীকের প্রতিনিধি। নীলিমা তার সগোত্র—মণি জানে। জাতবোনকে না চেনার মতো বোকা সে নয়। নীলিমা শুধু সংযম শিখেছে—ঝোঁক সামলে মানিয়ে চলে। সে যা বলে ফেলে, করে বসে—নীলিমা শুধু সেটা মুখ ফুটে বলে না, কাজে করে না।

ঘরে গিয়ে মণি বিছানায় আশ্রয় নেয়। ভাবে, বিদ্বান বিদুষী ও বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীরা ত্যাগে আদর্শে কর্মে সারাদেশের ভাগ্য নিয়ে যে গৌরবময় জীবন যাপনের অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ! সংসারে টুকিটাকি কাজ করে স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়েছে, বিয়ের পর স্বামী চাওয়ামাত্র আলিঙ্গন দিয়েছে, রেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে প্রসব করেছে, আবার রেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে--তার উচিত হয়নি এ বাড়িতে আসা ! এ বাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রয় লাভের যোগ্যতাও তার নেই, বড়ো বড়ো ব্যাপার কিছুই সে বোঝে না। তার উচিত ছিল, দেশের কোটি কোটি মেয়েছেলে যে রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে শোয়ার ঘরে মুখ গুঁজে আছে তাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খোঁজা।

হ্যাঁ, অন্ধকারের জীব সে, অন্ধকারে থাকাই তার উচিত ছিল। বড়ো সে ভুল করেছে এই সচেতন আলোর জগতে এসে—এ আলোতে শুধু তার চোখ ঝলসে যায়, সে অন্ধকার দ্যাখে। এ বাড়িতে সে শুধু পিছনে পড়ে থাকা অবজ্ঞেয় জীব !

নিজেকে এত ছোটো মনে হয় মণির ! গান্ধী জহরলাল সুভাষচন্দ্রের তুলনায় নিজেকে সুশীল যত হেয় যত ছোটো মনে করে তার চেয়েও অনেক বেশি তুচ্ছ, বেশি ছোটো। মহাপুরুষের মহান এই দেশ, তাদের মতো তুচ্ছ অবজ্ঞেয় অগণিত নরনারী কেন এই দেশে বেঁচে আছে ?

ঘণ্টা দুই পরে প্রণব তার ঘরে আসে। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্য মানুষও ঘরে এসেছিল হঠাৎ তার কী হয়েছে খবর জানতে, তাদের মণি গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে একটা আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে বাড়িতে। শুধু বিছানায় শুয়ে পড়ে আর যে ঘরে আসে তাকেই গাল দিয়ে তাড়িয়ে বাড়িতে এ রকম একটা আবর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে জানলে, বিশেষত পাড়ায় যখন বস্তি পুড়ছে আর ঘরের সামনে মিলিটারি টহল দিচ্ছে, মণি টের পেত এ বাড়িতে অতটা সে তুচ্ছ নয়—অবজ্ঞেয় নয়।

প্রণব বলে, হল কী মণিবউদি ?

মণি বলে, বেরোও আমার ঘর থেকে, দূর হয়ে যাও। ইয়ার্কি করতে এসেছ, না ?

তাড়িয়ে দিলেই অন্যদের মতো প্রণব চলে যাবে না এটা মণিও অবশ্য জানত। বালিশ সরিয়ে নিজে সরে বসে সে প্রণবের বসবার জায়গা করে দেয় ! প্রণব এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসে। বসে গায়ের ঘামে ভেজা ময়লা পাঞ্জাবি আর তার তলার ছেঁড়া গেঞ্জিটা খোলে, দুহাতের তালুতে সমস্ত মুখটা একবার ঘষে মেজে নেয়। তারপর মণির গায়ে হাত দিয়ে বলে, কই, জ্বর তো হয়নি ? গা তো বেশ ঠান্ডা !

জ্বর হয়েছে কে বলল ?

কেউ বলেনি। শুনলাম তোমার কী যেন হয়েছে, ভয়ানক ছটফট করছ, সবাইকে ধমকাচ্ছ—

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, গিরীন ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। বিষম ভড়কে গেছে বেচারা, দেখলে তোমার মায়া হবে। খালি বলছে, চটে যাবার মতো কিছু তো বলিনি, উনি কেন এমন চটে গেলেন !

তাই নাকি !

আমিও বুঝতে পারছি না তুমি চটলে কেন।

সে তোমরা বুঝবে না।

তোমার মতো বোকা নই বলে ?

ফোঁস করে উঠতে গিয়ে মণি থেমে যায়। তার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফোটে। প্রণব ছাড়া সোজাসুজি তাকে এ কথা বলার সাহস সত্যই অন্য কারও হত না। ভাবত, খোঁচা দেওয়া হবে !

মণি বলে, দ্যাখো ঠাকুরপো, সবসময় আমায় ছেলেমানুষ বানিযো না। গিরীনবাবুর মনমেজাজ বিগড়ে ছিল, এটা আমিও বুঝি। নইলে হঠাৎ আমায় বোকা-হাঁদা বলে বসতেন না। তোমরা ভাবছ আমি শুধু ওই জন্য রাগ করেছি, একটা মানুষের কাছে একটু অপমান পেয়েই খেপে গেছি ! আমি খেপেছি সত্যি, অন্য কারণে খেপেছি, গিরীনবাবুর কথায় নয়। আমার ভেতরটা কীরকম পুড়ে যাচ্ছে জানলে তুমিও বুঝতে অত সামান্য কারণে এ রকম হয় না।

আর একটু বলো। তাহলেই বুঝে নেব।

গিরীনবাবুর দোষ কী ? তোমাদের সবার যা মনোভাব, গিরীনবাবু হঠাৎ সেটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। আমি সব দিক দিয়ে কত বাজে তুচ্ছ মানুষ সেটা আমি জানি না ভেবেছ ? এখানে আসবার আগে জানতাম না সত্যি—তোমরা চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছ।

প্রায় বুঝে ফেলেছি মণিবউদি। তবু, আরেকটু বলবে ?

মণি একটু হাসে।—তুমি সত্যি ভারী চালাক ঠাকুরপো ! এমনভাবে মানুষের মনমেজাজ বুঝে কথা কইতে পার। আরেকটু কী বলব ? সবই তো বললাম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমার কী দোষ বলতে পার ? আমার বড়ো আদর্শ নেই, দেশের জন্য কখনও কিছু করিনি, ঘরে বসে স্বাধীনতা চেয়েছি, লড়ায়ে সায় দিয়েছি,—বড়ো জোর গায়ের একটা গয়না ফান্ডে দান করেছি। আমার মনটা নরম, বুকটা ন্যাকামিতে ঠাসা—কিন্তু এ সবের জন্য কি আমি দায়ি ?

দায়ি বইকী। তবে তুমি একা নও, অন্য সকলেও দায়ি। দায়িত্বের হিসাবটা পরে আসবে, তুমি যে সবদিক দিয়ে এত খারাপ, এত তুচ্ছ এটা বুঝি তুমিই হিসাব কষে কষে বার করেছ ?

তোমাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েই বুঝতে পারছি।

সে তুমি যত ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা বোঝ। আমাদের চেয়ে নিজেকে যত খুশি হীন মনে কর। কিন্তু আমরাও যে তোমায় ওই রকম মনে করি এটা ধরে নেওয়া তো তোমার উচিত নয়। এটা তোমার মনগড়া মিথ্যে ধারণা হতে পারে।

তোমাদের ব্যবহারেই সেটা বোঝা যায়।

এবার আমি রাগ করব ! তুমি মিছে অপবাদ দিচ্ছ আমাদের। কে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ? কবে করেছে ? একটা উদাহরণ দাও।

মণি বিব্রত বোধ করে বলে, সে রকম খারাপ ব্যবহার নয়। আমি তা বলিনি। আমায় তোমরা সয়ে চলছ, আমার মান বাঁচিয়ে চলছ, কিন্তু আমায় মানিয়ে নিচ্ছ না, পর করে রেখেছ—

প্রণব মৃদু হেসে বলে, তার মানে আমাদের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না তোমার, এই তো ? তুমি এক রকম, আমরা খানিকটা অন্য রকম, এই তো ? কিন্তু তার মানে দাঁড়াবে কেন যে তোমায় আমরা হীন মনে করি ? তাহলে আমরাও তো ভাবতে পারি, তোমার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। তুমি আমাদের হীন মনে কর !

মণি কথাটা তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করে।

প্রণব আবার বলে, অনেক বিষয়ে মিল খাচ্ছে না, এটা স্বাভাবিক। এ রকম তো হবেই। তুমি এতকাল শুধু ঘরসংসার নিয়ে ছিলে, আমরা বাইরে কাজ করে আসছি, বাইরের সমস্যা নিয়ে ভেবে আসছি। তুমি আমাদের মতো হবে কী করে ? সোজা স্পষ্ট করে বলি, তুমি পিছিয়ে আছ, আমরা খানিকটা এগিয়েছি। এ তো সত্যি কথা।

মণি বলে, আমি কী তা অস্বীকার করেছি ? আমি বলছি, পিছিয়ে থাকাটা কি আমার দোষ ?

প্রণব খুশি হয়ে জোর দিয়ে বলে, আমিও তো তাই বলছি ! দোষটা কি তোমার ? তোমায় তো আমরা দোষী করিনি ! তা যদি করতাম তাহলে নিশ্চয় বলতে পারতে তোমায় অবজ্ঞা করা হয়েছে। তোমায় কেউ দোষ দেয় না, ছোটো ভাবে না, তুমি যেমন তোমাকে তেমনি মনে করে। তোমার ভালোটুকু ভালো, মন্দটুকু মন্দ।

ওটাই তো উদাসীনতা, ওকেই তাচ্ছিল্য করা বলে। যেমনি হই, মানুষ তো আমি, আপন করার চেষ্টা তো করতে হয়। তুমি পিছিয়ে থাক, মর বাঁচ আমাদের বয়ে গেল—এটা অবজ্ঞা নয় ?

প্রণব হেসে বলে, পিছিয়ে আছ কি না, তাই এ রকম মনে হচ্ছে। এও তোমার পিছিয়ে থাকার একটা লক্ষণ ! তোমার জগতে যেমন ছিল, তুমি সবার কাছে সেই রকম ব্যবহার চাও, সেই রকম সম্পর্ক চাও। তাহলে তো মিল খেয়েই যেতে ! ঘরের কোণে থেকে তোমার কতগুলি দুর্বলতা আর সংকীর্ণতা জন্মেছে, মানো তো ?

নিশ্চয় মানি ! কিন্তু—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু সে জন্য তুমি দোষী নও। তুমি চাও তোমার যে দুর্বলতা আছে সেটা নেই ধরে নিয়ে সবাই দেখাক যে তোমাকে কেউ দোষী মনে করে না। এই মিথ্যা অভিমানটাই তোমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা মণিবউদি, বুঝলে ? এই সংকীর্ণতা তোমার সঙ্গে সকলকে মিশ খেতে দিচ্ছে না। নীলিমা দশজনকে নিয়ে সমিতি গড়তে পারে, কাজ করাতে পারে, সভায় দাঁড়িয়ে আজকের সমস্যা কী আর সমাধান কী বুঝিয়ে দিতে পারে—তুমি পার না। তুমি যে পার না অন্যে এটা ধরলেই তোমায় দোষী করা হয়, হেয় ভাবা হয় !

মণি মাথা নেড়ে বলে, তুমি ভুল করছ। তুমি খালি তোমার দিক থেকে দেখছ ব্যাপারটা। আমি কী আর কী নই সে তো মোটামুটি টের পেয়েই গেছি। আমায় তোমরা যা খুশি ভাব না, শুধু আমায় একটু নিজের করে নিলেই কোনো নালিশ থাকত না। তোমরা ধবে নিয়েছ আমি দুদিনের অতিথি, দুদিন পরে যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলব। দেশের কাজে স্বাধীনতার লড়ায়ে আমার কাছে কিছুই আশা করার নেই। তাই দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছ তোমরা আমাকে।

প্রণব বলে, এখন বুঝতে পারছি, আসলে তোমার হয়েছে জ্বালা। তুমি ভাবছ, কী সর্বনাশ, এখানে পালিয়ে এলাম, এখানেও দাঙ্গা ? ভাবতে গিয়ে তোমার সারা জীবনের ক্ষোভটা নাড়া খাচ্ছে, এই বিশ্রী বাস্তব থেকে কি কিছুতে মুক্তি নেই ? কী তুচ্ছ মানুষ, কত অসহায়। জীবনটা কী বিশ্রী ! রাগে অভিমানে তোমার মেজাজটা গিয়েছে বিগড়ে।

যদি গিয়েই থাকে ? আমার রাগ অভিমান হওয়া কি অকারণ ? আমার মেজাজ বিগড়োতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে ?

প্রণব আশ্চর্য হয়ে জবাব দেয়, আছে বইকী। তুমি অকারণে অন্যের উপর রাগ অভিমান করবে কীসের অধিকারে ? মেজাজ খারাপ করে কেন তুমি অন্যকে দোষী বানাবে ?

আমি যদি নিজের মনে—

নিজের মনে ? অভিমান হল তোমার দশজনের ওপর, সেটা নিজের মনে হয় কী করে ? তুমি কি বনে একা আছ—গাছপালার ওপর রাগ করছ ? দশজন তোমার মনের মতো নয় বলেই তো তোমার জ্বালা !

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব গলা পালটে বলে, তুমি কি সুধীনের জন্য ভাবনায় পড়েছ ? ছেলেটা বিগড়ে যাবে, বিপদ-আপদ ঘটবে বলে—?

কী আশ্চর্য ঠাকুরপো, মণি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে, এখানে এসে থেকে ছেলেমেয়ের কথা আমার খেয়ালও থাকে না ! সুধীনটা সত্যি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় বলো তো ? কী করে ? ছেলে যদি আমার গোল্লায় যায়, আমি তোমায় দুষবো কিন্তু ! আশাটারও কী হয়েছে দ্যাখো, দু-দণ্ড কাছে থাকে তো আর সারাদিন পাত্তাই নেই। ছেলেমেয়েরা আমায় ত্যাগ করছে না কি ?

তুমিই হয়তো ওদের ত্যাগ করছ ! প্রণব হেসে বলে।

সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় দুঃস্বপ্নের মতো, দেহমন যেন ভোঁতা হয়ে আসে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অবসাদে। সন্ধ্যার পর মণির দেহমন এক আশ্চর্য বিশ্রামের সুযোগ পায়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সরস্বতী হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। মণি কলতলায় ছিল, সেইখানে গিয়ে সরস্বতী বমি আরম্ভ করে। চোখের পলকে মণি ভুলে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমনভাবে সে সরস্বতীকে সামলে উঠতে সাহায্য করে, শরীরের এই অবস্থায় বাড়াবাড়ি করার জন্য বকে, বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় যে মনে হয় একটি অসুস্থ মেয়েকে সেবা করার সুযোগের জন্য তার দেহমন যেন অধীর হয়ে ছিল। সুযোগ পেয়ে বর্তে গেছে। পাখার বাতাস করতে করতে মায়ের মতো সে সরস্বতীকে বোঝায় মেয়েছেলের কতটুকু হিসেব না থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।

সময়মতো খাবে না, আগুনের আঁচে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডি রাঁধবে, একটা তোমার বিপদ হতে কতক্ষণ ?

চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই সরস্বতী বলে, কিছু হবে না। আমাদের কিছু হয় না।

ছয়

এমনি সময় সকালে একদিন যতীন আচমকা সুশীলকে ডেকে পাঠাল। তাব আহ্বান নিয়ে একেবারে তার গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়।

মণি বলে, হঠাৎ ডেকে পাঠাল কেন ?

সুশীল বলল, কে জানে। চালের কথা বলব না কি ?

মণি বলল, না এরা চায় না। আমাদের বাহাদুরি করে দরকার ?

অনেক কৌতূহল ও প্রত্যাশা নিয়ে সুশীল লাখপতি বন্ধুর কাছে যায়, অভ্যর্থনা পায় কল্পনাতীত। তাকে বসতে বলে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে যতীন ঝাঁঝালো গলায় বলে, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক ! এত বড়ো বজ্জাত তুমি ! আমি তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি আমার বিশ হাজার টাকার চাল ধরিয়ে দিলে ?

সুশীলের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। খাঁটি বিবেক হয়তো মানুষকে নির্ভয় করে, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ করেনি বলেই বিবেক কারও খাঁটি হয় না। ধনীর পা ধরে উঠবার চেষ্টায় যে এতকাল কাটাল, ধনী বন্ধুর মিথ্যা সন্দেহে অবিচলিত থাকার সাহস সে কোথায় পাবে ?

সুশীল সভয়ে বলে, আমি তো কিছুই জানিনে ভাই !

দ্যাখো, আমরাও ভাত খাই। শুধু ভাত খাই না, চোরা-বাজারে চাল বেচে ভাত খাই !

সুশীল আরও ব্যাকুল হয়ে কাতরভাবে বলে—কী বলছ তুমি ? আমাকে বিশ্বাস কর না ?

যতীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।—সারাবছর তোমার টিকিটি দেখতে পাইনি, হঠাৎ তুমি উদয় হলে দু-মন চালের জন্য। আমার কাছে কেউ দু-মন চালের জন্য আসে ? তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, ছুতো করে গুদোম দেখে রাশিয়ার এজেন্টগুলোকে লেলিয়ে দেবার মতলবে তুমি এসেছ। লেখাপড়া শিখেছ, কলেজে পড়াও, এমন বিশ্বাসঘাতক বজ্জাত স্পাই তুমি হতে পার কে তা ভেবেছিল। আমি বরং মনে মনে হেসে ভেবেছিলাম, তেমনি হাবাগোবা ভালো মানুষটিই রয়ে গেছ তুমি !

এ রকম চাঁছাপোঁছা গালাগালি সুশীলের সহ্য হয় না, ক্ষোভে অপমানে তার মুখ বাদামি হয়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে একটু মার্জিতভাবে গম্ভীর অবজ্ঞার সঙ্গে এই একই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা প্রকাশ

করে যতীন তাকে কেবল মর্মাহত নয় একেবারে মরমে মেরে ফেলতে পারত। চোরাকারবারিদের বাড়াবাড়িতে খেপে গিয়ে পাড়ার লোক যা করেছে তার সঙ্গে সুশীলের সত্যই যে কোনো সংশ্রব ছিল না, তার চোরা-চালের গুদাম ধরিয়ে দিতে গুদামের একটা নেংটি ইঁদুরের ভূমিকাটুকুও যে সত্যই সে নেয়নি, কিছুই তাতে আসত যেত না। এত দিন কিছুই হয়নি, আচমকা সে সামান্য চালের খোঁজে উদয় হবার পরেই তার বিশ হাজার টাকার চাল ধরা পড়ে গেছে বলে যতীন তাকে সন্দেহ করে, এতেই তার আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা শুরু হয়ে যেত। তারও তো সেই যুক্তিসর্বস্ব মন যাতে প্রকৃত সত্যমিথ্যার চেয়ে যুক্তিটাই বড়ো। নীতিগত বিচারে তার দোষ না থাক, ওই নীতিটাই যে এখন যতীনের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে !

তার মুখ দেখে যতীন সুখ পায়। সে আবার বলে, ছি ! ছি ! কত বড়ো নীচ কত বড়ো ছ্যাঁচোড় হলে বন্ধুর সঙ্গে এমন করতে পারে !

এবার আর সইতে না পেরে সুশীল চশমা খুলে হাতে নিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়—ক্লাসে ছেলেদের বে-আইনি বেয়াদপিতে মেরুদণ্ড জ্বলে গেলে এমনিভাবে আগে চোখের চাশমাটি সামলে ক্রোধ প্রকাশ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তুমি চাষা বনে গেছ যতীন ! তুমি ছোটোলোক হয়ে গেছ !

সুশীলের ভাবান্তর দেখে যতীন সত্যই একটু ভড়কে গিয়েছিল ! টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তু... যদি ছুঁড়েই মারে ? সে একটু নরম সুরে বলে, তুমি কী বলতে চাও ?

নিশ্চয় বলতে চাই, একশোবার বলতে চাই আমার কোনো দোষ নেই, আমি কিছুই করিনি। একবার শুনতে হয় তো আমার কথাটা ? এমন কি হতে পারে না যে অ্যাকসিডেন্টালি আমি ঠিক এই সময়ে চালের জন্য এসেছি, তোমার গুদোমের খবর আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল ? কিছুই না জেনেশুনে এমন অভদ্রের মতো তুমি আমায় গালাগালি দেবে !

এ প্রায় মেয়েলি অভিমান। যতীন মজা পায়। আরও একটু নরম সুরে বলে, তা হতে পারে, তুমি ইচ্ছে করে হয়তো করনি। কোথায় চাল পেয়েছ বলে বেড়িয়েছিলে তো ?

না। কাউকে বলিনি।

না, মিছে কথা, মণিকে সে সবকথাই বলেছে, চালের গুদাম যে গলিতে তার নামটা পর্যন্ত ! কিন্তু মণি তো 'কেউ' নয়, সে ধর্মপত্নী। মুখে যাই বলুক, মনে সুশীলের খটকা লেগেছে। বেশ একটা তোলপাড় উঠেছে। মণিই কি তবে বলে বেড়িয়েছে খবরটা ? অথবা হয়তো মণির কোনো দোষ নেই, নিজে থেকে সে কিছুই ফাঁস করেনি, প্রণবেরা কৌশলে তার কাছে সব জেনে নিয়েছে যে এ বাজারে এত চাল সুশীল কোথায় বাগাল ? ওদের অসাধ্য কিছু নেই। পরের আধঘণ্টা সময় এই সিদ্ধান্তটাই তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রায় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়।

এদিকে যতীন কিন্তু কেমন নরম হয়ে গেছে। যেমন হঠাৎ বন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ যেন সে বিশ্বাস করে বসেছে তার কোনো দোষ নেই। তাই বলে ক্ষমা কি চায় যতীন, দুঃখ প্রকাশ করে ? ও সব তার জবরদস্ত লোকের জন্য, বড়ো নেতা লাট-বেলাটের জন্য তোলা থাকে। তাদের গাল দেওয়া তো দূরে থাক, কড়া কথা বলার স্বপ্নও অবশ্য দ্যাখে না যতীন। সুশীলের মতো যে সব মানুষকে সে খুশি হলে জুতো মারে, ভুল করে জুতো মারার জন্য তাদের কাছে অনুতপ্ত হওয়া তার ধাতে নেই।

সে করে কী, চা আর খাবার আনতে হুকুম দেয়। তাতেই গলে জল হয়ে যায় সুশীল। খাবার খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একাগ্র গভীর চিন্তায় মুখ-চোখ কুঁচকে বলে, দ্যাখো যতীন, একটা কথা ভাবছি। যে রিকশায় চাল নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রিক্‌শাওয়ালাটা হয়তো বজ্জাতি করেছে।

যতীন মুচকে হাসে।

সস্তা সিরিজের ডিটেক্‌টিভ বই পড়ো বুঝি খুব ?

মোটেই না।

সুশীল আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তবে ধন ও শক্তির মালিকদের আঘাতে আহত হওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। অল্পেই সামলে নিয়ে বলে, খুব বেশি রকম ক্ষতি হয়েছে ভাই ?

যতীন নাক সিঁটকে বলে, বিশ-বাইশ হাজারের মাল গেছে, বয়ে গেছে। গুদোমটা গিয়ে অসুবিধা হল। কী আর হবে, ঠিক করে নেব সব।

তোমার তো কোনো ভয় নেই ? তোমাকে তো ধরবে না ? এই কথাটা ভেবেই আমার এমন খারাপ লাগছে। তোমায় যদি অ্যারেস্ট করে, জেলে দেয়—

কে অ্যারেস্ট করবে ? কে জেলে দেবে ?

তাই বলছিলাম। সুশীল হঠাৎ বোকার মতো হাসে !

যতীন বলে অন্য কথা।

প্রণব আজকাল কী করছে ? সিনেমায় গিয়েছে শুনলাম ? ডিরেক্ট করবে না অ্যাকটিং করবে ?

কিছুই করে না। আড্ডা মেরে বেড়ায়।

বাড়িতেই তো ওর বিরাট আড্ডা। কংগ্রেস-লিগকে দিয়ে কিছু হবে না, ইংরেজকে মেরে তাড়াও, চোরাবাজারিদের ফাঁসি দাও—

মাঝে মাঝে ও সব কথা বলে, বেশির ভাগ কথা হয় দেশের কুলিমজুর চাষাভুসা নিয়ে। কী যে ওরা বলাবলি করে আমি ভালো বুঝিনে।

দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।

ওটা রোজ বলে।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাসা-ভাসা আলাপ চলে। সুশীল মনে একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে। যতীনের অবিশ্বাস যে দূর হয়েছে, এতেও কেমন যেন সুখ পায় না। বিদায় দেবার সময় যতীন বলেছে, কাল-পরশু আরেকবার এসো।

মণিকে সব কথা খুলে বলতে সাহস হয় না, অনেক কথাই গোপন করে যায়। মোটামুটি বিবরণ শুনে সুশীলের প্রশ্নের জবাবে মণি বলে, আমি ? কেন বলতে যাব ? ও সব কথাই তোলেনি কেউ ! তবে—

চিন্তায় মুখ কালো হয়ে আসে মণির—দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করছি।

না না, সর্বনাশ !

তুমি থামো। আর যাই হোক, ঠাকুরপো মিছে কথা কইবে না।

প্রণবকে সে বলে, ঠাকুরপো, ওই যে চাল আনিয়েছিলাম, কে দিল, কোন ঠিকানা থেকে এল, এ সব জানতে চাওনি। কিন্তু রিক্‌শাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে বা অন্য রকম খোঁজ নিয়ে তোমরা কি চালের গুদাম ধরিয়ে দিয়েছ ?

কানাই দত্ত লেনের ব্যাপারটার কথা বলছ ? আমরা কিছুই করিনি। আমি কাগজে পড়ে প্রথমে জেনেছি। কিন্তু কেন বলো তো ? তোমাদের শেয়ার ছিল নাকি ?

বাজে বোকো না। উনি যেদিন চাল আনলেন, পরদিন গুদামটা ধরা পড়ল। ওঁর বন্ধু ওঁকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই ওদের বাতিক। জগৎসুদ্ধ লোককে শত্রু ভাবতে হয়, তাই বন্ধুকেও সন্দেহ না করে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষতিটা হল কোথায় ?

ক্ষতি হয়নি ?

কীসের ক্ষতি ? একটা দলিল বাগিয়ে নিয়েছে, সব ঝঞ্ঝাট ফুরিয়ে গেছে। কিছু বেআইনি কাজ হয়নি, অনেকদিন থেকে ওখানে প্রকাশ্যভাবে আইনসঙ্গতভাবে ওর চালের গুদাম। চালের মস্ত এজেন্ট তো। ঘুষ-টুষ দিতে অবশ্য কিছু খসে থাকতে পারে, সে সব ওদের গায়ে লাগে না।

সুশীল শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে, ব্যাপার মিটে গেছে ?

গেছে বইকী। চোরা গুদাম কাগজপত্রে খাঁটি করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

তার মৃদু কথা এমন ঝাঁঝালো শোনায় যে সুশীল অপরাধীর মতো উশখুশ করে। মণি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এবার বুঝতে পারছি ঠাকুরপো, পেটের জন্য সবার সঙ্গে ব্ল্যাক মার্কেটে চাল কেনার সঙ্গে সেই ক-মন চাল আনার তফাত কী ছিল।

প্রণব সায় দিয়ে বলে, বুঝতে চাইলে আজকাল অনেক কিছুই বোঝা যায়। আগে তবু অনেক পাপ অনেক অন্যায়ের একটা নীতিধর্মের লোকদেখানো কোটিং থাকত, আজকাল স্পষ্ট উলঙ্গভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ হল ফ্যাসিস্ট ধর্মের প্রভাব। অনেক কিছুই এখন শুধু ফাঁকি দিয়ে ধোঁকা দিয়ে করতে হয় না, গায়ের জোরে দাবড়ানি দিয়ে করে নেওয়া যায়।

এ সব কথা সুশীলের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। মণি কিছু কিছু বুঝতে পারে তার আজকালের চিন্তা আর অনুভূতির গভীরতা দিয়ে।

অন্যায়ের নগ্ন রূপ ? জীবনের আড়াল করা আর উলঙ্গ ব্যাভিচার ? তা ঠিক। এমনভাবে মুখোশ খুলে লোভ হিংসা অনাচার অবিচার বীভৎসরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে, এমন বর্বর চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভক্তিভাজন মানুষেরও যে নিজের সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা সম্পর্কে নিজেরই মনে খট্‌কা লেগে যায় ! কীসে কী হয়, কেন কী হয়, ভালো করে না বুঝেও এই কথাটা বড়ো হয়ে উঠেছে, এত যে বড়ো বড়ো বিশ্বাস আর বদ্ধমূল ধারণা চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেল, অন্য সব ধারণা বিশ্বাসগুলিও যে সেই পর্যায়ের নয়, কে বলতে পারে ?

আশা আর ভরসা, এই তো সম্বল ছিল। অপ্রাপ্যের আবর্জনায় ভরে উঠে নোংরা হয়ে উঠেছে জীবন, লক্ষবার আত্মহত্যা ঘটেছে আশার, তবু শেষ পর্যন্ত এইটুকু ভরসা ছিল যে, যেটুকু আছে যেটুকু পাওয়া যাবে ততটুকু আজও রইল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অবলম্বনও শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অনিশ্চিত, অন্ধকার। প্রচণ্ড দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমাগত নাড়া দিয়ে দিয়েই যেন শুধু আজ সচেতন করে রাখতে পারে, তুমি মানুষ, তুমি জীবন্ত মানুষ—তোমার প্রাণ-ধারণটাই তোমার বিচিত্র জীবন ! দুর্ভোগের মধ্যে ডুবে থেকেই যেন নতুন করে আবার সব জানতে বুঝতে সাধ যায়।

তাই, পরদিন আবার যতীনের কাছ থেকে ঘুরে এসে সুশীল যখন একটা সুসংবাদ দেয় যে যতীন তাদের একেবারে নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলেছে, তখন প্রথমটা আগ্রহে প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরক্ষণে মণি ঝিমিয়ে যায়।

বলে, থাক গে। আজ এখানে কাল ওখানে আর ছুটোছুটি করতে পারি না। কত পালিয়ে বেড়াব ?

এই বিপদের মধ্যে থাকবে ?

অ্যাদ্দিন তো আছি ? আর সবাই তো থাকবে ?

সে উপায় ছিল না বলে, কী করব। ভালো পাড়ায় গিয়ে থাকার সুযোগ যখন পাচ্ছি, কেন যাব না ?

দুজনের কলহ বেধে যায়, নতুন রকমের কলহ। ঝগড়াঝাঁটি তাদের আগেও হয়েছে, এমন জোরালোও হয়েছে যে একবেলা খাওয়া বন্ধ কথা বন্ধও ঘটেছে তার ফলে। নিরীহ এবং মণির একান্ত বশংবদ হলেও দাম্পত্য কলহে সুশীলকে অপটু দেখা যায়নি। আজ একটা নতুন তীব্রতা, নতুন

তিক্ততা দেখা দেয় তাদের মতান্তরে। এতদিন যত মতবিরোধ ঘটেছে সব ছিল একাভিমুখী দুটি মতের তুচ্ছ অমিল, দুটি মতেই তারা এবং তাদের সংসারটাই বড়ো, দুটি মতেই কাজ হয়, শুধু কারটা খাটবে বেছে নেবার ঝগড়া। আজ যেন দু মুখী মনের বিপরীত স্বার্থের সংঘাত বেধেছে তাদের মধ্যে, ঘরোয়া সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে ভেদ।

সুশীলের মতো মানুষ সে যেন গালাগালি দেবার ভঙ্গিতে বলে, মাথা বিগড়ে গেছে তোমার, শয়তানি কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায় ! বুড়ো বয়সে ঢং শিখেছ !

তীব্র জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে মণি ঝেঁঝে বলে, ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ তুমি, তুমি ঢং দেখবে না ? মানুষ তো নও, কত কী তুমি দেখবে !

যতীন বালিগঞ্জে ছোটো একটি ফ্ল্যাট তাদের দিতে চেয়েছে এ সৌভাগ্য একদিন তাদের উল্লসিত করে দিত, জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকত না, আজ ওই নিয়েই পরস্পরকে তারা প্রথম ঘৃণার আঘাত হানল, ফাটল ধরে আলগা হয়ে গেল এতদিনের সম্পর্কের ভিত্তি।

ভোলানাথের বৈঠকখানাটি প্রথমে স্থির করা হলেও এ বাড়িটিই পাড়ার শান্তি কমিটি গড়াব আসল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই প্রতিবাদে সুবোধ সিংহদের ইঙ্গিতে একদিন রাত তিনটেব সময় গুন্ডা দলের হানা দেবার চেষ্টা হয় ! ইতিমধ্যে শান্তি কমিটি অনেকটা সুগঠিতভাবে গড়ে না উঠলে সেদিন সত্যই বিপদ ঘটতে পারত।

এই আক্রমণের সুযোগে পরদিন সকালে সুশীল অনেকটা নরম সুরে মণির কাছে আবার বালিগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আবেদন জানায়। সত্যই আবেদন জানায। চিবদিন যেমন জানিয়েছে।

আমি যাব না। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার।

আমি যাব না, তুমি যেতে পার ! এমন অনায়াসে মণি যে এমন কথা বলতে পারে কে কল্পনা করেছিল ? শুধু কথা শুনে নয়, মণির চোখ মুখ দেখে মনে হয় সে যেন মায়া-মমতা ভুলে গেছে।

শহরের অসংখ্য মানুষের রসুইঘর নেই, একটি উনান জ্বালাবার ঠাঁই নেই, রান্না করে খাবার সম্বল বা সময় নেই। মেস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, চা-খানা, খাবারেব দোকান, চিঁড়েমুড়ির দোকান থেকে আরম্ভ করে ফলমূল ছাতু-লংকার ফিরিওলা পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহের বিচিত্র ব্যবস্থা। শখের বা শখ-ধর্মী প্রয়োজনের সায়েবি খানা যে প্রকাণ্ড ঝকঝকে হোটেলগুলিতে, তাবই সামনা-সামনি রাস্তার অপরদিকে ময়দানের গাছতলায় হয়তো একজন বসেছে ছাতুব ধামা নিয়ে। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে ও সস্তায় পেট ভরাবে গরিব মানুষ। মাজায় ঘষায় ঝকঝকে পিতল কাঁসার থালায় ছাতু মেপে নিয়ে জল দিয়ে মেখে ক্ষুধার্ত মানুষটা পেটে চালান করে দিল, তারপর মুখে ঢালল এক ঘটি জল।

থালাটি ছাতুওলার, জলও সেই দেয়।

মানুষ এভাবে ছাতু খায় এটা হয়তো জীবনে কোনোদিন চোখেও পড়ত না মণির, যদি না ময়দানের পাশে ট্রাম লাইনের ধারে গাছতলায় উবু হয়ে বসে গোকুলকে ওভাবে সে ছাতু খেতে দেখত। নীলিমার ভাই গোকুল। রিক্‌শাওলা বা ঠেলাগাড়িওলা বা ফিরিওলাদের সঙ্গে গাছতলায় সে ছাতু খায় !

বাড়িতে দম আটকে আসায় মণি হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। সুশীলের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ঝগড়ার পরে এবং কোথায় যাবে কী করবে না জেনে। শুধু পরনের সাধারণ কাপড়টা বদলে ফেলেছিল আর পাঁচ টাকার একটা নোট ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। বাড়ির বাইরে দুদণ্ডের মুক্তি এবং শান্তি খোঁজার এমন অন্ধ তাগিদ জীবনে তার এই প্রথম এল। অনেকদিন আগে এ বাড়ি

থেকে আরেকবার সে পালিয়েছিল, চিরতরে পালিয়েছিল, এই সুশীলকেই বগলদাবা করে। আজ একলা কোথায় যাবে ? ট্রাম চলেছে, ট্রামেই উঠে বসা যাক। ট্রামটাতেই না হয় একটা চক্র দিয়ে ঘুরে এসে ফের এখানে নামবে।

আপিসগামী যাত্রীতে ট্রাম ভরা। মেয়েদের রিজার্ভ সিট থেকে দুজন বৃদ্ধকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসে আনমনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ভেসে উঠে মনের মধ্যে রূপ নিতে থাকে। তার পরিত্যক্ত ছোটো বাড়িতে ফিরে গেলে কেমন হয় ? থাক সেখানে কারফিউ আর গোপন ছোরা, আতঙ্কে ভরাট হয়ে থাক দিন ও রাত্রি। তবু সেখানে সে ধাতস্থ ছিল, নিজের ভেতর থেকে নিজে এ রকম ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে বসেনি। সেখানে থাকার সময় সুশীল যদি যতীনের দয়ায় বালিগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবার ব্যবস্থা করত, কত খুশিই না সে হত ? মনে মনে যতীনকে কৃতজ্ঞতার কত অর্ঘ্যই না জানাত—ঠিক করে ফেলত যে শীঘ্রই একদিন বেড়াতে গিয়ে যতীনের স্ত্রীকে আপ্যায়িত করে আসাটা বিশেষ জরুরি কর্তব্য ! কী অদ্ভুত পাগলামিতে তাকে পেয়েছে যে এমন একটা সুবিবেচনার প্রস্তাব করায় সুশীলকে সে যা মুখে এল বলে বসল ? একবার নয়, দুবার ? পাড়ার অবস্থাটা দেখে এলে কেমন হয়, তার নিজের বাড়ি যে পাড়ায়, কুক্ষণে যেখান থেকে প্রাণের ভয়ে সে প্রণবের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে ? এখন যাবে ? একা ? অন্তত কাছাকাছি যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে বুঝে আসবে হাঙ্গামা কমেছে কিনা, ফিরে যাওয়া যায় কিনা ?

এই ভাবনার মধ্যে ছাতু খাওয়ায় রত গোকুলকে দেখে ট্রাম থেকে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

শহরে কারা রাঁধে আর কারা পথে-ঘাটে খাবার কুড়িয়ে খায়, প্রকাণ্ড হোটেলের প্রায় সামনেই কেমন সস্তায় সহজে ছাতু খাবার ব্যবস্থা থাকে, এ সব বর্ণনা গোকুল তাকে শোনায়। নিজেই শোনায়, জল খেয়ে কোঁচায় মুখ-হাত মোছে, ভূমিকাও করে না। মণি যে একা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এতে যেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই, খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

ছাতু খুব পুষ্টিকর জিনিস। একদিন খেয়ে দেখবেন।

আর কিছু পুষ্টিকর নেই ?

বেশি পয়সা লাগে। গাঁটে পয়সা কম থাকলে সস্তায় পুষ্টি চাই তো।

সকালে খেয়ে বেরোলে হত।

অত ভোরে কী খাব ?

কত ভোরে বেরোও ? রাত থাকতে ?

না, ভোরেই বেরোই। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

কেন ?

ছেলে পড়াই, দু-জায়গায় দুজনকে। একজনকে ছ-টায় পড়ানো শুরু করতে হয়, নইলে সময় কুলোয় না।

ছেলে পড়িয়ে দশটা নাগাদ এখানে এসে ছাতু খাও ? ছাতু খেয়ে যাও কোথায় ? তোমাকে কিন্তু আমি দশটা-এগারোটার সময় বাড়িতে দেখেছি মনে পড়ছে—

কথাটা বলে মণি ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। গোকুল বাড়িতে থাকে, নীলিমার সে ভাই। এতদিন এক বাড়িতে বাস করেও তেইশ-চব্বিশ বছরের জলজ্যান্ত এই ঢেঙ্গা ছেলেটা কখন বাড়িতে থাকে, কখন বেরিয়ে যায়, কী করে, কিছুই সে সত্যই খেয়াল করেনি।

গোকুল হেসে বলে, রোজ এখানে ছাতু খাই না, ছেলে পড়িয়ে বাড়ি ফিরি। আজ অন্য একটা কাজ আছে তাই। আপনি কোথায় যাবেন ?

আমি ? আমি যাব রাজাপাড়া লেন। আমাদের আগের বাড়িটা দেখে আসব ভাবছি।

ও পাড়ায় একা যাবেন ?

কেন ? একা গেলে কী হবে ? পাড়ার খবর জানো নাকি ? এখনও গোলমাল চলছে ? আচমকা বাড়ি ছেড়ে এলাম, ভাবছিলাম গিয়ে দেখে আসি—

গোকুল ধীরে ধীরে শার্টের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট বার করে ধরায়, একটিবার ক্ষণেকের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মণির মুখখানা দেখে নেয়। বলে, শুনেছি ওদিকে হাঙ্গামা চলছে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বরং খবর নিয়ে ওবেলা আপনাকে জানাব। আপনি বাড়ি ফিরে যান।

তাহলে তো ভালোই হয়। মণি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে।

পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তারপর এত জোরে এসপ্ল্যানেডের দিকে পা চালায় যে বেশ বোঝা যায়, মণির সঙ্গে কথায় তার জরুরি কাজের সময় নষ্ট হয়েছে। কথা বলার সময় কিন্তু মণি সেটা টেরও পায়নি।

প্রণবের কাছে পেয়েছে বোধ হয় গুণটা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রণব মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন আর কোনো কাজই তার আপাতত নেই !

বাড়ি ফিরে নীলিমাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনার ভাই কী করে ?

অসময়ে এই আকস্মিক প্রশ্নে নীলিমা একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, কত কিছু করে। ছেলে পড়ায়, কবিতা লেখে, খবরের কাগজে লেখে, মজুর উসকায়—

জবাব শুনে নীলিমা তামাশা করছে ভেবে মণি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এদের সঙ্গে নিজের অমিলটা আরও স্পষ্ট অনুভব করে মুখ ফিরিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, নীলিমা কোথা থেকে একটি লম্বাটে আকারের হালকা বই তার হাতে দিয়ে বলে, ওর লেখা কবিতা।

গোকুল তবে সত্যই কবিতা লেখে ? কবিতার ছাপানো বই পর্যন্ত তার আছে ? ঘরে গিয়ে বিছানার বসে পাতা উলটোতে প্রথমেই পৃষ্ঠার মাঝামাঝি ছোটো হরফে নামহীন ক-লাইন কবিতা তার চোখে পড়ে। উৎসর্গ বা ভূমিকা হবে—কবিতার বইয়ে বোধ হয় এই রকম ভূমিকা লেখা রীতি।

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা পড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার
দখল করেছি ভবিষ্যৎ।
এ প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু-পরোয়ানা।
দুটো দিন বাকি আছে,
থাক,
পড়ো না ঘোষণা।

পড়ে মানে যে মণি ভালো বুঝতে পারে তা নয়, মৃদু অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক অনুভব করে। জাপানি বোমা বা দাঙ্গার আতঙ্কের মতো নয়। এই আতঙ্কের স্থান যেন হৃদয়ের অন্য স্থানে, সমস্ত অনুভূতির একেবারে মূলে।

এত বড়ো শহরের জীবনযাত্রা যখন বেশি দিনের জন্য পঙ্গু ও ব্যাহত হয়, যুদ্ধ-বিপ্লব বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা অন্য যে কারণেই হোক, সেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার মারাত্মক

অস্বাভাবিকতার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মরীতি গড়ে ওঠে। কোন এলাকা কার পক্ষে কতখানি নিরাপদ বা বিপজ্জনক, কোন পথে দিবারাত্রির কখন যাতায়াত চলে, কখন চলে না, এ সব মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলে মানুষ। উন্মাদ ও গুন্ডাদের রক্তপিপাসাকে এড়িয়ে চলার দু-একটা কৌশলও শিখে ফেলে। তেমন দরকাব হলে সাজ-পোশাকের অদল-বদল ঘটিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটির ভেতর থেকেও যে ঘুরে আসা চলে দুঃসাহসী কর্মী বা সাংবাদিক দু-চারজন এটা হাতেনাতে প্রমাণ করেই দেয়। ধর্ম যেন উভয় পক্ষেই নিছক পোশাকি চরমতায় উঠে গেছে। সায়েবি পোশাকে তবু খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে, গুন্ডারা মাঝে মাঝে যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে, কী নাম কী দরকার কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তুমি যে হিন্দু কিংবা তুমি যে মুসলমান বাইরে তার একটা চিহ্নধারণ করে, একটা গান্ধী টুপি বা ফেজ মাথায় চাপিয়ে, হত্যার জন্য উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দু বা মুসলমান-পাড়ায় তুমি অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পাব। গুন্ডারা বিরক্ত করতে সাহস পাবে না। গুন্ডারাও তো জানে তারা কীসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, এমন আশাতীত নরকে পরিণত করে রাখতে পেরেছে শহরটাকে !

যে পথে সম্ভব যতক্ষণ সম্ভব ট্রাম বাস গাড়ি আর পদাতিক মানুষ চলাচল করে, বাজার বসে, দোকানে বেচাকেনা হয়, আপিস চলে, কারখানা চলে, সিনেমা চলে, রেডিয়ো বাজে, বস্তিতে বস্তিতে মানুষ বাঁচে আর অভিশাপ দেয়, ফুটপাতে ঘুমানোব লোকদের পর্যন্ত ফুটপাতে ঘুমোতে দেখা যায়। বিরাট মহানগরীর বিপুল জনসাধারণ দাঙ্গাকে সয়ে চলেছে, কিন্তু জীবনকে সস্তা হতে দেয়নি ! এই তো সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরে গেল হিন্দু-মুসলমানের বাংলায়, শহরের অলিতে-গলিতে মরা ইঁদুরের চেয়ে অগুনতি মানুষ চোরাকারবাবির লোভ আর লাভের অস্ত্রে খুন হয়ে পড়ে ছিল, পচেছিল। ওটা জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে, সকলের অন্ন আর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে পাওয়ার জন্যই যুগ-যুগ ধরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আনন্দ বেদনা বিশ্বাস ও আবেগ পর্যন্ত বশীকরণের ওষুধ মিশিয়ে কর্তারা পরিবেশন করে এসেছে। দুর্ভিক্ষ দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষকে হত্যা করা হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে, ওটা হল কৌশলে হত্যা করা। কৌশলটা ধরি-ধরি করেও সাধারণ মানুষ ধরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে রাজপথে ছোরা মেরে হত্যা চলতে দেবার অসঙ্গতি জনসাধারণ অনুভব করে। তাই এ রকম হত্যা ঠিক যতটুকু চলতে দিয়েও মোটামুটি বাঁচা যায় শুধু ততটুকু হত্যাই শহরে সম্ভব হয়েছে।

রাজাপাড়া লেনের মধ্যে আটকা পড়ে গোকুলের তাই আত্মরক্ষায় দুঃসাহসিক প্রেরণা জাগে। মণিদের বাড়ির সংবাদ নিতে এদিকে এসেছে, পাড়াটা শান্ত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সব ধর্মের সব পোশাকের মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচলের পিচ ঢালা নোংবা সংকীর্ণ পথটুকু তার মৃত্যুর ফাঁদে পবিণত হয়েছে—ধুতি-পরা সে হিন্দু যুবক।

হেঁটে, জোরে হেঁটে, এ পথটুকু পেরোতে মিনিট তিনেক লাগবে, তারপর ট্রাম রাস্তা, নিরাপত্তা। কিন্তু এই তিন মিনিটের পথে অনেক ছোরা কিলবিল করছে। পিছন থেকে পিঠে বা সামনে থেকে বুকে একটা ছোরা বসাতে দুই কী তিন সেকেন্ড লাগে। গোকুল পিছনে তাকায়। ওদিকে জবরদস্ত ঘাঁটি—ওদিকে ফেরা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব। সামনে তাকে এগোতেই হবে। দুশো-আড়াইশো গজ গলিটুকু পেরোতে যদি মরতে হয়, মরবে। অন্য কোনোদিকে অন্য কোনো উপায়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

দু-এক পলকের মধ্যে সহজ স্পষ্ট বাস্তব অবস্থাটা গোকুল আয়ত্ত করে ফেলে আর আয়ত্ত করতে করতে সেই দু-এক পলকের মধ্যেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে পানবিড়ির দোকানটাতে যায়। দোকানে পাঁচজন বিড়ি বানাচ্ছে একমনে। তাদের এই গলিতে যে একটা খুন হয়ে গেল, আরও খুনের জন্য গলিটায় তৃষ্ণা চরমে উঠে গেল, এ সব তুচ্ছ বিষয়ে তাদের যেন ভ্রুক্ষেপও

নেই! বিড়ি পাকানো শেষ না করলে হয়তো আজও তাদের আস্তানার বাল-বাচ্চার, দু-একদিনের ভুখা থাকার মীমাংসা হবে না।

নারকেলের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে গোকুল বেপরোয়াভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ে। বিড়িতে টান দিতে দিতে হেলে দুলে ধীরপদে অগ্রসর হয়। তার তাড়া নেই, তার আতঙ্ক নেই, সে এই পাড়ারই লোক—চকচকে শানানো ছোরা যারা নিয়ে আসে তাদেরই আপনজন। নইলে, বিধর্মী অনাত্মীয় কেউ কি এসময় এখান দিয়ে এভাবে চলতে পারে ? পরনে অবশ্য শার্ট আর ধুতি, কিন্তু আজকাল কোনো মুসলমান ছেলে কি শার্ট আর ধুতি পরে না ?

দশ-এগারোবছরের একটা ছেলে, তার পরনে মখমলের পোকায়-কাটা পরিত্যক্ত ট্রাউজার কেটে তৈরি করা হাফপ্যান্ট, গায়ে হাতকাটা নকল খদ্দর, ছিটের বোতাম-ছেঁড়া কোট, সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, তুম কোন হ্যায় ?

গোকুল গর্জন করে বলে, চোপরাও ! শালা !

ছেলেটা ছিটকে সরে যায়।

ধীরে ধীরে এগোয় গোকুল। সেই যেন এই গলির কর্তা, বাদশা ! সে জানে, প্রত্যেক পলকে জানে, প্রাণটা সে বজায় রাখছে অভিনয় দিয়ে, ঢং করে ! কেউ কখনও যা করে না সে তাই করছে।

গলির মোড়ে পৌঁছে, ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া লোকজনের চলাচলের মধ্যে এসে, সে যেন হঠাৎ দিশে হারিয়ে ফেলে। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে পিতলের শূন্যকুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে একজন উড়িয়া দোকানে দোকানে ঘণ্টা নেড়ে একটা ফুল আর একটু জল ছিটিয়ে ব্যাবসা চালিয়ে চলেছিল, অসাবধানে পা বাড়াবার ফলে সে বেচারিকে গোকুল না জেনে কুপোকাত করে দেয়।

মুখ থুবড়ে সে ফুটপাতে পড়ে যায়। তার জীর্ণ তসরের কাপড়ের তলা থেকে একটা বোতল ফেটে কাচ আর ধেনো মদের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত শহরেও সে ধর্মকে আশ্রয় করে দিব্যি ব্যাবসা চালাচ্ছিল। এক পয়সা মূলধন দরকার হয়নি, গায়ে দেবার সাধারণ একটা চাদরের বদলে নামাবলি চাদর, কয়েকটা ফুল-পাতা, একটু কলের জল। কলকাতার কলে গঙ্গার পবিত্র জলই সরবরাহ হয় !

সামলে-সুমলে উঠে ধর্ম-ব্যবসায়ী উড়িয়াটি গোকুলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলে, লেংড়ি মাবার মানেটা কী মশায় ?

কে লেংড়ি মেরেছে ?

শুনে লোকটি সিধে হয়ে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে পিতলের ফুল-চন্দন সজ্জিত দেবতার সাজিটি যে গড়াগড়ি যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালও করে না। গায়ের নামাবলিটা খুলে কোমড়ে জড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখুন, আপনিও বাঙালি, আমিও বাঙালি। আপনি দাঁতের মাজন ফিরি করছেন, আমি অন্য জিনিস ফিরি করছি। আমাকে লেংড়ি মেরে ফেলে দেবার মানেটা কী মশায় ?

সামনেই একটা ট্রাম যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে লাফিয়ে গোকুল ট্রামটায় উঠে বসে, এখানে ওই অবস্থায় জীবনযুদ্ধের দুই ফিরিওলার হাতাহাতি যুদ্ধ সৃষ্টির সাধ তার ছিল না। বেচারির দেশি মদের বোতলটা চূর্ণ হয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় ও জ্বালা শান্ত হবার নয়। মার খেলে জীর্ণ শরীরে আরও ব্যথা পাবে। তার চেয়ে হার মেনে তার পলায়ন করাই ভালো !

আরও একটু কাজ ছিল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধান করে গিয়ে দেখতে পায়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মণি রান্নাবান্নার কাজে নেমেছে,—একা। নীলিমা সরস্বতী বা উষা এরা কেউ ধারে-কাছে নেই।

মণি বলে, এত দেরি হল ? যাক গে, এক টুকরো রুটি আছে, চা খেয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে ভাত দেব।

গোকুল বলে, বলেন কী ? সন্ধ্যাবেলা ভাত খেয়ে নিলে মাঝরাতে খিদে পাবে যে ? চা-টা খাই, ভাত ঠিক সময়েই খাব। একা রাঁধছেন কেন ?

ভারী রান্না, এতে আবার কজন দরকার ?

মুখ-হাত ধুয়ে এসে গোকুল চা খায়, তার বাড়ির কথা মণি তোলে না। আসলে, কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল।

গোকুল নিজে থেকে বলে, আপনাদের ও পাড়াটা দেখে এলাম। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মালপত্র কিছু রেখে এসেছিলেন ?

চেয়ার টেবিল খাট, ক-মন কয়লা, এই সব ছিল।

বোধ হয় আর নেই।

বাড়িতে ঢুকেছিলে ? তালা দিয়ে এসেছিলাম।

তালা নেই। অন্য লোক বাড়ি দখল করেছে, ভেতরে যেতে পারিনি। এমনিই প্রাণটা যেতে বসেছিল।

মণি ব্যাকুল হয়ে বলে, কেন তবে গেলে পাড়ার মধ্যে ? আমি শুধু বলেছিলাম তফাত থেকে গা বাঁচিয়ে পাড়ার অবস্থাটা একটু জেনে আসতে। বাড়ি পর্যন্ত যেতে তো বলিনি তোমাকে ?

যে বিপদ ঘটতে পারত তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে মণিকে কাতর হয়ে পড়তে দেখে গোকুল বুঝিয়ে বলে, জানলে আমিই কি যেতাম ? প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কী একটা ঘটল, নইলে ভাবনা ছিল না।

নীলিমাকে গোকুল জিজ্ঞাসা করে, ওঁকে একা রাঁধতে দিলে কেন ?

নীলিমা উদাসভাবে বলে, ওঁনার শখ। আমাদের খেদিয়ে দিলেন। কারও কিছু করবার দরকার নেই, উনি একা সব করবেন !

দুপুরে মণি একটু শুয়েছিল। উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় মনটা ছিল শান্ত। বাইরে থেকে ফিরে সুশীল একটু তফাতে ম্লান বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ বসে থাকার পাঁচ মিনিটে সে শান্ত ভাবটুকুও বিগড়ে গেল।

সুশীল প্রথমেই কথা বললে বোধ হয় এ রকম হত না। তারপর সুশীল যখন অতি মৃদুকণ্ঠে আদরের সুরে কথা বলল গভীর বিতৃষ্ণায় জগৎটা তিতো হয়ে গেল মণির কাছে।

কিছু ঠিক করলে ?

সে তো বলেই দিয়েছি।

দ্যাখো—

মণি উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কোথায় যাবে ? রান্নাঘরে নীলিমা দুজনকে ভাত দিচ্ছিল, সেইখানে গিয়ে বসল।

শানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, ওবেলা থেকে আমি রান্নাবান্না করব।

মণি হঠাৎ প্রায় গায়ের জোরে সেই যে রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করল, মনে হল মরলেও আর এ দায়িত্ব সে ছাড়বে না। অধিকাংশ সময় সে রান্নাঘরেই কাটায়। এ দেশের মেয়েরা যে সত্যিই নিছক পুরুষের ভোগের সামগ্রী, রাঁধুনি চাকরানি আর পুরুষের সন্তান-সন্ততির দুধ-মা ধাই—এ খবরটা সে চিরকালই জানত। মাসিকপত্রাদিতে কী কম লেখা সে পড়েছে এ বিষয়ে ! এ দেশের নারী-সমাজকে মনে মনে সে কী কম আহা জানিয়েছে ! সুশীলকে কেঁচো বানিয়ে নিজের ঘর-সংসারে তার ছিল অখণ্ড প্রতাপ, নিজেকে অবশ্য ওই অভাগীদের দলে সে ভাবতে পারত না। অহর্নিশ মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে, স্নেহ-সেবা কান্না-অভিমানের জাল বুনে, কী অধ্যবসায়ের সঙ্গেই একটি দুর্বল পুরুষ আর তিনটি ছেলেমেয়ে এই চারটি প্রজা নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য বশে রেখে সে অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে

এসেছে। নিজের ঘরের কোণে নিজেকে সে যাই ভাবুক, আসলে সে-ও ওই বিরাট রাঁধুনি চাকরানি-মার্কা মেয়েদেরই দলে, এটা টের পেয়ে তাব প্রচণ্ড অভিমান ফেটে পড়েছিল। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব রাজনীতি নেতা নিয়ে বেশি মাথা-ঘামানোর বিরুদ্ধে তার সেদিনের অসহিষ্ণুতা, সুশীলের সঙ্গে শত্রুর মতো ঝগড়া, রান্নাঘরে আশ্রয় নেওয়া সবই তার প্রতিক্রিয়া। দেশটা বড়ো, দেশ-বিদেশ আরও বিরাট, রাজনীতির সুতো টানলে নিরালা ঘরের কোণে মশারির অন্তরালের গোপন মুহূর্তগুলিতে পর্যন্ত বুঝি টান পড়ে : এ সব কথা সামনে রাখলে নিজে তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়।

তুচ্ছ যে হয়ে গেছে তার প্রতিকার মণির জানা নেই, নিজেব ছোটো সংসারটিতে ফিরে গেলেও আগের দিনগুলি তার ফিরবে না। নিজেকে বড়োই সে অসহায় বোধ করছিল। রান্নাবান্নায় মেতে যদি ভুলে থাকা যায় ! প্রহৃত আদুরে ছেলের মতো শঙ্কিত কাঁদো-কাঁদো মুখ কবে সুশীল যে আশেপাশে ঘুরঘুর করবে, এটা থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া গেছে।

তার রান্নাঘরে আশ্রয় নেওয়ার মানে সুশীল বুঝেছে এক রকম ! সে ভেবেছে, ঝগড়া কবে মণি এখন অনুতাপে কাতর। মণিকে নরম কল্পনা করে তার পৌরুষ ধাতস্থ হয়েছে। সেও গম্ভীর মুখে বই আর কাগজে মন দিয়েছে।

সকালে প্রণব এসে রান্নাঘরে টুলটা টেনে বসে। বলে, হঠাৎ রান্নার মধ্যে ডুব মারলে কেন ?

কারও সঙ্গে বনে না, কী করব। একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ ?

কারও সঙ্গে বনে না বলে একা এতগুলো লোকের রান্না রেঁধে মরতে হয় বুঝি ?

অনেকদিন পরে মণি আজ মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে।

যে যে-কাজের যোগ্য। রাঁধাবাড়া বাসনমাজা ছেলে বিয়োনো আমার কাজ। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ মার্কসবাদ এ সব কি আমার জন্য ? আমাব চালচলন কথাবার্তায় তোমাদের হাসি পায়, তোমরা বিরক্ত হও। তার চেয়ে যা পারি তাই করছি।

হাসিমুখের কথাগুলি করুণ কিন্তু তাতে কী ঝাঁঝ ! ঝাঁঝটা বোধ হয় প্রণব পছন্দ করে, নইলে মণির কথাগুলি সত্যই নিছক ন্যাকামি হয়ে যেত।

আমরা যে হাসি, বিরক্ত হই, এটা কিন্তু আমরাই জানি না।

ও সব আমি বুঝি ঠাকুরপো।

তুমি কিছুই বোঝ না। নিজেই বলছ, এতকাল ঘরকন্নায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছ, বড়ো বড়ো কথা তোমার জন্য নয়। নিজেই আবার বলছ তুমি সব বোঝো। এই কটা দিনে তোমাব বুঝবাব ক্ষমতায় ম্যাজিক ঘটে গেল ? তুমি বুঝে ফেললে যে রাজনীতি সমাজনীতি বোঝ না বলে আমরা মনে মনে হাসি ? নিজেকেই তুমি বুঝতে পার না, তুমি আমাদের কী বুঝবে ? ঝগড়া তোমার নিজের সঙ্গে, নিজের মনগড়া ধাঁধায় তুমি পাক খাচ্ছ।

শুনতে শুনতে মণির দুচোখে রোষের দীপ্তি ঝলক মেরে যায়। খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সে এমন ভঙ্গি করে যেন খুন্তি দিয়ে প্রণবকে মেরে বসবার ঝোঁক সামলাচ্ছে।

বলে, ঠাকুরপো, আমার স্বামীও মস্ত বিদ্বান, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে যেয়ো, কেঁচো বনে যাবে। অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত প্রফেসার আমার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বড়ো বড়ো কথা বলেছে, আমার দেওয়া চা-বিস্কুট খেয়েছে। তাদের কথা এক বর্ণ বুঝিনি। তাই বলে কি আমার মনটা জবুথুবু উই-টিবি হয়েছিল ? আমি হাসিনি কাঁদিনি ভাবিনি ? তোমার বিদ্বান দাদার মনের খুশি-অখুশিতে পুতুল নেচেছি ? কী বুদ্ধি তোমার ঠাকুরপো ! বড়ো বড়ো কথায় মেতে তোমার সহজ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা নিয়ে আমি চলব না তো কি তোমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা ধার করতে যাব ? আমার মনটা যেমন ছোটো তোমার মনটা তেমনি বড়ো তাই বলে কি তোমায় আমি বলব যে, তোমার মনটা দিয়ে আমার মনটা চালাও ?

মণির দুচোখ জলে ভরে যায়। গাল বেয়ে টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ে ! কিন্তু সে হিসাবি মেয়ে, বাপ-দাদার জুটিয়ে দেওয়া পুরুষটার সঙ্গে বহু বছর তিনটে ছেলেমেয়ে বিইয়ে খাওয়া পরা রোগ-ব্যারাম সামলে, নিজে খেয়ে-পরে আর সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে জীবন কাটিয়েছে, সে জানে এখন কাঁদলেই সর্বনাশ হবে। চোখ দিয়ে জল পড়ে তবু সে তাই কাঁদে না। ন্যাতা দিয়ে কড়াই মুছে নতুন ব্যঞ্জন রান্না শুরু করার মতো আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নতুন সুরে বলে, দুবার তুমি আমায় দিশেহারা করেছ ঠাকুরপো, আর পারবে না।

দুবার তোমায় দিশেহারা করেছি ? আমি ?

ভীরু নতুন বউ পেয়ে একবার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। সবাই নিয়মে চালাত, ওঠাত বসাত, তুমি তোমার কলেজি চ্যাংড়ামি আব গোঁয়ারতুমি দিয়ে নিয়ম ভাঙতে, আমার রাইট নিয়ে ফাইট করতে, বিদ্রোহ করতে শেখাতে। মনে আছে সে সব কথা ? তোমার পাল্লায় পড়ে সংসারের দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলার বদলে স্বাধীন হতে শিখলাম—আহা, কী স্বাধীনতাই শেখালে ! বড়ো ছেলের বউ, বাড়ির হালচাল বুঝে আস্তে-আস্তে দশটা দায়িত্ব নিয়ে বাড়ির একজন হয়ে উঠব সবাই এটা চেয়েছিল—কাজেই ঠিক তার উল্টোটা কব, সকলকে পর করে দাও ! উঠতে বসতে ঠোকাঠুকি লাগাও ! একটু যে স্নেহ চায় গালে তার চড় মারো। নইলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, সবাই তোমায় গিলে ফেলবে। কেন ঠাকুরপো ? আমায় কি খেতে পরতে দিত না, গাল দিত, মারত কেউ ? আমায় একটু খুশি করার জন্যেই বরং কে কী করবে ভেবে পেত না। তুমি মাথা বিগড়ে না দিলে আজ কি আমার এ দশা হয় ? এ বাড়িতে ফিরে এসে মনে হয় শত্রুপুরীতে এসেছি ? মা বেঁচে থাকলে এ সংসাবে যে ঠাঁই পেতেন, আমি আজ সেখানে থাকতাম।

প্রণব খানিক চুপ করে থেকে বলে, তোমায় একটা খবর জানাই। শুনে খুব কষ্ট পাবে। কিন্তু না বলেও লাভ নেই। পরে ভুল ধারণা ভেঙে কষ্ট বরং আরও বেশিই হবে।

মণি নীরবে চেয়ে থাকে।

শেষের দিকে মা-র মাথাটা একটু খাবাপ হয়ে গিয়েছিল মণিবউদি। তীর্থে যাবার নাম করে পালাতেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনতে হত। মা-র চিকিৎসায় দুবছরে বাবার সমস্ত জমা টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মা একদিন ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।

বেশি জ্বরে মা হার্টফেল করেছিলেন।

মণির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। তাব নিশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে।

তাই আমরা সবাইকে বলেছিলাম। বাড়ির সকলেও জানত না। গুরুদেব এসেছিলেন। মা-র কথা সব শুনে বাবাকে বললেন, ছাদে একটা সর্বতীর্থ সৃষ্টি করতে হবে, তিন দিন হোমপূজা চলবে। মা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, সারাদিন ছাদে সব আয়োজন করতে মেতে গেলেন। আমি বাড়ি ছিলাম না, অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেই মা আমায় ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন। বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, খোকা, আমায় সব তীর্থ দেখাবি বলেছিলি, এই দ্যাখ, সব তীর্থ তৈরি হচ্ছে। তোরা বাপ-ব্যাটায় আমায় ঠকাচ্ছিস কেন রে ?

ঠাকুরপো !

মা-র প্রত্যেকটি কথা মনে গাঁথা হয়ে আছে, একটি শব্দও এ জীবনে ভুলব না। মা বলেছিলেন, বুড়ো বয়সে তীর্থও করতে দিবি না তোরা ? গোরু-ছাগলের মতো ঘরের গোয়ালে মরতে পারব না খোকা। তীর্থে আমি যাবই। বলেই সোজা গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কড়াইয়ে তরকারি পুড়ে যেতে শুরু করে। মণির হাত থেকে খুন্তি খসে পড়েছে। কথা বলতে বলতে প্রণব এমনভাবে হাতে হাত কচলিয়ে চলেছিল যেন তার মায়ের হত্যাকারীদের টুঁটি দুহাতে চেপে মারছে।

মা যে তীর্থে যেতে চেয়েছিলেন মণিবউদি, সে তীর্থ এ জগতে নেই, সমাজ-জীবনে নেই। দুবার ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেকবার দু-একটা জায়গা ঘুরে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে একা এই বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। বেঁচে থাকতে সব কাজ ফুরিয়ে গেলে, মানুষ ফালতু হলে, এ রকম হয়। সবাব বেলা আমার মা-র মতো চরম হয় না, মা-র মান-অভিমান চিরদিন খুব উগ্র ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে ঘবে পুরানো মায়েদের এই গতি, অবলম্বনহীন শেষ জীবন। শুধু সংসারটুকু জীবনেব ভিত, সংসারের ভিতটাই ধ্বসে যাচ্ছে।

তুমি আবার আমায় দিশেহারা করছ ঠাকুরপো।

মাপ চাইছি। মা-র কথা তুললে কিনা, আমার জন্য সংসারে মা-র স্থানটি নিতে পারনি বললে কিনা, তাই এ সব বলে ফেললাম।

এতদিন কেন আমায় কিছু বলনি ?

অবান্তর কথা আমি বলি না মণিবউদি।

কড়াইয়ে তরকারি পুড়েই চলেছিল, খেয়াল করে মণি তাড়াতাড়ি ঘটি কাত কবে জল ঢেলে দেয়। ক্ষুব্ধ চোখে তরকারিটার দিকেই চেয়ে থাকে। এ তরকারি আব পবিবেশন করা চলবে না, খানিক আগেও যা ছিল সবুজ সতেজ আলু-কুমড়ো, ভেজাল তেলে সাঁতলে খাদ্য হচ্ছিল, দু-দণ্ডে তা কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। দু-এক মিনিটে জগতে কী অঘটন ঘটে যায় ! সকলে নিন্দা করবে, যা-তা বলবে। অন্তত মনে মনে ভাববে যে, আহা, গায়ের জোরে রান্নাব ভাব নিয়ে কী সুন্দর পোড়া তরকারিই ইনি খাওয়াচ্ছেন !

একটু বোসো ঠাকুরপো।

তরকারির ঝুড়ি দেখে মণির কান্না পায়। আধখানা বেগুন, গোটা তিনকে আলু, একটু টুকবো আদা, কয়েকটা পেঁয়াজ আর কালচে মারা শুকনো গোটা-দুই কাঁচাকলা ছাড়া তবকারিব ঝুড়িতে কিছু নেই। ডাল আর তরকারি দিয়ে একুশজন লোক ভাত খাবে।

মণি ফিরে গিয়ে বলে, ঠাকুরপো, আমায় কিছু তবকারি এনে দাও, এদিকের বাজারে তো কারফিউ হয়নি ?

পুরোনো বাঁকানো হাতাটা দিয়ে উনুন খুঁচিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে হাত ধুয়ে মণি আবাব মিনতি করে বলে, আলু পটোল বেগুন, কুমড়া যা পাও এনে দাও ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি। আমাদের কথা শেষ হয়নি, অনেক কথা আছে। তরকারিটা রেঁধে সারারাত তোমার সঙ্গে কথা বলব।

প্রণব উঠে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। বলে, গোকুলকে বাজারে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে। দ্বিতীয়বার কবে তোমায় দিশেহারা করলাম বলো তো শুনি ?

প্রথমবারের সব কথা বলা হয়নি। তুমি কেমন বিশ্বাসঘাতক সেটা শোনো।

বলো।

তুমি হঠাৎ মাকে টেনে আনলে। তুমি বিগড়ে না দিলে আমি এ সংসারেই মানিয়ে থাকতাম, মা-র আসনটি পেতাম। তার মানে কি এই আমি অবিকল মা-র মতো হতাম ? সংসার বদলাত না ? সংসার যেমন বদলেছে, আমিও তেমনি বদলে যেতাম—আমিও একালের মেয়ে। তুমি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে, বড়ো সার্থকতার পথ দেখালে। বেশ, আমি আজও বলি, তোমার ওই বিদ্রোহের পথেই সব ফাঁকি থেকে মুক্তি পেতাম, জীবনটা সত্য হতে পারত। কিন্তু তুমি কী করলে ? তোমার বাইরের জীবন বড়ো হয়ে উঠল, দুদিন পরে আর তোমার পাত্তা পাই না। একটু বেনোজল ঢুকিয়ে তুমি নাগালের বাইরে সরে গেল। নিজের পথ খুঁজে নিতে লাগলে, আমায় ছেড়ে দিলে এক অদ্ভুত অসহ্য অবস্থায়। সবার সঙ্গে বিরোধ, শুধু অশান্তি, আর কিছুই নেই। কেন, কী তোমার দরকার ছিল

গোবেচারি আমার মনটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ? বিচারবুদ্ধিতে ধাঁধা লাগিয়ে তোমাব পথে দু-পা সাথে করে এগিয়ে নিয়ে ফেলে পালাবার ?

আমি ফেলে পালাইনি। তুমিই সঙ্গে চলতে পারলে না।

মণি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, সঙ্গে চলতে পারলাম না মানেই তো ফেলে পালালে। আমি তো পারবই না তোমার সঙ্গে চলতে—তুমি যদি না চেষ্টা করে সঙ্গে নাও। সেটা ছিল তোমার দায়িত্ব। আমায় খানিকটা বিগড়ে দিলে, খানিকটা এগিয়ে নিলে তারপর আর ফিরে তাকালে না,—এ তো উচিত হয়নি। প্রথম থেকে উদাসীন থাকলেই পারতে।

তুমি ভুল করছ। জীবনে কত কাজ, কত দায়িত্ব, সে সব অবহেলা করে তোমায় মানুষ করার জন্য মেতে থাকলে তুমিই আমায় অশ্রদ্ধা করতে। এ পথে কেউ কাউকে চিরকাল হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার মানে দাঁড়ায়, একটা মিথ্যে বোঝা বয়ে চলা। এগোবার সাধ থাকলে, তুমি নিজেই এগোতে পারতে। আমি পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি শুধু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলে।

তাহলে তো মীমাংসা হয়ে গেল। তোমার ছিল শুধু একটা ঝোঁক, একটা খেয়াল। সংসারী হওয়াটাই ছিল তোমার আসল সাধ। নইলে ধাঁধা লাগত না। দেশের জন্য দশের জন্য নিজেকে একটু কাজে লাগানো, এতে ধাঁধার কী আছে ? স্বাধীনতা ছিল তোমার সাময়িক একটা ঝোঁক, আর কিছু নয়।

ও ঝোঁকটা তুমিই গজিয়েছিলে। বেশ তো, ঝোঁকটা শুধরে নিয়ে ঘরে থেকেই যাতে বড়ো আদর্শ মেনে বড়ো কাজ করতে পারি, সেটা করলেই পারতে ? আমি তো তোমা বই আর জানতাম না ! তুমি হুকুম দিলেই তো আমি দেশের জন্য প্রাণটা দিতে পারতাম। বোকাসোকা একটা সাধারণ বউ, সে তো শিশুর সমান, তোমায় ও সব সংসার-ছাড়া ব্যাপারে তাকে শুধু খেপিয়েই দেবে, ঠিক পথে চলতে শেখানোর দায়িত্ব নেবে না ? সেটাই তো বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রণব নিজের মনে বলে, শিশুর সমান ! সংসারের ব্যাপারে নয়, সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। সংসার-ছাড়া ব্যাপার ! শিশুর সমান !

মণি বলে, আগে শুনে নাও, পরে সমালোচনা করবে। এই তো গেল পুরানোবারের হিসেব। এবার কী কবলে ? একটু বীরত্ব দেখিয়ে থতোমতো খাইয়ে সাজানো সংসার থেকে হ্যাঁচকা টানে শিকড়-সুদ্ধ তুলে ফেলতে চাইলে। আমায় যদি তোমার দলে টানার সাধ, গড়ে-পিটে নাও, জানতে-বুঝতে শেখাও ? মুখ্যু তো আছিই, জ্ঞানও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। সেটা নতুন কিছু নয়। ডেকে নিয়ে, টেনে নিয়ে অপদস্থ করা কেন ? আমার চালচলন কথাবার্তায় তোমরা যে হাসাহাসি কর, সেটা তোমাদেরই লজ্জা, বুঝতে পার না ?

বুঝতে একটা অসুবিধা আছে, তাই বুঝতে পারি না। তোমায় নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না, বারবার এ কথা বলেও তোমার ভুল ধারণা কাটাতে পারছি না। তোমায় নিয়ে হাসাহাসি করার সাধও কারও নেই, সময়ও নেই। নিজের মনে নিজেকে নিয়ে তুমি হাসাহাসি করছ। তোমার মনের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার মনের মধ্যে না ঢুকলে কী করে এটা আমাদের বোধগম্য হবে ?

প্রণবের কথা যেমন বাঁকা কথার সুর তেমনি কড়া হয়ে উঠছে খেয়াল করে মণি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর প্রণবের মেজাজকে উপেক্ষা করে বলে, হাসাহাসি মানে কি ইয়ার্কি তামাশা ? সেদিন তোমরা খালি বড়ো বড়ো কথা বলছিলে, আমি বিরক্ত হয়ে গান-টান শুনতে চাইলাম। সবাই তোমরা কীরকম চুপ হয়ে গেলে আমি টের পাইনি ভেবেছ ?

মনগড়া টের পেয়েছ। নইলে এটুকু নিশ্চয় টের পেতে, তোমার মতো আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, তখন শুধু জাবর-কাটা চলছিল।

একঘেয়ে লাগছিল সবারই, তুমি মুখ ফুটে সেটা বলে আলোচনাটা থামিয়ে দেওয়ায় সকলে বরং কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিল। তুমি উল্‌টোটা বুঝলে। মনগড়া বোঝা এই রকম হয়। বোঝাটা মনের মতো হলেই হল। আর কিছুই দরকার হয় না।

প্রণব উঠে দাঁড়ায়।

অন্য সব কিছুই তোমার মনগড়া মণিবউদি। যার সংস্পর্শে আসবে, যে তোমায় নতুন কিছু শোনাবে, একটু বিচলিত করবে, তাকেই যদি তোমার দায়িত্ব নিতে হয়, সংসারে একা থাকা ছাড়া তোমার গতি নেই। তোমার হিসাবে দাঁড়ায়, বন্ধুমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

রাগ করলে ? আমি কিন্তু সাধারণ লাভ-লোকসান নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিনি। ওটা আদর্শগত বিশ্বাস রাখা-না-রাখার কথা।

তোমার বিশ্বাসও তবে দুরকমের ? একটা সাধারণ লাভ-লোকসানের, আবেকটা আদর্শগত ? কখন কোন হিসাবটা ধববে ঠিক কব কী কবে ?

মণি দু-চোখে আগুন জ্বালিয়ে তাকায, তাতে তার চোখ দুটিই শুধু কটমটে মনে হয। তাব নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে চোখের ধমকে কাউকে কাবু কবাব সাধ্য তাব আর নেই।

তর্ক করে আমার কাছে পার পেলে, জগতেব কাছে পাবে না।

তর্কটাও তবে আমিই করলাম ?

জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রণব বেরিয়ে যায়।

গোকুল চটের থলিতে তরকারি এনে ঢেলে দিচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী মেনে মণি বলে, দেখলে ? গাল দিয়ে জবাবটা শুনবাব ধৈর্য রইল না, গটগট করে বেরিয়ে গেল ? এরাই দেশোদ্ধার কববে !

ঝিঙে-বেগুন গুছিয়ে রাখতে রাখতে গোকুল হেসে বলে, ভাবছেন কেন ? আপনাব জবাব না শুনে যাবেন কোথা ? যেচে এসে জবাব শুনতে হবে।

মানে কী হল ?

মানে খুব সোজা। আপনাব বিষয়ে অজানা কিছুই নেই। মানুষটা আপনি কেমন, কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সব জানা কথা। যে আপনাকে জানে তাব মনে আজ প্রথম প্রশ্ন জাগা উচিত . আপনার মধ্যে এমন তোলপাড় উঠল কেন ? এমন সংসাবি মানুষ আপনি, কেন আপনি এমনভাবে নাড়া খেলেন ? দেখে-শুনে মন-বাখা কথা কইতেন, মিষ্টি করে হাসতেন, চুকে যেত। তাব বদলে সবাই কী ভাবে কী বলে, কী করে তাই নিযে হয়েছে আপনাব জ্বালা। কেন ? এব জবাবটা তো আপনার কাছেই পেতে হবে।

খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে মণি সংশয়ভরে তাকায়। তাব আশঙ্কা হয়, হয়তো গোকুল তার ক্ষোভ দূর করতে মন-রাখা কথা বলছে।

আমি আবার একটা মানুষ !

গোকুল হাসিমুখেই বলে, সে প্রমাণটাই তো দিলেন যে এতকাল চোখ-কান বুজে সংসার করেও মানুষ রয়ে গেছেন। নইলে, আপনার এত জ্বালা হবে কেন ? শুধু যদি আপনার মনে হত, আমাদের রকম-সকম আপনার পছন্দ নয়, সেটা আপনার মনে-মনেই থাকত। কিন্তু আপনি একেবারে ছটফট করছেন—এ তো সোজা ব্যাপার নয়। আপনার ভেতরে ওলট-পালট চলেছে। ফল কী দাঁড়াবে সেটা অবশ্য আলাদা কথা। তবে আপনি আর আপনি থাকবেন না মণিবউদি, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

কী হবো ?

কে জানে কী হবেন—বন্ধু অথবা শত্রু। কিন্তু বাইরের জগৎকে ঠেলে সরিয়ে উদাসীন হয়ে সংসার নিয়ে মেতে আর থাকতে পারবেন না।

বন্ধু হওয়া কপালে নেই। কারও সঙ্গে মিলছে না।

গলায়-গলায় ভাব দিয়েই বুঝি শুধু বন্ধুত্ব শুরু হয় ? শুধু মিল নিয়ে সৃষ্টি চলে ? মিল আর অমিল আছে বলেই জগৎটা এগোচ্ছে, নইলে কবে পচে গলে যেত ! তা জানেন ?— মুহূর্ত না থেমে এই কথার সঙ্গেই গোকুল যোগ দেয়, আবার কেন তরকারি রাঁধার হাঙ্গামা করবেন? বেগুন ভেজে ফেলুন।

বেগুন ভাজায় হাঙ্গামা কম নাকি ? না। ক্ষিদে পেয়েছে ?

কয়েক দিন গোকুলের কথাগুলিই মণির মনে ঘুরে বেড়ায়। কথাগুলি সরল কিন্তু সাংঘাতিক, তবু মণির বড়ো ভালো লেগেছে। নিজের মাধ্যমে জগৎকে বিচার করা তার চিরদিনের অভ্যাস। গোকুল এই মাধ্যমকে আমল দেয়নি, কিন্তু তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। সেটা মণির কাছে গোকুলের সততার একটা বিরাট পরিচয় হয়ে উঠেছে। প্রণব যেন সে তুলনায় অনেক বেশি অনুদার।

সাত

নাজিমের প্রথমে মনে হয়েছিল, পাড়ায় এবং জানা-চেনা লোকেদের কাছে সে আর কোনোদিন মুখ দেখাতে পারবে না। বেঁচে থাকতে মাকে সে যে খেতে দিত না, বাড়ি বাড়ি ঘুঁটে বেচে সে পেট চালাত, এজন্য নাজিমের বিশেষ কোনো লজ্জা ছিল না। গরিবের কঠোর বাস্তব জগতে মনগড়া লজ্জার ঠাঁই নেই। কোনো রকমে পেটে খেয়ে কে বেঁচে আছে সেটাই চরম কথা, কীভাবে খাওয়াটা সে যোগাড় করছে, কলে খেটে না ঘুঁটে ফিরি করে, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর গরজ কারও নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ুক, নিজেকে সকলের নানি করে তুলে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে নাজিমের মা যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারত যে নিজের পেট চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নিজেরই ছিল ? সুতরাং তাকে খেতে-পরতে না দেওয়ায় নাজিমের কোনো দোষ হয়নি। দয়া-মায়ায় কারও পেট ভরে না, শূন্য থেকে খানা নামে না। যে খায় সে জোগাড় করেই খায়। কথার কথা যে যা বলুক, মাকে ছেড়ে সুন্দরী বউ নিয়ে থাকার জন্য সত্যিকারের নিন্দা কেউ নাজিমের করেনি। বউ নিয়ে, খাপসুরত বউ নিয়ে, থাকবে না তো কাকে নিয়ে থাকবে মানুষ ? বুড়ি যদি কাত হয়ে পড়ত, রোগে বা অনাহারে সত্যই মরতে বসত পথের ধারে, তখন তার দিকে না তাকালে দোষ হত নাজিমের। লোকে বলত, ছিঃ, নাজিমের মা এভাবে প্রাণ দিয়েছে। তার চেয়েও বুঝি আপশোশের মরণ হয়েছে বুড়ির। গুন্ডা কাপুরুষ তাকে কুৎসিতভাবে হত্যা করেছে।

জোয়ান মদ্দ মানুষ হলে কথা ছিল, শক্ত-সমর্থ স্ত্রীলোক হলেও বুঝি মনে করা চলত ওরা শয়তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বয়স যাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছে, শনের মতো সাদা করে দিয়েছে মাথার চুল, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, গায়ের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে, এক পা কবরে দিয়ে যে প্রতিদিন মরণের অপেক্ষাই করছে—তাকে এভাবে হত্যা করা কীসের পরিচয় ? কেন, আর মানুষ ছিল না বেছে নেবার ? শিশুর মতো নিরীহ ভালো মানুষ এ বুড়িকে কেন ?

আপশোশে এমনি নাজিমের বুক পুড়ে যায়, মানুষের মুখের দিকে তাকাতে না পারায় গুম খেয়ে সে মাটিতে চোখ পেতে রাখে, তার উপর ক-জন চেনা লোক নানা কথা বলে তাকে উন্মাদ করে দিতে চায়। বলে, এ কেবল দাঙ্গার ব্যাপার নয়, সাম্প্রদায়িক ঝগড়া নয়। আমি তোমায় মারলাম, তুমি আমায় মারলে, এ তা নয়। এ নাজিমের কলঙ্ক, সমস্ত বস্তির কলঙ্ক, তাদের সমাজের কলঙ্ক। প্রাণ যাক, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নাজিমকে নিতে হবে। বেছে বেছে নাজিমের মাকে ওরা সাবাড় করেছে, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। শুধু ওই ভদ্রপাড়ার দুশমনদের নয়, ওই

যে বস্তি থেকে বউকে নিয়ে এদিকে সরে আসতে হয়েছে নাজিমের, সে বস্তির লোকেদেরও কারসাজি আছে তলায়-তলায়। রাত্রে ওরাই তো টেনে বার করেছে নানিকে, হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে মন্দিরের কাছে....

একজন বলে আপশোশের সুরে, একজন বলে খোঁচা দিয়ে, নাজিমের মরদের রক্তে তারা আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। সে আগুন যাতে সামনের ওই বস্তিটাতে লাগে, সেখান থেকে চারিদিকে আরও দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও এদিকে ভালো করে হাঙগামা বাড়েনি। বস্তিতে অধিকাংশই মজুর, দাঙ্গায় তাদের মন নেই। উত্তেজিত হয়ে প্রায় বাধিয়ে বসবার উপক্রম করেও কী ভেবে যেন তারা আবার অল্পেই সামলে নিয়ে থমকে থেমে গেছে।

নাজিম যদি সক্রিয় হয়ে নামে তাহলে বেধে যাবে ! দো-মনা মন কম নয়। নাজিম ডাক দিলে নানির কথা ভেবেও অনেকে মরিয়া হয়ে নেমে পড়বে।

পরীবাণু বলে, না।

মুখ দেখাতে শরম লাগে।

আরও শরম লাগবে। ওরা যে এ সব বলছে ওদের মতলব আছে। অর্ধেক মিছে কথা।

মিছে কথা ? নাজিম চোখ তুলে তাকায়। তার দু-চোখে আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে যায়।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল কে বললে ? আবদুলের মা আমায় বলেছে, তোমার ব্যারাম বলে কে যেন ডেকে নিয়েছিল। আরও কেউ কেউ জানে।

কে ডেকে নিয়েছিল ?

তা শুধোয়নি আবদুলের মা।

কী বলতে চায় পরীবাণু, কী বোঝাতে চায় ? ছেলের ব্যারামের কথায় ভুলিয়ে তার মাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এতে বড়ো জোর প্রমাণ হয় একেবারে ঘর থেকেই কুকুর বেড়ালের মতো তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাতেই হত্যাটা শুধরে গেছে পরীবাণুর কাছে ? অথবা পরীবাণু শুধু কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখে তাকে বাঁচাতেই ব্যাকুল, দিশে হারিয়ে যা মনে আসছে তাই বলছে ? ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বউটার ওপর ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা জেগেছে নাজিমের। পরীবাণু শহরে এই দাঙ্গা বাধায়নি। তার মার অপমৃত্যুর জন্যও সে কোন দিক দিয়ে দায়ী নয়। এ সব কথা অবশ্য মনেও আসে না নাজিমের, পরীবাণুর বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে মন তার বিগড়ে যায়নি। পরীবাণুকে নিয়ে মশগুল হয়ে দিন যাপনের অদ্ভুত খাপছাড়া একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া।

রূপ যেন এতদিন চোখ মেলে দ্যাখেনি বউয়ের, শুধুই মুগ্ধ হয়ে মেতে ছিল—আর সব বিষয়ে আনমনা হয়ে। রূপ ? রূপ আছে পরীবাণুর, এমন ছিপছিপে নিটোল দেহ, এমন মোলায়েম রং, সুন্দর কোমল এই মুখ এমন আর কারও ঘরে নেই। কিন্তু বউয়ের রূপ আছে বলে কি আর কিছু থাকতে নেই জগতে ? সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে আলগোছে কোনো রকমে সমাজ-সংসার বন্ধুবান্ধব পুরুষের জীবনধারণের নিয়মরীতি বজায় রেখে কেবল বউয়ের রূপে মশগুল হয়ে দিনরাত্রি কাটাতে হবে ? পরীবাণুকে পাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনটা খুঁজে এই একটি নেশা ছাড়া আর কিছুই নাজিম দেখতে পায় না। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এ সবও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভিন্ন এক জগতে ঘটেছে, তার শুধু ছিল নিজের ঘরটি, যে ঘরে তার পরীবাণু থাকে।

পরীবাণু ঝুঁকে ঘরের কাজ করে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, সামনে দিয়ে এদিক-ওদিক চলা-ফেরা করে—তার দেহের চেনা রেখা ও ভঙ্গিগুলি, সজীব লতার মতো দেহের গড়নে যৌবনের পুষ্ট সম্ভারগুলি নাজিমের অচেনা মনে হয়। মনে হয়, ঘরের বউ রূপ দিয়ে এমনভাবেই ভুলিয়ে রেখেছিল

যে এ বুপও সে ঠিক মতো ভোগ করেনি, নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পরীবাণুকেও সে যেন স্বপ্নের মতো গ্রহণ করেছে।

বাস্তব সংসার ভুলে নরম হয়ে গেলে এই রকম হয় পুরুষের. সব দিকে সে ঠকে, ফাঁকিটুকু নিয়ে সে খুশি হয়ে থাকে।

নাজিমের বিতৃষ্ণা নতুন। রুক্ষ কঠোর বাস্তব জগৎ তাকে আচমকা কুৎসিত আঘাত দিয়ে সচেতন করেছে। সেই সঙ্গে তার তৃষ্ণাও জেগেছে নতুন—পরীবাণুর রূপেরই তৃষ্ণা, নতুন ধরনেব। উগ্র নিষ্ঠুর উপভোগের মধ্যে এত দিন পরীবাণুকে পায়নি বলে নিজেকে তার বঞ্চিত প্রতারিত মনে হয়। রহমত খলিলেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রূপহীনা নোংরা সাধারণ স্ত্রীলোককে নিয়ে কী প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে নিজেদের পৌরুষ জাহির করে. হইচই করে সত্যিকারের মরদের মতো দিন কাটায়। পরীবাণুর মতো বউ থাকতে সে নিরীহ গোবেচারি সেজে ভীরু কাপুরুষের মতো মিইয়ে মিইয়ে জীবনটা কাটিয়ে এসেছে। এমনি পৌরুষবিহীন হয়ে গেছে সে যে বেছে বেছে তার মাকে খুন করেছে গুন্ডারা।

খপ করে সে হাত ধরে পরীবাণুর। হ্যাঁচকা টানে গায়ের ওপর এনে ফেলে। চিরকাল যে ডাকলেই খুশি হয়ে হাসিমুখে যেচে এসে বুকে আশ্রয় নেয়, কোমল দুটি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে—সকাল না সন্ধ্যা না মাঝরাত্রি খেয়াল রাখে না !

পরীবাণু ভয় পেয়ে বলে, কী হল ? কী হল ?

সকালবেলা নটার সময় তার বড়ো বড়ো চোখের সে বিস্ফারিত চাহনি নাজিমের সহ্য হয় না, তার বিগড়ানো মনের উগ্র ভাব মিইয়ে শীতল হয়ে যায়। আরও বেশি যায় হ্যাঁচকা টানের ব্যথায় যখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে পরীবাণুর !

লাগল ?

লাগবে না ? হাতটা তুমি ভেঙে দিয়েছ !

পরীবাণুর ভয় ও রাগ ভাঙিয়ে আপিস যেতে সেদিন দেরি হয়ে যায় নাজিমের। দপ্তরির কাজ নিয়ে এই তার প্রথম গাফিলতি।

আপিসের কাজের পর সেদিন ইয়াসিনেব কাছে তার ডাক আসে। ডাকতে আসে বুড়ো একটি লোক, মাথাব সমস্ত পাকা চুল তার রং করা, গোলগাল মুখখানা মেয়েদের চেয়ে কোমল। মুখ দেখলে আর মিহিগলার কথা শুনলে মনে হবে এমন নিরীহ ভালো মানুষ লোক বুঝি জগতে আর হয় না, মনটা না জানি কত কোমল। তার নাম রেজ্জাক, স্ত্রীলোক সেজে শিশুহরণ তার প্রধান পেশা। অজানা পুরুষের চেয়ে অচেনা স্ত্রীলোকের কাছে ছোটো ছেলেমেয়ে সহজে বশ হয়।

রেজ্জাক রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রেজ্জাক মেয়েলি ঢংয়ে মেয়েলি সুবে কথা কয়। বলে, ইয়াসিন সাব একটু ডাকছিল গো।

নাজিম ইতস্তত করে।

আজ আস্‌লি বিলাতি মাল।

গলির মধ্যে মদের দোকানে ইয়াসিন দুজন সঙ্গীর সঙ্গে গেলাস সামনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল। বিলাতি মদের এই সাদাসিধে দেশি বারটিতে দাঙ্গার আগে একদিন নাজিম এসেছিল, আপিস-ফেরত বাবুদের ভিড়ে সেদিন এত বড়ো ঘরটা সন্ধ্যার আগেই গমগম করছিল। বসবার ব্যবস্থা সস্তা কাঠের লম্বা-লম্বা টেবিল ও বেঞ্চ, আজ সেগুলি বেশির ভাগ খালি পড়ে আছে। বারটা যে পাড়ার মধ্যে পড়েছে তাতে ইয়াসিনের জাতভাই ছাড়া ভরসা করে ফুর্তি করতে আসবে না সহজেই বোঝা যায়। বিশেষভাবে ইয়াসিনরা সদলবলে দখল করে থাকায় তাদের জাতভাইরাও অনেকে এখানে ঢুকতে সাহস পায় না। ইয়াসিনদের কাছে নিজের জাত পরের জাত খানিকটা

সুবিধার ব্যাপার মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। এ শহরে অত ধর্মের আত্মীয়তা মেনে গুন্ডামির ব্যাবসা চালানো যায় না। ইয়াসিন নিজেই বলে যে অত মানতে গেলে পলিটিক্‌স করতে হয়, তাদের ব্যাবসা চলে না।

নাজিমের এ সব অজানা নয়। তার গা ছমছম করে। তবু সেই আতঙ্কের মধ্যেই সে এক নতুন উন্মাদনার সন্ধান পায়। যে হিংসা ও ক্ষোভের জ্বালা সে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না, এমনি সব ভয়ানক মানুষের সংস্পর্শে এমনি পরিবেশে একটা বেপরোয়া মরিয়া ভাবের মধ্যে সে তা থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। এক চুমুকে সে গ্লাসের অনভ্যস্ত পানীয় অর্ধেকটা পেটে চালান করে দেয়, আগলহীন বিহ্বল কল্পনায় নানির হত্যার উদ্ভট অমানুষিক প্রতিশোধের ঘটনা ঘটিয়ে চলতে থাকে।

ইয়াসিন বলে, ঔর মত পিজিয়ে ভাই।

নাজিম বলে, আরে ভাই, লাও লাও। সব ঠিক হ্যায়।

ইয়াসিন মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকায়। দুদিন দেখে মানুষটার ওপর তার পর্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। একে দিয়ে কী হবে ? কোনো কাজের, কোনো দায়িত্বের যোগ্যতা কি এর আছে ? মানুষ মাপার মাপকাঠি ইয়াসিনেরও আছে, একদিকে তাকেও কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনেক ভয়ংকর লোকের সঙ্গে তার কারবার, নিজে শক্ত না হলে শক্ত হাতে দলকে শাসনে রাখার, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার হত না, কবে সে ধ্বংস হয়ে যেত তার মিথ্যার ভাঁওতায় স্বার্থের বিরামহীন সংঘাতের জগতে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বার বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় নাজিমের।

রাস্তায় তাকে একা রেখে ইয়াসিনেরা চলে যায়। ইয়াসিন কেন তাকে ডেকেছিল জানবার কৌতূহলও দেখা যায় না নাজিমের।

চলতে চলতে ইয়াসিন বলে বাজে মার্কা লোক।

রেজ্জাক বলে, বউটা ওকে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে।

বউ ?

আঃ ! রেজ্জাক যেন মেয়েলি ভঙ্গিতে জিভ চেটে স্বাদ পায়, বহুৎ খাপসুরত বিবি আছে ওর। সিনেমা স্টারসে আচ্ছা।

শুনে ইয়াসিন কৌতূহল অনুভব করে।

নাজিম টলতে টলতে এগিয়ে চলে। নেশার সঙ্গে রাগটা তার জমাট বেঁধেছে পরীবাণুর ওপর ! মনটা গিয়েছে বাড়ির দিকে, কাল্লু কখন সঙ্গ নেয় সে ভালো বুঝতে পারে না। কাল্লুই তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সেদিন রাত্রে প্রতিবেশীরা প্রথম পরীবাণুর কান্না ও চিৎকার শোনে।

কাল্লু মিস্ত্রির ঘর নাজিমের ঘরের লাগাও। তার স্ত্রী রাবেয়া বলে, লোকটার হল কী ?

কাল্লু বলে শয়তানের খপ্পরে পড়েছে, মাথা বিগড়ে গেছে। খুব মাল টানছে ইয়াসিন মিঞাদের সঙ্গে।

এমনি বেশ ভালো ছিল লোকটা।

অমন ভালো সবাই থাকে। কে কেমন চিজ ইমানদারিতে জানা যায়। সব খবর না জানতে পারে, মোটমাট তো জানা আছে নানির জানটা কেন গেল ? কিন্তু জেনেও জানবে না, সে মুরোদ নেই—নাজেরালি সাবের মোসায়েব তো। বড়োলোকের পা-চাটা কুত্তা এমনি করে, ঘরে বিবির ওপর ঝাল ঝেড়ে দেখায় আমি মস্ত মরদ।

কাল্লুর ঝাঁঝালো সমালোচনায় রাবেয়া একটু হকচকিয়ে যায়। মানুষটার চিরদিন এ রকম সহজ স্পষ্ট কথা। ওজনদার লোকেরা তাকে তাই বড়োই অপছন্দ করে। তবে গরিব খাটুয়েদের মধ্যে খাতির দিয়ে সেটা বোধ হয় পুষিয়েও বেশি হয়েছে। বস্তির লোকে তাকে বিশ্বাস করে, এ পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠেও যে ঝিমিয়ে আছে, নানির হত্যা নাজেরালিদের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি, সে জন্য কাল্লুও অনেকটা দায়ি।

পরীবাণুর চাপা-কান্নার আওয়াজ থেমে যায়—বাইরে থেকে আর শোনা যায় না। ঘরে কান্না তার থেমেছে কিনা সেটা অবশ্য অনুমান করা যায় না। কয়েকটি কণ্ঠ থেকে আচমকা উগ্র হিংসার ধ্বনি রাত্রির আকাশে কর্কশ আঁচড় কাটে—আরও কতগুলি কণ্ঠ থেকে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। জবাবের মতো দূরে শোনা যায় তেমনি কর্কশ আওয়াজের ওঠা-নামা। খানিক আগে পরীবাণুর তীক্ষ্ণ বেদনার্ত চিৎকার যেন স্বপ্নের পর্যায়ে চলে যায়।

রাবেয়া বলে, লোকটা হয়তো জানে না ? ওরা হয়তো অন্য রকম বুঝিয়েছে ? কাল একদফা বাতচিত কর না ?

কাল্লু বলে, কুলিমজুরের সাথে বাতচিত করতে কি গরজ হবে ?

তবু সে রাবেয়ার কথা রাখে, সকালে কাজে যাবার আগে নাজিমের ঘর হয়ে যায়। নাজিম তখন মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। রাত্রির আঘাতেব চিহ্ন গোপন করতে পরীবাণু মুখ ঢেকে কাল্লুর সামনে আসে, কাল্লুর কাছে তার পর্দা ছিল না। তাকে কাল্লু জানিয়ে যায়, বিকালে সে আপিসে নাজিমের সঙ্গে দেখা করবে, জরুরি কথা আছে। কাল্লুর খাটুনি চারটে পর্যন্ত, তবু যদি কোনো কারণে দেরি হয়, নাজিম যেন কাজের পরেও তার জন্য অপেক্ষা করে।

পাঁচটার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে আপিসে খবর নিয়ে কাল্লু শুনতে পায়, দপ্তরি নাজিম একঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কাল্লু নিজের মনে বলে, শালা বেইমান !

দপ্তবির এই চাকরিটা পেয়ে মস্ত লোক হবার আগে বড়োই যখন খারাপ সময় চলছিল তখন কাল্লুর কাছে পাওয়া উপকারগুলির কথা নাজিমের মনে নেই। মনে থাকলে নেহাত জরুবি কাজে বেরিয়ে যেতে হলেও অন্তত একটা খবর সে রেখে যেত কাল্লুর জন্য।

বস্তিতে ফিরে ঘরের সামনে ছোটো মোড়ায় নাজিমকে বসে থাকতে দেখে কাল্লু একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। তবে বুঝতে পারে, এটা কালকের প্রতিক্রিয়া। পাকা গুন্ডাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করা এখনও তার আয়ত্ত হয়নি। নেশার ঝোঁকে একদিন বউকে মার-ধর করলে পরদিন মনটা এখনও তার খুব বিগড়েও যায়—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভালো ছেলে হয়ে একটু প্রায়শ্চিত্ত করার সাধ জাগে।

এই যে কাল্লু ভাই ! কী কথা আছে বলছিলে ?

সস্তা কাঠের একটা জলচৌকিতে সে কাল্লুকে বসতে দেয়, একটা বিড়িও দেয়। এটাও কালকের গুন্ডামির প্রতিক্রিয়া, নয় তো কাল্লুকে এতটুকু খাতির করতেও অনেকদিন আগেই নাজিম ভুলে গিয়েছিল।

কাল্লুকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হয়।

যে কথা সে বলতে এসেছে তা আচমকা বলার নয়। নাজিমের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়, কী বলতে সে কী বুঝে ফেলে কিছুই ঠিক নেই। ভালো কথা শুনে হঠাৎ রেগে যাওয়াই তার পক্ষে বেশি সম্ভব।

বেশ খানিকটা ভূমিকা করে রইয়ে সইয়ে কাল্লু তাকে নানির হত্যাকাণ্ডের পিছনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানায়। নাজিম শান্তভাবেই সব কথা শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না।

' বলে, এ সব ঝুটা বাত।

আজিজকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে। ক-রোজ নাজের আলি ইয়াসিন সিংহী এরা বাতচিত করছিল।

বাতচিত কী হয়েছিল আজিজ কি জানবে ?

কেরামত আর খালেকও জানে।

ওরা তোমাদের দলের লোক।

কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলে, এটা কী বলছ তুমি, অ্যাঁ ? বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা তোমাকে আমিই বা বলব কেন, ওরাই বা বলবে কেন ?

আল্লা জানে কী মতলব তোমাদের। নাজের আলি সাব বলেন, পাকিস্তানে গরিবের কিছু হবে না, এ বাত যারা বলে তারা বেইমান।

তারা যদি ফের এ বাতও বলে যে হিন্দুস্তানেও গরিবের কিছু হবে না ? যদি বলে আপসের এ কারবার বেইমানি ?

নাজিম আর কথা কয় না ! এ বিষয়ে তর্ক করতেও তাকে নারাজ দেখা যায়। সে কিছু বুঝতে চায় না, যে ধারণাটা জন্মেছে তাই অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকবে। কাল্লু জানত, সহজ সাধারণ যুক্তি মানবার মতো মনের অবস্থা নাজিমের নেই, নাজের আলি ইয়াসিনেরা মনকে তার বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার বউ জোর না করলে নাজিমকে বোঝাবার এই মিথ্যা চেষ্টাও সে করত না। সেও আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে যায়।

তার বউ বলে, কী হল ?

কাল্লু মাথা নাড়ে।

সেদিন রাত্রে আবার নাজিম মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে, নাজের আলির মোটরে। বস্তির কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আজিজ তাকে ধরাধরি করে ঘরে পৌঁছে দেয়।

পরদিন জানা যায়, নাজের আলি ড্রাইভার আজিজকে বরখাস্ত করেছে।

কাল্লু শুনে বলে, শালা নাজিমের কাজ এটা।

আচমকা এভাবে আজিজের চাকরি যাওয়ার কারণটা সে সহজেই অনুমান করতে পারে। নানির বিষয় কথা বলার সময় প্রসঙ্গক্রমে সে আজিজের নাম উল্লেখ করেছিল। নাজিম সে কথা নাজের আলিকে জানিয়ে দিয়েছে। তার সম্বন্ধেও যে অনেক কথা নাজিম নাজের আলিকে জানিয়েছে তার প্রমাণ পেতেও বেশি বিলম্ব হয় না।

সন্ধ্যাবেলা মুদি দোকান থেকে কয়েকটা সওদা কিনে কাল্লু ঘরে ফিরছে, বস্তিতে ঢুকবার মুখে আবদুলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাতের ডাল-মশলা ছড়িয়ে পড়ে, তেলের শিশিটা ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। ইচ্ছা করে গায়ে না পড়লে পথ চলতি দুটি মানুষের মধ্যে এত জোরে সংঘর্ষ সম্ভব হয় না এবং যে ধাক্কা দেয় প্রতিবাদ শোনামাত্র নরম হয়ে মাপ চাওয়ার বদলে সে এমনভাবে রুখেও ওঠে না।

দুজনের বচসা বাধতে না বাধতে কোথা থেকে আরও পাঁচ-সাতজন এসে জোটে, সকলে মিলে একা কাল্লুর উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে মারতে আরম্ভ করে দেয়। বস্তির কাছাকাছি ঘরের মানুষগুলি হইচই করে বেরিয়ে এসে কাল্লুকে ছাড়িয়ে নেয়।

কী ব্যাপার ?

আবদুল পাতলা পাঞ্জাবি-পরা আধবুড়ো একটি লোককে দেখিয়ে বলে, এর পকেট মেরেছে। ব্যাগটা নিয়ে ভাগছিল।

লোকটির হাতে একটা জীর্ণ মনিব্যাগ ছিল, সেটি সে তুলে ধরে দেখায়।

পকেট মেরেছে ! আবদুল নাম করা পকেটমার, দাগি আসামি, তাকে বুক ফুলিয়ে কাল্লুর নামে পকেটমারার অভিযোগ করতে শুনে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যেও অনেকের হাসি পায়। জগতে সবাই যেন পকেট মারে আবদুলের মতো এবং ধরা পড়লে মার খায়। তবে ধরা পড়ে মার খেয়ে আবদুলের যেমন প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার সাধটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কাল্লুর তা দেখা যায় না। আবদুলের গালে সে প্রচণ্ড একটা চাপড় বসিয়ে দেয়।

কাল্লুর পক্ষ নিতে বস্তির লোকেরা একটু ইতস্তত করছিল। তারা বেশির ভাগ কল-কারখানার মজুর, কাল্লুকে তারা ভালো করেই চেনে,—কিন্তু এতগুলি লোক বলছে পকেট থেকে ব্যাগটা তোলার সময় কাল্লুকে তারা হাতেনাতে ধরেছে। বুড়ো রহমান এগিয়ে আরেকটা দলবদ্ধ উদ্যত আক্রমণ থেকে কাল্লুকে টেনে সরিয়ে আড়াল করে দাঁড়ানোয় বস্তির লোকেরাও এগিয়ে যায়।

রহমান বলে, খপর্দার, মারপিট চলবে না !

আবদুলেরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, পকেটমারকে পিটব না ? কী তাজ্জব !

রহমান বলে, পকেট মেরেছে, থানায় নিয়ে চলো। তোমরা এত আদমি সাক্ষী আছ, কয়েদ হয়ে যাবে। চলো, আমরা সাথে যাব।

প্রস্তাব শুনে তারা ভড়কে যায় ! আধবুড়ো লোকটি, যার পকেট মারা গেছে, সে বলে, অত হাঙ্গামায় কাজ কী ? ব্যাগ তো মিলে গেছে। ছেড়ে দাও, যাক গে।

রহমান বলে, তোমার নাম সালেক না ? তুমি দুর্গা লেনের বস্তিতে থাক ?

সালেক বোধ হয় ভাবতেও পারেনি এত দূরে এখানে তার চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়বে, এই বেশেও তাকে চিনতে পারবে। সে জবাব দেয় না।

রহমান আবার বলে, এবার তোমার কয়েদ হয়েছিল কেন সালেক ? কত রোজ থেকে ছাড়া পেয়েছ ?

সালেক বিব্রত হয়ে বলে, কী বলছ তুমি আবোল-তাবোল যা-তা কথা ? একজনার নামে বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল ! চলো চলো, আমরা যাই।

রহমান বলে, আবে আরে, যাবে কোথা ? মোদের পাড়ায় এসে পকেটমাব পাকড়েছ, তাকে নিয়ে থানায় চলো আগে। চলো থানায় ডাইরি করবে ! মোদের আদমিকে ঝুটমুট পকেটমার বলে পিটে ভেগে যাবে, সেটি চলবে না হুজুর !

আবদুল সালেকেরা তখন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলে বাঁচে। এটা যে প্রধানত মজুরবস্তি তাদের তা জানা ছিল না, জানলে এখানে এসে এভাবে কাল্লুকে মারপিট করতে সাহস পেত কিনা সন্দেহ। পালাতে পালাতে ক্রুদ্ধ বস্তিবাসীর হাতে তারা কাল্লুকে যত না মেরেছিল সুদে-আসলে তার অনেক গুণ তাদের জুটে যায়।

কাল্লুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে আশ্চর্যরকম খুশি আর চাঙ্গা মনে হয়। কিছু তেল ডাল মশলার ক্ষতি আর কতগুলি গুন্ডার হাতে কিছু মার খাওয়ার পরিবর্তে সে যেন অনেক বেশি দামি প্রতিদান পেয়েছে তার বস্তিবাসী মানুষদের কাছে।

এই ব্যস্ত নগরের প্রাসাদ থেকে আস্তাকুঁড়েতে পর্যন্ত মানুষের যে ব্যস্ততা তার তুলনা নেই। জীবনের গতি এখানে তীব্র, অল্প সময়ে অনেকখানি জীবনঠাসা, গ্রাম্য শিথিলতা এখানে মানুষ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। চলা-ফেরা আহার-বিহার কাজ-কর্ম সব বিষয়েই অসীম ব্যস্ততা। জীবনধারণের জন্য যে খাদ্য গ্রহণ তাতেও দেবার মতো যথেষ্ট সময় মানুষের নেই।

তবু এই ব্যস্ততার মধ্যেও মানুষ অবসর খুঁজে নেয়, বিলাসের অবসর। সিনেমা দেখে রেডিয়ো শুনে তাস পিটে রেস খেলে মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নাচিয়ে হোটেলে ভোজ খেয়ে শহুরে টাকার লোভে ব্যস্ত পাগলেরা জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস গতিতে ঢিল দেবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার পর সংগীতমুখর আলোয় ঝলমল বড়ো হোটেলে গেলে প্রথমে মনে হবে, সত্যই বুঝি এখানে ব্যস্ততা নেই—শান্ত না হোক, জীবন এখানে ধীর। দশ মিনিট বসলে কিন্তু ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। আপিসের চেয়ারে মানুষগুলি বসে থাকে শান্ত ধীরভাবে অথচ প্রতিটি মুহূর্ত লাভের পিছনে উদ্দাম গতিতে তার সমস্ত চেতনা ছুটে চলে, এখানেও তেমনিভাবে হোটেলের চেয়ারে বসে জীবন থেকে পান-ভোজন ও উপভোগ আদায়ের লিপ্সায় সে উন্মত্ত হয়েই থাকে। সন্ধ্যার দিকে এটা আড়াল থাকে, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে বাইরে ফুটে বেরোয়। উন্মত্তের মতোই তারা তখন নাচে গায় হাসে হাত-পা ছোঁড়ে কথা কয়।

নীচের স্তরে নামতে থাক--একই ব্যাপার। শুধু পরিবেশ বদল হয়ে যাবে উপকবণ ও আয়োজনের রিক্ততা ও দীনতায়।

প্রণবদের বাড়ি যে দুর্গা ঝি কাজ করে তার মাসি প্রমদা ফুলুবি বেগুনি পেঁয়াজ বড়া বেচে দিন চালায়। সম্বল তার একটি তোলা উনান, একটা লোহার কড়াই, একটি বাবকোশ আর কয়েকটা ছোটোবড়ো মুখকাটা টিন। দেশি মদের দোকানটার গা ঘেঁষে একটা ভাঙনধরা একতলা বাড়িব ভাঙা সরু রোয়াকটির কোণে বসে সে তার সুখাদ্যগুলি তেলে ভেজে বাবকোশে সাজিয়ে রাখে। কড়াইযেব তেল কখনও বদল হয় না, তেল কমে এলে তাতেই আবার খানিকটা কাঁচা তেল ঢেলে দেয়। বিক্রি না হলেও বাসি ভাজি কখনও ফেলা যায় না, গরম তেলে ডুবিয়ে একবার শুধু শুধরে নেওয়া হয়।

মদের দোকান আজকাল তাড়াতাড়ি বন্ধ হযে যায়। মদ পেটে গিয়ে মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রবৃত্তি উসকিয়ে দেয়, আইডিয়াটা হল এই। মাতাল যেন কোনোদিন বউকে মাবা আর এলোমেলো হল্লা করা ছাড়া বড়ো হাঙ্গামায় মাতার সাধ-আহ্লাদ রাখে বা তাতে স্বোয়াদ পায়। মদের পিপাসা একটা ব্যারাম—মানসিক ব্যাধি নয়, অত্যন্ত স্থূল বাস্তব রোগ। রোগী না কি দাঙ্গা করে !

দুর্গার মাসি প্রমদা পর্যন্ত এটা জানে। তার সাধ্যমতো জানে। সে বলে, এ রোগে ধরলে যার অদেষ্টে যেমন। ঠিক যেমন জ্বর-জ্বারি কলেরা মা-র দয়া—একে অল্পে খালাস দিচ্ছে, ওকে সাবাড় করছে। অ্যাদ্দিন তো দেখছি, আমি জানি। একজন চুপচাপ আসে, অল্প করে খায়, চুপচাপ ঘর চলে যায়। দিন নয়, মাস নয়, বছরের পর বছর—একদিন একটিবার বাড়াবাড়ি নেই। আরেকজন শুবু করতে না করতে আকাশে চড়িয়ে দেয়, রোজ খানায় পড়ে। বছর ঘুরতে দেখায় যেন শ্মশানঘাটের জ্যান্ত মড়া। এ বড়ো ব্যারাম বাবা, ধনে-প্রাণে মারে !

দুদিন নাজিমের ধেনো খাওয়ার রকম দেখেই টের পাওয়া যায়, সে শেষের পর্যায়ের রোগী।

ইয়াসিন তাকে ছেঁটে ফেলার কথা ভাবছিল। কোনো মতলব হাঁসিল করতেই লোকটা কাজে আসবে না এই হয়েছিল নাজিমের সম্পর্কে তার ধারণা। রেজ্জাকের সঙ্গে আচমকা একদিন বেলা এগারোটার সময় তার বাড়িতে হাজির হয়ে পরীবাণুকে সে দু-তিনমিনিটের জন্য দেখে গেছে। নাজিম অবশ্যই তখন বাড়ি ছিল না, কাজে গিয়েছিল। রেজ্জাক মেয়ে সেজে গিয়েছিল, মলমলের পোশাক জরি-চুমকি বসানো ওড়নায় সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রৌঢ়া মহিলার বেশ ধরে। সঙ্গে ছিল আট-নবছরের একটি ছেলে। পরীবাণুকে পর্দা বাতিল করিয়ে সে ইয়াসিনের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তবে কথা বলাতে পারেনি, দু-একমিনিটের বেশি দাঁড় করিয়ে রাখতেও পারেনি। ইয়াসিনের দৃষ্টিপাতে পরীবাণুর সর্বাঙ্গ উৎকট লজ্জায় শিরশির করে উঠেছিল। আচমকা সে পালিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

তারপর থেকে ইয়াসিন আবার নাজিমের সঙ্গে খাতির করছে। পরপর দুসন্ধ্যা নিজের সঙ্গে বিলাতি-বারে বিলাতি খাইয়েছে, যত সে খেতে পারে। একজন দোস্ত সে জুটিয়ে দিয়েছে নাজিমকে।

তার নাম ইয়াকুব। নাজিমের সমান পর্যায়ের মানুষ, বেশভূষা চালচলন কথাবার্তা সব দিক দিয়ে। শুধু বয়সটা তার কিছু বেশি হবে। মনটা তার আশ্চর্যরকম উদার ! নাজিমের চেয়ে বিশেষ বড়োলোক না হলেও দুদিন সে নাজিমকে মদ খাইয়েছে। ইয়াসিন সেদিন তাকে ডাকেনি, কোথায় যাবে কী করবে ভেবে কাজের শেষে বিকালের দিকে গভীব হতাশা আর জোরদার কিছু করার অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষাময় উত্তেজনা জেগেছিল নাজিমের।

হঠাৎ ইয়াকুব এসে হাজির। তার স্ফূর্তি করার সাধ জেগেছে, কিন্তু একা কি স্ফূর্তি করা যায় ? নাজিমকে সঙ্গে যেতে হবে। যেতে হবেই, ইয়াকুব ছাড়বে না, নাজিমকে তার বড়োই পছন্দ হয়েছে। ছুটি হতে এখনও একঘণ্টা বাকি ? ছোঃ, একটা বাচ্চার বুদ্ধিও নাজিমের নেই !

ইয়াকুব সেদিন তাকে প্রথম দেশি মদ খাওয়ায়। অ্যালকোহল নয়, স্পিরিট। যত সে খেতে পারে। সে রাত্রে অজ্ঞান মৃতপ্রায় নাজিমকে নিজের গাড়িতে ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়ে ইয়াসিন ইচ্ছা করলেই পরীবাণুকে ভোগ করতে পারত। পরীবাণুও মেয়েলি বোধশক্তিতে ভাবছিল যে ওই রকম কিছু বোধ হয় ঘটবে। কিন্তু ইয়াসিন সস্তা, সাধারণ গুন্ডা নয়, সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী এই কলকাতায় প্রায় পৌনে এক স্কোয়ার মাইল এলাকার গুন্ডাদের বাদশা। সে ইংরেজি জানে, ইংরেজি বই পড়তে পারে, ইংরেজি সব ছায়াছবির কথোপকথনের মোটামুটি মানে বোঝে !

তাই, পরীবাণুকে অভয় দিয়ে সে ফিরে যায়। কৃতজ্ঞতায় ঘুম অচল ও বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরীবাণু তার বস্তির ঘরের বাঁশের বাতার শিক-বসানো ছোটো জানালাটিতে মুখ রেখে আকাশ-পাতাল ভাবে। ভাবনার আকাশেও থাকে তার নসিব, পাতালেও থাকে তার নসিব। বুকের মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভ উথলে ওঠে, কেন তার নসিব এমন হল ? তার নাকি রূপ-যৌবন আছে, অনেক মেয়ের চেয়ে সে নাকি অনেক বেশি খাপসুরত ? কেন তবে তার বস্তির এই ছোটো ঘরটিতেও ভাঙন ধরল ?

নেশায় অচৈতন্য নাজিম ভিতরের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখবার সাধও পরীবাণুর হয় না। নাজিমের আকস্মিক পরিবর্তনে প্রথমটা সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হতাশ হয়নি। ভেবেছিল, নানির মরণের আঘাতে সাময়িকভাবে মাথাটা বিগড়ে গেছে, ঠিক হয়ে যাবে। নেশাব ঘোরে নাজিমের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারেও সে দমেনি। ভেবেছে, নাজিম তো তাকে মারেনি, নাজিমের মগজ দখল করে তাকে মেরেছে ওই শয়তান নেশা। ওই নেশা তার দুশমন, নাজিম নয়। নেশা করা কোনোদিন নাজিমেব ধাতে ছিল না, গভীর দুঃখে সে মদ খেয়ে নিজেকে সামলাতে পারে না। তার কী দোষ ?

কিন্তু সব আশা ঘুচে গেছে পরীবাণুর। ভয়ে ভয়ে আজকেই সে নাজিমকে ইয়াসিনের কথা বলেছিল, লোকটার যে মতলব সে আন্দাজ করেছে তা-ও জানিয়েছিল। শুনে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল নাজিমের। তখন সকাল, মাথা থেকে নেশার শয়তান উপে গেছে, রেখে গেছে শুধু অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া।

শালাকে খুন করব।

না না, হাঙ্গামা কোরো না। ওর সাথে না মিশলেই ফুরিয়ে গেল ! সকাল সকাল ঘরে চলে এসো।

সেই নাজিম আজ রাত্রেই আবার সেই ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেয়ে তারই গাড়িতে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। এ অবস্থায় না হয় তার খেয়াল নেই যে তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে এসে আবর্জনার মতো তাকে একপাশে ফেলে রেখে ইয়াসিন তার পরীবাণুর দিকে হাত বাড়ালে কারও কিছু করার থাকত না। কিন্তু ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেতে বসার আগেও কি পরীবাণুর সকালবেলার

কথাগুলি নাজিমের মনে পড়েনি ? মদ খেতে খেতে জ্ঞান লোপ পাবার আগে একবারও কি খেয়াল হয়নি গাঁটের পয়সা খরচ করে কেন এ লোকটা তাকে মদ খাওয়ায় ?

নিশ্চয় মনে পড়েছে, খেয়ালও হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। নতুন নেশার কাছে পরীবাণু তার তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দূরে কোথায় আগুন লেগেছে। পরীবাণুর এই জানালা থেকে আগুন দেখা যায় না, শুধু চোখে পড়ে খানিকটা রক্তিম আকাশ। সেদিকে চেয়ে পরীবাণুর ভাবনায় ভাবনায় লালচে মারা চোখ ফেটে জল আসে।

পরদিন দুপুরে রেজ্জাক আসে। তেমনি মেয়েমানুষের বেশে। কানের একজোড়া সোনার ফুল পরীবাণুকে দিয়ে সে বলে, ইয়াসিন সাব পাঠিয়েছে। তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে লোকটা।

তাকে ইয়াসিনের কথা শোনায় রেজ্জাক। কত তার টাকা, কত তার প্রভাব প্রতিপত্তি আর কী দরাজ তার দিল। সোনার ফুল হাতে করে পরীবাণু নিঃশব্দে শুনে যায়।

রেজ্জাক বলে, চলো না, গাড়ি চেপে হাওয়া খেয়ে আসি ?

পরীবাণু মাথা নাড়ে—ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে তার আতঙ্ক টের পেয়ে রেজ্জাক মেয়েলি ভঙ্গিতে মুখ টিপে হাসে। বলে, আচ্ছা আচ্ছা, আগে ভাব হোক, ভয় ভাঙুক, কেমন কি না ? আজ রাতে এসে ভাব করে যাক !

ঘরের মালিকের সামনে ?

রেজ্জাক আবার মুখ টিপে হাসে।—মালিক আজ ঘরে ফিরবে না গো, তার মন বাইবে গেছে। কাল ইয়াসিন সাব জোর করে তুলে এনে ঘরে পৌঁছে দিল বলে তো, নইলে নতুন বিবির ঘরেই ঘুমিয়ে থাকত।

এ কথা পরীবাণু কাল রাত্রেই শুনেছিল। এ কথা শোনার পরেই মনটা তার একেবারে বিগড়ে গেছে। যার ঘরে রাত কাটাতে এত ব্যাকুল নাজিম, সে কি তার চেয়েও খাপসুরত ?

প্রমদার একটু জ্বর এসেছিল। দুর্গা তাই সেদিন গিয়েছিল তার তেলেভাজার কারবার বজায় রাখতে। মাঝে মাঝে দুর্গা গিয়ে মাসির কাছে বসে, ফুলুরি বেগুনি পেঁয়াজ বড়া বিক্রি দ্যাখে। প্রমদা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গেলে নিজেও বিক্রি করে। কোনটার কত দাম তার জানা আছে। মাতাল ক্রেতা তেলেভাজার বদলে তাকেই কিনতে চাইলে কীভাবে তাকে ঠেকাতে হয় তাও দুর্গার অজানা নয়।

বস্তিতে বাস, ঝি-গিরি করে পেট চালায়, বয়স কম। এ সব না জানা থাকলে চলে না।

নাজিম সেদিন হাঙ্গামা করে। ইয়াকুবের সঙ্গে মদের দোকানে ঢোকার সময় দুর্গার কাছ থেকে সে তেলেভাজা কিনেছে, দুর্গার দিকে ভালো করে চেয়েও দ্যাখেনি। দোকান থেকে বেরিয়ে নজরে পড়তেই তার মনে হয় দুর্গা ছাড়া তার এ জগতে আর কেউ নেই।

দুর্গা কড়া গলায় ইয়াকুবকে বলে, সামলে নিয়ে চলে যাও না বাবু ?

ইয়াকুব একটা আস্ত দশ-টাকার নোট তার সামনে ধরে বলে, আজ রাতটা তুমিই সামলাও না ?

দশ টাকা ! এক বাড়িতে পুরো এক মাস বাসন-মাজা ঘর-ঝাঁটানো মশলা-বাটা কয়লা-ভাঙ্গা জল-তোলার খাটুনির দাম !

দুর্গা তবু বলে, আমি পারবোনি।

ইয়াকুব কাঁচা একটা টাকা বার ক'রে বলে, কে পারবে দেখিয়ে দাও না। নোটটা সে নেবে, তুমি টাকাটা নিয়ো।

এগারোটা করকরে টাকা ! দুর্গা নাজিমকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখে। মোটামুটি ভদ্র চেহারা, ধুতি আর পাঞ্জাবি ফরসা। দুর্গা মরিয়া হয়ে নোট আর টাকাটা ছিনিয়ে নেয়, বলে, আচ্ছা, আমিই সামলাবো।

নাজিমকে দুর্গা ঘরে নিয়ে যায়। এগারোটা টাকা পেয়েছে, একটা বাড়িতে পুরো একমাস খেটেও যা সে পায় না, তাই তাড়াতাড়ি মাটির ঘরের মাটির প্রদীপ নিবিয়ে সে নাজিমের পাশে শোয়। পুরুষালি ব্যবহারের ভয়ংকরতম নমুনা পাবার ভয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে রাখে।

মড়ার মতো পড়ে থাকে নাজিম।

খানিক পরে দুর্গা ওঠে। আবার তার মাটির ঘরের মাটির প্রদীপ জ্বালে। জল এনে নাজিমের মাথা ধুইয়ে দেয়। পাখাটা খুঁজে এনে নাজিমের মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

তখন অল্পে অল্পে তার মনে হতে থাকে মানুষটা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে ! পথে-বাজারে হোক, অন্য কোথাও হোক, আগে যেন দু-একবার দেখেছে এ লোকটাকে। প্রদীপটা তুলে এনে মুখের কাছে ধরে দুর্গা ঠাহর করে দ্যাখে। মনে পড়ি-পড়ি করে মনে পড়তে চায় না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটা এমনভাবে রহস্যময় হয়ে ওঠে যে সেটা রীতিমতো ভয়-ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় দুর্গার পক্ষে !

প্রদীপটা রাখতে রাখতে আচমকা নাজিমের পথে দেখা মূর্তিটা দুর্গার মনে ঝলক মেরে যায়— ধুতির বদলে লুঙ্গি পরা নাজিম, ছককাটা ছাপমারা লুঙ্গি।

কী সর্বনাশ ! দুর্গার গা কাঁপে, সে শিউরে ওঠে। জানাজানি হলে কী হবে ? পাড়ায়, ঝি-সমাজে তার লজ্জা আর কেলেঙ্কারির সীমা থাকবে না। মানুষটা ও পাড়ার বস্তির, তার চিনতে দেরি হলেও এ পাড়ার অনেকেই হয়তো তাকে ভালো করেই চেনে, নাম জানে, পরিচয় জানে। কে জানে, কেউ দেখেছে কিনা ঘরে আনবার সময় ?

প্রমদা একনজর তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। অনেক দিন ইতস্তত করে দুর্গা যে আজ মনস্থির করেছে, প্রথমবার পুরুষ নিয়ে ঘরে এসেছে, এটা প্রমদার খুশি-অখুশির ব্যাপার নয়। দেশে যাবার নাম করে দুর্গার স্বামী এক বছরের ওপর ভেগেছে, পরে জানা গেছে সে রেলপুলের কাছের বস্তিতে আরেকটি মেয়েমানুষের সঙ্গে বসবাস করেছে। এ অবস্থায় কী করবে না করবে দুর্গারই স্থির করার কথা, আর কোনো চারা নেই। তবে ভাজি বেচতে গিয়ে পথ থেকে আচমকা একজনকে কুড়িয়ে না আনলেই প্রমদা সুখী হত। এর চেয়ে ক-দিন চেনাজানা হবার পর একটু যাচাই-করা মানুষের সাথে ঘর বাঁধা ভালো।

কী করবে ভেবে না পেয়ে দুর্গা এসে প্রমদাকে বলে, মাসি, লোকটাকে চিনিস নাকি দেখবি আয় তো ?

আমি যাব না।

বড়ো ঝঞ্ঝাট হল মাসি, পায়ে পড়ি আয়। বেঘোর হয়ে পড়ে আছে। তোর ডরটা কী ?

ঝঞ্ঝাট কীসের ?

প্রমদা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে আসে। নাজিমকে দেখে আঁতকে উঠে বলে, মা গো মা দুগ্‌গা, তোর কাণ্ডজ্ঞান নাই ? একটা বেজাতকে নিয়ে এসেছিস !

আস্তে কথা বল মাসি, লোকে শুনবে না ? কী করি এখন বল দিকি ?

আনলি কেন ?

কেমন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে, মোটে চিনতে পারিনি গোড়ায়।

প্রমদা বলে, গোষ্ঠকে ডাকি ? মোরা মেয়েলোক কী করব ?

দুর্গা ভয় পেয়ে বলে, না না, গোষ্ঠকে নয়। ওর খপ্পরে পড়ব না বাবা, দফা নিকেশ করে দেবে।

তবে চুপ মেরে থাক। রাত বাড়লে মোরা ধরাধরি করে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে আসব।

তুইও থাক মাসি। ঘোর কেটে যদি জেগে ওঠে ?

জ্বর গায়ে বসতে পারবনি। মোর মাথা ঘুরছে।

প্রমদা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বেজাত পুরুষটাকে আগলে ঘরে একা জেগে বসে থাকে দুর্গা। অস্পষ্ট আওয়াজ করে নাজিম একটু নড়লে চড়লে তার বুক টিপটিপ করে। একগাদা মদ খেয়েছে বলেই শুধু গোড়ায় মানুষটার সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল, নইলে সুন্দর চেহারার জোয়ান মানুষটাকে বিশেষ তার অপছন্দ হয়নি। প্রদীপ নিবিয়ে পাশে শোয়ার সময় ভয়ের মধ্যেও প্রত্যাশার উত্তেজনা বোধ করেছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের অনেকগুলি রাত তার এই শয্যায় নিঃসঙ্গ কেটেছিল। নেশায় মানুষটাকে কাবু দেখে মাথায় জল ঢেলে সেবা করার সময় মন তার ভরে গিয়েছিল মমতায়। শুধু জাতটা টের পাওয়া মাত্র সেই মমতা তার ভয়ে-বিতৃষ্ণায় শত যোজন তফাতে সরে গেছে ! এখন ওকে যদি বাঘে টেনে নিয়ে যায় সে যেন বেঁচে যাবে ! অধীর হয়ে সে সময় গুনছে কতক্ষণে রাত গভীর হয়ে পাড়া নির্জন নিঝুম হয়ে যাবে, মাসির সঙ্গে ধরাধরি করে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবে মানুষটাকে !

ক্রমে ক্রমে নাজিমের ছটফটানি বাড়ে, যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ স্পষ্টতর হয়। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে দুর্গার বোধগম্য হতে থাকে যে লোকটা ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে, অদ্ভুত রকম বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখটা। বেশি মদ খেলে কি এ রকম হয় ? না মদের সঙ্গে অন্য কিছু খেয়েছে ? বিষ-টিষ কিছু ? সঙ্গের সেই লোকটা খাইয়ে দিয়েছে ?

হাত-পা অবশ অবসন্ন হয়ে আসে দুর্গার। হয়তো মেরে ফেলার মতলবে সঙ্গের লোকটা সত্যই একে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, তারপর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেটে পড়েছে। নইলে একরাত্রির জন্য তাকে কেউ এগারোটা টাকা কখনও দেয় ? তার ঘরে এভাবে লোকটা যদি মরে যায় কী সর্বনাশ হবে তার !

কী কুক্ষণে আজ তার এই কুমতি হয়েছিল।

দুর্গা এখন করবে কী ?.

ইতিমধ্যে একসময় বমি করে নাজিম দুর্গার বিছানা ঘর-দুয়ার ভাসিয়ে দেয়। দুর্গা নিজের হাতে আজ যে ভাজি বিক্রি করেছিল সে সবও বেরিয়ে আসে তার পেট থেকে। দুর্গার গা ঘিনঘিন করে। নিজের মরণ চাইতে চাইতে সরে গিয়ে কোনায় দাঁড়ায়। নাজিম আর ছটফট করে না, গোঁঙায় না। নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। দুর্গা ভাবে, এইবার কী করবে মানুষটা ?

খানিক পরে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে নাজিম জল চায়। কোনো রকমে উঠে বসে।

তার ঘরে সে যে মরবে না, মরে গিয়ে তাকে যে ভীষণ বিপদে ফেলবে না, নাজিমের এই অনুগ্রহে দুর্গার যেন কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না—সে যে বেজাত বিধর্মী, বমি করে সে যে তার ঘর-দুয়ার নোংরা করে দিয়েছে, সব দুর্গা ভুলে যায়। জল গড়িয়ে গেলাসটা সে নাজিমের মুখে ধরে।

জল খেয়ে নিজের বমির মধ্যে চিত হয়ে পড়ে নাজিম এক রকম সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুর্গা বলে, শুনছ ? কথা শুনছ ?

গেলাসের তলাটা দিয়ে মাথায় ঠেলা দেয়। নাজিম নড়েও না, সাড়াও দেয় না। ভোঁস-ভোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে থাকে।

কলসি আর বালতিতে জল তোলা ছিল, জল ঢেলে ঝাঁটিয়ে দুর্গা মেঝেটা সাফ করে ! এটা তাকে করতেই হবে, আজ অথবা কাল। এই ঘরে না থেকে যখন তার উপায় নেই, এখনি সাফ করে ফেলা ভালো। তার স্বামী অঘোরের বমিও দু-চারবার তাকে সাফ করতে হয়েছে। নেশার অভ্যাস ছিল না অঘোরের, খেলেই বেতাল হয়ে পড়ত, আর ঠিক এমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড় তুলে অঘোরে ঘুমোত। জাগত শেষরাত্রে।

দুর্গার ভয়-বিহ্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যায়। পিঁড়ি পেতে বসে ঘুমে বেহুঁশ নাজিমের দিকে চেয়ে সে ভাবে, এতটা উতলা হবার কী আছে ? তার ঘরে এসেছে মানুষটা, চারিদিকে হিন্দুর বসবাস। মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক তার ভয়ের কী আছে—এ পাড়ায় এই লোকটারই বরং ভয় পাবার কথা। ঘুম ভেঙে ভালোয়-ভালোয় যেতে না চায় একটু ভড়কে দিলেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবে না। বোকামি করে ঘরে যখন এনেই ফেলেছে মানুষটাকে, মিছামিছি বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। মাসির পরামর্শটা এতক্ষণে বেশ খানিকটা খাপছাড়া ঠেকে দুর্গার কাছে ! ধরাধরি করে একটা জ্যান্ত মানুষকে রাস্তায় নিয়ে ফেলার ঝুঁকি কম নয়। কে দেখবে, কীসে কী হবে কে জানে। তার চেয়ে মানষটাকে ঘুমিয়ে নেশা কাটাতে দিয়ে রাতারাতি ভাগিয়ে দেওয়াই ভালো—যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যাবে, কেউ টের পাবে না।

করকরে নগদ টাকাগুলি হাত পেতে নিয়েছে, তার বিশ্বাসটাও তো রাখা উচিত ? জাতধর্ম শুধিয়ে যখন সে টাকা নেয়নি, মাতাল দেখেও টাকা নিতে আপত্তি করেনি, রাতটা শুধু তার ঘরে ঘুমিয়ে কাটাতে না দিলে অন্যায় হবে, পাপ হবে ! সে কি ঠক-জোচ্চোর যে টাকাটা হাতে পেয়ে কড়ার ভুলে যাবে, বাঁচুক মরুক অচৈতন্য মানুষটাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসবে ?

গভীর রাতে প্রমদা চুপিচুপি খবর নিতে আসে—দুর্গাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলে তার কিছু বখরার আশাও ছিল।

দুর্গা বলে, থাকে গে মাসি। অত হাঙ্গামার কাজ নেই। নেশা কাটলে ভোররাতে ভাগিয়ে দেব।

প্রমদা ক্রূর চোখে তাকায়, বলে, ওর সাথে তুই রইবি রেতে ?

দুর্গা বলে, রাম রাম, মোর গলায় দড়ি জোটে না ?

তোকে ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছিস ? একে ইয়ে তায় মাতাল ?

একদম কাবু হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবার সাধ্যি হবে না। তাছাড়া, প্রাণেব ডর নেই ওর ? কোন পাড়ায় এসেছে টের পেলে প্রাণটা নিয়ে কতক্ষণে ভাগবে তার চেষ্টা দেখবে না ?

ক্রূর চোখে চাইতে চাইতে প্রমদা ফিরে যায়।

পিঁড়িতে বসে ঢুলতে ঢুলতে চমকে চমকে তন্দ্রা ভেঙে দুর্গা সারারাত জেগে কাটায়। শেষরাত্রে ঠেলে তুলে দেয় নাজিমকে। বলে, মরণ-দশা পেয়েছে বুঝি তোমায়, এ পাড়ায় এয়েছ ফুর্তি করতে ?

দেখা যায়, হিসাব দুর্গার ভুল হয়নি। ব্যাপার বুঝতে একটু সময় লাগে নাজিমের, কিন্তু বুঝে পালাবার জন্য সত্যই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে !

দুর্গা তাকে সাথে নিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আসে। বস্তির ঘরে ঘরে তখনও সকলে ঘুমোচ্ছে।

সকালে দুর্গা প্রমদার ঘরে ঢুকতে যাবে খবরটা দিতে, প্রমদা একেবারে খেঁকিয়ে ওঠে ! বলে, বেরো বেরো, ঘরে ঢুকিস নে তুই আমার ! জিনিসপত্র ছুঁসনে আমার ! তোকে ছুঁতে নেই !

মাসির কাছে দুর্গার জাত গেছে ! একরাত্রে সে অস্পৃশ্যা হয়ে গেছে। সেদিনটা কাজ কামাই করতে হয় দুর্গার।

একরাত্রে এমন দুর্বল হয়ে গেছে যেন কতকাল রোগ ভোগ করে উঠেছে। রাতের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মাসির অদ্ভুত ব্যবহার এক অজানা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তার মনে। এমন একটা ফাঁড়া গেল, মাসি কোথায় একটু দরদ জানাবে, তার বদলে রাতারাতি সে যেন নিষ্ঠুর হিংস্র শত্রু হয়ে গেছে! তার সর্বনাশ করতে না পারলে মাসির যেন শান্তি নেই !

নাজিমকে ঘরে এনে সে যেন মাসিরই এমন ক্ষতি করেছে যার পূরণ নেই। প্রতিশোধ নিতে মাসি তাই খেপে গেছে।

অথচ রাতের ব্যাপারটা মাসি কেন রটিয়ে দেয় না দুর্গা বুঝতে পারে না। যা দিনকাল, যে কাণ্ড চলছে শহরে চারিদিকে, তাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে সে রাতে নাজিমকে এনেছিল জানলে বস্তির মানুষ এখান থেকে তার বাস না উঠিয়ে ছাড়বে না। এ শত্রুতাটা মাসি অনায়াসেই করতে পারে। গায়ের জ্বালায় যা-তা বলে বেড়াচ্ছে, তাকে শাসাচ্ছে শাপছে অথচ আসল কথাটা মুখ দিয়ে বার করছে না। মাসির দিক থেকে এটা আরও বেশি ভয়ের কারণ হয়েছে দুর্গার। কে জানে, কী মতলব ভাঁজছে মাসি !

ঝি-রা কামাই করলে মণির গা জ্বালা করে। বিশেষত এখন যেচে ঘরকন্নার দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ায় তার দারুণ খাটুনি চলছিল। পরদিন দুর্গা যখন দেরি করে কাজে এল, মণি মনে মনে অনেকগুলি কড়া কড়া ধমক আউড়ে নিচ্ছিল। দুর্গার সাদাটে শুকনো মুখ দেখে গলার কাছে উঠে আসা গালগুলি তাকে প্রায় ঢেঁকি গেলার মতো গিলে ফেলতে হয়। কিন্তু একটা উদ্‌গার সে ছাড়ে।

বলে, সত্যি তবে অসুখ হয়েছিল, শখের কামাই নয় !

দুর্গা বলে, শখ করে কেউ কামাই করে ?

মণি ঝালের সুরে বলে, তোমরাই কর, একবার ছেড়ে দশবার ! ঝিদের এই একটা বিচ্ছিরি ব্যারাম আছে বাবা !

তারপর উদার সুরে যোগ দেয়, যাই হোক, তুমি যে ফাঁকি দিয়ে কামাই করনি তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি দুর্গা।

দুর্গার গা জ্বলে যায় তার কথার ধরনে। স্থিরচোখে চেয়ে বাঁকা হাসি হেসে সে বলে, খুশি হয়েছো নাকি ? তবে দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও !

তোদের খালি মাইনে বাড়াও, মাইনে বাড়াও ! মুখে আর কথা নেই। কী হয়েছিল তোর, এক দিনে এমন চেহারা করেছিস ?

ওরে মা রে বাবা রে ! সে কথা শুনলে তুমি ভিরমি যাবে। কাল মোকে মাম্‌দো ভূতে ধরেছিল বউদি, আসল মাম্‌দো !

রাগে মণি লাল হয়ে যায়। একটা ঝিরও তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার তামাশা করার স্পর্ধা হয় !

এককাঁড়ি বাসন নিয়ে দুর্গা কলতলায় মাজতে বসেছে, আবির্ভাব ঘটে তার মাসি প্রমদার।

মণি তরকারি কুটছিল, হাত তিনেক তফাতে বসে প্রমদা বলে, একটা ভারী বিশেষ কথা বলতে এলাম মা।

সে যেন নেতিয়ে পড়েছে। সে যেন খবর দিতে এসেছে যে জগৎ সংসার শেষ হয়ে গেছে কিংবা যায়-যায় হয়েছে, আর বেঁচে থেকে লাভ নেই !

কী কথা বাছা ?

এই যে বলি। বড়ো দুঃখের কথা, বড়ো খারাপ কথা মা। বলতে মন চায় না মোটে। মায়ের পেটের বুনের পেটের মেয়ে তো। তা জেনেশুনে চুপ করেই বা রই কী করে ? মান্‌ষের জাত-ধম্মো নষ্ট করিয়ে চিরটা কাল নরকে ডুবব ?

নরকে তো তোমরা ডুবেই আছ। কী বলবে বলো চট করে।

মা গো, তুমি রাগ করেছ ? বুঝেছি মা, এই দুগ্‌গা ছুঁড়ির জন্য তোমার মেজাজ ভালো নেই। ওই বজ্জাতটার কথাই বলতে এসেছি মা।

মাইনে বাড়াতে হবে ? এই সেদিন এসে ঝগড়া করে দুটাকা বাড়িয়ে নিয়েছ, আর এক পয়সাও বাড়াতে পারব না, আগে থেকে বলে রাখছি। না পোষায় কাজ ছেড়ে দিক।

প্রমদা জিভ কেটে বলে, ছি ছি, ও বজ্জাতটার হয়ে ফের বলব ? সেদিন বলতে এসেছিলাম বলেই না আজ এই নাক কান মলছি ! ছুঁড়িটা যে কত পাজি কত বেহায়া মোটে মোর দিশে ছিল না। ওটাকে আর রেখোনি মা, এই দণ্ডে দূর করে দাও। ওর ছোঁয়া জল খেতে নেই, হারামজাদি এক বেজাতের সাথে মেতেছে।

মাম্‌দো ভূত ! দুর্গাকে আসল মাম্‌দো ভূত ধরেছিল ! মণি কৌতূহলে ফেটে পড়তে চায়।

মা ! মুসলমানের সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে। ওর স্বামী ?

সে ওকে কবে ছেড়ে গেছে। ও বজ্জাতটার সাথে কে ঘর করবে বল ? সে ছিল ভালোমানুষের ব্যাটা, এ সব্বোনাশির খোয়ার কী তার সয় ? মেরে আধমরা করে রেখে জন্মের মতো ছেড়ে চলে গেছে। আহা, একেবারে শেষ করে যদি রেখে যেত গো !

একবছর ধরে প্রমদা দুর্গার পলাতক স্বামী আর তার চোদ্দোপুরুষের শ্রাদ্ধ করে এসেছে, অভিশাপ ঝেড়েছে তার সাধ্যে যতটা কুলায় ! আজ সে অঘোরের পক্ষে। যাবার আগে সরু লোহার শিক দিয়ে অঘোর দুর্গাকে অমানুষের মতো মেরেছিল, সাত দিন বিছানায় পড়ে ছিল দুর্গা, প্রথম দুদিন জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে ছিল। তখন হাতের কাছে পেলে প্রমদা অঘোরকে অনায়াসে মেরে বসতে পারত। দিবারাত্রি কাছে থেকে দুর্গার সে সেবা করেছিল, সর্বাঙ্গের অসহ্য ব্যথায় দুর্গাকে কাতরাতে দেখে নিজেও যে কতবার কেঁদেছিল ঠিক নেই। আজ তার হৃদয় থেকে আপশোশ ঠেলে উঠছে— অঘোর কেন মেয়েটাকে একেবারে খুন করে রেখে যায়নি !

গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে আর বিদ্বেষে ঘৃণায় আক্রোশে বুক যেন জ্বলে পুড়ে ফেটে যেতে চায়। তার মুখ দেখে মণির পর্যন্ত সর্বাঙ্গে একটা ভীতিকর শিহরন বয়ে যায়। মোটাসোটা প্রৌঢ়বয়সি বিধবাটির থলথলে মুখ যেন সারাজগতে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত হিংসায় ত্যারা-বাঁকা হয়ে গেছে।

মণি একটু ভয়ে ভয়েই বলে, তা তুমি অত খেপেছ কেন প্রমদা ? ও নষ্ট হয়ে থাকে, ওর সঙ্গে তুমি আর সম্পর্ক রেখো না, ফুরিয়ে গেল !

প্রমদা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, তুমি বলছ কী মা ? এ যে আসল সম্পর্ক গো, ঘরের সম্পর্ক জেতের সম্পর্ক সমাজের সম্পর্ক—রাখব না বললে কী এ ফুবিয়ে যায় ফুসমন্তরে ? মোর একার ব্যাপার নয় তো যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করলাম আব চুকে গেল ? মায়ে-বেটিতে মুখ দেখে না সে ব্যাপার তো কত ঘটছে, মোরা শুধু মাসি-বোনঝি। ছুঁড়ি যে সমাজ ধম্মো বিকিয়ে দিলে, জেতের গলায় ছুরি দিলে—এতে যদি না খেপব তবে কীসে খেপব বল ?

কী জানি বাছা, তোমার এ বিচার মাথায় ঢুকছে না। একটা মেয়ে যদি নিজের খুশিতে জাত-ধর্ম নষ্টই করে, সে নিজেরটাই নষ্ট করলে, তোমাদের দশজনের কী এল-গেল ? তোমরা নয় ওকে ছেঁটে ফেল, ও নিজের পথ দেখুক।

তাই তো বলতে এয়েছি মা, এই দণ্ডে ছুঁড়িকে দূর করে দাও।

মণি বলে, আমি কেন ওকে দূর করতে যাব বাছা ? ও মুসলমানের সঙ্গে পিরিত করুক আর খ্রিষ্টানের সঙ্গে পিরিত করুক, আমার কী এল-গেল ? দুবেলা ঠিকমতো জল তুলে বাসন মেজে দিয়ে গেলেই হল।

প্রমদা থ বনে যায়।—তুমি হিঁদুর মেয়ে ?

নয় তো কী মুসলমানের মেয়ে ? বেচারাকে দুবেলা খাটিয়ে মারছি, জানি তো যে ক-টা টাকা দি, তাতে আজকের দিনে কারও পেট ভরে না। এই পাপেই হয়তো নরকে যাব। অন্য সময়টুকু বেচারা নিজের ঘরে কী করছে না করছে, তাতেও যদি শাসন করতে যাই, নরকেও আমার ঠাঁই হবে না !

কলকাতায় রোদ পড়ে না, চিরন্তন ছায়ায় ভিজে পিছল শ্যাওলা ধরা ফাটা সিমেন্ট থেকে ভেজা দম আটকানো ভাপ ওঠে ! বাসনের কাঁড়ি নিয়ে আজ দুর্গা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। যে যেখান

থেকে উৎখাত হয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, তারা সবাই আর যা-ই কিছু ফেলে এসে থাক, মুঠি কয়েক চালডাল আর বাসনপত্র আনতে ভোলেনি। বাড়ির মানুষের মাথা গুনে বাসন দিয়ে হিসাব ধরলে মনে হবে, শহরে বুঝি ভাতের অভাব নেই, জোড়াতালি কনট্রোল নেই—ভোজ ছাড়া কী খেতে এত ঘটিবাটি থালা গেলাস হাঁড়ি কলসি দরকার হয় ? যন্ত্রের মতো বাসন মাজতে মাজতে দুর্গা কায়ক্লেশে মণি আর প্রমদার কথা শুনছিল। মণি তাকে তাড়িয়ে দেবে, এতে দুর্গার ভয়ের কিছু নেই। কালকেই আরেক বাড়ি কাজ পাবে। ঝি-চাকরের অভাবে শহুরে বাবুদের বাড়িগুলি খাঁ-খাঁ করছে।

সে মুখ বুজে ছিল মাসির সম্পর্কে ওই অজানা আতঙ্কে। দুদিন আগে এসে যে মাসি ঝগড়া করে তার দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মাসি আজ যেচে এসেছে ভাংচি দিয়ে তার কাজ খসাতে। এর পিছনে নিশ্চয় একটা অলৌকিক ভৌতিক প্রক্রিয়া আছে—নিশ্চয় এর পেছনে মন্ত্র-টন্ত্র প্রক্রিয়া-টক্রিয়া খাটিয়ে তার সাংঘাতিক কোনো ক্ষতি করার মতলব আছে মাসির।

মণির কথায় এক নিমেষে তার সব ভয় জুড়িয়ে যায়, ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ঠিক কথা, মণিও তো হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে বামুনের বউ। তার প্রমদা মাসির চেয়ে শত ধাপের উঁচু স্তরের মানুষ, মন্ত্র-তন্ত্র মারণ-বশীকরণ যাদের ছেলেখেলার ব্যাপার। মণি যদি তার মিথ্যা অপরাধটা এমন হালকাভাবে নেয়, দাসের ঘরের ছোটো জাত প্রমদা মাসি তার কী করতে পারে !

তড়াক করে উঠে আসে দুর্গা। হাত নেড়ে মুখ খিঁচিয়ে বলে, গায়ে পড়ে শত্তুরতা করতে এয়েছিস ? মিথ্যুকি শতেকখোয়ারি বুড়ি ! মরণ হয় না তোর ?

মণিকে সে বলে, ওর সব বানানো কথা, মিছে কথা। ওর কথা শুনো না বউদি। আমি কারও সাথে মজিনি, মজে মোর কাজ নেই।

আবার সে প্রমদাকে গাল দেয়। প্রমদা জবাব দিতে মুখ খুলেছে, মণি তাকে ধমকে থামিয়ে দেয়। কঠিন সুরে বলে, তুমি যাও—এখখুনি যাও। না না, তোমার কোনো কথা আমি শুনব না। বেরোও তুমি এ বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যাও !

প্রমদা চলে গেলে বলে, বোস তো দুর্গা এখানে।

আচমকা তার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টায়, স্নেহ আর প্রশ্রয়-মেশানো আদবের সুরে দুর্গা একটু ভড়কে যায়। ভাবে, এ আবার কী রে বাবা !

মণি বলে, কী ব্যাপার সব খুলে বল দিকি আমায় লক্ষ্মীটি। তোর কোনো ভাবনা নেই। যে জাতের হোক, যত বাধা থাক, আমি তোদের মিল ঘটিয়ে দেব।

দুর্গা ভয় পেয়ে বলে, কার কথা বলছ বউদি ? কার সাথে মিল ঘটিয়ে দেবে ?

মণি মুচকে হেসে বলে, যে মাম্‌দোর সাথে তোর ভালোবাসা হয়েছে।

ভালোবাসা ? ভালোবাসা কী গো ! ও পিরিত ভালোবাসার ব্যাপারে মোর কাজ নেই, দূর থেকে পায়ে দণ্ডবৎ। আসল ব্যাপারটা বলি শোনো।

মাতাল নাজিমকে দাঙ্গার শিকার বানিয়ে দুর্গাকে গল্পটা ফাঁদতে হয়, নইলে মণি তো বুঝবে না পেটের দায়ে কেন তাদের অজানা মানুষ ঘরে আনতে হয়। পেটের দায়ে বাসন-মাজা ঝি-গিরি মণি বোঝে, অচেনা পুরুষের কাছে রাতের ঝি-গিরি তার মাথায় ঢুকবে না !

মণির মুখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরকমভাবে বদলে যেতে থাকে। ভ্রূকুটি ভরা কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে আসে তার মুখে, চোখে ঝিলিক মেরে যেতে থাকে তীব্র ঘৃণা আর হিংস্র বিদ্বেষ। দুর্গার নামে নালিশ করার সময় প্রমদার মুখ আর চাউনি যেমন হয়েছিল, তারই আশ্চর্য প্রতিফলন যেন ঘটছে।

খানিকক্ষণ সে গুম খেয়ে থাকে। মাছ-তরকারি কুটতে কুটতে বঁটিটা হয়েছে চকচকে, কাঠের হাতলে চাপানো তার পায়ে এদিকে জলে জলে ক-দিনে উপক্রম হয়েছে হাজা ধরার। চৈতি বিচিভরা বেগুনটা অভ্যাসবশেই সে দুফালি করে কাটে।

তুইও বিদেয় হ দুর্গা। বেরিয়ে যা।

এই তোমার বিচার হল ?

হ্যাঁ, তোকে দেখলে ঘেন্না করছে। এখুনি বিদেয় হও, কাল এসে মাইনে নিয়ে যেয়ো।

মণিকেও কড়া কড়া কটা গাল দেবার সাধটা চাপতে চাপতে দুর্গা বলে, বেশ তো—বেশ তো, বিদেয় এখুনি হচ্ছি। যে বাড়ি যাব খেটে খাব, ভয় দেখাও কীসের ? তা, অপরাধটা কী হয়েছে শুনতে পাইনে ?

তোর অপরাধ ? শুনবি তোর কী অপরাধ ?—বেগুনের ফালি দুটি মাটিতে ফেলে দিয়ে মণি দুহাতে এলোচুল পিছনে ঠেলে দেয়, প্রমদার রোগাটে ভদ্র প্রতিমূর্তির মতো হিংসা-বিদ্বেষ চাপা দেওয়া সুরে বলে, তুই হিন্দু-মুসলমান মেথর-মুদ্দফরাস কার সাথে ভালোবাসা করেছিস, আমার তাতে বয়ে যেত দুর্গা। হিসেব করে প্রেম হয় না জানি তো আমি। কিন্তু এ তো তোর ভালোবাসার ব্যাপার নয় ! টাকার জন্য তুই একটা মাতালকে ঘরে এনেছিলি ? তোর মুখ দেখলে পাপ হয় !

দুর্গা বলে, পাপ হয় ? তবে আর পাপ বাড়িয়ে কাজ নেই বউদি, আজকেই মাইনেটা দিয়ে বিদেয় দাও ! কাল ফের মাইনে নিতে এলে পোড়ামুখ দেখতে হবে, আরও খানিকটা পাপ হবে !

মণি নীরবে উঠে গিয়ে আগের দিনের কামাই কেটে পাই-পয়সার হিসাব করে দুর্গার মাইনে এনে দেয়। হিসেব হয় সাত টাকা তেরো আনা এক পাই। এক পাই কাটবে না পুরো একটা পয়সা দেবে, মিনিট খানেক ভাবতে হয় মণিকে !

হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে বলে, এক পাইয়ের জায়গায় একটা পয়সা দিয়েছি—তিন পাইয়ে এক পয়সা।

তোমার অনেক দয়া বউদিদি ! দয়ার সিমে নেই তোমার !

হাত পেতে বেতন নিয়ে দুর্গা মুচকে হাসে, বলে, আজ এখুনি কেন মাইনে চেয়ে নিলাম জানো ? মোরও তো একটা পাপপুন্যির হিসেব আছে ? তোমার মুখ দেখে মোর পাপ হবে জেনেছি। কাল ফের মাইনে নিতে এসে পাপ বাড়াব ? তাই জন্যে !

বলে গজর-গজর করতে করতে দুর্গা বেরিয়ে যায়।

কাজ দুর্গা পরদিনই পেয়ে যায়, এক বাড়ির বদলে দুবাড়িতে, প্রণবদেব পাড়াতেই কাছাকাছি দুটি বাড়ি। বাজারে ঝি-র টানাটানি, যদিও চাকরের অভাবের মতো নয়। গেরস্ত-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ছাড়া যারা কলে-কারখানায়, এমনকী চালের কলে পর্যন্ত কাজ করার কথা ভাবতে পারত না, যুদ্ধের বাজারে তাদেরও এ সংস্কার ভেঙে গিয়েছে। চালের কলে নতুন ধানের মরশুমের সময় দু-একমাস ভদ্রপাড়ার গিন্নিদের ঝিয়ের শোকে চোখে প্রায় জল এসে পড়ার উপক্রম হয়।

দুবাড়ির কাজ, কাক-ডাকা ভোরে দুর্গাকে বেরিয়ে যেতে হয়। এমনি ভোরে একদিন ডোবার ঘাটে কাপড় কেচে সে রাস্তায় উঠেছে, চেয়ে দ্যাখে সামনে দাঁড়িয়ে নাজিম !

তুমি ফের এয়েছো এ পাড়ায় ? কী সব্বোনাশ !

নাজিমের শীর্ণ ম্লান মুখে মৃদু একটু হাসি ফোটে। সে বলে, সেদিন জান বাঁচিয়েছিলে, দুটো কথা বলতে এলাম সাদা চোখে।

কী কথা ?

বিশেষ কথা কিছুই নয়, কৃতজ্ঞতা জানাতে এসে দুটো কথাবার্তা বলে যাওয়া। দুর্গার নাম তো জানে না নাজিম, কোনটা তার ঘর, তাও ঠিক মনে ছিল না। সে তাই ভোরবেলা দু-চারদিন এখানে ঘোরা-ফিরা করে গেছে। দুর্গা নিশ্চয় ভোরবেলা ঘাটে কাপড় কাচতে আসে, যদি দেখা হয়ে যায় !

ভয়ে দুর্গার গা কাঁপছিল—নাজিমের ভয়ে নয়। তাকে নিয়ে হাঙ্গামা হবার ভয়ে। প্রমদা মাসি যদি ঘাটে আসে এখন, যদি দেখতে পায় লোকটাকে, তবে আর উপায় থাকবে না—সঙ্গে সঙ্গে হইচই বাধিয়ে লোক জড়ো করবে, বাঁচবার আশা থাকবে না নাজিমের ! প্রমদা ছাড়াও পাড়ার অন্য দু-চারজন নাজিমকে চেনে না, এমন নয়। কিন্তু এ লোকটা কি পাগল ? সে রাত্রে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে দুটো কথা বলতে প্রাণ হাত করে এই যমপুরীতে এসেছে—আজকে প্রথম নয়, আগেও তাকে খুঁজতে এসে ঘুরে গেছে দু-চারদিন !

তুমি কি পাগল ? পাড়ার কেউ চিনলে যে মেরে ফেলবে তোমায় ?

নাজিম জোর দিয়ে বলে, না, মারবে না।

মারবে না ? চাদ্দিকে মারছে যে যাকে পারে, তোমায় হাতে পেয়ে মারবে না ?

কেন মারবে ? আমি বলব আমি গরিব মানুষ, খেটে খাই ; আমার জাত ভি নেই, ধরম ভি নেই। তবু যদি মেরে ফেলে, মারবে ! নাজিম নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে একটু হাসে, তুমি মিছে ডরাচ্ছ, আমাকে কেউ মারবে না। এটাও গরিব আদমিব পাড়া।

দুর্গা বলে, গরিব মানুষ কী আব মারবে তোমাকে ? মাববে পাড়াব গুন্ডারা।

গুন্ডাকে ডরালে চলবে কেন ? আজ এই অজুহাতে মারছে, কাল ফের অন্য অজুহাতে মারবে।

নাজিমকে চেনা যায় না, ভাবা যায় না, এই লোকটাই সে রাত্রে মদ খেয়ে বেতর হয়ে তার ঘরে বমি করে ভাসিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, জ্ঞান হয়ে কোন পাড়ায় এসেছে শুনেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চোরের মতো গিয়েছিল পালিয়ে। আর সেই মানুষটা আজ ভোরে সাদা চোখে সাধ করে আবার মরতে এসেছে এ পাড়ায়। না মরতে আসেনি। অপমরণের গালে থাবড়া মারতে এসেছে !

কী করা যায় এখন ? মানুষটাকে তো খেদিয়ে দেওয়া যায় না যে দেখা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, এবার তুমি ভাগো, আর বেশি কথায় কাজ নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাও বলা যায় না মানুষটার সঙ্গে এভাবে। বলছে কিনা যে আঁতে ঘা লেগে চোখ খুলেছে, জানতে পেরেছে খাটুয়েব জাত-ধর্ম নেই—কোন আঁতে কী ঘা লেগে তার মাথা খুলে গেছে কিনা জানলেই বা দুর্গার চলে কী করে !

কী হয়েছে তোমার ? বউ ঝগড়া করে বাপের বাড়ি গেছে ?

বাপের বাড়িই গেছে। বাপের সাথে নিকা বসতে গেছে !

দুর্গা ভেবেচিন্তে বলে, ঘরে এসো, বসে ধীবে সুস্থে কথা কও। অত গলা চড়িযো না।

নাজিমের হাবভাব কথাবার্তা পাগলের মতো। মাথা বিগড়ে যাবার পর উমেশের চোখে যে রকম ঝিলিক খেলতে দেখেছিল দুর্গা, নাজিমের চোখও থেকে থেকে তেমনিভাবে ঝলসে উঠছে। দুর্গার কিন্তু ভয় করে না। লোকটা যদি উন্মাদ হয়ে গিয়ে থাকে, উন্মাদ হয়েই যেন সুস্থ আর শান্ত হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। নাজিমের কথাগুলি তার বড়ো ভালো লাগে শুনতে। নাজিম যেন নতুন একটা ধর্ম প্রচার করছে—জগতে হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, আছে শুধু বড়লোক আর গরিবলোক। জগতে আছে শুধু গুন্ডা আর তাদের শিকার লাখ লাখ কুলিমজুর, বাস্ খতম। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয়, স্রেফ ধনী আর গুন্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।

আচমকা দুর্গার হাত চেপে ধরে নাজিম কী যেন বলতে চায়, কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোয় না। বক্তব্যটা বোধ হয় এখনও শুধু আবেগ, ভেতবে ফেটে পড়তে চাইছে কিন্তু কথায় রূপ পাচ্ছে না। বোবাকে ধরে বেদম মেরে ছেড়ে দিলে যেমন করে, খানিকটা সেই রকম মনে হয় নাজিমের কথা বলার চেষ্টা। দুর্গার একটু ভয় ভয় করে বইকী। তবে কোনো পুরুষের কাছেই জাত-ধর্ম হারাবার সত্যিকারের ভয় তার নেই, ও সব পাট অনেক কাল চুকে গেছে, বজায় আছে শুধু ঠাটটা। তাছাড়া, এ ছটফটানি পিরিতের নয় বোঝা যায়।

নাজিম বলতে চেয়েছিল নানির কথা, তার ঘুটে-বেচা বুড়ি মাকে শয়তানেরা কীভাবে ষড়যন্ত্র করে জবাই করেছে দাঙ্গা উসকানোর আশায়। বলতে চেয়েছিল পরীবাণুর কথা, তার সরল নিরীহ বউটার মন ওই শয়তানেরা কী কৌশলে বিগড়ে দিয়ে তাকে ঘর ছাড়িয়েছে, তাকে দিয়েই ভেঙেছে তার পরীবাণুর মন। কিন্তু বলতে গিয়ে কথা খুঁজে পায় না, মনে হয় ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন যেমন ঘুমন্ত মানুষের আর্তনাদকে বোবায় ধরিয়ে চেপে রাখে, তার মা-বউয়ের কাহিনিও তেমনি তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনও বেরোতে পারবে না।

নসিব ! আর কী ? সব নসিব !

দুর্গার হাত ছেড়ে নিজের কপালটা থাপড়ে দিয়ে নাজিম শান্ত হয়ে যায়। খাপছাড়া একটু হাসি পর্যন্ত সে হাসে। দুর্গার ঘরের চাবিদিকে এমনভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, যেন এতক্ষণ তার খেয়াল হয়েছে সে কোথায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে সোজাসুজি বলে, মোর কেউ নাই ভাই। মা ছিল, বউ ছিল, দুটোকে মাটি দিয়েছি। বাচ্চাকাচ্চা ভি একটা নাই। রোজগার করি, উড়িয়ে দিই, ভালো লাগে না।

দুর্গা বলে, ফের বিয়ে করো। অত মদ খেলে মানুষ বাঁচে ?

নাজিম বলে, আরে না, মাল টানা মোর ধাত নয়। লোকের পাল্লায় পড়ে খেয়েছিলাম। মাল টানতে যে শিখে গেছে, তার ওই রকম দশা হয় ? তুমি বল ?

দুর্গা এটা স্বীকার করে। সে রাত্রে নাজিম যে নমুনা দেখিয়েছে পাকা মাতালের ও রকম হাল হয় না বটে। ফরসা আকাশের আলো আস্তে আস্তে রোদ হয়ে পৃথিবীতে নামছে, ঘরের ভিতরের আবছা আঁধার হালকা হয়ে এসেছে দুর্গার। অতিথিকে বসতে বলে চট করে সে বেরিয়ে যায়, মন্টার দোকান থেকে কাচের গ্লাসে চা আর ছেঁড়া কাগজে ভাজা বিস্কুট এনে দেয়। যাবার সময় আসবার সময় প্রমদাকে সে ডোবার ঘাটে বাসন মাজতে দেখেছে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্রমদার বাসন সামান্য, রোজকার দু-একটি থালা বাটি কড়াই মাজতে ধুতে তার ঘণ্টা-খানেক সময় লাগে। অনেকক্ষণ একটি থালা মাজে, বারবার জলে ডুবিয়ে ধোয়, তবু তার শকুনির নজরে ধরা পড়ে যায় যে থালাটার কানার কাছে এঁটোর দাগ। আবার মাজে, আবার ধোয়। আজ পিলসুজ, ডাবর আর ঢালাই কলসি তার ঘাটে গেছে। মাজতে ঘষতে নটা বাজবে।

ডবল চায়ের গেলাস থেকে নিজের জন্য কাপে একটু চা রেখে চায়ের গেলাস আর বিস্কুট দুর্গা নাজিমকে দেয়। কাপটা সে দু আনায় কিনেছে। হাতল নেই, নতুন প্রক্রিয়ায় জোড়া লাগানো ভাঙা কাপ।

চা-বিস্কুট খেয়ে হঠাৎ মুখ তুলে নাজিম বলে, একসাথে থাকি এসো না ? রোজগার যা করি, তা দুজনে খাব। আর মাইরি বলছি, খোদার কসম, মাল-টাল ছোঁব না।

দুর্গা হঠাৎ জবাব দেয় না। আগে থেকেই সে জানতো, এ রকম একটা প্রস্তাবের জবাব তাকে দিতে হবে, তবে এতটা সে ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, নাজিম তাকে বাঁধা রাখতে চাইবে, মাইনে দিয়ে। স্পষ্ট পরিষ্কার না বলবে দুর্গা এটা ঠিক করেই রেখেছিল।

নাজিম জিজ্ঞাসা করে, কী বলছ ? হয় না ?

দুর্গা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

নাজিম বলে, মন সরছে না ? জাতে বাধছে ?

দুর্গা স্বীকার করে যে, কথাটা তাই। বলে, ওই যে বললে। গরিব মানুষ তোমার আমার জাত-ধর্ম নাই, কথাটা বড্ড মানি আমি। কিন্তু মেনে হচ্ছে কী বলো ? তোমায় আমায় বনবে না একসাথে, ওই যে বলে না, স্বভাব যায় না মলে ? তুমি আমি শত্তুর নই, কিন্তু স্বভাবে মিশ খাবে না মোদের। আমি রাঁধব পুঁই, তুমি বলবে ওতে পিঁয়াজ দাও। বুঝলে না ?

নাজিমের নিজের মনেও এ বিষয়ে খটকা ছিল। দুর্গাকে আপন করতে চেয়েও চব্বিশ ঘণ্টা এক ঘরে দুজনের আপন হয়ে থাকার ধরনটা ভাবতে গিয়ে তার কল্পনা ভড়কে যাচ্ছিল। তাই বটে,

কতকাল ধরে উপরতলার আদমিরা তাদের পাহারা দিয়ে শাসনে রেখে হালচাল বিগড়ে দিয়েছে, আজ তাদের দিল মেলে তো চাল মেলে না।

দোস্তি হবে, পিরিত চলবে না, আঁ ?

তুমি ঠিক বুঝেছ !

দুর্গা খুশি হয়ে সায় দেয়।

নাজিমকে দুর্গা সদর রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। প্রমদা তখনও ঘাটে বাসন মাজছে।

আট

কয়েক দিন পরে এক অদ্ভুত ঘটনা।

তিন বাড়ি কাজ সেরে সন্ধ্যার পর দুর্গা শালপাতা কেনার জন্য বাজার হয়ে ঘরে ফিরবে, বাজারের লাগাও পোড়ো জমিটায় মস্ত এক সভা। সাধারণ লোকের সভা দেখে নয়, বক্তাকে দেখে দুর্গা থমকে থেমে গিয়ে গুটি-গুটি পা বাড়িয়ে সভার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। নাজিম তারস্বরে বক্তৃতা দিচ্ছে ! তার সাধারণ আলাপের মৃদু মিষ্টি গলা চড়ায় উঠে খ্যান-খ্যান করে বাজছে ভাঙা কাঁসরের ব্যান্ডবাদ্যির মতো।

একটা মাছ-চালানি কাঠের বাক্সে আলু-চালানি বস্তা বিছিয়ে সভাপতিকে বসানো হয়েছে, সভাপতি স্থানীয় শান্তি কমিটির সম্পাদক ধীরেনবাবু। সভাপতির আসন কাঠের বাক্সোটার এ-পাশে ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, তার মধ্যে প্রণব, গোকুল আর ভূপেনকে দুর্গা চেনে। কয়েক শো হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি উবু হয়ে বসে সভাটা গড়েছে, দেখলেই চেনা যায়। বাজারের কিছু বেচুনে আর কিনুনে মানুষ সভা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে—শ-খানেকের কম নয়।...

দুর্গা দাঁড়িয়ে যায়, নাজিমের বক্তৃতা শোনে। সেই কথাই বলছে নাজিম, সেদিন দুর্গার ঘরে বসে যা বলেছিল—গরিবের জাত নেই, খাটুয়েরা এক জাত। কিন্তু সেদিন যেন নিজের মনের খেদই শুধু আউড়েছিল নাজিম, তার জাতভাই তার ঘর ভেঙেছে, প্রাণে দাগা দিয়েছে বলেই যেন গরিবেরা এক জাত হয়ে গিয়েছিল নাজিমের কাছে ! মোট কথাটা দুর্গা সহজেই বুঝেছিল, গরিবরা যে এক জাত এ আর কোন গরিব মানুষ না জানে—গরিবেরা সবাই গরিব ! কিন্তু কথাটার আরও যে কী বড়ো মানে নাজিম করতে চেয়েছিল, সেটা সেদিন তার মাথায় ঢোকেনি। আজ নাজিম সেই মানেটা এত সহজ করে বলে যে শুনতে শুনতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির পিছনে কী কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে, এখনও না সমঝালে গরিব মানুষকে—খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কী বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কী জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসি বড়ো বাবুরা আর লিগের বড়ো সায়েবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপস লড়াই আদায়-নিকাশের ব্যাবসাদারি খেলা—খেটেও যারা খেতে পায় না। তাদের জাত-ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড়ো চাল। মজুর চাষি গরিব খেপে গেছে, খেপে গেছে জাহাজের দেশি ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসি বড়োবাবুদের, লিগের বড়োসায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষি, গরিব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরিব খাটুয়ের—সর্বনাশ ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়-নিকাশের ঘরোয়া আপস ভালো।

দাঙ্গা হল এই আপসের একটা দর-কষাকষি ! ইংরেজের সেরা চালবাজি। আমরা ভাব করি, দাঙ্গা করি, আপস করি, তুমি বিদেশি ইংরেজ, তোমার মাথাব্যথা কেন ?

কারখানা-ফেরত মজুররা সন্ধ্যায় বাজারে সওদা করতে আসে, দলে দলে তারা জমায়েতে ভিড়ে যায়। দেখতে দেখতে দু-তিনশো মানুষের ছোটো সভাটা হয়ে দাঁড়ায় হাজার মানুষের জমায়েত। অদূরে বিড়ির দোকানে দুটি কারবাইড জ্বালিয়ে জন পনেরো লোক বিড়ি পাকাচ্ছিল, কাজ বন্ধ করে তারাও জমায়েতে যোগ দেয়। একজন একটি আলো এনে কাঠের বাক্সের উপর বসিয়ে দেয়। নাজিমকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পায় সকলে। নোংরা বাজারের আবর্জনা-ভরা পোড়ো জমিতে হিংসায় শঙ্কায় গুম খাওয়া এই দিনে সন্ধ্যার ভয়ার্ত অন্ধকার নামার পর এমন জনসমাবেশ কে কল্পনা করতে পেরেছিল ?

বহুদিন বিষের নেশায় আচ্ছন্ন আত্মহারা হয়ে থেকে আজ এখানে মানুষগুলি যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে, আটকানো নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে জীবন্ত মানুষের মতো।

জোর বাতাসে গ্যাসের আলোটা নিবুনিবু হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে, তিনটি লাল ঝান্ডা উড়ছে পতপত করে, আশা উৎসাহ আত্মবিশ্বাসের জোয়ার আসছে মানুষের মনে। ভয়াবহ রক্তাক্ত ফাঁকির কবল থেকে এখানে আজ মুক্তি ঘোষণা !

এক বুড়ো জমায়েতকে একটা খাপছাড়া চমক দেয়।

দুর্গার কাছে, প্রায় তার গা ঘেঁষে বুড়ো দাঁড়িয়েছিল। কোমরে নিয়মিত গঙ্গাস্নানে মেটে রংয়ের সাতহাতি কাপড় জড়ানো, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় মস্ত একটা টিকি। থেকে থেকে বুড়ো কাশছিল। প্রণব চড়া গলায় বক্তৃতা শেষ করে কাঠের বাক্সের মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াতেই বুড়ো দাবি জানায়, সে কিছু বলবে।

নাজিম ডেকে বলে, আইয়ে।

কাঠের বাক্সে উঠে বুড়োব কাশির ধমক আসে। নিজের মুখে থাবড়া মেরে-মেরে এক দলা কফ তুলে সে কাশি থামায়। মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলে, মোছনমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও !

হাজার মানুষ চমকে ওঠে, থ বনে যায়। এতগুলি লোকের গরম নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত থেমে গিয়ে হঠাৎ যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

অন্য সভা হলে তখনি একটা গোলমাল শুরু হয়ে যেত, শান্তিসভায়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সভায় এ কী বেয়াড়া কথা ! মোছলমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও ! বুড়ো হাঙ্গামা বাধাতে চায় নিশ্চয়। থামাও বুড়োকে, থামিয়ে দাও ! মারো !

কিন্তু সভায় বেশির ভাগ মজুর। অত অল্পে তারা ভড়কে যায় না, নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখে। বুড়ো দেখুক না চেষ্টা করে গোলমাল বাধাতে পারে কিনা, নিজেই গলায় রক্ত তুলে চেঁচিয়ে মরবে, সভা তাকে গ্রাহ্যও করবে না। শোনাই যাক, দু-একমিনিট কী বলে বুড়ো !

একটু থেমে বুড়ো বলে, মোদের হিঁদু জেতের বড়োবাবুরা গো-মাতার মাংস খাওয়া পাপ বলে দুধ খায়। ক্ষীর ছানা মাখন ঘি খায়, দই সন্দেশ রাবড়ি রসগোল্লা খায়, ফের আবার দুধ মিশিয়ে চা-ও খায় ! বড়োবাবুরা খায়, পয়সাওলা বাবুরা। মোরা গরিব বেচারারা গোস্ত খাওয়ার নাম শুনলে বলি, রাম রাম ! দুধ ছানা খাবার সাধ জাগে, তা, হা মোদের পোড়া অদেষ্ট, ট্যাক গড়ের মাঠ ! স্বাধীন হয়ে দুধ ছানা সন্দেশ খেয়ে মোটা হব এই ভরসায় দিন গুনি, গঙ্গাজল খেয়ে খিদেও মেটাই, তেষ্টাও মেটাই !

প্রণবরা এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে। প্রণব আর গিরীন দু-জনে কোঁচার কাপড়ে মুখ মোছে। বুড়োর রসজ্ঞান আছে !

বুড়োর গলা ক্রমে ক্রমে চড়ছিল। একটু থেমে আরও চড়া গলায় বলে, শুনবে ভাইরা, শুনবে ? মোর বাচ্চা ছেলেটা আজ মরে গেছে ! একটু দুধ না পেয়ে মরে গেছে। মায়ের বুকের দুধ গেল শুকিয়ে, গো-মাতার দুধ পেল না, বাচ্চাটা মোর গলা শুকিয়ে মরে গেল—যাঃ ! না মশায়রা, গো-মাতা মোদের মা নয় গো, বড়ো মান্‌ষের মা, মোরা গো-মাতার ত্যাজ্যপুত্তুর।

বুড়ো আবার খানিক থামে। আরও কী বলার আছে বুড়োর ? সকলে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে। বুড়ো এবার গলা আকাশে চড়িয়ে দেয়, যেন দূরের কোনো জাত-শত্রুকে শুনিয়ে শাপ দিচ্ছে : তারপর শুনবে ? মোর বাচ্চাটা তো মোল, মোকে এসে বলে কী, তোর ওই ছেলেটাকে দে, মরা ছেলেটাকে দে, টাকা পাবি ! মরেই তো গেছে, কী করবি ছেলেটাকে দিয়ে ? মোদের কাজে লাগবে, দিয়ে দে। মাথাটা ছেঁচে, গা কাটাকুটি করে দশজনকে দেখাবে, দাঙ্গা বাধাবে। শুনলে ? মোর মরা বাচ্চাটাকে ছেঁচে কেটে দাঙ্গার উসকানি দেবে ? না ভাই, হিঁদু-মোছনমান এক না দুই জানি না বাবা, দাঙ্গায় মোদের কাজ নেই ! দাঙ্গা মোরা করব না, বাস ! ওদের দাঙ্গা ওরা করুক।

বুড়োর পর কাঠের বাক্‌সে ওঠে অন্য প্রদেশের একজন মুসলমান মজুর। বোঝা যায় সে পাকা বক্তা, জমায়েতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আছে। উর্দু-বাংলা মেশান ভাষায় সে বলে যে, না, দাঙ্গা আমরা আলবৎ করব না, আমরা দাঙ্গা রুখব। মজুর দাঙ্গার মানে জানে। মজুর শুধু জোর-গলায় বলতে পারে তারা উসকানিতে ভোলেনি, নিজের নিজের এলাকায় দাঙ্গা রুখেছে। মালিক সরকারের দালাল-পুলিশের সাথে মজুর লড়ে, জাত-ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করে না। মজুরের কাছে হিন্দু-মজুর মুসলিম-মজুর নেই, এ-দেশি মজুর ও-দেশি মজুর নেই, দুনিয়ার মজুর এক জাত, সারা দুনিয়া মজুরের দেশ। মজুর দুনিয়ার সাচ্চা মানুষ। কিন্তু নিজেরা দাঙ্গা না করলেই শুধু চলবে না, নিজের এলাকায় দাঙ্গা রুখলেই শুধু চলবে না, মজুর ভাইদের এগিয়ে গিয়ে সব এলাকায় দাঙ্গা রুখতে হবে।

প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি তুলে জমায়েত সাড়া দেয়, সায় দেয়। শুধু দাঙ্গা না করলেই চলবে না, এগিয়ে গিয়ে রুখতে হবে দাঙ্গা ! কেরানি দোকানি যারা বাজার করতে এসে সভায় আটকে গিয়েছিল তারা দু-একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ইতস্তত করে, তারপর তারাও গলা খুলে সাড়া দেয়, সায় দেয়। জমায়েতের সমবেত কণ্ঠের সে আওয়াজ বড়ো দালান কুঠির কয়েকটি কানে পৌঁছায় দূরাগত ক্রুদ্ধ সাগর-গর্জনের মতো, ঝড়ের ইঙ্গিতের মতো—হাজার হাজার উৎসুক কানে পৌঁছায় আশ্বাস-বাণীর মতো। আধঘণ্টা পরে সভা পরিণত হয় শোভাযাত্রায়। চারিদিক মুখরিত করে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলে তুলে শোভাযাত্রা অগ্রসর হয় : হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই ; দাঙ্গা চাই না, রুজি চাই ; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক আপসকারীরা ব্রিটিশের গোলাম, মোদের খুন ওদের শরবৎ.......

সমস্ত এলাকার আবহাওয়া বদলে যায় এক বেলায়। প্রতিদিন এদিকে ওদিকে অলিতে-গলিতে দু-একটা খুন-জখম হয়ে আসছিল, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সংঘর্ষ বাধছিল। দিনের বেলাও এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যেতে ভয় পেত, বাজার আর ট্রামেবাসে বড়ো রাস্তার সীমাবদ্ধ একটা অংশ ছাড়া দুই ধর্মের মানুষকে একত্র চলাফেরা করতে দেখা যেত না। আজ চারিদিকের অদৃশ্য ভয়ের দেয়ালগুলি চুরমার হয়ে যেতে থাকে, ভয়ার্ত মানুষ পথে নেমে আসে, আর এই ভয় যারা সৃষ্টি করেছে—জিইয়ে রেখেছে, তারা ভয় পেয়ে আড়াল খোঁজে, খুন-জখমের মতলব আর হাঙ্গামার ষড়যন্ত্র বাতিল করে দেয়। মানুষ জানতেও পারে না আগামী কত বড়ো একটা কুৎসিত দুর্ঘটনাকে আজকেরই সভা আর শোভাযাত্রা কাঁচিয়ে দিয়েছে। ছোটো দরগা লেনের এক প্রান্তে ক-দিন গোপন পরামর্শ ও প্রস্তুতি ঘনীভূত হয়েছিল—প্রথম রাত্রেই রাস্তার অন্য প্রান্তে একটু ছড়ানো ও দুর্বল পাড়াটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল একটা দল।

এ অঞ্চলে আগুন জ্বলেও দাউদাউ করে জ্বলছিল না, নানির হত্যার মতো ব্যাপারও এদিকের মানুষগুলিকে খেপিয়ে দিশেহারা করে দিতে পারেনি, তাই আয়োজন করা হয়েছিল এই বড়ো রকম

আক্রমণের। একটা পাড়াকে ছারখার করে দিতে হবে—এমনভাবে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে রক্তপাত ঘটাতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে, সে রক্তপাত যেন আর না থামে, সে আগুন আর না নেভে। উন্মত্ত আক্রোশে মানুষ হিংসা আর প্রতিহিংসা ছাড়া সব যাতে ভুলে যায়।

বাজারের কাছে শান্তি কমিটির সভার খবর শুনে উদ্যত আক্রমণকারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, এ এলাকায় লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এসেছে শুনলেও তারা এতটা ভড়কে যেত না। জমায়েত যখন শোভাযাত্রায় পরিণত হল, তারা তখন অস্ত্র আব পেট্রোলের টিন গোপন করে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে শুধু ঘোষণা করেছে, শান্তি চাই। সে আওয়াজ শুনেই অবশ হয়ে গেছে গোপন হিংসার ছোরা-ধরা হাত—শিকার ধরতে ওত পাতা বাঘ দল-বাঁধা মানুষের সাড়া পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে ইটের জঙ্গালের গোপন অন্ধকারে !

শোভাযাত্রা সমস্ত এলাকা টহল দেয়, রাস্তার দুপাশে মৃতপ্রায় পাড়াগুলি দূর থেকে শোভাযাত্রার আওয়াজ শুনে জীবন্ত সজাগ হয়ে উঠতে থাকে। দুপাশের গলি থেকে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। অনেকে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে বিভক্ত পাড়াগুলি। অনেকে শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়ে। আঃ, এই তো চাই ! পেষণে পেষণে দুঃখে-দুর্দশায় নাজেহাল হয়ে আছি, মিছামিছি মারামারি কাটাকাটি করা কী আমাদের পোষায় !

মণি আলুথালু বেশে গলির মোড়ে ছুটে যায়। সেখানে ইতিমধ্যেই বিশ পঁচিশটি মেয়েবউ আর শ-খানেক নানা বয়সের পুরুষ জমা হয়েছে। ছোটো ছেলেমেয়েরা জুড়ে দিয়েছে চেঁচামেচি। আনন্দে ও উত্তেজনায় সকলে তারা চঞ্চল। মণি আশ্চর্য হয়ে যায়। শোভাযাত্রা তখনও দূরে, শুধু সাড়া পেয়ে ইতিমধ্যে এত লোক জমে গেছে ? আরও সে আশ্চর্য হয়ে যায় বস্তির মুসলমান বাসিন্দাদের এই গলি দিয়ে মোড়ে এসে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে দেখে। নানির হত্যাকাণ্ডের পর এ পথে ভয়ে ওদের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গভীর উত্তেজনার সঙ্গে মণির অদ্ভুত এক হতাশা ও আপশোশ জাগে। এত খেটে ছুটোছুটি করে এই শোভাযাত্রা যারা গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে আছে তার ঘরের মানুষ, তারই বাড়িব ছাদে এদের কত পরামর্শ হয়েছে এই দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান গড়ে তোলার। অথচ সে-ই সবার শেষে টের পেল চারিদিকে কী সাড়া পড়ে গেছে এই সভা আর শোভাযাত্রা নিয়ে !

মণি জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলে। শোভাযাত্রার মাথা তার দিকে এগিয়ে আসে। কাছাকাছি এসে সে স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ করে, নাজিম আর দুর্গা পাশাপাশি চলেছে সামনের লাইনে, বীরদর্পে পা ফেলে হাত তুলে দুজনে শান্তির আওয়াজ দিচ্ছে !

পাশে সরে দাঁড়ায় মণি। প্রায় সে ভিড়ে পড়েছিল শোভাযাত্রায়, সামনের ওই লাইনে। হয়তো ওই দুর্গার পাশে পাশেই তাকে চলতে হয় ! দুর্গার গায়ে ব্লাউজ বা শেমিজ নেই। আরও মেয়ে আছে শোভাযাত্রায়—সামনেই আছে। মজুর-মেয়ে, কেরানি-ঘরের মেয়ে। মজুর-মেয়েদের মণি চেনে না, কাল্লু মিস্ত্রির বউ রাবেয়া হয়তো ঠিক মজুর-মেয়ে নয়। আভা, শোভা, ইন্দিরা, জিন্দার মা কাসেমের পিসিকে চিনতে চিনতে তাকে ছাড়িয়ে শোভাযাত্রার মাথা এগিয়ে যায়।

প্রণব তাকে দেখতে পায়নি। গোকুলের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হয়েছে। গোকুল মাথা হেলিয়ে স্পষ্ট ইশারায় ডাক দিয়েছে : ভিড়ে পড়ো ! মণিও মাথা নেড়ে ইশারায় জানিয়েছে, না !

রাত এগারোটার পর প্রণব আর গোকুলেরা ফিরল। প্রণবের জ্বর এসেছিল, গুরুতর কিছু নয়। তবু তো জ্বর ! খাবার বেলায় দুপুরে ভাত না খেয়ে সাগু খেল অথচ বেলা তিনটেয় কাজে বেরোবে বলে তৈরি হল—মণির সঙ্গে তখন একচোট তার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। মণিই ঝগড়া করেছিল একতরফা। বাজারে শান্তি কমিটির মিটিং করার গুরুত্ব মণি স্বীকার করেনি—এ অবস্থায় দু-দশজনকে নিয়ে মিটিং কার কী লাভ হবে ? প্রণব না গেলেও কি এই সামান্য কাজটা হয় না ?

প্রণব বলেছিল, হয়। কিন্তু আমারও দায়িত্ব আছে তো ?

কাজে এই বাড়াবাড়ি নিষ্ঠা, চলার পথে শুধু চলার জন্যই সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাকুলতা, মণির কাছে পাগলামির সামিল ঠেকেছিল।

প্রণব গোকুল গিরীনদের মণি খাওয়ায়, হেঁসেল সে ঠিক করেই রেখেছিল। তিনজন বাড়তি এবং অজানা মানুষ এসে পড়ায়, তিনজন যে খাস মজুর দেখেই সেটা চিনতে পারায়, কয়েক মুহূর্ত একটু শুধু সে অস্বস্তি বোধ করে যে ভাত ডাল তরকারিতে কুলোতে পারবে কিনা, ওদের মন উঠবে কিনা এই খাদ্য খেতে !

এগারোজন শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত মানুষ তার পুঁইডগার চচ্চড়ি আর মটর ডাল দিয়ে যে রকম আগ্রহে ভাত খায়, তিনটি ডিম ফেটিয়ে মামলেট ভেজে ছোটো ছোটো টুকরো করে রাঁধা ডিমের ডালনা সামনে ধরতেই সবাই যে রকম জয়ধ্বনি করে ওঠে, তাতে মণি সত্যই কৃতার্থ হয়ে যায়। আগেব দিনে কোনো বিশেষ উপলক্ষে দু-তিনশো লোককে পোলাও-মাংস খাইয়েও কোনোদিন তার এমন আনন্দ হয়নি—পোলাও-এ ঘি কম হয়েছে কিনা, মাংসে দই বেশি মেখেছে কিনা, মাছের কালিয়ায গরম মশলা বেশি পড়েছে কিনা, এই ভাবনায় নেমন্তন্ন খাওয়ানোর রাত্রে তার ঘুম হত না, ছটফট করত, আধঘুম আধজাগরণের স্বপ্নে চমকে উঠে চিৎকার করে ভয়ার্ত নখে সুশীলেব গা আঁচড়ে বক্ত বাব কবে দিত ! বড়ো বড়ো লোকেরা নেমন্তন্ন খেতে আসত তার বাড়িতে— প্রাণপণ যত্নে খাইয়েও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পেরেছে কিনা, না জানি কী ত্রুটি হয়েছে, কী জানি কী হবে ভেবে ভয়ে তার বুক টিপটিপ কবত।

হেঁসেল ঠিক রেখে সকলকে যা জোটে যেমন জোটে খাওয়াবার কাজটা সেও যে ভয়ংকর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে, প্রণবের কাজের নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজের নিষ্ঠার যে কোনো তারতম্য নেই, এটা মণির খেয়ালও হয় না।

খাওয়ার পর সকলে ছাদে যায়। মাদুর শতরঞ্চি বিছিয়ে আগে থেকেই কয়েকজন ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। মণি না খেয়েই ছাদে যায়। প্রণবকে বলে, একটা কথা শুধোঁব ?

প্রণব কিছু বলার আগেই গোকুল বলে, নিশ্চয় !

গোকুল একটা বিড়ি ধরিয়েছে। গোকুলকে বিড়ি খেতে মণি এই প্রথম দেখল। কবি বিড়ি খায় ।

মণি বলে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের আর কোন প্রতীক তোমরা পেলে না ? একটা সস্তা বেশ্যা আর তার মুসলমান বাবুটাকে সামনে দাঁড় কবিয়ে দিলে ?

ঘুমে প্রণবের চোখ জড়িয়ে আসছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বসে একজনের কাছে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে সে ধরায়। বলে, সস্তা বেশ্যা ? সস্তা বেশ্যার মুসলমান বাবু ? দু-শো আড়াইশো মেয়ের মধ্যে তুমি বেশ্যা চিনলে কী করে বউদি ? দেড়-দুহাজার পুরুষের মধ্যে বেশ্যাটার মুসলমান বাবুটাকেই বা কী করে চিনলে ? গায়ে কি লেবেল আঁটা ছিল ?

মণি চটে বলে, কেন, আমাদের দুর্গা ? দুর্গার বাবু ওই নাজিম ?

প্রণব আশ্চর্য হয়ে খানিক্ষণ মণির মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বলে এত বড়ো প্রসেশনে তুমি দুর্গা ঝি ছাড়া কাউকে দেখতে পেলে না মণিবউদি ?

দেখতে পাব না কেন ? কিন্তু দুর্গাকে কী বলে তোমরা প্রসেশন লিড করতে দিলে ?

গোকুল মুচকে হেসেই ফস করে আবার নেভা বিড়িটা ধরিয়ে ফেলে। প্রণবও হাসে।

তুমি হাসালে মণিবউদি। যার খুশি হচ্ছে প্রসেশনে যোগ দিচ্ছে, সামনে থাকছে, পাশে থাকছে, পিছনে থাকছে, আমরা কি বাছতে বসব, কে কেমন লোক ? দুর্গাকে বলব, তুমি সস্তা বেশ্যা, বেরিয়ে যাও ?

ও ! তাই বলো ! আমি ভাবলাম, তোমরাই বুঝি ওদের দুজনকে সামনে দিয়েছ।

গোকুল চুপ করে শুনছিল, হঠাৎ সে বলে, ছেলেবেলা আপনি খুব আদুরে ছিলেন না ?

মণি ভ্রু কুঁচকে বলে, তার মানে ?

না এমনি বলছিলাম।

মণি মুখ কালো করে উঠে যায়।

সকালে চা খেতে খেতে গোকুল বলে, জানেন, আসল কথাটা তা নয়, আপনি যা ভেবেছেন।

গোকুল ভোরে উঠেই কী কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল, একটু বেলায় ফিরে একা চা খাচ্ছিল। কবি যে সময় নেই অসময় নেই এত কাজ করে, সমিতি শোভাযাত্রা মজুর-মিটিং থেকে বাজার করা—অথবা এত বাজে কাজ করেও যে কেউ কবি হয়; এটা মণির ধারণায় আসতে চায় না। কবি শুধু কবি, সে কেন কাজের মানুষ হবে ?

আমি কিছু ভাবিনি।

গোকুল এ কথা কানে তোলে না। বলে, ছেলেবেলা বাপের আদুরে ছিলেন, আপনার স্বভাব তাই বিগড়ে গেছে, আমি তা বলিনি। আপনি আমি মধ্যবিত্ত, মজুর-বিপ্লবের চাড় যখন বাড়ছে, তখন আমরা যে আসলে কী, তার কতগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমিও ছেলেবেলা বাপের আদুরে ছিলাম। তাই আপনার আমার লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

সে আবার কী !

লক্ষণ হল, কী চাই জানি না, যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। জীবন মনের মতো নয়, জগৎ মনের মতো নয়। আমি একদিকে আর সমস্ত জগৎ আরেক দিকে। নিজের জ্বালায় ভাজা-ভাজা হয়ে নিজের রসে সিদ্ধ হয়ে কবিতা লিখি—তোমার চোখে মরা তারা, অমাবস্যার রাত, আকাশ-ভরা কাদের জ্বলা চোখ ? তোমার চোখে মানুষ উঁকি দেয়, মাটির প্রদীপ নিবতে চেয়ে নিজের বুকে দপ্‌দপিয়ে জ্বলে, শেষ যাতনার রোখ ! আমি তোমার চোখে দেব চুমা, শেষ-মিলনের মরণ-কামড় দিয়ে—

গোকুল হাসে, এই সেদিনও এ রকম কবিতা লিখলাম। মরণের জয়গান করতাম। আপনিও তেমনি আজ দেড় হাজার মানুষের শোভাযাত্রায় জীবন না দেখে, ভবিষ্যৎ না দেখে, দেখলেন একটি ঝিকে ! কারণ, বেচারাকে আপনি ঘেন্না করেন।

মণি হাতজোড় করে ঝাঁঝালো সুরে বলে, আমার অপরাধ হয়েছে, এবার আমায় রেহাই দেও।

গোকুল বলে, রেহাই নেই। আমিও একদিন রেহাই চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন ?—মণি আশ্চর্য হয়ে বলে,—এই তো বয়েস তোমার। ছেলেবেলাতেই তোমার সমাজ-সংসার অসহ্য হয়ে উঠেছিল না কি ?

গোকুল হাসে।—ঠিক ছেলেবেলা নয়, ক-বছর আগের কথা বলছি। নিজের মনে ঘরের কোণে বসে শুধু কবিতা লিখতাম,—আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আমার জীবন গেল ! লিখতাম—এই কালো অতল মৃত চোরাবালিতে আমি তলিয়ে যাবই, তুমি আমার একমাত্র আশা। তুমিও কি চোরাবালিতে ধরা পড়েছ ? আমিও কি তোমার একমাত্র আশা ? এসো তবে ডুবে যাই, ডুবে যেতে মিলে যাই, মরণেরে জয় করি একসাথে মরে !

মণি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটি কে ঠাকুরপো ?

আমার মেয়ে। আমি তার বাপ।

তোমার মেয়ে ! পাগল হলে নাকি তুমি ?

আমার মানস-কন্যা। মানস-প্রিয়া বলে তো কিছু হয় না ? মন নিজের মধ্যে যাকে সৃষ্টি করে, সে মনের মেয়ে বটেই তো ! এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার না হলে কেউ একসাথে বাঁচতে চাওয়ার

বদলে মরতে চায় ? জগৎকে এড়িয়ে ঘরের কোনায় একলা বসে প্রাণভরে প্রিয়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে মরার কবিতা লিখেও রেহাই পাইনি। কারও রেহাই নেই মণিবউদি ! জীবনের বন্যায় ধরা পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি বলেই না আপনার আমার রেহাই পাবার সাধটা এমন উগ্র হয়েছে ? বদ্ধজলায় পচা-নালায় যারা আটকে গেছে, তারা পচে গেঁজে বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে উপে যেতেই ভালোবাসবে ; কিন্তু কোটালের জোয়ার আমাদের ভাসিয়ে এনেছে জীবন নদীর স্রোতে। এই স্রোতে মিশে না গিয়ে আমাদের উপায় কী ? স্রোতে এসে পচা-নালার ঘোলাটে জল কতক্ষণ আমিত্ব বজায় রাখতে পারে ?

প্রণবের চেয়ে গোকুলের কথা মণির ভালো লাগে, গোকুলের কথা সে মনে-প্রাণে বুঝতে পারে। গোকুল পাছে কথা শেষ করে কাজের তাগিদে উঠে যায় তাই মণি তাড়াতাড়ি বলে, ঠান্ডা চা গরম করলে স্বাদ থাকে না। এক কাপ টাটকা চা বানিয়ে দেব ?

যদিও মণি জানে, জরুরি কাজের তাগিদ থাকলে গোকুল তার জন্যও দেরি করবে না, টাটকা চায়ের জন্যও নয়।

দিন না। দিন।

তুমি যে রকম কবিতা লিখতে বললে, তোমার বইয়ে তো ও রকম কবিতা পড়িনি ? শুধু লোহার ডান্ডার মতো শক্ত কবিতা।

পুড়িয়ে ফেলেছি।

কত কবিতা লিখেছিলে ?

কয়েকটা খাতায় শ-চারেক।

মায়া হল না ? শ-চারেক কবিতা তো একদিনে লিখতে পারোনি, দু-চারবছব লেগেছিল নিশ্চয় ! খাওয়া নেই ঘুম নেই দিনরাত নেই শুধু ছটফটানি, জীবনটা ক্ষয় করা। আমি জানি, অল্পবয়সি এক কবিকে আমি ভালো করে দেখেছি। পুড়িয়ে ফেলতে মায়া হয়নি ?

গোকুল সগর্বে বলে, কীসের মায়া ? যা আমার পরাজয় মানার—

গোকুল থেমে যায়। লজ্জায় এক মুহূর্তের জন্য মাথা হেঁট করে।—না মণিবউদি, মিছে কথা বললাম। মায়া হয়েছিল, ভীষণ মায়া হয়েছিল। যখন বুঝলাম, এই চার-পাঁচশো কবিতা আমার বাহাদুরির প্রমাণ নয় আমার কাপুরুষি লজ্জার প্রমাণ, কবিতাগুলি তখন নষ্ট করে ফেলব ঠিক করলাম। তারপরেও প্রায় এক বছর ইতস্তত করেছি। কতবার পুড়িয়ে ফেলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ভেবেছি, পুড়িয়ে ফেলব ? যদি দাম থাকে কবিতাগুলির ? এই যে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছি, এটা যদি ভুল হয়ে থাকে ? যদি হঠাৎ বুঝতে পারি আমার কবিতাগুলি অমূল্য ছিল ? পুড়িয়ে ফেলে সারা জীবন যদি আপশোশ করতে হয় ? এ রকম কত দ্বিধাসংশয় যে জাগত !

তারপর একদিন পুড়িয়ে ফেললে ?

হ্যাঁ, তারপর একদিন পুড়িয়ে ফেললাম। একটা কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল ! আমার চোখের সামনে শুধু ধর্মঘট করার জন্য তিনজন মজুর গুলি খেয়ে মরে গেল। প্রাণে আমার আগুন ধরে গেল। রাত্রে কবিতা লিখতে বসলাম, প্রাণের সেই আগুনকে একটি কবিতায় পরিণত করব। ঘরের কোণে রাত দুটো পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে কবিতা একটা দাঁড় করালাম, জগৎটাকে যেন জয় করেছি এমনি তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোলাম। অনেক বেলায় উঠে চা-টা খেয়ে কবিতাটা পড়ে নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছা হল—

কী লিখেছিলে কবিতাটায় ?

মণির আগ্রহ গোকুলকে আশ্চর্য করে দেয়। প্রকাণ্ড উনানে গনগনে আগুন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের ভাত সিদ্ধ হয়। অন্যমনে খালি হাতে ফুটন্ত জলের কেটলিটা নামাতে গিয়ে মণির হাতে ছ্যাঁকা লাগে !

গোকুল বলে, সবটা মনে নেই। আরম্ভ করেছিলাম—

কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, কী আওয়াজ !
কানে যেন কোটিখানেক বিঁধলো সরু ছুঁচ !
প্রাণটা যেন ছুঁলো হঠাৎ কোটি কোটি প্রাণ
তীক্ষ্ণ ইশারায়।
নক্ষত্রের মতো।
মনের আকাশ জুড়ে জীবনের অপলক চাওয়া—

কেন, আরম্ভটা তো বেশ !

বেশ ? গোকুল হাসে, কী উপমা, কল্পনার কী ত্যারচা গতি—

মণি বুঝতে পারে না। চা ছেঁকে দুধ-চিনি মিশিয়ে কাপ এগিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে গোকুল বলে,—এ কী কবিতা ? এ তো আত্মপ্রতারণা ! মাটির পৃথিবীর ঘটনা মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বালল, কবিতা চলে গেল মনের আকাশে জীবনের নক্ষত্রের মতো কোটি কোটি চোখ মেলে চেয়ে থাকায়। মনের আকাশটাই সব ? ঘরের কোণে একা একাই তো মনের আকাশের চাষ করা যায়—তাতেই বরং আকাশ-কুসুমের ফসল ভালো ফলে।

মণি তবু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

গিরীন মাঝে মাঝে কবি মনসুরের খবর নেবার চেষ্টা করত। তিন সপ্তাহ মনসুরকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মাথা তার বিগড়ে যায়নি, এক বিষয়ে ছাড়া। গিরীন ভেবেছিল, স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এলেই মনসুর তার উদ্ভট ধারণা ভুলে যাবে যে এতকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীন কৌশলে তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালে তাকে দেখেই মারতে চাওয়া, বাড়ি বয়ে গিয়ে রশৌনার ঝগড়া করে আসা, এ সব ব্যাপার নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি হবে—এ-ও গিরীন আশা করেছিল।

মনসুরকে একটু সুস্থ হবার সময় দিয়ে দিন-দশেক পরে গিরীন আবার হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিল। এবার মনসুর তাকে কামড়ে দেবার চেষ্টা করেনি, তাকে দেখেই রাগে ঘৃণায় মুখ তার বিকৃত হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও। বেইমান ! হারামি ! কাফের !

সুস্থ হয়েও মনসুর তার বিকার কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বন্ধুর বীভৎস বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা ধারণা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে ছিল সাম্প্রদায়িকতার অনেক উঁচুতে, ধর্মগত ছদ্মবেশী গোঁড়ামি পর্যন্ত যার কাছে ছিল বর্বরতায় শামিল, একটি হিন্দু বন্ধুর কাল্পনিক বজ্জাতি তাকে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মাদ করে দিয়েছে। কোমর বেঁধে সে নেমেছে হিন্দুবিরোধী প্রচারে। তার বিষোদ্গারের নমুনা গিরীনকে স্তম্ভিত করে দেয়, ভাবতেও তার অবাক লাগে যে ঘটনাচক্র মনসুরের কবি-হৃদয়ে কী আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ডাকে মনসুরের নতুন কবিতার বই আসে, গিরীনের নামেই আসে। ছোট্ট চটি বই, গোটা পঞ্চাশেক পৃষ্ঠা, কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছত্রে কী সীমাহীন আক্রোশ যে কাব্যহীন নগ্নতায় প্রকাশ পেয়েছে ! নতুন একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে—সম্পাদক মনসুর। প্রথম সংখ্যা পড়ে গিরীন বাক্যহারা হয়ে থাকে, এই কাগজের পিছনে তাদের মনসুর আছে—কবি মনসুর ? বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়।

নীলিমা কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে খানিকক্ষণ গিরীনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সব ফাঁকি। এবার বুঝতে পেরেছি।

কী ফাঁকি ?

কবি হয়ে, প্রগতিশীল হয়ে সুবিধা হচ্ছিল না, একটা অজুহাত খাড়া করে ভোল পাল্টেছে। কাগজের সম্পাদক, মোটা বেতন, আরও কত সুবিধে পেয়েছে কে জানে ! পরেও অনেক পাবে

নিশ্চয়। কী করব, কোন দিকে যাব ভাবছিল, এমন সময় মার খেয়ে হাসপাতালে গেল। ব্যাস, আর পায় কে ? বেইমান বন্ধু, মস্ত ষড়যন্ত্র—মানুষ এ সব সহ্য করতে পারে ? এই হল অজুহাত।

একটু থেমে নীলিমা যোগ দেয়, রশৌনার দুঃখ ঘুচল। দামি দামি শাড়ি পড়বে, জড়োয়া গয়না চড়াবে।

তাই কি তবে মনসুরের পাগলামির মানে ? নীলিমার কথা একেবারে বাতিল করতে পারে না গিরীন। নীলিমা হয়তো বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু মনসুরের আকস্মিক দিক পবিবর্তনের পিছনে বাস্তব লাভ-লোকসানের চাপ হয়তো ছিল—যার হিসাব সে সোজাসুজি কারবারি প্রথায় না করলেও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মানসিক আদর্শগত নিয়ম-নীতি বন্ধুত্ব প্রেম প্রীতি বিশ্বাস বেইমানির স্তরে করেছে। সাধারণ লোক যা সোজাসুজি কওত, কবি বলে মনসুর তাই জটিলভাবে করেছে।

মন কিন্তু মানে না গিরীনের। সে জানে, সংসারে বেঁচে থাকার বাস্তবতাই মানুষকে চালায়, যে শ্রেণির যার যেমন বাঁচা। তারও অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, যারা সামান্য একটা চাকরির জন্য গরিব শোষিত মানুষের শত্রুর দলে ভিড়তে পারে—কিন্তু সে আর তা পারে না। পারে না যে তাতে তার কোনো বিশেষ বীরত্ব বা অসাধারণ বাহাদুরি নেই, কারণ পারিবারিক সম্পর্কে পাড়া সম্পর্কে আর স্কুল-কলেজ সম্পর্কে যারা ছিল আত্মীয়বন্ধু, তারা শুধু নামে, পুরানো দিনের নিছক জের টানার নামে আত্মীয়বন্ধু হয়ে আছে। দেখা হলে কুশল প্রশ্ন করতে হয়, বিয়ে বা শ্রাদ্ধের ব্যাপারে একবার উঁকি দিয়ে আসতে হয়। নতুন বন্ধু, নতুন আত্মীয়, নতুন স্বজনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে তার নতুন জীবন, দৈনন্দিন খুঁটিনাটিতে, সমাজ-রাষ্ট্রের বড়ো বড়ো ব্যাপারে। খবরের কাগজের যে কেরানি, চাকরি তার আজ আছে কী কাল নেই, কিন্তু তাকে সম্পাদকের পদ কেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চাইলেও সে আপনা থেকে গড়ে ওঠা এই বন্ধুত্ব বাতিল করে পুরানো ধামাধারী পা-চাটিয়ে আত্মীয়বন্ধুর দলে ভিড়তে পারবে না। কারণ, সেটা হবে তার আত্মহত্যার শামিল। সে একা হয়ে যাবে, নিজের বিকার দিয়ে নিজেকে কুরে-কুরে মারবে, অভিশপ্ত প্রেতের মতো একাকীত্বের মহাশূন্যে ঝুলে থাকবে।

এদিক দিয়ে, চেতনা আর জীবনের এই পরিণতির হিসাবে, মনসুরের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল ছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের ঠাটটুকু আছে, খোলসটুকু আছে, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনার সঙ্গে, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের চুকে গেছে। দুটো বেশি পয়সা এক টুকরো জমিতে ছোটো একটি বাড়ি, বেতনভোগী চাকরের কোটিপতির হাস্যকর অনুকরণে সংকীর্ণ অসংলগ্ন ভাবগ্রস্ত জীবনকে ঘষে-মেজে মিথ্যা জলুস দেবার চেষ্টা—এ পথে ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে। দুজনেরই পক্ষে। কিন্তু মনসুরের পক্ষে এভাবে বিগড়ে যাওয়া সম্ভব হল কী করে ?

বিগড়েই গিয়েছে মনসুর। তার নতুন কবিতার বই আর তার কাগজ পড়ে আর তাতে সন্দেহ করা যায় না। মাথায় চোট লেগে মাথা যত দিন বিকারে ঝাপ্সা হয়েছিল, ততদিন গিরীনের সঙ্গে হিন্দু সমাজটাকে ধ্বংস করার ঝোঁকটা হয়তো তার ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু মাথা যে মনসুরের এখনও কিছুমাত্র ভোঁতা হয়ে আছে মাথায় আঘাত লাগার ফলে তার এতটুকু চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাঙা মাথার ভোঁতা মস্তিষ্ক দিয়ে জঘন্য কাজও মানুষ এত নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারে না।

একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ গিরীনের মনকে চেপে রাখে, চেষ্টা করেও কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনসুর তার বন্ধু, শুধু এ জন্য নয়। তার জীবন-দর্শনের যেন একটা বাস্তব ব্যতিক্রম ঘটে গেল, যার মানে সে বুঝতে পারছে না। সে জানে, তার আর মনসুরের মতো মানুষের নতুন পথে চলতে হয় অনেক দ্বিধা-সংশয় নিয়ে, অনেক দুর্বলতা তাদের অগ্রগতিকে মন্থর করে রাখে, জীবনের নতুন মানে খুঁজতে অনেক সময় ভুল করে তারা অতীতের দিকে তাকায়। কিন্তু এ তো তা নয়। এ যে ডিগবাজি খাওয়া। ইতস্তত করতে করতে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে এগোবার বদলে ঘুরে

দাঁড়িয়ে মৃত অতীতের দিকে মরণের খোঁজে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলা। এ রকম কাণ্ড মানুষ করে, তাদের মতো সাধারণ মানুষ শুধু নয়, অসাধারণ মানুষ, তাদের নেতৃস্থানীয় মানুষও করে। গিরীনের পরিচিত দু-চারজন এভাবে অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করেছে—গিরীন আশ্চর্য হয়নি। আগে পরিষ্কার না ধরতে পারলেও দিক পরিবর্তন করা মাত্র এদের কতগুলি বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গিরীনের কাছে, সে বুঝতে পেরেছে এই পরিণতিই ছিল ওদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। লক্ষণগুলি আগে গৌণ ছিল, কিন্তু ছিল।

মনসুর তো এ ধাঁচের নয়। তার এমন কোনো ত্যারচা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার লক্ষণ তো আজ ভেবে বার করা যায় না, যার মধ্যে তার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। হতাশা ঘনিয়ে আসুক। বিষাদে দিগন্ত আচ্ছন্ন ভারাক্রান্ত হয়ে যাক, জনসমুদ্রের জোয়ার তাকে অক্ষম সকাতর ভীরু করে দিক, সক্রিয় বিশ্বাসঘাতক হওয়া মনসুরের ধাতে ছিল না।

অথবা ছিল ? মনসুরের সবদিক জানেনি বোঝেনি সে, শুধুই ভেবেছে মনসুর তার সব-জানা বন্ধু ? গিরীন নিজেকে বোঝায়, হয়তো তাই হবে। মনসুরের জীবনে হয়তো এমন অনেক বাস্তবতা গোপন ছিল, সে যার হদিস পায়নি। অন্য দু-চারজন বন্ধু যারা বিগড়ে গেছে, তাদের মতো হয়তো স্থূল ছিল না মনসুরের জীবনের বিবোধ আর সংঘাত, অবস্থার ফেরে হয়তো তার ভিতরের দুর্বলতা আর তেজ পরস্পরকে দাবিয়ে রেখেছিল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা ঘুচে একটি শক্তি অপরটিকে চুরমার করে মহাসমারোহে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মনসুরের সঙ্গে আরেকবার দেখা করার জন্য গিরীন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। দেখা করে ব্যাপার বুঝে চরম বোঝাপড়া করে আসবে। প্রস্তুত হয়েই যাবে—মনসুর কামড়াতে এলেই ভড়কে যাবে না। ধমক দিয়ে বলবে, চোপ ! বোস এইখানে। দশ মিনিট কথা বলতে এসেছি, কথা বলে চলে যাব। চলে যেতে না দিতে চাস কথা শেষ হবার পর আমায় খুন করিস !

মনসুরের খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে দেখা করা কঠিন নয়। তার খবরের কাগজের আপিসে যেমন মুসলিম কম্পোজিটর, দপ্তরি আসে, মুসলিম কবি শিল্পী সাহিত্যিক রিপোর্টার আসে—মনসুরের খবরের কাগজের আপিসেও যে তেমনি হিন্দু কম্পোজিটর দপ্তরি কবি শিল্পী সাহিত্যিক রিপোর্টার যাতায়াত করে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। নইলে কাগজ চলে না !

মনে মনে গিরীন জানে, তাকে খুন করা দূরে থাক, মনসুর তাকে রীতিমতো খাতির করবে। হাসপাতালের আহত বিকারগ্রস্ত মনসুর খবরের কাগজের সম্পাদক মনসুর নয়।

গিরীন কিন্তু যায় না। এ দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। এত তার কীসের বন্ধুপ্রীতি যে জনসমুদ্রকে ভুলে গিয়ে কাজের ক্ষতি করে একটি মানুষের জন্য, একটি বুদ্‌বুদের জন্য সে মাথা ঘামাবে ? চুলোয় যাক মনসুর। জনতার রোষে অমন কত হিন্দু মনসুর, মুসলিম মনসুর ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রণব বলে, তা যাবে কিন্তু এ অভিমান তো তোমায় মানায় না গিরীন। একটা মানুষ বিগড়ে গেছে, তোমার হিসাবে সেটা বেখাপ্পা ঠেকছে, কেন বিগড়ালো কারণ খুঁজে পাচ্ছ না। হঠাৎ কোনো খাপছাড়া অসাধারণ কারণ হয়তো মনসুরকে কাবু করেছে। এটা মনসুরের সাময়িক দুর্বলতা হওয়া অসম্ভব নয়। চেষ্টা করলে হয়তো তাকে বদলানো যায়। একটু সাহায্য পেলে হয়তো মনসুর ক্রাইসিস্‌টা কাটিয়ে উঠতে পারে, না পেলে হয়তো—

কাল্লু হাজির ছিল। প্রণবকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা বাড়িয়ে দেয়।

গোসা করলে চলবে কেন গিরীনবাবু ? লিখাপড়া জানা আদমি কমজোর হবে, ভুলচুক করবে। গোসা করবেন তো তাকে রাস্তা বাতলাবে কে ?

গিরীন মাথা নেড়ে বলে, রাস্তা ঢের বাতলানো হয়েছে। আর বেশি রাস্তা বাতলাতে গেলে ভাববে, তেল মাখাতে এসেছে। অহংকার বাড়বে শুধু।

প্রণব বলে, তোমার বিশেষ বন্ধু তাই—

না, আর বন্ধু নেই। কোনোদিন ছিল কিনা ভাবছি।

কয়েক দিন পরে এক প্রেস কনফারেন্সে মনসুরের সঙ্গে গিরীনের মুখোমুখি দেখা। মনসুর প্রথমে কথা বলে।

কেমন আছ ?

আছি এক রকম। তোমার খবর কী ?

জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করা, তোমার খবর কী, নইলে মনসুরেব খবর কিছু অজানা নেই গিরীনের। তবে, চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে মনসুরের। শুধু রোগা হয়ে যায়নি, মুখে একটা অস্বাভাবিক বিবর্ণতা, চোখ বসে গেছে, কিন্তু সেই চোখে মারাত্মক রোগের সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের খাপছাড়া তীক্ষ্ণ জ্যোতি—দেহের আড়ালে প্রাণশক্তি জমার চেয়ে বেশি খরচ হতে থাকলে যে জ্যোতি আসে। মাথার ফাটার দাগটা এখনও চুলে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়নি, সবটা কোনো দিন ঢেকে যাবেও না, চুলের ভেতর থেকে চিহ্নটা বাঁদিকে কপালে খানিক দূর নেমে এসেছে। কিন্তু মাথা ফাটার সঙ্গে মনসুরের এখনকার খারাপ চেহারার কোনো সম্পর্ক যে নেই, সেটা খুব স্পষ্ট। মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে গিয়ে মানুষের কঙ্কালের মতো শীর্ণ-বিশীর্ণ হয়ে পড়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু ফাটা মাথা জোড়া লাগার পর সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন শরীর হাজার রোগা হোক, স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির চিহ্ন তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। বোঝা যায়, মানুষটা অসুস্থ কিন্তু সুস্থ হচ্ছে। মনসুরকে দেখলে মনে হয় উলটোটা ঘটছে, স্বাস্থ্য তার ক্ষয় হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

মনসুর মৃদু হেসে তার কথার জবাব দেয়। দুজনেই তারা পরস্পরের পাশ কাটিয়ে অন্যত্র তাকায়, আবার দৃষ্টি তাদের মুখোমুখি হয়। দুজনেই জানে যে এমন আচমকা দেখা হওয়ায় এটুকু অস্বস্তি বোধ না করে তারা পারছে না !

মনসুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই হাত বাড়িয়ে গিরীন তাকে বাধা দেয়। মনসুরের মুখেচোখে মরণের ছাপ দেখতে দেখতে সে আর সব কথা ভুলে গেছে।

এ কী চেহারা হয়েছে ? কী ব্যাপার মনসুর ?

কিছু না। ব্যাপার আবার কী ?

তার মানে ?

মানে ? মনসুরের দুচোখে আগুন জ্বলে ওঠে, মানে দিয়ে কী করবে ? হাসপাতালে মরতে পাঠিয়ে তিন মাসের মধ্যে একবার খোঁজ নেবার সময় হল না, আমার কী হয়েছে না জানলেও তোমার বেশ চলে যাবে গিরীন।

দুবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম মনসুর। আমায় দেখলেই তোমার মাথা বিগড়ে যেত, তাই....

দুবার গিয়েছিলে ? তোমার মাথাই বিগড়ে গেছে!

ক্ষীণ দুর্বল হাতে তাকে একটু পাশে ঠেলে দিয়ে মনসুর এগিয়ে যায়।

মনসুরের মনে নেই। তাকে বেইমান ভাবার কথা, তাকে দেখে খুন করতে চাওয়ার কথা সব মনসুর ভুলে গেছে। উলটে গিরীন কেন খবর নিতে যায়নি বলে প্রচণ্ড অভিমানে বন্ধুকে বাতিল করেছে মনসুর।

মাথায় চোট লেগে জ্বরবিকারের ঘোরে তার সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ধারণা জন্মেছিল, সেটা ভুলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু কী তবে হয়েছে মনসুরের ? কীসে তাকে এমনভাবে কাবু করেছে, দেহে ও মনে ?

প্রেস কনফারেন্স শেষ হবার পর মনসুরকে পাকড়াও করতে গিয়ে গিরীন দ্যাখে, সে এমন এক উচ্চপদস্থ দলে ভিড়ে গেছে যে কাছে গিয়ে কথা বলা অসম্ভব। অধঃপতনের এত উঁচু স্তরে গিরীন নামতে শেখেনি। অগত্যা সে ফিরে যায়।

রাতে নীলিমা সব শুনে বলে, কাল আমি ওদের বাড়ি যাব। রশৌনার কাছে জেনে আসব ব্যাপার কী।

গিরীন বলে, না, তোমাদের স্তরে আমাদের ভুল বোঝার মীমাংসা হবে না। তুমি পরে যেয়ো কাল আমি যাব।

মনসুর বাড়ি ছিল না। ম্লান গম্ভীর মুখে রশৌনা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বসায়। সে অনেক দিনের বন্ধু। বাড়ি তাদের আসবাবপত্রে ভরে যায়নি, রশৌনার গায়ে জড়োয়া গয়নাও ওঠেনি। বরং ম্লান শুকনো মুখে তার ছাপ পড়েছে গভীর হতাশার।

অন্য এক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়িতে কিছু নতুন মানুষ এসেছে—ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে গিরীন দুটি পর্দানশিন মানুষের অস্তিত্ব টের পায়।

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোপন করা বোরখার আশ্রয় ছাড়া যাদের অন্দরের চৌকাঠ পার হওয়া নিষেধ।

মনসুর এখনই ফিরবে। কাছেই ডাক্তারের কাছে গেছে।

ডাক্তার ?

রশৌনা চোখ তুলে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। কিছু বলে না। সে-ও রোগা হয়ে গেছে। তারও কাজল-কালো চোখ দুটিতে গভীর হতাশা।

কী অসুখ রশৌনা ?

টি বি।

গিরীন চুপ করে বসে থাকে। অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায়। মনসুর কেন বিগড়ে গিয়েছে, তাও যেন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে।

রশৌনা এবার নিজে থেকেই অসুখের বিবরণ জানায়। মনসুরকে রোগটা ধরেছিল আগেই, কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তারা তখন ধরতেও পারেনি, অতটা গ্রাহ্যও করেনি। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়ে শরীরটা কাবু হওয়ায় রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফাটা মাথা আর গায়ের জখম থেকে যা রক্ত পড়বার পড়ে গিয়ে চুকেবুকে গিয়েছে, কিন্তু এবার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে মনসুরের।

এও জখম রশৌনা, জানো ? কারা এ জখম করেছে জানো ?

রশৌনা সায় দিয়ে বলে, জানি।

অসুখের জন্য চাকরি নিয়েছে ? নতুন ধরনে কবিতা লিখেছে ?

কী করবে ? বাঁচতে হবে তো! ভালো চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ তো সারে না। আচ্ছা করেছে চাকরি নিয়েছে, নয়া কবিতা লিখছে। একশোবার! হাজারবার! লোকটা মরলে আপনারা খুশি হতেন ? কবরে ফুলের তোড়া পাঠাতেন ?

গিরীন চুপ করে থাকে। সে সমালোচনা করেনি, কৈফিয়ত চায়নি, মরণের আশঙ্কা তুচ্ছ করে যেচে এ পাড়ায় তাদের বাড়ি বয়ে খবর নিতে এসেছে—এটা খেয়াল করে রশৌনার ক্রোধ ও উত্তেজনা তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে যায়।

মেজাজ ঠিক থাকে না। নীলিমা আর স্বরুদির সাথে মিছে গিয়ে ঝগড়া করে এসেছিলাম, গিয়ে সব বলে আসতে সাধ যায়। কিন্তু কী আর যাব, কী আর বলব।

তার গভীর অতল হতাশার মধ্যে গিরীন মনসুরের মানসিক অবস্থারও পুরো হদিস খুঁজে পায়। আপশোশের তার সীমা থাকে না যে নিজেকে এত বড়ো বাস্তবধর্মী বলে জেনেও নিছক আদর্শবাদের খাতিরে বন্ধুর সঙ্গে এতদিন যোগাযোগ বন্ধ রেখেছে !

মনসুরের প্রচণ্ড অভিমানের মানে সে এখন বুঝতে পারে। নিরুপায় অসহায় একক হয়ে গিয়েছিল মনসুর—এ জগতে একজন, শুধু একজন মানুষও যদি তার কাছে থাকত, একটু তাকে সাহস দিত, ভরসা দিত।

না, মনের জোরের অভাব ছিল না মনসুরের। তার চেয়ে একবিন্দু কম ছিল না, নিজেকে সে যতই একনিষ্ঠ মনে করুক। আত্মবিক্রয়ের অনেক সুযোগ অনেক প্রলোভন বিনা দ্বিধায় বর্জন করে যে বিশ্বাস আর তেজের বিনিময়ে মনসুর এই রক্তক্ষয়ী রোগ অর্জন করেছে, তা ভুয়ো ছিল না। স্বার্থপর দুর্বল মন নিয়ে মনসুর বিগড়ে যায়নি।

অত সস্তা মানুষ ছিল না মনসুর।

তার প্রতিক্রিয়াও কি তাই প্রমাণ করে না ? রশৌনার মধ্যে তার যে সীমাহীন হতাশা প্রতিফলিত হয়েছে, প্রেস কনফারেন্সে যে সীমাহীন অভিমান সে প্রকাশ করেছে, এ সব তো ক্ষুদ্র-প্রাণ দুর্বল-হৃদয়ের ধর্ম নয়। ক্ষীণ-প্রাণ দুর্বল-হৃদয় সুবিধাবাদী হলে ডিগবাজি খাওয়াটা আরও সহজভাবে মনসুর গ্রহণ করত, অপরাধী মনের বাঁকা যুক্তি আর ফাঁকা অভিযোগ ফেনিয়ে তুলে নিজের কাজের সমর্থন সৃষ্টি করত, এমনভাবে বিচলিত হত না।

ছোটো মানুষের আশা যেমন হয় ভবিষ্যতে নিজের একটু সুখ-সুবিধা, হতাশাও তেমনি হয় মৃদু একটু মানসিক বেদনাবোধ।

নানাচিন্তা আনাগোনা করে গিরীনের মনে।

সে যদি সংযোগ রাখত মনসুরের সঙ্গে! রক্তবমি করার চরম হতাশার মুহূর্তে সে যদি মনসুরকে শুধু মনে পড়িয়ে দিত যে, বড়োলোকের দামি চিকিৎসায় সকলের রক্তবমি কবা রোগ সারে না, জীবন ফিরে পাবার এ সহজ পথ তার বা মনসুরের জন্য নয়। কোটি মানুষের খিদে ন্যাংটামি নোংরামি রোগ দিয়ে রক্তশোষণ আর লাঠি ও গুলিতে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থাকে চালু রাখতে সাহায্য করার বিনিময়ে সেরা খাওয়া-দাওয়া, সেরা আরাম-বিলাস পেলেও মনসুবের কাশতে কাশতে রক্ত তুলে মরার রোগ সারবে না।

নয়

গিরীনের হয়েছে আপশোশ, তার কবি-বন্ধু মনসুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার জন্য। প্রণবের হয়েছে কী ?

প্রণবকে মাঝে মাঝে খুব চিন্তিত দেখায়। গভীর দার্শনিক চিন্তায় মশগুল হয়ে গেছে, সেরকম চিন্তিত নয়। আমাদের মণি পর্যন্ত টের পায়, এ নতুন চিন্তা। আত্মচিন্তাকে প্রণব বলে দুশ্চিন্তা, তার মধ্যে ডুবে যাবার, বিচলিত হবার ধাত তার নয়। কিন্তু মুখে যেন আজকাল তার দুশ্চিন্তারই গাঢ় ছায়া পড়েছে।

দুদিনের জন্য বাড়িতে একটি নতুন লোক আসে। ধোয়া-মোছা-ঝাড়াই করা আলগা বিপ্লবী ঝড়ের মতো লোকটি। তার নাম মনস্বামী। দুদিন ধরে বাড়িটিকে সে সরগরম করে রাখে। কত রকমের কত লোক যে যাতায়াত করে, কত যে ছোটোবড়ো বৈঠক বসে, জীবনের পরিসর যে কত দিকে কতভাবে বেড়ে যায়।

মণি ভীষণভাবে দমে গিয়েছিল, সে-ও অদ্ভুতভাবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে মেতে গেছে। মনস্বামী তাকে বিশেষভাবে খাতিব করে বিশেষভাবে তার সঙ্গে আধঘণ্টা আলাপ করাব পর তাব এই পরিবর্তনটা দেখা যায় !

মনস্বামীর সঙ্গে আলোচনার মধ্যে প্রণবের মাথায কীসের চিন্তা ঢুকেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। মনস্বামী যেদিন এসেছিল সেইদিনই গভীর রাত্রে আলোচনা-মুখর এক ধরনের অবসর ভোগ করেছিল সকলে।

প্রণব বলে, আমার মনে খটকা লেগেছে। গান্ধী-জিন্না আপসে কিছু হবে না। ওটা আসলে ব্রিটিশের সাথে আপস।

মনস্বামী বলে, তা ছাড়া পথ কী আছে ?

গিরীন ও গোকুলকে নিয়ে জন-ছয়েক উপস্থিত ছিল। মণিও উঠি-উঠি করছিল কিন্তু উঠতে পারেনি, আলোচনা এমন এক পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যে সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল—এ দেশের স্বাধীনতা মানেই জগতের মানুষের মুক্তি। এ সবের চেয়ে রসালো কথা আজকাল আর তাব কাছে কিছুই নেই।

সকলেই ছিল মুখর, সারাদিনের ছুটোছুটি ঝঞ্ঝাটের শ্রান্তি সকলেরই মুখ দিয়েছিল খুলে, প্রণবের কথা শুনে কিন্তু এমনভাবে সকলে চুপ হয়ে যায় যে, মণির বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে !

প্রণব বলে, আমাব মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধী-জিন্না আপসে চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ওই স্তরে আপস হবেও না সে আপসে সাধারণ মানুষের লাভও নেই। গরিব খাটুয়ের মধ্যে খাঁটি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত, কংগ্রেস-লিগ মিলন নয়। কংগ্রেস-লিগ-ব্রিটিশ এই তিন পক্ষে আপস হতে পাবে, কংগ্রেস-লিগ আপস হবে না। ব্রিটিশের আপস আদরে কংগ্রেস-লিগ দুভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোযারা নিয়ে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে, ব্রিটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশকে বাতিল করতে তো পাবে না !

আমরা জনমত সৃষ্টি করব। চাপ দিয়ে ব্রিটিশকে বাতিল করাব।

জনমত ওদেবই কাজে লাগবে, কাজে লাগছে। ওদের পলিসির ফলে এই দাঙ্গা, ওদেব মধ্যে আপস চাওয়া মানেই এই ব্রিটিশের ফরমাসি পলিসি সমর্থন করা। আমরা বলছি, পরস্পবের পলিসিকে তোমরা মেনে নাও, একটু ত্যাগ স্বীকার কর দুপক্ষেই—পলিসি যে ভুল, দেশেব স্বার্থ-বিরোধী, তা তো আমরা বলছি না ! মজুর এলাকায় আমি যে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি দেখেছি তাতে আমার চোখ খুলে গেছে।

তাই নাকি ?

বোঝা যায়, মনস্বামী বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে।

প্রণব সেটা লক্ষ করেও বলে, গান্ধী-জিন্নার বোঝাপড়া হোক, সেটা হিন্দু-মুসলিম মিলন হবে না, কৃত্রিম ব্যাপার হবে। আমরা এই মিথ্যেটাকেই ফাঁপিয়ে তুলছি। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট দেখছি, সাধারণ মজুর চাষি হিন্দুত্ব মুসলমানত্বের উপরে উঠে রাজনৈতিক স্বার্থে হাত মেলাতে পাবে, হাত মেলাচ্ছে। কলকাতার মজুরদের দাঙ্গায় নামানো যায়নি, তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে তারা একতা বজায় রেখেছে। এই মিলনটাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত, আমরা ভুল করছি।

এ সব তোমার ফ্যান্সি। বেশি বেশি বই পড়ে বাস্তব ভুলে যাচ্ছ !

তুমুল তর্ক বেধে যায়। প্রথম থেকেই বিরক্তি নিয়ে শুরু করেছিল বলে মনস্বামী বেশি রকম চটে উঠতে থাকে। প্রণব গরম হয় কিন্তু রাগে না, তর্ক অচল হয়ে পড়লে সে-ই এক রকম দুজনেরই

মেজাজের লকআউট মীমাংসা করে দিয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করে। কে বলবে দুজনে তারা সেই ভোর থেকে লোকের পর লোকের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করেছে, বৈঠক চালিয়েছে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করেছে—মাঝে রাত্রির আগে এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায়নি।

মণি অবাক হয়ে তাদের তর্কও শোনে, অন্য সকলে কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথা শুনছে তাও অবাক হয়ে দ্যাখে। বেশির ভাগ কথাই সে ভালো বুঝতে পারে না।

হঠাৎ এক সময় গোকুল বলে, আমারও মনে হয় প্রণবদার কথাই ঠিক। আমরা ভুল করছি। উপরতলার নীতি থেকে দাঙ্গা বেধেছে, কিন্তু উপরতলায় দাঙ্গার প্রতিকার নেই। নেতাদের মর্জির উপর নির্ভর করে আমরা সাধারণ খাটুয়ে মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

বিশ্বাসঘাতকতা ! কথাটা সরাসরি গোকুল না বললেও পারত। এত সহজ তো নয় বিচার আর সিদ্ধান্ত—প্রণবও কি সমগ্র জগতের সমস্যার সঙ্গে সমগ্র দেশের সমস্যাটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুলভাবে বিচার-বিবেচনা করে কীসের ভুল তা ঠিক করেছে, কথাটা তার মনে হয়েছে মাত্র। গোকুল বোঝে আরও কম। কবি মানুষ, কম বোঝাটুকুর মধ্যেই বিরাট খাঁটি সত্যের ইঙ্গিত তাকে ভুলের স্বরূপটা চিনিয়ে দিয়েছে। দশজনের ভালোমন্দের দায়িত্ব যে নেয় তার ভুল সাধারণ ভুল নয়, দশজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা !

দশের জন্যে যে দায়ি, তার ভুল করার অধিকাব নেই। তবু কথাটা গোকুল এ বকম চটাং চটাং ভাবে না বললেও পারত।

মনস্বামী আচমকা গম্ভীর ও চুপ হয়ে যায়। খানিক পরে মণিকে বলে, ঘুমোবার ব্যবস্থা করেছেন নিশ্চয় ?

মণি খুশি হয়ে বলে, আপনারা আবার ঘুমোন নাকি ?

মণির নিজেরই ঘুম আসে না অনেকক্ষণ। কী ঝগড়াটাই দুজনের মধ্যে হয়ে গেল ! কাল হয়তো ওরা পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে না, দেশ ও দশের মুক্তিব জন্য জীবনপাত করে খাটবে দুজনে, কিন্তু একসাথে খাটবে না, তফাতে সরে যাবে।

কী আপশোশের কথা !

ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত্রি পর্যন্ত যেভাবে ঘরে-বাইরে তারা দুজনে শত শত মানুষকে পরিচালনা করেছে, আন্দোলন গড়েছে, কাজ করেছে—বাইরে না গেলেও ওদেরই আলাপ-আলোচনা পরামর্শ শুনে সেটা কল্পনা করা মণির পক্ষে শক্ত। কোথায় গিয়ে তারা কী করেছে, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে তার বিবরণ শুনে নিতেও সে কসুর করেনি। কাল থেকে ওরা পরামর্শ করবে না, পরিকল্পনা গড়বে না, একসাথে মিটিং শোভাযাত্রা করতে যাবে না। দুজনেই ওরা কুনো হয়ে যাবে। মণির গভীর বিষাদ জাগে।

তার দাম্পত্য জীবন সত্যিকারের জীবন ছিল না, ছিল ফাঁকি ; তাদের দাম্পত্য কলহও তেমনি সত্যিকারের কলহ ছিল না, তাও ছিল ফাঁকি। এখানে এসে স্বাধীন ও খাঁটি মতবিরোধের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে আসল ঝগড়া হয়ে গেছে, দুজনে আর তারা একসাথে সংসার চালাবে না। ক্ষুদ্র তুচ্ছ সংসার, কৃত্রিম কদর্য পারিবারিক জীবন। এতকাল একসাথে মিলেমিশে ভালোবেসে হেসে কেঁদে ন্যাকামি করে দুজনে তারা ফাঁকিতে ফাঁপানো পারিবারিক কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করার নামে ঝকমারি করে আসছিল, এতদিনে ঝগড়া করে পৃথক হয়ে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু মনস্বামী আর প্রণব তো এতদিন এ রকম ফাঁকির কারবার করেনি, তারা বিপ্লবী, ঈশ্বর আল্লা অহিংসা মাধুরীর ধোঁকাবাজি ফাঁকিবাজি বাতিল করে তারা টাকার পাহাড় আর দারিদ্র্যের অতল কুণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে ভেঙে চুরমার

করে দিতে দিতে গড়ে তুলবার সাধনায় নেমেছে। ওদের মতবিরোধও যদি তাদের দাম্পত্য কলহের চরম রূপ নেয়, সে তবে কীসের ভরসা করবে ?

এমনি এক রাতদুপুরে আরেক কেলেঙ্কারি। সুশীল একটু মত্ত অবস্থায় ফিরে আসে। ভূমিকা পর্যন্ত না করে সে চিরকালের অভ্যস্ত প্রথামতো মণিকে ভোগ করতে উদ্যত হয়। এ বিষয়ে চিরকালই সে ছিল নিরঙ্কুশ। মণিও অবশ্য প্রশ্রয় দিত, ঘরে নিরঙ্কুশ হতে না দিলে স্বামী বাইরে নিরঙ্কুশ হতে চাইবে, এটা আর কোন স্ত্রী না জানে ! হতাশায় ডুবে না গেলে মণি হয়তো বাঘিনির মতো গর্জে উঠে সুশীলের গলা টিপে ধরত লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দিত বিছানার বাইরে। কিন্তু বিষাদে-অবসাদে আজ সে দিশে হারিয়েছে। সে মৃতের মতো নির্বাক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। সকালে ঠান্ডা মাথায় রাত্রির কথা স্মরণ করে মণি শিউরে ওঠে। কী সর্বনাশ, আবার যদি সে ফাঁদে পড়ে গিয়ে থাকে ! আবার যদি তাকে মা হতে হয় ওই মানুষটার সন্তানের ! তার ধারণা ছিল, মত ও মনের অমিল হওয়ায় তাদের মধ্যে চটাচটি হয়ে গেছে, সে শুধু ভীষণ রেগে আছে সুশীলের উপর। আজ সে প্রথম টের পায়, কী ঘেন্নাটাই তার জন্মেছে, সুশীলের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ছাড়া কোনো ভাবই তার মনে নেই।

সকালে মনস্বামী ও প্রণবকে চা খেতে খেতে গতকালের মতোই পরামর্শে এবং তারপর চারিপাশের সমস্ত বস্তি ঘেঁটিয়ে শোভাযাত্রা গঠনে মশগুল হতে দেখে মণি একটু বিমূঢ় হয়ে যায়। কে বলবে, ওদের কাল মতের অমিল ঘটেছিল গুরুতর, তর্ক হয়েছিল প্রায় ঝগড়ার মতো, মিলেমিশে একসাথে তারা কাজ করতে পারবে, কল্পনা করাও কঠিন ছিল মণির পক্ষে !

গোকুল শুনে বলে, ঝগড়া ? ঝগড়া কেন হবে !

কাল যে চটাচটি হল ?

চটাচটি নয়। মতের অমিল।

গোকুল মাথা নাড়ে। বলে, কাল ঝগড়াও হয়নি, আজ মতের মিলও হয়ে যায়নি। এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় যে মত না মিললে ঝগড়া হয়ে যাবে, আবার আসল প্রশ্ন বাদ দিয়েই আপসে মিল হয়ে যাবে। জিনিসটা আপনি ঠিক ধরতে পারছেন না মণিবউদি।

মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। তায় আবার মেয়েমানুষ।

গোকুল হাসে।—ওই তো, ওইখানেই ঠেকেছেন। নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রেখেছেন, মর্মগ্রহণ হচ্ছে না। আপনি মুখ্যু না মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে তো এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই ! মজুর চাষা কি আপনার চেয়ে বেশি বিদ্যা লাভ করেছে ? বিদ্বানের চেয়ে সহজে তারা বুঝে নেয়। মেয়েমানুষ হলে কি বুদ্ধি কম হয় ?

অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে মণিকে নীরবে হাতজোড় করতে দেখে গোকুল জোরে হেসে ওঠে। এই ভেবে সে খুশি হয় যে, মণি আজ চটেনি, বিরক্ত হয়নি, সহজভাবেই তার সমালোচনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবাদের ভঙ্গিটাই তার প্রমাণ।

এ একটা পরিবর্তন।

মণি বলে, কীসে কী হয় আর কীসে কী হয় না, সে বিচারে না গিয়ে সাদামাটা কথাটা স্পষ্ট করে বলো। থিয়োরি কষে দশ ঘণ্টা বোঝালেও মাথায় ঢুকবে না। যা নিয়ে কথা উঠল, ঠিক সেই বিষয়টা ধরে বুঝিয়ে বলো তো, কোন জিনিসটা ধরতে পারছি না। মনস্বামী আর ঠাকুরপোয় ঝগড়া কেন ঝগড়া নয়, মতের অমিল কেন মনের অমিল নয় ? কাল রাতে গরম হয়ে দুজনে দুজনকে স্পষ্ট বলল, তোমার কথা ভুল। ভোরে উঠে দুজনে দুজনার ভুল মেনে নিল কী করে ?

কে বললে তোমাকে, ভুল মেনে নিয়েছে ?

একজন নিশ্চয় নিয়েছে ! নইলে মত হল দুরকম, কাজের পথ এক হয় কী করে ? ঠাকুরপো বললে, কংগ্রেস-লিগের মিলনের ভরসা করা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। ভোরে ঘুম ভেঙে

ঠাকুরপো সুড়সুড় করে বেরোলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের আন্দোলন করতে। চা খেয়ে তুমিও ওই কাজে ছুটবে।

গোকুল বলে, আমি যাব খেপাতে। মন্ত্রী-কমিশনের বিরুদ্ধে একটা জবর ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে। নইলে অবশ্য ওদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান মেলাতেই যেতাম। তোমার কথার জবাবটাও তাই দিতে হয়।

মণির মুখের কঠিন ভাব লক্ষ করে মাথা হেলিয়ে যেন তার মনোভাবে সায় দিয়ে বলে, তুমি যে সীমা বেঁধে দিয়েছ, তার বাইরে যাব না। তুমি কাল কোন জিনিসটা ধবতে পারনি জানো ? আমাদের কোনো ব্যক্তিগত পৃথক মত নেই। গরিব খাটুয়ের লড়ায়ে আমার মত, তোমার মত নেই, শুধু আছে আমাদের মত। সবাই যদি ভুল করে, আমিও সকলের সঙ্গে ভুল করব—যতক্ষণ সকলকে বোঝাতে না পারছি, ততক্ষণ আমি একলা কী বুঝলাম তার কানাকড়ি দাম আমার কাছেও নেই। সাধারণভাবে অনেকের মনে যে সব কথা জাগছে, কাল আমবা তাই নিয়ে ভাসা-ভাসা প্রাথমিক আলোচনা করেছি মাত্র, ঝগড়া নয়।

ভাসা-ভাসা প্রাথমিক আলোচনা ?

তা বইকী। আসল বিষয়ে আমাদেব তো কোনো খটকা নেই, আমাদের লড়াইকে হিন্দুত্ব-মুসলমানত্বের উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, শুধু ইংরেজ নয়, কংগ্রেস আর লিগের হাত থেকেও দেশকে রক্ষা করতে হবে, এ নিয়ে কাল আমাদের তর্ক হয়নি। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস-লিগের আপসের কথা বলা ঠিক হচ্ছে কী হচ্ছে না, এই হল আমাদের তর্ক। কংগ্রেস-লিগের মিলন আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কি এক জিনিস ? আমবা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, তা নয়। কংগ্রেস-লিগেব মিলন যদিই বা হয়, সে হবে উপরতলার মানুষেব স্বার্থে। আসল ঐক্য নীচেব তলাতেই সম্ভব, সাধাবণ মানুষের মধ্যে।

মণি বলে, কংগ্রেস-লিগ সাধারণের স্বার্থ দ্যাখে না ? কংগ্রেস দেশকে স্বাধীন কবলে সাধাবণ লোক স্বাধীন হবে না ?

গোকুল স্পষ্ট ভাষায় বলে, না। কংগ্রেস বা লিগ সে রকম স্বাধীনতা চায় না যা মজুর-চাষি সাধারণ লোককে স্বাধীন করবে। ইংরেজের সঙ্গে আপসে ও রকম স্বাধীনতা মিলতেই পারে না। নইলে ইংরেজের ভারত ছাড়া নিয়ে এত মারামারি কেন ? এত শর্ত কীসের ? বিদেশি তোমরা ভাগো, আমাদের যা হবার হবে, আমরা বুঝব—এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া স্বাধীনতা খাঁটি হয় ? ফাঁকির স্বাধীনতা, তাই নানারকম শর্ত নিয়ে দরদস্তুর।

কিন্তু ক্ষমতা তো পাওয়া যাবে ? ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়েই তো মারামারি ?

সেটাই তো প্রমাণ যে, ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যে ফাঁকি আছে। সত্যিকারের ক্ষমতা মানেই জনসাধারণের ক্ষমতা, ধর্মের নামে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে জনসাধারণ মারামারি করে না। উপরতলার একদল লোক দেশ শাসনের নামে এক ধরনের কিছুটা ক্ষমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন। আপসে দরদস্তুর করছে তারাই। দেশে আগুন জ্বলেছে, সৈন্যেরা পর্যন্ত বিদ্রোহী। সোজাসুজি এ দেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত শোষার সাধ্য আর ইংরেজের নেই। তাই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা দিয়ে পরোক্ষ দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সে ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে কংগ্রেস আর লিগ।

বিশ্বাসঘাতকতা ঠাকুরপো ?

বিশ্বাসঘাতকতা। জনসাধারণ বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাসের মান না রাখাকে আর কী বলে বউদি ? এই দিকে আমাদের চোখ ফুটছে। একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এই দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে। জনসাধারণের মধ্যেই আসল দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব আছে, সত্যই তারা দাঙ্গা চায়

না। ঐক্যের খাঁটি বাস্তব ভিত্তি দেখেছি মজুরদের মধ্যে। এত কাণ্ডের মধ্যেও মজুর শ্রেণি স্থির রয়েছে, কারও ভাঁওতায় ভোলেনি, উসকানিতে বিচলিত হয়নি, হানাহানি দেখে উত্তেজিত হয়নি, বরং এগিয়ে গিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছে। মজুররাই এগিয়ে গিয়ে দাঙ্গা থামাতে পারত, ঐক্য গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারত, এটা আমাদের খেয়াল হয়নি, আমরা কংগ্রেস-লিগ আপসের ভরসায় থেকেছি।

মণি খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, গোকুল, মজুর-মেয়েরা শোভাযাত্রায় আসে ?

আসে না ? জমায়েতে আসে, বক্তৃতা পর্যন্ত দেয়। দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাদের সোজা স্পষ্ট কথা শুনে আমাদের জ্ঞান জন্মে যায়। বুঝতে পারি, কত সোজা কথাকে আমরা কত পেঁচিয়ে ভাবি।

সেদিনের শোভাযাত্রায় দুর্গা ঝি ছাড়া কাউকে দেখতে পাইনি। চোখের আমার সত্যি দোষ আছে গোকুল।

আপশোশ কোরো না। দোষ তোমার একার নয়। জন্ম থেকে এতকাল যে দৃষ্টিতে একজন জগৎ দেখে এসেছে, হঠাৎ চোখে তার বদলে নতুন দৃষ্টি কোথা থেকে আসবে। আমরা ও সব ম্যাজিকে বিশ্বাস করি না। আমাদের উচিত ছিল তোমায় দেখিয়ে দেওয়া।

আমি দেখতে চাইলে তবে তো !

গোকুল মাথা নাড়ে, উঁহু তা নয়। তুমি দেখতে চাও বা না চাও, তোমার চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তোমার চোখকে সমীহ করাটাই ভুল হয়েছে।

সুধীন বলে, মা, আমি গোকুলের সঙ্গে যাচ্ছি।

মণি চমকে ওঠে।

সুধীন স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বলে, মানা করার আগে শুনে নাও। তুমি বারণ করলেও আমি যাবই। তোমাকে না বলেই যেতাম, গোকুল ছাড়ল না।

মণি বলে, গোকুল কি তোর সমবয়সি, নাম ধরে ডাকছিস ?

মানুষের নাম তো ডাকবার জন্যই।

আমায় তবে মা বলিস কেন ? আমার কি নাম নেই ?

সুধীন একটু থতোমতো খেয়ে যায়। গোকুল মণিকে বউদি বলে বলেই গোড়ায় সে দু-চারবার তাকে গোকুলকাকা বলে ডেকেছিল, গোকুল নিজেই তাকে নাম ধরে ডাকতে বলে দেয়। বয়সের তফাত হবে মোটে কয়েকটা বছরের, তাই যদিও জ্ঞান-বুদ্ধি-কার্যকলাপের পরিচয় পেয়ে অনেক বুড়ো গুরুজনের চেয়ে গোকুলকে সুধীন ঢের বেশি শ্রদ্ধা করে বসেছে, তবু কথাটা মেনে নিয়ে নাম ধরে ডাকতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। নির্দিষ্ট মানুষকে নির্দিষ্ট নামে ডাকার জন্যই যখন নাম, তখন ছোটো বড়োকে নাম ধরে ডাকতে পারবে না, এটা যে কুসংস্কার—এ কথাটাও তার গোকুলের কাছেই শেখা। কথাটা তার বড়ো ভালো লেগেছিল ! সত্যই তো, নাম থাকতে নাম ধরে ডাকা যাবে না, এ কৃত্রিম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দরকার। এখন মণির প্রশ্নে বেচারা ফাঁদে পড়ে যায়। বুঝতে পারে, যতখানি উৎসাহের সঙ্গে নামকে নির্ভেজাল করতে চেয়েছে, ততখানি তলিয়ে বুঝে দেখা হয়নি ব্যাপারটা !

মণি হেসে বলে, তা হবে না, আমার কথার জবাব দেবে, তবে তুমি যেতে পাবে। বড়ো বড়ো কথা বললেই হয় না। নাম ধরে ডাকার জন্যই যখন নাম, আমায় কেন মা বলবে, ওনাকে কেন বাবা বলবে, প্রণব ঠাকুরপোকে কেন কাকা বলবে, আমায় বুঝিয়ে দেওয়া চাই। নইলে তুমি যেতে পাবে না।

আজ সময় নেই মা।

সময়ের খবর জানি না। আজ না যাও, অন্যদিন যাবে। গোকুল আরও অনেকবার ছাত্র আন্দোলন করতে যাবে, আজকেই তো ছাত্রদের শেষ ডেমনস্ট্রেশন নয়।

মুখ কালো করে উনানে ভাতের ডেকচি চাপিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আজ এখন তার প্রথম খেয়াল হয়েছে, এ বাড়িতে এসে কী ভয়ানকভাবে সে উদাসীন হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। প্রথম প্রথম একটু খেয়াল রাখত, সময়মতো নাচ্ছে কিনা, খাচ্ছে কিনা, শুচ্ছে কিনা, শরীর ঠিক রেখে ঠিকভাবে চলছে কিনা। তারপর কখন যে ভুলে গিয়েছে ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে নিজে যে টেরও পায়নি, ওরা কখন নায় কখন খায় কখন ঘুমায় কোথায় যায় কী করে, জানবার কথাও মনে পড়েনি। সুশীলের সঙ্গে চরম ঝগড়ার পর তার মন থেকে যেন মুছে গিয়েছিল এত কষ্টে বিইয়ে এতকাল মানুষ করা ছেলেমেয়েগুলির অস্তিত্বের কথা।

যে সব কথা নিয়ে জীবনে কখনও মাথা ঘামায়নি, এ বাড়িতে এসে সেই সব কথা নিয়েই মেতে গেছে—কংগ্রেস, লিগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, স্বাধীনতা, ধনিক, মালিক, শ্রমিক, চাষি, বিপ্লব। এমন মেতেছে যে, ছেলেমেয়েগুলি বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাও খেয়াল করার অবসর থাকেনি।

ছি!

অথবা ছি নয়?

একটা ফাঁদে আটকে পড়েছিল। মুক্তি পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে, সেই ফাঁদের মায়ায় আবার ধিক্কার আসছে মুক্তির উপর। ছি ছি বলার বদলে তার জয়ধ্বনি করা উচিত।

সুধীন এসে বলে, তোমার ধাঁধার জবাব শোনো মা।

আমার ধাঁধা!

মা হল তোমার নাম, তাই তোমায় মা বলি। একটা নামে তো চলে না, সম্পর্ক বোঝবার জন্য নাম দরকার হয়। তাই বাবা কাকা দাদা মামা মাসি পিসি, এই সব নাম। গোকুলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই ওকে গোকুল বলি। বয়সে খুব বেশি বড়ো হলে গোকুলবাবু বলতাম।

মণি হেসে বলে, গোকুল শিখিয়ে দিয়েছে, না?

মণির অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু গোল বাধায় সুশীল। ক্ষুব্ধ উদাসীন ভাব কাটিয়ে উঠে ক-দিন থেকে সে ধীরে ধীরে পরিবারের দিকে মন দিচ্ছিল। একটা বিষয় সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে এ বাড়িতে বাস করে যতীনের চোরাকারবারে অংশ নিয়ে মোটা রোজগারের আশা করা চলে না। এরা টের পেলে কেলেঙ্কারি হবে। কিছু চোরাবাজারি চাল জোগাড় করে দিলে পর্যন্ত এরা খেতে নারাজ হয়। কেবল তাই নয়। শুধু এ বাড়িতে বাস করার জন্যই পুলিশ ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করেছে। এখান থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয়।

মণির মনটা একটু ভেজাতে হবে। এখানে এসে যে সব পাগলামি ঢুকেছে মণির মাথায়, বিশ্ব-সংসার ভুলে উদ্ভট সব আদর্শ নিয়ে খেপে গেছে, এ বিকারকে ঘাঁটালে চলবে না। মেয়েদের এ রকম হয়, সংস্কারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অতিরিক্ত মেতে থাকতে থাকতে মাথা বিগড়ে গিয়ে কত মেয়েকে সুশীল ব্রত-পূজা নিয়ে পাগল হয়ে থাকতে দেখছে। ওদিকে না গিয়ে মণি প্রণবদের খাপছাড়া মতামত নিয়ে মেতেছে। ও একই ব্যাপার। কিছুদিন না ঘাঁটিয়ে খুশিমতো চলতে দিলে নিজেই সামলে উঠতে পারবে।

যতীনের সঙ্গে যোগ দেওয়া, যতীনের দয়ায় নিরাপদ এলাকায় ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া, এ সব কথা গোপন রাখতে হবে মণির কাছে। বলতে হবে, নিজেই বাড়ি খুঁজে সে সকলকে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ, এখানে থাকার অনেক অসুবিধা, আর বেশিদিন থাকা উচিতও নয়।

তবু যদি মণি না যেতে চায়—কথাটা ভাবলেও সুশীলের মাথার মধ্যে রাগের যেন ঝিলিক খেলে যায়—তবে মণিকে ফেলে রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাবে। উপায় কী!

সুধীনকে শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে, এ সময় কোথায় বেরোচ্ছ ?

এমনি একটু কাজে যাচ্ছি।

সুশীল গম্ভীর কিন্তু সস্নেহ কণ্ঠে বলে, কলেজ যাচ্ছ না বলে কি পড়াশোনার সঙ্গেও সম্পর্ক ছেড়ে দিতে হবে ? কলেজ তো চিরকাল বন্ধ থাকবে না।

পড়াশোনা করছি।

সুশীল হুকুম দেয়, এখন আড্ডা দিতে বেরিয়ো না।

আমার জরুরি কাজ আছে।

কী তোমার জরুরি কাজ ?

সুধীন কথা বলে না। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

মণি রান্নাঘর থেকে শুনছিল, বেরিয়ে এসে বলে, যে কাজে যাচ্ছিস বলে যা। না বলে যাবি কেন ? অন্যায় করতে তো যাচ্ছিস না।

সুধীন বলে, আমি গোকুলের সঙ্গে ছাত্রদের মিটিংয়ে যাচ্ছি।

সুশীল চমকে ওঠে,—কীসের মিটিং ? পলিটিক্যাল মিটিং ? গোকুলের সঙ্গে যখন যাচ্ছ—

কীসের জন্য মিটিং শুনে সুশীলের চোখ কপালে উঠে যায়, বলে, কী সর্বনাশ ! তোরা কী ভেবেছিস, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট চলে গেছে, স্বাধীনতা পেয়ে গেছিস, মিটিং করবি, প্রসেশন করবি, পুলিশ কিছু বলবে না ? আগেও অমন ঢের পাওয়ার ট্রানস্‌ফারেন্সের কথা হয়েছে। আগে দাঙ্গা থামুক, স্বাধীনতা হোক, তারপর যত খুশি সভা আর শোভাযাত্রা করিস। তোর যাওয়া হবে না।

মণি বলে, এত ছেলে যাবে, ও যাবে না কেন ?

সুশীল বলে, পুলিশ লাঠি মারবে, গুলি চালাবে খেয়াল আছে ?

মণি বলে, উচিত কাজ করতে গিয়ে অন্য ছেলেরা যদি লাঠি-গুলি খেতে পারে, তোমার ছেলেও পারবে।

আমার ছেলে ! আমার ছেলে ! তোমার বুঝি ছেলে নয় ?

আমার ছেলে বলেই তো যেতে দিচ্ছি। আহ্লাদি জড়পিণ্ড হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে না থেকে, দশটি ছেলের সঙ্গে মানুষ বলে পরিচয় দেবে।

সুশীল গর্জন করে ওঠে, তোমায় পাগলা গারদে পাঠানো উচিত।

মণিও ফুঁসে ওঠে, গারদে রেখেই তো পাগল করেছ !

বাড়ির অনেকে এসে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়েছে, আশা গা ঘেঁষে এসেছে মায়ের, স্ফুরিত চোখে চেয়ে আছে সুশীলের দিকে। গোকুল জুতো-জামা পরে তৈরি হয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে বাইরে যাবার প্যাসেজটার মুখে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনছিল। এবার সে মৃদুস্বরে বলে, অত ভয় পাবেন না সুশীলদা। একটা এত বড়ো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাবে, এটুকু স্বাধীনতা ছেলেদের দিতে হবে বইকী।

সুশীল বলে, তুমি চুপ করো। তুমিই তো ওর মাথাটি খেয়েছ। যত সব ভ্যাগাবন্ড—

ও পাশ থেকে সরস্বতী বলে, ওই ভ্যাগাবন্ডটা আমার ভাই দাদা !

আশা হঠাৎ ক্ষোভে দুঃখে আকুল হয়ে বলে, তুমি কেলেঙ্কারি করছ বাবা। সবার সামনে মাকে অপমান করছ, আমাদের মাথা হেঁট করে দিচ্ছ !

সুশীল তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে শুধু একবার তাকায়, সুধীনকে বলে, সুধী, জামা-জুতো ছেড়ে পড়তে বোসো। তুমি যেতে পাবে না, আমার শেষ কথা।

মণি বলে, সুধী, তুই যদি কাপুরুষের মতো হার মানিস, গোকুলের সঙ্গে না যাস, জীবনে তোর মুখ দেখব না। তোকে পেটে ধরেছি বলে, মানুষ করেছি বলে, প্রায়শ্চিত্ত করব।

গোকুলের দিকে চেয়ে বলে, গোকুল সভায় ছাত্রীরা আসবে না ?

আসবে বইকী। বহু ছাত্রী আসবে।

তবে সুধী একা কেন যাবে ? আশাকেও নিয়ে যাও। আশা তুই যেতে চাস তো ?

আশা উৎফুল্ল হয়ে বলে, চাই, একশোবার চাই !

তবে যা।

গিরীন নিঃশব্দে এগিয়ে এসে সুশীলের হাত ধরে, তাকে এক রকম টেনে ঘরে নিয়ে যায়। সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্যে নয়, সে টের পেয়েছিল হাত ধরে মানুষটাকে সামলানো দরকার, এ রকম অবস্থায় ভয়ংকর কিছু করে বসা আশ্চর্য নয় লোকটার পক্ষে। অসহ্য ক্রোধে অপমানে মণিকে গুরুতর শারীরিক আঘাত করে বসতে পারে। তাকানি দেখে গিরীন অনুমান করেছিল যে ক্রোধের ধোঁয়া সম্ভবত ওই রকম উন্মাদ ইচ্ছার রূপ নিচ্ছে সুশীলের মগজে।

ঘরে নিয়ে গিয়ে সুশীলকে সে চৌকিতে বসায় কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলা শুধু নিরর্থক নয়, অনুচিতও বটে।

সুশীল কী ভাবল সেই জানে, আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল, মানুষটাই যেন হতাশায় চুপসে গেছে। পলকে পলকে তার মুখের ভাবের দ্রুত পরিবর্তন, দ্রুত নিশ্বাস, ঝিমিয়ে আসা, হিংস্র ক্রোধের বদলে দুচোখে প্রশ্ন ও হতাশা ফুটে ওঠা, গিরীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে। অস্বস্তিও বোধ করে সে বিশেষ রকম।

সুশীল নিজেই প্রথম কথা বলে অদ্ভুত গলায়,—আমার সংসারটা ভেঙে গেল ! বুঝলে গিরীন, সংসারটা আমার চুরমার হয়ে গেল !

গিরীন মৃদুস্বরে বলে, কী বলব বলুন। এমনি কালের গতি।

কালের গতি ? বুকভাঙা দুঃখ-হতাশা-আপশোশ চাপা আর্তকান্নার মতো ধ্বনি হয় সুশীলের কণ্ঠে—কালের গতি ? কালের গতি কী কেবল আমার বেলা ? সবাই সুখে ঘর-সংসাব কবছে, কালের গতি শুধু আমার সংসাবে ভর করল !

গিরীন তেমনি মৃদুস্বরে বলে, শুধু আপনার সংসার কেন, সকলের সংসার ভেঙে যাচ্ছে, আগেকার ধরনের সংসার। নতুনভাবে গড়ে উঠবার জন্যই ভাঙছে। এ জন্য আপশোশ করে লাভ নেই।

কী বলছ তুমি পাগলের মতো ?

কী বলব তবে বলুন ? আপনি নিজের সংসারটা দেখছেন, আমি এ রকম শত শত সংসার দেখছি। কমবেশি একই ব্যাপার ঘটছে সব সংসারে।

সব সংসারে ?

সব সংসারে। আপনার আমার সংসারে যেমন স্পষ্ট হয়েছে, অনেক সংসাবে হয়তো তা হয়নি। দেখলে হয়তো মনে হবে, সেই পুরানো দিনের সুখী শান্ত পরিবার। কিন্তু সবার গতি এক দিকে। মানুষ নিজে সমাজ-সংসার ভাঙছে নতুন সমাজ-সংসার গড়ার জন্য, এ তো আপনার আমার খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয় বা ভগবানের ইচ্ছা নয়। মনুষ্যত্বের মানেই হল এই, দরকার হলে মানুষ নিজে যা গড়েছে তা ভাঙবেই, নতুন যা গড়তে চায় তা গড়বেই। নইলে ভাবুন দিকি, মণিবউদি কখনও নিজের ছেলেমেয়েকে পুলিশের গুলির মুখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ? আপনি বলবেন, আপনার সঙ্গে রেষারেষি করে ঝোঁকের মাথায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভাবুন তো, আপনার সঙ্গে এ রকম রেষারেষি কেন ? ছাত্রদের এ রকম বেপরোয়া সভা-শোভাযাত্রা করা কেন ? শুধু সুধী নয়, আশার পর্যন্ত লাঠিগুলির সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াবার এ উন্মাদনা কেন ?

সুশীল চুপ করে শুনছিল। এবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমাদের জন্য। আবার কেন ! কী কুক্ষণেই তোমাদের যে এই আড্ডায় এসেছিলাম ! আগে জানলে কী এমন ঝকমারি করতাম।

গিরীন নির্বিকারভাবে বলে, করতেন। আজ ভুলে গেছেন,—প্রাণ বাঁচিয়ে উপকার করলেও আপনারা চটপট ভুলে যান কিনা, ভুলে গেলেই সুবিধা—নইলে আপনার খেয়াল থাকত কোথা থেকে, কী অবস্থা থেকে আপনাদের উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছিল। মণিবউদির মামা শহরে পৌঁছে প্রায় সারাটা দিন হত্যা দিয়ে তোষামোদ করে পুলিশ এসকর্ট জোটাতে পারেননি, তারপর মরিয়া হয়ে এসেছিলেন এখানে। তাই প্রণব গিয়ে আপনাদের জ্যান্ত উদ্ধার করে এনেছিল। তাই এখনও বেঁচে আছেন। নইলে—

গিরীন আপশোশের আওয়াজ করে।—নইলে, আশেপাশের বাড়ির লোকদের মতোই সপরিবারে অক্কা পেতেন। আপনাদের দক্ষিণের বাড়িটাতে হৃদয়বাবু থাকতেন না ? কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে লুঙ্গির মস্ত কারবার করতেন ? তিনি প্রায় সপরিবারে এখন স্বর্গে বাস করছেন, স্বর্গ বলে যদি কোনো বসবাসের জায়গা থাকে। আপনাদের উত্তর দিকের বাড়ির—

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে সুশীলের, ভয়ার্ত ভঙ্গিতে স্তম্ভিত শ্বাস টেনে সে বলে, সজনী সেন ?

গিরীন মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

সজনীর ছেলে দুটো ? তার মেয়ে বেবি ?

বেবি হালাতপুরের তেভাগার আন্দোলনে গান গাইতে গিয়েছিল, দলটা রাত্রে আটকা পড়ে যায়। ছোটো ছেলেটা বেঁচে গেছে। বড়ো ছেলে কানাই গুন্ডাদের একজনের গলায় কাটারি দিয়ে কোপ মারে, সে মরে গেছে। কানাইকেও শেষ করে দেয়।

সুশীল খানিক ঝিমিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বলে, বেবি এখনও তেভাগার গান গাইছে তো ? যারা তার বাপ-ভাইকে মারল, তাদের মারার গান গাইছে না ?

গিরীন বলে, এক হিসাবে গাইছে, তবে তুমি যে হিসাব ধরছ, সে হিসাবে নয়। যারা তার বাপ-ভাইকে খুন করিয়েছে, তাদের মারার গান গাইছে।

খুন করিয়েছে মানে ?

মানে, যারা দেশের নামে জাতির নামে ধর্মের নামে দিশেহারা করিয়ে মানুষ দিয়ে মানুষ মারায়। সব কারসাজি তাদের, সব দায়িত্ব তাদের। হিন্দু-মুসলমান যারা অন্ধ আবেগে পরস্পরকে আঘাত করেছে, তারা কেউ খুনি নয়, খুনিরা উপর থেকে কল টিপছে। এটা না বুঝলে ওদেরই ফাঁদে গিয়ে পড়তে হয়। ওরাই তো চায় যে বেবির মাথা বিগড়ে যাক, বেবির পক্ষ নিয়ে আপনার আমার মাথা বিগড়ে যাক, ধনিক মালিক মজুব চাষির তফাত ভুলে আমরা জাতের তফাতটা শুধু দেখি। বজ্জাতি করি !

সুশীল নিশ্বাস ফেলে বলে, কী জানি, তোমাদের এ সব রাশিয়ান যুক্তি মাথায় ঢোকে না। আমার বাপ-ভাইকে যখন মারছে, তখন কী করে হিসাব করব, আসলে এরা মারছে না, আড়াল থেকে [illegible] মারছে, এ আমার মোটা বুদ্ধিতে ঢুকবে না।

গিরীনও নিশ্বাস ফেলে বলে, বুদ্ধি আপনার মোটা নয়, সূক্ষ্ম। আপনি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন আপনার নিজের ছাড়া কোনো যুক্তি মানবেন না, আপনাকে কে বোঝাবে বলুন ? বাপ-ভাইকে যখন মারছে, তখন কেউ আমার হিসাবটা করে, না আপনার হিসাবটা করে ? কানাই কি হিসাব করতে বসেছিল লোকগুলি কেন তার বাপকে মারছে, কাদের উসকানিতে মারছে কিংবা ওরা কোন জাতের লোক, আগে সেটা বুঝে তারপর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একা কাটারি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। আপনি কেবল একমুখো নীতিকথা বোঝেন, সদা সত্য কথা বলিবে। জীবন কিন্তু চলে দুমুখী নীতিতে, সে জন্য চিরন্তন সত্যটা আসলে মিথ্যা। এভাবে না ধরলে জীবনের মানেই বোঝা যায় না।

সুশীল চুপ করে থাকে।

গিরীন নেয়ে-খেয়ে আপিস চলে যায়। সুশীল তার নিজের বিছানায় পা তুলে বসে ভাবে আর পা নাচায়। ভাবতে ভাবতে বেলা বারোটা নাগাদ তার মুখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে, দৃঢ় সংকল্পের ছাপ পড়ে। তখন সে উঠে গিয়ে ধীরভাবে স্নান করে, ধীর শান্ত গলায় মণিকে বলে, আমাকে ভাত দাও।

মণি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তভাবে সুশীলের ভাত খাওয়া দেখতে দেখতে একটু ঘৃণাও বোধ করে। ভাবে, আবার কী সুশীল তাকে বিনা ভূমিকায় বিনা প্রতিশোধে ক্ষমা করল ?

খেয়ে উঠে সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে বিকালে। তার রকম-সকম দেখে সত্যই মনে হয় সকালে স্বামীত্ব ও পিতৃত্বের যে চরম লাঞ্ছনা আর অপমানে সে খেপে যেতে বসেছিল, ইতিমধ্যে সে লাঞ্ছনা অপমান সে হজম করে বসে আছে।

সুধীন ও আশা ফিরেছিল আগেই। তাদের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন দুদিন পিছিয়ে গেছে। অন্য দুটি ছাত্র সংগঠনকে যোগ দিতে ডাকা হয়েছিল, তারা প্রথমে অস্বীকার করে। আজ দুটি সংগঠনের তরফ থেকেই হঠাৎ খবর পাঠানো হযেছে যে, দুদিন পিছিয়ে দিলে তারা শোভাযাত্রায় যোগ দেবে। এ দুদিন তাদের অন্য অনুষ্ঠান আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে।

গোকুলদের সভায় স্থির হয়েছে, ডেমনস্ট্রেশন দুদিন পিছিয়ে দিলে ক্ষতি নেই। সাম্রাজ্যবাদের যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, দুদিনে তা পুরানো হয়ে যাবে না।

ছেলেমেয়ে দুজনকেই অক্ষত দেহে নিরাপদে ফিরতে দেখে মণির দেহমন হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল। ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে পর্যন্ত হাঙ্গামার মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে অনভ্যস্ত কর্তব্য পালনের রোখটা চড়া পর্দায় তুলে রাখতে অনেক কৃত্রিম ঘৃণা ক্রোধ ক্ষোভ অভিমানের ঠেক্‌নো দরকার হচ্ছিল গার্হস্থ্য জীবনের হীনতা দীনতা পঙ্গুতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে ! ওরা ভালোয় ভালোয ফিরে আসতে সে-ও যেন ভালোয় ভালোয় রেহাই পায়। এমনকী, আবেকটা মানুষ যে রহস্যজনক শান্তভাবে ভাত চেয়ে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, সে আবার কোনো একটা কাণ্ড না করে বসে, এ ভাবনাটাও ক্রমে ক্রমে উঁকি দিতে আরম্ভ করে মণির মনে।

সুশীল স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় সময়মতো বাড়ি ফিরতে সে আরও স্বস্তি বোধ করে। মুড়ির বদলে খুচরো ক-খানা বিস্কুট আনিয়ে চা-বিস্কুট দিয়ে নিজে থেকে যেচে জানায়, সুধী আর আশা ফিরেছে।

সুশীল বলে, ফিরেছে ? বেশ।

উদাসীনভাবে কথাটা বলে পরম নিশ্চিন্তভাবে কয়েক চুমুক চা খেয়ে সে আবার বলে, আমি কাল সকালে নূতন বাড়িতে চলে যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাব। তোমার বা তোমার ছেলে-মেয়েদের উপর আমি জোর করব না, ইচ্ছা করলে তোমরা যেতে পার, ইচ্ছা না করলে যেয়ো না।

মণি বলে, ও !

সুশীল বলে, তুমি যদি না যাও তোমার বিয়ের গয়না তুমি রেখো, আমি যা দিয়েছি, সেগুলি নিয়ে যাব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করেছি, সেই টাকায় গয়না দিয়েছি। কবে কোন মজুর উদ্ধারনি ফাণ্ডে দান করে বসবে, তাতে আমার কাজ নেই।

কয়েক মুহূর্ত মণি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার হাসি পায়।

তার মানে, সঙ্গে যাই তো ভালো, নইলে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না ?

তোমরা যদি সম্পর্ক রাখতে না চাও, গায়ের জোরে সম্পর্ক রেখে লাভ আছে কিছু ?

গায়ের জোরেই তো রাখতে চাইছ সম্পর্ক। সঙ্গে যেতে হুকম দিলে, যদি না যাই, তুমি মালিক, তুমি জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি নিয়ে চলে যাবে, খরচপত্র বন্ধ করে দেবে। মোট কথাটা তো এই ?

জোড়হাত করে ক্ষমা চাইছি, আর উপদেশ ঝেড়ো না। দয়া করে রেহাই দাও। তোমরা স্বাধীন, যা খুশি করতে পার। কেবল আমার কি কোনো স্বাধীনতা নেই ? আমি কি দাসখত লিখে দিয়েছি যে তোমাদের খেয়াল-খুশিমতো আমাকে চলতে হবে ?

দাসখত ! দাসী আর দাসীর সন্তানদের জব্দ আর পদানত করার জন্য যে চরম চাল চেলেছে, সে বলে দাসখতের কথা ! এখানে এসে অবধি ছাঁটাই আর লকআউটের কথা শুনছে ক্রমাগত, মালিক চায় খুশিমতো ছাঁটাই করার স্বাধীনতা, মালিক নাকি তারস্বরে নালিশ জানায় যে কী এমন দাসখত লিখে দিয়েছে যে, গাঁটের পয়সা দিয়ে লোক রাখা বা না-রাখার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত থাকবে না ! এতদিন পরে আজ যেন প্রথম মণি বুঝতে পারে, মজুর-কেরানিরা কেন কাজ করার অধিকারকে বলে স্বাধীনতা, ছাঁটাই করার অধিকারকে বলে মানুষকে দাস করে রেখে রক্ত চোষার ভাঁওতা !

কিন্তু বুঝেই কি রেহাই আছে ? মণি ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার ভাবনা বেড়ে যায়। দন্তের সঙ্গে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সাত-আটবছর পরে ফিরে এসেছে। সবই স্বামীর ভরসায়, স্বামীর উপর নির্ভর করে। কাল সকালে স্বামী যদি মালপত্র গয়নাগাঁটি সব কিছু নিয়ে চলে যায়, যদি একটি পয়সা না দেয়, তবে সে কী করবে তার উপার্জনহীন জোয়ান ছেলে আর মেয়ে নিয়ে, কে খাওয়াবে-পরাবে তাদের, দু-মাস বা ছ-মাস পরে হাঙ্গামা মিটে গেলে ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে কে খরচ জোগাবে, কীভাবে সে কী করবে ?

মণির হাত-পা হিম হয়ে আসে।

তখন মাঝরাত্রি। নতুন শীতের থমকানো ধোঁয়াটে কুয়াশার আবরণে মানুষ ও কুকুরের চিৎকারে মাঝে মাঝে ফেটে যাওয়া স্তব্ধতা। মণি চরম ভয় ও হতাশা এবং চরম বেপরোয়া বিদ্রোহের মধ্যে দোল খায়। তখন ভাবে নিজের নিরুপায় অসহায় অবস্থার কথা, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার কথা, ভবিষ্যতের কথা, সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়। অসম্ভবকে সে কী করে সম্ভব করবে ? মাথা নিচু করে মুখ বুজে গুটি-গুটি ফিরে তাদের যেতেই হবে সুশীলের কাছে, মেনে নিতে হবে শাসন আব জীবনযাপনের নীতি ও বিধান। তা ছাড়া কী আর করার আছে ?

আবার এই অসহায়তার অনুভূতি সর্বাঙ্গে অবশ করে এনে যখন প্রায় দম আটকে দিতে থাকে, তখন বিদ্রোহ গর্জন করে ওঠে তার মধ্যে। ভাবে, চুলোয় যাক ঘর-সংসার, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, ওই পচা জীবনে সুখ-সচ্ছলতার চেয়ে, দাসীপনার চেয়ে হাজার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাও ভালো। সুশীলের মনের মতো মানুষ হওয়ার চেয়ে ছেলেমেয়েদের কুলি-মজুর হওয়াও ভালো। চলে যাক সুশীল, একা ভোগ করুক তার রোজগার, আবার বিয়ে করে সংসার পাতুক।

[illegible] ধীরে ধীরে আবার জুড়িয়ে যায়।

সকালে সুধীনকে বলে, আজ আমরা ওনার সঙ্গে অন্য বাড়িতে যাব।

সুধীনের মুখ শুকিয়ে যায়।

পরশু যে আমাদের ডেমনস্ট্রেশন !

ডেমনস্ট্রেশনে যাবি।

সুধীন মাথা নাড়ে।—ওখান থেকে বাবা যেতে দেবে ভেবেছ ? বলতে গেলে মেরে তাড়িয়ে দেবে। এমনিও তাড়িয়ে দেবে ওমনিও তাড়িয়ে দেবে, তার চেয়ে আমি না-ই বা গেলাম নতুন বাড়িতে ? তোমরা যাও।

আশা বলে, আমিও যাব না।

মণি তখন ভেবেচিন্তে সুশীলকে গিয়ে বলে, দ্যাখো, আজ না গিয়ে দুটো দিন পরে গেলে হয় না? পরশুর পরদিন? ওরা আর দুটো দিন থাকতে চাইছে।

সুশীল বলে, পরশুর পরদিন? বেশ!

মণি আরও দুদিন এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে।

বিপ্লবীদের এই বিপজ্জনক আস্তানায়।

সুশীল খুশি হয়েই এ অনুমতি দিয়েছে।

তা, রকম সুবিধে নয় দেখলে স্ত্রীরা এ রকমভাবেই হার মানে, একটা ছোটোখাটো আপসের মধ্যে। ব্যাপারটা তুচ্ছ, দুদিন আগে আর পরে যাওয়ার প্রশ্ন, আর কিছুই নয়! মণি দুদিন পরে যেতে চাইল এবং তার কথাই রইল। ব্যাস্, ব্যাপার গেল চুকে!

সুশীল পাকা লোক, ঝানু স্বামী। বহুকাল ধরে সে তার জীবন্ত সম্পত্তি বিয়ে করা বউটিকে ভোগদখল করেছে, স্ত্রী বশে রাখার কোনো কৌশল তার অজানা নয়। সে একেবারে নরম হয়ে যায়, মণির সঙ্গে প্রায় সবিনয়ে কথা বলে।

নরম হতে আর আপত্তি কী, সে সত্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে। এ বাড়ির আবহাওয়া আর মণির বিগড়ানো মেজাজ তাকে রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছিল। একেবারে ত্যাগ করার চরম নোটিশ দিয়েও শেষ পর্যন্ত মণিকে টলানো যাবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এ বাড়ির মানুষগুলির ব্যারাম মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে, মাথা বিগড়ে দেয়। মাথা একবার বিগড়ে গেলে তার পক্ষে কিছুই আর অসম্ভব থাকে না, প্রাণের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রাখা, আদর্শের জন্য লড়াই করা। যেন প্রাণে বেঁচে থাকলে একটা ছেড়ে দশটা আদর্শের অভাব হয়!

ছেলেমেয়ে ডেমনস্ট্রেশনে যেতই! জিদ যখন ধরেছে, এবারের মতো শখ মিটুক, ও বাড়িতে গিয়ে ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে!

সুশীল তাই এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি। অসময়ে সপরিবারে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সুযোগ-সুবিধামতো আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে!

মণি আশ্চর্য হয় না। আশ্চর্য হবার দশা সে পার হয়ে গেছে। সে শুধু আকুল হয়ে ভাবে যে এই মানুষটার সঙ্গে, এই মানুষটার নিয়ম মেনে, বাকি জীবনটা কাটাব কী করে?

খবরের কাগজে, অতি বাজে কাগজেও, কী দ্রুত ঘটনা ঘটছে। এ দেশে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সন্দেহ নেই, সাধারণ মানুষও সেটা জেনে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের কামনাই রূপ নিতে চলেছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও মধ্যস্থের মারফতে, চারিদিকে ফেটে পড়ছে পরিবর্তনকামী মানুষের বিদ্রোহ। চারিদিকে বিদ্রোহ গুমরাচ্ছে, ফেটে পড়ছে—পুলিশ আর সৈন্যের মধ্যে পর্যন্ত এ আগুন ছড়িয়েছে। এমনই অবস্থা দেশের যে নেতা মশায়েরা একটিবার কোমর বেঁধে হাঁক দিলেই ব্রিটিশ শাসন জনতার ফুৎকারে উড়ে যায়!

জনতার ফুৎকারের হলকায় ব্রিটিশ পাছে ঝলসে পুড়ে উড়ে যায় এই ভয়ে নেতারাই হয়েছে সন্ত্রস্ত, মুশকিল হয়েছে ওইখানে। এত বেশি বিদ্রোহ দেখে নেতারা খুশি নন। বিদ্রোহ হবে মৃদু, অহিংস—আয়ত্তে থাকবে। নইলে নেতৃত্ব থাকে কীসে?

স্বামীর সাথে আপস করে মণি সাগ্রহে ভোর থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত দেশের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিদ্রোহীদের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক শোনে।

আর দুটি দিন। দুদিন পরে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে।

শুধু মিথ্যার গাঢ় অন্ধকার। শুধু ফাঁকি, শুধু জোড়াতালি। সত্যের একটা ঝলকও চোখে পড়বে না।

মনে মনে মণি সংকল্প করে, না, তা চলবে না। অত শান্তশিষ্ট গোবেচারি ভালো মেয়ের মতো সুশীলের বিধান মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর জেলখানায় সে সিঁদ কাটবে। সুশীলকেও সে বুঝিয়ে দেবে, চালাক সে একা নয়। অবস্থার সুযোগ সে একা নিতে জানে না।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। নোংরামিকে মানাই অভ্যাস, নোংরামির সাথে লড়াই করার অভ্যাস নেই। লড়াই করার কথা ভাবলে একটা বিষাদ ঠেলে উঠতে চায়, সব যেন ফুরিয়ে যেতে বসেছে, বেঁচে থাকার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নেই।

আগে মণি কাবু হয়ে যেত। নিজের গভীর বেদনা ও অভিমানেই শেষ হয়ে যেত তার রাগ দুঃখ অপমান জ্বালা-বোধ। কোনোদিকে জীবনের কোনো সার্থকতার সম্ভাবনাই তার জানা ছিল না, দশজনের জীবনকে সুস্থ সুন্দর করতে কোমর বাঁধাই যে মানুষের জীবনের সেরা অবলম্বন, এ ছিল শুধু নীতিশাস্ত্রের ফাঁকা কথা। এখন হতাশ বেতনার অনুভূতিতে জোয়ার আসছে একভাবেই, কিন্তু হাল ছেড়ে ভেসে যাবার অবস্থায় মণি আর নেই। নিজেকে সে সামলাতে পারে। প্রক্রিয়াটা ঘটে, ঠেকাতে পারে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা থেকে যায় মানসিক ব্যাপার। বাস্তব পন্থাটা সে অন্য হিসাবে বেছে নেয়।

দ্বিধা তার কাটেনি। স্বভাব তার ঘোচেনি। নয় তো সুশীলের এক হুমকিতে কেন ভড়কে যাবে, সঙ্গে যাবার হুকুম মেনে নেবে ! কিন্তু সঙ্গে সে যাচ্ছে না নিজেকে সমর্পণ করে দিতে, আগের জীবন ফিরে পেতে—সে কুৎসিত নিরাপত্তার লোভ আর তার নেই। জীবন সে নতুন করেই গড়বে, সুশীলকেও শিক্ষা দেবে। মানুষ মুক্তির স্বাদ পেলে গায়ের জোরে তাকে বেঁধে রাখা যায় না, সুশীলের এ জ্ঞানটুকু হওয়া দরকার।

সোজাসুজি সুশীলের হুকুম মানতে অস্বীকার করলে, সমস্ত ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করে মাথা উঁচু রাখলে, সুশীলের যে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা হত, এটা অবশ্য মণি ভাবে না। সে শিক্ষাও সে পায়নি, অতখানি মনের জোরও তার নেই।

গোকুল বলে, আপনারা তাহলে চললেন ?

মণি বলে, আর কতকাল থাকব ? সেফ এরিয়ায় একটা বাসা যখন পাওয়া গেল—

সুশীলদা জোগাড়ে আছেন !

মণির ভেতরে ছ্যাঁত করে ছ্যাঁকা লাগে। সুশীলের এ বাহাদুরি তার কাছেও লজ্জার বিষয়—তবু গোকুল তাকে খোঁচা দিল !

তোমার সুশীলদার কথা আর বোলো না।

গোকুল একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। মণি যে তার প্রশংসার ব্যঙ্গের দিকটা ধরতে পারবে সে তা ভাবতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আসবেন তো ?

নিশ্চয়। এক ভদ্রলোকের গৃহিণী গৃহকর্ত্রী হয়ে এসেছিলাম, তোমরা মজুরনির অধম চাকরানি করে ফেরত পাঠাচ্ছ। মাঝে মাঝে না এসে থাকতে পারব কেন ! তোমরা খবর নেবে না ?

নিজের কবিতার কথা বলতে গিয়ে একদিন গোকুল আলাপে যে অকৃত্রিম সরলতা এনেছিল, মণি চলে যাবার আগেও সেই ধারা টানছে। উগ্র অভিমানের লাগসই চিকিৎসা করায় মণি সেই দিন থেকে চিকিৎসকের মতো তাকে আপন করেছে। নতুন চেতনা পেতে সে তাকে অনেক ধৈর্যের সঙ্গে সাহায্য করেছে, নিজের চেতনা মণি তার কাছে গোপন করবে না। এই নতুন আত্মীয়তার সূত্রপাত গোকুল আঁচ করছিল। এ আত্মীয়তা স্বার্থবোধের উপরে।

সুশীল কীভাবে কান ধরে মণিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এটা জেনে গোকুলের মধ্যে একটু ঘৃণা জেগেছিল বইকী ! যাওয়ার আগে মণির এ ভাব গোকুল আশা করেনি। সে বলে, খবর নেব বইকী মণিবউদি ! আমাদের তো একটা উদ্‌বেগ থাকবে আপনার সম্পর্কে।

কীসের উদ্‌বেগ ?

গোকুল সরলভাবেই বলে, আপনার মতিগতি কী দাঁড়ায়। আপনি নিজেই বোঝেন কী তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছিলেন, নিজেকে মজুরনির অধম চাকরানি বলে চিনতে পেরেছেন। এবার আপনি কী করবেন সেটাই ভাবনা। বন্ধু থাকবেন না শত্রু হবেন !

মণি বলে, কী বলছ বুঝতে পারছি না ভাই।

গোকুল বলে, দুদিক বজায় রেখে চলার মানুষ আপনি তো নন, আপনার ধাতে সেটা সয় না। ক্রমে ক্রমে হয়তো এখানে যা শিখলেন সব ফাঁকি মনে করা আপনার দরকার হবে—আমাদের ওপর ভীষণ চটে না গেলে চলবে না। এখন যা সব ঘেন্না করছেন, আমাদের ঘেন্না না করে তো আর সে সব ফের পছন্দ করতে পারবেন না !

মণি কথা বলতে গেলে হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে গোকুল জোরের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে ঠিক উল্‌টোটাও যে হবে না তা কিন্তু বলছি না ! কিছুদিনের মধ্যে হয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এসে মজুরদের সাথে ভিড়ে যাবেন ! তবে হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার—মাঝামাঝি কিছু ঘটবে না।

মণি শান্ত সুরে বলে, সংসার করলে তোমাদের বন্ধু থাকা যায় না ? কাজ করা যায় না ?

রাগ করবেন না তো ?

না।

সুশীলদার সংসার করে কিছুই করা যায় না।

এমনি সৃষ্টিছাড়া তোমার সুশীলদার সংসার ? অন্য সংসারে থেকে পারা যায়, এ সংসারে থেকে কিছুই পারা যায় না ?

সৃষ্টিছাড়া নয়, এমন সংসার অনেক আছে। এ সব সংসারে আদর্শকে সংসারের বড়ো করা অসম্ভব, মুশকিল ওইখানে। নতুন আদর্শের জন্য কাজ করা কি শখের ব্যাপার মণিবউদি ? জগৎকে বদলাবার কাজ কি ফাঁকি দিয়ে হয় ? সংসার করেও এ আদর্শ মানা যায়—দরকার হলে আদর্শের জন্য সংসারকে বাতিল করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। শুধু আজকের জগতের নতুন সত্যের জন্য নয়, মানুষ চিরদিন সত্যের জন্য—আদর্শের জন্য নিজের জীবন, নিজের সুখ-সুবিধা স্নেহ-মমতা সংসার সবকিছু তুচ্ছ করেছে। মনুষ্যত্বের আসল মানেই তাই।

গোকুল ভেবে বলে, নীতিকথার মতো শোনালো ? নীতি ছাড়া কী মানুষের চলে ! এ কিন্তু শূন্যে তোলা ফাঁকা নীতি নয় ! বনের মানুষেরও নীতি ছিল—সত্য ছিল। নীতি নিয়েই মানুষ এগিয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে বাস্তব অবস্থাকে বদলে নিজেকে উন্নত করেছে। কিন্তু একটা নীতি নিয়ে নয়—যে নীতি যখন মিথ্যা হয়ে গেছে, মানুষকে একেবারে বদলে পিছনে টেনে রাখতে চেয়েছে, তখন মানুষেরই অগ্রণী অংশ প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াই করে নূতন নীতি চালু করিয়েছে—মানুষকে বাঁচিয়েছে। মানব সমাজের কাছে নিজের জীবন না ছেলেমেয়ে সংসার ? বাপ-মা ভাইবোন ? এটুকু বোঝার উপর সব কিছু নির্ভর করে। অনেকে বুঝছে। না বুঝে উপায় নেই। তাই না হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সংসারে থেকেও সংসারকে না মেনে, দরকার হলে সংসার চুলোয় পাঠিয়ে নতুন আদর্শের লড়ায়ে ভিড়ে গেছে। ছেলেমেয়েরাই অবশ্য বেশি। তাদের পক্ষে মায়া কাটিয়ে পুরোনো জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলা সহজ।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল বুঝে বলে, সংসারে থেকেও এমন অনেকে এসেছে, সংসারের অন্য সকলে যার কাজকর্ম চালচলন অপছন্দ করে। কিন্তু এ সব সংসারে হয় কী, একজনের মতিগতি সকলে অপছন্দ করলেও সকলের মতে ভয়-ভাবনা দ্বিধা-সংশয় থইথই করে। ছোঁয়াচ তো লেগেছে সবার মনেই। কেউ তাই জোর করে ঠেকায় না। শোভাযাত্রায় মালতীদিকে দেখেছিলেন ? ওই সামনের 'বাড়ির

মালতীদি ? ভূপেনবাবুর স্ত্রী ? দ্যাখেননি ? উনি সামনে ছিলেন। ওঁর তিনটি ছেলে, চারটি মেয়ে। স্বামী আর বড়ো ছেলে চাকরি করে। উনি মজুর-চাষির সঙ্গে ভিড়বেন এটা তাদের পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়, উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতে যান। মালতীদি পরিষ্কার বলেন, বেশ, তোমরা আমায় না চাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। দুজন নরম হয়ে যায়।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল বুঝে বলে, কেন নরম হয় জানেন ? সবাই ভালো করেই জানে যে, মালতীদির কথা আর কাজে তফাত নেই, নিজের মতে চলতে না দিলে তিনি সত্যিই বেরিয়ে যাবেন। তাছাড়া, পছন্দ না করুক, ওরা জানে মালতীদির আদর্শই খাঁটি ! মা-র জন্য চাকরি যাবার ভয়ে ছেলেই আগে রাগারাগি করত বেশি, এমনিতেই এখন ছাঁটাই তার মাথায় ঝুলছে। আজকাল সে চুপ করে থাকে।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল একটা বিড়ি ধরায়। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে মণির মুখের দিকে। বুঝতে পারে, উদ্ধত অভিমানের সঙ্গে কোনো ইচ্ছার জোর চেতন মনের সঙ্গে লড়াই করছে। তার কথাটা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

সুশীলদা কিন্তু নরম হবেন না। ওঁর মতিগতি অন্য রকম। সংসারের চেয়ে ওঁর কাছে সংসারের দখলিস্বত্ব বড়ো, তার চেয়ে বড়ো টাকার সুখ, আরাম-বিলাস। মনে-প্রাণে টাকার কাছে দাসখত লিখে দিয়েছেন, বড়ো বড়ো ডাকাতরা যে লুট চালাচ্ছে উনি তার ছিটেফোঁটা ভাগ চান, অন্তত যাতে একখানা বাড়ি একখানা গাড়ির মতো আরাম-বিলাস মান-সম্মান হয়।

মণি চুপ করেই থাকে।

বউ ছেলেমেয়ে এই আদর্শ জীবনের বিরোধী হলে, বাধা দিলে, সুশীলদা সইবেন না। দরকার হলে সবাইকে তাড়িয়ে দেবেন, আবার বিয়ে করে সংসার পাতবেন।

মণি এবার হেসে ফেলে। গোকুলের কথাটা হাস্যকর বা অসম্ভব বলে নয়, সুশীল আবার বিয়ে করবে ভাবলেই তার হাসি পায়। বলে, দেখাই যাক। আমার কর্তব্য আমি করব, তাতে না পোষায়, তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমায় চরম নোটিশ দিয়েছে ? আমি তো কাউকে কিছু বলিনি !

নোটিশ ? কীসের নোটিশ ?

এমনিই আন্দাজ করছ তোমার সুশীলদা দরকার হলে আমায় ত্যাগও করতে পারে ?

মানুষ দেখে বোঝা যায় না তার পক্ষে কী সম্ভব ?

কেবল আশা ও সুধীন নয়, তাদের সঙ্গে মণিও গেল বিক্ষোভ প্রদর্শনে। বোধ হয় গোকুলের সঙ্গে আলোচনার ফলে।

গোকুল বলে, আপনি কিন্তু সুশীলদার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যাচ্ছেন মণিবউদি !

মণি মাথা নাড়ে।

শুধুই সে জন্য নয়। তোমাদের মতো অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতেও যাচ্ছি। এমনি হয়তো যেতাম না, তা ঠিক। কিন্তু কারণ ছাড়া মানুষ কীভাবে এ সব কাজে নামে আমি বুঝি না ভাই। মানুষের মতো জীবন হলে এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কীসের গরজে ? আমার বেলা কারণটা খাপছাড়া হতেও পারে, কিন্তু কারণ তো একটা থাকবেই ! তুমিও কি অকারণে যাচ্ছ, ফাঁকা আদর্শের খাতিরে ? জীবনের কার্য-কারণের সঙ্গে যোগ নেই, সে কী রকম আদর্শ বুঝি না ভাই।

গোকুল লজ্জিত হয়ে বলে, আমিই ভুল বলেছি।

সভায় লোক হয় প্রচুর। অনেক চেনা মুখ মণির চোখে পড়ে। প্রায় সব মুখই প্রণবদের বাড়ি আসার পর চেনা হয়েছে। সুধী ও আশার গরম গরম উৎসাহ দেখে বারবার মনটা আকুল হয়ে ওঠে মণির—মনুষ্যত্ববিরোধী কত দোষও ওরা অজান্তে অর্জন করেছে তার তো কিছুই অজানা নয় ! এই তেজ উৎসাহ আনন্দ উদ্দীপনা সব ওরা পেয়েছে বাইরের জগতে নূতন কালের হাওয়া থেকে— ঘরে পায়নি। বাড়িতে মানুষ করতে চেয়ে কত মিথ্যায় ওদের মগজ বাপ-মা তারা দুজনে ঠেসেছে, কত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা হীনতা শিখিয়েছে। নতুন বাড়িতে আবার সুশীলের খপ্পরে গিয়ে পড়বে ! কে জানে কী দাঁড়াবে ওদের মতিগতি ? মন তো ওদের কাঁচা, সে মনে মনুষ্যত্বের ভিত্তি তারাই সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য এই, কেবল তার জন্য গোকুলের দুর্ভাবনা দেখা গেছে, সুশীলের সংসারে থেকে ওদের মতিগতি কী হয়ে যেতে পারে, সে জন্য গোকুলের তো কোনো ভাবনাই দেখা যায়নি !

সভার মধ্যেই মণি গোকুলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে। নিজেই একটা যুক্তি জুগিয়ে বলে, তুমি বুঝি ভেবেছ, আমি ঠিক থাকলে ওরাও বিগড়াবে না ?

গোকুল বলে, মোটেই না। ওদের কথাই আলাদা, ওরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। ওরা আপনাদের কনট্রোলে নেই, যে সব শক্তি সমাজটাই পালটে দিচ্ছে তাই ওদের গড়ে-পিটে নেবে। তবে, নানা বিরোধী শক্তি আছে, ঘাত-প্রতিঘাত আছে, ভুল পথে গিয়ে বিগড়েও যেতে পারে। কিন্তু সেটাও আপনার বা সুশীলদার জন্য ঘটবে না, বাড়িতে কীরকম জীবন কাটায় সে জন্যও ঘটবে না। ঘরের পুকুরটা আপনারা প্রাণপণ চেষ্টায় ঘিরে-টিরে রেখে মোটামুটি শান্ত রাখতে পারেন কিছুকাল, কিন্তু বাইরে জীবন-সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ওদের বেলা সেটাই আসল।

সভা গরম হয়ে জমে গিয়েছে শুরু থেকেই। প্রতিবাদের পিছনে গভীর ও তীব্র অসন্তোষ। প্রতিবাদটা কুৎসিত কালো কানুনের বিরুদ্ধে, অতি নিরীহ শান্ত পশ্চাৎপদ মানুষেরও তার দেশে যে আইন চালু আছে ভাবলে গা জ্বালা করে, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অমানুষিক আইন মাথার উপর ঝুলছে জেনে সাধারণ মানুষের সাধ্য কী নিজেকে পুরোপুরি মানুষ মনে করে।

মণি অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের ভাবনা একেবারে ভুলে যায়। মন দিয়ে বক্তৃতা শোনে।

নিজের কথা একবার শুধু মণির মনে আসে, ভূষণের বক্তৃতার একটা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। ভূষণ যখন বলে যে, এই ফ্যাসিস্ত আইন দেশের মানুষকে পদানত দাস করে রাখার অস্ত্র ; তখন তার মনের মধ্যে ঝলক মেরে যায় এই কথাটা যে, তাকে আর তার ছেলেমেয়েকে সুশীলের গায়ের জোরে দাসদাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টাও অনেকটা এই রকম। কিন্তু এ রকম জোরালো প্রতিবাদ কি সুশীলের সইত, এ রকম স্পষ্ট নির্ভীক সমালোচনা ? কী ভীরুর মতোই সে ঝগড়া করে সুশীলের সঙ্গে নিজের স্বাধীনতার চরম প্রশ্ন নিয়ে !

প্রতিবাদ ও সমালোচনা। দেশটা বিভক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে, সব আয়োজন প্রস্তুত। আংশিক আপসিক স্বাধীনতা, রক্তমাংস বাদ দিয়ে ছাড়ানো চামড়ায় খড়-কুটা-জঞ্জাল পোরা মেকি স্বাধীনতা। যে আইন চালু থাকলে চামড়া শুধরে না নেওয়া স্বাধীনতার মৃত প্রতিমূর্তি অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়, জ্যান্ত বাঘ পোষ মানাবার সাধ মেটার বদলে চামড়ার মরা বাঘে ঘর সাজিয়ে শখ মেটানো পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা।

এক সময় লাঠি ও গুলির কী ভয়ংকর আর্ত আঘাত যে নেমে আসে সভার উপর ! কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে যায় যে দেশটা সত্যই স্বাধীন হতে চলেছে !

অনেকের সঙ্গে আশাও জখম হয়। মুখে।

দেশটা স্বাধীন হব হব করছে বলেই বোধ হয় শুধু জখম হয় ! দেশটা স্বাধীন হয়ে গিয়ে থাকলে বোধ হয় খুন হয়ে যেত।

আশা ছাড়া প্রণবদের বাড়ির বাসিন্দা আরেকজন আহত হয়, গিরীন। আঘাত গুরুতর হয় গিরীন আর ভূষণের। গিরীনের লেগেছে মাথায়, ভূষণের বুকে। ভূষণের অবস্থাই হয সবচেয়ে মারাত্মক, কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের হস্তক্ষেপ ছাড়া তার বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না।

সেটা জুটে যায়।

এও একটা সমসাময়িক যোগাযোগের ফল। পাড়ার ডাক্তার অসীম চক্রবর্তী ডাক্তারি পাশ করে বিয়ে করে বাজারের কাছে ছোটো একটি ডিসপেনসারি দিয়ে আজ বছর সাতেক সব রকম গোলমাল থেকে গা বাঁচিয়ে শুধু পশার বাড়াবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ কবেছে। অনেক চেষ্টায় বছর খানেক আগে একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনেছে। সেই গাড়িতে বউকে শহবের অন্য প্রান্তে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে নিছক কৌতূহলের বশেই সভার পাশে থেমেছিল। গাড়িতে বসেই তারপর সে জমে গিয়েছিল বক্তৃতা শুনে। সে-ও যেন একটা রোগের রোগী, স্পেশালিস্টের বক্তৃতা শুনছে, রোগের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিধান।

হাঙ্গামা শুরু হতেই আতঙ্কে ইঞ্জিন চালু করে গিয়াবের হাতল ধরে সে থেমে যায়। হুস্ করে পালিয়ে যাবার সাধটা হুস্ করেই একান্ত লজ্জাকর হয়ে ওঠে তাব নিজের মরচে-ধরা বিবেকের কাছে। যতই হোক, সে তো ডাক্তার, কত জীবনেব কত রকমেব কত মৃত্যু সে দেখেছে, কত মৃত্যুকে ঠেকিয়েছে, কত মৃত্যু তার সুনিশ্চিত বিশ্বাস আর বিধানের পাশ কাটিয়ে তার রোগীকে গ্রাস করে তাকে পরাস্ত করেছে। প্রাণভয়ে সে পালাবে ? ছি !

দু-একটা প্রাণ হয়তো সে বাঁচাতে পারবে—হাসপাতালে পৌঁছানোর দেরিটুকুই যে প্রাণকে খতম করে দেবে।

গাড়িতে সে স্টার্ট দেয়,—পালাবার জন্য নয়, এখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বাখা সম্ভব ছিল না বলে কয়েক হাত তফাতে সরিয়ে নেবার জন্য।

বুক দুরদুর করে কিন্তু তবু সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে ডাক্তার হিসাবে তার কর্তব্য পালনের জন্য।

অসীম ডাক্তারই বাঁচায় ভূষণকে এবং সম্ভবত গিবীনকেও।

অসীমের প্রথমে সংযোগ ঘটে মণি ও আশার সঙ্গে।

আশাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে নিয়ে মণিকে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসতে দেখে কেবল একটি মুহূর্তই অসীম স্তম্ভিত হয়ে থাকে। মণি তার চেনা, রক্ত-ঢাকা মুখ দেখে আশাকে চিনতে পারা না গেলেও মেয়েটি কে সে অনুমান করে নিতে পারে। দিন দশেক আগে মাঝরাত্রে সুশীলেব কলিকের ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে মণির উগ্র মন্তব্য কলিক-ব্যথাতুর স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য হিসাবে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল অসীম ডাক্তারের কাছে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে মণি বলেছিল, বড়োলোক বন্ধুর মন রাখতে যা তা খেয়ে আসবে, শরীরে সয় না জেনেও মুখ ফুটে না বলার সাধ্য নেই। বড়োলোকের মন জোগাতে মরতে পারে।

আশা বলেছিল, আঃ ! মাঃ !

অসীমের কাছে কিশোরী মেয়েটির মুখখানা আশ্চর্য রকম কোমল ও সুন্দর মনে হযেছিল। অসীম ডাক্তারের বউ এ পাড়ায় সকলের চেয়ে ফরসা বলে খ্যাত। তার সুন্দরী বউয়ের চেয়ে মেঘলা রঙের এ মেয়েটি তার কাছে বেশি রূপসি ঠেকেছিল।

এদিকে আসুন, এদিকে !

মণি তাকে দেখতে পায়নি। ডাক শুনে থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। ডাক দিয়েই অসীম নেমে আসে।

মণি চিনতে পেরে বলে, ডাক্তারবাবু ? বাঁচা গেল। একবার দেখুন তো।

আশাকে গাড়িতে বসিয়ে এক হাতে এক খাবলা তুলো নিয়ে তার মুখের রক্ত মুছতে মুছতে অসীম অন্য হাতে তার নাড়ী ধরে। অসীম ডাক্তার মানুষ, জ্যান্ত মানুষের গায়ে ছুরি চালিয়ে কাটাকাটি করা তার অভ্যাস, তবু আশার জখমের রকম দেখে তার ভেতরটা একটু শিউরে ওঠে। আশার গোটা কয়েক দাঁত উড়ে গেছে, উপরের ঠোঁটটা চিরে ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে। বাঁ চোখটাও বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে জন্মের মতো।

হাসপাতালে নিতে হবে। ভয় পাবেন না।

না। আর দুজনকে একটু দেখতে হবে ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি। একেবারে ওদের নিয়ে হাসপাতালে যাব।

আশাকে গাড়িতে রেখে অসীমকে মণি, ভূষণ আর গিরীনের কাছে নিয়ে যায়। অসীমের হিসাব সার্থক হয়, সত্যই সে ভূষণের প্রাণ বাঁচায়। নইলে হাসপাতালে নিতে নিতে সে শেষ হয়ে যেত।

তিনজনকে হাসপাতালে রেখে অসীমের গাড়িতেই মণি, গোকুল আর নীলিমা বাড়ি ফেরে।

গাড়িতে মণি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে। সত্যই যেন পরম স্বস্তির নিশ্বাস।

গোকুল, সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম।

এরা তিনজন চুপ করে থাকে। অসীম গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। এরা কী কথাবার্তা বলে শোনার ঔৎসুক্যে তার প্রাণটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল।

তোমাদের বলিনি, আজ বলছি। না বলে পারব না। স্বামী-দেবতা বড়োলোক বন্ধুর চোরাকারবারের এজেন্ট হবেন, বন্ধু বাড়ি জুটিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, যাব না। স্বামী-দেবতা নোটিশ দ্যান, না গেলে ত্যাগ করবেন, বিয়ের গয়না দানসামগ্রী ছাড়া যা কিছু দান করেছেন সব বাজেয়াপ্ত করবেন।

এরা তিনজন চুপ করে থাকে। মণির খোঁপা আলগা হয়ে মুখে চুল এসে পড়েছিল, নীলিমা চুলের গোছাটা সরিয়ে দেয়। অসীম গাড়ির গতি আরও কমিয়ে দেয়।

আমি ভয় পেয়ে হার মানি। পায়ে ধরে দুটি দিনের শুধু সময় চেয়ে নিই। আজ বুঝতে পারছি, তোমরা কেন আমার চোরাবাজারে কেনা চাল খেতে চাওনি। তখন ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি।

এবার গোকুল ধীরে ধীরে বলে, আশাব প্রাণের কোনো ভয় নেই।

অসীম সায় দিয়ে বলে, নাঃ, সে ভয় নেই। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবে।

মণি বলে, মরবে কী বাঁচবে, আর তা ভাবি না। সভায় গিয়েছিল বলে হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দিলেই বা আমি করছি কী ? বাপের চোরাবাজারি পয়সার ভাত-কাপড় ছুঁতে না চেয়ে মেয়েটা নিজেই ন্যাংটো হয়ে উপোস করে মরে গেলেই বা করছি কী ? আমি আজ তোমার সুশীলদাকে নোটিশ দেব গোকুল, ভালো বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বজ্জাতি করার মতলব যদি না ছাড়ে, আমিই ওকে জন্মের মতো ত্যাগ করব।

গোকুল বলে, সাবাস!

মণি বলে, না, সাবাস বোলো না গোকুল। আমার মনে ভাবনা ঢুকেছে। তাই তো বলছিলাম, সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম। সারা দেশে রক্তপাতের মধ্যে তোমরা যে স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছ, তার মতো হয়ে যাবে না তো আমার স্বাধীনতা ?

আমাদের স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতা পৃথক ভাবছেন ? তাহলেই তো মুশকিল মণিদি !

কথাটা বলে নীলিমা। মণির মুখে আবার চুল এসে পড়েছিল, চুল সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে বিপর্যস্ত খোঁপার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে দিতে নীলিমা বলে, স্বাধীনতা পাচ্ছি কই ? দেশের লোক খেপে গেছে, তাই লোক-ঠকানো একটা কিছু পাচ্ছি। স্বামী ত্যাগ করেই কি স্বাধীনতা পাওয়া যায় মণিদি ?

স্বাধীনতা কি এতই সস্তা ঘরোয়া ব্যাপার ? তাহলে আব ভাবনা কী ছিল ? ডাইভোর্স মামলায় মানুষ স্বাধীন হয়ে যেত।

গোকুল কড়া সুরে বলে, দিদি, তুমি বাজে কথা বলছ। মণিবউদি ও কথা বলেননি। মণিবউদি অনেক উঁচু কথা বলেছেন।

তাই নাকি !

নিশ্চয। মণিবউদি বলছেন, ওব মনে খটকা লেগেছে, ত্যাগে কি স্বাধীনতা মেলে ? এটা অত সোজা কথা নয়। কতকাল ধবে এই ভাঁওতা চলছে দেশ জুড়ে, ত্যাগেই স্বাধীনতা, ত্যাগেই মানবতা। ত্যাগ আর তাঁতবোনা এ দেশেব মানুষেব চবম ধর্ম। শুধু মণি বউদির নয়, সারা দেশে লাখ লাখ মানুষেব মনে এই খটকা জেগেছে। ত্যাগ ত্যাগ কবেই তো আমাদের এই দশা। আমাদেব ত্যাগধর্ম দুশো বছর ব্রিটিশের ভোগধর্মের রসদ জুগিয়েছে। মণিদি ভাবছেন, সুশীলদাকে ত্যাগ করে আবার অন্যভাবে অন্যের সঙ্গে না আপস কবতে হয। তাই না মণিবউদি ?

খানিকটা তাই বইকী।

গোকুল জোর দিয়ে বলে, ভাববেন না। এ আপনাব ত্যাগ নয, জয় !

হাঙ্গামার খবর পেযে সুশীল ভযে ভাবনায দিশেহারার মতো ছটফট কবছিল। আশার খবর শুনে সে হাহাকাব করে ওঠে, আমাব সর্বনাশ হল !

পরক্ষণে প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষোভে সে আবার দিশে হারায। গর্জন কবে মণিকে বলে, সমস্ত তোমার বজ্জাতি। বজ্জাতদেব সঙ্গে মিলে—

কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি হয় না, মণি তাকে সে সুযোগ দেয না। সে-ও সমানে গর্জে ওঠে, সাবধানে কথা বলো বলছি। মেয়েমানুষ বলে অত অসহায় ভেব না। মান রেখে সমানভাবে কথা না বললে আমিও সইব না !

সুশীল ভড়কে যায়। মণির মুখ দেখে কড়া সুবে কথা বলাব সাহস আর তার হয না। তাব গলা নেমে আসে অনুযোগের সুরে।

আগেই বলিনি তোমাকে আমি, ও সব জায়গায যেতে নেই ? গেলেই এমনি বিপদ হয ?

হয কেন বিপদ ? মানুষ সভাও কবতে পাববে না, বিপদ হবে ! বিপদেব ভযে ভীবুর মতো হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে ঘরে বসে থাকবে ! আমার মেয়ের একার বিপদ হয়নি।

মেয়ে শুধু তোমার ? একলার ?

তোমারও মেয়ে। কিন্তু তোমার আমাব কারও সম্পত্তি নয়, সে-ও দশজনেরই একজন।

সুশীল গুম খেয়ে যায।

এ সব মণির কাপড় ছাড়ার আগে বোঝাপড়া, আশার রক্তে মাখামাখি কাপড়। মণি স্নান কবে কাপড় ছেড়ে এলে সুশীল মেঘাচ্ছন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করে, তোমাব মতলব কী ?

আমার মতলব ? বলছি। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।

পারবে না ?

মণি মাথা নাড়ে। —পারব না বলাই ভালো। যেতে পারি একটা কড়ারে, কিন্তু আমি জানি, তুমি তা মানবে না। তুমি যদি কথা দাও যতীন চক্রবর্তীর সংশ্রব ছেড়ে দেবে, টাকা রোজগারের যে সব ফন্দি করেছ বাতিল করবে, আর আমাদের নিজের মতে চলতে দেবে, তবে যেতে পারি।

সুশীলের ঠোঁটে ফোটে এক অস্বাভাবিক হাসি, চোখ জ্বল-জ্বল করে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, সৎপথে থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেভাবে পারি আমি টাকা রোজগার করব, তোমাদের

খাওয়াবো-পরাবো, তোমরা দয়া করে আমার বাড়িতে থেকে আমার রোজগারে খাবে-পরবে আর যা খুশি করে বেড়াবে। আমি কথাটি কইতে পারব না। তোমার কড়ারটি বেশ !

মণি শান্তকণ্ঠে বলে, তুমি ভুল বুঝলে। আমি শুধু এইটুকু কড়ার করছি, চোরাবাজারি গুন্ডা-দালালের বউ আমি হতে পারব না, মনুষ্যত্ব ভেস্তে যায় এমন হুকুম মানতে পারব না। ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি ছাড়া আমার রোজগারের ক্ষমতা নেই, আমি ঝিয়ের মতো রাঁধুনির মতোই খাটব তোমার সংসারে, স্বামীর মতোই তোমার সেবাযত্ন করব। অন্যায় হুকুম ছাড়া তোমার সব উচিত কথা শুনব। তোমার আমার মতে না মিলুক, তুমি যেমন আমার কথা বিবেচনা করবে, আমিও তেমনি তোমার কথা বিবেচনা করব।

সুশীল গম্ভীর মুখে ভাবনার ভান করে। বলে, ধরো, আমার কঠিন অসুখ। এখন যাই তখন যাই অবস্থা। এদিকে তোমাদের সভা হবে। আমায় একলা ফেলে রেখে তোমবা সভায় যাবে তো ?

মণির হাসি পেলেও হাসি চেপে সে মুখ গম্ভীর করে রাখে। বলে, না, সভায় যাব না। তোমার প্রাণটা বাঁচাবার জন্য যদি সভায় না যেতে হয়, যাব না।

বেশ। তোমার কড়ার মানলাম।

প্রাণটা খুশি হয় না মণির। একটা সভায় গিয়ে সন্তানের রক্তে শাড়ি রাঙিয়ে আসার পর আর ক-ঘণ্টা সময় কেটেছে ! সুশীলের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ, এর কোনো প্রতিকার নেই, কোনো দ্বিতীয় পথ নেই, এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েই সে বাড়ি ফিরেছিল। এ সিদ্ধান্ত বদল হতে পারে সে কল্পনাও করেনি। অথচ শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটা আপস-রফার মধ্যে সুশীলের সঙ্গে সম্পর্কটা তার বজায় রয়েই গেল। তার কথাই মেনে নিল সুশীল, তার যে কড়ার সুশীলের পক্ষে মানা একেবারে অসম্ভব জেনে রেখেছিল, সেই কড়ারটাই সে মেনে নিয়ে তাকে যেন হারিয়ে দিল।

অথচ, আজ প্রায় বিশ বছর যে মানুষটার সঙ্গে ঘরকন্না করে এসেছে, তার শর্ত মেনে নিয়ে তার সঙ্গে ঘরকন্না চালিয়ে যেতে রাজি হলেই বা সে কী করে বলে, তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব না !

জীবনে বিপ্লব যেন ভেস্তে গেল একটা আপসের জয়লাভে ! জীবনটার পুরানো দিনের গতানুগতিক দাসীত্বের জের টেনে চলা খতম করে দিয়ে একেবারে নতুন পথে চলার বিপ্লবী পরিকল্পনা যেন পরিণত হল নিছক চলার পথের দিক পরিবর্তনে !

ছাদে গিয়ে আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আধা-নির্জন পথ ও আধা-ঘুমন্ত বাড়িগুলির দিকে চেয়ে মণির চোখে জল আসে। সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক পথে চলতে চেয়ে নিজের কিশোরী মেয়ের রক্তে স্নান করে, সমস্ত সুখ-সুবিধা আরাম-বিলাসের আয়োজন বাতিল করে সমস্ত মানুষের অকারণ অর্থহীন দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাতে চেয়ে, কীভাবে যেন নিজের সংকীর্ণ কুৎসিত জীবনের হিসাব-নিকাশের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছে !

কথা দিলেও কাজে সুশীল তা পালন করতে পারবে না। এভাবে কখনও কারও স্বভাব বদলায়—কোণঠাসা হয়ে একজনের কাছে কথা দিয়েছে বলেই ! এতদিন এখানে বিপ্লবীদের সঙ্গে বসবাস করেও সুশীলের মন-প্রাণ রয়ে গেছে যতীনদের সঙ্গে ভিড়ে কিছু চুরি-চামারির পয়সা করার দিকে—উঁচুগাছের ডালে বসেও শকুনের দৃষ্টি যেমন আটক থাকে ভাগাড়ে।

গোকুলকে বোঝাতে হয় না। মণি নিজেই অনুভব করে। কিন্তু অনুভূতি কি মানুষকে মুক্তির পথ বাতলে দেয় !

ভূষণকে বারবার মনে পড়ে মণির। কারখানায় কালিঝুলি মাখা রুক্ষ কঠোর মূর্তি মানুষটার সোজা ও স্পষ্ট কথাগুলি কানে যেন ঝমঝম করে বাজে। মণির মনে হয়, গোকুলের বদলে ভূষণ বোধ হয় তাকে বলে দিতে পারত তার কী করা উচিত।

রাত বারোটার সময় সুধীন আর প্রণব ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে। সুধীন ছাদে গিয়ে ডাকে, মা !

মণি চমকে উঠে বলে, ওঃ ! চল, তোদের খেতে দি।

পরদিন সকালে দুজন মানুষ আসে এ বাড়িতে, মনসুর ও রশৌনা।

মনসুরের চেহারার কিছু উন্নতি হয়েছে। বোগা হয়ে গেছে রশৌনা।

সেই যে রশৌনা একদিন এসে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে গিয়েছিল, তারপর এ বাড়িতে তাব এই প্রথম পদার্পণ। বন্ধু হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মনসুবকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন কবতে চেষ্টা করার কথা যা সব শুনিয়ে গিয়েছিল, রশৌনা ভোলেনি।

নীলিমাকে সে প্রথম কথাই বলে, মাপ চাইতে এলাম ভাই।

নীলিমা বলে, না চাইলেও চলবে।

মনসুর বলে, গিরীন ?

নীলিমা বলে, বাঁচবেন, সময় নেবে। মাথাটা প্রায় আপনার মতোই ভেঙেছে। আপনি কেমন আছেন ?

আছি ভালোই। কিন্তু ভালো থাকাটাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে। দামি দামি খাদ্য চাই, আরাম চাই, নয় তো ভালো থাকার টাগ অব ওয়ারে রোগটা জিতে যাবে।

তারা বসে। মণি ও গোকুল এসে যোগ দেয়। নীলিমা আপশোশের আওয়াজ করে বলে, ব্যবস্থা হচ্ছে না কবি ? ভালো থাকার ?

মনসুর বলে, হচ্ছিল—আপসে। আর হচ্ছে না। একটা বোগের খাতিরে কাঁহাতক খুনে-বজ্জাতদের সাথে আপস করা যায় ?

মণি সাগ্রহে বলে, কী ব্যাপার ?

ব্যাপার শুনে সে কিছুই বলে না। সকলের বেলাতেই কী সেই এক প্রশ্ন—হয় মান দাও, নয় জান দাও ! এদের কথা সে শুনেছিল কিন্তু এদের সমস্যার কথাটা জানত না। শুধু শুনেছিল, গিরীনেব কবি-বন্ধু হার মেনেছে ; নিজেকে বেচে দিয়েছে।

আজ আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কবি নিজেকে বেচে দেয়নি, একটু বাস্তব পরীক্ষা করে দেখছিল যে কতটুকু সামযিক আপস করে একটা সামঞ্জস্য সম্ভব। কবি নিজেই সিদ্ধান্তে এসেছে, আপসের পথে হয় না, এ যুগে মাঝামাঝি পথ নেই, হয় এস্‌পাব নয় ওস্‌পাব। কবির পক্ষে একদিকে টি বি বোগে মৃত্যু সুনিশ্চিত হতে পারে কিন্তু অন্য দিকে রোগেব সঙ্গে লড়াই করার জন্যও দুদিন সুব নবম করে আপস করতে রাজি হওয়া সুনিশ্চিত জীবন্ত মৃত্যুকে বরণ করা।

সে কুৎসিত বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো !

মনসুর বলে, মরতে ভয় পেতাম। ক-মাস বুঝবার চেষ্টা করেছি মরণটা আসলে কী। বন্দুকের গুলি অগ্রাহ্য করে যে মজুর এগিয়ে যাচ্ছে তার কি একদম মরার ভয়টাই থাকে না ? অথবা ভয়টা সে জয় করে ? ব্যাপারটা খানিক বুঝতে পেরেছি। জীবনকে ভালোবাসি বলেই মরতে ভয় পাই, মরণ এড়াতে চেষ্টা করি। এ ভয় স্বাভাবিক। এই ভয়টাই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ভীষণ রকম বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, আমরা সাধারণ মানুষ যাতে মৃত্যুভয়ের গোলামি করি, দাম কষতে ভুল করি। নইলে রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে আমরা যা হই মরে গেলেও তাই হই—তফাত এই যে ঘুমোলে আবাব জীবন্ত হব, মরলে আর জাগব না।

মণি পলকহীন চোখে শুনছিল, সে বলে, তফাতটা কি সামান্য হল ?

মনসুর বলে, বাস্ রে, সামান্য ! সে কথাই তো বলছি। ঘুমটাও জীবনের অঙ্গ। না ঘুমোলে মানুষ বাঁচে না। ঘুমোতে আমরা ভয় পাই না। আরাম পাই। মরলে জীবন শেষ হয়ে যায়, তাই মরতে আমাদের ভয়। মানুষ মানেই তো জীবন, বিচিত্র জীবন।

মনসুর নাক ঝেড়ে পাটের সিল্কের রুমালে মুখ মুছে হাসে।—বাঁচতে চাই, মরতে চাই না। মরণে বাঁচার শেষ। জীবন হারাব, মরণকে ভয় করার এটাই তো তবে আসল কথা। মরলে জীবন শেষ হওয়ার বেশি আর তো কিছুই ঘটে না ? কিন্তু আমাদের মনে কৃত্রিম ভয়ংকর মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মরণ জীবন হারানোর চেয়ে ভীষণ ব্যাপার।

মনসুরের চোখ জ্বল-জ্বল করে। সকলে স্মিত মুখে চেয়ে থাকে তার দিকে। রশৌনা একটা পান আর অনেকটা জর্দা মুখে পুরে দেয়। গোকুল তার শেষ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলে।

মরে গেলে জীবনটা হারাবো, এটাই তো সাংঘাতিক ক্ষতি। এটা বুখতেই তো মরণপণ করে মানুষ চিরকাল লড়ছে। ব্যাটারা করেছে কী, মরে গেলে জীবনের আতঙ্ক বিকারের ভয়াবহ যন্ত্রণা থাকবে, এই ধারণা ছড়িয়েছে। মরলে শুধু জীবনটা শেষ হবে না, আরও বীভৎস অনেক কিছু ঘটবে। আসলে তা তো নয়। মরা মানে চিরন্তন ঘুম, স্বপ্নহীন ঘুম। মরে যাওয়ার পরে আর কিছুই থাকে না, মরা মানে বস্তুর যে বিশেষ সমন্বয় ঘটে একটা জীবন সৃষ্টি হয়েছিল সেই বস্তুগুলির আবার বস্তুর সঙ্গে মিশে যাওয়া।

মনসুর জোর দিয়ে বলে, বাঁচার জন্য লড়াই করব, মরণকে ভয় করব, ঠেকিয়ে রাখব। কিন্তু হিসাবটা কষব সব মানুষের মরণ-বাঁচন ধরে। আমার মরণটা ঠেকাতে যদি মানুষের বাঁচার চেষ্টায় সিঁদ কাটি, সবার বাঁচাকে ঘায়েল করে নিজে বাঁচার চেষ্টা করি, তবে আমার দশা হবে মরার বাড়া। জীবন হবে রোগীর বিকার। মানে, যে জীবন শেষ হবে বলে মরণকে ভয় করছি, সেই জীবনটাই হবে পচাগলা জীবনের ব্যভিচার—ওটা জীবন নয়, জীবনের শত্রুতা। জীবনকে ভালোবাসার জন্যই এ ক্ষেত্রে মিথ্যা কুৎসিত বেঁচে থাকার ওপর ঘৃণা মৃত্যুভয়কে ছাপিয়ে উঠবে।

মণি আপশোশের সুরে বলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া—

মনসুর মাথা উঁচু করে সতেজে বলে, হাল ছেড়ে দেওয়া ? এভাবেই তো হাল ধরা যায় ! এ শালার রোগকে আমি ছেড়ে কথা কইব ? আরও জোরের সঙ্গে লড়ব, আরও লড়ায়ে কায়দায় প্রাণপণে মরণকে ঠেকাব। তাতে যদি ছ-মাস বাঁচি, ক্ষতি নেই। ছ-টা মাস তো মানুষের খাঁটি জীবন ভোগ করব। রোগের খাতিরে দশ-বিশবছর বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করলে শত্রুর গোলাম বনলে শুধু বেঁচেই থাকব, মানুষের মতো বাঁচা হবে না।

মণি চেয়ে থাকে রশৌনার মুখের দিকে। মুখে তার আপশোশের ছাপ নেই, জীবনের লাভক্ষতির হিসাব দুজনের যেন এক হয়ে গেছে। তা তো হবেই। নিজের স্বার্থ ধরে তো এ হিসাব নয় !

আরেকটু বেলা বাড়লে তারা হাসপাতালে খবর নিতে যায়।

হাসপাতাল থেকে আগে ফিরে আসে আশা। কয়েক দিন পরে তার মুখের ব্যান্ডেজ খোলা হয়।

একনজর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মণি চোখ বোজে।

শুনতে পায়, আশা বলছে, আমায় একটা আয়না এনে দেবে গোকুলদা ?

মণি জানালায় সরে গিয়ে তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

প্রতি মুহূর্তে সে প্রতীক্ষা করে মেয়ের মুখে আর্তনাদ শোনার জন্য—আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়েই যে আর্তনাদ ধ্বনিত হবে আশার মুখে। এই মুখ নিয়ে কি বাঁচতে পারবে আশা ? আত্মঘাতিনী হবে না ? তা এর চেয়ে হাসপাতালে মরে গেলেই বোধ হয় চুকে যেত।

খানিক পরে আশার গলায় আর্তধ্বনির বদলে শান্ত কথাই শোনে, বা রে বা, বেশ সুন্দর হয়েছে তো মুখখানা !

গোকুলের কথা শোনে, সত্যি সুন্দর হয়েছে আশা। সুন্দর মুখ দেখে লোকের শুধু আনন্দ হয়, তোমার মুখ দেখে আমাদের আনন্দ হবে, গর্ব হবে। যতবার দেখব !

মণি ফিরে দাঁড়ায়।

গোকুল এক হাতে আশার একটি হাত ধরেছে, অন্য হাত জড়িয়েছে তার কাঁধে। ডান হাতে আশা আয়নাটা উঁচু করে ধরে চেয়ে আছে। আয়নার মধ্যে বোধ হয় সে গোকুলের মুখও দেখতে পাচ্ছে।

মণি আশ্চর্য হয়ে যায়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা যে কতভাবে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিতে পারে। মা হয়ে যে মেয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না, বিনা ভূমিকায় বিনা দ্বিধায় সকলের সামনে এমনভাবে গোকুল তাকে বুকে টেনে নিয়েছে যে সেটা হয়ে উঠেছে একটা স্পষ্ট ঘোষণার মতো !

মণি ভাবে, আমি কী স্বাধীন হলাম ? আমার দাসীত্ব ঘুচল ? কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা ! এ কেমন মুক্তি ক্রীতদাসীর !

দুদিন যেতে না যেতে সে টের পেতে থাকে, অত সহজ নয় স্বাধীনতা লাভ, অত সস্তা নয় মুক্তি। সব বজায় রইল, আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অবস্থা বদল হল না দশজনের, একজন শুধু তার নিজের স্বামীটির সঙ্গে ঘরোয়া খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্ত স্বাধীন নতুন জীবন আয়ত্তে এনে ফেলল—একটা ছেলেমানুষি চিন্তা।

গোকুল যেমন বলে, বিদেশি বড়োলাট দেশে ফিরে গেছে বলেই কি স্বাধীন হয়ে গেছে দেশটা ? আর কিছু না পালটালেও ? কৃত্রিম দেশ বিভাগ থেকে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলেও ? আরেকটা সর্বনাশা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র বিষবৃক্ষের চারার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করলেও ?

নিজের এতকালের আঁটঘাট-বাঁধা সাজানো-গোছানো অভ্যস্ত জীবন ওলট-পালট করে দিয়েছে—একটা আদর্শের জন্য। সুখের সংসারের ভিত্তিটাই ভেঙে ফেলেছে। সব দিক দিয়ে জীবন এবার নতুন করে গড়তে হবে, এখন শুরু হল অনেক দিকে অনেক রকমের নতুন সংগ্রাম। এ জন্য দুর্বল মুহূর্তে, অতীত জীবনের মোহে কাবু থাকার অবস্থায়, মণির কিছু কিছু আপশোশ জাগে বইকী। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। সাধারণ মানুষের ও রকম হয়েই থাকে। মণির এই আপশোশের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই এই জন্য যে নত হয়ে আপসের চিন্তা তাতে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় না।

মুখোমুখি লড়াইটা চরমে উঠেছিল, সুশীল চলে যাবার পর ধীর-স্থিরভাবে সবকিছু পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয় স্তরে নেমে আসে আবেগ উত্তেজনা, সমস্তটুকু মনের জোর প্রয়োগ করে জয়লাভের পর জয়টা কী ও কেমন হয়েছে, হিসাব না করে উপায় থাকে না।

সুশীলকে এত তীব্রভাবে ঘৃণা করা কী করে তার পক্ষে সম্ভব হল ? বিশ বছর যার সোহাগে-আদরে খুশি থেকে হাসিমুখে ঘর-সংসার করেছে, মা হয়েছে সন্তানের ?

এখানে এসে মুক্ত স্বাধীন বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়ে টের পেয়ে গিয়েছে বলে যে খুশি থেকে হাসিমুখে করে এলেও আসলে সে দাসীত্বই করে এসেছে, সোহাগ-আদরটা ছিল তাকে ভুলিয়ে রাখার বকশিশ ? অর্থাৎ সোজা কথায় সে কি তার স্বামীকে ঘৃণা ও বর্জন করেছে শুধু এই জন্য যে আরও লাখ লাখ স্বামীস্ত্রীর মতো তাদেরও সম্পর্ক ছিল আদর-সোহাগের প্রলেপ মাখানো প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক ? কোটি কোটি স্ত্রী যে সম্পর্ক মেনে চলেছে আজও, এখানে এসে সে এমনই এক মহামানবীতে পরিণত হয়ে গেছে যে সে সম্পর্কটা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হল না ?

সুশীল যেদিন চলে যায় সমস্ত রাত্রি এই চিন্তাই মণিকে উতলা করে রেখেছিল।

তারপর দু-চারদিনের মধ্যে সে যখন টের পেতে আরম্ভ করে যে ব্যক্তিগত ঘরোয়া যুদ্ধে এত বড়ো জয়লাভ করেও সে জগৎটাকে কণামাত্র বদলাতে পারেনি, তার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দেওয়ার মতো ত্যাগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি, শুধু তার নিজের মানুষ হিসাবে বাঁচার প্রয়োজনেই দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মরিয়া হয়ে এই জয়লাভ করা তার দরকার ছিল, তখন ধীরে ধীরে আসল কথাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

না, সোহাগ-আদরের ভন্ডামি-ভরা স্বামীর প্রভুত্ব টের পাওয়া তার বিশ বছরের আনুগত্য ঘুচে যাবার একমাত্র বা আসল কারণ নয়। সত্য কথা বলতে কী, তাদের বিশ বছরের সাধারণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেনি, সুশীলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না ! ওই একপেশে কৃত্রিম স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়ায়ে অংশ নেবার যে অধিকার দেশের মেয়ে-পুরুষ ছোটো-বড়ো-নিচু প্রত্যেকটি মানুষের আছে, নিজের সেই অধিকারটুকু সে খাটাতে চেয়েছিল।

সুশীলের সঙ্গে তার লড়াইটাও আসলে তাই।

সুশীল প্রভু আর সে দাসী বলে নয়, দাম্পত্য জীবনে তাদের অনেক মিথ্যা আর অনেক ফাঁকি ছিল বলে নয়,—এখানে এসে শুধু এই দিকটাই তার কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনি, অসহ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে এসে জীবনের আরও একটা সত্যও বড়ো হয়ে উঠেছে তার কাছে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য যার যেটুকু সাধ্য না করলে সে মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়, প্রকারান্তরে পোষা পশুর মতোই মেনে নেওয়া হয় বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব, যার যেটুকু লড়াই সেটুকু যদি সে না করে !

সুশীল তাকে এই লড়াইটুকু করতে দিতে চায়নি, স্বাধীনতার সংগ্রামে সামান্য অংশটুকু না নিলে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকে না যখন জেনে গেছে, তখন সুশীল তাব এই অংশ নেবার জন্মগত অধিকার মানতে চায়নি !

এটাই তার ঘৃণা ও বিক্ষোভকে প্রচণ্ড করে তুলেছে। এই একটি দিকে স্বামিত্বের জোবে তাকে আটকাতে চেয়ে সব দিক দিয়ে স্বামিত্বকে সুশীল তার কাছে অসহনীয় করে তুলেছে। নইলে ভয়ানক মতবিরোধ আর প্রচণ্ড কলহ আগে কি তাদের আর হয়নি ? কিন্তু অল্পেই মিটে গেছে সে সব ঝগড়া ! কারণ, কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার লড়াই আর সে লড়াইয়ে নিজের অংশটুকু গ্রহণ করে মনুষ্যত্ব বজায় রাখার প্রশ্ন উঁকিও মারেনি তাদের কলহে, চরম বিচ্ছেদ ঘটে যাবার মতো আপস-হীনতার চরম পর্যায়ে উঠে যায়নি তাদের ঘরোয়া যুদ্ধ।

মণির মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছিল। সে লক্ষ করছিল, ছেলেমেয়েরাও বেশ ঘাবড়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের ম্লান বিষণ্ণ মুখ আর স্তিমিত নিস্তেজ ভাবটাই তাকে পীড়ন করছিল সবচেয়ে বেশি।

সুশীলের সঙ্গে তার সংঘাতের আসল মর্ম বুঝতে পেরে তার স্বস্তি ফিরে আসে, মুখের কালো ছায়া মিলিয়ে যায়। নিজের ভুল-ত্রুটি আর দুর্বলতার হিসাব-নিকাশটাও এবার সে করতে পারে। সবচেয়ে বড়ো দোষ তার হয়েছে—কাণ্ডজ্ঞান হারানো। এটা নিছক তাদের দাম্পত্য-কলহ নয়, আদর্শের লড়াইও বটে, অথচ ক্রোধে ঘৃণায় দিশে হারিয়ে সুশীলকে সে শুধু আঘাতই করেছে, দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার সামনে আদর্শকে তুলে ধরেনি, স্নেহ আর উদারতা দিয়ে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেনি, পক্ষে রাখতে চায়নি। সে চেষ্টা করলে চোরকারবারি বন্ধুর উসকানিতেও সুশীল হয়তো এতটা বিগড়ে যেত না।

সুশীল আদালতে নালিশ করার পর এই কথাটা আরও বেশি করে তার মনে হয়েছে। সুশীল এভাবে সোজাসুজি মামলা করতে পারে প্রতিহিংসার জ্বালায়, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না।

প্রণব বলে, পিছনে তো আছে আরেকজন, তাকে ভুলো না। খবর পেয়েছি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে দাদা যতীনের কারবারে ঢেলেছে। জমিটা বেচেছে, আপিস থেকে যতটা পারে লোন নিয়েছে—

আমার তোলা গয়নাগুলিও নিয়ে গেছে। লাখপতি হবার এ ভূত কেন ঘাড়ে চাপল ঠাকুরপো ?

লাখপতি ভূত ঘাড়ে চেপেছে যে ! ছেলেবেলা দেখেছি, দাদার ওই একটি সত্যিকারের বন্ধু ছিল। বন্ধু ঠিক নয়, নেতা। যতীন যা বলে, যতীন যা করায়, তাই সই। এতকাল পরে আবার তার পাল্লায় পড়েছে। অনেক সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল তো, সেগুলি মেটেনি। যতীন আজ ভরসা দিয়েছে সে সব স্বপ্ন সফল করে দেবে, জীবনটা সার্থক করে দেবে। দশ কাঠা জমি দিয়ে কী হবে, একতলা কি দোতলা একটা ইঁটের কুঁড়ে তৈরি করার বেশি যদি সাধ্য না হয় ? যতীনের মতো পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছাড়া বেঁচে সুখ কী ?

মণি অধীর হয়ে বলে, তা তো বুঝলাম ঠাকুরপো, হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। অত ব্যাখ্যা কোরো না। কিন্তু বড়োলোক বন্ধু বড়োলোক করে দেবে বলে সংসার ছেলেমেয়ে ভেসে যায় ?

ভেসে গেল কোথায় ? তাহলে কি নালিশ করে ?

মণির যেন চমক ভাঙে। তাই বটে, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব, পৈত্রিক বাড়ির অংশ,—এ সবই তো সুশীলের নালিশ। মণি সুশীলকে জানে, আইন-আদালত পুলিশের সাহায্যে স্ত্রী-পুত্র আর সুখী দাম্পত্য জীবন পাওয়া যায়, এটা বিশ্বাস করার মতো ছেলেমানুষ সুশীল নয়, কোনো কোনো দিকে বুদ্ধি তার যতই কম হোক। এ শুধু একটা চাল, বাঁকাভাবে চাপ দেওয়া—আপসের জন্য। আদালতের সমনটা আসলে সুশীলের বাঁকা ঘোষণা,—এখনও মিটমাট করো, আমায় মেনে নাও, নইলে আদালতে প্রকাশ্যভাবে কুৎসিত অপমান মানতে হবে, খবরের কাগজে কেচ্ছা বার হবে।

কিন্তু সুশীলের কি মান-অপমান জ্ঞান নেই ? সে কি জানে না তার স্ত্রী-পুত্রের অপমানে, পিতৃপুরুষ আত্মীয়স্বজন ভাইদের অপমানে তার নিজেরও অপমান ?

প্রশ্ন শুনে প্রণব মুখ বাঁকায়। বলে, তাই তো শুধু দাবির নালিশ করেছে। একটা আমগাছ নিয়ে এ রকম মামলা করা চলে। তোমার আমার অপমান গায়ে লাগবে বলেই নিজের মান বাঁচিয়ে নালিশ করেছে। নইলে—

নইলে ?

প্রণবের মুখ দেখে মণির ভয় করে !

নইলে নালিশটা যত দূর পারে বীভৎস, কুৎসিত করে তুলত। নিজের লজ্জা অপমান গ্রাহ্য করত না, যেভাবে হোক আমাদের অপদস্থ করতে পারলেই হল। আমাদের সঙ্গে তোমার খারাপ সম্পর্ক, তোমাদের আটকে রেখে ভোগ-দখল করছি, তোমাকে দিয়ে আশাকে দিয়ে ব্যাবসা করছি—

ছি ! ছি !

মণি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

কেন মণিবউদি ? মূর্ছা যেতে বসলে কেন ? খবরের কাগজে কি এ রকম মামলার বিবরণ পড় না ? আজকের কয়েকটা কাগজেই আছে—নামকরা কাগজ, অনেক বিক্রি। একটার প্রথম পাতার চার-পাচকলম জুড়ে স্বাধীনতা আসছে, তার পাশে দু-কলম জুড়ে মামলার খবর। একজন শিক্ষিত পদস্থ লোক তার স্ত্রী আর শ্বশুর-শালাদের নামে—

থাক, আর শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে ছাড়ছে কে মণিবউদি ? দাদা যে পথ ধরছে সেটা বড়ো পিছল। আজ এইটুকু পেরেছে, দুদিন পরে চরম নালিশের সমন আসবে না—এটা ধরে নিয়ো না।

মণির মুখ দেখে প্রণব ভরসা দিয়ে বলে, তবে পথটা পিছল বলে সবাই যে গড়িয়ে যায়, তা নয়। মানুষ তো—সামলে চলার ঝোঁকটাই স্বাভাবিক। আমি শুধু বললাম যে অসম্ভব নয়, এইমাত্র। কাজেই ভড়কে যেয়ো না।

মণির কথা শুনে বোঝা যায় ভরসা তার দরকার ছিল না। সে মাথা নেড়ে বলে, না ঠাকুরপো, আমি বিশ্বাস করি না। অতটা নামা তোমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি কেবল দাদাকে দেখছ। আমি দেখছি পিছনে দাদার বন্ধুটিকে। শনির চেয়েও সাংঘাতিক ভূত ঘাড়ে চেপেছে, এ সব নালিশ-টালিশ সব তার বুদ্ধি-পরামর্শ।

এ আরেকটা দিক, মণির কাছে যার তাৎপর্য ঠিকমতো ধরা পড়েনি। যার কথায় তাদের বরবাদ করে দিয়ে যথাসর্বস্ব চোরাকারবারে ঢালতে পেরেছে, সুশীল যে তার কতখানি বশংবদ সেটা ক্রমে ক্রমে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এ কথাও তার মনে হয় যে শুধু ওই লোকটার জন্য সুশীল এভাবে বিগড়ে গেছে। ওর সংস্পর্শে না এলে সুশীল হয়তো তাদের পথেই ঝুঁকত, অন্য দিকে যেত তার মনের গতি।

কথাটা ভেবে তাই তার আপশোশ বেড়ে যায় যে শুধু সুশীলের সঙ্গেই সে লড়াই করেছে, শুধু সুশীলকে আঘাত করেছে, পিছন থেকে সুশীলকে গ্রাস করছে যে শয়তানটা তার বিরোধিতা করার কথাটা মনেও আসেনি। ওর কবল থেকে স্বামীকে বাঁচাবার লড়াই যদি সে একটু করত !

মণি প্রশ্ন করে, আমরা এবার কী করব ?

প্রণব বলে, সব দাবি-দাওয়া মেনে নেব। বলব যে নালিশ মিথ্যা, তার কোনো অধিকার কেউ অস্বীকার করেনি। তিনি আসুন, স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হোন, বাড়ির অংশ দখল করুন।

শেষকালে হার মানব !

হার মানবে ? হার কীসের ?

আমায় তো কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে ?

প্রণব হাসে, যার যাবার ইচ্ছা নেই, কেউ তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে ? যে পথে চলতে চায় না সে পথে চালাতে পারে ? সৈন্য-পুলিশের সাঁড়াশি দিয়ে কান টানলেও কানটা হয়তো ছিঁড়ে যায়, প্রাণটা হয়তো বেরিয়ে যায়, কিন্তু মানুষটা যায় না বউদি"!

কিন্তু আমি যে দাবি মেনে নিচ্ছি—

কী দাবি মেনে নিচ্ছ ? কান ধরে টানলে সঙ্গে যাবার দাবি ? যা হুকুম করবে তাই তুমি করে যাবে, এই দাবি ? যন্ত্রের মতো চিন্তা করার স্বভাবটা ছাড়ো তো মণিবউদি ! নইলে এ রকম সস্তা চালে ভড়কেই যাবে শুধু, কিছু করতে পারবে না।

প্রণব একটু থামে, শান্ত স্পষ্ট কথাগুলিতে জোর দিয়ে বলে, যে দাবির সমন এসেছে, তার একটাও তুমি অস্বীকার করনি। এ সব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া নয়। আইন-সঙ্গত কেন, তুমি সমাজ-সঙ্গত স্ত্রী, এই সোজা সত্যটা কেন অস্বীকার করতে যাবে ? নাবালক ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব তার বাপের, এটাই বা মানবে না কেন ? স্ত্রী বলেই স্বামীর হুকুমে তুমি গলায় দড়ি দেবে কী দেবে না, সে হল আলাদা কথা। বাপ চুরি করতে বললে নাবালক ছেলেমেয়ে চুরি করবে কী করবে না, সেটা আলাদা কথা। আইন-আদালতের সাধ্য আছে এখানে নাক গলায় ?

কিন্তু—

তোমার কিন্তু বুঝেছি। স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী বড়ো জোর ভাতকাপড় দেওয়া বন্ধ করবে—ওটাই তো আসল সম্পর্ক। ছেলেমেয়ে অবাধ্য হলে বড়ো জোর তাদের ত্যাজ্য করবে—খেতে পরতে দেবে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব দেবে না।

এবার ব্যাপার বুঝে মণি কথা বলার বদলে কৌটো খুলে একটা পান মুখে দেয়। বাসি পান, কালকের সাজা। আদালতের মারফত স্বামীর সমন পাবার পর পান খেতেও তার সাধ যায়নি !

গোকুল এসে জুটেছিল, এতক্ষণ একটি কথা কয়নি। বলতে হলে গোকুলও কী কম কথা কয় ! অথচ চুপ করে থাকার অসাধ্য সাধনাও এই বয়সে সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এতক্ষণে গোকুল বলে, আমায় একটা পান দিন। সর্দি-জ্বরে মুখটা বিশ্রী লাগছে।

ওমা, সর্দি-জ্বর নাকি তোমার ? ঠান্ডা লাগিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?

ঠান্ডা লাগাইনি। কড়া জোলাপ খেয়ে শোব, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার কল্পনা কী ছিল, আর আজ মেয়ের কী পাত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে ! পার্থক্যটা বাস্তবতার কঠোর স্পষ্টতা নিয়ে মনে ভেসে আসে মণির। রূপসি মেয়ে ছিল, কুরূপা বিক্ষতা হয়ে গেছে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ের বাজারে তার দাম গেছে শূন্যের কাছে নেবে। নতুন জীবন গড়ার কাজে রত এই সুস্থ সমর্থ বুদ্ধিমান প্রতিভাবান তরুণ মনুষ্যত্বের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই মেয়ে।

এ তার ঝোঁক নয়, গোঁয়াবতুমি নয়। এটুকু জেনেছে মণি। সে জানত, ছেলের মতো তার মেয়েও শুধু ভক্ত হয়ে উঠেছে গোকুলের—এবং তার মেয়ে বলে গোকুল শুধু একটু স্নেহ করে আশাকে। ছেলেমানুষি এত কম গোকুলের যে মুখের ব্যান্ডেজ খোলার পর সকলের চেয়ে বড়ো আশ্বাস ও আশ্রয় দেবার মতো আশাকে অনায়াসে গোকুলের বুকে টেনে নিতে দেখার আগে সেই স্নেহের স্বরূপ সে আঁচও করেনি।

গোকুলের জন্যই নিজের মুখের কুরূপ বীভৎসতাকে সেদিন অতটা সহজে সইতে পেরেছিল আশা।

নগদ টাকা গয়না-গাঁটি দানসামগ্রী সমেত সুন্দরী মেয়েটিকে ভালো একটি ছেলের হাতে সঁপে দেবার দুশ্চিন্তায় কত কাতর ছিল সে আর সুশীল ! মেয়ের আজ রূপ নেই, চাকুরে বাপও নেই !

সুশীল চলে যাবার পর একটা আতঙ্ক জেগেছিল মণির—গোকুল হয়তো পিছিয়ে যাবে। তার মনে সত্যিই একটু খটকা ছিল যে, মেয়েটা কুৎসিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে ভালোবাসা বোধ হয় কাঁচা-বয়সি ছেলেটার প্রথম প্রেমের মহৎ ঝোঁক। কিন্তু কুৎসিত হওয়ার উপর মেয়েটার দীনহীনা হওয়ার চোট কি সইবে এ প্রেমের ?

দুদিন গোকুলের রকমসকম দেখে মণি লজ্জার সঙ্গে নিজের কাছে স্বীকার করেছে যে সারা জীবন ক্ষুদ্রতা আর হীনতাকে বড়ো করে দেখে তার নজরটা ছোটো হয়ে গেছে, চিনেও সে মানুষ চিনতে দ্বিধা করে !

দেশ ভাগ হয়ে যাবে, দেশের দুটো টুকরোয় প্রত্যক্ষ শাসনের সুযোগ পাবে কংগ্রেস ও লিগের প্রধানেরা। সময় ঘনিয়ে এসেছে। জল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনার জোয়ার এসেছিল—প্রায় তা বন্যায় পরিণত হয়েছে। আশা-প্রত্যাশা আনন্দ-বেদনা প্রীতিবোধ হতাশা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ ঘৃণার পাশাপাশি মেশামেশির কী উলঙ্গ উত্তাল রূপ !

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝিমিয়ে গিয়ে রূপ নিয়েছে ওলট-পালটের।

কী ওলট-পালট ! ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে দিন দিন মারাত্মক বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। অশান্তি উদ্‌বেগ ঝঞ্ঝাট আর প্রাণশক্তির ক্ষয় ও সম্পদের লোকসান—এ সবের সীমা-পরিসীমা থাকছে না।

বিশেষত যাদের ছড়ানো স্বাভাবিক জীবন স্থানে ও স্তানে ভাগ হয়ে যেতে বসেছে।

মুখ ম্লান হয়ে গেছে স্থান ও স্তানের হিন্দু ও মুসলমানের। যে মারাত্মক আত্মহননের মধ্যে জন্মেছে স্থান ও স্তান, কে জানে এই ভাগাভাগিতেই তার ইতি কি না ?

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা ঘরবাড়ি ফেলে পালিয়েছিল ভারাক্রান্ত বুক ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক প্রাণে নিয়ে, ধীরে ধীরে তাদের ফিরে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বস্তিবাসী অনেকের ফিরে যাবার বালাই নেই, ঘর পুড়ে গেছে কিংবা যথাসর্বস্ব লুঠ হয়েছে। অনেকে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেছে বা করছে। অথবা করার কথা ভাবছে।

এ পাড়ার বস্তির পোড়া ঘরগুলি তেমনি পড়ে আছে, আধপোড়া বাঁশ আর দরজার কাঠ কিছু সাফ হয়েছে হাতে-হাতে। বুড়ি নানির মরণ থেকে যে হাঙ্গামার শুরু তার ধাক্কায় এ ছোটো বস্তির মানুষগুলি কাছের বড়ো বস্তিতে চলে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তাদের দু-চারজনের চেনামুখ এ পাড়ার পথেও দেখা যায়।

উষার নিরীহ গোবেচারি স্বামী ক্ষীণকণ্ঠে বাড়ি ফিরে যাবার কথা বলে। নিজেদের বাড়ি, কত খরচ করে কত কষ্টে তৈরি করা বাড়ি !

বলে, বাঁচলাম। এবার নিজের বাড়ি ফেরা যাবে। আমি তো ভেবেছিলাম, বাড়িটা আমার জন্মের মতো গেল।

উষা বলে, না বাবা, আমার কাজ নেই নিজের বাড়িতে গিয়ে। ও বাড়ি তুমি বেচে দাও।

এখানে, মানে কলকাতায় আর ভয় কি আছে ? কলকাতা তো হিন্দুস্থানে হল ?

ও সব বুঝিনে আমি ! আমি যাব না।

উষার একটা অন্ধ বিদ্বেষ আর আতঙ্ক জন্মে গেছে সাধারণ অনির্দিষ্ট একদল মানুষের বিরুদ্ধে, যারা তার কাছে মুসলমান। উঠতে বসতে সে মুসলমানদের গাল দেয়। রক্তমাংসের জীবন্ত মুসলমান দেখে কিন্তু সে এতটুকু ঘৃণা রাগ বা ভয় অনুভব করে না। কাল্লু, কাসেমরা প্রণবদের কাছে আসা-যাওয়া করে, দরকার হলে উষাই দরজা খুলে তাদের ছাদে নিয়ে যায়, চা খেতে দেয়—কথাবার্তা শোনে ! মনসুর আর রশৌনার সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব হয়েছে। ওরা ধৈর্য ধরে তার একঘেয়ে সুখ-দুঃখের কাহিনি শোনে বলে, বাড়ির লোকের চেয়ে ওদের কাছে নিজের কথা বলতে সে বেশি ভালোবাসে। বলতে বলতে মুসলমানদের গাল দিয়েও বসে !

মনসুর মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। রশৌনা মৃদু হেসে বলে, আমরাও কিন্তু মুসলমান !

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ! আপনাদের কিছু বলিনি !

মনসুর বলে, সেটা না বলতেই বুঝেছি। কাদের বলছেন ঠিক জানেন না, তারা শুধু মুসলমান। মুসলমান হয়েও তারা যে বহুকাল ধরে সাধারণ গরিব মুসলমানের ঘাড় ভাঙছে, মুসলমানেরাই সবে সেটা টের পেতে আরম্ভ করেছে, আপনার দোষ কী।

উষা বলে, ঠিক মুসলমানদের উপর নয়। কী জানেন, আমার রাগটা হল গিয়ে—

সে কথা খুঁজে পায় না।

রশৌনা বলে, আপনার কথা বুঝেছি ভাই।

কেবল নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতেই নয়, ছাদে নানা সমস্যা নিয়ে সকলের আলোচনা শুনতে শুনতেও গরম হয়ে উষা গাল দিয়ে বসে, মনসুর রশৌনা কাল্লু কাসেমদের সামনেই।

প্রণব গোকুলদের খোঁচা দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে উষা বলে, তোমরা বিপ্লবী না হাতি ! ওদের জিততে দিলে, তোমরা আর কথা বলো না।

প্রণব বলে, কাদের জিততে দিলাম ?

কাদের আবার, যাদের জন্য আমার আজ এই দশা ! নিজের ঘরবাড়ি থাকতে চোরের মতো এখানে পালিয়ে রয়েছি। বলতে বলতে গরম হয়ে উষা অভিশাপ দেয় !

তার গোবেচারি স্বামী বিব্রত হয়ে বলে, আহা, চুপ করো না !

মনসুর নির্বিকার হয়ে থাকে, রশৌনার মুখখানা একটু ম্লান দেখায়।

প্রণব সোজাসুজি বলে, এরাও মুসলমান কিন্তু উষা।

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ছি ! ওদের কিছু বলিনি !

কাসেম বলে, আপনার বলতে হবে না, সেটা জানি ! কাদের গাল দিচ্ছেন আপনি জানেন না। ঠিক কথা—কজন সেটা ঠিকমতো জানে ? যারা এত অশান্তি হাঙ্গামা ঘটিয়েছে তাদের আপনি গাল দিচ্ছেন। একটা নাম দিতে হয় তাই একটা নাম দিয়ে দিয়েছেন।

গোকুল বলে, তা নয় হল। কিন্তু সবাই তো অত তলিয়ে বুঝবে না ? গালাগালিটা বন্ধ কর না উষাদি ? এটাই চেয়েছে ব্রিটিশ—সাধারণ লোক অবুঝের মতো যত গালাগালি করবে ততই ভালো।

রশৌনা সখেদে বলে, সত্যি, ভাবলেও বুক জ্বলে যায়। রাজনীতি নয় না বুঝল, এই সোজা কথাটা সাধারণ মানুষ বোঝে না ? হিন্দু-মুসলমান লড়তে হয়, ভিন্ন রাষ্ট্র দরকার হয়, পরেই নয় লড়ব, ব্রিটিশরাজ ঘাড়ে চেপে আছে, ওটাকে আগে খতম করি !

গোকুল মৃদু হেসে বলে, সাধারণ মানুষকে অত বোকা ভেবো না ছোটোমাসি। সোজা কথা যদি না বুঝত, সহজে ভোলানো যেত, এত বড়ো বিরাট ভাঁওতার দরকার হত না। ব্রিটিশরাজকে খতম করেছি জেনেছে বলেই ঘর ভাগাভাগিব লড়াইটা তারা ঘটতে দিয়েছে। ওটাই তো মোক্ষম চাল ব্রিটিশের। ব্রিটিশরাজ ঘোষণা করেছে, এবার আমি খতম হয়েছি, তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে এবার পালাতে পারলে বাঁচি—কিন্তু যাবার আগে এসো তোমাদের দু-ভায়ের বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। দুশো বছরের বাপ আমি, দুশো বছর ধরে কত কষ্টে কত যত্নে লালন-পালন করে তোমাদের সাবালক করলাম, আমি চলে গেলে তোমরা মারামারি করে মরবে, সাগরপারে গিয়েও সেটা কী করে সইব বলো ?

মণি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গোকুলের ঘৃণায় বিকৃত মুখের দিকে। গুরুজন হলেও ক্রমে ক্রমে সে প্রায় ভক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোকুলের।

গোকুল তপ্ত নিশ্বাস ফেলে। আবার বলে, সত্যি সত্যি এবার স্বাধীনতা পেয়ে যাচ্ছি বিশ্বাস জন্মাতে না পারলে কারও সাধ্য ছিল এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় ?

সরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে, ঘটনাচক্রে এমন যোগাযোগ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতার জন্মের সঙ্গে তার সন্তানও জন্ম নিয়ে বসবে। মাঝখানে কাবু হয়ে পড়েছিল, আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, একটা অদ্ভুত বেপরোয়া সাহস এসেছে তার।

হাসপাতালে মরলে গিরীন স্বর্গে যেত, মরেনি বলে হাসপাতাল থেকে সোজা জেলে গেছে—স্বাধীনতাদাতা ব্রিটিশরাজের বেআইনি বিনা বিচারে আটক রাখার আইনে। খবর শুনে দেহের জড়তা আর অস্বস্তিবোধ কাটিয়ে উঠে মরিয়া হয়ে গেছে সরস্বতী। ডাক্তারের প্রত্যেকটি নির্দেশ ভঙ্গ করছে। তাকে বিয়োতে তার মা মরে গিয়েছিল। কিন্তু তার ঠাকুরমা নাকি দশ মাস পর্যন্ত মস্ত সংসারের হাঁড়ি ঠেলত, প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে বলত, মা গো, গেলাম !—বলে উঠানে তৈরি অস্থায়ী আঁতুড়ঘরে গিয়ে দু-দণ্ডে বিনা কষ্টে মা হত ! সরস্বতীও তাই ঠিক করেছে এই অন্যায় অনিয়মের জগতে একটা নিয়ম অন্তত মানবে—মা হওয়া সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার ! এতটুকু কাবু হলে চলবে না।

সরস্বতী বলে, যাই হোক, এবার তো শান্ত হয়েছে দেশটা ? ভালো হোক, মন্দ হোক, একটা মীমাংসা হয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করা যাবে, কেমন স্বাধীনতা পাওয়া গেছে।

প্রণব একটু হাসে, মনসুরের মুখেও মৃদু হাসি ফোটে। রশৌনা দ্বিধার সঙ্গে বলে, নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করা যাবে কি ?

গোকুল বলে, কী করা যাবে ? ভাগাভাগিতে যার স্বার্থ, সেই হল ভাগ-বাঁটোয়ারা মিটমাটের মধ্যস্থ, কত বিষয়ে কত মামুলি বাধার রাস্তা খোলা রয়েছে জানো ? সত্যি যদি ব্রিটিশ চলে যেত,

এতকাল ধরে ব্রিটিশ যে ভেদাভেদ তৈরি করে গেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে সত্যি যদি হিন্দু-মুসলমান নিজেরা মারামারি করে অর্ধেক সাবাড় হয়ে গিয়েও নিজেরা একটা মিটমাট করত, তাহলে বরং একটা স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব ছিল। ব্রিটিশ করাচ্ছে মারামারি, ব্রিটিশ করে দিচ্ছে ভাগাভাগি মিটমাট, সে কী দেশের সাধারণ মানুষকে খাঁটি স্বাধীনতা দেবার জন্য, নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করতে দেওয়ার জন্য ?

ক-দিন আর লাগবে এ স্বাধীনতা তিতো হতে, দেশের লোকের চোখ খুলতে ? যাদের গর্জনে ব্রিটিশ পিছু হটেছে, আবার তাদের গর্জন শোনা যাবে হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে—সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই।

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, অনেককালের পরাধীনতা গোকুল, দৃষ্টি বাঁকা হয়ে আছে অনেকভাবে। হাজার বছরের কুয়াশা জমে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। চোখ খুললেই কি শত্রু-মিত্র চেনা যায়, সত্য চোখে পড়ে ? অত সোজা করে দিয়ো না ব্যাপারটা !

গোকুল একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, সোজা করিনি। আমি কী নিজেই জানি কতদিনে কী হবে, না ঠিক বুঝতে পেরে গেছি কীভাবে অবিকল কী ঘটবে ? তবে মোটামুটি যা ঘটবেই সে কথা বলছি। চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানকে তো চিরকাল বিদেশি আর স্বদেশি দালালরা শোষণ করতে পারবে না।

প্রণব হাসিমুখেই বলে, চিরকাল মানে জানো তো ? দুশো চারশো বছর না হয় ধরলাম না। দশ-বিশবছর তো ধরতে পারি ? এতেই তুমি খুশি যে আরও দশ-বিশবছর চললেও তার বেশি তো চলবে না ?

গোকুল জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় না। আজ সাধারণ লোকের মধ্যে যে চেতনা এসেছে, ষড়যন্ত্র ভাঁওতা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারলেই—

কে চুরমার করে দেবে ?

আমরা।

প্রণব বলে, এইখানেই তুমি সোজা করে দিচ্ছ ব্যাপারটা। সাধারণ লোকের চেতনা আজ ষড়যন্ত্র ভাঁওতা ভেঙে চুরমার করে দেবার বেশি রকম প্রতিকূল। এ স্বাধীনতা যারা আনছে এখনকার মতো তারাই দখল করে বসেছে চেতনা। স্বাধীনতা নিয়েই সবাই মশগুল, চিন্তিত। তাছাড়া, এ চেতনা বহুকালের জঞ্জালে আবিল হয়ে আছে। প্রাণ দিয়েও এখুনি ষড়যন্ত্র ভেঙে চুরমার করে এ চেতনাকে আরও সচেতন করার সাধ্য তোমার আমার নেই। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এবার এক হয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তারা এবার নিজেরাই হিসাব-নিকাশ নিতে বসবে কী পেলাম আর কী পেলাম না—নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে যাচাই করবে। সঙ্কট বাড়বে, বঞ্চিত হতে হতে খাঁটি স্বাধীনতার কামনা দিন দিন বাড়বে। এর সঙ্গে যদি চলে চেতনাকে সাফ করা, দেশ-বিদেশে ছড়ানো বজ্জাতির আসল চেহারা চিনে চিনে নেওয়া, তবে হয়তো বছরও ঘুরবে না, চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান গর্জন করে উঠবে। কিন্তু এতদিনের পরাধীন পিছনে ঠেলে রাখা দেশ, চেতনা কী দুদিনে সাফ হবে, সহজে হবে। কত অন্ধকার অলিতে গলিতে ঠেলে দিয়ে চেপে পিষে ঠেকিয়ে রাখবে দেশটার সভ্য স্বাধীন জগতে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার সাধ।

গোকুল সতেজে বলে, এ সব তোমার বাজে আতঙ্ক। শ্রমিক জেগেছে, চাষি জেগেছে, মধ্যবিত্ত জেগেছে—কারও সাধ্য আছে এবার তাদের ঠেকিয়ে রাখে ? আজ সাহস করে ডাক দিলে তারা সাম্রাজ্যবাদের, ধনতন্ত্রের বনিয়াদ ছারখার করে দেবে !

প্রণব ধীরকণ্ঠে বলে, আজ শুধু ডাক দিলেই দেবে ? এতখানি প্রস্তুত আর সচেতন হয়ে আছে তোমার দেশের মানুষ ?

গোকুল সতেজে বলে, আছে। চরম বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

প্রণব চিন্তিতভাবে তাকায় গোকুলের দিকে, উপস্থিত সকলের মুখের ভাব সে লক্ষ করছিল প্রথম থেকেই। গোকুলের কথা শুনতে শুনতে আবেগের তাপে যেন স্ফুরিত হচ্ছিল সকলের মুখ-চোখ, উষার মতো দু-একজন ছাড়া। তার কথা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মুখগুলি, গোকুলের সতেজ উগ্র প্রতিবাদে সে মেঘ আবার কেটে গেছে মুখগুলি থেকে।

উষা মুখ বাঁকিয়ে বলে, তোমাদের সঙ্গে পারি না সত্যি। কী কথা বললাম, কী নিয়ে তোমরা মেতে গেলে। ধন্যি বাবা তোমাদের ! এমনিতেই কি পাজিরা জিতে গেছে ? কথা হচ্ছে মুসলমানদের নিয়ে, তোমাদের শুরু হল স্বাধীনতা, ব্রিটিশরাজ, সাম্রাজ্যবাদ, হাতি-ঘোড়া ! ধন্যি তোমাদের !

উষারা তাদের বাড়িতে ফিরে যায় স্বাধীনতা দিবসের দিন তিনেক আগে।

তার নিরীহ গোবেচারি স্বামী তাকে একদিন বলে, তোমায় যেতে হবে না ও বাড়িতে। বাড়িটা বেচেই দেব আমি। শুধু একবাব বেড়িয়ে আসি চলো, দেখে আসি বাড়িটা কেমন আছে।

এমনভাবে সে কথাটা বলে যেন ইট-সুবকির বাড়ি নয়, জীবন্ত কোনো রুগ্‌ণ পরমাত্মীয় কেমন আছে একবার দেখে আসার কথা বলছে।

তবু উষা বলে, ওরে বাপ রে !

কিন্তু সে যায় ! গিয়ে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে তারই বাড়ির আশেপাশে মহাসমারোহে স্বাধীনতা দিবসকে বরণ করার আয়োজন চলছে। স্বাধীনতা দিবস বলে নতুন রকম বিশেষ রকম কিছু নয়, দুর্গাপূজা ইদ হোলির মতো উৎসবের আয়োজন।

পরদিন উষা মালপত্র এবং স্বামীপুত্র নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। একদিনে তার সমস্ত ঝাঁঝ যেন উড়ে গেছে, একবার ভুলেও সে তার নির্দিষ্ট শত্রুদের গাল দেয় না রওনা হওয়া পর্যন্ত !

তাবা যায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে, সন্ধ্যার পর প্রণব বাড়ি ফিরে মণিকে বলে, মণিবউদি, কাল একবার যাবে তোমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ?

মণি উষা নয়। সে ধীরভাবে কিন্তু উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে বলে ব্যাপার কী ঠাকুরপো ?

ব্যাপার কিছু নয়। বাড়িটা একবার দেখে আসব।

এবার মণি শান্ত কিন্তু কড়া সুরে বলে, ব্যাপার কী ঠাকুরপো ?

প্রণব একটু ভেবে বলে, তবে তোমায় খুলেই বলি। সকালে বলব ভেবেছিলাম।

খুলেই বলো।

বন্ধুটি দাদাকে পথে বসিয়েছে।

মানে ?

লাখপতি হবার লোভে যথাসর্বস্ব বন্ধুর চোরাকারবারে ঢেলেছিল। বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে টাকা তুলেছিল। কাল যতীন ওকে দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে।

মণি চুপ করে থাকে। সুধীন ও আশা এসে দাঁড়াতে প্রণব তাদের বলে, তোরা একটু ঘুরে আয় তো গিয়ে, আমরা একটা পরামর্শ ক'বনি।

মণি বলে, ওরা থাক।

প্রণব ঘামে ভেজা গেঞ্জি-পাঞ্জাবি ছাড়ে। গামছাটা টেনে নিয়ে গা মোছে। শুধু তাকে নয়, সুধীন আশার সামনেও সব কথা খুলে বলবে কিনা চিন্তা করার অজুহাত বলে এটা মণি নীরবে সহ্য করে যায়। সুধীন আশাদের প্রসব করার আগে তার যে রকম উদ্‌বেগ ব্যাকুলতায় ভারাক্রান্ত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা এসেছিল, ভয়ংকর দুর্ঘটনার খবর শোনার প্রস্তুতি হিসাবে তার প্রায় সেই রকম ধীরতা স্থিরতা এসেছে এখন।

হোগলার চালার নীচে শুধু তারে ঝোলানো বালব্‌টা জ্বলছে। প্রণবের এটা আস্তানা, এত সে খাটে অথচ তার এই আশ্রয়ে এলোমেলোভাবে স্তূপাকার বই, লেখা ও সাদা কাগজগুলি চাপা দিতেও কাজে লাগানো হয়েছে একখানা বই। কে জানে কী করে যে দিনেও লেখাপড়ার সময় করে নেয় অফুরন্ত কাজের মধ্যে।

গামছাটা কোমরে বেঁধে প্রণব বলে, যতীনের সঙ্গে আজ দাদার মারামারি হয়ে গেছে। যতীন পুলিশে দিয়েছিল ; সুকুমারবাবু জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাছেই সব শুনলাম।

খুন করতে গিয়েছিল, না ?

মণির প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রণব বলে, কী করে জানলে ?

মণি বলে, এ তো জানা কথা। বন্ধুর হাতের পুতুল ছিল, বন্ধু ঘাড় ভেঙে ডুবিয়ে দিয়েছে, আপনজনের সঙ্গে পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি কবিয়েছে। প্রথম ঝোঁকটাই হবে বন্ধুকে খুন করা।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে মণির। বলে, জামিনের কথা বললে শুনে যেন বেঁচেছি। খুন করলে তো জামিন দেয় না।

খুন করলে অসুখী হতে ?

হতাম। একটা জানোয়ারকে মেরে দশ-বিশবছর জেল খাটবে ?

ঠিক বলেছ। তার চেয়ে বরং যাতে সব চোরাকারবারির ফাঁসির ব্যবস্থা হয় সে জন্য জীবন উৎসর্গ করা ভালো। তবে ভেবো না, যতীনের অবস্থাও দাদার মতোই হবে। বেশি দেরি নেই।

কী করে ?

দাদাকে যেমন যতীন পার্টনার করেছিল, যতীনও তেমনি জীবনলাল মাড়োয়াবির পার্টনার। লাখোপতি হাত মিলিয়েছে কোটিপতির সঙ্গে, পুঁটিমাছ-খেকো রুইমাছ গেছে রাঘব বোয়ালের কাছে। কী হবে তা তো জানা কথাই, স্বাধীনতাটা একবার আসতে দাও।

মণি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দ্বিধার সঙ্গে বলে, দেখা করেছঁ না কি ?

করেছি। ভালোই আছে। তোমরাও চলো না কাল সকালে ?

প্রণবের প্রথম কথাটা মণি ভুলে গিয়েছিল। প্রণব বাড়ি এসে তাকে প্রথমে শুধু পরদিন সকালে তাদের ফেলে পালিয়ে আসা বাড়িটা দেখে আসার কথা বলেছি। এতক্ষণে মণি যোগাযোগ খুঁজে পায়।

তাই সকালে ও বাড়িটা দেখে আসার কথা বলছিলে ? কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে না গিয়ে খালি বাড়িতে গেল কেন ?

তা তো জানি না।

মণি আর্তনাদের সুরে বলে, ঠাকুরপো ! শিগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডাকো ! এত বোকা তুমি ?

প্রণবও চমকে উঠে বলে, সত্যি তো !

মণি অধীর হয়ে বলে, ট্যাক্সি ডেকে আনো একটা।

সুধীন বলে, চলো না বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় ট্যাক্সি নিয়ে নেব ? গিয়ে ডেকে আনতে দেরি হবে।

চারজনে তারা দ্রুতপদে রাস্তায় নেমে যায়। সরস্বতী প্রশ্ন করে, কিন্তু চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেবার সময়ও তাদের ছিল না। সরস্বতী ও গোকুল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর গোকুল ব্যাপার জানতে দ্রুতপদে এগিয়ে তাদের সঙ্গ নেয়।

ছন্দপতন

আমি একজন কবি।

গোড়াতে এ কথাটাও জানিয়ে রাখি যে আমার বয়স মোটে পঁচিশ বছর।

নীরব কবি, হবু কবি বা অখ্যাত অজ্ঞাত কবি আমি নই। দু-খানা কবিতা সংকলনের রীতিমতো নামকরা কবি। বই দু-খানা চারিদিকে প্রচুর সাড়া তুলেছে। আমার কবিতা নিয়ে বিশেষ করে তরুণ মহলে গুঞ্জনের অন্ত নেই।

আবেকটু বলা দরকার। কারণ, অল্পবয়সি কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে—অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতোই সেটা জোবালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশি স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবি অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগৎটা যার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এ রকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনি পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিকঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে—অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীতরকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কী ?

যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলেব চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষেব বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতেব অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমাব পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনেরো বছর বয়সে লিখেছিলাম—

> শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
> শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
> কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোযার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিণী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারীঅঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

কবি ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোনো কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কী রকম মানুষ।

কবিতায় যা লিখেছি তার বাইরে আমি কেমন মানুষ বোধ হয় খানিকটা বোঝা যাবে এই কবিতা ছাপিয়ে কবি হিসাবে নাম করার কথাটা বললে।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার !

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিনি।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভীরুতা থাকে কারও অজানা নেই,—কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক !

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা। ছেলেমানুষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি। কবি বেঁচে থাকতে তার দিকে কেউ ফিরে তাকায়নি, মৃত্যুর পর সেই কবিকে নিয়ে চারিদিকে হইচই হয়েছে—এ রকম দৃষ্টান্ত আছে বইকী ইতিহাসে। কিন্তু তবু আমি মানতে পারিনি যে দোষটা শুধু এক পক্ষের, কবির কোনো অপরাধ ছিল না।

শুধু লিখেই কবি খালাস, এ কথা নতুন কবি কেন ভাববে ? কেন তার নতুন ভাব ভাষা ছন্দ জীবনদর্শনকে যেচে এসে জেনে বুঝে নেবার বরাত জগৎকে দিয়ে নিজে অভিমানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে ? কেন সে এই সহজ বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করবে না যে নতুন রকম কবিতা বলেই সে কবিতাকে জানিয়ে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব নতুন কবির কম নয় ?

নতুন কবি—জগৎ তো উদাসীন হবেই তার সম্পর্কে ! সেটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত। এ একটা নিয়ম মাত্র—একে উদাসীনতা বা অনাদর মনে করাও ভুল।

নতুন কবির উপর মানুষ উদাসীনও নয়, নিষ্ঠুরও নয়। বরং নতুন কবির দিকেই বেশ খানিকটা পক্ষপাতী। তা না হলে নিরুপায় অসহায়ের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরের কোণে বসে থেকেও কাব্যজগতে যুগে যুগে এত নতুন কবির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। তরুণ বয়সের লাজুক ভীরু অভিমানী কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য জগতের হত না।

নতুন কবিকে লোকে চিনবে না, তার কবিতাকে আদরও করবে না—এটাই তো উচিত আর স্বাভাবিক ! এই সহজ বাস্তব সত্যটা মেনে নেওয়ার বদলে এ জন্য বিচলিত হওয়া শুধু বোকামি নয়,—ছেলেমানুষি আহ্লাদিপনা !

কবিতা বাজারের মাল নয়, কাজেই তার জন্য প্রচার বা বিজ্ঞাপন দরকার নেই : এ কথার ফাঁকি কুড়ি-একুশবছর বয়সেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। অদৃষ্টবাদী ভাববাদী কবি নিজের কবিতার প্রচার জোরের সঙ্গে চালাতে ভয় পান, কারণ প্রচার মানে তিনি জেনে নিয়েছেন একমাত্র মাল কাটাবার সস্তা ফাঁকিবাজি বিজ্ঞাপন। পাছে লোকে নামের কাঙাল ভাবে এই ভয়ে তাকে উদাসীন সেজে থাকতে হয়। নিজেকে জাহির করার সস্তা কৌশল—খাতিরের মূল্যে নিজের লেখার প্রশংসা করানো—এর সঙ্গে নিজের সৃষ্টির দিকে দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের সুস্থ স্বাভাবিক চেষ্টা তার কাছে একাকার।

প্রত্যেক কবিই প্রচার চায়—নইলে কবিতা লেখার কোনো মানে হয় না।

নীরব কবিরাই জগতের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ।

আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে নিজের কবিতা প্রচারের অভিযান চালিয়ে এসেছি। আমি মস্ত কবি, রবীন্দ্রনাথকে ডিঙিয়ে আমি হাজার বছর এগিয়ে গেছি, আমার কবিতার তুলনা নেই,—এ সব মাল কাটানো বিজ্ঞাপনি প্রচার নয়। খাতিরের চাপ দিয়ে কবিতার প্রশংসা করানোও নয়—যদিও এটা আমি খুব বড়ো স্কেলে করতে পারতাম।

শুধু প্রচার। সসংকোচে আশা-নিরাশার নাগরদোলায় হিমসিম খেতে খেতে অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন কবি ডাকে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি বা দুটি কবিতা পাঠায় যে প্রচার চেয়ে—কবির দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তেজের সঙ্গে জোরের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সার্থকভাবে সেই প্রচার।

দয়া করে সম্পাদক যদি কবিতাটি ছাপান এবং দয়া করে দশজনে যদি পড়েন এবং ভাগ্যক্রমে যদি আমার প্রতিভা ধরা পড়ে যায়...

কুড়ি-একুশবছর বয়সেই ছি ছি করে উঠেছে আমার মন ! একটি কবিতা লেখা কত শত বা কত হাজার মায়ের সন্তান প্রসবের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের শামিল সেটা আমার জানা নেই, সে উদ্ভট উপমার হিসাবও কখনও কষতে বসিনি। কিন্তু কবিতা লিখে আমি তো জেনেছি কী করে মানুষ কবিতা লেখে। আমি তো জেনেছি কেন আর কীভাবে মানুষ কবি হয় !

দেবতা দানব মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ কারও রামায়ণ রচনার সাধ্য হয়নি কেন রত্নাকর ছাড়া, এ রহস্য আমার কাছে তো গোপন নেই। নোবেল প্রাইজ পাবার পব দেশ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কেন সে সম্মানকে ঠিকমতো অসম্মান করেছিলেন, পনেরো-ষোলোবছর বয়সেই আমি তো তা অনুভব করেছিলাম।

আমি তাই একদিকে যেমন প্রাণপাত করে কবিতা লিখেছি অন্যদিকে তেমনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করেছি দেশের মানুষ যাতে আমার কবিতা পড়ে !

মানুষকে আমার কবিতা পড়াব—মানুষ পড়ে স্থির করবে আমার কবিতা কোন দরের। দৃঢ়ভাবে এই নীতি মেনে চলেছি বলে বিবেক আমাকে কখনও কামড়ায়নি, সস্তা আত্মপ্রচার হতে দিইনি বলে নিজের কাছে নিজেও আমি সস্তা হয়ে যাইনি।

অনেকে অবশ্য মনে করেছে অনেক রকম। কিন্তু মানুষের ভুল বোঝার আতঙ্কে বিচলিত হয়ে ভুল করার ধাত আমার নয়।

মানসী পর্যন্ত বলেছে, তোমার সত্যি লজ্জাশরম নেই। 'ড়ো বেহায়া তুমি !

আমি বলেছি, কবি হওয়া কি অপরাধ যে লজ্জায় কাঁচুমাচু করব ? নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব ?

তাই বলে এভাবে নিজেকে জাহির করবে !

ঘটনাটা বলি। কবিতা প্রকাশ আরম্ভ করার গোড়ার দিকেব কথা—এখানে ওখানে সবে দু-চারটি কবিতা বেরিয়েছে। আমি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারি। গান শেখার মতো আমি ছেলেবেলা থেকে আবৃত্তি শিখেছি। নানা সভায় নানা অনুষ্ঠানে আমাকে আবৃত্তি করতে বলা হয়। এতকাল আবৃত্তি করে শোনাতাম বিখ্যাত কবিদের রচনা। সেদিনের সভায়,—সভায় কম করেও হাজার দশেক লোক উপস্থিত ছিল—আমাকে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলেও নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম।

সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন : এবার শ্রীনবনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন।

আমি আগেই কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করব। তারপর সভাপতির এ ঘোষণা উচিত হয়নি।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করি : কবিগুরুর বহু কবিতা আমি বহুবার আবৃত্তি করেছি, ভবিষ্যতেও করব। আজ আমার স্বরচিত একটি কবিতা শোনাবার কথা ছিল, এটি শোনাবার জন্যই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

কবিতাটির নাম ও রচনার তারিখ এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে আমার যে বইটি বার হচ্ছে, এ কবিতাটি যে তাতে স্থান পাবে এ কথাও আমি জানিয়ে দিই।

এটা বড়োই খারাপ লেগেছে মানসীর ! আবৃত্তি শুনে সভা জমে গেছে, আবৃত্তির শেষে হাততালি ফেটে পড়েছে, চারিদিক থেকে দাবি উঠেছে আরেকটি আবৃত্তি শোনাবার—তবু মানসীর এটা ভালো লাগেনি !

জাহির করা বলছ কেন ? সভায় আবৃত্তি কবার মতো কবিতা আমি লিখেছি, শোনাব না কেন ?

একটু বিনয় তো থাকা উচিত ? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল—

সেটা আমার দোষ নয়। আর বলা হয়ে থাকলেই বা কী ? এতে কি রবীন্দ্রনাথ ছোটো হয়ে গেলেন ? হাজার হাজাব মানুষ তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে আসছে, পরেও করবে। ও সব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, স্থায়ী জিনিস। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আবৃত্তি করবে ? আমি কি ভেসে এসেছি !

তুমি আর রবীন্দ্রনাথ !

তাঁকে ছোটো কোরো না। চারা মাথা তুলতে চাইলে গাছের অপমান করা হয় না। তিনিও নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, নিজের লেখা গান গাইতেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।

তবু—

এ তবুর মানে আমি জানি। এ নিছক সংস্কার—সাংস্কৃতিক কুসংস্কার। যেহেতু ববীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং আমি নামহীন-নগণ্য তরুণ সেই হেতু আমার নিজের কবিতার চেয়ে বেশি আপন ভাবতে হবে, বেশি খাতির করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ! এ হল মহান আত্মলোপন,—মিথ্যা হলেও—উদারতা দেখিয়ে হতে হবে সুবোধ সুশীল বালক ! নিজের ছেলেকে মানুষ জগতেব অতীত ও বর্তমান সব ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এতে কারও আপত্তি নেই ; রূপে গুণে মদনকে লজ্জা দেবার মতো রাজপুত্র থাকতে কোনো বাপ তার কালো ছেলেকে আদর করছে এর মধ্যে সম্রাটের অপমানের প্রশ্ন কেউ কল্পনাও করবে না ; ববীন্দ্রনাথের কবিতার বদলে আমি আমার কবিতাকে তুলে ধরলে সেটা কিন্তু হবে রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা !

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের দিনের নতুন কবির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। রবীন্দ্রনাথকে ছোটো করা বড়ো করার প্রশ্নটাই হাস্যকর।

কিন্তু কুসংস্কার যাবে কোথা !

মানসী ভাগ্যে আমাকে অকৃতজ্ঞ বলেনি !

আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড়ো উৎস রবীন্দ্রনাথ, সেটা তো আছেই। এটা শুধু আমার বেলা নয়, সবরকমের সব কবির বেলাই সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাইনি—এ কথা বলা যে-কোনো কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।

এ কথা বলার অর্থ আমি বাংলাদেশে জন্মাইনি, বাংলার জলমাটিতে বাঙালি সমাজের খাদ্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হইনি—আমি স্বয়ম্ভু অথবা আমি পরগাছা।

পরগাছার নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস সব গাছের কোশে। পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারায় কাব্যসৃষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে, আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা জোগায়নি এ কথা বলার সাধ্য আমার নেই—অন্য কারও আছে আমি বিশ্বাস করি না।

এদিক দিয়ে নয়। মানসী আমাকে অন্যদিকে অকৃতজ্ঞ বলতে পারত।

আমার মুখে রবীন্দ্রনাথেব কবিতার আবৃত্তি শুনে মানসী আমার সঙ্গে যেচে এসে পরিচয় করে।

রেডিয়োতে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে তার নাকি জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আঁধাব রাতে কোথায় কোন বাপ-মা-ছাড়া অসহায় বিড়াল ছানা সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এই যদি রবীন্দ্রনাথের দান হয় তবে আর কীসের ভরসায় বেঁচে থাকা ?

আমার আবৃত্তি শুনে সে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল এ রকম সৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের আছে—প্রচুর আছে।

সত্যি মুষড়ে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হত না। কী হবে পড়ে ? আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আবৃত্তি শুনে বাড়ি গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।

চলবে না ? ভাতকাপড়ের চোরাকারবার যদি চলে, শিল্পসাহিত্য কখনও বাদ যায় ? কবিতার জাত থাকে ? এ সবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমানুষ, যেমন হালকা তেমনই নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে চান সেই রসেই মজে যান। কিছুদিন জাতীয় সংগীত শোনালে আপনারা দেশের জন্য খেপে ওঠেন। আবার কিছুদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁদুনি শোনালে ভাবেন, নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাদের এত সস্তা করে দেওয়া যেত ?

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মানসীর।

ও বাবা, আপনি বক্তাও নাকি ?

আপনাকে বলিনি। আপনারা মানে সাধারণ দশজন—আপনি ও রকম নাও হতে পারেন। আপনাকে তো জানি না আমি।

ও মানেটা বুঝেছি। ও বেলা চা খেতে আসুন না ? ঠিকানা দিচ্ছি।

মাপ করবেন। ও বেলা কাজ আছে।

মানসীর মুখ আবার লাল হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, কবে আসবেন ?

সে তো ঠিক করে বলা মুশকিল !

ও !

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, দেখুন, এ সব ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে। বয়সে ছোটো হব না আপনার চেয়ে—আপনাদের না হোক, মেয়েদের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মায় এ বয়সে।

আমি বলেছিলাম, চললেন ? মাথা ঠান্ডা করে একটু শুনে গেলে হত না আমার অসুবিধা কী ?

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বলুন।

কাল আমি বাইরে যাচ্ছি, দার্জিলিং। কবে ফিরব ঠিক নেই। কবে আপনার ওখানে যেতে পারব ঠিক করে বলাটাও তাই মুশকিল হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো ট্যাকটিক্স নেই।

ও ! তাই বলুন।

তাই তো বলছিলাম—শেষ পর্যন্ত শুনলেন কই ?

দুই

বাইরে গিয়েছিলাম কাজ নিয়ে। রোজগার করতে।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবার আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মুখেও সকলকে বলে রেখেছিলাম যে ছুটির সময়টা মাইনে দিয়ে আমায় খাটিয়ে নেওয়া যাবে।

বউদি মুখ অন্ধকার করে বলেছিলেন, ঠাকুরপো, কী এমন অভাব তোমার যে, পয়সা রোজগারের জন্য পাগল হয়ে উঠলে ? এখন ছুটকো পয়সার দিকে মন না দিয়ে পরে যাতে রোজগারটা ভালো হয় সেদিকে মন দিলে হত না ?

আমার একটা বিশেষ দরকার।

কীসে তোমার টাকার দরকার বলো, আমি তোমায় টাকা দেব।

কবিতার বই ছাপাব।

কবিতার বই ছাপাবে ! তোমার যে কত পাগলামি।

বউদি আর কিছু বলেননি। তাঁর কাছে আমার কবিতার বই ছাপাতে চাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

বিজ্ঞাপনে কাজ হয়নি। দু-চারখানা চিঠি এসেছিল, ছেলে পড়ানোর কাজ, মাসিক বেতন দশ পনেরো টাকা।

গৃহশিক্ষকেরই কাজ তবে একটা জুটিয়ে দিয়েছিল তৃপ্তি।

মোটা মাইনের কাজ—আমার পক্ষে আশাতীত। মস্ত ব্যবসায়ী হারানবাবু সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে যাবেন, তাঁর ছোটো দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে, খেলাতে এবং সাধারণভাবে দেখাশোনা করতে আমায় সঙ্গে যেতে হবে।

হারানের ছেলে অবনী তৃপ্তিকেই কাজটা দিতে চেয়েছিল। সাত বছরের একটি মেয়ে আর দু-বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর মতো বিদ্যা হয়তো তৃপ্তির আছে, তিন বছর আগে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তৃপ্তি রাজি হয়নি।

বিয়ের জন্যই তার ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া। কেরানি বাপদাদা তিন বছর তার বিয়ের চেষ্টা করছে এবং সে ঘরে বসে আছে বিয়ে-না-হওয়া বেকার মেয়ে হয়ে। স্বাধীনভাবে রোজগারের সুযোগ পেলে তার নেওয়াই উচিত। তৃপ্তি তা মানে। কিন্তু মস্ত একটা কিন্তু আছে। বাড়ির সকলের সঙ্গে মর্মান্তিক ঝগড়া করতে হবে—সেটা আসল কথা নয়। তার কিন্তুটা ভিন্ন।

এটা তার পথ নয়।

অবনী না হয় গায়ের জোরে তাকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল একমাস দেড়মাসের জন্য। তারপর ?

তারপর সে কোনদিকে যাবে ?

একমাস দেড়মাস চাকরি করে এসে আবার সরলা অবলা বালিকা সেজে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করবে বাপভায়ের জুটিয়ে দেওয়া সুপাত্রের ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভালো ! মানুষের একটাই পথ থাকা উচিত। তবে আমাকে কাজটা দিলে সে খুশি হবে। সত্যই খুশি হবে।

তৃপ্তি হেসে বলেছিল, শুনে বলল কী জানো নবদা ? মুখে আটকাল না, সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করে বসল, তুমি ওর জন্য অপেক্ষা করছ নাকি ? পাস-টাস করে মানুষ হতে ওর তো অনেক বছর দেরি।

আমিও হেসেছিলাম।

আরও কী বলল শুনবে ? বলল, নব তো ছেলেমানুষ, তোমার চেয়ে বেশি বড়ো তো হবে না। তুমি যে বুড়িয়ে যাবে নব মানুষ হতে হতে ! বিশ্রী বেমানান হবে তোমাদের মধ্যে !

তুমি কী বললে ?

আমি বললাম, নব-টব জানি না। বাবা যাকে জুটিয়ে দেবেন আমি তারই দাসী হব। তোমাকে জোটান, নবকে জোটান কিংবা বিড়লাকে জোটান—আমার বাছবিচার নেই।

বলেছিলে ? বলতে পেরেছিলে ?

কেন পারব না ? সুপাত্রের জন্য আমবা জবুথবু লাজুক মেয়ে সেজে থাকি বলে কি আমরা বোকাহাঁদা ?

তৃপ্তি আঁচলের কোন গহন আড়াল থেকে একটি পান বার করে মুখে পুরেছিল। তার দৈনিক পানের বরাদ্দ বাঁধাধরা। আমি মাঝে মধ্যে তাকে কয়েকটি বাড়তি পান এনে দিয়ে সস্তায় খাঁটি কৃতজ্ঞতা অর্জন করতাম।

নেবে নাকি কাজটা ? আমি বলি, নিয়ে নাও। অপমান হবে না, আদরযত্নই করবে। তুমি না নাও আরেকজন নেবে। তার হয়তো বউ ছেলেমেয়ের দায়, তোমার দায়টাও তো কম নয়, কবিতার বই ছাপানোর দায় ! যদিবা অপমান কিছু জোটে, অন্য একটা মানুষ যা মুখ বুজে সইবে, তুমি তা সইবে না কেন ?

তুমি আমাকে কাজটা নেওয়াতে চাও ?

চাই। তুমি কথায় ভারী বস্তুবাদী হয়েছ। কাজে একটু হয়ে দেখিয়ে দাও।

হারানবাবু আমায় দেখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন, আরে, তুমি নাকি ? তা বেশ বেশ। তোমারও রোজগারের দরকার হল ! তা বেশ বেশ। বাবা ভালো আছেন ? তোমার দাদা বুঝি এখন— ? ও হ্যাঁ, ইনকামেব হিসাবটা কষার মধ্যে সেও ছিল বটে। তা, তুমি পারবে তো বাবা ? হারামজাদা হারামজাদি দুটো আসল শয়তান !

একটা চুরুট ধরিয়ে ফেললেন !

তা বেশ, বেশ। তুমি কবতে চাইলে কাজটা আমি কী আব কাউকে দিতে পারি ?

লক্ষ্মী আর লক্ষ্মণ—আমার ছাত্রী আর ছাত্র। বাপ অসত্য উপায়ে পয়সা রোজগার করলে সাত বছরের মেয়ে আর ছ-বছরের ছেলে পর্যন্ত কেন আর কীভাবে এমন অসভ্য হয়, সেবার সেটা টের পেয়েছিলাম।

সব আছে প্রচুর পরিমাণে, না চাইতে সব পেয়ে যায়,—তবু কচিকচি মন দুটি যেন হিংসার আড়ত। মিথ্যা কথা মুখে লেগেই আছে—কারণে এবং অকারণেও। রাগ হলেই চরমে উঠে যায়—রাগবার জন্যে সর্বদাই যেন দুজনে উদ্যত হয়ে থাকে। এদিকে এত ভীরু যে জাগ্রত অবস্থায় ঘর এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার করলে হাউমাউ করে ওঠে—ঘরে যত লোকই থাক !

মাইনেটা মোটা—কাজটাও প্রাণান্তকর। সে হিসাবে বেশি নয় মোটেই।

যতই দুরন্ত হোক শাসনের নিষ্ঠুরতা দিয়ে ছেলেমেয়েকে দমন করা আমার মতে পাপ—ঘরোয়া দমননীতি মনুষ্যত্বের গোড়া আলগা করে দেয়।

কিন্তু এরা দুজন দুরন্ত নয়, বিকারগ্রস্ত। বিকৃত অস্বাভাবিক পরিবেশ এদের বিগড়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে, দ্বিতীয় দিনেই পড়ার সময় লক্ষ্মীর হাতের পুতুলটা কেড়ে নিতে যাওয়ায় সে কামড়ে আমার হাত থেকে রক্ত বার করে দিয়েছিল।

দুদিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার সমস্যা। হয় বর্বরের মতো নিষ্ঠুর হওয়া, নতুবা কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া।

সেদিন এ সমস্যার মীমাংসা করতে যে নীতি খাটিয়েছিলাম, আমার কবিজীবনে চিরদিন সকল সমস্যার হিসাব-নিকাশ সেই একই নীতিতে হয়ে এসেছে।

রাত্রে বসে বসে ভাবছিলাম কী করা উচিত। গা বাঁচিয়ে ফাঁকি আর জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে গেলে পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে গরমের ছুটিটা দার্জিলিং-এ সুখেই কাটানো যায়—কিছু টাকাও পকেটে আসে। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পুঁথির নীতিকথার হিসাবে নয়, আমার বাস্তব হিসাবেই ওটা লাভ নয়—নিছক লোকসান।

নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে বোকামি জগতে কী আছে ?

আমাকে সোজাসুজি ঠিক করতে হবে : নিষ্ঠুর হওয়া উচিত কিনা এবং ও রকম নিষ্ঠুর আমি হতে পারব কিনা।

ফুলের মতো মুখখানা লক্ষ্মীর, লক্ষ্মণের বড়ো বড়ো আশ্চর্য দুটি চোখ। বিকার যতই থাক, দুজনে ওরা শিশুই। ওদের মনে অন্ধকারের ভয়ের মতোই আমার সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি কবা ঠিক হবে কি ? দিনের পর দিন দুটি শিশুকে শুধু ভয়ে দমিয়ে রাখা আমার সহ্য হবে কি ?

ওদের আপনও করা যায়, সংশোধনও করা যায়। কিন্তু সেটা অনেক দিনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া। গরমের ছুটির মধ্যে তো সেটা সম্ভব নয়।

হৃদয়হীন বর্বরতা ছাড়া পথ নেই।

আসল কথাটা ধরতে পারছিলাম না। ছোটো ছেলেমেয়ে আমি বড়ো ভালোবাসি, সে জন্য আরও বেশি অসুবিধা হচ্ছিল।

রাত্রে খেতে বসেও ভাবছিলাম। হারানের স্ত্রী সর্বাঙ্গে গয়না পরে এবং তার সেজো মেয়ে রমা আধুনিক বেশে খাওয়া দেখতে এলেন।

লক্ষ্মীর মা বললেন, ও দুটোকে তুমি নাকি সামলাতে পারছ না বাবা ?

রমা বলল, অত নরম হলে কি চলে ?

লক্ষ্মীর মা বললেন, তুমি ভাবতে পার, বেশি শাসন করলে আমরা রাগ করব। সে ভয় কোরো না। আমরা শাসন চাই। শাসন ছাড়া কী ছেলেপিলে মানুষ হয় ? শাসন করতে পারেনি বলেই আগের দুজন মাস্টারকে আমরা ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আদর যা দেবার আমরা দেব, তোমার কাজ শাসন করা, তুমি শাসন করবে।

রমার বছর দেড়েকের একটি ছেলে আছে। ছেলেটিকে রাখার জন্য মাঝবয়সি মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোককে রাখা হয়েছে। শোবার ঘর থেকে রমার ছেলেটির জোরালো কান্না শোনা যাচ্ছিল। আচমকা তার কান্না থেমে গেল।

লক্ষ্মীর মা আবার বললেন, কেন, উনি তোমাকে বলে দেননি যে খুব কড়া শাসন করবে ? শাসন করার জন্যই তোমাকে রাখা ?

কী করা যায় সে কথাই ভাবছিলাম।

রমা হেসে বলেছিল, পালিয়ে যাবার কথা ভাবছেন না তো ?

সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে কবিতা লিখতে বসেছিলাম : যে নিষ্ঠুর সাধ শিশু চেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে...

অনেক রাত্রে রমা ঘরে এসে বলেছিল, এখনও জেগে আছেন ? চুপিচুপি একটা কথা বলতে এলাম। শাসন করার ঢালাও হুকুম দিয়েছে বলেই সত্যিসত্যি বেশি শাসন করতে যাবেন না যেন ! বুঝেছেন ?

বুঝেছি বইকী।

কী করবেন বলে দিচ্ছি। ভয় দেখাবেন। ওদের কলকাতার মাস্টার শুধু ভয় দেখিয়ে ওদের জব্দ রাখত। এমন ভয় দেখাবেন যাতে আপনাকে দেখলেই কাঁপতে থাকে। এটা কী লিখছেন ? কবিতা নাকি ? আপনি কবিতা লেখেন ! শোনাবেন একটা ?

এখন লিখি, কাল শোনাব।

মন স্থির করতে তারপর আর অসুবিধা হয়নি। যে আসল কথাটি এতক্ষণ ধরতে পারিনি সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মী আর লক্ষ্মণের জীবনে আমার দুদিনের অতি অস্থায়ী আবির্ভাব। আমি ওদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে আসিনি। এতদিন যে ভাবে ওদের দিন কেটেছে, যে ভাবে ওরা বড়ো হয়েছে, তেমনিভাবেই ওদের দিন কাটবে, তেমনিভাবেই ওরা বড়ো হবে—সাময়িকভাবে দুদিনের জন্য জের টেনে চলা ছাড়া কিছুই আমার করার নেই।

আমার নিষ্ঠুরতা নতুন কিছুই হবে না ওদের কাছে।

আগের দিন শখ করে একখানি ভুজালি কিনেছিলাম। পরদিন ছাত্রছাত্রীর প্রথম অবাধ্যতায় আসুরিক ক্রোধের অভিনয় করে সেই চকচকে ভুজালি দিয়ে যখন কেটে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম দুজনের গলা, আতঙ্কে কেঁদে উঠতে গেলে সেই ভুজালির ভয় দেখিয়েই যখন থামিয়ে দিয়েছিলাম কান্না—লক্ষ্মীর তখনকার মুখের ছবি আমার মনে চিরতরে আঁকা হয়ে গেছে।

এই ছবিরই প্রতিচ্ছবি একদিন দেখেছিলাম মানসীর মুখে।

বুকে আঁচড় লেগেছিল। কিন্তু অনুতাপ করিনি। সংসার চিরদিন যা দিয়ে এসেছে শিশু দুটিকে, আমিও সেটুকুই দিয়েছি তাদের। প্রতিকার বা প্রতিরোধের প্রশ্নও ছিল না।

লক্ষ্মী বা লক্ষ্মণের কিছুমাত্র লাভ বা লোকসান হয়নি আমার ব্যবহারে। আমার দিক থেকে অতি কঠিন একটা কাজ আমাকে করতে হয়েছিল, এইমাত্র।

হারান বলেছিলেন, তুমি নাকি ভুজালি দিয়ে কাটতে গিয়েছিলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ? বেশ করেছিলে, বেশ করেছিলে। মার-ধোর আমি পছন্দ করিনে ! এমনি কৌশলে শিক্ষা দেবে, এই তো আমি চাই ! গায়ে আঁচড়টি লাগল না, শাসনটি হল ঠিক মতো !

হা হা করে তিনি হেসেছিলেন।

এটাই বোধ হয় ছেলেমেয়ে শাসনের জন্য অহিংস নীতির ঘরোয়া বাস্তব সংস্করণ ? কে জানে !

লক্ষ্মী জানত, সত্যিসত্যি গলাটা তার আমি কাটব না কিন্তু জানলেও ভয় পেতে বাধা ছিল না, ভয় না পেয়ে উপায়ও ছিল না। চারিদিকে গা ঘেঁষে মানুষ বসে আছে জানলেও ঘর অন্ধকার করে দিলে আতঙ্কে না কেঁদে সে পারত না।

তারপর লক্ষ্মী আমার শাসন মেনে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত লক্ষ্মণ সব ব্যাপারে দিদিকেই অনুসরণ করত।

পরদিন সকালে তাদের পড়াতে বসে ইতিহাসের গল্প শোনাতে গিয়েছিলাম—বিখ্যাত বীর নারীদের গল্প।

গল্প শুনতে চাই না। পড়ান।

অর্থাৎ লক্ষ্মী শাসন মেনে নিয়েছিল কিন্তু আপস করেনি ! যতদিন দার্জিলিং ছিলাম ততদিন তো নয়ই, কলকাতা ফেরার মাস দুয়েক পরে যখন একবার দেখা হয়েছিল তখনও নয় !

আমাকে সে এক রকম স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বন্ধুত্ব করতে এসো না, তুমি মাইনে করা মাস্টার, যেটুকু তোমার কাজ সেইটুকু শুধু করে যাও !

ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যা কথার ডিপো দশ-এগারোবছরের মেয়ে, চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তার মতো এমন একগুঁয়েমি পায় কোথা ? প্রচুর মাছ দুধ ছানা মাখন ছাঁকা ছাঁকা খাবার খেয়ে মানুষ হলে এটা আপনা থেকেই হয় ! আসলে এ তো চরিত্রের দৃঢ়তা নয়, নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। রাগ হয়েছে, জ্বালা হয়েছে কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধের সাহস নেই। আমার সঙ্গে ভাব না করে আমায় যদি একটু জব্দ করা যায়, এই নিষ্ক্রিয় নিরাপদ উপায় অবলম্বন করা। প্রচুর খাদ্য যথেষ্ট প্রাণশক্তি না জোগালে এটুকুও সম্ভব হত না লক্ষ্মীর পক্ষে। খাদ্য থেকে একগুঁয়ে অভিমান, কবির মুখে কথাটা হয়তো বেখাপ্পা শোনাবে। কিন্তু সত্য কথা না বলে উপায় কী !

অবশ্য লুকিয়ে অন্য প্রতিশোধ নিতেও লক্ষ্মী ছাড়েনি। আমার কবিতার খাতায় প্রতি পৃষ্ঠায় কালি ঢেলে দিয়েছিল, জামা-কাপড় কাঁচি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটেছিল।

তিন

কলকাতা ফিরেই নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম মানসীর।

তার বাবা মস্ত ডাক্তার। তার দাদা মস্ত আই সি এস অফিসার। বাড়িটা মস্ত এবং বাড়িতে অনেক লোক।

গিয়ে দেখি, আমার আগেই উদীয়মান তরুণ কবি সুময় আসর জমিয়ে বসেছেন। আমার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়ো, সৌম্যসুন্দর মুখ, শান্ত উদাস দৃষ্টি। গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। কোনোদিন আমি তার বেশ বা চেহারার বাইরের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি, শীতকালে শুধু সুতির বদলে গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি ওঠে, কাঁধে গ্রীষ্মকালের সুতি বা সিল্কের চাদরটির বদলে গরম চাদর তেমনিভাবে ভাঁজ করা থাকে।

ক্রমে ক্রমে তার আরও নাম হয়েছে। তাঁর কবিতায় অনুভূতি ও কল্পনার দিগন্তস্পর্শী এক ব্যাপকতা ও দূরত্ব আছে ; অনেক উঁচু থেকে যেন তিনি তাকিয়ে আছেন জীবনসমুদ্রের দিকে—তাঁর কবিতা জীবনসমুদ্রের মতোই বিরাট ও বিস্তৃত কিন্তু একটু কুয়াশা ঢাকা, প্রশান্ত আর তরঙ্গহীন।

মনে পড়ে, মানসীর সামনে সুময়কে মুখোমুখি দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বাঃ এদের দুজনকে তো বেশ মানায় !

বিখ্যাত সাহিত্যিক অটলবাবু উপস্থিত ছিলেন, মানসীর সেই বিশেষ পার্টিতে বোধ হয় একমাত্র তিনিই ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তি। আরও কয়েকজন নামকরা বয়স্ক কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে মানসীর জানাশোনা ছিল, কিন্তু সে নাকি তাদের ডাকতে ভরসা পায়নি ! অটলবাবুর সঙ্গে তার অন্যরকম সম্পর্ক—আগে অটলবাবু তাকে প্রাইভেট পড়াতেন।

আরও কয়েকজন উঠতে-ইচ্ছুক এবং উঠতি পর্যায়ের কমবয়সি কবি সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিল—ছেলেরাই বেশি তার মধ্যে—তবে তারা প্রায় সকলেই তখনও ছাত্রছাত্রী পর্যায়ের, কবি সাহিত্যিক হিসাবে নগণ্য।

মানসী আমার পরিচয় দিয়েছিল : ইনি অদ্ভুত ভালো আবৃত্তি করতে পারেন !

অধীর বলেছিল, সেটা তুমি আজ জানলে নাকি !

অধীরের গায়ের শার্টটি ধোপ-দুরস্ত কিন্তু সেলাই ও রিপুর চিহ্নগুলি প্রকাশ্য—গোপন করার চেষ্টা মাত্র নেই।

সুময় আমাকে বলেছিলেন, আমার একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু !

কোন কবিতা ?

সেটা তুমি বেছে নিয়ো।

আবৃত্তি করার মতো কবিতা কি আপনার আছে ?

আমি সরলভাবেই কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু সুময়ের মুখ হয়ে গিয়েছিল লাল ! অগত্যা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল যে ভালো হলেও সব কবিতা আবৃত্তি করার উপযোগী হয় না। নানান রকম কবিতা আছে তো ! সব কবি তো এক রকম কবিতা লেখেন না যে সকলের সব কবিতাই আবৃত্তি করলে জমবে।

মানসী বলেছিল, কেন, আবৃত্তি মানে মুখে কবিতা শোনানো। সব কবিতাই নিশ্চয় আবৃত্তি করা চলে।

আমি হেসে বলেছিলাম, আবৃত্তি মানে কি তাই আছে ? যে কোনো কবিতা ঠিকমতো আউড়ে গেলেই আবৃত্তি করা হল ? আবৃত্তির জন্য তাহলে কবিতা বাছা হত না—কয়েকটা কবিতা সব জায়গাতে সবাই আবৃত্তি করত না। ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের ঝংকার, ভাবানুভূতিব ওঠানামা—এ সব অনেক কিছু না থাকলে কী আবৃত্তি করলে জমে !

অটলবাবু বলেছিলেন, কথাটা যেন ঠিক মনে হচ্ছে। তাই হবে বোধ হয়। যেমন গান—সুর দিয়ে গাইতে হলে গান লিখতে হবে, কবিতা লিখলে চলবে কেন ?

সুময় বলেছিল, গান কি কবিতা নয় ?

মানসী বলেছিল, তাই তো ! তবে ?

আমি বলেছিলাম, সবই কবিতা। গোড়ার হিসাবে তাই দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যবহার ভেদটা আকাশ-পাতাল বেড়ে গেছে তো। যেটা যে কাজের জন্য যে উদ্দেশ্যে দরকার সেইভাবে লিখতে হয়। আমি নিজের যে কবিতা আবৃত্তি করি সেটা আবৃত্তি করার জন্যই লিখি !

আপনি কবিতাও লেখেন !—মানসী সুময়ের দিকে তাকিয়েছিল—তাই আপনাদের দুজনের দেখা হতেই তর্ক !

অটলবাবু বলেছিলেন, কিন্তু কবির লড়াই তো এ রকম নয় !

অধীর বলেছিল, একটা কবিতা শোনান না ?

মানসী তাড়াতাড়ি চেপে দিয়েছিল অনুরোধটা।

চা এসে গেছে !

এক ফাঁকে মানসী সেদিন আমায় বলেছিল, ভুল করেছি। আপনাকে একা আসতে বললেই ভালো হত। পরে নয় একদিন এ রকম—

ক্ষতিটা কী হল ? পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেই লাভ !

কাল একবার আসবেন ?

কাল ? আচ্ছা।

ভুল মানসী করেনি, এ রকম পাঁচজন কবি-সাহিত্যিকদের মজলিশেই সে আমায় ডেকেছিল প্রথম আলাপ পরিচয়ের জন্য। মনটাই এখন তার অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল যে এ ভাবে নয়, আগে একলা একলা আমার সঙ্গে আলাপটা জমিয়ে নিতে হবে। কথাটা মনে হবার মধ্যে খাপছাড়া আর কিছুই ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে একা একা পরিচয় করা দরকার এটুকু খেয়াল হওয়ার জন্যই সেদিন পাঁচজনকে ডেকে আনাটা তার কাছে দাঁড়িয়ে গেল—ভুল ! আগে এ ভাবে পাঁচজনের মধ্যে আলাপ করে নিয়ে পরে একা আলাপ করলে যেন বিশেষ কিছু এসে যায়।

প্রথম দিন মানসীর বিশেষ কোনো প্রভাব অনুভব করিনি। শুধু সেই প্রথম দিন কেন, তার পরেও অনেকবার দেখাশোনা আলাপ পরিচয় হওয়ার মধ্যেও চিন্তিত হবার মতো বিশেষ জোরালো

আকর্ষণ বোধ করিনি। আপনি থেকে আমরা তুমিতে উঠে গিয়েছি কয়েক মাসের মধ্যেই, কিন্তু সে যেন শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। পরে এটা আমার সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছে—পরে যখন ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছি যে আমার জগৎ মানসীময় হয়ে গেছে।

প্রথম দিন তার চেহারাটি ভালো লেগেছিল—আর ভালো লেগেছিল তাকে আয়ত্ত করার জন্য অনেকের অনেকরকম 'ট্যাকটিক্‌স'-এর অভিজ্ঞতার দরুন ক্রুদ্ধ বিরক্ত তার সহজ কুঁদুলেপনা। অনেক ছেলে তার সঙ্গে ভাব করতে উৎসুক এটা মুখ ফুটে তার না বললেও চলত। তাকে দেখেই সেটা সহজ অনুমান করে নেওয়া যায়।

সুন্দর সুস্থ শরীর, মুখে সুশ্রী লাবণ্য, গভীর কালো চোখ। বেশের বাড়াবাড়ি নেই এটাই তার বাড়াবাড়ি মনে হয ! কারণ, বেশের সমারোহ থাকলে তাব স্বাস্থ্য আর গড়ন আরও একটু চাপা পড়ে যেতে পারত।

সত্য কথা বলি, বহুদিন পর্যন্ত তার কাছে বিশেষ কিছু আশা করিনি, তাই এ আকর্ষণ কামনাও হয়ে ওঠেনি আমার মধ্যে। তার অপরূপ দেহটি প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রের ফলমাত্র—এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুস্থ সতেজ জীবনবোধের আশাবাদী সংগ্রামী প্রকৃতির সমন্বয় আমি আশাও করিনি, খুঁজেও পাইনি অনেকদিন।

সাধারণ মেয়ের মতোই নানাভাবে মেশাল গড়ন পেয়েছিল তার মন, তেজের সঙ্গে দুর্বলতা, বড়ো আশার সঙ্গে সস্তা হালকা সুখের লোভ, জীবনকে দামি মনে করাব উদারতাব সঙ্গে স্বার্থপরতার দীনতা। চলতি নানা নীতি আর আদর্শ, নরম-গরম সংস্কার আব বিদ্রোহ, ভাবভাবনা কাজ আব ফ্যাশন—সব কিছু থেকে সুযোগসই পছন্দসই কমবেশি খুঁটে খুঁটে নিয়ে নিজে নিজেকে গড়া।

আপশোশ জাগেনি, বিশেষ বিচলিতও হইনি কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত বারবার মনে হয়েছে যে এমন যার দেহের গড়ন, এমন সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য যার রূপে, তার মনের কোনো সুনির্দিষ্ট গড়ন নেই, বৈশিষ্ট্য নেই !

তৃপ্তির মধ্যে বরং খানিকটা মানসিক সংগঠন দেখেছি—ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক থাকাব জন্য যতই সংকীর্ণ হোক তার মনটা। আমরা যাকে কবিতা বলি তার কিছুই সে বোঝে না : বামাযণ মহাভারত, সাধারণ ছড়া ও পদ্য পর্যন্ত তার বোধশক্তির সীমা। হাতের কাছে বাংলা খববের কাগজ পেলে সে বাছাবাছা কয়েক রকমের কয়েকটা খবরে চোখ বুলায়। কিন্তু যেটুকু সে বোঝে, জীবনেব নিয়মনীতি আর মানে যেটুকু সে জানে এবং মানে, যত সংস্কার আর অন্ধ ধারণা তার মন জুড়ে থাকে—তার মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে।

তার চিন্তা ভাবনা আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন কল্পনা এলোমেলো উলটোপালটা নয়।

সে জানে তার রূপ আছে। আবার এটাও জানে যে নিজের স্বার্থে এই রূপকে কাজে লাগাবার উপায় তার নেই। এই রূপের জোরেই বড়ো জোর তার সচ্ছল ঘরে ভালো চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বেশি আর কিছু আশা করার অধিকার সে পায়নি।

সে জানে, রূপের জোরে পাড়ার মস্ত বড়োলোক হারানবাবুর ছেলে অবনীকে সে যে বাগাতে পারে না এমন নয়—কিন্তু তাতে লাভ নেই। আজ তাকে বিয়ে করার জন্য অবনী পাগল কিন্তু বিয়ের পর অবনীর যাই হোক দুঃখ অশান্তির আগুনে পুড়ে তাকে সত্যসত্যই পাগল হতে হবে।

তৃপ্তি আমায় বলে, নবদা, যে মেয়েকে খুব বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কখনও তাকে বিয়ে কোরো না, খপর্দার !

বিয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই তোমাদের ?

কী করে থাকবে ? বিয়ে ছাড়া আর কী আছে আমাদের ?

মানসী কখনও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেনি। সে বিশ্বাস করে না যে বিয়ে ছাড়া তারও গতি নেই। চাকরি ? সে তো শুধু একটা গত্যন্তর !

তৃপ্তির বাপভাই তার জন্য এই গত্যন্তরের ব্যবস্থা করতে পারেননি—মানসীর বাপভাই এ ব্যবস্থাটা করেছেন। গত্যন্তর হিসাবে নয়, বিয়েরই প্রয়োজনে।

তৃপ্তি আর মানসীর মধ্যে এই তুলনাটুকু তুলে ধরার উদ্দেশ্য বাংলার গরিব বড়োলোক সেকেলে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত সাধারণ মেয়ের আসলে যে একই দশা এটা আরও একবার শুনিয়ে দেবার জন্য নয়। এ কথা অনেকে অনেকবার বলেছে—শত শত গল্প উপন্যাসের এইটুকুই আসল ভিত্তি।

হঠাৎ এই পুরানো পচা কথাটা যে টেনে এনেছি তার কারণ আছে। কথাটা পুরানো হতে পারে কিন্তু এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দিক, একটা বিশেষ মর্ম, আজ পর্যন্ত আড়ালেই থেকে গেছে।

অতি কঠোর সত্য। কিন্তু এ সত্য সামনে না রাখলে মানসী আর আমার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে বিবরণ দিচ্ছিলাম তার আসল মানে বোঝা যাবে না : পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তো কথাই নেই !

সমাজের যে মূল নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তৃপ্তি আব মানসীদের জীবন, দুজনের কারও বেলা এতটুকু তারতম্য নেই সে নিয়মের—তারই অভিশাপ মানসীদের সুনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব।

তৃপ্তিদের জীবন হয় পঙ্গু, সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সুখদুঃখের কারবার।

মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা ছড়ানো এলোমেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর আত্মবিরোধে জটিল। সেও তো সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ।

বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ—দু-একটি ঢেউ শুধু গায়ে লাগতে পারে।

তারই মারাত্মক ফল হয় সংগতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা কুৎসিত মিথ্যা মনে হয়। আজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে বাড়িতে এসে মানসী বলত, তোমায় বাড়িতে পাব ভাবিনি। ভালোই হল। মনটা বড়ো ছটফট করছে। ভাবছিলাম বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথাও চলে যাই। তোমার বাড়িটা একবার ঘুরে গেলাম, যদি তুমি বাড়ি থাক ! বেশ আছ, খুশিমতো ফাঁকি দাও।

ফাঁকি দিই না। ফাঁকি বাঁচিয়ে চলি। বেছে বেছে ক্লাস করি, যাতে কিছু লাভ আছে। যেটাতে শুধু সময় নষ্ট তাতে প্রক্সি চালাই।

ভাবছি পড়া ছেড়ে দেব। ভালো লাগছে না।

সে কী ! পরশু না আমায় বললে জীবনে কী করবে একেবারে স্থির করে ফেলেছ ? শেষ পর্যন্ত পড়ে চাকরি করবে ?

বলেছিলাম না কি ? করব তাই—মাঝে মাঝে কেন জানি ভারী বিশ্রী লাগে।

কোনোদিন খুব ভোরে আসত, শুধু মুখে চোখে জল দিয়ে, চুলটুল না আঁচড়েই।

মানুষ কীসে সুখী হয় বলো তো ? কাল ক-টা মেয়ের সঙ্গে একটা বস্তিতে গিয়েছিলাম। ওরা মাঝে মাঝে যায়, রেগুলার ওয়ার্ক করে। আমার কাল শখ হল, দেখে আসি। উঃ কী ভয়ানক অবস্থায় থাকে বস্তির মেয়েগুলি ! অথচ, ওদের তো খুব অসুখী মনে হল না ? কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি।

বলে হাসত, রাত জেগে ভেবেছি আর ভোরে উঠেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি মস্ত পণ্ডিত মানুষ, বয়সে অনেক বড়ো—

হাসি থামিয়ে বলত, ছুতো ভেবো না কিন্তু। তোমার কাছে বুঝতে আসিনি, তুমি কী ভাবো শুধু সেটুকু শুনতে এসেছি।

বস্তিতে পুরুষ দ্যাখোনি ? তাদের সুখী না অসুখী মনে হল ?

পুরুষ ? খেয়াল করিনি !

কোনোদিন রাত নটা-দশটার সময় বাড়ি ফিরে দেখতাম, সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে।

বউদি বলতেন, বেচারা সাতটা থেকে তোমার জন্য বসে আছে ঠাকুরপো।

পড়ার ঘরে এসে মানসী বলত : একটা কথা বলতে এসেছিলাম। ভেবে দেখলাম, থাকগে, দরকার নেই।

এতক্ষণ বসে আছ, বলেই ফেলো না কথাটা।

বলে আর কী হবে ? যাব না ঠিক করেছি।

কোথায় যাবে না ?

বাবা-মা কাল পাটনা যাবেন। ওই সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসতে যাব ভেবে বলতে এসেছিলাম, তুমিও যদি যেতে পার। তারপর ভেবে দেখলাম, পাটনায় আবার কী বেড়াতে যাব ! পরে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে।

এই অনিশ্চয়তা, ক্ষণে ক্ষণে মনের এই দিক পরিবর্তন, এটা অবশ্য আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ছিল না। আমার সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পরেই তার এই অস্থিরতা বেড়েছে।

আমি যদি ভাবুক কবি হতাম তাহলে পরমানন্দে এর মধ্যে আবিষ্কার করতাম প্রেম ! বুঝে নিতাম, আমায় ভালোবেসে ফেলার জন্যই মানসীর এই ছটফটানি।

ভালোবাসা যেন মেয়েদের চঞ্চল অস্থিরচিত্ত করে দেয় ! প্রেমের গুরুভার হৃদয়ে চাপলে বরং চপলমতি দিশেহারা মেয়ে শান্ত হয়, দিশে ফিরে পায়।

শুধু মানসীর অস্থিরতা কেন, সব কিছুরই মনের মতো মানে করার অভ্যাস থাকলে আরও একটা লক্ষণ দেখে অহংকারে ফুলে উঠতে পারতাম অনায়াসে।

আমি একবার মানসীর কাছে গেলে মানসী যেচে পাঁচবার আমার কাছে আসে।

এর সহজ মানে কী দাঁড়াত না যে, তাকে আমি এমনভাবেই জয় করেছিলাম, এমনি সে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল আমার জন্য যে, মেয়েদের একেবারে স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্মকে পর্যন্ত সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়ে হয়েও উপযাচিকা হতে তার বাধছিল না—একবার নয়, বারংবার !

জগতের সবচেয়ে বোকা মেয়েও আপনা থেকে জানে যে এতে নিজেকে সস্তা করা ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মানসীকে তার চেয়েও বেশি বোকা ভাবব কোন বুদ্ধিতে ?

কিন্তু চোখ বুজে ভুল বুঝে খুশি থাকার ধাত আমার নয়। নিজের সঙ্গে ফাঁকির খেলা আমার সয় না। এটা আমি ঠিকমতোই টের পেয়েছি যে, বারবার যেচে এ ভাবে আমার কাছে ছুটে ছুটে এলে আমি কিছু ভাবতে পারি এটা মানসী খেয়ালও করেনি।

তার অস্থিরতার যে কারণ, ঘনঘন আমার কাছে আসবার কারণও সেটাই। এ সব আমাকে কেন্দ্র করে নয়, আমি উপলক্ষ মাত্র। তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে, নিজের এলোমেলো ছড়ানো চেতনাকে একটা সুসংবদ্ধ সুগঠিত রূপ দেবার জন্য সে হয়েছে ব্যাকুল। নিজের উদ্দেশ্যহীন শৃঙ্খলাহীন মতিগতিকে সে অতিক্রম করে যেতে চায়।

নিজেকে সে খুঁজে পায় না। এতদিন বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়নি নিজেকে খুঁজে পাবার। এবার সে উঠে পড়ে লেগেছে নিজেকে অন্তত মোটামুটি গুছিয়ে নিতে—

যাতে এটুকু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে যে অসম্পূর্ণ হই খণ্ডিত হই আর যেমন হই, আমি এই রকম।

আমার জন্যই অবশ্য এটা ঘটেছে, আমার প্রভাবে। কিন্তু একটা মানুষের প্রভাবে আরেকটা মানুষের বদলে যাবার প্রক্রিয়া তো প্রেম নয় !

আমি জানতাম, মানসীও পরে আমায় বলেছে, আমার কাছে বিশেষভাবে কোনো দিক দিয়ে তার জুটেছিল পরম আশ্বাস, অভাবনীয় স্বস্তি। কোনো বিশ্বাস আমাকে তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু করেছিল।

আমি প্রেমাতুর নই, সব সময় তার ওঠাবসা চলাফেরা কথা আর কাজে আমি শুধু মানে খুঁজিনি যে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

দুটো মিষ্টিকথা, একটু প্রীতির হাসি, একটি সদয় চাউনি, শুধু এটুকু থেকেই চেনা আধ-চেনা এমনকী প্রায় অচেনা ছেলে অমনি বুঝে নেয় মানসীর কী হয়েছে ! সত্যই যেন প্রেমের ফাঁদ পাতা রয়েছে ভুবনে—সব সময় সাবধানে হিসাব করে কথাটি পর্যন্ত না কইলে ধরা পড়ে যেতে হবে।

স্বাধীনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুখ না ছাই, এ যেন অভিশাপ ! তুমি বুঝবে না, মেয়ে হলে বুঝতে। সবাই যেন ওত পেতে আছে, সব সময় সকলের সঙ্গে হিসেব করে চলা, এতটুকু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। একজনের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে বলে একটু ঢিল দিয়েছ কী প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে ! একেবারে উলটো ব্যবহার করে ঘা দিয়ে অপমান করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, না বন্ধু, তুমি ভুল করেছ !

মানসী নিশ্বাস ফেলেছিল : তা ছাড়াও বদনাম। মেয়েটা ভারী ইয়ে, ছেলে নিয়ে খেলা করে, বাঁদর নাচায়।

দোষ কি শুধু ছেলেদের ? ছেলেরা কিন্তু ঠিক এই নালিশ করে। কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু ভালো করে মিশলেই—

সমাজটাই পচে গেছে, না ?

আমি হেসেছিলাম। ওই বয়সে সমাজবিদ্ হয়ে পড়িনি—কিন্তু সহজ বুদ্ধি বজায় রাখলে ওই বয়সেও সমাজ পচে যাবার কথা শুনে হাসা যায়। পচে হেজে গেছে আমাদের সমাজ—বুড়োদের মুখে আর তরুণদের সাহিত্যে এ আর্তনাদ শুনে সহজ বুদ্ধি বজায় রাখা যদিও খুব সহজ নয়।

সমাজ পচে গিয়ে থাকলে আমরা বেঁচে আছি কী করে ? মানুষ কি তা হলে বাঁচে ? পচন ধরাবার চেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরে—আমরা দুশো বছর পরাধীন ! গলদ জমেছে অনেক, সেকেলে একেলে এ-দেশি সে-দেশি অনেক কিছু মিলে উদ্ভট খিচুড়ি বনেছে—কিন্তু সমাজ পচেনি। তুমি আপশোশ করছ, ব্যাপারটা আপশোশ করার মতোই। কিন্তু অত হতাশ হবার কিছু নেই। বাস্তব অবস্থা যেমন তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার রীতিনীতি রকমফের হয়েছে—দু-চারজনের রুচি আর পছন্দ নিয়ে তো এ সব গড়ে ওঠে না। সাঁওতালদের সমাজে মেলামেশা এক রকম, তোমার আমার সমাজে আরেক রকম। ভালো হোক মন্দ হোক, তোমার আমার পছন্দ হোক বা না হোক—সবাই আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে যেরকম হওয়া দরকার ছিল তাই হয়েছে ।

মানসী চুপ করে মন দিয়ে কথাগুলি শুনেছিল। গুরুজন নই, অধ্যাপক পণ্ডিত নই, প্রায় সমবয়সি একজন কবি। তার এই সহজ শ্রদ্ধার দাম যে কতখানি ছিল তখন ভালো বুঝিনি। অনায়াসে নিজের প্রাপ্য বলে গ্রহণ করেছি।

যেভাবে লিখলাম এ রকম ছাঁকাভাবে অবশ্য কথাগুলি মানসীকে বলিনি। সাধারণ চলতি আলাপের কথায় ছেড়ে ছেড়ে কেটে কেটে অনেকক্ষণ ধরে বলেছি।

প্রাণ খুলে অবাধে মিশতে চাও ? চাও যে কেউ ভুল বুঝবে না ? দেশটা পরাধীন—সেই পরাধীন দেশে তুমি পরাধীনা মেয়ে ! কত শিক্ষা পেয়েছ তোমরা ? কত সংস্কার কাটিয়েছ ? তোমাদের মালিক আমরা পুরুষরাই রয়ে গেছি অশিক্ষিত, সংস্কারে ভরা।

মানসী বলেছিল, এ সব যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়েই হয়েছে—এত অসহ্য ঠেকে কেন ? আমরাও তো সেই বাস্তব অবস্থায় তৈরি মানুষ।

আমরা অবস্থাটা মানতে চাই না। মুক্তি চাই। পরিবর্তন চাই।

ঠিক ! তুমি ঠিক বলেছ !

চার

লোকে বলবে, তুমি কবিই বটে। এবং তুমি যে বস্তুবাদী কবি তাতেই বা সন্দেহ কী ? এত বড়ো জগৎ পড়ে আছে, জীবনের এত বিচিত্র দিক, মানুষের এত ব্যাপক জীবন-সংগ্রাম—এতক্ষণ ধরে তুমি শোনালে শুধু তোমার মানসীর কথা !

তাও প্রেম শুরু হবার আগেকার কথাটুকু !

আমি বলব, মিছে কথা ! আমি জীবনসংগ্রামের কথাই বলেছি। সংগ্রাম বিমুখ এক মানসীর জীবনসংগ্রামের একটা বড়ো দিকের গোড়াপত্তনের কথা।

সেই জন্যই এত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে বহুদিন পর্যন্ত কেন প্রেমের কথা আমাদের মনেও আসেনি। মানসী যে আমায় ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরেছে সেটা কেন প্রেমের জন্য নয়—তার মোহমুক্তির লড়ায়ের প্রয়োজনে !

আমি জীবনসংগ্রামকে মানি—জীবন আমার কাছে ছন্দিত স্পন্দিত বিকাশধর্মী সার্থকতা। এ সার্থকতার জন্য শত দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ব্যর্থতা হতাশার মধ্যেও মানুষের লড়াই আছে—পলায়ন নেই। আমি আনন্দ আর সুন্দরের উপাসক—তাই আনন্দের ভেজাল মেশানো নিরানন্দ, সুন্দরের মুখোশপরা অসুন্দর, সত্য ও শিবের মার্কা-মারা মিথ্যা ও ফাঁকি আর ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিতে আমি নারাজ।

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমারই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে তাই মানসী মিথ্যা ও ফাঁকির বেড়াজাল ছিঁড়ে মুক্তি আর মনুষ্যত্বের জন্য লড়াই শুরু করেছে।

প্রায় দুবছর আমাকে গুরু করে শিষ্যা হয়ে থেকেছে। একদিনের জন্য প্রেমিকের আদর চায়নি আমার কাছে।

জগতে মানসীর মতো মেয়ে কি আর নেই ? শুধু এই একজন আমার সংস্পর্শে এসে জীবন থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে খাঁটি হতে চাইল ?

তার আগে আর পরে আরও অনেক মেয়ে কমবেশি নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছে আমার কাছে। মানসী কেন বিশেষভাবে আমার কাছে প্রশ্রয় পেল তার কারণ আগেই বলেছি।

এমন সুস্থ সুন্দর দেহশ্রী, এমন সতেজ সজীব রূপলাবণ্য আগে আর আমি দেখিনি।

বউদি বলেন, ঠাকুরপো, একটা কথা বলি। রাগ করো না, তোমার ভালোর জন্যই বলা।

রাগ করব কেন ? তুমি কি আমার ভালো ছেড়ে মন্দ চাও ?

বউদি গম্ভীর মুখে বলেন, আর যাই কর, মেয়ে নিয়ে মাতামাতির বয়স তোমার এটা নয় ঠাকুরপো। একটু-আধটু মেলামেশা করলে সে আলাদা কথা। এত ঘনিষ্ঠতা করলে ভবিষ্যতের কথা ভাববে কখন ?

আমিও তাই ভাবছিলাম।

বউদি খুশি হয়ে বলেন, ভাবছিলে ? লক্ষ্মী ছেলে ! এবার তাহলে ঘনিষ্ঠতা একটু কমিয়ে দাও। বয়সের দিক দিয়ে ভারী বেমানান হবে, বয়েস তো আরও বেড়ে যাবে তুমি মানুষ হতে হতে। তবু, আমি সে কথা ধরছি না। ওকে তুমি চাও, বেশ ওকেই তুমি ঘরে এনো। কিন্তু তার ব্যবস্থা তো করতে হবে ? পাস-টাস করে বেশ একটা ভালোমতো চাকরি তো জোটাতে হবে ? নইলে যে সব স্বপ্নই থেকে যাবে ভাই !

ও বাবা ! তোমরা এতসব ভেবেছ ?

ভাবব না ? তোমার ভালোমন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকব ? মা, উনি, মায়াদি, আমি—আমরা চারজনে ক-দিন ধরে আলোচনা করেছি। আমরা কী চিন্তায় পড়েছি, তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমায় তো জানি আমরা। জোর করতে গেলে, শাসন করতে গেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে। তোমায় বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে এটুকু আমরা আশা করছি।

তুমি তাই বুঝিয়ে দিতে এসেছ ?

বউদি খানিক চুপ করে থেকে বলেন, হ্যাঁ ভাই, বুঝিয়ে দিতে এসেছি। যতই হোক তুমি তো ছেলেমানুষ, সংসারের হালচাল সব তো তোমার জানা নেই। কয়েকটা সোজা স্পষ্ট কথা বলব তোমায়। তাতে কি দোষ আছে কিছু?

বউদি এম এ পাস করে দুবছর মাস্টারি করেছিলেন। আমার ভগ্নী লতিকাকে প্রাইভেট পড়াতে এসে দাদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিয়ে হয়। বউদি নিজের বয়স যত বলেছিলেন এবং এখনও বলে থাকেন, সেটা মেনে নিলে অবশ্য দাদার সঙ্গে তাঁর বয়সটা খুব মানানসই হয়—সেই তুলনায় মানসী ও আমার বয়স নিতান্তই বেমানান। কিন্তু এম এ পাস করে দু-বছর মাস্টারি করে—ক্লান্তি আর হতাশার যে ছাপ এখনও তাঁর মুখ থেকে মুছে যায়নি সেটা কি ওই বয়সে কোনো মেয়ে মুখে আমদানি করতে পারে ? ছ-সাতবছর হয়ে গেছে, আজও বউদি যেন বাসরঘরের সেই নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলছেন মনে মনে, মাগো, বাঁচলাম !

আমি বলি, বউদি, আমার একটু পেট খারাপ হলে তুমি এমন ব্যস্ত হয়ে পড় যেন আমার কলেরা হয়েছে। তোমার কথা মন দিয়ে শুনব না আমি ? বুঝবার চেষ্টা কবব না ?

নিশ্বাস ফেলে আবার বলি, তবে জানই তো, অল্প বয়সে বড়ো বেশি পেকে গেছি। তাই সোজাসুজি স্পষ্ট করে বলো।

সোজাসুজিই বলছি। তুমি তো জানো, মানসীর বাবা নামকরা ডাক্তার, অনেক টাকা করেছেন। ওর এক ভাই আই সি এস। আরেক ভাই নাকি ব্যাবসা করে—

জেলে যেতে বসেছিল।

ওমা, তাই নাকি ?

যেতে বসেছিল, যায়নি। মানসী আমায় বলেছে। বাপ-ভাই সামলে নিয়ে চেপে দিয়েছে ব্যাপারটা। মানসী বলেছিল, ছোড়দার দু-চারবছর জেল হলে ও ভারী খুশি হত।

বউদি হেসে বলেন, ওটা তোমারই শেখানো বুলি, তোমায় খুশি করার জন্য বলেছে।

আমি একটা সিগারেট ধরাই।

বউদি গম্ভীর হয়ে বলেন, রোজ এক প্যাকেট সিগ্রেট খাও। কোনোদিন দেড় প্যাকেটও হয়। সাড়ে-সাতআনা না ? মাসে কত পড়ে হিসেব করেছ ? কলেজের মাইনে, বই, ট্রামের মান্থলি—

আমি তো বাঁধা হিসেবের বেশি টাকা চাই না বউদি !

চাও না কিন্তু খরচ তো কর !

রোজগার করে খরচ করি। লিখে দু-দশটাকা পাই।

অপচয় কর কেন ?

তোমরা অপচয়ের টাকা দেবে না, কী করি !

বউদি মাথা নেড়ে বলেন, যাক যাক ঝগড়া করতে আসিনি ভাই। ও সব কথা পরে হবে। যা বলছিলাম, তাই বলি। মানসী নয় তোমার জন্য পাগল, কিন্তু তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে কী হবে ভেবে দেখেছ ? ওর বাপ-ভাই হেসে উড়িয়ে দেবে কথাটা। কী আছে তোমার ? কী দেখে মানসীকে তোমার হাতে দেবে ? এ সব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে, কিন্তু কী করবে, এই হল সংসারের নিয়ম। ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করছ, এতে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে উঠে-পড়ে লাগো না, নিজের দিকটা গুছিয়ে নাও ? ক-বছর বাদে যাতে নিজের জোরে দাবি করতে পার, কারও যাতে বাধা দেবার সাধ্য না থাকে ? তাই কি ভালো নয় ? আমাদের মুখ চাইতে বলছি না, তোমার সুখেই আমাদের সুখ। মানসীর জন্যেই তুমি মেলামেশা কমিয়ে দাও—ওকে বুঝিয়ে বলো, আজ যে সময় নষ্ট করছ সেটা কাজে লাগালে পরে তোমাদেরই ভালো হবে।

সহজ সত্য কথা। সংসারের সেই চিরদিনের নিরেট নীতিকথা, সব ক্ষেত্রে লাগসই সদুপদেশ। হে তরুণ, যাই তোমার কামনা হোক, লক্ষ্য হোক—যশ চাও, অর্থ চাও, রাজকন্যাকে চাও বা জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও বা ঈশ্বরকে চাও—শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনপ্রাণ সময় শক্তি সব কিছু লাগাও। খাঁটি যুক্তি। কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু মুশকিল এই যে, এ সব বাস্তব নীতিকে মানুষ একপেশে করে নিয়েছে—উদ্দেশ্যের চেয়ে উদ্দেশ্য সাধনের পথ আর প্রচেষ্টাকেই করেছে প্রধান। খাটো কাপড়ের মতো তাই নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।

মানসীকে পাওয়ার কথা তখন পর্যন্ত আমার মনে জাগেনি। তাকে পাওয়ার বাস্তব বাধা অসুবিধার হিসাবও কষিনি, সে সব বাধা কাটাবার উপায়ও খুঁজিনি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, বউদির ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত। সংসারে সব সময় সব অবস্থায় ধরাবাঁধা নিয়মনীতি কলের মতো খাটিয়ে গেলেই চলে না ! সে চেষ্টা চলে বলেই সংসারে নিয়মতান্ত্রিক মানুষদের ঝঞ্ঝাটের সীমা নেই।

আমি বলি, বউদি, সে তো বুঝলাম। কিন্তু কবে আমি মানুষ হব সেই আশায় মানসী হাঁ করে বসে থাকবে ? আমি নয় দেখাশোনা কমিয়ে দিলাম, কোমর বেঁধে মানুষ হতে লেগে গেলাম। এর মধ্যে মানসী যদি আরেকজনের হয়ে যায়, আমার ক্ষতিপূরণ করবে কে ?

বউদি বড়ো বড়ো চোখ করে তাকান।

আমি হেসে বলি, কীসে এই ক্ষতিপূরণ হয় আমি জানি না। তোমার জানা আছে ? তুমি পারবে তো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে ? যদি পার, কথা দাও, আমি তোমার কথামতো চলব।

কী সর্বনাশ ! তুমি কি এখনই ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছ ? পরীক্ষা দিতে দিতে ? আমাদের অমতে, ওর বাপ-ভায়ের অমতে বিয়ে করবে ?

আমি হাসিমুখেই মাথা নেড়ে বলি, ও সব ভাবনাও আমার মাথায় ঢোকেনি। তোমরাই পরামর্শ করে আমায় নিয়ে একটা সমস্যা দাঁড় করিয়েছ। সমস্যাটা যদি সত্যিও হয়, তোমার উপদেশটা কেমন একপেশে আমি তাই দেখালাম। তুমি বলছ মানসীর জন্যই আমার আগে মানুষ হওয়া উচিত—আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানুষ হতে গেলে মানসীকে যদি হারাতে হয় ? তুমি জবাব দিতে পারলে না। মিছে মনগড়া সমস্যা নিয়ে কেন ভেবে মরছ ?

বউদির মুখ দুশ্চিন্তায় কালো দেখায়। তাঁর সুপরামর্শের ফাঁকিটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে আমি শুধু তাঁর মধ্যে নতুন আশঙ্কা জাগিয়ে দিয়েছি মাত্র !

কী সর্বনাশের কথা ! তোমরা সব ঠিক করে ফেলেছ নাকি ?

কী মুশকিল ! আমরা কিছুই ঠিক করিনি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে !

কেউ আর কিছু বলে না। মেঘভরা বর্ষার আকাশের মতো থমথমে মুখ নিয়ে মা করুণ চোখে তাকান। দিদির চোখে-মুখে উদ্যত বজ্রের মতো ভর্ৎসনা দেখতে পাই। চিরদিনের মতো বাবার চিবুকে নিদারুণ দুশ্চিন্তার হাত বুলানো চলতে থাকে। দাদা আপিস কামাই করেন।

অতিমাত্রায় ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে থাকেন বউদি। এ ব্যাপারে তিনি হাল ধরেছেন, সকলকে সামলে চলেন। তাকে ডিঙিয়ে কেউ পাছে আমাকে কিছু বলতে গিয়ে সব বিগড়ে দেয়।

কী নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা যে ঘনিয়েছে পরিবারে ! বাড়ির অল্পবয়সি কলেজের ছাত্র একটি ছেলে সকলের অমতে একজন ধনী প্রতিপত্তিশালী ডাক্তারের মেয়েকে, একজন মস্ত সরকারি অফিসারের বোনকে ফুসলে নিতে চলেছে বিয়ের আইনের সুযোগে। কে জানে কোথায় গড়াবে ব্যাপার ?

আমিও চুপ করে থাকি। মজা দেখতে নয়, ব্যাপার বুঝতে। আমিও থ বনে গেছি। কীসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই পরিবারটি ? একটি ছেলের একটা নিয়মভঙ্গ, একটা অবাধ্যতায় যে ভিত্তি টলে যায়, মনে হয় যেন ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সমস্ত পরিবারটি ?

তেমন কিছু আর্থিক অনটন তো নেই, অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ? অনেক সাধ অনেক আশা অপূর্ণ থেকে যায়, অনেক দুরাশা অনেক স্বপ্ন চিরব্যর্থতার জ্বালা হয়ে থাকে। কিন্তু মানসীকে আমার বিয়ে করাটা এত বড়ো একটা পারিবারিক বিপদ হয়ে দাঁড়ায় কী করে ? পরিবারটিকে জিইয়ে রাখার প্রত্যাশা তো আমার কাছে এদের নেই !

ধীরে ধীরে অলোকদের বাড়ি গিয়ে একটু বসি।

মোড়ের কাছাকাছি ধনঞ্জয়বাবুর পুরানো গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে মাস ছয়েক বাস করছে অলোকরা—সমস্ত পরিবারটি।

একটি উৎখাত হওয়া পরিবার। অলোকের বাবা রামেশ্বরবাবু ওকালতি গুটিয়ে যেটুকু পেরেছেন সেটুকু অর্থসম্পদ কুড়িয়ে সপরিবারে পালিয়ে এসেছেন।

অলোক মেসে থেকে কলকাতায় পড়ছিল। এখন আর পড়ে না। চাকরি খুঁজছে।

অলোকের মা বলেন, এসো বাবা, বোসো।

আলেয়া এলোচুল গুটিয়ে নিতে নিতে বলে, আপনার জায়গাতেই বসুন, গদি পাতাই আছে।

এই একখানা মোটে ঘর—গ্যারাজ ছিল, সামান্য অদল-বদল হয়ে ঘরে পরিণত হয়েছে। রাস্তার দিকের প্রকাণ্ড হাঁ-করা দরজাটা গেঁথে ফেলে পাশের সরু প্যাসেজের দিকে বসানো হয়েছে সাধারণ দরজা। প্যাসেজটাই ঘিরে ঢেকে দুটি অংশে ভাগ করে করা হয়েছে রান্নাঘর আর কলঘর। লম্বাটে রান্নাঘরটুকুতে একজন কোনোরকমে বসতে পারে।

এক কামরাওয়ালা বাড়ি হিসেবে এটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

এই একখানা ঘরে সকলে ওঠে-বসে খায়-দায় ঘুমায়—সকলে ! বেশি রাত্রে কখনও আসিনি, কী কৌশলে বিছানা করা হয় জানি না। কল্পনা করে কূলকিনারা পাওয়া দায়।

সাতজন মানুষ ! রামেশ্বরবাবু, অলোকের মা, অলোক, আলেয়া, আলেয়ার ছোটোবোন মলয়া, তারও ছোটোভাই অশোক—এবং আলেয়ার বর নিখিল।

তাদের বিয়ে হয়েছে বছর চারেক। আমিও রেল-স্টিমারে চেপে অলোকের প্রথম বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।

নিখিলের কিছু রোজগার আছে। ভোরে সে বেরিয়ে যায়, রাত ন-টায় বাড়ি ফেরে। শনি রবি নেই, ছুটি নেই। ভোরে হেঁটে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মাঝে মাঝে কখনও আমাব সঙ্গে দেখা হয়। বয়স হবে ছাব্বিশ সাতাশ কিন্তু ছোটোখাটো রোগা চেহারা আর অপরিণত মুখের ভাবের জন্য আরও ছোটো মনে হয়। মুখখানা শুকনো। শান্ত লাজুক প্রকৃতি। নিজে থেকে কথা কয় না।

আমি যদি বলি, এত ভোরে বেরিয়েছেন ?

থেমে দাঁড়িয়ে মৃদু একটু হাসে, হ্যাঁ, উপায় কী।

আপনার আপিসটা কোথায় ?

ঠিক আপিসে কাজ নয়। এখানে ওখানে ঘুরে—

থেমে গিয়ে নীরবে চেয়ে থাকে। সেটা খুব সহজ প্রশ্ন এবং ঘোষণা : আমাব ঘরের খবর আরও কিছু জানতে চান ? আমি আর একটি কথাও বলব না !

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলে ধরায়। নিজের মনেই বলে, সুবিধে হচ্ছে না, এ কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড়ো খাটুনি।

দিনের বেলা ঘরের কোণে লেপতোশক জমা থাকে। তার উপর গদিয়ান হয়ে বসলে আরাম মন্দ হয না। আমি চটের আসনটা টেনে নিয়ে মেজেতে পেতে বসি।

চারিদিকে তাকিয়ে নিখিলের কথাটা মনে পড়ে। সত্যই এদের বড়ো খাটুনি। সকাল থেকে রাত ন-টা পর্যন্ত তার খাটুনি বাইরে, তারপর এই ঘরটুকুতে শ্বশুর শাশুড়ি শালা শালিদের সঙ্গে বউ নিয়ে রাত্রিযাপনের অমানুষিক খাটুনি।

এদের খাটুনিও কি কম ? এতটুকু ঘরে মানুষের যেখানে নড়াচড়াটা পর্যন্ত অসুবিধার সঙ্গে যুদ্ধের পরিশ্রম, সারাটা দিন রাত সেখানে কাটানো ?

সকলে কী ভাবে যেন চুপ হয়ে গেছে। রামেশ্বর শার্ট গায়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা যায়, এমন একটা সাংসারিক কথার মধ্যে আমি এসে পড়েছি আমার সামনে যে কথার জের টানা কঠিন।

কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। কারণ একটু ইতস্তত করে অলোকের মা রামেশ্বরকে বলেন, তাই করো তবে। চাল আর তরকারিই আনো। শুধু চাল চিবিয়ে তো খাওয়া যাবে না।

রামেশ্বর বলেন, অলোকের জন্য আর খানিকটা দেখব ?

কী দরকার ? পাবে কিনা ঠিক তো নেই। বেলা কম হয়নি।

আলেয়া প্রায় ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়। সোজাসুজি আমাকে জানিয়ে দেয় ব্যাপারটা কী। বলে, সের দুই চাল কিনলে তরকারির পয়সা থাকে না। চাল আর তরকারি ভাগাভাগি করে কিনলে শুধু আজকের দিনটি চলবে। তা, সেটাই ভালো ব্যবস্থা, না, কী বলেন ? শুধু চাল চিবিয়ে খাব কী করে ! আজ তো চলুক, কাল যা হবার হবে।

রামেশ্বর তীব্রদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকায়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে তীব্রতা আছে ভর্ৎসনা নেই—মানসীকে বিয়ে করতে চাই বলে আমার বাড়িতে সকলের চোখে যে ভর্ৎসনা ফেটে পড়তে দেখে এসেছি।

মলয়া বলে, দিদির মুখে আটক নেই !

আলেয়া বলে, খেতে পাই না, মুখে আবার মানের আটক !

রামেশ্বর মলয়াকে ধমক দিয়ে বলেন, তোর অত কথা কেন ? দে, থলি আর ন্যাকড়াটা দে।

রামেশ্বর বেরিয়ে যান। আমার দিকে ফিরেও তাকান না।

অলোকের মা বলেন, কপালে আরও অনেক ভোগ আছে। বলে তিনিও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেন।

আলেয়া বলে, কোথা যাচ্ছ মা ?

ঘুরে আসি।

তিনি চলে গেলে আলেয়া আমায় বলে, বাড়িতে মন টেঁকে না। দিনে দশবার বেরিয়ে যায়। পাড়া বেড়ায় না রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে ! ট্রাম-বাসের পয়সা জোগাতে পারলেই কালীঘাট নয় দক্ষিণেশ্বর। আমাদের সবার চেয়ে মা-র ছটফটানি বেশি।

সে তো হবেই। কেউ একেবারে মুষড়ে পড়েন, কেউ অস্থির হন। সারাজীবন একভাবে সংসার করলেন, এখন শেষ বয়সে—

সংসারটা ভেঙে পড়ছে। কিন্তু সত্যিসত্যি ভাঙছে কই ? তাহলে তো বেঁচে যেতাম !

বোধ হয় দমও নেয় না, এক নিশ্বাসে বলে, ক-টা টাকা ধার দেবেন ?

গোটা চারেক দিতে পারি।

তাই দিন। আমার চাওয়া দরকার আমি চাইলাম, আপনার খুশি হলে দিতেন, খুশি না হলে দিতেন না। এবার ইচ্ছা হয় আসবেন, নইলে আসবেন না। আমার না হলে নয়, কেন ধার চাইব না !

নিশ্চয়, কেন চাইবেন না ? কিন্তু এদিকে আবার কেঁদেও ফেললেন দেখছি !

একটু-আধটু না কাঁদলে বাঁচব কেন ?

অলোক আর সে পিঠোপিঠি ভাইবোন। মানসীর সঙ্গে বয়সের যদি তফাত হয় তো বড়ো জোর এক বছর কম বেশি হবে। সে তো মেয়ে, তার তো দায়িত্ব নেই, তবু কেন সে অসহায় বাপ-মা ভাইবোনদের আঁকড়ে পড়ে আছে, স্বামীর সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগেছে অচল সংসার চালু রাখতে ?

তারা দুটি প্রাণী, যাই জোগাড় করুক নিখিল, দু-জনে দূরে সরে গেলে অনেক ভালোভাবে অনেক নিশ্চিন্তে তারা দিন কাটাতে পারে।

আলেয়ার না হয় বাপ-মা ভাইবোন, নিখিল কেন এটা মেনে নিয়েছে ? এ কোন আদর্শবাদ এদের ? এমনিতেই দুঃসাধ্য জীবনসংগ্রাম। ছেলের সঙ্গে মা বাপের, ভাইয়ের সঙ্গে নিজের ভাইয়ের সম্পর্ক গুঁড়ো করে দিচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী পর হয়ে ঘর ভেঙে পড়ছে, এরা দুজন কেন ঘাড় পেতে নিয়েছে এই বোঝা ?

বিয়ের পরেই নিখিলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার ভাই, সে কাহিনি অলোকের কাছে শুনেছি। বড়ো পরিবার ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে আর খণ্ড খণ্ড ছোটো পরিবার পথের ধারে চুরমার হতে নেমে এসে যে বিষাক্ত তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে চারিদিকে নিখিল তো তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি !

শুধু মাস কয়েক সে বেকার অবস্থায় রামেশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে রামেশ্বরের কাছেই সে বরাবর আছে কিন্তু তার উপর নির্ভর করে থাকেনি একটি দিনের জন্যেও। যেমন হোক উপার্জন করেছে। বেকারির ক-মাস শ্বশুর ভাত দিয়েছিল এই কৃতজ্ঞতাই কি বুকে পুষে রেখেছে নিখিল—আর আলেয়া ?

ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ক-পা এগোতেই মলয়া এসে পাকড়াও করে।

কেমন আমায় ধমক দিল দেখলেন তো ? আমার মাকড়ি বেচে দিয়েছে কি না, আমিই তাই ধমক খাই।

কিশোরী মেয়ের দুটি চোখে কী হিংসা আর ক্ষোভ!

ছেলেমানুষ গয়না দিয়ে কী করবে?

আমি ছেলেমানুষ নই। শাড়ি পরতে দেয় না, নইলে দেখতেন—

আমি মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তোমায় শাড়িও পরতে দেবে, গয়নাও দেবে। ছেলেমানুষ যখন নও, ভাবনা কী? তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে।

মলয়ার দুচোখে বিদ্যুতের ঝলক খেলে যায়।

ছাই হবে। দুদিন বাদে ঝি খাটতে পাঠাবে আমায়, নয় বিক্রি করে দেবে!

মলয়াও দম না ফেলে এক নিশ্বাসে যোগ দেয়, আমায় একটা টাকা দিন। আমি কি ভেসে এসেছি?

সঙ্গে তো আর টাকা নেই।

চলুন আপনার বাড়ি যাব।

টাকাটা তাকে আমি দিই। আমি জানি এ ভাবে তাকে একটা টাকা দেওয়া বা না দেওয়াতে কিছুই আসে যায় না। এটা ভালো কাজও নয় মন্দ কাজও নয়। একটা টাকা না দিতে চেয়ে আমি কি ঠেকাতে পারব চারিদিকের দুর্নিবার শক্তি তাকে যে বিকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

এও আমি জানি যে টাকাটা নিয়ে সে খাবার কিনে খাবে—যাবার পথেই খাবে। আজ খাবে কয়েক আনার, বাকি পয়সা লুকিয়ে জমিয়ে রাখবে কাল পরশুর জন্য।

টাকাটা হাতে পেয়ে খুশি হয়ে মলয়া আমার গা ঘেঁষে আসে। মুচকি মুচকি হাসে।

সে টের পায় না আমার হৃদয় মনে কী আলোড়ন উঠেছে। কী প্রচণ্ড ঘৃণায় আমায় সমস্ত সত্তা ধিক্কার দিতে উদ্যত হয়ে উঠেছে দেবতারূপী সেই জীবনদানবকে, গোপন নখ দাঁতের সঙ্গে এই নিষ্পাপ নির্দোষ কিশোরী মেয়েটিকেও যে নিজের অস্ত্রে পরিণত করে।

একটা বই তুলে নিয়ে বলি, বাড়ি যাও। দেরি হলে বকবে।

বকলে কী হয়? সব সময়েই তো বকছে। আপনার ঘরে কত বই! স্কুলে ভর্তি করিয়ে আমার নামটা কাটিয়ে দিলে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দু-তিনমাস স্কুলে গেলাম, তারা কী ভাবছে বলুন তো?

বইটা গুটিয়ে রাখতে হয়।

ভাবুক না। তোমাদের এখন সময়টা খারাপ পড়েছে—

বাড়িওয়ালার মেয়েটা ইস্কুলে যাবার সময় আজকেও তামাশা করে গেল, কীরে মলুয়া, ইস্কুলে যাবি না? আমার কান্না পায় না বুঝি!

আলেয়া আচমকা টাকা ধার চেয়ে চারটি টাকা পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। সে ছিল আরেক রকম ব্যাপার। মলয়া একটা চেয়ে নিয়ে গা ঘেঁষে এসে মুচকি মুচকি হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে।

তুমি বড়ো ছিঁচকাদুনে হয়েছ মলু।

মলুয়া এক পা সরে দাঁড়ায়। হাঁটুর কাছে মাথা নামিয়ে ফ্রক দিয়ে চোখ মোছে। ভালো ছাপা ছিটের গাউন প্যাটার্ন ফ্রক, পুরোনো বিবর্ণ হয়ে এখন এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টাকাটা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে যায়।

চাইনে আপনার টাকা।

নোট নয়, ধাতুর টাকা। আমার গায়ে লেগে মেঝেতে পড়ে যায়—কিন্তু তেমন ঝনঝন করে বাজে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। মানসী কেন আমার পরিবারের বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরেছি। ধ্বংসের মুখে একটি পরিবারকে দেখলে আরেকটি পরিবারের উঁচুতে উঠবার অবলম্বন হারানোর ভয় আর নীচে নেমে যাবার আতঙ্ক চিনতে কষ্ট হয় না। মানসীর বাপ-দাদার অনেক ক্ষমতা। তারাই আমাদের তুলতে পারে নামাতে পারে।

কিন্তু এ সব চিন্তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে আমার কাছে। একটি কিশোরী মেয়ে আমাকে পারিবারিক জীবনদর্শন থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কাগজ নেই। সাদা ভালো কাগজ। ডায়েরির পাতা বড়ো ছোটো, তাতে কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় না। দেয়াল থেকে ইংরেজি বাংলা দেয়ালপঞ্জিটা নামিয়ে উলটে নিয়ে লিখতে শুরু করি—

চাতকের প্রাণ গেছে
মেঘের আশ্বাস ধ্বনি শুনে !
চাতকিনি কিশোরী রাধার
প্রাণটুকু শুধু ছিল প্রেমের খেলায়—
বজ্রদগ্ধ প্রেমিকের মরণ চিৎকারে
চাতকের প্রাণটুকু গেছে।
ওই মরে পড়ে আছে বিবর্ণ বিশীর্ণ দুর্বাঢাকা,
তৃষার্ত মাটিতে।
কিশোরী মেয়ের মতো
এতটুকু পাখি তার কতটুকু প্রাণ !
দিয়ে গেছে অভিশাপ বজ্রের সমান !

বউদি এসে বলেন, ঠাকুরপো, নাবে না খাবে না আজ ? তোমাকে একটা কথা বলতাম, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না। দেড়টা বেজে গেল, যদি নেয়ে খেয়ে নিতে—

ভীষণ খিদে পেয়েছে বউদি ! দাঁড়াও, চট করে নেয়ে আসছি। খেতে দিয়ে কথাটা বোলো ?

কথা আর কিছু নয়, অনেক ভেবে বউদি একটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। দু-তিনটে বছর যদি অপেক্ষাই না করতে পারে মানসী আমার জন্য, কতটুকু মূল্য আছে তার ভালোবাসার ? একে কি ভালোবাসা বলে ? এমন হালকা যার মতি, এমন অনিশ্চিত যার প্রেম, কেন আমি তার জন্য সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাব, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব ?

তুমি ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলে। যে মেয়ের এটুকু সবুর সইবে না, তাকে হারালে কীসের ক্ষতি !

এত বেলাতেও আজ ভাত ডাল মাছ তরকারি সব গরম। খেতে আমার প্রায়ই বেলা হয়। ঢাকা ভাত ঠান্ডা করকরে হয়ে থাকে। আমি ভাত মাখতে মাখতে বলি, ক্ষতি বইকী ! সব কিছু বাড়বে কমবে [illegible] শুধু ভালোবাসা ঠিক থাকবে মানুষের ! ওটা বাজে কথা। তবে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? এখন বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই, সুবিধাও নেই।

বউদি যেন আকাশ থেকে পড়েন।—ওমা, তুমিই না সকালে বললে—?

কী বললাম ? তুমি বললে মেলামেশা কমিয়ে দিতে, আমি বললাম তা পারব না। বিয়ের কথা তুমিই তুলেছিলে।

ও !

গভীর অতল গহন এক রহস্যের সন্ধান যেন বউদি পেয়েছেন। কল্পনাতীতের মুখোমুখি হওয়ার বিস্ময় দেখা দেয় তার মুখে। সত্যই তিনি বাক্যহারা হয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি কবি। সেটা জানাই ছিল এতদিন। আমি আছি আর আনুষঙ্গিক ওই একটা বাড়তি দিক আছে আমার—আছে থাক, না থাকে না থাকবে, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। আমি ছিলাম একটা মানুষ, আজ পর্যন্ত কবি হয়ে উঠতে পারিনি,—কবিতা লিখেও নয়, কবিতা ছাপিয়েও নয় !

আজ এখন এক মুহূর্তে বউদি যেন টের পেয়ে গেছেন যে তাই তো, এ ছেলেটা যে সত্যই একটা কবি !

একটা মেয়েকে এ বিয়ে করবে না, মেলামেশা চালিয়ে যাবে ! শুধু তাই নয়, ডাল-ভাত মেখে খেতে খেতে ডাল-ভাত খাওয়ার মতো অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেটা ঘোষণাও করে দিতে পারে !

কী বলতে গিয়ে বউদি চুপ করে যান। প্রথম বিস্ময় কেটে যাবার পর তাঁর মুখে নানা বিচিত্র ভাবের খেলা চলতে থাকে। নিজের মনে কী কথা ভেবে বোধ হয় লজ্জাতেই তিনি চোখ বোজেন। চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেন।

দু-একদিনের মধ্যেই টের পাই আসন্ন বিপদের শঙ্কাতুর দুশ্চিন্তার ভাবটা কেটে গেছে সকলের মুখ থেকে। সকলের মুখ শুধু গম্ভীর, আমার সঙ্গে একটু সংযত নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। হঠাৎ ছেলেমানুষত্ব খসে গিয়ে আমি যেন বয়স্ক মানুষের পর্যায়ে প্রমোশন পেয়েছি। সমস্ত পরিবারটি আমাকে নীরব নিষ্ক্রিয় অসমর্থন জানায়, আর কিছুই বলে না।

পরদিন মানসী এসে সকলের পরিবর্তন লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যায়।

বউদির উদাস গম্ভীর ভাব আর ভাসাভাসা কথা শুনে প্রথমে বউদিকেই সে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বউদি ?

কিছু হয়নি তো !

তারপর মানসী প্রশ্ন করে আমাকে। আমার ঘরে এসেই প্রশ্ন করে। আমি মানস চোখে দেখতে পাই আমার ঘরের দিকে আসবার সময় সকলে কী দৃষ্টিতে মানসীকে লক্ষ করেছে !

মানসীর প্রশ্নের জবাবে বলি, ব্যাপার কিছুই না—আবার মনে করলে বেশ গুরুতরও বটে। আমাদের মেলামেশা সবাই পছন্দ করছে না।

মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, কী বিশ্রী জগতে আমরা বাস করি !

মোটেই না। এর চেয়ে সুশ্রী জগৎ তুমি কোথায় পাবে ?

পাঁচ

আমার এক কবি বন্ধু বলেন, রাজপথে হাঁটার সময় তাঁর মনে হয় তিনি যেন মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন ! আর কোনোদিন কবিতা লিখতে পারবেন না। এত রকমের এত মানুষ, কত বিভিন্ন কাজ ও অকাজ, কত রকমের চিন্তাভাবনা কামনা বাসনা, কত রকমের মুখ আর চোখে কতরকমের চাউনি ! কাকে বেছে নেব, কী বেছে নেব কবিতার জন্য ? এমনি যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয় !

পথে মানুষের ভিড়ে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলি,—ভিড়ের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাই। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলি এ সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে আমায় আপন করে নেয়। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পালিশ করা জুতা পরা মানুষটার সঙ্গে অর্ধ উলঙ্গ ধুলোমাখা ফাটা পায়ের মানুষটার পার্থক্য মুছে যায় না, এক হয়ে যায় না আশায় আনন্দে উজ্জ্বল মুখখানার সঙ্গে বেদনাকাতর উদ্‌বিগ্ন মুখ, পাশাপাশি চলতে চলতে জীবনের দু-প্রান্তেই দাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের ছেলে আর আপিসের বুড়ো কেরানি, ধোঁয়া মিশে গেলেও এক হয়ে যায় না কাছাকাছি দুটি মুখের সিগারেট আর বিড়ি। এই বৈচিত্র্যকেই একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে জীবনের একাভিমুখী গতি :

পথে-হাঁটা মানুষ পথের দুদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।

জীবন পেয়ে যে সদ্যোজাত শিশু কেঁদেছে আর মরণের দুয়ারে এসে যে বুড়ো ক্ষীণ নির্জীব ভাবে কেশেছে, তাদেরও বেঁধে রেখেছে জীবনের যে সমগ্রতা, পথ-চলা মানুষের ভিড়েও তার জীবন্ত সত্য রূপ।

যে বেশি বঞ্চিত ? আগামী জীবনে তার সঞ্চয় বেশি। যে বেশি ক্ষুধাতুর ? তার চেয়ে কম ক্ষুধাতুরের সে আগামী দিনের অন্নদাতা।

এই চলমান মানুষ সভায় জমে। একাংশই জমে—কিন্তু সমগ্রেরই তা প্রতিনিধি।

আমার কবিতা শোনার জন্য জমে না ! একেবারে না-ই বা বলি কী করে ? কবিতা গান তো বাদ পড়ে না অতি কড়া মেজাজের রাজনৈতিক সভাতেও।

সুময় বলেন, অনেক লোক হয়েছে কিন্তু !

মানসী বলে, তা তো হবেই। ভাতকাপড়ের দাবির সভাতে লোক হবে না ?

সুময় আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, তুমি বুঝি তাই ভাতকাপড়ের দাবির কবিতা লিখছ ? সহজে পপুলার হবে ?

আমিও হেসে বলি, ভাত-কাপড়ের কবিতা লিখে কবি কি পপুলার হয় ? ভাতকাপড় যারা চায় তাদের প্রাণের কবিতা লিখতে হয় !

মানসী বলে, এই রে, লাগল বুঝি দুই কবিতে !

মানসীর কথায় সুময়ের মুখে একটু হাসিই ফোটে। মানসীর বাড়িতে একদিন আমার একটি সরল প্রশ্নে তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল আলাদা কথা। আমি মস্ত বিজ্ঞের মতো জানতে চেয়েছিলাম, আবৃত্তি করার যোগ্য কবিতা তার লেখা আছে কিনা। পাঁচজনের সামনে—বিশেষ করে মানসীর সামনে—এ রকম প্রশ্নে একজন নামকরা কবির অপমান বোধ হওয়া আশ্চর্য কী ?

কিন্তু আজ মানসী তামাশা করেছে আমাকেও একজন কবি করে দিয়ে—তার সমান পর্যায়ে তুলে ! লাগল বুঝি দুই কবিতে—দুই কবি। অর্থাৎ কবি আমরা দুজনেই। কোথায় সুময় আর কোথায় নব—একজনের নাম শিক্ষিত মানুষ সবাই জানে, সাময়িকপত্রে নিয়মমতো কবিতা বেরোয় এবং যথানিয়মে ইতিমধ্যেই তার দুখানা কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে,—আরেকজন জনসভায় বক্তার মতো আবৃত্তি দিয়ে আসর মাতিয়ে কবি হতে চায় এবং সে ছেলেমানুষ কলেজের ছাত্রমাত্র !

এটা হাস্যকর উপমা !

সুময় তাই সদয়ভাবেই হাসে। কবি বলে মানসী অপোগণ্ড আমার পিঠ যদি দু-একবার চাপড়াতে চায় সেটাই তো প্রমাণ যে তার তুলনায় আমি অপোগণ্ড।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সভাতেই মুছে যায় সুময়ের মুখের হাসি।

পাশাপাশি আমরা বসেছি। তাকে বাদ দিয়ে আমায় বলা হয় সভায় কবিতা শোনাতে। একবার নয় দুবার। এ সম্মান আমার কবিতার প্রাপ্য খুব সামান্যই, আমি জানি মূল্য পেয়েছে আমার আবৃত্তি করার ক্ষমতা।

নতুন কবিকে সহজে কী কেউ মূল্য দেয় ! না দেয় ভালোই করে। নতুবা আজও কী কবির এত মূল্য থাকত জগতে !

কবি হওয়া সহজ নয়।

রাতের পর রাত জেগে অনেক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে জীবনের অনেক মালমশলা জ্বালিয়ে যারা বিদ্বান নাম কিনে অর্থবান হয় আজও জগতে কবি তাদের চেয়ে বড়ো হয়ে আছে !

জীবনপাত করে জগতে যারা কোটি কোটি টাকায় ছিনিমিনি খেলার ক্ষমতাযুক্ত ব্যবসায়ী হয়েছে, কবি আজও জগতে তাদের মাননীয় হয়ে আছে।

মানুষ কি সস্তায় কবি হয় ?

কত অজানা অচেনা কবি কাব্য-সাধনায় প্রাণ দিয়েছে, কাব্যরসিক কি সে হিসাব রাখে ? কবিতা লিখতে চেয়ে মরে গিয়ে কয়েকজন কবি স্মরণীয় হয়েছেন মানুষের। মানুষের ভাববারও সময় নেই যে এঁরা অঘটন নন, অবতার নন। কাব্যসৃষ্টি করতে চেয়ে শত শত কবি যে প্রাণ দিয়েছে— এঁরা সেই সাধনারই প্রতীক। মাইকেল অকালে মরেছেন। আমি জানি কত শত অজানা কবির মরণ-পণ সাধনার তিনি সাফল্য সার্থকতার প্রতীক !

আমার কবিতা আবৃত্তির পর জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেই সভাতে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক যামিনী কর্মকার। তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হয়, বিজ্ঞান ও কাব্যের, বৈজ্ঞানিক ও কবির, কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এবার বুঝি স্বাভাবিক ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে !

সৃষ্টিতে নর আর নারীর যে ব্যবধান—আমার আর মানসীর মধ্যে যে ব্যবধান।

পুরুষ ও নারীর সংঘাত, বিজ্ঞান ও কাব্যের সংঘাত—অ্যাটম বোমাও তো জন্মেছে এই সংঘাতেই ! এই সংঘাতই অ্যাটম বোমাকে পরিণত করবে পুরুষ ও নারীর, বৈজ্ঞানিক ও কবির অ্যাটমিক এনার্জিগত অগ্রগতিতে।

অথচ সভায় আজ সুময়ের কীরকম কাঁদো কাঁদো মুখ ! বিজ্ঞান যেন তাকেই হার মানিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গেই যেন বিজ্ঞানের যত কিছু ঝগড়া, যেহেতু সে কবি !

সত্যিই কি কবি ? কবি কি কখনও এমন ছেলেমানুষ হয় ?

হয়তো হয় !

কত ছেলেমানুষ বৈজ্ঞানিক সস্তায় মানুষকে খুশি করতে চেয়ে নিজের সুখ খুঁজছে—নিছক নিজের সস্তা সাধারণ সুখ, যার জন্য কারও বৈজ্ঞানিক হওয়ার দরকার হয় না !

সভা শেষ হলে মানসী রাগ করেই আমায় বলেছিল, তোমার সঙ্গে চলা দায়।

কেন ?

সব ব্যাপারেই কি তোমার আসল কথা টেনে আনা চাই ?

আমি তো শুধু দুটো কবিতা আবৃত্তি করেছি !

ভূমিকা করোনি ? ভূমিকার নামে বক্তৃতা ?

কোনো কোনো কবিতার একটু পরিচয় দরকার হয়। কখন কী উপলক্ষে লেখা কিংবা...যেমন ধরো দ্বিতীয় কবিতাটা। চাষির মেয়ে পেটের দায়ে ধানকলে খাটতে এসে ধর্ষিতা হয়েছে, হাজার হাজার মন ধানের মধ্যে সে একা কী ভাবছে, তাই হল কবিতার বিষয়। এটুকু না বলে দিলে—

মানসীর মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

আর বিষয় ছিল না ? কবিতা ছিল না ?

কেন, কবিতাটা তো অশ্লীল নয়। একটি কথাতেও কারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

ভূমিকাটা না করলে আপত্তি হত না। কবিতায় যা লিখেছ শুনিয়ে দেবে, ফুরিয়ে গেল। কোথায় কোন চাষির মেয়ে, তার কত বয়েস, ধানকলে কী হল—অত দিয়ে তোমার দরকার কী ?

আমি হেসে বলেছিলাম, দরকার আছে বইকী। নইলে কবিতাটার মানে বুঝত না লোকে।

তারপর চার-পাঁচদিন মানসী আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

ছয়

কবিতা লিখি কেন ?

এক কথায় একভাবে না হোক, মানসী আর তৃপ্তি দুজনেই অল্পদিন আগে পরে আমাকে এই প্রশ্ন করেছে।

একজন খুব গুরুত্ব দিয়ে, আরেকজন হালকা তামাশার সুরে। দুজনকেই আমি পালটা প্রশ্ন করেছি : লোকে কবিতা পড়ে কেন ?

প্রশ্ন করে জবাব এড়িয়ে গিয়েছি, কারণ আমি সত্যই জানি না কেন আমি কবিতা লিখি—কবি কেন কবিতা লেখে ! আর্টের মানে নিয়ে অনেক বই পড়েছি, তর্ক-সভায় হাজির থেকেছি, নিজে তর্কও করেছি। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে অনেক থিয়োরি আর থিয়োরির হরেকরকম ব্যাখ্যার খিচুড়ি—স্বস্তি যেন তাতেই। যাকগে, এ প্রশ্নের আর মীমাংসা নেই ! ধাঁধায় পাক খাওয়াই এর মীমাংসা !

আশ্চর্য এই, এরা দুজন চেপে ধরার আগে আমার খেয়ালও হয়নি যে আমি নিজেও তো কবিতা লিখি, একবার নিজের কথাটা ভেবে দেখি না কেন, আমি কবিতা লিখি কেন—কী আমার দরকার পড়ল কবিতা লেখায় ! এতসব থিয়োরিতে আমি পণ্ডিত—নিজের বেলায় পাণ্ডিত্য খাটিয়ে একবার পরখ করে দেখলে দোষ কী ! পরের মুখে ঝাল খেয়ে খেয়েই কি দিন যাবে ?

কবিতা লেখা বড়ো কষ্ট। বিনা কষ্টে একটা কবিতা তো আজ পর্যন্ত লিখতে পারলাম না ! লিখি আর কাটি, কাটি আর লিখি, একখানা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি কাগজে নতুন করে আরম্ভ করি। যদি বা কখনও একটা কবিতা তরতর করে লিখে গেলাম—মনে হল, এতদিনে সত্যি সত্যি খাঁটি অনুপ্রেরণার বশে খাঁটি একটা কবিতা লিখে বসেছি, এর কমা সেমিকোলনও বদলাবার দরকার নেই। সেই কবিতা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম পরদিন—আবার নতুন করে লিখতে হবে।

ইনস্‌পিরেশন তবে কাকে বলে ?

আমি কি আসলে তবে কবি নই ? ঘষে-মেজে গায়ের জোরে নেহাত চর্চা করছি মাত্র ? কবিতা লিখে নাম করার আসল ব্যাপাবটা বুঝে গিয়েছি : একটা কবিতা লিখে সেটা চেষ্টা করে প্রকাশ করার মধ্যে অকবিত্ব কিছুই নেই। ওখানে শুধু ছেলেমানুষি আর বাস্তববুদ্ধির টানাপোড়েন।

কিন্তু সত্যই আমি কবি কিনা সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?

নাম কিছু হয়েছে বটে। লোকে কবি বলেই খানিকটা গণ্য করছে সত্য। কিন্তু চেষ্টা করে এটুকু ফাঁকি দিতে কি মানুষ পারে না ? আসলে স্বাভাবিকভাবে যে যা নয় সে ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায় দিয়ে খানিকটা তাই হতে পারে বইকী ? ইচ্ছা আর চেষ্টায় সবই খানিকটা সম্ভব হয়।

খাদ্যে অরুচি জন্মে। কাজে আলস্য আসে। রাত্রে ঘুম আসে না। কত যে অপরাধ করেছি এই সদ্য সাবালকত্ব পাওয়া জীবনে তার যেন হিসাব হয় না এমনিভাবে দিবারাত্রি ছটফট করি। কারও কাছে কিছু বলারও নেই। করারও নেই।

বউদি চমকে গেছেন টের পাচ্ছিলাম। একদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় দেহের বিদ্রোহ আর অস্থিরতা অসহ্য মনে হওয়ায় ভাবলাম, আর কেন, এবার আত্মসমর্পণ করা যাক। পুঁটুলি খুঁজে পেতে একটা দশ টাকার নোট আর ধাতুর টাকা পেলাম সাতটা। এতে কী হবে ? বস্তিতে দেশি কোনো নেশায় আত্মহারা হয়ে রাতটা কাটানো যাবে ?

কবির আত্মসমর্পণ মানেই সাময়িকভাবে সংঘাত এড়িয়ে যাবার জন্য সাময়িক পরাজয় মানা। জীবন সংঘাতময়, মহান সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে অনেক বিরোধী ভাবের সংঘাত কবিত্ব লাভেরই একটা অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ সমস্তই আমি জানি। অসামঞ্জস্যকে আয়ত্ত করে এই প্রক্রিয়া থেকেই বেরিয়ে

আসবে নতুন সৃষ্টি। কিন্তু সহ্য যে হয় না ? জাঁতাকলে ক্রমাগত পিষে যাওয়ার মতো, বোমাটির বিদীর্ণ হবার মুহূর্ত দিবারাত্রিতে পরিণত হওয়ার মতো আমার অবস্থা। অপচয় অনাসৃষ্টির মধ্যে এই চাপ নষ্ট করে দিয়ে আমি মুক্তি চাই।

আত্মহত্যা করার চেয়ে এ তো অনেক ভালো।

বউদি পথ আটকাল।

না। সারাদিন খাওনি—সারাদিন ঘরে বসে পাগলের মতো করেছ। এখন আমি তোমায় বাইরে যেতে দেব না।

পথ ছাড়ো। আমি কিন্তু যা খুশি করতে পারি এখন।

যা খুশি কর, পথ ছাড়ব না। এক ঘণ্টা পরে যেয়ো, যদি অবশ্য ঘুমিয়ে না পড়।

ঘুম পাড়িয়ে দেবে ?

দেব।

ভেবেচিন্তে বলছ ? আমি কোন অবস্থায় আছি জেনে বলছ ?

বলছি বইকী। তুমি এখন উন্মাদ। নইলে এত রাতে টাকা নিয়ে নিজেকে ধ্বংস করতে যাচ্ছ ?

উন্মাদের কিন্তু বিচার বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।

কী করা যাবে ? আমি তোমার জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারি, তোমায় বাঁচাতে পারি। চেষ্টা না করে তোমায় কী করে যেতে দেব ?

আমি কড়া সুরে বলি, ছি ! মায়া কর বলে কি বিচার বিবেচনাও বিসর্জন দিতে হবে ?

আমার বিবেচনা ঠিক আছে। তুমি এখন বুঝবে না।

আমি অপলক চোখে চেয়ে থাকি। বাঘের কাছে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়ার মতো এই রূপ যৌবন নিয়ে এখন আমাকে শান্ত করতে চাওয়ার দুঃসাহস কোথা থেকে আসে ? আশা তো শুধু এইটুকু যে আমিই কিছুতে অমানুষ হতে পারব না। আমি যে এখন অন্য সময়ের সেই মানুষ নই, অমানুষিক উন্মাদনার এই স্তরে আমার কাছে এখন সমাজ সংসার নিয়ম নীতি শুধু তুচ্ছই নয় একেবারে অর্থহীন, এটা নিশ্চয় ভালো করে বোঝেনি। নইলে ওই আশাটুকু সম্বল করে শেষরক্ষার ভরসা করত না।

এগিয়ে এসে একটা কাণ্ড করে অদ্ভুত। আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে।

তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেব না। প্রথমে মায়ের মতো চেষ্টা করে দেখি। যদি না পারি তখন দেখা যাবে।

প্রথমে মায়ের মতো চেষ্টা—মা !

জোর করে মাথা তুলে বলি, দম আটকে মরে যাব বউদি। দোহাই তোমার।

বউদি চোখ মুছতে মুছতে বলে, একদিন একটু আদর করতে চাইছি, এটুকুও দেবে না ? তোমার কত সেবা করেছি, তারও কি একটু দাম নেই ? আজ বাইরে গেলে জীবনে আর তোমায় আপন ভাবতে পারব না। মায়া-মমতা সব শুকিয়ে যাবে। সারাটা রাত পড়ে আছে, পরেই নয় বেরিয়ে যেয়ো।

আদর সয় না বউদি। হার্টফেল করবে মনে হয়।

আজ ফেল করবে না। একদিন পরীক্ষা করেই দ্যাখো না কী হয়, ওষুধ খাওয়ার মতো আদরটা মেনে নাও ? পালিয়ো না কিন্তু, খাবার আনছি। নিজের হাতে তোমায় খাইয়ে দেব। আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শোবে।

তার সে রাত্রির সর্বাঙ্গীণ আদরের সত্যই বর্ণনা হয় না।

আমার ভিতরের আগুন যে কামাগ্নির চিতা নয়, কবি আমি যে গীতগোবিন্দের ঐতিহ্যের জের টানতে বসিনি, এটা বুঝাবার মতো গভীর দৃষ্টি আর বোধশক্তি সে কোথায় পেল কে জানে!

শুধু কথায় নয়, সেবায় নয়, বিনা দ্বিধায় তার তরুণ কোমল অঙ্গের নিবিড় স্নেহস্পর্শ দিয়ে বিদ্রোহী শিশুর মতোই আমাকে সে জয় করেছিল।

সত্যই স্নেহ করত। কিন্তু এই দুর্লভ উদার চেতনা সে কোথায় পেয়েছিল যে স্নেহস্পর্শের সীমা কোনো রীতিনীতির আইনে বেঁধে দেওয়া নেই, মায়ের কোলে স্তন পান করতে শিশুর সর্বাঙ্গে যে পুলকের সঞ্চার হয়, বালক না হলেও সেদিন তখন আমি তার ঘনিষ্ঠ স্পর্শে তেমনই আনন্দের স্বাদ পাব—আজও অবাক হয়ে ভাবি।

সামনে বসে নয়, পাশে গা ঘেঁষে বসে বাঁ হাতে আমায় জড়িয়ে গায়ে চেপে ধরে রেখে অন্যহাতে ভাত মেখে মুখে গেরাস তুলে সে আমায় খাইয়েছিল, তার কোমল অঙ্গের স্পর্শে সর্বাঙ্গে আমার রোমাঞ্চ আর শিহরন বয়ে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল আমার একার জগতে, বর্ষণহীন সজল নিবিড় মেঘে ঢাকা আকাশ আর শুষ্ক তপ্ত ধুধু করা মরুভূমির জগতে হঠাৎ পেয়ে গেছি একাধারে মূর্তিমতী মা আর প্রিয়াকে।

সত্য কথা বলি। প্রথমে মোটেই ভালো লাগেনি। কোমল হোক মধুর হোক বাঁধনে আটক পড়ার আতঙ্কে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড আতঙ্ক জেগেছিল।

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জল খেতে গেলে প্রথমে যেমন ঢোঁক গেলা যায় না, মনে হয় তৃষ্ণা আর জলের বিরোধ যেন গলা টিপে ধরেছে, তার স্নেহসিক্ত আদর নিতে প্রথমে আমার তেমনি বেধে গিয়েছিল।

ভেতরটা সত্যই যেন আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল তার অনুপম স্নেহের রসে ধীরে ধীরে সরস করে আনল।

তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আমি যেন জুড়িয়ে গেলাম। শান্ত আর সহজ হয়ে গেলাম।

আমায় ঘুম পাড়িয়ে বউদি কখন চলে গিয়েছিল জানি না। সকালে উঠে রাতের কথাটাই ভাববার চেষ্টা করছিলাম, বউদি চা নিয়ে এল গম্ভীর মুখে।

কত সেবাই যে তোমার চাই !

একরাত্রে জগৎ যেন আমার ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। চা খেতে খেতে হেসে বললাম, নাই বা বাঁচাতে আমাকে !

তাই নাকি ! তোমার তাই মনে হবে। কিন্তু এটুকু না করলে সংসারে আছি কেন ? গা বাঁচিয়ে পেট পুরে খেয়ে শাড়ি গয়না পরতে ? বড়ো বড়ো কথা জানিনে ঠাকুরপো, আমাদের অনেক দোষ, অনেক সংকীর্ণতা। কিন্তু সংসারটি ছাড়া আমাদের কী আছে বলো ? চারদিকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। স্নেহ মায়ার কারবার করে বসেছি, উপায় কী ! নিজের দোষে তুমি রোগ করেছ, কিন্তু তোমায় ধ্বংস হতে দিলে আমিই জ্বলে পুড়ে মরতাম না ?

বউদির চোখে জল দেখে কী বলব ভেবে পাই না।

বউদি চোখ মুছে নিজেই আবার বলে, তুমি ব্যাটাছেলে, তেজি ছেলে, নিজের পথ তুমি খুঁজে নেবেই। কিন্তু এই বয়সটা বড়ো বিশ্রী। সাদামাটা সোজা কথা খেয়াল থাকে না। একদিকে ঝোঁক গেলে সামলাতে পারে না। মানুষ শরীর সর্বস্ব নয়, কিন্তু শরীরটা ডিঙিয়ে গিয়েও কিছুই হয় না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বউদির কথা শুনি।

দশ-এগারোবছর থেকে আমাদের এ সব শিখতে হয় ঠাকুরপো। তুমি খুব সংযমী ছেলে—

মানসীর সঙ্গে এত মিলেও ?

বউদি শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে বলে, বাহাদুরি কোরো না, ওতে মোটেই বাহাদুরি নেই। তোমার এই বাহাদুরির কথা টের পেয়েই তো ভাবনা হচ্ছিল। তোমার খালি বাইরের সংযম—আর ভেতরে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। এ কখনও সয় মানুষের ?

উন্মাদনা কি অসংযম ?

সীমা ছাড়িয়ে গেলে অসংযম নয় ? সামঞ্জস্য না থাকলে অসংযম নয় ? তাই তো বলছিলাম এ বয়সে ছেলেরা বোকা হয় কিন্তু তোমার মতো বোকা খুব কম ছেলেই হয়। অন্য ছেলেরাও হয়তো এ রকম আরম্ভ করে, খালি ভেতরের তাপটাকেও চড়িয়ে যায়। কিন্তু খানিক এগিয়ে তাদের সব ভেঙে পড়ে, ভেতরে বাইরে একটা সামঞ্জস্য হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তো আর সাধারণ ছেলে নও, তোমার সব খাপছাড়া ব্যাপার। বুদ্ধিটাও যে তোমার আবার ঢের বেশি চোখা। নাওয়া খাওয়া ঘুচে গেছে, এক ঘণ্টার জন্য ঘুম হয় না, শরীরের যন্ত্রণায় ছটফট করছ—তবু কি একবার খেয়াল হবে যে ভেতরের জ্বরের জন্য এ রকম হয়েছে, আমার আর কোনো রোগ নেই ?

ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করি, বাইরের সংযমটা এ অবস্থার চিকিৎসা নাকি বউদি ?

বউদি হেসে বলে, সংযম কেন বলছ, সামঞ্জস্য বলো। অন্য চিকিৎসাও আছে। তুমি কবি, ভাবুক মানুষ, ভাবাবেগ তাতিয়ে তাতিয়ে অন্তর্জ্বর তুমি করবেই। কিন্তু সেটা সীমার মধ্যে রেখে করো, অন্যদিকেও তাকাও। দু-একদিন না খেলে কিছু হয় না, বরং মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভালো। কিন্তু খিদে যখন মরে যাচ্ছে—তখন খিদের প্রাণটা বাঁচাও কাব্য রেখে ? ঘুম আসে না—ঘুমটা আনার ব্যবস্থা কর ?

তার মানে স্বাস্থ্য ?

স্বাস্থ্যটা কি ফেলনা ? গত সপ্তাহে কটা কবিতা তুমি লিখেছ ঠাকুরপো ?

লিখেছি অনেকগুলি। লিখে আবার পুড়িয়ে ফেলেছি।

বউদি জয়ের হাসি হাসে। হাসবার অধিকার সে অর্জন করেছে বইকী। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে আমি যে কথা বলি, জীবনের যে মূলনীতি প্রচার করি, আজ আমাব দরকারের সময় সেই কথাগুলি সে আমায় শুনিয়েছে। আমার হারানো খেই ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে।

বউদির স্নেহে আমার বিশ্বাস ছিল না। সে অবিশ্বাসও আমার একমুখী উগ্র ভাবচর্চাব ফল। জীবনের মানে যেমন বাঁধা হয়ে গিয়েছিল অনুভূতির তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবার চড়া পর্দায়, একাভিমুখী প্রবল বন্যার মতো নিয়ম নীতি বিচার বিবেচনা বর্জিত উদ্দাম স্নেহ ছাড়া স্নেহের মূল্যও ছিল না আমার জগতে। কাল তার স্নেহে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আজ ফিরে পেলাম তার সহজ বাস্তব বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা।

ঘরের একটি বউ, রাঁধে-বাড়ে পাঁচজনের সেবা করে আর সংকীর্ণ স্বার্থ শানায়—সেও নিজেব মতো করে জানে যে যোগসাধনার মতোই কাব্যসাধনারও নিয়মনীতি আছে, যা না মানলে মুশকিল হয় ! সেও বোঝে যে আভ্যন্তরীণ জগৎটা বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয় !

শুধু জানাবোঝা নয়, একজন আত্মবিস্মৃত বিপন্ন কবিকে অতি কঠিন মুহূর্তে সামলে নিয়ে ধাতস্থ করতেও পারে !

কী ভাবে যে ধীরে ধীরে জুড়িয়ে শান্ত হয়ে আসে চারিদিক। এক শান্তিময় গভীর অবসাদ অনুভব করি। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে টের পাই আমার সমগ্র সত্তা কোন অবর্ণনীয় অসহনীয় অবস্থা লাভ করেছিল—সাধারণ অবস্থার চেতন-অনুভূতির সঙ্গে তার কেমন আকাশ-পাতাল তফাত।

শান্ত স্বাভাবিক হবার আগে এটা টেরও পাইনি।

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এই অবস্থান্তর।

মনে পড়ে, কেন কবিতা লিখি এই প্রশ্নের একটা জবাব নিজের কাছে খুঁজে পাবার জন্য ব্যাকুল হবার পর দেহমনে একটা অদ্ভুত তন্ময়তার ভাব নেমে আসছে অনুভব করেছিলাম। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, চেনা অচেনা সমস্ত মানুষ আর বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। আমার ইচ্ছাই নিয়ন্তা সব কিছুর !

আমার আনন্দে জগৎ আনন্দময়, আমার বেদনায় বিশ্বসংসার বিষণ্ণ নিঝুম। ছাতের কোনার আবর্জনার ছোটো চারাটি থেকে গাছপালা পশুপাখি মানুষ সব আমারই রসাস্বাদে জীবনরসে থমথম করছে।

কেন কবিতা লিখি এ তার জবাব নয়। জবাব আমি এ ক-দিনে পাইনি। সাধকের সমাধি লাভের মতো এ হল কবির ক-দিন নিজের অন্তরে তলিয়ে যাবার অবস্থা।

সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পরদিন বেলায় ঘুম ভাঙে। রসকুণ্ডে ডুব দিয়ে উঠে আসার পরেও কাল ঘুমানো পর্যন্ত একটা চটচটে অনুভূতি ছিল দেহমনে, আজ সকালে সেটাও সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

স্নান করে চা খাবার খেয়ে মানসীর কাছে যাবার কথা ভাবছি, সে নিজেই এসে হাজির হয়। মুখে তার দুশ্চিন্তার বোঝা।

আমার তাজা ভাব দেখে সেটা খানিক কেটে যায়। কিন্তু উদ্‌বেগ সে বেশিক্ষণ গোপন রাখতে পারে না।

কদিন তোমার কী হয়েছিল ?

কেন বলো তো ?

আমি যেন কিছুই জানি না !

মানসী ক্লিষ্ট চোখে চেয়ে থাকে। কত দুর্ভাবনা, কত সংশয়, কত প্রশ্ন যে উঁকি মেরে যায় তার চোখে !

খানিক পরে মৃদুস্বরে বলে, সত্যি করে বলো। নেশা করেছিলে ? ও রকম হয়ে গিয়েছিলে কেন ?

আগে বলো কী রকম হয়ে গিয়েছিলেম, তারপর বলছি কী হয়েছিল।

মানসী ভেবে বলে, কী জানি, বলা বড়ো মুশকিল। কী ভাবে তাকাতে, কী ভাবে কথা কইতে, সব সময় কেমন যেন একটা—। জ্বরবিকারের রোগী যেমন করে সেই রকম ! অথচ এদিকে জ্ঞান ঠিক আছে, পাও টলছে না। কথা যা বলেছ ক-দিন, শুনে মনে হয়েছে যেন কোনো মহাপুরুষের আত্মা-টাত্মা ভর করেছে। আমায় অধ্যাত্মবাদ বুঝিয়ে দিলে আধঘন্টা ধরে, এমন আর সত্যি কারও কাছে শুনিনি। জানা কথাই বললে সব কিন্তু মনে হল তোমার কাছে শোনার আগে যেন এক বর্ণও বুঝিনি। তাতে আরও ভয় হয়েছিল।

পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ভেবেছিলে তো ?

নখ খুঁটতে খুঁটতে মুখ তুলে মানসী বলে, মিছে বলব না, কথাটা মনে হয়েছিল।

আমি হেসে বলি, কী হয়েছিল শুনবে ? অসাবধানে পা পিছলে আমার ভাবজগতের রসের ডোবায় তলিয়ে গিয়েছিলাম।

মানসী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুঝিয়ে বলার পরেও তার সে দৃষ্টি ঘোচে না।

এ রকম তো প্রায়ই হবে তোমার ? নইলে কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে হবে। আমি জানি, একটি ছেলেকে দেখেছিলাম, কীর্তন করতে করতে দশা লাগত। প্রথমে অনেকদিন পরে পরে লাগত, শেষে এমন হল, কীর্তনেরও দরকার হত না। দুদিন ঠিক থাকে, দুদিন ঘনঘন দশা লাগে।

তাকে অভয় দিয়ে বলি, কবির কি ও রকম দশা সহজে হয় ? এ একটা অঘটন ঘটে গেল। অনেকদিন থেকে অনেকগুলি যোগাযোগ ঘটছিল। আসল ব্যাপারটা শুনবে ? আমার নিজেরই ভাব আবেগ চিন্তা অনুভূতি সব কিছু দিয়ে নিজেকে জানবার জন্য একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিন দিন সেটা বাড়িয়ে চলেছিলাম। সব কিছু উঠে আসছিল ওই স্তরে। তোমার হাসিটা ভালো লাগে, সেখান থেকে চলে এসেছিলাম বিশ্বের হাসিকান্নার মানে দিয়ে আমাকে বুঝবার ব্যাকুলতায়। আমাকে মানে নিজেকে সেটা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় ? এ কি আর বারবার মানুষের জীবনে ঘটে ? ব্যাপারটা তো বুঝে গিয়েছি।

মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, দাদা যেবার প্রথম মদ খেল —পরদিন ঠিক এই কথা বলে সকলকে ভরসা দিয়েছিল। খেলে কেমন লাগে জানবাব কৌতূহল ছিল—জেনে গিয়েছি। আবার খেতে যাব কেন ? আজকাল রোজ খায়।

ওটা নেশা।

এটা ?

কবিতা লেখাকে তুমি মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করছ !

মানসীর কাছে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিই কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে এসেছে, শহরের ছাড়া ছাড়া ভাঙা ভাঙা শব্দগুলি পেয়েছে এক রহস্যের ইঙ্গিত, তারাভরা আকাশে ছড়িয়ে গেছে সেই রহস্যময়তারই নিঃশব্দ আহ্বান, আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলির কথা ভেবে এক গভীর ব্যাকুলতা জাগে আরেকবার সেইখানে ফিরে যেতে। কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত ছিল ওই কয়েকটা দিন ! এই এক মাটির পৃথিবীতে একই পরিবেশে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সাধারণ চলতি অস্তিত্বের মধ্যে কী অপরূপ রহস্যময় রোমাঞ্চকর জগতে চলে গিয়েছিলাম !

ইচ্ছা করলে আবার যেতে পারি ! আজ না হোক কাল না হোক ইচ্ছা করলে দুদিন বাদে আবার আমি পৌঁছতে পারি অপার্থিব সেই ভাবাবেশের জগতে, ক টা দিন আত্মহারা হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থায়।

নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাই। হে বাংলার কিশোর তরুণ কবি, কী মায়াসংকুল মারীসংকুল বিপজ্জনক কঠিন তোমার পথ ?

সাত

এই মাটির জীবনকে আমি ভালোবাসি। মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।

এই শহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।

আমায় তারা জানে না, চেনে না।

কিন্তু আমি তো তাদের অবিচল দৃঢ় আহ্বান শুনি। কে তুমি আসছ নবাগত কবি, ভাষা দাও, ভাষা দাও ! আমরা তোমারই পথ চেয়ে মূক হয়ে আছি। হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এসো !

কী রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর এই কবি হবার প্রস্তুতি ! আমাতে যেন আর আমি নেই। বৃহত্তর জীবনের টানে আমি যেন সব হারিয়ে ফেলতে বসেছি কিন্তু খুশির টানে শিকড়গুলি উঠছে না, একটি একটি করে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হচ্ছে শিকড় !

এ যে কী কষ্টকর প্রক্রিয়া, যে কবি হয়নি সে কী বুঝবে ?

মানসী বলে, সত্যি, সে কী বুঝবে ? আমি কবি নই, আমিও বুঝি না।

আমি মানসীর হাত চেপে ধরি।—বড়ো একা লাগছে। এসো না একসাথে থাকি ?

তা, আমি কবি মানুষ। প্রস্তাবটা এ রকম আচমকা এই ধরনের কোনো একরকমভাবে একদিন আসবে মানসীর এটা জানাই ছিল। কিন্তু আমি এমন শিশুর মতো একা থাকতে ভয় করে বলে তাকে

সাথে থাকার আবেদন জানাব, এটা বোধ হয় সে কল্পনাও করেনি। বয়স কম হোক, কবি হই, মানুষটা আমি বেশ একটু জবরদস্ত। মানসীকে কত বিষয়ে অভয় দিয়েছি ঠিক-ঠিকানা নেই।

এখনই ? তুমি কিছু একটা করার আগেই ?

বউদি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় হেসে ফেলত ।

ঘরসংসার পাতছি না। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। শুধু—

মানসী মুচকে হাসে।

সবাইকে বলবে তো এ কথাটা ? আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব, শুধু--?

সবাইকে বলার দরকার !

অন্তত তোমার আমার বাড়ির লোককে তো বলতে হবে ? আমাদের মতলব কী না জেনে তারা ছাড়বে কেন !

মানসী তেমনিভাবে মৃদু মৃদু হেসে যায়।

আমি শান্ত সুরেই বলি, তা নয়, তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি আমি যেমন যাতায়াত করছি তেমনই করব। তোমার আমার মধ্যে শুধু একটা বোঝাপড়া হবে।

ওঃ ! সেই বোঝাপড়া ?

মানসী ভ্রু কুঁচকে বিস্মিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে আবার তার মুখে রহস্যের হাসি ফোটে।

নাঃ, কবি হলে কী হবে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ ! আমার ভুল হযনি, সত্যি এখনও তোমার মধ্যে একটা শিশু আছে। তা বোঝাপড়া হবার আগেই তুমি যে বড়ো হাত ধরেছ আমার ?

হাত ধরতে পারি।

তাই নাকি ! তা এত কথা বকবক না করে হাত ধরে টানাটানি করে দেখলেই তো তোমার এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা চুকে যেত ! হয় আমি হাত ছাড়িয়ে নিতাম নয় তোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম। এ বোঝাপড়াটা লোকে ওভাবেই করে, মুখের কথায় হয় না। সংসারে সবাই জানে, তুমি এটুকু জান না ? মেয়েরা মুখে এক কথা বলে, মনে অন্যরকম ভাবে, কাজে অন্যরকম করে ?

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি, তুমি বুঝতে পারছ না। এটা ওই সস্তা বোঝাপড়া নয়। মাঝে মাঝে একা বড়ো কষ্ট হয়, তখন আমি তোমায় চাই। কষ্ট যে কীরকম হয় তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। শরীর মন দুয়েরই ক্ষতি হয়। মুশকিল এই যে, আমার কোনো অবলম্বন নেই। একা একা সামলাতে হয়। তুমি আমার অবলম্বন হবে।

মানসী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কবিতা লেখার জন্য এ রকম হয়, না ?

না লিখলেও হয়।

কলম ধরে লেখ না লেখ, ব্যাপারটা তো একই।

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে মানসী বলে, আমার একটা কথা শুনবে ? দু-তিনবছর তুমি কবিতা লেখা বন্ধ রাখো।

কথাটা শুনে আমার হাসি পায়।

বন্ধ রাখতে চাইলেই কি বন্ধ রাখা যাবে ? তুমি আমায় শখের কবি ধরে নিয়েছ ! আমার প্রকৃতি হল কবির, কবিত্ব আমার স্বাভাবিক ধর্ম।

তাই নাকি ! নিজের ওপর কন্ট্রোল নেই ?

কী কন্ট্রোল ? নিজের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ করা কি কন্ট্রোল ? গায়ের জোরে সেটা করা যায়, আমি নষ্ট হয়ে যাব, বিকৃত হয়ে যাব। ধ্বংস করে দেওয়া যায়, দু-তিনবছরের জন্য খুশিমতো বন্ধ রাখা যায় না।

মানসী চেয়ে থাকে। কথাটা পরিষ্কার হয়নি।

একটা বিশেষ শক্তির বিকাশ হচ্ছে। এ তো একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন ঘটতে পারে যে, দু-চারবছর কবিতা লেখার দিকে কিছুমাত্র ঝোঁক রইল না, একেবারে ভুলে রইলাম। সে হল একটা স্টেজ। কিন্তু জোর করে সেটা ঘটানো যায় না।

মানসী তবু চেয়ে থাকে।

যেমন ধরো, কাল বিকালে কলোনির ধারে তোমার বয়সি একটি মেয়েকে দেখলাম। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরেছে, কলে কলসি ভরছে—জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। রাস্তায় গাড়ি চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো ? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ ! কাল থেকে মনের মধ্যে ঘুরছে মেয়েটির চাউনি। আজ পর্যন্ত কবিতায় কত মেয়ে বউ জানালার ফাঁক দিয়ে, দরজার আড়াল থেকে, রেলে নৌকায় গাড়িতে রাস্তায় পথের লোকের দিকে চোখ তুলে চেয়েছে—সবাই তারা মেয়ে। তাব বেশি দাবি তারাও করেনি। এ মেয়েটি বলছে, আমি মেয়ে নই, আমি মানুষ ! ওর এই কথাটাকে ভাষা দিতে আমার মধ্যে কবিতা ভাঙছে গড়ছে। একটি কবিতা বেরিয়ে আসবেই।

তোমার পথে দেখা ওই মেয়েটিই বুঝি জগতে প্রথম বলেছে যে, আমিও মানুষ ? আর কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের দাবি তোলেনি ?

আমার সশব্দ হাসি মানসীকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করেছে দেখে হাসি বন্ধ করে বলি, এই তো, এইখানেই কবির সঙ্গে তোমাদের তফাত ! তোমরা চল যন্ত্রের মতো, নতুন কথা ধরতেই পার না। এটা মেয়েদের সে দাবি নয়। এ মেয়েটি বলছে না যে, মেয়েজাত বলে আমায় তুচ্ছ কোরো না, আমিও পুরুষের মতোই মানুষ ! এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যত্ব দাবি কবা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড়ো কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনও করছে। কিন্তু ওই বয়সের ও রকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবি ছাড়া আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার কাছে যা নারীত্বের মর্যাদা, মানুষের মতো বাঁচার জন্য ও মেয়েটি তা অনায়াসে চুলোয় দিতে পারে। আবার দরকার হলে সে জন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে।

তুমি কী করে জানলে ?

সত্য জানা যায়।

মানসী আচমকা উঠে দাঁড়ায়।

কালপরশু তোমার কথার জবাব দেব।

লক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বিকালে হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাড়ি যাবার সময় পথের ধারে সেই কলোনিব গায়ে সেই মেয়েটিকে দেখতে পাই। আজ সে কলসিতে জল ভরছে না। পরনের শাড়িখানাও তার ছেঁড়া নয়, নতুন এবং দামি। একা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তার এ পাশে মহিমের পান-বিড়ির দোকানের সামনে বেঞ্চটায় পা তুলে উবু হয়ে বসে কলোনির গেঞ্জিপরা সতীশ বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে, নব কবি যে ! শোনো, শোনো।

কাছে গেলে বাসের জন্য দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, একটা হিল্লে হয়েছে মেয়েটার ! একটা গান শেখাবার চাকরি পেয়েছে। মস্ত বড়োলোকের বাড়ি।

ভালোই তো !

ভালো বইকী। গান না জানলেও মেয়েদের বেশ গান শেখাবার কাজ জুটে যায়। আমাদের পোড়াকপাল আর খোলে না !

সতীশ সবে বিড়ি বানানোর কাজ শিখছে। এখনও একটানা বানাতে পারে না। শ-খানেক বানিয়ে বেঞ্চটায় এ ভাবে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে দু চারমিনিট বিশ্রাম করে নেয়।

হাঁটতে হাঁটতে সতীশের কথা ভাবি। গায়ের জ্বালাটা তার একার নয়, নালিশটা মেয়েটির বিরুদ্ধে নয়। বড়োলোকের বাড়ি মেয়েটির কাজ জুটেছে এ তো একটা রূঢ় বাস্তব সত্যের এ পিঠ মাত্র। এ সত্যের ও-পিঠও আছে এবং সতীশদের সেটা অজানা নয়।

যে কারণে তাদের পোড়াকপাল আর খোলে না সেই কারণেই মেয়েটিকে এ ভাবে কাজ জুটিয়ে নিতে হয়। সতীশদের যদি বিড়ি বানানো শিখতে না হত, মেয়েটিরও এ রকম কাজ জুটে যাবার সুযোগটা আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হত না।

হয়তো ওই সতীশের অন্তঃপুরেই সে অন্যবেশে হাসিমুখে অন্যকাজ করত—তার নিজের সংসারের কাজ।

হারাণবাবুর বাড়ি পৌঁছে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবনীর সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখে বুঝতে পারি এই বাড়িতেই আমার পূর্বতন ছাত্রী লক্ষ্মীকে গান শেখাবার কাজ সে পেয়েছে। কাজ পেয়েছে বলেই এতটুকু পথ সে এসেছে বাসে এবং আমার চেয়ে আগে এসে পৌঁছেছে।

অবনীকে প্রশ্ন করি আমায় ডেকেছেন কেন?

অবনী বলে, আমি জানি না।

অগত্যা ভেতরে একটা খবর পাঠিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করি।

শুনি মেয়েটি অবনীকে বলছে, আমার গানের বিদ্যা সামান্য। বাড়ির মেয়েরা দুদিনে টের পেয়ে গেছেন।

অবনী বলে, টের পাক। সারেগামা শেখাতে ওস্তাদ হতে হয় না।

আপনার বোন মোটেই খুশি নন।

আমার বোন আপনাকে রাখেনি তমাল দেবী।

তবে আর কথা কী।

নিশ্চয়। আপনার ফাইন গলা। একটু গান শিখলে রেডিয়ো সিনেমায় আপনার কত রোজগার হত।

ভিতরে আমার ডাক আসে। ডাকতে আসে লক্ষ্মী স্বয়ং—এই সময়ের মধ্যেই সে আরও বেশ খানিকটা বড়ো হয়ে গেছে বোঝা যায়। একেই বোধ হয় বলে কলাগাছের বাড়।

আমায় দেখে লক্ষ্মী একগাল হাসে। ভেতরে যেতে যেতে জানিয়ে রাখে, আপনার জন্য মন কেমন করছিল।

আমিও তার দরদের সামান্য চাহিদা মেটাতে অকৃপণের মতো বলি, আমারও খালি খালি তোমার কথা মনে পড়েছে।

শুনে সকালবেলার তাজা রোদের মতো হাসি ফোটে, লক্ষ্মীর মুখে।

রমা বলে, বসুন। ভালো তো সব? সকালে এলে ভালো করতেন, বাবার সঙ্গে দেখা হত। যাকগে, আসল কথাটা আমি বললেও হ'ব।

আপনিই বলুন।

কোথাও কাজ করছেন?

না।

এখানে কাজ করবেন? আপনার কাছে পড়ার জন্য বজ্জাত দুটো ওত পেতে আছে। আপনাকে অবশ্য আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম মামাবাড়ি, ক-দিন হল এসেছি। এসে দেখি এ দুটো আরও গোল্লায় গেছে। মাস্টার যে আছে তাকে কেয়ারও করে না।

আমাকে করবে কি ?

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, করব ! নিশ্চয় করব। যা বলবেন শুনব।

রমা হেসে বলে, ওই দেখুন। আপনি কী দিয়ে যে ওদের বশ করলেন ! কবিদের বোধ হয় কোনো স্পেশাল কোয়লিফিকেশন থাকে ? ভালো কথা, আপনার কবিতার বই বেরিয়েছে ?

একটি বেরিয়েছে।

আমায় একটা দেবেন ? না, কিনে নেব ?

নিজের পয়সায় ছেপেছি, কিনে নিলেই ভালো হয়। শেষ হলে আবার ছাপতে হবে তো।

সে আমায় চাকরি দিতে চায়, আমার কবিতা পড়তে তার অসীম আগ্রহ, তবু আমি বিনামূল্যে তাকে একটি কবিতার বই উপহার দেব না—এতে তার আঘাত লাগবে ধরেই নিয়েছিলেম। মুখ দেখে বুঝতেও পারি আঘাত সে পেয়েছে।

তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আঘাতটা একেবারে বাতিল করে দিয়ে সে আমাকে আশ্চর্য করে দেয়।

হেসে বলে, বুঝেছি। ঠিক কথা। কবিতা বিলি করার জিনিসও নয়, উপহার দেওয়ার জিনিসও নয়। আপনি কারুকে বই উপহার দেননি—দেবেনও না। ঠিক ধরিনি ?

ঠিক ধরেছেন। তবে কি না কবিতার বই বলে এ নিয়ম নয়।

তবে ?

রোজগার করে বইটা ছাপতে হয়েছে।

লক্ষ্মী তমালের কাছে গলা সাধতে যায়। রমা নিজে আমাকে চা আর খাবার এনে দিয়ে লক্ষ্মণকেও ভাগিয়ে দেয়, বলে, যা ভাগ, খেলা করগে যা। মাস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি।

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসলে আমারও মন কেমন করছিল। কবিরা লোক ভালো নয়, নানারকম মায়া জানে !

হেসে বলি, কবিরা ও সব বশীকরণের মায়া জানে না, মায়া-মমতাকে মানতে জানে। সবাই বলছে, টাকাই সব, টাকা দিয়েই সব কেনা যায়—শুধু কবি বলছে, না, টাকার চেয়ে প্রাণটা বড়ো। অন্যেরা সুযোগ-সুবিধামতো এ কথা বলে কিন্তু দায়ে ঠেকলেই উলটো গায়। কবির ওই এক কথা। মরে গেলেও এ বিশ্বাস সে ছাড়বে না। কবি ভালোবাসাকে বড়ো করে, মানুষও তাই কবিকে ভালোবাসে। আর কোনো ম্যাজিক জানা নেই কবির।

এটা কি সোজা ম্যাজিক হল ? চারিদিকে হীনতা, স্বার্থপরতা, মানুষের বিশ্বাস গুঁড়িয়ে যায় না ? তার মধ্যে স্নেহ মায়া এ সবের পক্ষ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো কী সহজ কাজ ! কবিরা না থাকলে আমরা কবে ভুলে বসে থাকতাম যে ভালোবাসাটাসাও আছে মানুষের জীবনে, শুধুই স্বার্থের হিসাব আর পয়সার লেনদেন নয়।

একটু থেমে রমা বলে, কোনো কোনো আধুনিক কবি নাকি প্রেম ভালোবাসা এ সব উড়িয়ে দিচ্ছেন ? বলছেন বাস্তবটাই সত্য ?

রমার প্রশ্ন আমায় আশ্চর্য করে দেয়। সে যে এদিক দিয়েও ভাবে এটা কল্পনাও করিনি।

কোনো কোনো কবি তাই মনে করে। দুঃখ দারিদ্র্য ব্যর্থতা নোংরামি এ সব দিয়ে প্রেম ভালোবাসাকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা তো চলেছে বড়ো স্কেলে—ফাঁকির কারবারটাই সংসারে বেশি। এই অবস্থাটাকেই তারা বাস্তব ভেবে বসে। প্রেম ভালোবাসাটাও যে মানুষের জীবনে বাস্তব এটা ভুলে যায়। প্রেম বলতে ধরে নেয় ফাঁকা মিথ্যা রোমান্স।

খুব দুর্লভ বলে বোধ হয়। কটা মানুষের জীবনে আর—

প্রেম ? জীবনে আসল বাস্তব প্রেমের ছড়াছড়ি। দুর্লভ ওই মিথ্যা রোমান্সটা—দুর্লভ কেন, অসম্ভব। জগতে কারও জীবনে ওটা সত্য হয়ে ওঠেনি। ব্যাপারটা কী জানেন ? ভাবাবেগ চরমে

উঠতে পারে, মানুষকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিতে পারে, পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু এটা হল মানুষের নিজের ভেতরের ব্যাপার—যার ভেতরে ঘটছে শুধু তারই ব্যাপার। প্রেম এ স্তরে উঠতে পারে, দুজন মানুষ পাগল হতে পারে পরস্পরের জন্য। কিন্তু ভাববাদী মানুষ তাতেই সন্তুষ্ট নয়। বাস্তব উন্মাদনা নয়, তার রোমান্স চাই—মানুষের রক্তমাংসের দেহ নেই ধরে নিলে ওই উন্মাদনা যে পদার্থ হবে, সেই জিনিসটি চাই।

কে জানে, এ সব বুঝিনে অত !

দিন দুই ভাববার সময় চেয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। মানুষের সভ্যতা আজ দেউলিয়া হয়ে যেতে বসেনি, এক বিরাট রূপান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে : সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনের সমস্যা তারই প্রতীক। ভাব, চিন্তা, আদর্শ, মহত্ত্ব, প্রেম, হাসি, আনন্দের পুরানো খোলসটা খসে যেতে দেখে দুর্ভাবনার সীমা নেই যে, জীবনটাই বুঝি দেউলিয়া হতে বসেছে।

লক্ষ্মী আর লক্ষ্মণকে পড়াবার কাজটা নেব কি না ভেবে ঠিক করবার জন্য আমি দুদিন সময় নিয়েছি, মানসীও দুদিন সময় নিয়েছে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য। না ভেবে ঝোঁকের মাথায় কিছু করার সাধ্য আমাদের নেই—প্রাণ যা প্রাণপণে চায়, সেটাও নয় !

লাখপতি হারাণের বাড়ি আরামের চাকরি, মাস গেলে নগদ একশো টাকা, প্রতিদিন চা আর ক্ষীর ছানা খাঁটি ঘিয়ের খাবার, মাসে কয়েকদিন কয়েকটা উপলক্ষে দুপুর বা রাত্রের রাজসিক ভোজন---আরও যে কত আদর আপ্যায়ন তার হিসেব দেওয়া দায়। রমা আদুরে মেয়ে হারাণের, সে আমাকে চাকরিতে নিতে ব্যাকুল। সাংসারিক খাতে হাজার-দুই-আড়াই বাঁধাধরা খরচের সম্পূর্ণ কন্ট্রোল তার। কলেজের পড়াশোনা বজায় রেখে এ কাজটা করার জন্য কিছুমাত্র চিন্তারও দরকার নেই—শুধু অবসরটুকু দিয়েই কাজটা করা যায়, তাও সম্পূর্ণটা নয়, আংশিক দিলেই চলে। আমারও খেলাধুলা সিনেমা-দেখা আরাম বিলাস আড্ডা দেওয়া ব্যাহত করতে চায় না রমা—শুধু যে সময়টুকু আমার জীবনে বাহুল্য সেই সময়টুকু আমার আশাতীত মূল্য দিয়ে কিনতে চায়।

তবু আমি চাকরিটা নেব কি না ভাববার জন্য সময় চেয়ে নিই দুদিনের।

মানসীর কাছেও আমি কিছুই চাইনি। তার জীবনের এতটুকু এদিক ওদিক না করে চেয়েছি একটু স্নেহ--চিরদিনের জন্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করার শর্তে।

তবু মানসীও দুদিন সময় নিয়েছে ভেবে দেখবার।

মধ্যবিত্তের জীবনে সব ব্যাপারেই যেন আজ এই দ্বিধা আর সংশয়।

কবিতায় পর্যন্ত !

কবির প্রাণটা পর্যন্ত যেন তার নিজের কবিতায় সংক্রামিত হবার প্রয়োজন বিবেচনা করে দেখতে সময় চেয়ে নেয়,--ভেবেচিন্তে হিসাব করে না দেখে কবিতা পর্যন্ত লেখা চলে না আজ !

লেখার পরেও পুনরায় বিবেচনা করার দরকার হয়।

এসপ্ল্যানেডে সিনেমাটার সামনে ফুটপাতে এই দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এদিকে সিনেমা হোটেল সাজানো দোকান পেশাদার পোশাকে শহরের সেরা রূপ, ওদিকে বিরাট গড়ের মাঠ, মিথ্যা কলঙ্কের প্রতীক মনুমেন্টের নীচে হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশ।

সমাবেশ আজ সব দিক দিয়ে মানুষের যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকার চায়।

ওই সভায় আবৃত্তি করার জন্যই নতুন একটি কবিতা লিখে এনেছিলাম—প্রতিকার চাই। যাচ্ছিলাম সভার দিকেই। জনসমাবেশের দিকে চোখ পড়ায় এখানে হঠাৎ থেমে গেছি। হঠাৎ দ্বিধা জেগেছে—কবিতাটা কি ঠিক হয়েছে ? সভায় পড়া কি উচিত হবে ? প্রতিকারের দাবি ভিক্ষা চাওয়া হয়ে ওঠেনি তো আমার কবিতায় ?

এ খটকা না মিটিয়ে, আবার ভালো করে বিবেচনা করে না দেখে, কবিতাটা তো পড়া চলে না !

সুময়ের সঙ্গে মানসীকে সিনেমায় ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হই না। তাকেও ভেবে দেখতে হবে বইকী। ভেবে দেখার জন্যই সে সময় নিয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে মানসী একটু হাসে। সে হাসির মানে : ভয় নেই। এ কিছু নয় !

নিখিল চানাচুরের প্যাকেটটা প্রায় আমার মুখের ওপর তুলে ধরে বলে, নিন না, ঘরে তৈরি ভালো জিনিস !

পরক্ষণে আমায় চিনতে পেরে বলে, ওঃ, আপনি !

আমি একটু হাসি। নিখিল তবে এই চাকরি করে !

নিখিল বলে, কী চাকরি করি জেনে গেলেন তা হলে !

দোষের কিছু নেই। অনেকেই করছে।

দেখুন, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবেই। রোজ সারাদিন ফিরি করছি, চেনা লোকেব নজর এড়ানো যায় না। বাড়িতে কথাটা ফাঁস করবেন না, এইটুকু দাবি কিন্তু জানিয়ে রাখছি। আপিসে কাজ করি, না চানাচুর ফিরি করি, আপনার তো কিছু আসে যায় না তাতে ! বাড়িতে যদি খবরটা জানান, রাস্তায় আপনার মাথা ফাটিয়ে জেলে যাব। বুঝলেন ?

আপনাকে তো চিনতে পারছি না ?

থ্যাঙ্কস্ ! ধন্যবাদ ! জয় হিন্দ !

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখিল শান্ত সংযত দৃঢ়স্বরে পথচারীদের বলে, চানাচুর কিনুন, চানাচুর। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ঘরে তৈরি চানাচুর—হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়। শিক্ষিত লোকের সায়েন্টিফিক চানাচুর কিনুন—উদ্‌বাস্তুকে সাহায্য করুন। ঘরে তৈরি খাঁটি আসল চানাচুর !

কালীঘাটগামী বাসের জানালা থেকে আলেয়া তার দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে দেখতে পাই। এখানে স্ট্যান্ড নেই, গাড়িতে রাস্তা বন্ধ বলে বাসটাকে দাঁড়াতে হয়েছে। রোজ সারাদিন রাস্তায় চানাচুর ফিরি করলে শেষ পর্যন্ত আপনজনের চোখ সত্যই এড়ানো যায় না !

মলয়া নিখিলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, আলেয়া তার মুখে হাত চাপা দেয়।

বাস ছেড়ে দিলে আমার সঙ্গে আলেয়ার চোখোচোখি হয়। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিখিল চানাচুর ফিরি করে চলে, ওদের দিকে তার নজর পড়েনি।

সভার দিকে পা বাড়াই। কবিতা না পড়ি, বক্তৃতা তো শোনা যাবে আর নতুন সুরে নতুন ভাষার গান।

দু-চারজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় জমায়েতের প্রান্তে। কথা হয় দু-চারটা। ভিতরে অস্বস্তি ও অস্থিরতা বোধ করেই চলেছি। এই জমাট জনতার দিকে তফাত থেকে চেয়ে কবিতাটি পড়া সম্পর্কে সংশয় জাগার সঙ্গে এটা অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম।

সবার পিছনে যে নবদা ?

অধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার চেয়ে বয়সে ছোটো রোগা এই কিশোর কবির শ্রান্ত বিবর্ণ মুখ দেখলেই মনে হয় সারাদিন রোদের মধ্যে বুঝি টো টো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মুখের তাজা হাসিটা না থাকলে তাকে অসুস্থ মনে হত।

মাঝে মাঝে পিছনেও থাকতে হয়। শুধু সামনে এগিয়ে থাকলে পিছন পর হয়ে যায়।

অধীর খুশি হয়ে বলে, বাঃ, ফাইন বলেছ নবদা !

আমাকে তার ভালো লাগে, আমার কথা ভালো লাগে কিন্তু আমার কবিতা তার একেবারে পছন্দ হয় না। আমার যে কবিতাটি চারিদিক থেকে প্রশংসা পেয়েছে সে কবিতা পড়েও সে খুশি হয়নি, উদাসীনের মতো বলেছে, কী আছে এতে ?

এটা চাল নয়। তার আন্তরিকতায় আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। অন্য কবির কবিতা সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার মতের অনেকবার মিল ঘটতে দেখেছি, তাই আমার কবিতা সম্পর্কে প্রায় সকলের সঙ্গে তার মতের তফাত আমার কাছে সত্যই আশ্চর্যজনক মনে হয়।

পকেট থেকে নতুন কবিতাটি বার করে তার হাতে দিয়ে বলি, দ্যাখো তো কেমন হয়েছে ?

ছোটো কবিতা, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই সে মন দিয়ে পড়ে। আমি অপেক্ষা করে থাকি, পড়া শেষ হলে কখন সে ভাসা-ভাসাভাবে মন্তব্য করবে, এই হয়েছে এক রকম আর কী !

কিন্তু আজ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকায়, তার দুচোখে উদ্দীপনা। বলে, বাঃ, অদ্ভুত ভালো হয়েছে কবিতাটা ! কোথায় দেবেন ?

কে জানে এ কী রহস্য। যে সব কবিতা সম্পর্কে আমার নিজের কোনো সংশয় নেই এবং অনেকের কাছে যেগুলি অসাধারণ ভালো কবিতা, সে সব কবিতা পছন্দ হয়নি অধীরের। আর যে কবিতাটি নিয়ে আমার নিজেরই দ্বিধা সংশয়ের অন্ত নেই, সেটি তার অদ্ভুতরকম ভালো লেগে গেল !

এটা ভালো লাগল কেন ?

এতে সত্যি প্রাণ আছে।

প্রাণ আছে ? আমার অন্য কবিতায় প্রাণ ছিল না, এটাতে আছে ? সম্প্রতি ভাবোন্মাদনার যে গুরুতর প্রক্রিয়া ঘটে গেছে আমার মধ্যে তারপর এটি আমার প্রথম লেখা কবিতা।

সে জন্যই কি প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এই কবিতাটিতে—অধীর যাকে প্রাণ বলে ?

এবং প্রাণ আছে বলেই কি আমার এত দ্বিধা ? কবিতাটি সভায় পড়ার যোগ্য হয়েছে কিনা এই সংশয়ের পীড়ন ?

কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু এই একটি কবিতা নিয়ে নয়।

কবি হিসাবে আমাকে তবে বদলে দিয়ে গেছে প্রক্রিয়াটা ? এবার থেকে যা লিখব অধীরের ভালো লাগবে ?

কিন্তু তার তাৎপর্য তো সাংঘাতিক ! তার মানেই তো দাঁড়ায় যে অধীরের ভালো লাগলে আর দশজনের ভালো লাগবে না : এতদিন যা ঘটেছে এবার তার উলটোটা ঘটবে !

কবিতাটি তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দিতে হবে। শুনতে হবে দশজনে কী বলে।

অধীর বলে, ক্লাবের একটা মিটিং আছে কাল দুটোয়। আসবে ? কবিতাটি শোনাবে ?

কোথায় হবে ?

সুময়বাবুর বাড়ি।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলি, যাব।

বাড়ি থেকে বেরোবার ঘণ্টাখানেক আগে ডাকে তৃপ্তির একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি—নব, পত্রপাঠ আসবে, দরকারি কথা আছে।

চিঠি সে কদাচিৎ লেখে। অনুমান করতে কষ্ট হয়নি যে, ব্যাপার খুব সহজ নয়।

ফেরার পথে দোকান থেকে দুটি বিশেষভাবে তৈরি পান কিনে তাদের বাড়ি গেলাম।

তৃপ্তির বাবা বনমালী মানুষটা খুব শান্ত এবং এক রকম বাক্যহীন। বাজার করেন রেশন আনেন আপিস যান, বাড়ি ফিরে চুপচাপ বসে থাকেন। কথা বলতে এত অরুচি আমি খুব কম মানুষের দেখেছি।

কেমন আছেন ?—আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু একটু মাথা হেলালেন, মুখ কিছুই বললেন না।

তৃপ্তির মা কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন—এত বয়সে আবার সন্তান হওয়ায় প্রথমে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন টের পেতাম, কয়েক মাসেব মধ্যে সে ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

বলেন, এতদিন আসনি যে নব ? বাড়ির সব ভালো তো ? সাগর বলছিল তোমার কথা। এসে গিয়েছ ভালোই হয়েছে, খবরটা তোমায় জানিয়ে রাখি। মেয়েটার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। ওরা চাইছিল ফাল্গুনেই হোক, আমরা বৈশাখে দিন ফেলেছি। ধীরে সুস্থে আয়োজন করে কাজ করাই ভালো।

ছেলে খোঁজা হচ্ছিল বহুকাল থেকেই। খবরটা অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ পর্যন্ত একটা লেগেও যায় এমনিভাবেই।

ছেলেটি কেমন ?

তৃপ্তির মা আনন্দে প্রায় গদগদ হয়ে বলেন, খাসা ছেলে পেয়েছি বাবা। আমার পিতিমের মতো মেয়ে, পয়সার অভাবে কানা-খোঁড়া কার হাতে সঁপে দিতে হবে ভেবে বাতে ঘুম হত না। তা ভগবান মুখ তুলেছেন। রাজপুত্তুরের মতো দেখতে, কোনো খুঁত নেই। চারশো টাকার চাকরিতে ঢুকেছে, হাজার টাকার গ্রেড না কী বলে তাই হবে। এ ছেলের দিকে কি চাইবার ভরসা হত আমাদেব ? না ঠিকমতো দাবিদাওয়া করে বসলে সাধ্যে কুলোত ? মেয়ে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ছেলেব. .

মনের আনন্দে তৃপ্তির মা অনর্গল বকে যান। হঠাৎ থেমে বনমালীকে বলেন, ফটোখানা দেখাও না নবকে ?

ফটো দেখে বোঝা যায় তিনি বেশি বাড়িয়ে বলেননি। সাতাশ-আটাশবছর বয়সের অত্যন্ত সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবকের ছবি। সেই সঙ্গে অত ভালো চাকরি,—সত্যই এটা অঘটন বলতে হবে।

অবশ্য, তৃপ্তির চেহারার হিসাবটা ধরলে আর খুব বেশি অঘটন বলা যায় না। এ রকম সুন্দরী মেয়েও সংসারে গন্ডা গন্ডা মেলে না। সব সময় দেখে দেখে তার রূপের হিসাবটা সত্যই আমাদের খেয়াল থাকে না। গরিব কেরানির মেয়ে।

তৃপ্তির সেই গা-ভাসানো কথা মনে পড়ে—যেমন জুটবে, তাই সই ! গরিব কুৎসিত বুড়ো বরের জন্যও নিজেকে সে প্রস্তুত করে রেখেছে। এ রকম অসাধারণ ছেলে জুটে যাওয়ায় নিশ্চয় তারও খুশির সীমা নেই।

রান্নাঘরে সে ভাইবোনদের ভাত দিচ্ছিল। আমায় দেখেই বলে, তোমার আসবার সময়টা বেশ !

আমি পান দুটি বাড়িয়ে দিই। হাতে নিয়ে সে জানালা দিয়ে পান বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পান খাই না।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তৃপ্তির এমন মেজাজ আর কখনও দেখিনি। রাগটা আমার উপর নয় এটা অবশ্য জানা কথাই, ইতিমধ্যে কোনো অপরাধ করার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু এ কীরকম রাগ যে, গায়ের জ্বালায় আমার উপহার দেওয়া পান ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় ?

রান্নাঘরের তেলে ধোঁয়ায় চিটচিটে বালবের মিটমিটে লালচে আলোয় তাকে আজ অপরূপ দেখায়। এতখানি মনোযোগ দিয়ে আমি বোধ হয় এ পর্যন্ত কোনোদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখিনি।

দাদার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।

আপিস থেকে ফেরার পথে ছেলে পড়িয়ে সাগরের ফিরতে রাত সাড়ে নটা হবে। বোনের ভালো সম্বন্ধ স্থির হয়েছে কিন্তু বোনকে পার করেও যে তার অমানুষিক খাটুনি কমানো চলবে সে ভরসা কম। তার নিজের বউ সন্তান-সম্ভবা। বাপের বাড়ি গেছে।

কতটুকু ভাড়া বাড়ি, গায়ে গায়ে ঘর। শুনতে পাই পাশের ঘরে তৃপ্তি মাকে বলছে, ওদের কিছু লাগলে দিয়ো।

ঘুম পাড়াচ্ছি, উঠব কী করে ?

আমি তা জানি না।

তোর হয়েছে কী বল তো ?

কী হবে ? আমি তোমাদের বামনি নই।

থমথমে মুখ নিয়ে সে ঘরে আসে। চোখের চাউনি দেখে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না যে এই মেয়েটির প্রকৃতি স্বভাবতই অতি ধীর ও শান্ত, দুঃখবেদনা অপমানও সে চিরদিন নম্রভাবে মেনে নেয়।

বিয়ের ব্যাপারে কি কোনো ফাঁকি আছে ? এমন ফাঁকি যা তৃপ্তির পক্ষে পর্যন্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ? আসল কথা গোপন করে তৃপ্তির মা কি মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন আমাকে ?

রাগে আমার রক্তেও যেন হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তাই যদি হয়—

ব্যাপার কী ?

বলছি। তুমি একবার বম্বে যেতে পারবে ?

তেমন যদি দরকার হয় কেন পারব না ? কিন্তু কী হয়েছে খুলে বলবে তো আগে ?

তৃপ্তি মুখোমুখি বসে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।—যত শিগগির পার আমাকে বম্বে নিয়ে যেতে হবে। মামার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি পার সব ঠিকঠাক করে নাও—। টাকাও তোমাকে জোগাড় করতে হবে।

আমার সঙ্গে তুমি বম্বে যাবে ? একলা ?

যাব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

কীসের পীড়নে এমন দিশেহারা হয়ে গেছে তৃপ্তি ? যে সন্দেহটা মনে জেগেছিল সেটা আরও দৃঢ় হয় আমার মধ্যে। বুঝতে পারি যে, আসল কথা টেনে আনতে হবে আমাকেই, গুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা এখন তৃপ্তির নেই। মনের আলোড়নটা চেপে শান্ত থাকতে আমারও রীতিমতো লড়াই করতে হয়।

বলি, তোমার মামা কী বলবেন, তোমার মা বাবা সাগরদা কী বলবেন আর লোকে কী বলবে—সে সব কথা পরে তুলছি। হঠাৎ এভাবে বম্বেতে মামার কাছে পালাবে কেন সেটা আগে বুঝিয়ে বলো। কারণটা যদি সে রকম হয় সত্যি, তা হলে অবশ্য ও সব ভাবনা তুচ্ছ করতেই হবে। বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে ?

তৃপ্তি নীরবে সায় দেয়।

ছেলে তোমার পছন্দ নয় ?

না।

মাসিমা তাহলে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বললেন আমাকে ? ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর, ভালো চাকরি করে—ফটো দেখলাম কার ?

মা মিছে বলবেন কেন ? ফটোও ঠিক দেখেছ।

তবে ?

তৃপ্তি মুখ তুলে সোজা আমার মুখের দিকে তাকায়। তীব্র চাপা গলায় বলে, তবে মানে ? আমার পছন্দ হয়নি, ব্যস্। আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই ? একজনের ভালো চেহারা আর ভালো চাকরি থাকলেই পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে ?

সেই তৃপ্তির মুখে এই কথা ! যেমন-তেমন একটা যার হলেই চলত, রাজপুত্রের মতো ছেলে খুঁজে আনার পর তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এবং এমন অসাধারণ ভালো পাত্রে তার মন উঠছে না।

অপছন্দ হল কেন ?

জানি না। ভাবলেও আমার দম আটকে আসছে, মাথা ঘুরছে।

এ ভাবটা হয়তো কেটে যাবে।

তৃপ্তি দৃঢ়স্বরে বলে, না, কেটে যাবে না। আমি মরে গেলেও রাজি হব না।

দ্বিধা সংশয়ের লেশটুকু নেই তৃপ্তির। তার মেজাজ, তার দিশেহারা উতলা ভাব আর সেই সঙ্গে এ রকম একটা চরম ও গুরুতর সিদ্ধান্ত একেবারে স্থির করে ফেলা—এর মধ্যে ফাঁকি নেই। সব ঠিক করে ফেলেছে বলে সে একেবারে কথাই আরম্ভ করেছে আমার সঙ্গে বম্বে মামার কাছে পালিয়ে যাওয়ার ! ফলাফল সবই সে মেনে নিতে প্রস্তুত।

আকাশ-পাতাল ভাবি। ভেবে কূলকিনারা পাই না। অনুভূতির এক রহস্যময় জগৎ থেকে সবে পাক দিয়ে ফিরে এসেছি মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়। আরেক রহস্যময় জগতের সাড়া যেন অনুভব করি, চেতনার প্রান্ত থেকে যেন হাতছানি দেয় স্বাদ না জানা আনন্দ বেদনা।

অনেক ভেবে বলি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও না ? তুমি তো ছেলেমানুষ নও, তোমার এ রকম অনিচ্ছা দেখলে—

তৃপ্তি মুখ বাঁকায়। ভর্ৎসনার চোখে বলে, কী জানাব ? তুমি কবি মানুষ, বন্ধু মানুষ, তোমায় জানালাম। মাকে বাবাকে দাদাকে কী বলব ? কেনর কী জবাব দেব ?

জবাব কিছু নেই। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাবার কথা বলিনি। ওঁরা ধরেই নেবেন যে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে অনেক ঝঞ্ঝাট হবে, লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু উপায় কী ? চুপচাপ সব সয়ে যাবে। ওদের কাছে কোনো কারণ দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। তুমি শুধু গোঁ ধরে থাকবে, জিদ ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে অগত্যা ভেঙে দিতেই হবে।

তৃপ্তি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

এটাই তুমি ভালো উপায় মনে করলে ?

তাই তো মনে হচ্ছে। কেন তোমার অমত, কী বৃত্তান্ত এ সব না বুঝলেও এটা যদি ওঁরা বোঝেন মরে গেলেও তুমি রাজি হবে না—বিয়ে ভেঙে না দিয়ে উপায় কী থাকবে ?

তৃপ্তি ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তাকে হঠাৎ কেমন শান্ত মনে হয়।

কী যেন ভাবতে ভাবতে বলে, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে বম্বে পালিয়ে গেলে ভালো হত না ?

হেসে বলি, এভাবে পালাবার মানে বোঝ না ?

মানে ? আমি তো মানসীর মতো বিদুষী নই, কোত্থেকে মানে বুঝব ?

বলতে বলতে তৃপ্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলে, চা করছি।

আট

সুময়দের বাড়ি চিনতাম না। অধীর ঠিকানা দিয়েছিল। বাড়িটা খুঁজে বার করে দারোয়ানশোভিত গেট, ঘোড়াশোভিত আস্তাবল, মার্বেল পাথরের মূর্তি, ফানুস, দেয়াল ঝাড়, অয়েলপেন্টিং ফরাশ প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ির মানুষ, কর্মচারী আর চাকরের পোশাক ও চালচলন মিলিয়ে প্রথমেই মনে হল এ বাড়িতে এ যুগের কবি জন্মায় কী করে ? সুময় হয় কবি হিসাবে ফাঁকি নতুবা সে তার পরিবার ও পরিবেশের জীবন্ত স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব।

ঘরবাড়ি আসবাবপত্রে শুধু নয়, চালচলনেও গত শতাব্দীকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। বৈঠকখানায় ডাকা হয়েছে মানসীদের ক্লাবের একটি সাহিত্যের বৈঠক, ফুলপাতা দিয়ে ঘরটি সাজানো হয়েছে যেন এ বাড়িতে আজ বিয়ে, ছোটো ছেলেমেয়েরা চকচকে ঝকঝকে পোশাকে যেন সং সেজেছে, সুময়ের কাকার পোশাকটাই যেন ঘোষণা করছে যে ভদ্রলোক মস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাকে নমস্কার জানিয়ে মৃদু একটু হাসি লাভ করে আগন্তুকদের আসরে বসতে হচ্ছে। তিনিই নাকি আজ সভাপতি।

অন্দরমহল আড়ালে এবং তফাতে। এ বাড়ির মেয়েরা রয়েছেন অন্দরে। সাহিত্যবাসরে নিমন্ত্রিতা মেয়েরা সরাসরি আসরে এসেই বসছেন, শুধু এ বাড়ির সঙ্গে দু-চারজন যাদের ঘনিষ্ঠতা আছে তারা অন্দর হয়ে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে আসরে আসছেন।

আসছি, বলে মানসীও অন্দরমহলে উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে প্রায় আধঘণ্টা পরে।

নাঃ, কাউকে আনা গেল না।

সভাপতি সুময়ের কাকা প্রসাদ বলেন, আর কিছু নয়, সাহিত্যসভায় কখনও যায়নি তো তাই লজ্জা পাচ্ছে।

সুময় বলে, উঁকি মেরে না দেখে মেয়েদের মধ্যে এসে বসলেই ভালো হত।

বাইরের লোকের মতো নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে তাকে মন্তব্য করতে শুনে প্রসাদ তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। অনেক নাম-করা লোক বাড়িতে আসছেন—শুধু কি সুময়ের খাতিরে, তার খাতির কিছুই নেই ? তাকে সভাপতি করে, তাকে দিয়ে সকলের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়ে, সুময় তবে এমন ব্যবহার করে কেন যে, এ বাড়ির সবই মিছে এ সভার পক্ষে, ঘটনাচক্রে সে এ বাড়িতে বাস করে তাই শুধু দশজন কবি শিল্পী সাহিত্যিক এখানে জড়ো হয়েছেন ? সে শুধু এই সভার পক্ষে, বাড়ির সঙ্গে বাড়ির মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই ?

পরে শুনেছি, সুময়ের বাবা এ সভার ধারে কাছে ভিড়তে অস্বীকার করেছেন—তিনি অন্দরেই আছেন। প্রসাদও নাকি কবিতা রচনা করেন।

দাঁড়াও আমি দেখছি।

প্রসাদ উঠে অন্দরে চলে যান।

মানসী বলে, কী দরকার ছিল ? আমরা এসেছি মিট করতে—

সুময় বলে, হোক না, হোক না। মিট তো তোমার বাড়িতেও করতে পারতাম—এখানে মিটিং ডেকেছি কেন ?

অটলবাবুকে আসতে দেখে সুময় এগিয়ে যায়।

বলি, বেচারিকে খুব ফাইট করতে হচ্ছে।

মানসী বলে, নিশ্চয়। এ যুগেও যে এ রকম ফ্যামিলি থাকে—

অধীর বলে, আপনারা শুধু বাইরেটা দেখছেন। এ অচলায়তন শেষ হয়ে গেছে—এখন মিউজিয়মের জিনিস। এ সব পুরানো চালটাই এদের স্রেফ চালবাজি—জেনেশুনে হিসেব করে বজায়

রেখে চলেছে। পয়সা আছে, খুশি হলেই রাতারাতি এরা ডিগবাজি খেয়ে ঢের আপটুডেটদের ডিঙিয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে আবার ফাইট কীসের ? গোটা সমাজের কুসংস্কার ভাঙতে চাইলে তাকে বরং ফাইট বলা যায়।

হেসে বলি, সে ফাইট তো তুমি করবে। দরকার হলে আত্মীয়স্বজন বাড়িঘর ছেড়ে দেবে। সুময় তো তা পারছে না, বাড়িতে ওর একটু প্রেস্টিজ বাড়ানো দরকার। দেখে বুঝতে পার না বাড়িতে ওর অবস্থা খুব কাহিল ? বাড়িতে মান বাড়াবার ফাইট করতে হচ্ছে সেটা উড়িয়ে দিয়ো না।

মানসী বলে, বাজে কথা বোলো না। বাড়ির বড়ো ছেলে, ওর ভাবনা কী ?

বড়ো ছেলে বলেই তো বেশি ভাবনা, ফ্যামিলিকে অগ্রাহ্য করে এগোবার উপায় নেই। এ সব আয়োজন করে বাড়ির লোককে বোঝাতে হয় যে ও যা করে তা চ্যাংড়ামি নয়, গুরুতর সামাজিক ব্যাপার, বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে ওর কারবার।

অধীর মুখ টিপে হাসে, মানসী রাগ করে বলে, ছি ছি, মানুষকে তুমি—

কেন, তোমার বন্ধুর নিন্দে করিনি তো ? ওর সমস্যাটা দেখাচ্ছিলাম।

প্রসাদ ফিরে আসেন। সুময় অটলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি সত্যই খুশি হয়েছেন বোঝা যায়। অটলবাবুর নামের দাম তাঁরও অজানা নয়।

খানিক পরে নানা বয়সের একপাল মেয়ে বউ অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ সপ্রতিভভাবেই উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বসে। এতক্ষণ এ বাড়ির মানুষদের সম্পর্কে কমবেশি যে ধারণাটা সবার মনে গড়ে উঠেছিল মেয়েরা তার প্রায় কোনো চিহ্নই বয়ে আনে না—না শাড়িতে, গয়নাতে বা প্রসাধনে। মানসীদের সঙ্গে তারা অনায়াসে মিশ খেয়ে যায় !

যথানিয়মে যথাসময়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দেড়েক পরে সভার কাজ আরম্ভ হয়। চা খাবারের বিশেষ সমারোহ না থাকলে ঘণ্টাখানেকের বেশি দেরি হত না।

লোক হয়েছে অনেক। ছোটোখাটো হলের মতো মস্ত ঘরখানা ভরে গেছে।

গান বাজনা গল্প কবিতা বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য—বাঁধাধরা সাংস্কৃতিক প্রীতিসম্মেলন। সুময়ের সেতার বাজনার পর আমার কবিতা পড়ার ডাক এল। সুময় চমৎকার বাজাতে শিখেছে—এখন শুধু দরকার শিক্ষাটা পার হয়ে স্বকীয়তায় পৌঁছানো।

সেই কবিতাটা শোনালাম।

সভা স্তব্ধ হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে গান হোক বাজনা হোক কবিতা পাঠ হোক প্রত্যেকের বেলা হাততালি পড়েছে। আমার কবিতা শোনার পর কোনোদিক থেকে টুঁ শব্দটি ওঠে না। সভার আবহাওয়া যেন বদলে গিয়েছে।

এদিক ওদিক তাকাই। চেনা মানুষের মুখের দিকে চেয়ে মুখে মৃদু হাসি ফোটাই।

কেউ কথা কয় না !

মানসীও দুচোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে নীরবে চেয়ে থাকে।

অধীর বলে, কবিতাটি সম্পর্কে কেউ কিছু বলুন না ? আমার মনে হয়েছে, কবিতাটির একটা অদ্ভুত গুণ আছে, একেবারে প্রাণের মধ্যে গিয়ে ঘা মারে।

অটলবাবু বলেন, তা নিঃসন্দেহ। তবে বিচার করতে হলে কবিতাটি বোধ হয় আরেকবার পড়া দরকার।

একটি অজানা মেয়ে বলে, নাড়া দেয় খুব। কিন্তু—

চশমা-পরা প্রৌঢ়বয়সি সৌম্যদর্শন একজন বলেন, কবিতাটি ঠিক কী ভাবে নিতে হবে বোঝা মুশকিল। তবে শুনবার সময় মনে হচ্ছিল—

কী মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক সে কথাটা আর প্রকাশ করে বলেন না।

সুময় বলে, এ সব কবিতা বিচলিত করে কিন্তু—

এমনি অনিশ্চিত কিছু বক্তব্যের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়। আরম্ভ হয় আরেকটি গান। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। সভার প্রতিক্রিয়ার একটি মানে সন্দেহাতীত হয়ে গেছে। কবিতার ধরন বদলে গেছে আমার—অন্তত এই কবিতাটির বেলা তাই ঘটেছে।

আমিও কি বদলেছি ?

নানা বয়সের নানা অবস্থার নানা মতের মানুষ এসেছে সভায়, আবেগের যতখানি ঐক্য ও সমতা স্বভাবতই আছে তাদের মধ্যে অতি সহজে সেখানটা স্পর্শ করে সকলকে বিচলিত করে দিয়েছি। নাড়া দিয়েছি !

কিন্তু কেন ও কীসের এই আবেগ ব্যাকুলতা, একজনের কাছেও তা ধরা পড়েনি।

গানের কথার মানে না নিয়েও সুর যেমন নাড়া দিতে পারে মানুষকে, ভাবার্থের স্পষ্টতা ও পূর্ণতা ছাড়াও আমার কবিতা তেমনি সকলকে একসঙ্গে অভিভূত করেছে।

শুধু সুর নাড়া দেয়, তার মানে আছে। সে মানে হল ঐতিহ্য। আগে থেকেই অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বাঁধন থাকে সুরের, নইলে তার সাধ্য কী মর্মস্পর্শ করে। আমি কোন ঐতিহ্যের জের টেনেছি আমার কবিতায় ? ভাবার্থের সমগ্রতা ছাড়াই যাতে এমন গভীর সাড়া জাগানো সম্ভব হয়েছে ?

কে আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে !

আজ তোমার প্রশ্নের জবাব দেব। আমরা একটু আগেই বেরিয়ে পড়ি চলো।

প্রায় চমকে উঠেছিলাম মানসীর কথা শুনে ! আমার মনের কাব্যাত্মক সমস্যা টের পেয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে বলছে মনে করেছিলাম। আমার কবিতার কী হয়েছে ভাবতে গিয়ে একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা মানসীর।

সভা শেষ হয়ে এসেছে। দু-একজন করে উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। আমি সোজাসুজি রাস্তায় বেরিয়ে যাই, কয়েকজনের কাছে বিদায় নিয়ে মানসীর আসতে পাঁচ-সাতমিনিট দেরি হয়।

গেটের কাছে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মানসী বলে, তোমার বুদ্ধি নেই। সুময় আমায় গাড়িতে তুলে না দিয়ে ছাড়বে ? একটা বই আনতে ভেতরে গেছে। রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু কর—আমি তোমায় তুলে নেব।

তাই সই।

পথে নেমে হাঁটতে থাকি। মানসীর জবাব শুনবার তেমন জোরালো আগ্রহ অনুভব করি না টের পেয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে আসছে আমার কবিজীবনের নতুন পরিস্থিতি এবং তার অজানা সম্ভাবনার কথা। কবিতা লেখার মর্ম জেনেছি এত দিনে, বহু হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলার ক্ষমতা পেয়েছি, কিন্তু সার্থক করার পথ খুঁজে পাচ্ছি না আমার কবিতাকে।

অর্ধেক সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি ! কেন এমন হল আর কীসে এর প্রতিকার সে রহস্যের সন্ধান না পেলে কী মানসীর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে ?

পাশ দিয়ে মানুষ চলে যায়। গ্যাসের আলোয় মুখ ভালো দেখা যায় না। জীবন কি এদের কাছে এমনই আংশিক সত্য ? জীবনের মানে নেই—শুধু আছে নিরর্থক হাসি কান্না আনন্দ বেদনা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা ভালোবাসার ভাব-তরঙ্গ ?

মানসী নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসে পাশে থেমে যায়। হঠাৎ ব্রেক কষে অতি কষ্টে অ্যাকসিডেন্ট বাঁচায় পিছনের আরও বড়ো আরও নতুন গাড়িটা।

তোমাকে বড়ো বিচলিত মনে হচ্ছে মানসী। তুমি তো এ টাইপের মেয়ে নও !

গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। মানসী মৃদুস্বরে বলে, পিছনে গাড়ি আসছে ভাবিনি।

তাই তো বলছি। অল্পেই যারা এটা ভাবতে ভুলে যায় তুমি সে টাইপের নও। নিশ্চয় তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ।

খানিক চুপ করে থেকে সে হঠাৎ যেন ঝোঁকের মাথায় বলে, তা এ অবস্থায় মেয়েরা একটু নার্ভাস হয়। তোমার কী হয়েছে সত্যি বলবে ? আজ এ কী কবিতা পড়লে ? এ কীরকম ভাবে পড়লে ? দু-তিনবার আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করি, মানে বুঝেছ ?

মানে ? জায়গায় জায়গায় বুঝেছি। সবটার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না।

নিশ্বাস ফেলে বলি, পারবেও না। সবটার বোধ হয় কোনো মানেই নেই।

থাকগে কবিতার কথা। আজকাল তোমার কবিতা ধ্যানজ্ঞান হয়েছে।

নইলে কবি কীসের ?

কবিও তো মানুষ ? কোন দিকে যাব ?

এ কথার জবাব আচমকা খুঁজে পেলাম না। মনে হল, যে দিকেই যাই, যেখানেই যাই বিশেষ কিছুই আসবে যাবে না। শহর ছেড়ে যদি দুজনে চলে যাই গ্রাম মাঠ গাছপালার নির্জনতার দিকে, যদি যাই শহরের আলোকোজ্জ্বল হোটেলে অথবা যদি যাই আমার বা মানসীর ঘরে—কোথাও এই দম-আটকানো চাপ থেকে আমার মুক্তি নেই।

চলো যে দিকে খুশি।

আমার নিস্পৃহ ভাব খেয়াল করেই বোধ হয় একটু এগিয়ে একটা পার্কের পাশে মানসী গাড়ি দাঁড় করায়। বড়ো রাজপথ হলেও এ পথে গাড়ি ও মানুষ কম চলে—এখন আরও নির্জন হয়ে এসেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলো পার্কের বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় এখানে আরও স্তিমিত হয়েছে।

ঘুরে বসে মানসী বলে, তুমি কি রাগ করেছ ? সুময়ের সঙ্গে দেখেছ বলে ?

পাগল হয়েছ ?

আমিও তাই ভাবছিলাম—তুমি এ জন্যে রাগ করবে ! অন্য কোনো কারণে ?

না না, রাগ করব কেন ?

তবে এ রকম গা ছাড়া ভাব কেন তোমার ? বললাম তোমার কথার জবাব দেব, তবু শুনবার একটু উৎসাহ নেই ? তোমার আমার মধ্যে এ রকম বোঝাপড়ার অভাব হবে তা তো ভাবিনি।

আমি জোর দিয়ে বলি, বোঝাপড়ার অভাব হবে না, তুমি যদি ইচ্ছে করে ভুল না বোঝ। বড়ো মুশকিলে পড়েছি।

মুশকিল ! কীসের মুশকিল ?

ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। অল্প আলোয় তার মুখের ভাব দেখতে পাই না বটে কিন্তু খানিক শোনার পরেই সে প্রায় অস্ফুট আর্তনাদ করে দুহাতে আমার হাত চেপে ধরে, আবার কবিতা নিয়ে !

সব না শুনলে তো বুঝবে না।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বসে সে স্টিয়ারিং ধরে।

বলে, আমি চালাই, তুমি আস্তে আস্তে বলো। তোমার ঘরে গিয়ে বসব। আমার মাথা ঘুরছে। আমি আজ শেষ বোঝা বুঝবই, না বুঝে বাড়ি যাব না।

যে কবি নয় সে কি পুরোপুরি বুঝতে পারে নিজের অসম্পূর্ণতার চেতনা জেগেছে অথচ জানা নেই কেন আর কীসের ফাঁক—কবির পক্ষে এটা কী ভয়ানক অবস্থা ? একটি কবিতা লিখতে কবির মধ্যে কী তোলপাড় হয়, কী ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে কবি সয়ে যায় ছিঁড়ে পড়ার মতো টনটনে আত্মানুভূতি আর কী কঠিন ও তীব্র আনন্দময় তপস্যায় নিজেকে উঠিয়ে নেয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার শেষ সীমানার উর্ধ্বে—এ সব যে জানে না সে কী ভালো করে বুঝতে পারে কবি হয়েও কবিতা লিখতে না পারার ভয়ংকর কষ্ট ? কবিকে যে ভালোবাসে সে হয়তো খানিকটা বুঝতে পারে। এটুকু প্রাণের আত্মীয়তা ছাড়া তো প্রেম হয় না।

এমনি আমার কথার মর্মগ্রহণের সাধ্য মানসীর থাকার কথা নয়। যদি প্রেম থাকে মানসীর তবে হয়তো বুঝতে পারবে।

যদি সত্যই কবি আমাকে সে ভালোবেসে থাকে !

এইটুকু ভরসা নিয়েই আমি বলে যাই। মানসী নীরবে শুনে যায়—একটি কথাও বলে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর কথা তো নয়—যার বুঝবার সে অল্পেই বুঝবে। বাড়ি পৌঁছবার খানিক আগেই আমার কথা যায় ফুরিয়ে।

নয়

বারান্দায় চুরুট টানতে টানতে দাদা অসহায়ের মতো মানসীর দিকে তাকান। এত রাত্রে আমার সঙ্গে মানসীকে বাড়ির যার চোখে পড়ত তার মুখেই বোধ হয় এই অসহায় ভাবটা ফুটত।

মানসী বলে, ভালো আছেন ? ওই যে একজনকে আপনি বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন—

আমার শালা।

তাঁর চিকিৎসা নিয়ে বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। একদিন সময় করে যাবেন। মানে, তিনি মদ না ছাড়লে চিকিৎসায় কোনো ফল হবে না।

ওঃ !

একদিন যাবেন। কথা বলে আসবেন।

ঘরে এসে মানসী কুঁজো থেকে জল নিয়ে খায়। তাকে খুব শান্ত ও চিন্তিত মনে হয়। ভালো করে চেয়ে দেখে বুঝবার চেষ্টা করি তার দুচোখের বিষণ্ণতার মানে কী।

চোখে চোখ মিলতে সে মৃদু একটু হাসে।

আমার একটা কথা রাখবে ?

কথাটা সে হাসিমুখেই বলে—কিন্তু প্রায় মায়ের মতো তার স্নেহ ব্যাকুলতা আমার কাছে গোপন থাকে না।

কী কথা ?

বাবাকে একবার দেখাও।

আমি সত্যই প্রায় চমকে উঠি !

তোমার বাবাকে দেখাব ? আমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে কিনা ?

মানসী ব্যাকুল হয়ে বলে, না না, ছি। তা বলিনি আমি। তোমার শরীরটা বোধ হয় ভালো নয়। নিজের অজান্তে মানুষের কত রকমের অসুখ হয়, শরীরে কত রকমের কী হয়, তুমি জানো না। আমি ডাক্তারের মেয়ে, আমি জানি। দেখাতে তো কোনো দোষ নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করছে কিন্তু মুখে খেলে যাচ্ছে গভীর দুশ্চিন্তা ও ভয়ের ছায়া। একটা সিগারেট ধরাই। সেটাই শেষ সিগারেট, আর ছিল না। কিনবার পয়সাও ছিল না।

সত্য কথা বলতে কী, মানসী গাড়িতে আমায় বাড়ি পৌঁছে না দিলে ট্রামবাসের পয়সা কারও কাছ থেকে ধার করতে হত।

তুমি শেষ পর্যন্ত বুঝে নিলে আমার যা হয়েছে সেটা অসুখ ? ডাক্তারি চিকিৎসায় ধরাও পড়বে, সেরেও যাবে ?

রাগ কোরো না। ও সব কোনো কথাই আমি ভাবছি না। আমার মনে হয়েছে তোমার শরীরটা ভালো নয়। সত্যি বড়ো ভাবনা হচ্ছে আমার।

ঠোঁট কামড়ে সেই ঠোঁটেই আবার হাসি ফুটিয়ে মানসী বলে, বেশ তো, তোমার কিছু হয়নি, তুমি সুস্থ আছ। সুস্থ মানুষ মাঝে মধ্যে নিজেকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালে দোষ আছে কিছু ? আমার কথাটা রাখবার জন্যই নয় একবার দেখালে আমার বাবাকে।

বেশ, তোমার কথা রাখব।

মানসী খুশিতে সোজা হয়ে বলে, কাল সকালেই এসো না ? চা খাবে আর—

কাল নয়। মাসখানেক পরে।

মানসী মুষড়ে যায়।

বলি, কেন, তোমার কথা তো আমি উড়িয়ে দিলাম না ? এটা যদি অসুখের জন্যই হয়ে থাকে—অসুখটা আরেকটু প্রকট হোক। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, টাইসের প্র্যাকটিস অব মেডিসিন আগাগোড়া একবার তো পড়েছি। গোড়ায় না টের পাক, রোগ হলে রোগী শেষ পর্যন্ত জানবেই। আমার অসুখটা একটু বাড়ুক—তারপর চিকিৎসা করতে যাব। এতে তোমার আপত্তির কী আছে ?

মানসী খোঁপা থেকে একটা সরু তারের কাঁটা খুলে সেটা টেনে লম্বা করে আঙুলে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলে, কে যে তোমায় কী দিয়ে গড়েছিল তাই ভাবি !

মানসীও অদৃষ্ট মানে !

দরজার একপাট খোলা, একপাট ভেজানো। তারই আড়ালে ভদ্রতা রক্ষা করে বউদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি বলে, দু-চারমিনিটের কথা ছিল। বলেই চলে যেতাম।

ভেতরে এসো।

বউদিও আসেন। প্রথমে আমার এবং তারপর মানসী আর তৃপ্তির মুখে একবার নজর বুলিয়ে নেন।

বলেন, সন্ধ্যা থেকে ধন্না দিয়ে বসে আছে। তোমার সঙ্গে নাকি জরুরি দরকার।

তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করলেম, কবির সঙ্গে তোমার কীসের এমন জরুরি দরকার ?

বউদির কাছে জবাব পেলাম, কাল সকালেই হারাণবাবুর বাড়ি টিউশনি না নিলে কাজটা ফসকে যাবে।

তৃপ্তি হেসে বলে, তুমিই তো সব বলে দিলে বউদি !

বউদি বলে, তা হলে দেখলে তো আমিই সব বলতে পারতাম ? তোমার এত রাত পর্যন্ত ধন্না দিয়ে থাকার কোনো দরকার ছিল না ? এইবার তোমরা আসল কথা বলাবলি করো, আমি যাই !

এত স্নেহ করার ক্ষমতা নিয়েও এ কুৎসিত হীনতা কেন আসে কে জানে। জীবনে যতটুকু কামনা করার সাহস আছে তার বিশেষ কোনো অভাব নেই, তবু। হয়তো ওই একপেশে একঘেয়ে চাওয়া ও পাওয়ার সংকীর্ণ নিয়ম আঁকড়ে থাকতে হয় বলে হৃদয় মনের অসম্পূর্ণতাকে প্রশ্রয় দেবারও প্রয়োজন হয়—উদারতা বিরোধ হয়ে উঠে পীড়ন করে। জীবনের প্রায় সবরকম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত কত স্ত্রীলোক ছড়িয়ে আছে সংসাবে। খানিক পেয়ে তাই এমন দিশেহারা বিশ্রী সংঘাত সৃষ্টি করতে হয় বউদির মতো স্ত্রীলোকদের।

ডেকে বলি, বউদি বোসো।

বলি, তৃপ্তি, তুমিও বোসো।

মানসী ভয় পেয়ে বলে, আমি তবে যাই ?

তুমিও বোসো। আরেকবাব কবিতাটা শোনো। আমি সকলের মত চাই।

তৃপ্তি মানসীর মুখেব দিকে তাকায়। বউদি দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন, আমায আবার কী শোনাবে কবিতা ?

বোসোই না দয়া করে ! মন দিয়ে একটু শোনো।

মন দিয়েই তারা কবিতা শোনে—না শুনে উপায় কী ? পঙ্গু অর্থহীন হোক—মন টানার গুণ পেয়েছে কবিতাটি।

ব্যাকুলভাবে প্রথমে তৃপ্তিকেই জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল ?

কী সব লিখেছ, গায়ে কাঁটা দেয়।

মানে বুঝেছ তো ?

অত কবিতা বোঝার বিদ্যে নেই।

বউদি গুম খেযে গিযেছিলেন, তাঁকে একটি কথাও বলাতে পাবলাম না। তবে এভাবে কিছু বলতে না চাওযার মানে বোঝা কঠিন নয।

মনে হয়, কবিতা শোনাবার পর আমি যেন পর হয়ে গেলাম তাদেব। কথাবার্তা চালানো আব যেন সম্ভব নয়। আমার কবিতার দাপটে আড়ালে চাপা পড়ে গেছে আমাদের অন্য সম্পর্কেব জটিলতা আর সমস্যা।

মানসী এক রকম কিছু না বলেই চলে যায়।

তৃপ্তিও যাওয়ারই ভূমিকা করে বলে, বাত হয়ে গেল।

বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব ?

না, খোকা সঙ্গে আছে।

বউদি নীরবে ঘর ছেড়ে চলে যান। তৃপ্তি বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে আছে এটা বোধ হয় তাঁর খেয়াল হয়েছে। কিন্তু তৃপ্তি কিছু বলে না। সে যেন বলার কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

শেষে বলে, তবে যাই আমি।

হারাণবাবুর বাড়ি কাজের কথাটা কী বলছিলে ?

ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলেম। লক্ষ্মী এসে খুব ধরাধরি করেছে আমাকে, তোমাকে ওর মাস্টার করে দিতে হবে। আগেরবার আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম তো—ওর ধারণা আমি বললেই তুমি বাজি হবে। হারাণবাবুর ইচ্ছা নয় তোমাকে রাখেন। লক্ষ্মী বলছিল, কাল নাকি উনি আরেকজনকে লাগিয়ে দেবেন। তবে তুমি যদি সকাল সকাল গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করে দাও তাহলে অবশ্য তোমাকেই রাখতে হবে।

তৃপ্তি হাসে, কী আগ্রহ লক্ষ্মীর ! কবিরা কী দিয়ে মানুষ বশ করে বলো তো ?

যা দিয়ে কবিতা লেখে।

তৃপ্তি স্থির চোখে চেয়ে মাথা নাড়ে, না, কবিরা এক ধরনের পাগল বলে। নইলে দ্যাখো না, শুধু কবির বেলা মেয়েরা উপযাচিকা হয়। মেয়েরা জানে তা ছাড়া উপায় নেই। এত বোকা কবিরা যে অনেক সময় প্রায় সোজাসুজি স্পষ্ট করে বললেও বুঝতে পারে না মনের কথাটা।

বুঝতে পারে। কবিরা আসলে স্বার্থপর নয়। অন্যেরা ওত পেতে থাকে, কোনোরকমে প্রিয়াকে পেলেই হল। মেয়েদের তাই মুখ খুলতে হয় না, পুরুষরাই এসে ধন্না দেয়। কবিরা সস্তা সুযোগ চায় না, পেলেও নেয় না। মেয়েদেরও তো ভুল হয় ? সাময়িক ঝোঁক আসে ? কবিদের সব বুঝতে হয়। নইলে কবি কীসের ?

এত হিসেবি কবিরা ? হিসেব কষে, ওজন করে, কষ্টিপাথরে ঘষে—

তোমাদের তাই মনে হবে কিন্তু কবিদের ওটা স্বভাবধর্ম, সহজে আপনা থেকে হয়। একজন মনে করছে সে খুব ভালোবেসেছে, শুধু এটুকুতে কবির মধ্যে সাড়া জাগবে না।

কীসে জাগবে ?

সত্যি ভালোবাসা হলে। সাড়া যে তুলবে, কবিও জানবে যে ভালোবাসে বলে দিতে হবে না। একটি মেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে, সেটা কি কবির দোষ ? কবিকেও পাগল করা চাই তো।

তৃপ্তি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়।

একজন পাগল হয়ে উঠেছে, সেটাও সত্যি ভালোবাসা নয় ? কীরকম ভালোবাসায় কবিরা সাড়া দেয় ? পৃথিবীর ভালোবাসা তো ? না তার স্বপ্ন-রাজ্যের ভালোবাসা ? সে ভালোবাসা আমদানি হয় জগতে ? রক্তমাংসের মানুষ কারবার করে তা নিয়ে ?

অপমানে তার বুকে আগুন ধরে গেছে বুঝতে পারা যায়। সেদিন দেখেছিলাম মেজাজ, আজ তার দুচোখে দেখতে পাই আগুন।

শান্তভাবেই বলি, কেন শোনা কথা বাজে কথা টেনে আনছ ! কেন সস্তা মিছে বদনামটা তুলছ কবির ! কবি পৃথিবীর ভালোবাসা চায়, খাঁটি বাস্তব ভালোবাসা। সেই জন্যই পাগল হওয়াটাই তার কাছে ভালোবাসা হয় না। একমুখী ঝোঁকটাই ভালোবাসা নয়। একমুখী ঝোঁক নিয়ে বুক ফেটে মরে গেলেও কবি দু-লাইন কবিতা লিখতে পারে না—বাস্তব জীবন যেমন অনেক কিছু মিলিয়ে, ঝোঁকটাও তেমনই সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হওয়া চাই। ভালোবাসাও তেমনি। ভালোবাসা স্বপ্ন, ভালোবাসা রক্তমাংসের শরীর, ভালোবাসা দশজনের সঙ্গে মেলানো জীবন, ভালোবাসা রাগ ভয় ভক্তি ঘৃণা হিংসা মমতা সব কিছু দিয়ে গড়া—

ম্লান বিষণ্ণ মুখে তৃপ্তির অসহায় চোখে চেয়ে থাকার ভঙ্গিটা আমার নিজের কাব্যিক অসহায়তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে আমিও প্রায় ওর মতোই অসহায় হয়ে পড়েছি—কবিতা-রানির মায়া পেয়েছি, প্রেম পাইনি।

বোম্বেতে মামার কাছে যাওয়ার মানে কী আমি বুঝিনি ভাবছ ! তুমি আমি ঘর ছেড়ে যাব, এটাই তোমার আসল কথা ছিল। তারপর কী হয় দেখা যাবে।

বুঝেছিলে ?

পাশের দিক থেকে তার গায়ে আলো পড়েছে। সুন্দর মুখখানা নত করায় তার সুন্দর দেহটি এখন চোখে পড়ে। এই অপরূপ দেহের সঙ্গে নিবিড় মিলনের অভাবে নিজের দেহটা আমার তুচ্ছ মূল্যহীন মনে হয় !

সব বুঝেছিলাম। বোঝা কি শক্ত ছিল ? কিন্তু তুমি তো আমায় ভালোবাস না।

বাসি না ? কে বাসে ?

কেউ না। এখনও কারও ভালোবাসা পাইনি।

তৃপ্তি চোখ তুলে তাকায়।

তোমার ভালোবাসা পায়নি কেউ ?

পেলেও তো চুকেই যেত ! তার ভালোবাসাও আমি পেতাম।

তৃপ্তি এবার একটু হাসে।—একজন ভালোবাসলে আরেকজনকে বুঝি ভালোবাসতেই হবে ? শাস্ত্রে লেখা আছে নাকি ?

আমিও একটু হাসি।—শাস্ত্রের খবর রাখি না। তবে ভালোবাসাটাই এমন জিনিস যে একপেশে হতে পারে না। হয় দুজনে ভালোবাসবে—নয় ভালোবাসাই হবে না। এ তো খুব সোজা কথা। বাস্তব জগতের সাদাসিধে নিয়ম। ভালোবাসা যে জন্মাবে, দুজনে মিলে তো জন্ম দেবে ?

তৃপ্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে আর কথা কী। ভালোবাসা চুলোয় যাক, কাজের কথা বলি শোনো। কাল সকালেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যেও। কাজটা নিয়ে নাও, কিছু পয়সা জমাও। কখন দরকার হয় বলা যায় না। এটুকু অন্তত করো আমার জন্যে। কেমন, যাবে তো ?

দেখি।

দেখি নয়। যাবে।

আমার কথার জবাব দিতে এসেছিল মানসী, সে কথা না তুলেই সে চলে গেছে। অবশ্য মুখে না বললেও সে কী বলতে চেয়েছিল বুঝতে কষ্ট হয়নি। আমার দেহেমনে কবি হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে চায়—তাকে অবলম্বন করে এই মারাত্মক কাব্যাত্মক রোগটা যদি সামলাতে পারি।

দমে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি ছাড়েনি, কথা স্পষ্ট করে গেছে। কোনো বিষয়ে মন স্থির করে ফেললে সহজে সে হাল ছাড়ে না, অল্পে বিচলিত হয় না।

বউদির প্রশ্ন আসে : এখন খাবে কি ? না ভাত ঢাকা থাকবে ?

সবে দশটা বেজেছে। ভাত ঢাকাই থাক।

কিন্তু এখন কী করা যায় ? জীবনে আজ প্রথম অনুভব করি আমার কিছু করার নেই। কবিতা লেখা, বই পড়া, ঘুমানো, খোলা ছাতে গিয়ে পায়চারি করা—কোনো কাজে মন বসবে না। সব যেন উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন হয়ে গেছে—চুপচাপ বসে ভাবারও কোনো মানে হয় না।

বুকটা কেঁপে যায়। আমি তো এ রকম নই। আমিত্ব নিয়ে এ রকম বিপন্ন হওয়ার কথা তো আমার নয় !

নিজের কবিতাগুলি পড়ব ? তাতেই বা কী হবে ! নিজে পড়ে মশগুল হওয়ার জন্য তো কবিতা লিখি না আমি !

আলেয়াদের বাড়ি গিয়ে নতুন কবিতাটা শুনিয়ে আসব ? দেখে আসব ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয় ? যদি সন্ধান পেয়ে যাই কীসের অভাবে আমার এত ভালো কবিতাটি ব্যর্থ হয়েছে,—এর চেয়ে শতগুণ ভালো শতগুণ মর্মস্পর্শী কবিতা লিখলেও ব্যর্থ হবে !

এখনও ওরা শুয়ে পড়েনি নিশ্চয়। সেটা সম্ভব নয়। নটার পর নিখিল বাড়ি ফেরে।

নিখিল বোধ হয় খেয়ে উঠেই বাইরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল, আমায় দেখে বলে, এত রাত্রে ?

রাস্তায় চানাচুর ফিরি করার সময় তাকে চিনতে অস্বীকার করেছিলাম মনে করে হেসে বলি, আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

নিখিলও হাসে। বলে, আর বলেন কেন ভাই, মানুষের যে কত ছেলেমানুষি অভিমান থাকে ! আপিসের চাকুরে বাবু—নিজের এ মিথ্যে সম্মানটা বাড়িতে বজায় রাখতে কত অসুবিধা যে ভোগ করেছি। চানাচুর বেচি জানলে যেন ছোটো হয়ে যাব।

ছোটো হয়ে যাননি তো ?

নাঃ, ও সব চুকেবুকে গেছে। বাড়িতে জেনে গেছে, বেঁচেছি। বন্ধুর বাড়ি চানাচুর তৈবি কবে ফিরি করতাম—এবার থেকে নিজের বাড়িতেই তৈরি করব। আসুন, ভেতরে আসুন।

ভিতরে বিছানা পাতা হচ্ছিল। আলেয়ার মা বললেন, এসো বাবা।

আলেয়া ছিল রান্নার ঘুপচিটুকুতে, উঠে এসে বলে, এখন তো গদি নেই, বিছানাতেই বসুন। তার দুহাতে চানাচুরের গুঁড়ো মশলায় মাখামাখি !

হেসে বলি, এ কী জুয়াচুরি ! নিখিলবাবুর সায়েন্টিফিক হোমমেড চানাচুর নাকি হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নহে !

উনি হাত দিয়েছেন কই ?

তাই তো, ঠিক কথা।

একটু খাবেন, গরম গরম টাটকা ?

এত রাত্রে লোকে চানাচুর খায় ?

কবি আবার এত হিসেব করে চলে নাকি—কখন কী করতে হয় !

কেউ ভুলতে পারে না, আমি কবি। এরা কেউ আমার কবিতা চোখে দ্যাখেনি, কোনোদিন এক লাইন কবিতা শোনেনি। কবিতা সম্পর্কে কোনোরকম আগ্রহ আছে কিনা কে জানে—বিধ্বস্ত বিপন্ন জীবন কাব্যশূন্য হয়ে গেছে।

মনে হয়, এ তো আমারই অপরাধ। মানুষের সৃষ্টি কুৎসিত বাস্তবতার ঘায়ে মানুষ এবা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে কবি আমিও এদের বাতিল করে রেখেছি আমাব কবিতার শ্রোতা হবার অযোগ্য বলে। আজ আমি কবিতা শোনাতে এসেছি প্রয়োজনে—এদের প্রয়োজনে নয়—এদের জীবনে কবিতা এনে দেবার দায়িত্ব তো আমি পালন করিনি।

দুঃখ দৈন্য চরম দুর্দশা আছে বলে কবিতাও শুনবে না ? মানুষের মতো বাঁচার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে বলে কবিতা শোনার আনন্দটুকু থেকেও বঞ্চিত করতে হবে ?

আমার একটা কবিতা শুনবেন আপনারা ?

আলেয়া খুশি হয়ে বলে, শোনান না, শোনান। দাঁড়ান আমি আসছি।

মলয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, শোনান নবদা, শোনান।

নিখিল বলে, আমিও ভাবছিলাম, আপনার কবিতা আর শোনা হল না। সময়-ই পাই না !

কবিতা পড়া হলে অন্য সকলের মতোই তারাও খানিকক্ষণ স্তব্ধ অভিভূত হয়ে থাকে। তফাত যা বুঝতে পারি সেটা সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়। গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে কিন্তু এরা সন্তুষ্ট হয়নি। এবং অসন্তোষ এরা গোপন রাখে না !

নিখিল বলে, বাঃ, আপনার বেশ হাত।

আলেয়া বলে, আরেকটা শোনান না, আমরা বুঝতে পারি এ রকম কবিতা ?

শোনাব। আরেকদিন শোনাব।

দশ

এ রাত্রিও নিশ্চয় প্রভাত হবে।

বাকি রাত্রিটা প্রভাত হবার আশায় থাকি। আশা ক্রমে ক্রমে দাঁড়ায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

কারণ ঘুম আসে না। ঘুমের একটু আবেশ পর্যন্ত নয় !

একটা রাত ঘুমের অভাব ঘটলে কবি অবশ্য কাতর হয় না। এটা তো ইনসোমনিয়া ব্যারামের জন্য নয়—স্বাস্থ্য আর বিবেক দুটিতেই ঘুণ ধরার যেটা লক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে আর প্রতিভার অজুহাতে কবি আমি অসংযম আর উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিইনি—সজ্ঞানে সচেতনভাবে বিবেককে বিলিয়ে দিইনি কোনো স্বার্থের খাতিরে।

সত্যোপলব্ধির প্রয়োজন অসীম গুরুত্ব পেলে কবি-হৃদয়ে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জাগে তারই কাছে আজ আমার ঘুমের প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে গিয়ে হার মেনেছে।

আর একজনকে কবিতাটি শোনানো বাকি আছে। শুধু একজনকে। এই কবিতাটি লেখার যে প্রত্যক্ষ কারণ-স্বরূপ,—যাকে প্রত্যক্ষ করে আমার কবি-চেতনা ভাঙতে আর গড়তে শুরু করেছিল শব্দ ও ছন্দের রূপ ধরে এই বিশেষ কবিতাটি হয়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্য।

কাল সকালে তমালকে কবিতাটি শোনাতে হবে।

কিছুদিন আগে উদ্‌বাস্তু কলোনির ধারে রাস্তার কলে জল নিতে এসে দাঁড়িয়ে যে পথচারী বাস-চারী মোটর-চারী সকল মানুষের দিকে তাকিয়েছিল মনুষ্যত্বের সহজ সতেজ দাবি নিয়ে, তার দিকে কে কীভাবে তাকাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দিয়ে।

তমাল যদি মানে বোঝে আমার কবিতার, তার যদি ভালো লাগে আমার কবিতাটি—এ জগতে আর কোনো ভক্ত বা সমালোচকের সার্টিফিকেট আমার দরকার হবে না।

জানি, এ সিদ্ধান্ত অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাবে যে শেষ বিচারের ভার তমালের উপর ছেড়ে দেবার মানে কী ? সে না হয় প্রেরণা জুগিয়েছিল একটি কবিতা লেখার, কিন্তু কাব্য-বিচারের বিশেষ কোনো ক্ষমতা কি তার আছে ?

তার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো কথাই তো বলা হয়নি ? সাধারণ একটি উদ্‌বাস্তু মেয়ে হিসাবেই বরং তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমার কবিতার চরম বিচারের অধিকারিণী হবার মতো অসাধারণ গুণ সে পেল কোথায় ? সে গুণটাই বা কী ?

কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। তমালের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য—আমি লক্ষ্মীদের পড়াতে যাই আর সে গান শেখাতে যায়, এই সূত্রে ভাসা-ভাসাভাবে একটু আলাপ হয়েছে মাত্র। কোনো অসাধারণত্ব যদি এই মেয়েটির থেকে থাকে আমি সত্যই তার খোঁজ রাখিনি।

সাধারণ একটি অল্পশিক্ষিতা মেয়ে বলেই তাকে আমি জানি। নিরাশ্রয় নিঃস্ব পরিবারের সাধারণ মেয়ে, অবস্থার কল্পনাতীত পরিবর্তন আজ যাকে অন্তঃপুরের আশ্রয় থেকে কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যথানিয়মে ছেলে খুঁজে এনে বিয়ে দেওয়া হলে তাদের মতোই আরেকটি পরিবারে ঘর করতে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়েছিল। সেই সাধারণ জীবন ও স্বপ্ন আরও অনেকের মতো তারও একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। এই সর্বনাশা পরিবর্তনকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই হয়তো সে মনে করে কিন্তু কাজে সে অদৃষ্টের মুখ চেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে রাজি হয়নি।

তার চেতনায় সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে এই সত্য যে, সেও মানুষ এবং মানুষের মতো বাঁচার তার জন্মগত অধিকার। সংসারের কোনো নিয়মনীতি আইনকানুন যদি তার এই অধিকারের বিরুদ্ধে যায়, তার এই দাবিকে ব্যাহত করে, তবে সেটাই হবে সংসারের সবচেয়ে বড়ো অন্যায়।

এখন কথা হল, এই চেতনা কি তাকে কোনো অসাধারণত্ব দিয়েছে ? আমি তা মনে করি না। সচেতন মানুষগুলির কথা বাদ দিলাম, তার মতো এমন অনেক সাধারণ মেয়ের মধ্যেই আজ এই চেতনার বিকাশ কমবেশি ঘটেছে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা হয়তো আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনেক ভ্রান্তি ও সংস্কারে কিন্তু মানুষ হিসাবে নিজের অধিকারবোধ আজ আর সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও দুর্লভ নয়—বিদ্যাবুদ্ধির যতই তাদের অভাব থাক।

তমালের মধ্যে এই অধিকারবোধ ও সেই অধিকার দাবি করার অভিব্যক্তিটা অত্যন্ত সতেজ অথচ সহজ ও স্বাভাবিক। সে অনর্থক চেঁচামেচি করে না, গায়ের ঝাল ঝাড়ে না, সর্বদা ক্ষুব্ধ বা হতাশ হয়ে থাকে না। এইটুকুই হয়তো তার বৈশিষ্ট্য।

এ রকম একটি সাধারণ মেয়ের বিচারই শেষ কথা হবে। কারণ, এরা যদি না বোঝে, এদের যদি নাড়া না দেয়, তবে মিছেই আমার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

শুধু বন্ধুমহলে তারিফ পাওয়ার কবিতা লিখে কী হবে ?

এটাও একটা ভাববার কথা যে তমাল আমার বন্ধু নয়। হঠাৎ তাকে একটা কবিতা শোনাতে চাওয়ার মতো ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে আমাব জন্মেনি।

তবে সে জন্য আটকাবে না। আমি তো ভীরু লাজুক ভাবুক কবি নই ! পাঁচ-দশমিনিট আলাপ করে কবিতা শোনাতে চাওয়াটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত করে তোলার মতো অবস্থা নিশ্চয় সৃষ্টি করতে পারব !

এ সিদ্ধান্তে যখন পৌঁছলাম, মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। কয়েকটা কুকুর প্রচণ্ড সোরগোল জুড়েছিল বাড়ির সামনে রাস্তায়। মারামারি কামড়াকামড়ির চিৎকার আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রায় আস্ত একটা চাঁদ। ভাঙা ভাঙা মেঘভরা আকাশ আর ইট কংক্রিট খোলার ঘর ভরা শহর জুড়ে নয়ন মন ভুলানো অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে, আবার রাস্তার ওই কুকুরগুলির উপরেও অকাতরে জ্যোৎস্না ঢেলে যাচ্ছে।

আমি মানুষ। চাঁদিনি রাতের শোভা দেখতে পাওয়ার ভাগ্য কেবল আমারই। এমন ভাগ্যবান তবু কেন এত বিড়ম্বনা ?

সকালে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যাই। আমার কাছে পড়ার আগে তারা তমালের কাছে গলা সাধে।

বাইরে থেকে শুনতে পাই তমালের সুন্দর গলা। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের অংশ একটু বেসুরো সুরে গেয়ে ছাত্রীদের শেখাচ্ছে।

রমা বলে, আজ এত তাড়াতাড়ি যে ?

বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।

একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওরা গলা সাধছে।

গান শেখানোই শুনি একটু বসে বসে।

ছাই শেখাচ্ছে। নিজেই ভালো জানে না শেখাবে কী ? দাদার যে কী বুদ্ধি-বিবেচনা ! বলে কি না, পেশাদার ওস্তাদের চেয়ে এর কাছেই প্রথমে ভালো শিক্ষা হবে। ওস্তাদ নাকি যন্ত্রের মতো শেখাবে, এ শেখাবে প্রাণ দিয়ে, দরদ দিয়ে ! পরে ওস্তাদের কাছে শিখলেই চলবে।

রমা তমালকে পছন্দ করে না। মেয়েটির জন্য দাদার দরদ টের না পেলে বোধ হয় বিরাগটা এত জোরালো হত না !

তমাল বলে, নমস্কার। গান শেখানো বন্ধ করব নাকি আজ ?

আমি বলি, না না। আপনার যতক্ষণ শেখাবার শিখিয়ে যান। আমি শুনতে এসেছি।

আধঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলাম। আমার অনভ্যস্ত উপস্থিতির জন্য তমাল কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করেছে মনে হল না। প্রাণ দিয়ে দরদ দিয়েই সে যে গান শেখায় সেটা মিথ্যা নয়।

সেদিনকার মতো শেখানো শেষ হলে তমাল বলে, আচ্ছা এবার তবে আমি যাই।

আমি বলি, একটু বসুন না ? চা বোধ হয় তৈরি হচ্ছে, এককাপ চা খেয়ে যান।

সে একটু আশ্চর্য হয়েই আমার মুখের দিকে তাকায়। আমিও এ বাড়ির মাইনে করা মাস্টার, বাড়ির লোকের মতো তাকে চা খেতে নেমন্তন্ন করা একটু খাপছাড়া লাগবে বইকী !

লক্ষ্মী উৎসাহের সঙ্গে বলে, চা আনতে বলব ?

বলতে বলতেই সে চলে যায়।

চায়ের সঙ্গে রমা আসে। তার মুখখানা ঠিক গম্ভীর নয়, নীরব জিজ্ঞাসায় একটু ভার ভার। বুঝতে পারি যে সে রাগ করেনি কিন্তু তমালকে আমার চা খেতে বলার মানেটা বুঝতে না পেরে তার অভিমান হয়েছে।

চা খেতে খেতে আমি গান আর কবিতা নিয়ে কথা আরম্ভ করি। গানে যে সুরটাই আসল, সেতার এস্রাজ বাঁশি শুধু সুরেই আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু বক্তব্য বা মর্মকথাই যে কবিতার প্রাণ— এই সাধারণ পুরানো কথা।

রমা বলে, গান তো না শিখলে হয় না। কবিতাও কি লিখতে শিখতে হয় ?

শিখতে হয় বইকী। না শিখে কি কিছু আয়ত্ত করা যায় ?

তমাল বলে, সে কীরকম ? কবিরা শুনেছি নিজেরাই কবিতা লেখেন।

নিজেরাই লেখেন। কিন্তু শিখতে হয়। সোজাসুজি মাস্টার রেখে সামনাসামনি হাতেনাতে হয়তো শিক্ষাটা হয় না। কিন্তু জগতে যত কবি আছেন তাঁদের কবিতা থেকে নতুন কবিকে শিখতে হয় কী ভাবে কবিতা লেখে, গলা সাধার মতো কবিকেও হাত মক্শো করতে হয়।

রমা বলে, কিন্তু চেষ্টা করলে কি কবি হওয়া যায় ?

সাধারণ বাজে কবি হওয়া যায়। নইলে এত কবি এত গাদা গাদা কবিতা লিখছে কী করে ? তবে ভালো কবি হতে গেলে কবির ধাতটা থাকা চাই—বিশেষ কতগুলি গুণ থাকা চাই। শুধু কবিতার বেলায় নয়, সব ব্যাপারেই ওই এক নিয়ম। চেষ্টা করলে সকলেই গান শিখতে পারে, কিন্তু বিশেষ গুণ ছাড়া কি উঁচুদরের গায়ক হতে পারে কেউ ?

তমাল হেসে বলে, যেমন আমি পারিনি।

রমা তার কথা কানে না তুলেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, ওকেই তো প্রতিভা বলে, ওই বিশেষ গুণ ?

অতি সাধারণ সব কথা কিন্তু যেরকম আগ্রহের সঙ্গে তারা শোনে তাতে সত্যই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই কৌতূহলের আরেক অর্থ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা !

আমি বলি, যে লাইনে যে বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ গুণকেই প্রতিভা বলে। কিন্তু প্রতিভা সম্পর্কে মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে। প্রতিভা কোনো আকাশ থেকে পড়া গুণ কিম্বা ছাঁকা কোনো গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ—কোনো বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দুজনের মধ্যে তফাত শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

বক্তব্যটা ওরা কেউ বুঝতে পারেনি টের পেয়ে সোজা কথায় চলে আসি, বলি, বৈজ্ঞানিকও সাধক, কবিও সাধক। দুজনের দুরকম সাধনা। দুজনকেই সাধনার স্তর পার হয়ে এগোতে হয়। আমি যে নতুন কবিতাটা লিখেছি, কয়েকটা স্তর পার হয়ে না এলে কিছুতেই এটা লিখতে পারতাম না।

তমাল বলে, আপনি কবিতা লেখেন ?

রমা বলে, নতুন কবিতা ? শুনেছি ?

না। শুনতে চাইলে শোনাতে পারি। সঙ্গেই আছে।

তমাল চুপ করে থাকে। রমা সাগ্রহে বলে, শুনি না, শুনি।

কবিতা শুনতে, বিশেষত অজানা তরুণ কবির কবিতা শুনতে, তমালের আগ্রহের অভাব আমাকে বিস্মিতও করে না, আহতও করে না। আগ্রহের অভাবটাই তার পক্ষে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

তবে কবিতাটি সে শোনে। মন দিয়েই শোনে।

শুনতে শুনতে তার মুখের যে ভাব হয় আমায় তা হতাশ করে দেয়। প্রতিভা সম্পর্কে আমার কথাগুলি বুঝতে না পেরে যেভাবে সে তাকিয়েছিল, কবিতা শুনতে শুনতেও প্রায় অবিকল সেই ভাবেই তাকিয়ে থাকে। এবার কেবল বুঝবার জন্য আরও বেশি মন দিয়ে শুনবার চেষ্টায় বাড়তি একটা ব্যাকুলতার ছাপ পড়ে তার মুখে।

নীরবে আমার কবিতার বিচার করে মুখের ভঙ্গিতেই সে রায় দিয়েছে !

কবিতা পড়া শেষ হবার পর ধীরে ধীরে তার মুখে প্রায় নির্বিকার উদাসীনতা ফিরে আসে।

রমাও ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, এ কীরকম কবিতা ? এমন ব্যাকুল করে দেয় মনটাকে !

তার কাছে এ রকম মন্তব্যই প্রত্যাশা করেছিলাম।

কবিতা সে বোঝেনি। বুঝবার জন্য নিজের অসীম ব্যাকুলতাকে সে ধরে নিয়েছে কবিতাটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বলে ! নিজেই সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সে আবেগের আলোড়ন, কবির জন্য তার মোহগ্রস্ত উদ্‌বেল হৃদয়ে যেটা অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে, সেটাকেই সে মনে করেছে কবিতা শোনার ফল !

শুধু রমা নয়। আরও অনেককেই আমি জানি, কবিকে নিয়ে মেতে গিয়ে যাদের এক রকম মত্ততা আসে, কবিতা বোঝা না বোঝার প্রশ্ন যাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, বিশেষ কবিটির সৃষ্টি বলেই বুঝুক না বুঝুক তার কবিতা তাদের হৃদয়মন আলোড়িত করে।

একটা কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হওয়া আমার ধাতে নেই। যতই জরুরি আর বাস্তব হোক চিন্তা বা দুশ্চিন্তা, হাতের নগদ কাজের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তাতে মশগুল হওয়া আকাশের কুসুম নিয়ে মেতে থাকার চেয়ে খারাপ।

পড়াতে পড়াতে আজই বোধ হয় প্রথম আমি ভুলে যাই যে একটা কাজ করছি, লক্ষ্মীদের পড়াচ্ছি। লক্ষ্মীর প্রশ্নে চেতনা আসে।

কী ভাবছেন ?

জবাব না পেয়ে আবার মৃদুস্বরে বলে, আপনার মনটা ভালো নেই, না ?

মন ভালো না থাকা কাকে বলে তুমি বোঝ লক্ষ্মী ?

বাঃ, কেন বুঝব না ? এ বোঝা কঠিন নাকি ! কিন্তু আপনার কেন মনে কষ্ট হবে ?

আমার মনে কষ্ট হতে নেই ?

না। আপনি যা নিষ্ঠুর !

লক্ষ্মীর বড়ো হবার উদ্দাম প্রক্রিয়াটা সমানভাবেই চলছে, তবে অনেকটা সংযত হয়েছে তার প্রকৃতি। একটা নাটকীয় খণ্ড দৃশ্য সৃষ্টি না করেই সে আমাকে মুখের উপর নিষ্ঠুর বলতে পারে।

তোমাকে একদিনও শাসন করিনি লক্ষ্মী।

শাসন না করলে কী হয় ? শুধু পড়াতে আসেন, পড়িয়ে চলে যান।

নালিশ ও অভিমানে তার থমথমে মুখের দিকে একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকি। লক্ষ্মীও ব্যথা পেয়েছে আমার নীরস ব্যবহারে ?

জোর করে বলি, তুমি আমার আদরের ছাত্রী।

লক্ষ্মীর চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে।

আদর ছাড়াই আদরের ছাত্রী !

লক্ষ্মী আজ আমায় বিব্রত করে, কিশোরী ছাত্রীটির কাছে অস্বস্তি বোধ করি। কোথায় যে ত্রুটি ঘটেছে আমার ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু এ কথাও ভাবতে হয় যে আঘাত না পেলে সরল তাজা মনটা তার ব্যথাই বা পাবে কেন ?

আমি কী প্রত্যাশা জাগিয়েছি তাব মধ্যে, যা আমি পূরণ করিনি ? কোন পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তার কোন সঙ্গত দাবি ফাঁকি দিয়ে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি ?

কোনোরকমে পড়ানো শেষ করে পথে নেমে যাই।

কলোনির সামনে রাস্তার কলে তখনও কয়েকজন জলার্থী ও জলার্থিনী অপেক্ষা করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে কলোনিতে ঢুকে পড়ি। তমালের সঙ্গে কথা বলব।

তমালের বিচার জেনেছি, আমার কবিতা তাকে নাড়া দিতে পারেনি। আরেকবার বিচার করে সে তার রায় পালটে দিতে পারে, এ আশা রাখি না। তমালের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যও তা নয়।

তার মনের ভাবটা আরেকটু খুঁটিয়ে জানতে চাই।

সতীশদের ঘর জানতাম। তমালদেব কুটিরখানা ঠিক তারই সামনাসামনি।

চাঁচের বেড়া ও খড়ের চালার একটি প্রমাণসাইজ ও একটি খুব ছোটোঘর। চালে খড়ের পরিমাণ খুবই কম। বর্ষাকালে জল পড়ে কিনা কে জানে !

ছোটো ঘরটিতে তমাল রান্না করছিল। তাকে খবর দেবাব প্রয়োজন হয় না, আমাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

তারই মতো জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে ঘিরে আসে একগন্ডা ছোটোবড়ো ছেলেমেয়ে।

তমাল জিজ্ঞাসা করে, কী বলছেন ?

আমি ইতস্তত করে বলি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব ভাবছিলাম। কিন্তু আপনি তো দেখছি রাঁধছেন—

দ্বিধাভরা দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমাকে লক্ষ করে তমাল বলে, ভাত চাপিয়েছি, ফুটতে এক ঘণ্টা। আসুন, ঘরে এসে বসুন।

সাধারণ গেরস্তালির জিনিসপত্রে ঘরটি ভরা—কিন্তু যতদূর সম্ভব সাজানো-গোছানো। একপাশে চৌকির বিছানায় বসেছিলেন রুগ্ণ এক বৃদ্ধ।

তমাল বলে, ইনি আমার বাবা। মা নাইতে গেছেন।

মাদুর বিছানোই ছিল, তাতে সে আমায় বসতে দেয়। নিজেও একটু তফাতে বসে।

আমি বলি, আমি যা বলতে এসেছি শুনলে আপনার ভারী মজা লাগবে।

সে বলে, তা হলে তো ভালোই। আমি ভাবছিলাম কোনো খারাপ খবর আনলেন না কি !

চাকরি সম্পর্কে ?

তা ছাড়া কী ? কবে তাড়িয়ে দেয় অপেক্ষায় আছি।

রোজগার করার আর কেউ নেই ?

একটা ভাই ছিল, মারা গেছে। কী বলছিলেন আপনি ?

আমার কবিতাটা শুনে কীরকম লাগল কিছুই বলেননি। আপনার মতামত জানতে এসেছি।

বিব্রত বোধ করলেও বিনয়ের ছলে সে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে না। আমি ভারী কবিতা বুঝি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার মতামত—এ ধরনের কোনো কথাই বলে না।

কবিতাটি সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার তার পুরামাত্রাই আছে, মনের কথাটা কীভাবে প্রকাশ করবে তাই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আরেকবার শোনাবেন ?

পড়ে শোনাই। বুঝবার জন্য মন দিয়ে শুনবার চেষ্টার সেই ভঙ্গিটাই আবার তার মুখে দেখা যায়।

পড়া হলে বুড়ো মানুষটি বলেন, কীসের ছড়া ?

তমাল বলে, ছড়া নয়, ওনার লেখা কবিতা।

জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল ?

সে বিব্রতভাবে হাসবার চেষ্টা করে মাথা নাড়ে।

বলি, ভালো লাগেনি। বুঝতে পেরেছেন কী বলছি ?

না, ঠিক বুঝতে পারিনি। একটা কথা বলতে বলতে আবার কী যেন আবেকটা কথা বলছেন মনে হল।

সেই জন্য খারাপ লেগেছে ?

তাছাড়াও কেমন নীরস লাগল—কীরকম যেন শুকনো খটমট কবিতাটা। রাগ করবেন না কিন্তু, আমার কেমন লেগেছে শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।

বেশ করেছেন, বানিয়ে মন-রাখা কথা বললে রাগ করতাম। এককাপ চা খাইয়ে বিদায় দিন।

সে চা করতে যায়। আমি তার বুড়ো বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সতীশরে জানো, সতীশ ?

জানি।

ওর একটা চাকরি-বাকরি হয় না ?

কী বলব বলুন ? যে দিনকাল।

ভাঙা কাপের চা খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়েছে, বাইরে স্বয়ং সতীশের গলা শোনা যায়, বাজারটা নাও দিকি।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বাইরে যাই। তমালের হাতে বাজারের থলিটা দিয়ে সতীশ বলে, আপনি এখানে .

এঁকে একটা কবিতা শোনাচ্ছিলাম।

আমরা বাদ গেলাম কেন ?

বলে সতীশ হাসিমুখেই তমালের দিকে তাকায়।

আপনাকেও শোনাবো বইকী !

দোকানে আসুন, সেখানে বসে শুনব।

সতীশের সঙ্গে মহিমের বিড়ির দোকানে যাই। জন-সাতেক বিড়ি পাকাচ্ছিল, সতীশ তাদের মধ্যে নিজের জায়গায় বসে পড়ে।

মহিম বলে, সকালবেলা যে নববাবু ?

তোমাদের একটা কবিতা শোনাতে এলাম ভাই।

আরে, কবিতা শোনাবেন ! আপনার কবিতা ?

কবিতা কি বুঝব ?

কীসের কবিতা লিখেছেন ? মোদের নিয়ে ?

হেসে বলি, শোনই না। শুনে কেমন লাগে বলবে ভাই।

একটু দুলে দুলে বিড়ি পাকাতে পাকাতেই তারা কবিতা শুনতে আরম্ভ করে। তারপর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে আসে তাদের, মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারাও অভিভূত হয়। তবু, তারাও জানায়, ঠিক বুঝতে পারেনি আমার কবিতা।

রাস্তাতেই কবিতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। আর কাউকে শোনাবার দরকার নেই। শত শত বছর ধরে জীবনের সঙ্গে ধারাবাহিক যে কাব্যবোধ সকলে পেয়েছে বিচিত্র জীবন-চেতনার সাথে, আমার কবিতায় সেই বোধকে নাড়া দিয়েছি। কিন্তু এদের প্রাণের ভাষা জানি না বলে বোধগম্য মানে দিতে পারিনি।

এগারো

পড়া ছেড়ে দিলে ঠাকুরপো ?

দিলাম।

এত সময় শক্তি পয়সা খরচ করলে, আরেকটু ধৈর্য ধরলেই চুকে যেত। পুরো বছরও নয়।

নিজের পেশাটা ধাতে আনি ? এমনিই বড়ো দেরি হয়ে গেছে।

তুমিই বলেছিলে কবিদের খামখেয়ালি হওয়ার মানে হয় না।

আজও তাই বলি। এটা আমার খেয়াল নয়, কর্তব্য দাঁড়িয়ে গেছে। এতদিন দরকার হয়নি, পড়াও ছাড়িনি। কিন্তু এখন ওদিক বজায় রাখতে গেলে আমার আসল কাজ নষ্ট হয়। কোটি কোটি মানুষ আমার মুখ চেয়ে আছে বউদি, আমি তাদের কবি হব। দেশ বিদেশ আমার কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে আছে। সর্বদা কী মনে হচ্ছে জান ? সবাই যেন বলছে, তোমার কত বড়ো কাজ আর তুমি কী ছেলেমানুষি করে সময় নষ্ট করছ ? এ সব মিথ্যে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারব না, কী করি বল ? এ অবস্থায় আর ঢিল দেওয়া সম্ভব নয়।

বউদির মুখ কালো হয়েই থাকে।

কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াও ?

সব জায়গাতেই যাই। গ্রামে বাজারে বস্তিতে মন্দিরে মসজিদে হোটেলে সিনেমায় বন্ধুর বাড়ি আত্মীয়ের বাড়ি সভায়—কাল হাওড়ায় তোমার দাদার বাসায় গিয়েছিলাম। উনি একটু ভালো আছেন।

দুমাসে যে চেহারা কালি মেরে গেল ?

যাক না। চর্বি জমেছিল, ক্ষয় হোক।

কিন্তু এদিকে তো জমিদারি নেই। কী ক্ষয় হবে ?

ভেবো না, আমি ভাবুক কবি নই। সে ব্যবস্থা হবে।

মানসী বলে, বাঃ, বেশ তো ! মাইকেল নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্ত দাশু রায় নেরুদা... সবাইকে বিছানায় ছড়িয়েছ ? মেশাচ্ছ নাকি ?

মেলাচ্ছি।

কবি-শিপের পরীক্ষা কবে ?

পরীক্ষা চলছে। রোজ ফেল করছি।

মানেটা কী ?

মানে খুব সোজা। তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি—বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন, নতুন যুগের নতুন সত্যকে আমি জেনেছি—কিন্তু কবিতায় কোন ভাষায় ঢেলে সাজব ? ভাব বাখতে গেলে কবিতা হয় না—যেন একটা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেছি। কবিতা করতে গেলে ভাব থাকে না—যেন কাব্যবোধের ঐতিহ্যটুকু শুধু গুলে দিয়েছি। আমার না হয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন—অন্য জীবনদর্শনও তো কম কঠিন বা কম জটিল নয়। কিন্তু কবিতার তাতে এসে যায়নি। ঈশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, রহস্যবাদ—এ সব বাদ না দিয়েও কত শ-বছর ধরে জগতে কত কবিতা লেখা হয়েছে। নিজস্ব ভাবও বজায় আছে, কবিতাও হয়েছে। আমার একটা বিশেষ বাদ আছে বলে আমার কবিতায় এ সমন্বয় হয় না কেন ? এই খেইটা খুঁজছি।

এদিকে শরীর তো গেল।

যাক। এখন ঢিল দিতে পারব না। আমি সব জেনে ফেলতে চাই না, রাতারাতি কবি হতে চাই না, কোথায় ঠেকছি শুধু ইঙ্গিতটুকু চাই। খেইটা ধরতে পারলেই আমি শান্ত হয়ে যাব। কিন্তু তোমার কী হয়েছে ? তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?

আমি ?—আমিও খেই খুঁজছি।

মানসী ম্লান মুখে হাসে।

তৃপ্তি বলে, আস না যে ?

আমার যে কীভাবে দিনরাত কাটছে—

সে তো জানি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এর কি শেষ নেই ?

যা খুঁজছি পেলেই শেষ। কিন্তু তোমার কী হয়েছে ? চোখের কোণে কালি পড়েছে যে ?

খুব বেশি শান্তিতে আছি কিনা, তাই।

বাড়ির লোকের রাগ কমেনি ?

এখনও হাল ছাড়েনি, রাগ কমবে ! সে যাক। আমি রোজ তোমার খবর নেব, এটা কি উচিত ? আমার কত অসুবিধা বোঝ না ?

খবর নেবার দরকার কী ?

দরকার তুমি বুঝবে না। তুমি কী কাণ্ড করছ তুমি নিজেই জান না। রোজ ভাবি আজ খবর আসবে নববাবু রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, নয় টিবি হাসপাতালে গেছেন। দিনে একবার উঁকি মেরে গেলে দোষ কী ? একটু তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আজকের দিনটাও ভালোয় ভালোয় কেটেছে।

সবই বুঝি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে তাও টের পাই। কিন্তু ভিতরে আমার এমন অস্থিরতা, এত ব্যাকুলতা যে, এই প্রাণপাত অনুসন্ধানের তীব্রতা কমাতে পারি না। আশা নিয়ে ছুটে যাই সব রকম মানুষের

কাছে, মিলেমিশে আপন হবার চেষ্টা করি মানুষের—আত্মীয়তা যদি সন্ধান দেয় কীসের অভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আশা নিয়ে রাত জেগে আত্মীয়তা করি দেশ বিদেশের সকল রকম পুরানো কবি নতুন কবির সঙ্গে—তাদের সৃষ্টি থেকে যদি খোঁজ পাই আমি কেন স্রষ্টা হতে অক্ষম।

জীবনের কত দিকের কত নতুন পরিচয় পাই, কত ভুল ভেঙে যায়, কত দুর্বলতা ধরা পড়ে নিজের। কিন্তু আসল যে জিনিসটি আমার দরকার সেটির খোঁজ মেলে না।

আলেয়া বলে, আমি কিছুই বুঝি না এ সব—কিন্তু আমার মনে হয় কী জানেন ? আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আগে ব্যস্ত হইনি। কিন্তু এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, ব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই। এতটা এগিয়েছি বলেই বাকিটুকু তাড়াতাড়ি না এগোলে চলছে না।

কী জানি, বুঝি না। শুনি যে সাধকদের এ রকম অবস্থা হয়—সিদ্ধিলাভের ঠিক আগে।

এ তো সে সাধনা নয়।

কেন ? লক্ষ্য ভিন্ন হোক, সাধনার রকম আলাদা হোক, কিন্তু সব সাধনাই সাধনা। যা চাই তা পাওয়ার চেষ্টাই সাধনা—পাওয়াটা সিদ্ধি।

আলেয়ার বড়ো কথা সহজভাবে ভাবার এই নমুনা আমাকে সত্যই আশ্চর্য করে দেয়।

একদিন অধীর আসে। মুখখানা বিবর্ণ আর আশ্চর্যরকম প্রশান্ত।

ফাঁদে পড়েছি।

কী ফাঁদ ?

টি বি।

যতক্ষণ সে বসে থাকে মনে হয় আমার দেহমনের অস্থিরতা যেন শান্ত হয়ে গেছে। একটি দুরন্ত ছেলে প্রচণ্ড প্রহার পেলে আরেকটি দুরন্ত ছেলের যেমন হয় ! কথা বলতে বলতে সারাক্ষণ আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ভাবি, এ কি অনিবার্য ছিল ? এ কি প্রয়োজন ছিল ?

অধীর চলে যাবার পর একটা অদ্ভুত একাকীত্বের বোধ জাগে, একটা খাপছাড়া কষ্টে যেন দম আটকে আসে। বসে থাকা অসম্ভব মনে হয়, বাইরে মানুষের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না। ঘরটা ছোটো, বাইরে বারান্দায় গিয়ে দুপুরবেলা পায়চারি করি আর আকাশ-পাতাল ভাবি।

এক সময় খেয়াল হয়, ঘেমে গেছি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

নীচে নেমে শুনতে পাই এ ঘরে মাকে বউদি বলছে, দুপুরবেলা ঠিক পাগলের মতো ছটফট করছে বারান্দায়। এ আমি আগেই ভেবেছিলাম। এ হল ভেতরের ব্যারাম, বাড়তে দিলে ঠেকানো যায় না। আপনারা শুধু প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন। আমি কত চেষ্টা করেছি—

মা আঁচলে চোখ মোছেন।

বউমা, করুক যা খুশি। তুমি বরং ওকে নিজের মনে থাকতে দাও, শুধরোবার চেষ্টা কোরো না। তাতে ফল আরও খারাপ হয়।

বউদির মুখ লাল হয়ে যায়।

ওঃ, দোষটা হল আমার ?

দোষের কথা নয়। তুমি তো কিছু করতে পারবে না। এ রোগ যিনি দিয়েছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন। কে জানে এই অভাগীর পেটে হয়তো সত্যি কোনো মহাপুরুষ জন্মেছে, আমরা না বুঝে ওকে কষ্টই দিচ্ছি।

বউদি ফুঁসে ওঠে, বুঝেছি মা, বুঝেছি। আমি ভালো করতে চাইলে মন্দ তো হবেই। আপনারা নয় মহাপুরুষকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন।

মা কেঁদে আমায় উদ্দেশ্য করে বলেন, চোরের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিস, তোর লজ্জা করে না নব ?

এগিয়ে সামনে গিয়ে বলি, লজ্জা কীসের ? মনের কথা বউদি তো আগে জানায়নি, আজ এই প্রথম বলল, তাড়িয়ে দেবার পরেও এখন যদি আমরা থাকি, তা হলে লজ্জার কথা হবে। কাঁদছ কেন ? আজকেই আমরা চলে যাব।

বউদি ভড়কে গিয়ে বলে, কী বলছ যা তা ? তাড়িয়ে দিলাম কখন ? এ কী আমার বাড়ি যে চলে যেতে বলব ?

তোমার বাড়ি বইকী। তোমার নামেই বাড়ি। তাড়িয়ে তুমি সত্যি দিয়েছ। কথাটা ফিরিয়ে নিতে পার, কিন্তু আমাদের ফেরাতে পারবে না।

মাকে তৈরি হতে বলে জল খেয়ে ঘরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। তৃপ্তিদের বাড়ির বৈঠকখানাটা চেনা লোককে ভাড়া দেবার কথা আছে—তৃপ্তির বিয়ের হাঙ্গামা চুকবার পর। বিয়েটা তৃপ্তি বাতিল করতে পেরে থাক বা না থাক, বিয়ের তারিখের আগেই অন্য কোথাও উঠে যাব বলে সাময়িকভাবে ঘরটা ভাড়া নিতে পারব। জোর করে ধরলে আমাকে ওরা না বলতে পারবে না।

মাকে নিয়ে আগে এখানে উঠি। তারপর স্থায়ী ব্যবস্থা হবে।

কড়া নাড়বার আগেই তৃপ্তি বাইরের দরজা খুলে দেয়। হেসে বলে, তোমার জন্যই রাস্তায় চোখ পেতে ছিলাম ভেব না কিন্তু।

তবে কার জন্য ?

নিজের জন্য। রাস্তায় মানুষ দেখতে ভালো লাগে।

দরজা বন্ধ করেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, দুপুরবেলা হঠাৎ ? যা খুঁজছিলে পেয়েছ ?

না। ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি।

ঘর খুঁজতে ?

সব শুনে চোখ বড়ো বড়ো করে তৃপ্তি বলে, একটা কথার কথায় এমন রেগে গেলে ? সঙ্গে সঙ্গে ঘর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লে ? নাঃ, যা ভেবেছিলাম তা সত্যি নয় দেখছি। অন্তত একজনকে তুমি সত্যি ভালোবাসো।

তার মানে ?

মার জন্য একটু দরদ আছে। এ জগতে কারও জন্য তো একফোঁটা দরদ নেই—এ তবু মন্দের ভালো।

তৃপ্তি জ্বালাভরা হাসি হাসে।

আবার বলে, কিংবা এও তোমার কর্তব্যবোধ ? যন্ত্রের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছ ?

ঝন্‌ঝন্ করে কথাগুলি কানে বাজে, অনেকের কাছে শোনা মৌলিক ধ্বনির মৌলিক প্রতিধ্বনির মতো। শুধু এভাবে কেউ বলেনি বলে এ রকম স্পষ্ট হয়নি কথাটার মানে। এই সেদিন লক্ষ্মী আমায় নিষ্ঠুর বলেছিল—পড়াতে যাই, পড়িয়ে চলে আসি। কবিতা শুনে তমালের শুধু দুর্বোধ্য ঠেকেনি, শুকনো খটখটে ঠেকেছিল কবিতাটা।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। এতক্ষণে নজরে পড়ে যে তৃপ্তিব পরনের কাপড়খানা ময়লা ও মোটা, গায়ে তার গয়নার চিহ্ন নেই। মাথার চুলে তেলের অভাবটা সুস্পষ্ট।

এই নাকি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে ?

আর কী ধারণা করব ? সেদিন অনেক লেকচার দিলে, লেকচার দিয়ে তো আমাদের ভোলাতে পারবে না। আমরা সাদাসিদে সাধারণ মেয়ে। ভালোবাসাটা তোমার আসেই না—ভালোবাসার ক্ষমতাই আসলে তোমার নেই। না ভালোবাসো মানুষকে, না দেশকে, না তোমার কবিতাকে। কোনো কিছুকে নয়। পারলে তো ভালোবাসবে ? তুমি হলে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র।

তৃপ্তি আবার সেই জ্বালাভরা হাসি হাসে।

যাকগে, ঘরটা যদি চাও, বাবাকে আর দাদাকে তোমায় নিজের বলতে হবে। আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মুখ নেই। আসলে, আমি আর বাড়ির মেয়ে নই এখন, দাসী।

তাই দেখছি।

দেখছ ? চোখে পড়েছে আমার বেশটা ? বাড়ির লোকের কথা শুনতে রাজি হলে মেয়ে হতে পারি—নইলে দাসী হয়ে থাকতে হবে।

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে থাকি।

আমি যন্ত্রের মতো মানুষ বলে ? ভালোবাসতে জানি না বলে ?

তৃপ্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচ্ছা আমি যাই।

ঘরের কথা বলতে আসবে নাকি ?

ভেবে দেখি। সব কথা একটু ভেবে দেখতে হবে !

ভালোবাসি না ? ভালোবাসতে জানি না ? তৃপ্তিকে বা মানসীকে ভালোবাসার কথা নয়—মানুষকে ভালোবাসি না, ভালোবাসতে জানি না ? কবিতাকে পর্যন্ত নয় ? আমার যে ভালোবাসা সেটা যান্ত্রিক ?

তৃপ্তির কাছে শেষে হারানো খেই পেলাম—যার সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছি ! ভালোবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কী করে জানব সেই প্রাণেব ভাষা —যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।

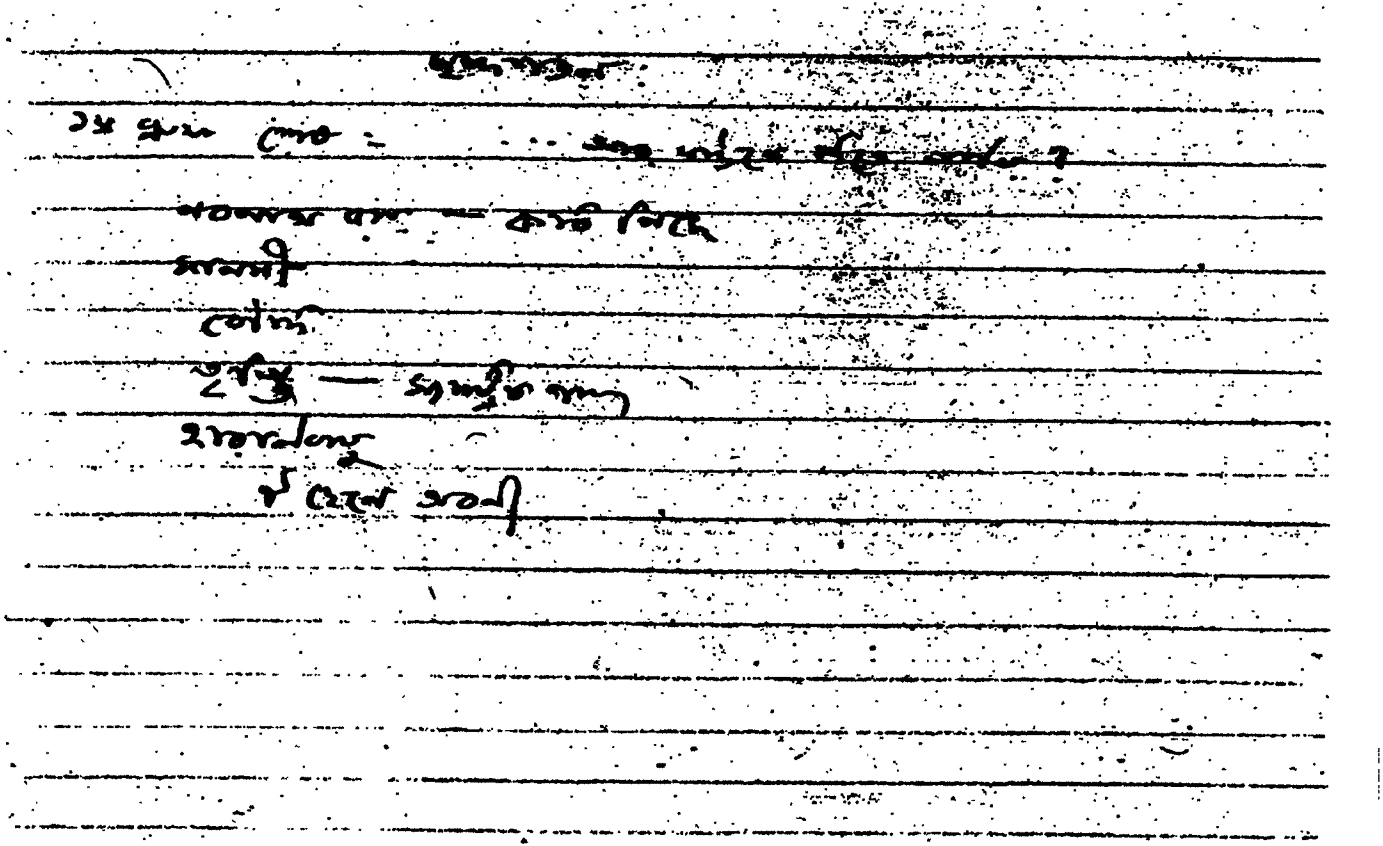

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার অংশ

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গল্প উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে শিরোনামসহ মূলপাঠের সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির অন্তর্গত চরিত্রনামের ক্ষেত্রে অবশ্য আদি বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কেবল গ্রন্থপবিচয় অংশের আলোচনাক্ষেত্রে, গ্রন্থসমূহ এবং অন্তর্গত রচনাবলির শিরোনাম, প্রথম প্রকাশকালে যেমন ছিল, তেমনই রক্ষা করা হয়েছে।

মূলে কোনো লিখিত জবানিতে (যেমন ৫ম খণ্ডে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে চিন্তামণির দিদির লেখা পত্রাদির ক্ষেত্রে) লেখকের ইচ্ছাকৃত ভাষাঘটিত বিকৃতি বা অশুদ্ধি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেগুলি যথাযথ রেখে দেওয়া হয়েছে।

লেখকের একাধিক গ্রন্থে সংলাপের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারে অভিন্ন রীতি লক্ষিত হয় না। এমনকী স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিতেও সংলাপে উদ্ধৃতিচিহ্ন কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। চিহ্ন ব্যতিরিক্ত সংলাপ-নির্দেশই সর্বাধিক ; চিহ্ন বিরলতর। মানিক রচনাসমগ্রে একটি অভিন্ন রীতি রক্ষার প্রয়োজনে সংলাপ-নির্দেশে উদ্ধৃতিচিহ্ন বা উর্ধ্বকমা [' '/" "] ব্যবহৃত হয়নি।

পেশা

'পেশা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং অষ্টাদশতম উপন্যাস। এই তালিকায় অবশ্য লেখকেব শ্রেষ্ঠ গল্প, গ্রন্থাবলি অথবা স্বনির্বাচিত গল্পকে ধবা হয়নি।

পেশা উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৩৫৮ (১৯৫১), প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ ৪ + ২০০, মূল্য তিন টাকা, প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়—যদিও নামপত্রে উল্লিখিত হয়নি। উপন্যাসটির দ্বিতীয় প্রকাশকাল লেখকের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে, প্রকাশক অপরিবর্তিত, প্রচ্ছদও তাই। কেবল পুনর্মুদ্রণে পৃষ্ঠাসংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে (পৃ ২ + ১৬৬) এবং মূল্য পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে সুনীলকুমার ধর সম্পাদিত নতুন জীবন নামক মাসিক পত্রিকায় পেশা উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয় ১৩৫২ কার্তিক থেকে। অনুমান হয় উপন্যাসটি দর্পণ, সহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি প্রভৃতি রচনারই সমকালে সূচিত হয়। নতুন জীবনে প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম ছিল ডাক্তারবাবু। উক্ত পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রথম কিস্তি (১৩৫২ কার্তিক, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা) এবং পরবর্তী দুটি বিচ্ছিন্ন কিস্তি (চৈত্র ১৩৫২, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা এবং ১৩৫৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ৩য় বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা) মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসটি উক্ত পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল কি না, সব কটি পত্রিকা সংখ্যা উদ্ধার হলে তবে সুনিশ্চিতভাবে জানা যাবে।

শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে ডাক্তারবাবু উপন্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তা থেকে উপন্যাসটি রচনার পূর্বে লেখকের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের কিছু ধারণা জন্মায়। ডায়েরির সেই অংশ যথাযথ সংকলিত হল :

ডাক্তারবাবু—উপন্যাস · নতুন জীবন :১

১। প্রমথের ছেলে কেদাব ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করাব খবর জানতে গেছে, মা শুভময়ী Blood Pressure-এর দরুণ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ফিরে এসে কেদারেব মনে আঘাত লাগল যে সে ডাক্তারী পাশ কবেছে কিন্তু মাব রোগের কত লক্ষণ দেখেও খেয়াল করেনি। ভাই উপেন, বোন অমলা। দোতালার ভাড়াটে জনার্দনেব ছেলে পরিমলের কবিরাজ হতে বিতৃষ্ণা। সে স্মার্ট হতে চাইছিল। তাব বোন কুমারী মায়া।

২। ডাক্তাবদেব অবহেলা, অজ্ঞতা—specialist না হযেও—হাতুডে ওযুধেব বিজ্ঞাপন—ডাক্তাবেব অভাব—ইত্যাদি—কলকাতায় Dispensaryতে বসাব কথা—মালিকেব ব্যবহাব—fee'ব % commission -হর্ষ ডাক্তাবেব সঙ্গে যোগ—বিযোগ—বিবাহ পশাবেব জন্য—মফস্বলে বসা—পশাব অর্জনেব চেষ্টা—ফাঁকিবাজী—

জেলাব সবকাবী ডিসপেনসাবীব ডাক্তাবেব সঙ্গে ভাব ডাক্তাব 'কি কবি—কোনদিন ওষুধ থাকে না—সিবাপ দেওযা জল দিযে দি।"

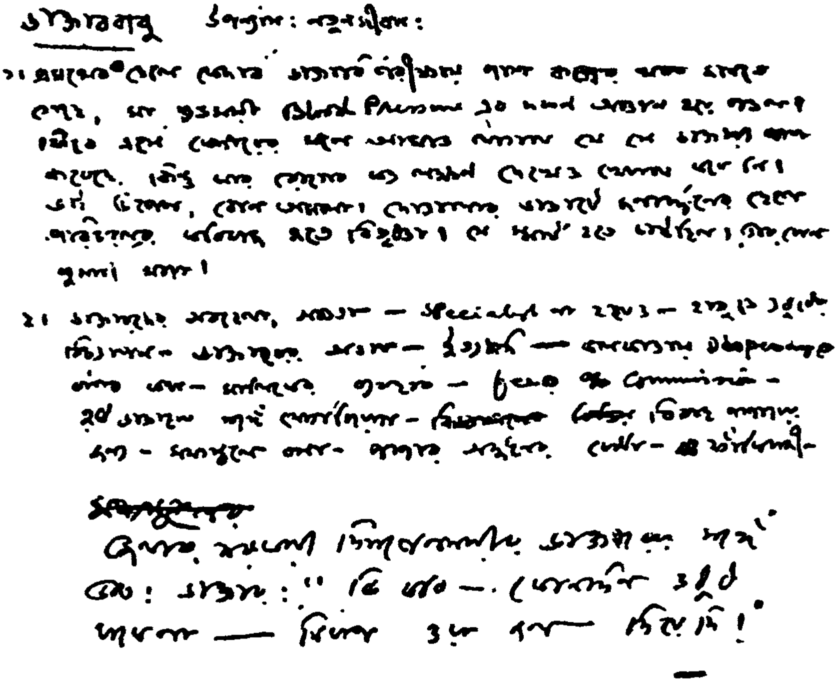

Sp Note

১। সহব থেকে মফস্বল

২। মফস্বল থেকে গ্রাম

৩। গ্রামে সার্থকতা

মূলকথা দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে জনগণেব প্রতি অনুবাগ—আত্মীযতাবোধ

সে জন্য সহবেব মেযেটিব সঙ্গে প্রেমেব বিলুপ্তি এবং গ্রামেব মেযেব প্রতি ভালবাসা

ডাক্তাববাবু (Cont.)

Note বইযে এই change

প্রথমদিকে প্রথম পবিচ্ছেদে কেদাবেব ডাক্তাবি পাশেব ঘটনাব সঙ্গে হর্ষডাক্তাব, জ্যোতি, জ্যোতিব ছোটবোন, ডাঃ পাল, গীতা প্রভৃতিকে আনতে হবে গীতাব সঙ্গে তাব ভালোবাসাব ভাব দেখাতে হবে সাধাবণভাবে। সে স্কলাবশিপ পেল না। কেদাব বিলাতী ডিগ্রি নিযে এলে গীতাব সঙ্গে বিযে হবে এবকম একটা understanding ডাঃ পালেব সাহায্য নিযে বিলেত যেতে—কাবো মেযেকে বিযে কবে বিলাত যেতে কেদাব অনিচ্ছুক ডাঃ পাল ঋণ হিসেবে টাকা দিতে চাইলে স্বীকাব কবল, বিলাতী ডিগ্রিব মোহ কেটে গিযে অনিচ্ছা জাগা সত্ত্বেও।

যুদ্ধেব জন্য যাওযা বন্ধ।

সহবে যুদ্ধেব বাত্রি [?]।

কেদাবের মফস্বল গমন প্রথম ভাগ শেষ।

Note Next instalment
ত্রৈলোক্যের প্রতিহিংসায় হরের কেদারকে তাড়ানো।
[বহু পরে লেখা পরবর্তী অংশ একই রচনার খসড়া চরিত্রলিপি একত্র গ্রথিত হল]

প্রমথ—কেদারের বাবা
শুভময়ী— মা (মৃতা)
উপেন ভাই
অমলা— বোন কুমারী
বিমলা— বিধবা দিদি

মোহিনী—হরডাক্তারের স্ত্রী
দীনেশ কম্পাউণ্ডার
সুন্দরী ডাক্তার পালের স্ত্রী গীতা
প্রীতি—জ্যোতির দিদি
বেলা—হরের বড় ছেলের বিধবা বৌ

জনার্দন—পরিমলের বাবা
বাণী— জনার্দনের বিধবা ভাইঝি
মায়া— জনার্দন [এর] কুমারী মেয়ে
ফু]—জনার্দনের ছোট মেয়ে
হরডাক্তার—
জ্যোতি—ঐ মেয়ে
ভূপেন কালীপদ—ডাক্তার
অণিমা দাস—স্বামী শশীনাথ—মেয়ে বুলু
রুকমিনি দাই

শরৎ মুখার্জি—ছদ্মনামে বোনা
ভবনডাক্তার
কুমুদ সেন—পাড়ার লোক
অনন্ত হরের ড্রাইভার
বিন্দু বিমলা কেদারের দিদি
ত্রৈলোক্য মজুমদার ধনী ব্যবসায়ী

ছায়া স্বামী সীতাংশু
শাশুড়ী—ননদ—বধূ

Note নতুন পরিচ্ছেদ—পরিমল ও জ্যোতির সংঘাত
অঞ্জলি— অমলার পূর্বতন বাগদত্ত
রেখা গীতার বন্ধু দিল্লি—বাবা মস্ত সরকারি চাকরি
দাদা—ডাক্তার অনাদি সেন—বাবা ম্যাজিস্ট্রেট

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা টীকা ভাষ্য সম্পাদনা—যুগান্তর চক্রবর্তী পৃ ৭৭-৮১

উল্লিখিত ডায়েরি অংশের প্রথম পংক্তির ১ সংখ্যক টীকায় সম্পাদক শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী এই অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করেছেন

ডাক্তারবাবু —পরিবর্তিত নামে পরিণত রূপ পেশা লেখকের অষ্টাদশ সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ বঙ্গাব্দ ১৩৫৮। ১৯৫১। ডি এম লাইব্রেরি কলকাতা।

ডাক্তারবাবু পেশায় পরিণত হবার আগে লেখক তার নাম ভেবেছিলেন নবীন চিকিৎসক। এ বিষয়ে ডায়েরি ১৯৫০ এ লেখকের নোট

20 7 51 D M Library নবীন চিকিৎসক (পরে নাম বদল— পেশা) উপন্যাস বাবদ অগ্রিম চেক 400/ (20%)।

লেখকের অন্যান্য নোট থেকে জানা যায় নতুন জীবন পত্রিকায় 'ডাক্তারবাবু'র ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। এ সম্পর্কে একটি খাতায় লেখা প্রথম নোট

ডাক্তারবাবু (উপন্যাস) ১৩৫২ কার্তিক থেকে নতুন জীবনে আরম্ভ। অগ্রিম পারিশ্রমিক 14 11 45 10/ । প্রতি পৃষ্ঠা ৫ টাকা।

ডায়েরি ১৯৫০ এ পরবর্তী নোট

12 4 46 নতুন জীবনের ডাক্তারবাবুর জন্য advance 25/

আর কোনো নোট নেই এবং উপন্যাসটি নতুন জীবন এ সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই।

তদেব পৃ ৩৬০-৬১

নতুন জীবন পত্রিকায় ডাক্তারবাবু শিরোনামে পেশা উপন্যাসের যে কটি কিস্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে তার পাঠগত ভেদ সামান্যই।

মানিক রচনাসমগ্রে পেশা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে।

সোনার চেয়ে দামী

'সোনার চেয়ে দামী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী সহরতলী উপন্যাসের মতো দ্বিপর্বিক উনবিংশতিতম উপন্যাস। সেই হিসেবে সোনার চেয়ে দামী প্রথম খণ্ড ('বেকার' নামে চিহ্নিত) লেখকের পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। ক্রমানুসারে সোনার চেয়ে দামী দ্বিতীয় খণ্ড ('আপোষ' নামে চিহ্নিত) লেখকের অষ্টাত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। কারণ দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর ষট্ত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ স্বাধীনতার স্বাদ ও সপ্তত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ ছন্দপতন উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। আলোচনার সংহতির স্বার্থে সোনার চেয়ে দামী দুই খণ্ডের পরিচিতি একত্রে সংকলিত হচ্ছে।

উক্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের (বেকার) প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ (মে-জুন ১৯৫১) প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ; পৃ ২ + ১২৮, মূল্য দুই টাকা ; প্রচ্ছদ আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের (আপোষ) প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৫৮ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫২) ; প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স কলকাতা ; পৃ ৪ + ২২৭ ; মূল্য সাড়ে তিন টাকা, প্রচ্ছদ প্রথম খণ্ডের অনুরূপ। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় পৌষ ১৩৫৯-এ, প্রকাশক পূর্ববৎ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ও প্রচ্ছদ অপরিবর্তিত ছিল। মূল্য জানা যায়নি। আষাঢ় ১৩৬৭-তে তৃতীয় মুদ্রণ হয়, তখনও গ্রন্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মূল্য পঁচিশ পয়সা বর্ধিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের (আপোষ) প্রথম সংস্করণে লেখকের একটি ভূমিকা আছে। এই খণ্ডের পরবর্তী সংস্করণ পৌষ ১৩৬৪-তে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মূল্য প্রথম সংস্করণেরই অনুরূপ ছিল।

উল্লেখ্য আষাঢ় ১৩৮৪ তারিখে সিগনেট বুক শপ কলকাতা-র পরিবেশনায় অরুণা প্রকাশনী কলকাতা-র প্রকাশনায় সোনার চেয়ে দামী উপন্যাসের একটি অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২ + ২১৩ + ২, প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী এবং মূল্য বারো টাকা। তিন বৎসর পর ভাদ্র ১৩৮৭ অখণ্ড সংস্করণের পুনর্মুদ্রণও হয়।

মানিক রচনাসমগ্রে সোনার চেয়ে দামী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত হয়েছে। এই সংকলনে উভয় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পাঠ সামান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে 'লেখকের কথা' শীর্ষক নিবেদনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন :

> পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মত তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দামী কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।
>
> প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড বড় হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাকনাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।

দেখা যাচ্ছে সোনার চেয়ে দামী দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য শিরোনাম পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র থেকে বর্তমান উপন্যাস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক কিছু উল্লেখ মেলে। ১৯৫১ সালের ৮ আগস্ট তারিখে ডায়েরির পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন :

> ...অনেকদিন পরে আজ আবার লিখছি।
>
> কি যে ঝন্‌ঝাট গিয়েছে তা কেবল আমিই জানি। শরীর খারাপ, টাকা নেই—খরচ কমে না। তবু কি অমানুষিক খেটে কতভাবে ব্যবস্থা করে যে সামলে উঠেছি তা কেবল আমিই জানি। 'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড বেরিয়েছে। ২য় খণ্ড লিখে দিয়েছি।
>
> সোনার চেয়ে দামী (১ম) সম্পর্কে সিগনেট 'টুকরো খবরে' লিখছে : একটি ছিন্ন হার উপলক্ষ করে এত ভাল উপন্যাস একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে পারেন বাংলা দেশে।...

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৫৩

সিগনেট প্রেস প্রচারিত ও প্রকাশিত সাহিত্য-বিষয়ক তথ্যবিবরণ 'টুকরো কথা'-র ৫ম সংখ্যায় লেখক-উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

> অনেকদিন পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন উপন্যাস লিখেছেন 'সোনার চেয়ে দামী'। ছিন্ন একছড়া সোনার হারকে উপলক্ষ্য করে এমন ভালো উপন্যাস একমাত্র তিনিই বোধ করি লিখতে পারেন বাঙলাদেশে।

উক্ত টুকরো কথা-র জনৈক পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। তদনুসারে টুকরো কথা-র ২০-সংখ্যায় প্রকাশকের পক্ষ থেকে উত্তরস্বরূপ উপন্যাস সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশিত হয়। যথা

> পাঠকের চিঠি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনার চেয়ে দামী' বইটি পড়লেম কিন্তু সোনার চেয়ে দামী বলতে লেখক ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন—ঠিক বুঝতে পারলেম না, যদি দয়া করে জানান কৃতজ্ঞ থাকবো।
>
> সিগনেট প্রেসের জবাব 'সোনার চেয়ে দামী' পড়ে আপনি জানতে চেয়েছেন লেখকের বক্তব্য কী। আপনি বোধকরি এ-উপন্যাসের শুধু প্রথম খণ্ড পড়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডও বেরিয়েছে কিছুদিন হল।
>
> 'সোনার চেয়ে দামী' হচ্ছে উপন্যাস। কাজেই গল্পটাই এখানে মুখ্য। সেই গল্পটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ছোটোগল্প কিম্বা উপন্যাসে গল্পটাই কিন্তু আসল। লেখকের যা বিশেষ বক্তব্য তা ঐ গল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। লেখাটি প্রবন্ধ হলে অবশ্য তার মধ্যে আইডিয়া অর্থাৎ লেখকের বক্তব্যের মূল্য হত বেশি।
>
> যাই হোক, গল্প যদিও গল্পই, তাহলেও প্রত্যেক সৎ এবং শক্তিশালী লেখকের গল্পেই কিছু বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। 'সোনার চেয়ে দামী' বইটিতেও আছে। কথাটা হচ্ছে এই
>
> এই উপন্যাসের গল্পের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন যে আর্থিক দৈন্যের ফলে রাখাল এবং সাধনার দাম্পত্যজীবন ক্রমে বিরস হয়ে উঠছিল। দেখা যাচ্ছিল যে তারা পরস্পরকে আগের মতো আর ভালোবাসতে পারছে না, কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে। সামান্য একটা সোনার হারকে কেন্দ্র করে তারা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পারিবারিক সুখকে হারাতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত রাখাল গয়না চুরি করতেও বাধ্য হল—যাতে এই পারিবারিক সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ভালোবাসা হচ্ছে সোনার চেয়েও দামী। শেষ পর্যন্ত সাধনা সেটা বুঝতে পারল। সেইজন্য হার গলায় দিয়ে আত্মীয় বাড়ির বিয়েতে সে গেল না, হার খুলে রেখে সে গেল গরীব ভোলার বোনের বিয়েতে।
>
> দারিদ্র্য মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নাশ করে ঠিকই, কিন্তু আমরা যেন না ভুলি যে পৃথিবীতে সোনাই সবচেয়ে দামী নয় তার চেয়েও দামী ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং জীবনের সহজ ছন্দ।।

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩৮৬-৮৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত অপ্রকাশিত ডায়েরির ১৯৫১-৫২ সালে লিখিত দু-একটি পৃষ্ঠায় বর্তমান উপন্যাসের দুটি খণ্ড বিষয়ে কিছু 'নোট' এর সন্ধান পাওয়া যায়। যথা

> সোনার চেয়ে দামী
>
> রেবা = অলকার বদলে রেবাই রইল
> সঞ্জীব—আশা
> রাজীব—বাসন্তী
> দীননাথ—রাজীবের পার্টনার—
> ৪র্থ ফর্মার শেষ তফাৎ থাকলেও যে বাঁধুনী

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৫২

> সোনার চেয়ে দামী—২য় ভাগ
>
> আপোষ
> শকুন্তলা—বয়স্কা কুমারী—বিয়ে হয় না কেন ?
> লতিকা }
> অমিয়া }

বামাচরণ—কবি
নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী ভাড়াটের সঙ্গে মেয়েদেরও ঝগড়া
মেয়ে দুটি নাচে গানে অদ্বিতীয়া
সুধীর মুখার্জির স্ত্রী মিশুক—ছেলের বৌ অঞ্জলি লাজুক—মেয়ে নমিতা
সেনদের রাঁধুনি আবার পালিয়েছে—বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনী
ঘোষাল বাড়ী থেকে এসে রাঁধুনি তিনদিনে ফিরে গেল—
পরেশ—৮০ টাকা পায়—একখানা ঘর—তিনটি ছেলেমেয়ে – বৌ অমলার আবার ছেলেপিলে হবে -
রাজেন মল্লিক—
শোভা বড় বৌদি ররদা
প্রভা রামনাথ
বাসন্তীর ভাড়াটে চরণদাস—বৌ রাধা—মেয়ে প্রণতি—
চরণের ভাই গৌর
সুমতী
সুমথ
১১ ফর্মা শেষ " খাবার দোকানদার অল্প

অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৬২ ৬৩

নোটগুলি প্রধানত চরিত্রভিত্তিক। দ্বিতীয় খণ্ডের উপর উল্লিখিত নোটে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কয়েকটি শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে অনুপস্থিত কেন, বোঝা যায় না। সমকালীন (১৯৫৪) একটি ব্যক্তিগত পত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন

> সোনার চেয়ে দামী'র ২য় খণ্ড ছাপাবার সময়কার একটা অভিজ্ঞতা স্মরণে এল। প্রথম দিকে কয়েক ফর্মা ছাপা হয়ে যাবার ফলে শেষের দিকে এক যাগায় [জায়গায়] একটু পরিবর্তন করবার ইচ্ছা হলেও করতে পারিনি।
>
> অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩১৮

১৯৫১ সালের ৭ মে তারিখে ডায়েরিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন

> অনেকদিন লেখা হয় নি। বড় অসময় চলছিল—এর মধ্যে এসেছিল চরম অবস্থা। অন্য মানুষ ডুবে যেত।
>
> অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৫৩

১৯৫১ সাল লেখকের জীবনে দারিদ্র্য ও অসুস্থতার সঙ্গে ক্রমান্বয় সংগ্রামের বৎসর। তথাপি ১৯৫১-৫৩ সময়কালের মধ্যে পেশা এবং সোনার চেয়ে দামী (১ম খণ্ড) থেকে শুরু করে মোট এগারোটি উপন্যাসের তালিকা পাওয়া যায়। এইগুলির ভিতর উপন্যাসের আঙ্গিক-সংক্রান্ত কিছু নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন নিহিত আছে। স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক সংকট ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসের নবরীতির পর্যায়টি আলোচ্য সোনার চেয়ে দামী উপন্যাস থেকেই সূচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

স্বাধীনতার স্বাদ

'স্বাধীনতার স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিংশতিতম উপন্যাস এবং ষটত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫১, যদিও গ্রন্থে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, পৃ ৬ + ২৬১, মূল্য চার টাকা, প্রচ্ছদশিল্পীর উল্লেখ নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থেই কেবল একটি উৎসর্গপত্র আছে, তাতে লেখা

> 'সম্প্রদায়-নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—
> জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।'—লেখক

উৎসর্গ পৃষ্ঠা ব্যতীত আর একটি পৃষ্ঠায় আছে 'লেখকের কথা'—সেখানে লেখক জানিয়েছেন :

> "এই উপন্যাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিন বছর আগে—শেষ হয় '৫৭ এর গোড়ার দিকে।"

'৫৭-র গোড়ার দিকে (আষাঢ় ১৩৫৭) মাসিক বসুমতীতে উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশের এক বছর পরে আষাঢ় ১৩৫৮-য় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং গ্রন্থ প্রকাশের 'তিন বছর আগে লেখা হয়েছিল' বলতে লেখক বলতে চেয়েছেন, তিন বছর আগে লেখা শুরু হয়েছিল। মাসিক বসুমতীতে উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য পরে বিবৃত হচ্ছে।

স্বাধীনতার স্বাদের দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭-তে মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত হয়, পৃ ৪ + ২৩২, মূল্য আট টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী গণেশ বসু। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল ১৯৫১; প্রকাশক অঙ্কুর পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ২৩২, মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা, প্রচ্ছদ বরুণ সাহা।

আলোচ্য উপন্যাস বিষয়ে লেখকের অপ্রকাশিত ডায়েরিতে কিছু বিচ্ছিন্ন মন্তব্য আছে। ৮ আগস্ট ১৯৫১ তারিখে লিখিত ডায়েরিতে উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কিছু অসন্তোষের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক :

> ...গুরুদাস 'স্বাধীনতার স্বাদ' ছাপিয়ে চটেছে। আগে বইটা পড়ে নি, পরে বোধহয় বাইরে থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় বইটার মতামত ভালো লাগে নি। জানিয়েছে আমার কোন বই-এর পুনর্মুদ্রণ ওদের দ্বারা হবে না। স্বাধীনতার স্বাদের ছাপা বাঁধা জঘন্য হয়েছে।...
>
> অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৫৩

১৯৫১ সালের একটি ডায়েরিতে তারিখ-উল্লেখহীন একটি পৃষ্ঠায় এই উপন্যাসের মুদ্রণকালীন কিছু ফর্মার হিসেব লিখিত আছে।

স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসে গোকুল কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ। উপন্যাসে তার কিছু কবিতার নিদর্শন আছে। তারই দুটি কবিতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, মে ১৯৫০) সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পাদক শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী প্রসঙ্গত টীকাসূত্রে মন্তব্য করেছেন :

> 'দিবারাত্রির কাব্য'-র ভূমিকাকবিতা ও হেরম্বের চরিত্রে কবিস্বভাবের বর্ণনা, এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুমুদের উক্তিতে কবিতাপ্রসঙ্গ বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। প্রথম জীবনের এই উপন্যাস দু'টির দীর্ঘকাল পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় শেষ জীবনের একাধিক উপন্যাসের অন্যতম বা প্রধান চরিত্র কবি। কবিচরিত্রকে কেন্দ্র করে কবিতাচিন্তা ও কবিতা এই সব উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। 'স্বাধীনতার স্বাদ' এই শেষ পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস ; প্রকাশকাল জুন ১৯৫১। আলোচ্য উপন্যাসের দু'টি চরিত্র কবি,—মনসুর ও গোকুল। মনসুর সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা : "কবি হিসাবে নজরুলের আধুনিক সংস্করণ হবার চেষ্টাটা তার আন্তরিক, বোধ হয় সেই জন্যই তার কবিতায় সরলতা এবং জটিলতার চরম সমাবেশ ঘটে, একটা লাইন হয় গ্রাম্য ছড়া এবং পরের লাইন শব্দার্থক ধাঁধাকে ছাড়িয়ে যায়,—কবিতা ভালো হয় না।" উপন্যাসের দু'টি কবিতাই গোকুলের রচনার নিদর্শন। প্রথম কবিতাটি গোকুলের কবিতার বইয়ের "উৎসর্গ বা ভূমিকা"। দ্বিতীয় কবিতাটির উপলক্ষ একটি কারখানায় ধর্মঘট ও গুলি। কবিতাটির শুধু আরম্ভটুকু উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে। নিজের এই কবিতা সম্পর্কে গোকুল বলে, "প্রাণে আমার আগুন ধরে গেল। রাত্রে কবিতা লিখতে বসলাম, প্রাণের সেই আগুনকে একটি কবিতায় পরিণত করব। ঘরের কোণে রাত দু'টো পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে কবিতা একটা দাঁড় করালাম, জগৎটাকে যেন জয় করেছি এমনি তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোলাম। অনেক বেলায় উঠে চা-টা খেয়ে কবিতাটা পড়ে নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছা হল...কি উপমা, কল্পনার কি তেরচা গতি—"...আলোচ্য কবিতাটির একটি ঈষৎ ভিন্নতর রূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার খাতায় পাওয়া যায় : রচনাকাল ২০.৫.৪৯।
>
> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, পৃ ১১২-১৩

সংশ্লিষ্ট কবিতা দুটি হল :

'আমি কবি, শুঁড়ি নই'
'কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, কি আওয়াজ'

স্বাধীনতার স্বাদ মাসিক বসুমতী পত্রিকায় 'নগরবাসী' নামে বৈশাখ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ থেকে আষাঢ় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় (১৯৪৮ এপ্রিল-মে থেকে, ১৯৫০ জুন-জুলাই)। ১৩৫৫ কার্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্রে, ১৩৫৬ বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুনে এবং ১৩৫৭ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি। মোট ১৬ কিস্তিতে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। চৈত্র ১৩৫৬ অর্থাৎ শেষ কিস্তির পূর্বতন কিস্তিটি উপন্যাসে বর্জিত হয়। বর্জিত কিস্তিটি পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত নগরবাসী উপন্যাসের সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত স্বাধীনতার স্বাদের মূলগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। স্বাধীনতার স্বাদ নামকরণ অবশ্য নগরবাসী অপেক্ষা যথাযথ। যদিও নগর কলকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, তবু আসন্ন স্বাধীনতা-অর্জনের পটভূমিতে এই দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতিও এই কাহিনিতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছে। সর্বত্রই আসন্ন স্বাধীনতার সংবাদ ধ্বনিত, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তিনদিন আগে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামো থেকে নারীর মনের জাগরণ ও স্বাধীনতার তাৎপর্য সন্ধানের দিকটিও উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য। মণিমালা এ কারণেই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র—প্রধান চরিত্রও বলা যায়। কারণ তার চরিত্রের বিকাশ ও মনোমুক্তির প্রসঙ্গই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

একটি সম্পূর্ণ কিস্তি উপন্যাসে বর্জন করা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখক কিছু কিছু পাঠ সংস্কার করেছেন—অধিকাংশই স্পষ্টতর করার কারণে, পরিবর্ধন-জাতীয়। ক্বচিৎ পরিবর্জন ঘটেছে, ঈষৎ ভিন্নতর সচেতনতার ফলে। উদাহরণগুলি নিম্নরূপ :

পত্রিকার পাঠ	**গ্রন্থধৃত পাঠ**
বৈশাখ ১৩৫৫ প্রথম কিস্তি খাজনার মত দাবী করছে ভিক্ষা	...খাজনার মতো দাবি করছে ভিক্ষা। এই অকথ্য অস্বাভাবিকতাই যেন গায়ের জোরে হয়েছে স্বাভাবিক। মানিক রচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৬১
গলিতে স্রোতের মত একটানা আনাগোনা ছিল মানুষের। এই ঠিকানায় ওরা না-ও থাকতে পাবে।	গলিতে স্রোতের মতো একটানা ছিল মানুষের। প্রণব বাস্তববাদী মানুষ, বাস্তব অবস্থার অভাবনীয় উদ্‌ভট পরিবর্তন ঘটলে বিচলিত হয়ে দিশাহারা হয় না। এ ঠিকানায় ওরা নাও থাকতে পাবে। মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৬২
হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে সে বলে, তাই যাব। তুমি ব্যবস্থা কর। প্রণব খুঁজে পেতে একটা লরি জোগাড় করে আনে।	...হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে সে বলে, তাই যাব। তুমি ব্যবস্থা করো। সুশীলের মতামতের প্রশ্ন কেউ তোলে না। মণি একবারও বলে না যে, উনি ফিরে আসুন। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি। সোজাসুজি সে প্রণবকে ব্যবস্থা করার কথা বলে দেয়। বিকেলের দিকে সুশীল ফিরে এলে দেখা যায় তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে এত বড়ো সিদ্ধান্ত করে ফেলার জন্য কিছু মনে করা দূরে থাক, মণির প্রতি সে রীতিমতো কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। প্রণব খুঁজে-পেতে একটা লরি জোগাড় করে আনে। মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৭০

একজন ছোকরাকে সাথে নিয়ে কানু খোলা ছাতে অস্থায়ী একটা চালা খাড়া করার কাজে লেগে গেল। একা কানু আর তার অল্পবয়সী সাথীটিকে বাড়ির মধ্যে দেখেই মণিব গা একটু শিউবে উঠেছিল। অন্তঃপুরচারিণী মনে এমনি বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস জমেছে ! নইলে কি নতুন ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনা যেত, দুরন্ত ছেলেকে মায়েবা ভয় দেখাত মুসলমান ধরে নেবে। পাল্টা ছড়া পাল্টা ভয় দেখান চালু হত অন্য এলাকায়। ওদের কেউ কিছু বলে না ঠাকুবপো ?	একজন ছোকরাকে সাথে নিয়ে কানু খোলা ছাতে স্থায়ী একটা চালা খাড়া করার কাজে লেগে গেল। ওদের কেউ কিছু বলে না ঠাকুরপো ? মা বচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৭৩
শ্রাবণ ১৩৫৫ সংখ্যার প্রথমাংশ (একই বিষয় ও প্রসঙ্গ)	**গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম দশ পৃষ্ঠা** (একই বিষয় ও প্রসঙ্গ কিন্তু গ্রন্থে অনেক সুলিখিত ও বিশ্লেষিত। প্রচুর পরিবর্তন, বর্জন ও সংযোজন আছে।)
(পত্রিকায় কৃষকদেব কথা আছে)	(গ্রন্থে কৃষকপ্রসঙ্গ বর্জিত। গ্রন্থে মজুর বা শ্রমিকদের কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। তাবা দাঙ্গা করে না, তারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে—এই সিদ্ধান্ত লেখকের।)

গ্রন্থের একস্থানে (মা বচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৬৯) বলা হয়েছে সুশীল অপিস গেছে। পরে ২৯০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, সে বিখ্যাত কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক। পত্রিকাতেও এই অসংগতি ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো উপন্যাসে লেখকের অনভিপ্রেত এই জাতীয় তথ্যভ্রান্তি বা অসংগতির উদাহরণ ইতিপূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান রচনাসমগ্রে এইগুলি সংশোধনের কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

মানিক রচনাসমগ্রে স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

ছন্দপতন

'ছন্দপতন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তত্রিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং একবিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১), প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ কলকাতা, পৃ ৪ + ১৬৬, মূল্য দুটাকা আট আনা। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৪ ফাল্গুনে প্রকাশিত হয, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ১১৩, প্রকাশক ও মূল্য অপরিবর্তিত ছিল।

উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ হয় 'কবির জবানবন্দী'—যদিও 'নাম বদল হবে' এই মর্মে লেখকের ডায়েরিতে (৪ এপ্রিল ১৯৫১) উল্লেখ ছিল। নিউ এজ পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে উপন্যাসটির জন্য ৫০০ টাকা অগ্রিম প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে উক্ত দিনপঞ্জিতে। যে কোনো কারণেই হোক, উক্ত প্রকাশক দু-তিন ফর্মা ছাপিয়ে ছাপার কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। ছন্দপতন সম্পর্কে ডায়েরিতে আরও কিছু নোট আছে, নাটকের কুশীলবের মতো, যথা :

১ম প্রুফ শেষ	আর কাউকে দিতে পারি ?
নবনাথ বায়	— কবি নিজে
মানসী	— কবি নিজে
বৌদি	

তৃপ্তি—ম্যাট্রিক পাশ

হারাণ বাবু

ঐ ছেলে অবনী

ছন্দপতন উপন্যাসের নায়ক নবনাথ কবি, সে কারণে উপন্যাসটিতে কিছু কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসভুক্ত দুটি কবিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলনে গৃহীত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, মে ১৯৭০) গ্রন্থে সম্পাদক কর্তৃক লিখিত কবিতা-পরিচয় অংশে ছন্দপতন ভুক্ত কবিতা দুটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত হল

> 'ছন্দপতন উপন্যাসের' প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৫১। প্রথম পুরুষে লিখিত এই উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র পঁচিশ বছর বয়সের যুবক কবি নবনাথ রায়। এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসটিকে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কবির অস্তিত্ব ও কবিতা রচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ বলে অভিহিত করা চলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ডায়েরি থেকে জানা যায় যে উপন্যাসটি কবির জবানবন্দী নামে ছাপা আরম্ভ হয় নাম পরিবর্তনের কারণ অবশ্য ডায়েরিতে লেখা নেই।
>
> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাচিন্তার দৃষ্টান্ত হিসেবে ছন্দপতনের দুটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত হল কবি ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোনো কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কিরকম মানুষ। তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি— বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন নতুন যুগের নতুন সত্যকে আমি জেনেছি— কিন্তু কবিতার কোন ভাষায় তাকে সাজব ? ভাব রাখতে গেলে কবিতা হয় না—যেন একটা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করছি। কবিতা করতে গেলে ভাব থাকে না—যেন কাব্যবোধের ঐতিহ্যটুকু শুধু পুরে দিয়েছি। আমার না হয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন— অন্য জীবনদর্শনও তো কম কঠিন বা কম জটিল নয়। কিন্তু কবিতার তাতে এসে যায় নি। ঈশ্বরবাদ মায়াবাদ ভক্তিবাদ রহস্যবাদ—এসব বাদ না দিয়েও কত শ বছর ধরে জগতে কত কবিতা লেখা হয়েছে। নিজস্ব ভাবও বজায় আছে কবিতাও হয়েছে। আমার একটা বিশেষ বাদ আছে বলে আমার কবিতায় এ সমন্বয় হয় না কেন ? এই খেইটা খুঁজছি।
>
> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পৃ ১১০-১৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা গ্রন্থে ছন্দপতন থেকে সংকলিত কবিতা দুটি যথাক্রমে

১। শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো

২। চাতকের প্রাণ গেছে

প্রসঙ্গ কবিতা বলেই হয়তো ছন্দপতন উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা প্রকাশিত হয়েছে, যার সমকালীন ইতিহাস জানা থাকলে উক্ত প্রসঙ্গের গুরুত্ব বোঝা যাবে। ১৩৫৬ ৫৮ বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াস ঘটেছিল এবং সেই বিতর্কসভায় কিছু অতিবাম প্রবণতায় রবীন্দ্রসাহিত্যবিচারে উগ্রতা বা সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৩৫৬ পৌষ পরিচয়ে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত অতিবাম সংকীর্ণতা থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত ছিল। তারই অল্পকাল পরে লিখিত ছন্দপতন উপন্যাসে তারই প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। নব উপন্যাসের নায়ক-কবি মানসীকে বলেছে

> হাজার হাজার মানুষ তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] কবিতা আবৃত্তি করে আসছে পরেও করবে। ওসব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে স্থায়ী জিনিষ। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আবৃত্তি করবে ? তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।
>
> রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের দিনের নতুন কবির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। রবীন্দ্রনাথকে ছোটো করার বড়ো করার প্রশ্নটাই হাস্যকর।

> আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড়ো উৎস রবীন্দ্রনাথ সেটা তো আছেই। এটা শুধু আমার বেলা নয় সব রকমের সব কবির বেলায়ই সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাইনি—এ কথা বলা যে কোনো কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি। এ কথা বলার অর্থ আমি বাংলাদেশে জন্মাইনি, বাংলার জল মাটিতে বাঙালি সমাজের খাদ্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হইনি—আমি স্বয়ম্ভূ অথবা আমি পরগাছা।
>
> পরগাছার নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের বাবারস সব গাছের শেকড়ে। পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।
>
> রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারায় কাব্যসৃষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা জোগায়নি এ কথা বলার সাধ্য আমার নেই—অন্য কারও আছে আমি বিশ্বাস করি না।
>
> মানিক রচনাসমগ্র ৭ পৃ ৩৯৮-৩৯৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য কয়েকটি উপন্যাসের মতো ছন্দপতন উপন্যাসেও লেখকের অনবধানতাজনিত কিছু তথ্যগত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। নায়ক নবকে একটি গৃহশিক্ষকতার ভার নিতে হয়। ব্যবসায়ী হারাণের সাত বছরের একটি মেয়ে ও দু-বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে তার দার্জিলিঙে যাওয়ার কথা—ছেলেমেয়ে দুটির নাম লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মী। অন্যত্র তাদের বয়স ছ-বছর ও সাত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে 'দু' বছর মুদ্রণ প্রমাদ ছিল। কিন্তু এর সামান্য পরে, দার্জিলিং থেকে ফেরার মাস দুই বাদে নব-র চিন্তা 'ভয় লোভ আর মিথ্যা কথার ডিপো দশ এগারো বছরের মেয়ে, চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তার মতো একগুঁয়েমি পায় কোথা'—পুনর্বার খটকা জাগায়। কারণ এর ফলে মাত্র তিন চারমাসের ব্যবধানে লক্ষ্মীর বয়স সাত থেকে দশ-এগারো হয়ে গেছে।

উপন্যাসের সূচনায় নবকে পঁচিশ বছরের যুবক বলা হয়েছে, অন্যত্র আছে, 'সে ছেলেমানুষ কলেজের ছাত্র মাত্র।' ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৩) গ্রন্থে শ্রীসরোজ দত্ত প্রশ্ন তুলেছেন, 'পঁচিশ বছর বয়স্ক কাউকে কি ঠিক ছেলেমানুষ বলা যায়? তাছাড়া ওই বয়সে সে কলেজে কী পড়ে? উনিশ কুড়ি বছর বয়সেই তো কলেজের পাঠ শেষ হবার কথা।' (পৃ ৮২)

মানিক রচনাসমগ্রে ছন্দপতন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

সম্পাদকমণ্ডলী

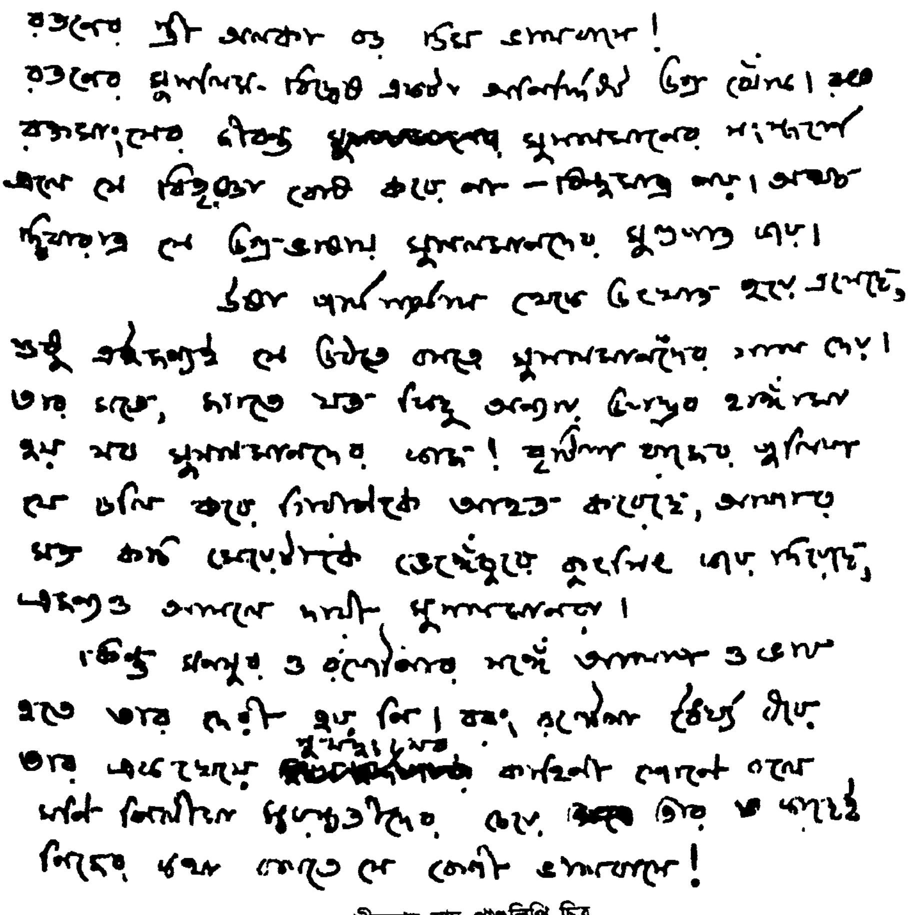
হাতের [illegible] অনেক তো [illegible] [illegible]!
হাতের মুসলিম-বিদ্বেষ একটা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] মুসলমানদের [illegible]
এখন যে হিন্দুদের কোনও কাজে না — হিন্দুরাও না। অথচ
[illegible] যে [illegible] মুসলমানদের সুযোগ দেয়।
[illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] হয়ে গেছে,
শুধু [illegible] যে [illegible] [illegible] মুসলমানদের [illegible] দেয়।
তার চেয়ে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] মুসলমানদের দোষ! মুসলিম [illegible] মুসলিম
যে [illegible] করে [illegible] [illegible] করেছে, আমাদের
এত কাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে,
এখনও আমাদের দাবী মুসলমানদের।
কিন্তু মজুর ও [illegible] সঙ্গে আমাদের ও [illegible]
হতে তার বেশী হয় নি। বরং [illegible] [illegible] [illegible]
তার [illegible] [illegible] কাহিনী শোনার পর
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
নিজের [illegible] [illegible] যে কোনো [illegible]!

স্বাধীনতার স্বাদ পাণ্ডুলিপি চিত্র

পরিশিষ্ট

মূল গ্রন্থের বর্জিত পাঠ

স্বাধীনতার স্বাদ : মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কিন্তু
গ্রন্থে বর্জিত অংশ এবং
এগারোটি পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

নগরবাসী উপন্যাসের (স্বাধীনতার স্বাদ নামে পরিবর্তিত) মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৫৬, (পৃ ৭৭৮) সংখ্যায় প্রকাশিত পাঠ (উপন্যাসে বর্জিত) :

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

স্বাধীনতা আসি-আসি করে, গিরীন ফিরে আসে না হাসপাতাল থেকে। ভূষণ একেবারেই আসবে কি না বলা খুব কঠিন। গিরীন ছাড়া পেতে পেতে হয় তো স্বাধীনতা এসে যাবে। ভূষণ হয়তো স্বাধীন হয়ে যাবে একেবারেই। মজুর কি না, সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। সব কিছুই সবার চেয়ে বেশী বেশী করা চাই, এগিয়ে এগিয়ে করা চাই।

ভীষণ রকম জখম-টখম হয়ে সবাই যা করল, সেটা ভূষণের করা চাই একেবারে সহীদ হয়ে। মজুর কি না।

স্বাধীনতা এল বলে। সকলেই কম বেশী উৎসুক, কৌতূহলী। কিন্তু আনন্দ আর উত্তেজনা যে স্তরে ওঠা উচিত ছিল ব্যাপকভাবে তার ধারে কাছেও পৌঁছে না। দলীয় আবেগ-উন্মাদনার মধ্যেও প্রাণের অভাব— ফেনিয়ে তোলার চেষ্টায় তা কৃত্রিম। সাধারণতম লোকটির মনেও খটকা স্বাধীনতা লাভের এ কেমন জটিল খাপছাড়া প্রক্রিয়া? বিদেশী শাসন খতম হয়, পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়, এই তো চিরকালের জানা কথা। বিদেশী নিজে খুশী হয়ে স্বাধীনতা দান করে, সে জন্য ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ করার দরকার হয়, এ সব মনে হয় সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। কোন সমস্যার মীমাংসা না হয়েই স্বাধীনতা আসছে, বরং নিয়ে আসছে নতুন বড় বড় সমস্যা। কোন নির্দ্দিষ্ট বাস্তব পাওনার সুনিশ্চিত আশা-ভরসা ভিত্তি করে এত কাল পরে স্বাধীন হবার নামেই যে মানুষ আনন্দে পাগল হয়ে যাবে সেটা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু অনির্দ্দিষ্ট অনিশ্চিত আশাই একমাত্র অবলম্বন যে এক রকম ভাবে সমাধান হয়ে যাবে সমস্যাগুলির, বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার যে পাহাড় প্রমাণ দেনা জমেছে সাধারণ মানুষের কাছে জীবনের, তা সুদে-আসলে পরিশোধ হয়ে যাবে। এ আশার ভিত্তি—কিসে কি হবে আমরা বুঝি না বটে কিন্তু নেতারা বোঝে।

আনন্দ উৎসাহের না হোক বাড়ীতে আলোচনা-তর্ক বিতর্কের বন্যা এসেছে। যাই ঘটুক আর যেমন স্বাধীনতাই আসুক, যা ঘটতে চলেছে তা সামান্য নয়, মস্ত ব্যাপার। যতই ঘটন-অঘটন সম্ভাবনার তাল-গোল পাকানো জগা-খিচুড়ি হোক, যেমন চেয়েছিলাম তেমন না হোক, ব্যাপার ঘটছে বিরাট স্কেলে। তর্ক আর হৈ-চৈ চরমে উঠবে বৈ কি। প্রণব গোকুলেরা ক'জন শুধু তর্কে উৎসাহী নয়, সকলের সঙ্গে আলোচনাতেও নয়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘরে বাইরে ঘটনা আর সকলের ভাব-সাব লক্ষ্য করার দিকেই তাদের ঝোঁকটা বেশী।

মনসুর আজকাল এক রকম রোজই আসে। রশৌনাও সঙ্গে আসে প্রায়ই। মনসুর এলে যেন তাকে উপলক্ষ করেই এক নতুন পর্য্যায়ের আলোচনা সুরু হয়, গোকুল থাকলে তো কথাই নেই। মণি তাদের সঙ্গ ছেড়ে নড়ে না। রান্নার দায়িত্ব সে ছাড়েনি, সে দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে তখনকার মত ছুটি নেয়। আশ্চর্য্য আর রোমাঞ্চকর মনে হয় আলোচনা মণির কাছে। ছোট-বড় সাধারণ-অসাধারণ সব কিছুর যেন নতুন মানে খোঁজাই এদের পণ। সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝে না মণি কিন্তু মোটামুটি তার চেতনায় মর্ম্ম-গ্রহণের স্বাদ লাগে। কি তীক্ষ্ণ সে স্বাদ—কি তার ঝাল! নানা ভাবে নানা সূত্রে সারা জগৎ আর সমস্ত মানুষের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ শুধু নয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত মূল সত্যের এক শক্ত বাস্তব অভিনব বুনিয়াদের উপর নূতন কাঠামোয় নূতন রূপ নিয়ে হাজির হয়। অথচ তারই সঙ্গে থাকে দেশের ছোট-খাট সমস্যা, মণির পর্য্যন্ত মনে হয় না যে ছোট-বড় কথার খাপছাড়া সমন্বয় হচ্ছে। ধান ভানতে শিবের গীত নয়, শিবের গীত গাইতে ধান ভানাও নয়। বিশ্বের মানে মাটির পৃথিবীর মানে, ঢেঁকিতে ধান ভানার মানে, কলে ধান ভানার মানে, বাঁচার মানে, মরার মানে এরা একসূত্রে গেঁথেছে। ফলের মালা বা শিকল নয়, যা পৃথক্ তবু এক। মাটি বা মন নয়, যা পৃথক্, তবু এক। চলা বা থামা নয়, গতি বা সমাধি নয়, যা পৃথক্, তবু এক। শুধু সংঘাত আর গতি। পৃথকের সংঘাত—মলিনের সংঘাত আর বিচ্ছেদের সংঘাত— জগৎ আর জীবনের মানে।

মনসুর বলে, কি প্রত্যাশা চারি দিকে, কি উত্তেজনা! অথচ সবাই ভাবছে, কিছু হবে কি সত্যি শেষ পর্য্যন্ত? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

গোকুল বলে, কেন? এ তো অদ্ভুত কিছু নয়। হতাশার আতঙ্কে প্রত্যাশা ফেঁপেছে—বড় বড় কথা শুনে কতবার হতাশ হতে হয়েছে। আবার সব ফস্কে যাবে, ফাঁকিতে দাঁড়াবে? তার চেয়ে আশা করা যাক, এবার নির্ঘাৎ কিছু মিলবে। মানুষ চিরদিন আশাবাদী, চিরদিন লড়ায়ে। উপরওলারা ভরসা দিচ্ছে অনেক কিছুর, বিশেষ কিছু পাবে না জেনেও প্রত্যাশা, উত্তেজনা ফাঁপিয়ে তুলছে সাধারণ লোক। তারা কি অন্ধ না কুকুর উপর তলার উপরওয়ালাদের? আশা তাদের ভেস্তে যাবে না, উপরওয়ালাদের সাধ্য কি যে তাদের আশা নষ্ট করে। কিছু তারা আদায় করবেই। খুব কম করেও অন্ততঃ এবার

আশা ভঙ্গ হলেও আশা জোড়া লাগাবার লড়াইয়ের পথটা। মানুষ বলে বটে যে দেখা যাক কি হয়, কিন্তু আসলে সে বলে যে দেখা যাক, এভাবে আশা মেটে কি না, না মিটলে অন্য ভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ কি বিপ্লব চায় মানুষ, না চাইতে পারে ? বিপ্লবের মানেই হল, এই যে, চলতি সব রকম উপায়ে চাওয়াটা না পাওয়া গেলে বিপ্লবের মধ্যে যত কিছু কথা আছে সব উল্টে-পাল্টে ভেঙ্গে-চুরে ছারখার করে দিয়ে আদায় করা। না মিটে না মিটে, ভাঁওতা সয়ে সয়ে, আশাবাদীর লড়াই তখন চরমে উঠে গেছে।

মনসুর বলে, ঠিক কথা। দেশে-দেশে মজুরের আশা তাই চড়-চড় করে চড়ছে। আজ সে কম খাটুনি, বেশী মজুরি চাইবে কি না ভাবছে, কাল সে দাবী করছে জগৎটা।

দুই কবির কথা শুনে মণি বলে, হতাশার কথাটা বুঝলাম না যে ! হতাশায় মানুস ভেঙ্গে পড়ে, আশার জোর বাড়ে কি করে ?

—এ সে আশা নয়, হতাশা নয়।

—আশা-হতাশা রকম রকম হয় না কি ?

মনসুর বলে, হয় না ? বিপ্লবীর আশা আর ছুঁচোর আশা কি এক ?

মণি চেয়ে থাকে।

গোকুল বলে, আশা-নিরাশাকে সব কিছু থেকে পৃথক্ করে দেখছ কিনা, তাই গোল বাধছে। তুমি ভাবছ, মনটাই বড় কর্ত্তা, মনটাই সব, আশা-নিরাশা মনের ধর্ম, কাজেই বাইরের জগৎ থেকে পৃথক্—শুধু আশাই মানুষকে চাঙ্গা করে, হতাশা ভেঙ্গে দেয়। তা যদি হত তাহলে মানুষকে আজও বন-মানুষ হয়ে থাকতে হত। কস্মিন্‌কালেও জগতে এমন একটা মানুষ জন্মেনি, যে শুধু আশাই করেছে, হতাশার ধার ধারেনি। শুধু আশা দিয়ে শুধু জয় দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে, শ্রেণীর লড়াই জয় করে এগোয়নি, ভুল-ভ্রান্তি পরাজয় হতাশা পর্য্যন্ত তার লড়াইকে জোরদার করেছে। মানুষ চিরদিন বিপ্লবী, বিপ্লবের ধর্মই এই। বিপ্লবী মানুষ ভুল করে, হেরে যায়, হতাশ হয় কিন্তু এসব তাকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে, কাবু করতে পারে না। আরও জোরে কোমর বেঁধে সে এগোবার লড়াইয়ের সঙ্গে ভুলভ্রান্তি দুর্ব্বলতা হতাশার বিরুদ্ধে আরও জোরদার লড়াই শুরু করে। হতাশা কাদের কাবু করে জানো ? মানুষের এগোনো ঠেকিয়ে যারা জীবনকে ভোগ করার আশা করে। হতাশা এদের পক্ষে মারাত্মক। সামান্য দাবী নিয়ে মজুর ধর্মঘটে জিতে গেলে এদের কি অবস্থা হয় জানো ? সামান্য একটু হার হয়েছে, তাতেই যেন পাগল হয়ে যায়, যেন সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

মণি খুশি হয়ে বলে, এবার একটু একটু বুঝতে পারছি গোকুল।

আগে সে গোকুলকে ঠাকুরপো বলত। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর গুলির ঘায়ে কুৎসিত বীভৎস মুখ মেয়েটাকে তার সামনেই দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে আপন করে নেওয়ার সুদৃঢ় ঘোষণা জারি করার পর থেকে সে গোকুলের নাম ধরে ডাকে। বিয়ে না হলেও গোকুল যেন তার জামাই হয়ে গেছে, এমনি একটা সস্নেহ আত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে তার কথার আচরণে। গোকুল বলে, শুধু একটা দেশে, সোভিয়েটে, এরা হেরে গেল। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে এরা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, এরাই রাজা, এরাই শাসক, এরাই মালিক। কিন্তু একটা দেশে হার মানার পর থেকে দিন-দিন হতাশা আতঙ্কে এদের কি অবস্থা করেছে দেখছ তো ? নইলে হিটলারের মত উন্মাদ সর্ব্বনাশা ফ্যাসিবাদ নিয়ে সারা জগতে এমন বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালু করতে পারে ? এই যে যুদ্ধ হয়ে গেল, এটা মানুষের চরম আশা আর চরম হতাশার যুদ্ধ।

মনসুর নিজের উরুতে থাপড় মেরে সোৎসাহে বলে, ঠিক বাত—ঠিক বাত। চরম যুদ্ধ, শেষ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ আর হবে না, আমরা হতে দেব না। আমরা জিতে গেছি ! মনসুর কাসতে আরম্ভ করে। সকলকে হাত নেড়ে বারণ করে দেয় যে তার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, কিছু করতে হবে না। এক ঝলক রক্ত উঠে তার মুখে-চাপা রুমালটার খানিকটা রাঙা করে দেয়। মুখ মুছবার ফাঁকে ফাঁকে মনসুর ঠোঁটে হাসি ফোটায়। সকলে চেয়ে থাকে। রশৌনা চেয়ে থাকে।

সামলে উঠে মনসুর প্রথমে কথা কয়, আমরা জিতেছি, শেষ লড়াই। এখানে, ওখানে টুকিটাকি লড়ায়ে হেরে যেতে পারি, কিন্তু আমরা জিতেই গিয়েছি।

মণি বলে, এবার বুঝেছি, গোকুল।

এমনি করে বোঝে মণি। বুঝতে বুঝতে ভাবে, আহা, মনসুর এই যে রক্ত তুলছে, রশৌনার সীঁথেয় সিঁদুর নেই কিন্তু যে রক্ত তোলা দেখে রক্ত সরে গিয়ে সাদাটে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে তার মুখ, এ রোগের তো চিকিৎসা আছে। মনসুরকে বাঁচানো যায়, চিকিৎসা আছে, ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে চিকিৎসা সে ব্যবস্থা লাট-প্রাসাদে আটক বলে মনসুরকে মরতেই হবে। মানুষ আবিষ্কার করেছে মানুষকে রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার অস্ত্র, সে সবগুলিও বিশিষ্ট মানুষের বেদখলে। ধনীর কাছে নিজেকে বিক্রী না করলে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে নিজের প্রাণ বাঁচাতেও কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সত্যই উন্মাদ শোষকেরা, আতঙ্ক-বিকারে সত্যই তারা ভুলে গেছে যে বীজ পুঁতলেই গাছ হয় না, নর-নারীর সঙ্গমেই জন্মায় না নতুন মানুষ।

মণি ব্যাকুলভাবে আবার বলে, এবার বুঝেছি গোকুল। সত্যি, এবার আমি বুঝেছি মনসুর। একটু থেমে বলে, তোমরা আমায় বাঁচালে। কি করে বাঁচি, কি করে বাঁচি, ভেবে খুনেটার সঙ্গে রফা করেছিলাম দু'চার বছর বাঁচতে দাও। ভেবেছিলাম খুনেটাই আমার জীবন-মরণের হর্তা কর্তা-বিধাতা। তোমরা আমায় বাঁচালে।

ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস। একটি স্বামি-পুত্রসম্বলিতা মাঝ-বয়সী নারী। কিন্তু কি ভয়ঙ্করতা এসেছে এই উচ্ছ্বাসে। হৃদয় দিয়ে মণি যেন পরাজিত হিটলারের চেয়ে বড় শত্রুকে পরাজিত করতে জীবনপণ করেছে।

সকলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার দিকে চেয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে অভিভূত হয় নীলিমা আর সরস্বতী। মণির সম্পর্কে গোড়ায় সত্যই খানিকটা বিতৃষ্ণা এসেছিল অনেকের, তার কথা-বার্তা চাল-চলনে পদে পদে প্রকাশ পেত সাধারণ আবদারে মধ্যবিত্ত রমণীর সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতা। শুধু তার তেজ আর জিদ এবং প্রথম থেকেই এ বাড়ির নতুন ধরণের মানুষ আর আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ঝোঁকটা সকলের কাছে ঘৃণা হয়ে দাঁড়ানোর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল। ঝোঁকটা তার দিন দিন জোরালো হয়েছে এ বাড়ীর মানুষ, তাদের জীবন আর আদর্শ জানবার বুঝবার প্রচণ্ড আগ্রহে অনেককে মাঝে মাঝে রীতিমত বিরক্ত ও বিব্রত করতেও সে ছাড়েনি। কিন্তু এই জন্যই কেউ তাকে তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করতে পারেনি, তার দ্রুত পরিবর্তন সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

এত তাড়াতাড়ি সে যে জীবনের আসল সার্থকতা সম্পর্কে এতকাল পোষণ করা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গী শুধু এত দূর বদলে নেওয়া নয় কাজেও নূতন ভাবে বাঁচার লড়াই এমন ভাবে সুরু করতে পারেনি। অভাবের তাড়না নেই, স্বামি-পুত্র নিয়ে তথাকথিত সুখের সংসার, জীবনের মূল নিয়ম-নীতি, সংসারের বড় ব্যাপারে স্বামীর মত মাথা পেতে মেনে নেওয়ার সংসারে তারই কর্তৃত্ব, মান অভিমান চোখের জলে স্বামীকে কাবু করার পূর্ণ অধিকার। আদর্শের জন্য সে যে এ ভাবে বিদ্রোহ করবে শুধু সুখের সংসারের মায়া নয়—স্বামীর নতুন চোরাবাজারী চেষ্টায় বাড়ী-ঘর গহনা-গাঁটি মোটর চড়ার চিরদিনের স্বপ্নটি সফল হবার সম্ভাবনাকে এমন তীব্র ভাবে ঘৃণা করবে, এটা ভাবা সত্যই কঠিন ছিল।

এই তো সেদিন চোরাবাজারী বন্ধুর কাছ থেকে সুশীল চাল যোগাড় করে এনেছিল, যে চাল নিতে না চাওয়ায় সকলের উপর চটে গিয়েছিল মণি, বলেছিল এটা তাদের বাড়াবাড়ি। আজ সে খোলাখুলি সকলের কাছে তীব্র আবেগের সঙ্গে সুশীলকে বলছে খুনে, খুনেটার সঙ্গে এতটুকু আপোষ না করার মনের জোর এনে দেওয়ার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করতেও তার এতটুকু দ্বিধা নেই।

সকলে টের পায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেও এটা মণির উচ্ছ্বাস নয়। সে মরে গেলেও তার কথার নড়চড় হবে না।

সরস্বতী একটু তফাতে বসেছিল, মেঝেতে দু'হাতের ভর দিয়ে নিজেকে তুলে সে মণির পাশে এসে গা ঘেঁসে বসে। তার ভরা মাস, আজ রাতেই তার ব্যথা উঠলে কেউ আশ্চর্য্য হবে না। এত দেরী হচ্ছে কেন ভেবেই বরং সকলে আজকাল বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। দশ মাস দশ দিনের সীমা পেরিয়ে এগার মাসের দিকে এগোতে থাকলে চিন্তার কারণ ঘটে। এ অবস্থাতেও সরস্বতীর কিন্তু এ সব আলোচনা বৈঠকে হাজির না থাকলে চলে না। তার প্রাণ আই ঢাই করে।

সরস্বতী বলে, আমিও ভাবছি মণিদি, পাপীটার সঙ্গে আর রফা করব না। দেখুন তো, আপনারা খুসী মত মিটিং-এ যাবেন, জেলে যাবেন, আমি ঘরে বন্দী হয়ে থাকব।

মণি হেসে ফেলে। পা ছড়িয়ে বসে দু'হাতে জড়িয়ে সরস্বতীকে বুকে ঠেস দিয়ে বসায়। বলে, ভাল করে আরাম করে বোসো। সে বেচারাও তো বন্দী হয়ে আছে জেলখানায়।

প্রথম আক্রমণের সূত্রপাত থেকে বড় তাড়াতাড়ি টি বি কীট মনসুরকে কাবু করেছে। চিদানন্দের শরীরটা শক্ত ছিল বলেই বোধ হয় প্রথম আক্রমণের পর একটু ঝিমিয়ে গিয়েছিল কীটগুলি। বড়ই সে তখন জ্বালাতন করেছিল সরস্বতীকে। পোয়াতি বৌটার জন্য দিবা রাত্রি কী তার অস্থির অসহিষ্ণু কামনা। পেটে মানুষ জন্মাবার ভয় তো আর নেই, একবার মানুষ যখন জন্মে গেছে দেহযন্ত্রে, মানুষটা ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্য্যন্ত মানুষ উৎপাদনের একক ছোট কারখানাটির লক-আপ, মালিকের নয়, একাকিনী মজুরণীর।

এক দিন এমন ঝগড়াই করল সরস্বতী। মানুষ হিসাবে চিদানন্দের দাম সে প্রায় নামিয়ে দিল পশুর কাছাকাছি, তার পর চিদানন্দ দু'দিন চিন্তিত, মনমরা হয়ে ছিল।

এক শনিবারের দুপুরে সরস্বতী পেটের ভারে আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মেশান বিশ্রামে ঝিমোচ্ছে, চিদানন্দ এসে চুমুর পর চুমু খেয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে তাকে পূর্ণমাত্রায় সচেতন করে দিল। সানন্দে কৈফিয়ৎ দিল, আমি জেলে যাচ্ছি। আর তোমাকে জ্বালাতন করব না। আজকেই শেষ।

—শেষ মানে ?

—বিকেলের মিটিং থেকে জেলে যাচ্ছি।

—যাচ্ছ মানে ? ইচ্ছা করে ? তুমি একা ?

—একা কি না জানি না। তবে আমি ইচ্ছা করেই যাব। একটু শুদ্ধ আর শক্ত হয়ে আসি।

—তার মানে খাপছাড়া অন্যায় কিছু করবে মিটিং-এ?

চিদানন্দ হাসে। একটা যে কথা বলে বহু দিন পর্য্যন্ত সরস্বতীর কানে আর মনে ঝন্-ঝন্ করে বেজেছে।

—এ দেশে জেলে যেতে হলে অন্যায় করতে হয়? দেশকে দেশের মানুষকে ভালবাসার মত সব চেয়ে ভাল কাজটা করলেই এ দেশে বিনা বিচারে জেলে আটকের ব্যবস্থা। ইংরেজ স্বাধীনতা দিচ্ছে তবু ইংরেজ রাজকে গরম গরম গাল দেব মিটিং-এ। পুলিশ লাঠি মারতে আসবে। আমিও অহিংস থাকব না ঠিক করেছি।

তাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে চিদানন্দ শুদ্ধ ও শক্ত হতে জেলে চলেছে বলে সরস্বতী কাতরায় না যে তার কি উপায় হবে। তাকে জ্বালাতন না করার প্রয়োজনে চিদানন্দের জেলে যাবার সখটা তার ভাল লাগে না।

চিদানন্দ বলে, না, শুধু সে জন্য নয়। রোগটার জন্যও নয়। সব দিক দিয়ে কেমন যেন নরম হয়ে গেছি। এটা শুধরে আসা দরকার।

—কাজের মধ্যে শুধরাও? জেলের চেয়ে যে হাজার গুণ ভাল চিকিৎসা। কাজ করে জেলে যাও, সেটাও কাজে লাগবে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়—

কিন্তু চিদানন্দ কোন কথা মানেনি। তার পক্ষে ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। শক্ত সে ছিল, দেহে-মনে ধনী মালিক সম্রাট দমন-নীতির বিরুদ্ধে জমজমাট ঘৃণার মত শক্ত। তবুও মনে হত, ঘৃণা বুঝি তার জমে লোহার মত কঠিন হয়ে গেছে, কোন দিন গলবে না। জীবনের শ্রেণী সংঘর্ষের তাপ যে লোহা গলানো হাপরের আগুনের তাপকে ছাড়িয়ে গেছে, এটা তার জানা ছিল না। কতগুলি টি বি কীট বুক আক্রমণ করে তাকে গলিয়ে দিয়েছে। যেমন দিয়েছিল মনসুরকেও।

মণির কাছে এক দিন এ গল্প করেছিল সরস্বতী। মণির কড়া শাসনের আত্মীয়তার পর। গায়ে জ্বর আর পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য মণি ধমক দিয়ে কিছু বাকি রাখেনি, গালে চড় মারার মত ঝাঁঝালো সুরে বলেছিল, পেটের দায় বইতে না পার ধৈর্য্য ধরে আগেই কেন খসিয়ে দাওনি? আজ বেশী মাসে বুঝি খেয়াল হয়েছে এ দায় বইতে পারবে না? লজ্জা করে না? বেচারা ইংরেজকে গাল দিয়ে জেলে গেছে সেই ফাঁকে দায় খসাতে নিজে মরার ফন্দি এঁটেছ?

তবে শুধুই গাল দেয়নি মণি। সরস্বতীকে বিছানায় শুইয়ে মেয়েমানুষের এই একচেটিয়া দায়, আনন্দ ও গৌরবের জয়গানও করেছিল। বাহাদুর পুরুষ মানুষ কত কিছুই না সৃষ্টি করে, মানুষ সৃষ্টি করতে মেয়ে মানুষের পায়ের তলে ধর্ণা দেয়।

তারপর সরস্বতী তাকে জানিয়েছিল চিদানন্দের জেল-বরণের বিবরণ—বিমান ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত।

শুনে মণি সেদিন বলেছিল, দোষ কিন্তু তোমার। মেয়েমানুষের এই এক দোষ, বুড়ো মাগীও বোকা হাবা কচি শিশুটি সেজে সব দায় স্বামীর ঘাড়ে চাপায়। আজকের দিনে কত সোজা উপায় আছে ঝঞ্ঝাট ঠেকাবার' তুমি জোর করে বললে সে বেচারা কি না করত? পেট হবে তোমার, সেটা ঠেকাবার দায় আরেক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে তুমি আহ্লাদী পুতুল হয়ে থাকবে। আমি তো দশ বছর ঠেকিয়েছি নিজে একটু শক্ত হয়ে, কারুকে কাঁদাতে দিইনি। তাই বলে ক্ষিদে পেলে কি খেতে দিইনি মানুষটাকে, না নিজের ক্ষিদে চেপে উপোস করেছি?

কথাটা মনে লেগেছিল সরস্বতীর। এদিকটা সে তো সত্যি খেয়াল করেনি একেবারে। কত দিক দিয়ে স্বামীর যে পোষা পুতুল নয় বলে, বিদ্রোহ করে আদায় করার বদলে তার ভালবাসায় মমতার সঙ্গে এই সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বলে কত তার গর্ব্ব ছিল। অথচ এদিকে নিজেই সে পোষা পুতুল হয়ে থেকেছে, দশটি সাধারণ খেলার পুতুল বৌয়ের মতই আহ্লাদী সেজে থেকেছে।

এই কথাটাই মনের মধ্যে তার তোলপাড় করেছে কয়েক দিন। কিন্তু তবু সচ্চিদানন্দের জেলে যাওয়ার সমর্থন মনের মধ্যে দাঁড় করাতে পারেনি—তার এই অবাঞ্ছিত অকর্মণ্য অবস্থার জন্য শুধু সচ্চিদানন্দের বদলে নিজেকেও সমান ভাবে দায়ী ভেবেও। তাই সে মণির কথার জবাবে বলে, ভাবি তো নিজের খামখেয়ালের বন্দী। এত লোক জেলে যাচ্ছে কাজ করে, উনি জেলে গেলেন নিজের জন্য, নিজেকে শক্ত করার জন্য।

মণি বলে, বেশ তো, অন্য সকলের তুলনায় ওর জেলে যাওয়াটা ছোট করেই দ্যাখো। নিজেকে সংশোধন করতেই যদি জেলে গিয়ে থাকে, সেটা তো একেবারে তুচ্ছ নয়।

—এমনি যে পারে না, যার এতটুকু মনের জোর নেই, শুধু জেলে গিয়ে সে কখনো মনের জোর বাড়াতে পারে? এ তো আরও বড় দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

—সকলের পক্ষে নয়। এমন অবস্থাও তো মানুষের কখনো কখনো হয়, যখন এরকম কিছু না করলে কিছুতেই নিজেকে আয়ত্তে আনতে পারে না।

কোন কোন মানুষের হয়তো এ রকম অবস্থা হয়। কিন্তু সরস্বতী এমন অনেক মানুষকে জানে কোন অবস্থাই যাদের কাবু করতে পারে না, নিজের দুর্ব্বলতা সংশোধনের জন্য এ রকম স্পেশাল চিকিৎসা দরকার হয় না। এ ধরনের দুর্ব্বলতাই তাদের নেই, মানুষ তারা অন্য শ্রেণীর। মনটা খাপছাপ হয়ে যায় সরস্বতীর। তার শ্রদ্ধেয় অনেক মানুষের সঙ্গে

সচ্চিদানন্দের যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা তাকে পীড়ন করে। সচ্চিদানন্দও শক্ত ছিল, কিন্তু তার গোড়ায় ছিল ভাব-বিলাস। চাঁদ দেখে কান্না পাওয়া মেয়েলি ভাব-বিলাস নয়, নতুন ধরণের বিদ্রোহী ভাব বিলাস। প্রণব গোকুল গিরীন মনসুরদের সঙ্গে এইখানে তফাৎ সচ্চিদানন্দের।

প্রবোধ দিয়ে সরস্বতীর মনটা ভাল করতেই মণি চেয়েছে কিন্তু ফলটা হয় বিপরীত আরও বিগড়ে যায় সরস্বতীর মন। সেদিন রাত জেগে সচ্চিদানন্দকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখে সে একটু স্বস্তি বোধ করে। চিঠির জবাবে সচ্চিদানন্দ যদি অন্ততঃ স্বীকার করে যে, সে বুঝতে পেরেছে তার আসল গলদটা কোথায়।

এত বড় সহর, সহরে এত বড় বড় রাস্তা। ট্রাম-বাস চলাচলের সদর রাস্তাগুলিতে একবার পাক দিয়ে এলে মনে হবে যেন সহরটা প্রধানতঃ চৌরঙ্গী সংস্করণের, খানিক মোটামুটি চলনসই নকল, বাকীটা অনুকরণের কাঙাল পণা। আসলে এটা ফাঁকি। সহরের শতকরা নব্বই ভাগ আনাচ কানাচ অলি গলি ইটের খোপ আর খোলা ও টিনের ঘরের বস্তি। দেখলে ভড়কে যেতে হয়। কত লক্ষ ইটের খোপ আর টিনের কুটির সহরের কয়েকটা রাজপ্রাসাদ আর নকল প্রাসাদকে খাড়া রেখেছে।

আশার ভাঙ্গা চোরা সেলাই করা মুখ, তারা হীন দৃষ্টিহীন একটি মাত্র রক্তবর্ণ চোখ আর অন্য অবশিষ্ট চোখে তার মানুষ ও জগতকে দেখবার অনভ্যস্ত চেষ্টা—দেখেও সুশীল মণিকে কিছু বলেনি। তার জন্যই আমার আজ এই শোচনীয় অবস্থা, এই সামান্য অনুযোগটি পর্য্যন্ত নয়।

ভিতরে ভিতরে সে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল মেয়ের মুখ দেখে, হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে মণিকে পাগলের মত আঘাত করতে দাড়ি কামানো ক্ষুরটা দিয়ে মণির মুখটাও ক্ষত বিক্ষত করে দিতে তার অদম্য সাধ জেগেছিল। বলতেই হবে যে, সুশীলের সংযম শক্তি অসাধারণ, মণিকে সে একটি কড়া কথাও বলেনি।

এখন নয়। মণিকে আগে নিয়ে যেতে হবে তার বাড়ীতে তার আয়ত্বের মধ্যে। তার পর দেখা যাবে, এতখানি তেজ যে মেয়ে মানবের তার কতখানি শাস্তি সহ্য হয়। এখন নয়, এ বাড়ীতে নয়, দু'টো দিন তাকে ধৈর্য্য ধরতেই হবে।

মেয়ের মুখ দ্যাখে আর রাগে আপশোষে রক্তে যেন তার আগুন ধরে যায়। সব দিক দিয়ে এমন ভাবে মণি তার সঙ্গে শত্রুতা করবে। সমাজে আর বার করা যাবে না এ মেয়েকে, একে নিয়ে তরুণ দলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণের আশা তার চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল। নিজের মেয়ের মুখ দেখে তার নিজেরই এখন পালাতে ইচ্ছা হয়। মণি এ জন্য দায়ী মণি।

এ বাড়ীর ডাকাতগুলোও দায়ী বটে, কিন্তু মণি সায় না দিলে তো তারা আশার এ দশা করবার সুযোগ পেত না।

মণিকে দায়ী করে মণির বিরুদ্ধেই ক্রোধের আগুন জ্বলতে থাকে সুশীলের মনে। পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে নিজেরা সরে পড়তে ব্যাকুল মহান বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস লীগ দু'জনেরি মন রাখা মান-রাখা নিঃস্বার্থ উদার বৃটিশ সরকার কেন তার শ্যামশ্রী সুন্দর মেয়েটার মুখে গুলী চালাতে গেল, কোন্ অধিকারে, সে প্রশ্নও জাগে না সুশীলের মনে।

মেয়েকে সে বড়ই ভালবাসত কি না, মেয়ের কোমল মুখ আর সুঠাম তনুলতা সস্নেহে সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কল্পনা করত কি না, তাই আজ মেয়েকে দেখলে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় তার নাড়ীতে পাক দেয় বমি আসে।

মণি মাত্র দু'দিন সময় নিয়েছিল, আশার জন্য আরও কতগুলি দিন কেটে গেছে। আশা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পর কয়েকটা দিন সুশীল ধৈর্য্য ধরে থাকে – উদারতা দেখাবার জন্য নয় মনে মনে মণিকে সে ভয় করে বলে। দায়ী হোক আর যাই হোক, আশার জীবনে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার আঘাতে মন-মেজাজ কি অবস্থায় কোথায় চড়ে আছে কে জানে। ধাতস্থ হতে একটু সময় দেওয়া দরকার। নইলে তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা থাকলেও হয়তো শুধু তাগিদ দেওয়ার জন্যই ফোঁস করে উঠে বিগড়ে বসবে।

এ রকম একটা ঘটনা মণির মন মেজাজকে যে বিগড়ে দিয়েছে এটুকু বুঝতে ভুল হয়নি সুশীলের। শুধু কেমন ভাবে বিগড়ে দিয়েছে, পরিবর্তনের কোন স্থায়ী স্তরে তুলে দিয়েছে, সেটা অনুমান করবার সাধ্য সুশীলের ছিল না। আর শুধু মেয়ের মুখখানা বিগড়ে যাওয়াই যে মণির মন-মেজাজ বিগড়ে যাবার কারণ নয়, সে রকম ভাবে বিগড়ে যাবার মত মন-মেজাজ নিয়ে নিজেই সে ছেলেমেয়েকে বিপজ্জনক সভায় যেতে দিতে পারত না, এটা বোঝাও অসাধ্য সুশীলের পক্ষে। তার কাছে মানুষ মানেই স্বার্থ, নিজের স্বার্থ ছাড়া দশের স্বার্থ বড় হতে পারে মানুষের কাছে, এর কোন মানেই নেই তার কাছে। আগে থেকে মন-মেজাজ কি ভাবে কতখানি বদলে যাওয়ার ফলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সভায় পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর সম্ভাবনার মধ্যে ছেলে মেয়েকে যেতে দেওয়া, নিজে সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল মণির পক্ষে, মাথা-কপাল কুটে মরে গেলেও কি সুশীলের পক্ষে তার হদিস মিলতে পারে।

কোন রকমে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে সে গম্ভীর কিন্তু শান্ত ভাবেই মণিকে বলে, কাল তাহলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর ? সকালে গেলে সুবিধা হবে না দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যাবে ?

—আমি যাব না।

—যাবে না মানে ?

—আমার ইচ্ছা নেই। তুমি যে ভয় দেখিয়েছিলে তাই কর। যা-কিছু আছে সব নিয়ে চলে যাও। সুধী আশা ওরাও যাবে না বলেছে।

সুশীল উন্মাদের মতই অট্টহাস্য করে, মুখ থেকে মোটা চুরুটটা ছিটকে পড়ে যায়। সিগারেটের বদলে আজকাল সে চুরুট খাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে সে চুরুটটা কুড়িয়ে নেয়—অতিরিক্ত রাগে কালাম্বরী—ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার মতই কাঁপুনি লাগে মানুষের।

—বাঃ বাঃ ! খাসা নাটক সুরু করেছে। যাবে না বললেই হল ! ঘাড় ধরে নিয়ে যাব, জুতো মেরে নিয়ে যাব।

মণিও হাসে। কি অপরূপ যে হয় তার সেই অবজ্ঞার হাসি ! মনে হয়, এত বয়সেও মণি যে সত্যই রূপসী সেটা তো মিথ্যা নয় ! আগে মণি ঘন-ঘন পান খেত, পানের সঙ্গে দোক্তা এবং জরদা। আজকাল কমিয়ে দিয়েছে, যখন-তখন খাবার ঝোঁকটা সামলেছে, নিয়ম করে যে কিছু খেলে পান খাবে, এমনি খাবে না। নিয়মটা যাতে মানতে পারে, সে জন্য খাওয়ার রকমটাও সে ধরেছে নিয়মের মধ্যে। সকালে এক কাপ চা-টোষ্ট বা দু'মুঠো মুড়ি খাওয়ার সঙ্গে তো তুলনা হয় না দুপুরের ভাত খাওয়ার—সকালের চা-এর পর দু'-তিন বার চা চলে, টুকিটাকি এটা-ওটা চলে, তার সঙ্গে নিয়ম রেখেই পান চলে। দুপুরের খাওয়ার পর বিকালের চায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ফাঁক। তাই দুপুরের খাওয়ার মর্য্যাদা অনুসারে তিনটি পানের ব্যবস্থা সে নিজের জন্য মঞ্জুর করেছে।

মণি হেসে বলে, পুলিশ আর সৈন্য এনে চেষ্টা করে দ্যাখো না কি হয় ? নিজে কেন ঘাড়-ধরা জুতো-মারার কষ্ট করবে ? আমরা তোমার সঙ্গে যাব না, এর আর নড়চড় নেই।

—তুমি নিজেই বলেছিলে যাবে। দু'দিন সময় চেয়ে নিলে। এখন আবার গোলমাল করছ কেন ?

—তোমার সঙ্গে যাবার মানে কি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি শুধু তোমাকেই দেখছিলাম, হিসেব করছিলাম তোমার-আমার সম্পর্ক। ভাবছিলাম কোন রকমে হয়তো চালিয়ে নেওয়া যাবে। ঘরে ঘরে করছে, আমিও নয় তোমার দাসীগিরি করব পেটের দায়ে। কিন্তু আমার চোখ খুলে গেছে। আমি বুঝেছি, তোমার সঙ্গে যাওয়া মানে সাম্রাজ্যবাদের কাছে হার মানা—শুধু তোমার কাছে নয়। যারা আমার মেয়েকে জখম করেছে, আমার আপন-জনদের খুন করেছে—

—তারা তো ভাগছে। আর ক'টা দিন।

—ভাগছে ! তাই তোমার মেয়েকে জখম করে গেল ? একটা রাজত্ব ফেলে যারা ভাগে তারা বুঝি একটা মিটিং নিয়ে মাথা ঘামায় ? রাজত্ব ছেড়ে দিলেও রাজদ্রোহ সইতে পারে না ? মারের চোটে যে প্রাণ নিয়ে ভাগে পিছু ফিরে দ্যাখে না কে দু'টো গাল দিচ্ছে।

—যাক গে, যাক গে, ও-সব বড় কথা নিয়ে—

—বড় কথা, তবু যাক গে ? শুধু ছোট কথা নিয়ে জীবন কাটাব ? আমি তা পারব না। ধনে-প্রাণে যে মারে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে পারব না আমার একটু আরামের ব্যবস্থা করে দাও ! তুমি চাইতে যাও, বাড়ী কর, মোটর কেন, সুন্দরী দেখে আবার বিয়ে কর—আমি পারব না। অমন সুখের মুখে ছাই দিয়ে যেন আমার মরণ হয়।

মণির কৃশ বিবর্ণ ফর্সা মুখখানা রক্তাভ দেখায়, তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে যোগ দেয়, বড় কথা ভাল না লাগে একটা ছোট কথা মনে রেখো। তোমার মেয়ের এ অবস্থার জন্য তুমিও দায়ী—তোমার প্রভুরা এটা করেছে।

মণি নয়, আশার ভাঙ্গা-চোরা মুখের জন্য সে দায়ী ! সে মণিকে একাই দায়ী ভেবেছে, মণি তাকে একা দায়ী করেনি, তবু তারও দায়িত্ব আছে ! ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ে সুশীলের। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে আরক্ত চোখে তাকায়, মুষ্টিবদ্ধ হাত থর-থর করে কাঁপে।

কিন্তু আর সহ্য হয় না। আর সংযম থাকে না। হঠাৎ গলা ফাটানো উন্মত্ত চীৎকারে সমস্ত বাড়ীর মানুষকে সচকিত করে দেয় : হারামজাদি ! বজ্জাতির ঝোঁকে মেয়ের দফা সেরেছিস্, আবার লম্বা লম্বা কথা।

শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা সংস্কৃতির বেশ মোটা আবরণই ছিল লোকটার, তাতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েও মণি যদি একটু নরম হত, আপোষের অন্ততঃ চরম সম্মানজনক পর্য্যায়ের আপোষে রাজী হত, এ ভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত না আবরণটা, পশুটা বেরিয়ে পড়ত না উলঙ্গ হয়ে।

এদিকে তার উন্মত্ত চীৎকার আর ভাষা শুনে বাড়ীর সকলে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল, গোকুল তাদের ঠেকিয়ে রাখে।

সরস্বতী ব্যাকুল হয়ে বলে যদি খুন করে ফেলে ?

গোকুল বলে, পাগল না কি ? এ সব লোক কখনো এ ভাবে খুন করে ? হাঙ্গামার ভয় নেই ? খুন করতে হলে আঁট-ঘাঁট বেঁধে চুপি চুপি খুন করবে। মণি বৌদির গায়ে হাত তুলতে সাহস পারে ওই ছাগলটা ! দেখো, শেষ পর্যন্ত শুধু হম্বি-তম্বি সার হবে। পরে প্যাঁচ কষবে অনেক রকম, বজ্জাতি করবে—

গোকুল আচমকা থেমে যায়। মাথা হেঁট করে। কারণ, দু'হাতে মুখ ঢেকে অদূরে দাঁড়িয়ে আশা কেঁদে ফেলেছে। সুধীন ফুঁসছে। লজ্জায় গোকুলেরও কেঁদে ফেলতে সাধ হয়। বেশী রকম বস্তুবাদী কি না, তাই এ ভাবে বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে ওঠে বস্তুবাদী হবার ঝোঁক।

এদিকে মণি ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

—যেও না।

মণি যায় না, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে বলে, হুকুম ঝেড়ো না।

মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সুশীল তাকে মারতে আসে। সীতাকে যখন খড়্গ দিয়ে কাটতে গিয়েছিল রাবণ সার্ট পায়জামা পরা সুশীলের মূর্তি বটতলার ছবির সেই রাবণের মত নয়, কিন্তু তার মুখ চোখের ভাব আর অঙ্গভঙ্গি অবিকল সেই রকম। রাবণ সীতাকে পেতে চেয়ে পায়নি, সুশীল মণিকে এত কাল ভোগ করে এসে পেতে চেয়ে পাচ্ছে না।

মণি বলে, আমিও মারব কিন্তু। এক ঘা মারলে দশ ঘা ফিরিয়ে দেব।

বাইরে গোকুলের লজ্জা কেটে যায়। আশা মুখ থেকে হাত সরিয়ে আঁচলে চোখ মোছে। অন্য সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মণি তাদের মনুষ্যত্ববোধকে শোচনীয় লজ্জা ও অপমানের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মণিও মারবে, এক ঘা মারলে দশ ঘা ফিরিয়ে দেবে। মণিই এ ভাবে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে, সুশীল মানুষ নয় পশু—হিংস্র পশুকে মারতে তার দ্বিধাও নেই, লজ্জাও নেই।

একটি স্ত্রী—সে এদের কারো মা, কারো বৌদি কারো মাসী কারো পিসী—সে যদি স্বামীর হাতে মার খেয়ে চুপ করে থাকে, কাঁদে—এদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যেতে বাধ্য। শুধু এদের নয়—জগতে যে যেখানে আছে সকলের। পশুত্বের ভেজাল নিয়েই তবে মনুষ্যত্ব ? মানুষ তবে অবস্থা-বিশেষে পশুত্বের স্তরে নামতে পারে ? কারণ, ওই স্ত্রীটি ছাড়া জগতে কারো অধিকার সেই স্বামীটিকে অমানুষ বলে, পশু বলে। স্ত্রীটিকেও তাহলে পশু বলতে হয়। নইলে মানুষ কি কখনো পশুর কাছে মার খেয়ে হজম করে ? কিন্তু স্ত্রী যখন ঘোষণা করতে পারে, আমাকে যে জীবটা মারতে হাত তুলেছে সে মানুষ নয়, কুকুর কামড়াতে এলে যেমন তাকে লাঠি পেটা করি এ জীবটাকেও আমি তেমনি ভাবে সায়েস্তা করতে প্রস্তুত, তাতে আমার লজ্জা নেই, ক্ষোভ নেই, অগৌরব নেই— মনুষ্যত্ব তখন মুক্তি পায়। দেবত্ব আমার পশুত্ব, দুই অপবাদ থেকেই মুক্তি পায়।

নীরবে সয়ে, গোপনে কেঁদে উদার ভাবে ক্ষমা করে মণি দেবীত্ব পায় না, পশুত্বকে প্রশ্রয় দিতে অস্বীকার করে শুধু মানুষ থেকে যায়।

—হারামজাদি বজ্জাত !

সুশীল সত্যই গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না, ভড়কে পিছিয়ে গিয়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মতই গাল দেয় মণিকে অকথ্য ভাষায়।

মণি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীলিমা তাকে ধরে তার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে যায়। সেইখানে নীলিমার কাঁধে মাথা রেখে মণি কেঁদে ফেলে।

মণি কাঁদে কিন্তু সেটা দুঃখের কান্না নয়। চোখ দিয়ে তার ব্যথার অশ্রু বেরোয় না। রক্তপাত ছাড়া কোন কালে স্বাধীনতা জোটেনি মানুষের। মণি আজ তার সংকীর্ণ জীবনের ছোট স্বাধীনতার জন্য ভয়ানক লড়াই করেছে। এ লড়ায়ে খাঁটি রক্তপাত আনুষঙ্গিক নয়—কিন্তু ছোট বড় সব স্বাধীনতাই রক্ত জল করা চেষ্টায় পেতে হয়। মণির দেহের উষ্ণ রক্তই তপ্ত অশ্রু হয়ে ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে পড়েছে চোখ দিয়ে।

—স্বপ্ন দেখছি না তো ?

মণি একটু শান্ত হয়ে এসেছে টের পেয়ে নীলিমা নিজের আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দেবার পর মণি বলে—স্বপ্ন দেখা মানুষ যখন বাস্তব দ্যাখে, তখন তার এমনি মনে হয়। মণি মৃদু একটু হাসে। সত্যি, স্বপ্নেও কি কোন কালে ভাবতে পেরেছিলাম আমার জীবনে এমন ব্যাপার ঘটবে !

আশাই প্রথম ধীরে ধীরে ঘরে আসে। তার পিছনে আসে সুধীন। দু'জনের মুখ দেখে মণির বুকে যেন শেল বেঁধে। ছোট স্বাধীনতার ঘরোয়া লড়াই কিন্তু তারও ফ্যাকড়া কত। সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সুশীল শুধু তার স্বামীই নয় সে এদের বাবা।

এত কাল তারা দু'জনে মিলে-মিশেই এদের মা-বাপ ছিল। এরাও কোন কালে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল মা-বাপের মধ্যে এক জনকে তাদের বর্জন করতে হবে।

আশা বলে, মা ?
—কি বলছিস্ ?
—বাবা স্যুটকেশ গুছোচ্ছে।
সুধীন বলে, মা ?
—কি বলছিস্ ?
—বাবা যদি স্যুইসাইড করে বসে ?
মণি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, না, তা করবে না। তবু, আমি কি করতে পারি বলো ?
—জানিয়ে দাও না আমরা একেবারে ত্যাগ করিনি ? আমাদের পক্ষে এলে আমরা খুশীই হব।
—সেটা কি আর জানে না ? তবু, ইচ্ছা করলে তোমরাই জানিয়ে দেবে যাও।
—তুমি ?
—বলবে যে আমারও ওই কথা।

[আগামী বারে সমাপ্য]

স্বাধীনতার স্বাদ

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে লেখকের পরিবারবর্গের আনুকূল্যে প্রদত্ত 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি-প্রতিলিপি আছে। পৃষ্ঠাগুলি উক্ত উপন্যাসের এক বা একাধিক প্রাথমিক খসড়া হতে পারে। মোট ১১ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপির কোথাও ধারাবাহিকতা নেই, মুদ্রিত উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে ক্বচিৎ যোগ পাওয়া যায়, আবার ৯, ১১ পৃষ্ঠাঙ্ক একাধিক পৃষ্ঠায় দেখা যায়। পাণ্ডুলিপির এই বিচ্ছিন্ন উদাহরণ থেকে মুদ্রিত উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে সংযোগ উদ্ধার করা প্রায় দুরূহ। তথাপি সম্ভাব্য যোগসূত্রগুলি মুদ্রিত উপন্যাসের পৃষ্ঠাঙ্কের দ্বারা নির্দেশ করা গেছে। মনে হয়, লেখক স্বয়ং বহু অংশ বর্জন করেছেন। দুই একটি চরিত্র-নাম উপন্যাসে আদৌ নেই। প্রতিলিপিতে লেখক ব্যবহৃত বানান যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে।

(ক) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ৪

...পাবার বিচলিত হবার কারণ মণিমালার আছে। কলকাতায় দাঙ্গায় টেকা যায় না বলে কিছুদিন মামার কাছে গিয়ে থাকার ইচ্ছা জানিয়ে সেই তো এতকাল পরে চিঠি লিখেছিল। চিঠি পেয়েই প্রমথ এ ভাবে ছুটে আসবে সে অবশ্য তা ভাবতে পারে নি। ভাবতে পারে নি বলেই হয় তো তার এত কষ্ট। পুরাণো দিনের মত প্রমথের ভালবাসায় এই প্রমাণ পেয়ে।

ও মামা, তুমি, এমন দাগা দিলে তোমার মণির মনে ?

আস্তে আস্তে কোমলভাবেই সে কাঁদে, চেঁচামেচি তার কোনদিনই আসে না। একটানা আতঙ্কের চাপে তার মন চড়া সুরে বাঁধা নইলে হয় তো নিয়মমত কোন শোকাবহ কথা না বলেই গুম খেয়ে পড়ে থেকে নিজের মনে কাঁদত। প্রবোধ নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল। আজ তাকে থেকে যেতে হবে, অনেক হাঙ্গামা আছে এবং সে-ই একরকম হাঙ্গামা সাথে করে বয়ে এনে ঘরে তুলেছে বৈকি। কাল সকালে ছত্রিশ ঘণ্টার কারফিউ শেষ হবে। তার আগে কোন বিষয়েই কিছু করার উপায় নেই। মণির সঙ্গে তারও দেখা হল অনেকদিন পরে, চার পাঁচ বছর আগে সুরেন কাকার বাড়ী তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল, কথাবার্ত্তা একরকম কিছুই হয় নি। তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে আর সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে মণিকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই ছবিটাই এমন স্পষ্টভাবে মনে আছে। দেখে মনে হয়েছিল, একটি কিশোরী মেয়ে যেন বড় বড় ছেলেমেয়ে প্রৌঢ় স্বামীর প্রকাণ্ড সংসারের গিন্নী সেজে বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে। স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলি যেন শুধু তার গিন্নী সাজার অঙ্গ। বাড়িতে কি ভাবে সে যেন মানিয়ে যায় চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় বড় যে রোগা। এবারও তাই মনে হল। ক'বছরে ছেলেমেয়েরা আরও বেড়েছে, লম্বা চওড়া হয়েছে, বড় ছেলে সুধীন বি. এস সি পড়ছে, বড় মেয়ে আশা ষোলয় পা দিল। আশার চেয়ে আজ ছোটখাট মণিমালা, গড়ন আরও বেশী কিশোরী মেয়ের মত। মুখে ছাপ পড়েছে বয়সের, সে লাবণ্য আর নেই, ফর্সা হাতে নীল শিরা দেখা যায়।

হাসি প্রায় তেমনি আছে, পাতলা ঠোঁটের নয়, সমস্ত মুখখানার হাসি। শুধু তেমন আর তাজা নয়।

ওর মধ্যেই হাসে মণিমালা, দাঙ্গার আতঙ্ক, কারফিউ, প্রমথের মৃত্যুর দুর্ঘটনার মধ্যে। এ অভ্যাস বোধ হয় তার যাবার নয়। তবে তার সঙ্গে নানা কথা বলতে বলতেই কেবল তার কখনো সখনো হাসিটা ফুটছে, অসহনীয় অস্বাভাবিক অবস্থা পরক্ষণে মুছে নিচ্ছে হাসিটা।

মনে পড়ত না বুঝি ঠাকুরপো ? পড়ত ? কেন মিছে কথা বানিয়ে বলে নিজে লজ্জা পাও। মনে পড়লে আর খবর নিতে না, এই সহরে আছো।

ঠিকানা জানা ছিল কই ?

এ কথায় মণি হাসে। —ঠিকানায় ঠেকে ছিল ?

তা ঠিক। এই সহরেরই অন্ততঃ দশটা আত্মীয়স্বজন আছে, গত ক'বছরে এরকম কত জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, যাদের কাছে অনায়াসেই মণিমালার ঠিকানা জানা যেত। আসল কথাটা মুখ ফুটে বলা যায় না যে মনে পড়া এক জিনিস খবর নেওয়া আরেক, মনে পড়লেই খবর নিতে হবে কেন ? প্রবোধ তাই অস্বস্তি বোধ করে। সংসারে সকলকে মনের

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৬৪

(খ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ৮

রূপ নগদ টাকা গয়না গাঁটি দানসামগ্রী আদায় করার বদলে নিজে মনুষ্যত্ব পণ দিয়ে বেচে তার জামাই হতে চেয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে, এবাড়িতে আমার আগে ওকে হয় তো সে মানুষ বলেই গণ্য করত না।

[এই অংশে ইংরেজিতে Double Space কথাটি লিখিত]

এ পাড়ায় সব চেয়ে ঝিমিয়ে গেছে রতন সান্যাল আর এ বাড়ীতে প্রণবের পিসতুতো বোন উষা, যে পার্ক সার্কাস থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। রতন কোন দলে নেই, ওসব তার পোষায় না। সময়ও নেই, পছন্দও করে না। ব্যক্তিগতভাবেই সে উগ্র মুসলমান-বিদ্বেষী। বেঁটে মোটাসোটা একটু ভোঁতা ধরণের মানুষ, মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করে, রূপলাবণ্যবতী একটি অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে আছে—ছোট ছোট।

মুসলমানরা গোখাদক নেড়ে, এইজন্যই রতনের রাগ। যদিও নিজে সে খুব বেশী গোঁড়া নয়, কালের গতিতে যেমন দাঁড়িয়েছে আর দশজনের মত তেমনি শিথিলভাবেই মোটা মোটা আচারনিষ্ঠা মেনে চলে সখ হলে মাঝে মাঝে হোটেলে মুরগীর মাংস ও পরোটা খায় বয় মুসলমান টের পেয়েও মুখ বাঁকায় না। আপিসে দু'জন মুসলমান সহকর্মী আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা খোস গল্প করে। একজন মুসলমান ফিরিওলার কাছে সে ডিম কেনে, লোকটা ভাল ডিম দেয় পচা ছিল বললে তার কথাতেই বিশ্বাস করে দু'একটা ডিম বদলে দেয়। পুরানো খদ্দের বলে বাজার দরের চেয়ে তার কাছে দু'পয়সা এক আনা কম নেয়।

রতনের স্ত্রী অলকা বড় ডিম ভালবাসে।

রতনের মুসলিম-বিদ্বেষ একটা অনির্দিষ্ট উগ্র ঝোঁক। রক্তমাংসের জীবন্ত মুসলমানের সংস্পর্শে এলে সে বিতৃষ্ণা বোধ করে না—বিন্দুমাত্র নয়। অথচ দিবারাত্র সে উগ্রভাষায় মুসলমানদের মুণ্ডপাত করে।

উষা পার্ক সার্কাস থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে, শুধু এইজন্যই সে উঠতে বসতে মুসলমানদের গাল দেয়। তার মতে, জগতে যত কিছু অন্যায় উপদ্রব হাঙ্গামা হয় সব মুসলমানদের কাজ। ব্রিটিশরাজের পুলিশ যে গুলি করে গিরীনকে আহত করেছে আশার মত কচি মেয়েটাকে ভেঙেচুরে কুৎসিত করে দিয়েছে, এজন্যও আসলে দায়ী মুসলমানরা।

কিন্তু মনসুর ও রশৌনার সঙ্গে আলাপ ও ভাব হতে তার দেরী হয়নি। বরং রশৌনা ধৈর্য ধরে তার একঘেয়ে সুখদুঃখের কাহিনী শোনে বলে মণি নিলীমা সরস্বতীদের চেয়ে তার কাছেই নিজের কথা বলতে সে বেশী ভালবাসে।

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ২৭৬

(গ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ৯

উষার মধ্যে এক অন্ধ বিদ্বেষ আর আতঙ্ক জন্মেছে সাধারণ অনির্দিষ্ট এক মানুষদের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে—যার তার কাছে শুধু মুসলমান। উঠতে বসতে সাধারণভাবে এখনো সে মুসলমানদের গাল দেয়। রক্তমাংসের জীবন্ত

মুসলমান কিন্তু ঘৃণা রাগ বা ভয় ? না মোটেই। উষা বড ডিম ভালবাসে, এ বাড়ীতে উৎখাত হয়ে এসেও মুসলমান ফিরিওলার কাছ সে নিয়মিত ডিম কিনে এসেছে, মাঝখানে ডিমওলা কিছুদিন আসে নি, এখন আবার আসতে আরম্ভ করায় আবার কিনছে। কাল্লু-কাসেমেরা প্রণবদের কাছে আসা যাওয়া করে, দরকার হলে দরজা খুলে উষাই তাদের ছাতে অস্থায়ী ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে বসায়, চা দেয়, কথা বলে। মনসুর আর রশীনার সঙ্গে তার রীতিমত ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে, ওরা ধৈর্য্য ধরে তার একঘেয়ে সুখদুঃখের কাহিনী শোনে বলে বাড়ীর লোকের চেয়ে ওদের কাছেই নিজের কথা বলতে সে বেশী পছন্দ করে।

কেবল নিজের সুখদুঃখের কথা বলতে বলতে গরম হয়েই নয়, পাঁচজনের আলোচনা শুনতে শুনতেও গরম হয়ে গাল দেয়। গোকুল প্রণবদের বলে, তোমরা বিপ্লবী না হাতি! ওদের তোমরা জিততে দিলে ? ওই বলতে বলতে গরম হয়ে হয়তো মুসলমানদের গাল দিয়েও বসে।

মনসুর নির্ব্বিকার হয়ে শুনে যায়। রশীনা মৃদু হেসে বলে, আমরাও কিন্তু মুসলমান।

উষা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, না না, ছি! আপনাদের কিছু বলি নি!

মনসুর বলে, না বললেও সেটা বুঝেছি। কাদের গাল দিচ্ছেন আপনি ঠিক জানেন না। তারা শুধু মুসলমান। তা আপনার দোষ কি, মুসলমানেরাই কিছু কিছু যরে (?) টের পেতে আরম্ভ করেছে, মুসলমান হয়েও কারা এতকাল গরীব সাধারণ মুসলমানের ঘাড ভেঙে এসেছে।

রশীনা সখেদে বলে, সত্যি! হিন্দুরা এবিষয়ে অনেক সচেতন। ভাগ্য নিয়ে যারা খেলা করে হিন্দুরা তাদের নেতা বলেই, মুসলমানদের কাছে তারা আগে মুসলমান পরে নেতা। কোন অন্ধকারে ঠেলে রেখে দিয়েছে, কিভাবে কাজে লাগছে সেটা! ভাবলেও বুক জ্বলে যায়।

[এই অংশটি কাটা] হয়ে বলে, হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের বেশী অন্ধকারে ঠেলে রেখে

দ্র মা রচনাসমগ্র ৭ পৃ ৩৮৪

(ঘ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ৯

দেশ ভাগ হয়েছে বলে তারা দুজনেই তাই ভয়ানকভাবে মুষড়ে গেছে। দেশ ভাগ হয়েছে বলে নয়, মুসলমানরা দেশটা ভাগ করে নিয়ে রাজা হয়েছে বলে। মুসলমানেরা রাজত্ব পেল ? কি সর্ব্বনাশ! প্রণবের সঙ্গে সে ঝগড়া করে। বলে, তোমরা বিপ্লবী না হাতি! তোমাদের শুধু মুখের বড়াই! এ সর্ব্বনাশটা ঘটতে দিলে তোমরা ? প্রণব অতিষ্ঠ হয়ে সোজাসুজি ঘাট মানে যে সত্যই তারা ভাল বিপ্লবী নয়, তারা খালি ভুল করছে। কিন্তু তার বিনয় বা ঘাটস্বীকার দিয়ে উষা কি করবে ? সেটা তো তার আসল কথা নয়!

সে উঠতে বসতে মুসলমানদের গাল দেয় আর প্রণবকে দায়ী করে দেশ ভাগ করে মুসলমানদের রাজত্ব দেওয়ার জন্য।

প্রণব তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে—রেহাই পাবার জন্য। বলে, তুই বুঝিসনে কিছু। দেশটা ভাগ হয়েছে কিন্তু হিন্দুও রাজত্ব পায় নি, মুসলমানও রাজত্ব পায় নি।

উষা বড বড চোখ করে বলে, পায় নি কিরকম ? হিন্দু পায় নি, মুসলমানরা পায় নি কিরকম ? বলে সে মুসলমানদের সাধারণভাবে কতগুলি অনির্দ্দিষ্ট গাল দেয়।

প্রণব বলে, রাজত্ব যাদের ছিল, তাদেরি আছে। রাজত্বের ভাগ কেউ পায় নি। যাদের রাজত্ব তারাই শুধু দেশটা ভাগ করেছে। নিজেদের খুশীমত ভাগ করেছে।

উষা রেগে বলে তোমাদের এসব ফাঁকা কথা বুঝিনে বাবু।

প্রণবও রেগে বলে, বুঝিসনে কেন ? তোর ভাসুর আর তোর কর্তার সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম হয় নি শ্যামবাজারের বাড়ীটা নিয়ে ? ভাগ হয়ে যায় নি তারা, ভাগ হয়ে গিয়ে তোর কর্তা পার্কসার্কাসে বাড়ীটা করে নি ? তারপর তোর ভাসুরের মেয়ের বিয়েতে গিয়ে সাতদিন তোরা থেকে আসিস নি তোর ভাসুরের বালীগঞ্জের বাড়ীতে ?

উষা ভড়কে গিয়ে বলে, এসব কথা টানছ কেন ?

প্রণব বলে, টানছি তোকে কথাটা বোঝাতে। সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কদিন মারামারি করেছিল তোর কর্তা আর তোর ভাসুর ? ভাগবাটোয়ারা হয়ে থাকার পর কদিন লেগেছে তাদের ভাব হতে ?

উষা একটু কোনঠাসা হয়ে পড়ায় ছ'মাসের ছেলেটাকে টেনে নিয়ে তার মুখে মাই গুঁজে দেয়। বিড বিড করে বলে, বাপের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া আর—

প্রণব বলে, হিন্দু মুসলমান যদি সত্যি দেশটা ভাগ করে নিতে চাইত নিজেদের মধ্যে, কবে দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে তাদের ভাব হয়ে যেত। হিন্দু মুসলমান দেশটা ভাগ করে নি, দেশের কর্তারা দেশটা ভাগ করিয়েছে। ঝগড়াও বাধিয়েছে তারাই, তাই দেশ ভাগ হয়েও ঝগড়া মিটছে না।

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৩-৩৮৪

(ঙ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১০

প্রণব কিছুদিন ধরে বই পুঁথি ঘেঁটে কি একটা লেখা তৈরী করছে। বাড়ীতে ঘরে বারান্দায় তো স্থান নেই, ছাতেই একটা হোগলার ছাতা বানিয়ে তার তলায় যে অধিকাংশ সময় কাটায়। বাইরের লোক এলেও ছাত ছাড়া বসাবার ঠাঁই নেই। চিলেকুঠির দেয়াল নিয়ে তাই আরেকটা হোগলার চালা উঠেছে সংবর্ধিতে বসার ব্যবস্থা। রাত্রে সংবর্ধিটা সরিয়ে ছাত ঝাঁটা দিয়ে মাদুর বিছিয়ে কয়েকজন এখানে শোয়।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রণব বোধ হয় ছাতের নানা আলোচনার কথাবার্তাও শোনে।
কলম রেখে উঠে এসে সে বলে, বর্ণৌনা, তুমি যে কেন অবশ করলে আমাকে ! এই কথাটাই আমি ধরতে পারছিলাম না, ক'দিন ধরে হাঁসফাস করছি।
বর্ণৌনা বলে, মেরেছে ! কে জানে কি বলতে কি বলে ফেলেছি ? তর্ক করতে পারব না কিন্তু।
তর্ক নয়। তুমি যা বললে সেই কথাটাই।
এতো সাধারণ কথা। সবাই জানে।
না, সবাই জেনেও জানে না কথাটা। আমিও জানতাম না।
প্রণব বলে। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। খোলা ছাতের চালায় ঝোলানো তার ন্যাংটো বালব্‌টা ঠিক তার মাথার উপর থেকে আলো ছড়াচ্ছে। বিদ্যুৎ আবিস্কার করতেই কতকাল ধরে কত কাণ্ড করেছে মানুষ, বৈদ্যুতিক আলোয় বালব্‌টি তার হদিস দেয় না। আকাশের তারা যেন খসে এসেছে তাদের আলো দেখার জন্য। প্রণব যেন আপনার বিপ্লবী কামনার ফাটকে আটক ছিল এতদিন। অতীতের সঙ্গে লড়াই করছিল এতদিন। অতীতকে বাধা করায় বাগিয়ে নেবার উপায় খুঁজতে এই খোলা ছাতে হোগলার চালার নীচে দিনরাত্রি একাকার করে দিয়েছিল দিনের আলো আর বালব্‌টার আলোয় পড়া ও লেখা চালিয়ে গিয়ে। যদি হদিশ মেলে।

হিন্দুমুসলমান আর ইংরেজকে ঘাটি করে সে অতীতকে, ইতিহাসকে আক্রমণ করেছিল। এক কদম এগোতে পারে নি।

প্রণব শ্রান্তির দম ফেলে বলে, সিক্রেট আছে মনসুর দে তো একটা।
সিগারেট ধরিয়ে বলে, এটা হিন্দুমুসলমান সমস্যা নয়।

(চ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১১

বর্ণৌনা সখেদে বলে, সত্যি। হিন্দুরা এবিষয়ে অনেক সচেতন। ভাগ্য নিয়ে যারা খেলা করে হিন্দুরা তাদের নেতা বলেই জানে, মুসলমানেরা কাছে তারা আগে মুসলমান, পরে নেতা ! কোন অন্ধকারে রয়ে (?) গেছে কিভাবে সেটা কাজে লাগাচ্ছে ইংরেজ আর নেতা ভাবলেও বুক জ্বলে যায়। বাদশার জাত, ইংরেজকে বেশী ঘেন্না করত তাই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে নি। কত যেন গর্ব্বের কথা !

গোকুল বলে, কথাটা ঠিক হল না মাসী।

ঠিক হল না ?
না। বাদশার জাত, ইংরেজকে বেশী ঘেন্না করত এইজন্য মুসলমান ইংরাজি শিক্ষা নেয় নি, এটা উড়ো পণ্ডিতদের বানানো কথা। ইংরাজের। দেওয়া শিক্ষা নিয়ে ইতিহাসের বাঁকা ব্যাখ্যা করে এসব ফাঁকা সিদ্ধান্ত করা হয়। এরাই হিন্দুদের উদারতার কথা বলে, হিন্দুরা এগিয়ে ইংরেজী শিক্ষা নিয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করেছে, অনেক বেশী আধুনিক আর সচেতন হয়েছে ! সব বাজে কথা, ইতিহাসের কলকাটি বাদ দিয়ে ইতিহাসের মানে বানানো।

মুখ্যু মেয়েমানুষ, বুঝলাম না তো ! একটু বুঝিয়েই বলো ? গোকুল প্রণবের দিকে তাকায়, বলে, আপনি বলুন না ?
প্রণব বলে, তুমিই তো বেশ বলছ !

গোকুল দ্বিধা না করেই বলে, হিন্দু ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষা পেয়ে এগিয়েছে, মুসলমান পিছিয়ে আছে, এ ধারণাটাই ভুল। কোটি কোটি হিন্দুর শিক্ষার ব্যবস্থা কই ? কোথায় তারা শিক্ষা পেল, পুরানো দিনের অন্ধকার থেকে আলোয় এল ? এদেশে শিক্ষিত কজন ? ইংরেজের খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, হিন্দুদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা পেতে দেবে ! কাজেই, ঠিক কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এদেশে কিছু হিন্দু স্কুল কলেজের শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানরা তাও পায় নি। সাধারণভাবে, কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান একই অন্ধকারে সমানভাবে পিছিয়ে আছে।

সকলে মন দিয়ে শোনে। গোকুল এমন সহজ আর স্পষ্ট ভূমিকা করে যে তার কথার গতি কোনদিকে বুঝতে কষ্ট হয় না। হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ থেকে এদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজকে সে পৃথক করেছে, বলেছে এরা প্রধানত হিন্দু। হিন্দু সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ। এদেশের হিন্দু মুসলমান সমান অশিক্ষিত, একইরকম পিছিয়ে পড়া জীব।

গোকুল বলে, এদেশের সামান্য ইংরাজী শিক্ষাটুকু এদেশের হিন্দুরা যে প্রায় একচেটে করেছে, এটা কি ঘটেছে তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ? ইংরেজ রাজত্বের ব্যাপার আমরা ইংরাজকে বাদ দিয়ে ধরতে ভালবাসি ! ইংরেজ রাজা হয়েছিল বটে কিন্তু আমরা হিন্দু মুসলমানরা যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের খুশীমত শিক্ষাদীক্ষা সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের পথ বেছে নিতাম। ইংরেজ শুধু শাসন করে আসছে, আমাদের কোন ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলায় না, উদার ইংরাজ রাজ ! বাদশার জাত বলে মুসলমানরা পেতে ইচ্ছা করে নি, শুধু এইজন্য ইংরেজী

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৫

(ছ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১১

শিক্ষাটুকু তাদের জোটে নি। হিন্দুরা পেতে ইচ্ছা করেছিল , তাই তারা পেয়েছে। ইংরেজরাজের যেন কোন ইচ্ছাও ছিল না, অনিচ্ছাও ছিল না। আসলে, ইংরাজের ইচ্ছাতেই হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষাটুকু পায়, মুসলমানরা বঞ্চিত হয়। অনেক হিসাব করেই ইংরাজ হিন্দুদের বেছে নিয়েছিল, কিছু লোককে শিক্ষা না দিয়ে রাজত্ব চালানো যে সম্ভব ছিল না। দপ্তরে কেরানীর কাজের জন্যও যে শিক্ষিত ছেলে চাই। নিজের দরকারে যেটুকু শিক্ষা দেবে, সেটুকু দেবার জন্যও বিশেষ করে বেছে নিয়েছিল হিন্দুদের, ইংরেজ কি হিসাবী ! ইংরেজ চেয়েছিল, হিন্দুরা তাই ইংরাজী শিক্ষা নিয়েছিল। নইলে ইংরেজ যদি শিক্ষাটুকুর জন্য মুসলমানদের বেছে নিত, আজ উল্টো যুক্তি শুনতাম, হিন্দুরা গোঁড়া তাই ইংরাজী শিক্ষা নিতে এগোয় নি। মুসলমানরা উদার, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই তারা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে গেছে।

মণি মুগ্ধ হয়ে গোকুলের কথা শোনে। গুরুজন হতে বলেও আজকাল সে প্রায় ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে গোকুলের। শিষ্যের কাছে শিক্ষা পাবার আগ্রহ নিয়ে প্রণবও যেন শুনছে গোকুলের কথা। তার দিকে চেয়ে মণির বুক গর্বে ভরে যায়।

মনসুর বলে, কথাটা ঠিক মনে হচ্ছে। ইংরেজরাজাই আসলে সব ঘটিয়েছে। কিন্তু আমরা কি পুতুল ছিলাম ইংরাজের হাতে, আজও পুতুল হয়ে আছি ? ওই তো মুস্কিল ! গোকুল সখেদে বলে, গা-জ্বালা করা সত্যটুকু মানতে না চেয়ে মিথ্যা এনে গোল পাকাতে চাই। ইংরাজের হাতের পুতুল ? এদেশে একদিন শান্তিতে রাজত্ব করতে পেরেছে ইংরেজ—একটা দিন ! হিন্দু মুসলমান মিলে দেশ জুড়ে বিদ্রোহ করেছে, নয় তো এখানে ওখানে বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে। শুধু কি গরম বিদ্রোহ আর গরম বিক্ষোভ ? সামনাসামনি গায়ের জোরে ব্যাপার না জেনে এদেশের লোক কতভাবে কত কৌশলে। ভিত খুঁড়ে আলগা করে দিতে চেয়েছে ইংরেজ রাজত্বের। দিবারাত্রি কতদিনে কতভাবে কতরকম লড়াই সামলে কত হিসাব কত কৌশল করে ইংরেজ এদেশে টিকে আছে !

গোকুল একটু থামে, মেরুদণ্ড সোজা করে মুখ তুলে ঘোষণা করে, এদেশের মানুষ ইংরেজ রাজত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু একটা দিনের জন্যও মানে নি !

রশৌনা স্বরস্বতীকে বলে দিদি, সেই সম্পর্কে গোকুল তাকে মাসী বলে। প্রসবের দিন ঘনিয়ে এসেছে স্বরস্বতীর। তার এক অদ্ভুত বেপরোয়া সাহস এসেছে আজকাল, সেকালের শোনা মায়েদের মত। যারা দশ মাস পর্যন্ত দশজনের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে একদিন মস্ত ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে বলত, মাগো, গেলাম !—বলে, তৈরি করা আঁতুর ঘরে গিয়ে ছেলে বা মেয়ে বিইয়ে ফেলত।

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৫

(জ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১১

স্বরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। গোকুলের গলা কি তার কানে গেছে ? স্বরস্বতীর প্রসবের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ঘটনাচক্রে এমন যোগাযোগও ঘটতে পারে যে হয় তো ঘনিয়ে আসা পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে সে মা হয়ে বসবে। এই প্রথম, কিন্তু ছেলে বিয়োনো সম্পর্কে স্বরস্বতীর এক অদ্ভুত বেপরোয়া সাহস এসেছে। তাকে বিয়োতে গিয়ে তার মা মরে গিয়েছিল। কিন্তু তার ঠাকুরমা নাকি দশমাস পর্যন্ত দশজনের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে একদিন মস্ত ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে বলত, মাগো, গেলাম ! বলে, উনানের কোণে খড় বাঁশে তৈরী ছেলেখেলার মত অস্থায়ী আঁতুর ঘরে গিয়ে দু'দণ্ডে বিনা কষ্টে ছেলে বা মেয়ে বিইয়ে আরেকবার মা হত।

হাঁসপাতালে মরলে গিন্নী স্বর্গে যেত, মরে নি বলে হাঁসপাতাল থেকে জেলে গেছে—স্বাধীনতাদাতা ব্রিটিশ রাজের বে আইনী বিনাবিচারের আইনে। স্বরস্বতীও তাই ঠিক করেছে যে ডালভাত খাওয়ার মত সহজে সে গিন্নীর ছেলে বা মেয়েটাকে জন্মিয়ে দেবে। নিজে মরে তো মরবে ! স্বরস্বতীর ধারণা জন্মেছে, যে দেশে বে-আইনী আইন চলে সে দেশে ডাক্তাররা প্রাণ বাচানোর ব্যবসা করে। স্বাধীনতা আর প্রাণের ব্যবসায়ীদের সে মানবে না। না হয় মরবে !

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৫

(ঝ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১২

স্বরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। খিদেয় পেট শুঁটকিয়ে মরে গেছে মরে যাচ্ছে কত মেয়েপুরুষ, সে যেন মেয়ে বা ছেলে একটা বাচ্চা দিয়ে একবারে হাজার ভোজনের মত পেট ফুলিয়ে নির্বিবাদে এসে বসেছে দশজনের মধ্যে। গোকুল তার ভাই। আজ রাত্রেই হয় তো ব্যথা জয় করে সে মা হয়ে, কিন্তু ভাই দশজনের হৃদয় জয় করতে কি বলছে সেটাও তো শোনা চাই !

রশৌনা উঠে গিয়ে তার পাশে বসে। ব্লাউজের তলা দিয়ে বাঁ হাত ঢুকিয়ে গোপনে আলগোছে স্বরস্বতীর পিঠের ঘামাচি মেরে দিতে দিতে গোকুলকে বলে শিক্ষাটুকু দেবার জন্য হিন্দুদের বেছে নিল কেন, মুসলমানদের বাদ দিল ?

দ্র মা রচনাসমগ্র ৭ পৃ ৩৮৫

(ঞ) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১২

স্বরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। রশৌনা তার পাশে উঠে গিয়ে চুপি চুপি বলে, ঘামাছি মেরে দি' ?

বা হাতটি ব্লাউজের তলা দিয়ে গোপনে পিঠে চালিয়ে দেয়। গোকুলকে জিজ্ঞাসা করে, তা শিক্ষাটুকু দিতে ইংরেজ বিশেষ করে হিন্দুদের [অস্পষ্ট]
বেছে নিল কেন মুসলমানদের বাদ দিয়ে ?

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৫

(ট) পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাঙ্ক ১৫

থাকার নিয়ম ভেঙে সব হারিয়ে দু'একদিন গোপন থাকতে না চিরতরে নিজেকে গোপন করে ফেলতে।
এদিকটা আমার খেয়াল হয় নি।
তোমার খেয়ালখুশী বিচার বিবেচনা থাক, রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।
সুধীন বলে, চলো বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় ট্যাক্সি নিয়ে নেব।
তাই চল।
প্রণবকে ভাববার বুঝবার অবকাশ না দিয়ে তারা রাস্তায় নেমে যায়। মোড়ে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড শূন্য দেখে তারা দাঁড়ায় না, ঘাবরায় না, এগিয়ে চলে। লাটপ্রাসাদের দিক থেকে একটা ফেরত ট্যাক্সি থামিয়ে ডবল ভাড়া কবুল করে তারা ছেড়ে আসা বাড়ীতে ফিরে যায়।

চাবিদিকে ধুলো আর ময়লা। ত্যক্ত বাড়ীর রিক্ততা মেঝের ধুলোয়, দেযালেব মাকড়সার জালে, বাতাসে মেশানো কটু হতাশায় থমথম কবছে, তারা কজন যেন ঝড় ভূমিকম্প বিপ্লবের মত হাজিরা দিল।

সুশীল অবশ্য সেই মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল না। ব্রিটিশ আমেরিকান ডিটেক্‌টিভ নভেলের নায়ক হলে সে অবশ্যই তা করত। সস্তা ডিকেট্‌টিভ টিভি নভেলেব আদর্শে যতই প্রভাবিত হোক, সুশীল এই বিপ্লবী দোলায় দু'চাবটা ছেলেমেয়ে আর তাদেব জননীরূপী স্ত্রীর স্বামী তো।

দড়ি আপিস বাতিল কবে মুহূর্তে রক্ত দই-জমা পেট [?] জমিয়ে দিয়ে দ্রুত মৃত্যুব আয়োজন ঠিকঠাক করে সুশীল শেষ চিঠি লিখছিল মণিকে। মরব—মৃত্যু আসতে না চাইলেও আত্মনাশেব চরম ডাক দিয়ে ডেকে এনে মবব—মৃত্যু কত সস্তা হয়ে গেছে এ দেশে।

মণি যেন জীবনেব বন্যাব মত ছেলেমেয়ে দাওব ননদ কুলি চাষা নিয়ে এসে ভাসিয়ে দিল সুশীলেব আত্মনাশের সঙ্কল্প।

সুশীল মজুর নয।

দ্র মা রচনাসমগ্র-৭ পৃ ৩৮৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম মানিক ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা-লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় , ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী , এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান , 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু , পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ বৌ' , সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ ।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে বা পরবর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প -পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর-ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ।

প্রকাশিত গ্রন্থ গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ,

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।
চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—২৮ জুলাই মুক্তি পায়।
একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।
'পেশা' 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।
ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।
১১ ১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।
প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'– চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।
বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।
প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।
বিপর্যস্ত শরীর মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দুমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।
২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।
৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যুষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।